ব্রহ্মবিদ্যা।

ধর্ম্ম ও অধ্যাত্মবিদ্যা সম্বন্ধীয়

মাসিক পত্র।

দ্বিতীয় বৎসর।

রায় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর এম, এ, বি, এল

ও

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম, এ, বি, এল

সম্পাদিত।

৪।৩.১, কলেজস্কোয়ার, বঙ্গীয় তত্ত্ববিদ্যা সমিতি হইতে

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

কলিকাতা, কলেজ স্কোয়ার, উইলকিন্স মেশিন প্রেসে

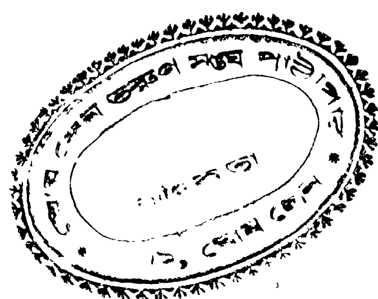
তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩২০ সাল।

চিত্র-সূচী।

"ব্রহ্মবিদ্যা"—দ্বিতীয় বৎসর।

বিষয়ের বর্ণানুক্রমিক সূচী।





নিমাইসন্ন্যাস

ব্রহ্মবিদ্যা

২য় বর্ষ।] বৈশাখ, ১৩২০। [১ম সংখ্যা।

মর্ম্মগীতি।

জানি না কেন যে ডাকি ; কেন, এ আঁধারে থাকি,
কোন্ আলোকের অধীশ্বরে
চাহিতেছি নিশিদিন ; কেন চিরদীনহীন
অজ্ঞাত সম্পদ্ আশা করে ?
ডাকিতে জীবন গেল, শকতি ফুরায়ে এল,
ভকতি পড়িয়া র'ল পিছে ;
জানিনা কোথায় যাব, কোথায় কি ধন পাব ?
ডেকে ডেকে ছুটিয়াছি মিছে।
আমার পরশ-দোষে প্রসন্ন অম্বর রোষে,
গরজে কুলিশ শত-নাদে ;
ত্রিলোকের তৃপ্তহাসি — নিশির আলোক রাশি
আমারে হেরিয়া যেন কাঁদে ;
অতল অমৃতধারা সলিল-সম্পদ-হারা
বালুকা-প্রবাহে বহে যায় ;
কনক-অচল গায়, চঞ্চল-জলদ-প্রায়
মরীচিকা যেন বা লুকায়।
জানিনা কেন যে ডাকি, জীবন ধরিয়া ফাঁকি
যে জন দিতেছে জ্ঞানহীনে ;
বুঝিনা কি আছে ফল, রসনায় অবিরল
কেন নাম আসে নিশিদিনে ?
শৈশবের পাদদেশে রঞ্জিত সুরম্য বেশে
ছিল যৌবনের সানুদেশ
যৌবন আসিল, গেল ; সে ঐশ্বর্য্য কই এল ?
দুরাশায় আশা হ'ল শেষ।

ব্রহ্মবিদ্যা।

যৌবন কহিল ফিরে, ওই দেখ প্রৌঢ়-শিরে
বাঞ্ছিত সুফল স্বর্ণপুরে ;
সেই প্রৌঢ় চ'লে যায় বিফল সে বাসনায়
তেমনি বিফলে ফেলে দূরে ;
জীবন সীমান্তে আজি লইয়া আশার সাজি
তেমনি চলেছি সেই পথে ;
আর না কুসুম চাহি, কণ্টকে বেদনা নাহি,
শেষে যেতে চাই কোন মতে।
জানি না কেন যে ডাকি, কি লাঞ্ছনা আছে বাকী
সেই বাঞ্ছা-কল্পতরুমূলে ?
কি জানি কাহার কাছে কি কথা লুকান আছে ?
সকল লাঞ্ছনা যাই ভুলে।
না বুঝিনু ভালবাসা, না শুনিনু মিষ্টভাষা ;
তবু যেন কি স্নেহের আশা,
সব ভগ্ন আশা জুড়ে, সব বিঘ্ন ফেলে ছুঁড়ে,
মিটাইতে চায় সে পিপাসা।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র।

নরকঙ্কালের উক্তি।

পূর্ব্বে ছিল কিবা মোর তনু সুকুমার,
নিরখিয়া জুড়াইত নয়ন সবার॥
স্বর্ণকান্তি ত্বগ্ দ্বারা ছিলাম আবৃত,
পরম সুন্দর দেহ মেদমাংস-যুত॥
কত যত্ন কত কার্য্য সেই দেহতরে,
সদা চেষ্টা—কাল নাহি গ্রাসিবারে পারে॥
কিন্তু ভাই! দেখি মোর এই পরিণাম,
সনাতন বস্তু লাভে হও যত্নবান্॥

শ্রীখগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চৈতন্যকথা।

রাধাকৃষ্ণ কে ?

বিগত বর্ষে 'চৈতন্য কথা'র আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সূত্রধার মাধবেন্দ্রপুরী। দেখিয়াছি, সেই আবির্ভাবের মহা আয়োজন ও মহা আন্দোলন। দেখিয়াছি, প্রবল বিশ্বাসের সহিত মনের মহা আবেগে ভক্ত-গণ তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। দেখিয়াছি, অদ্বৈতের আবাহন, বিশ্বরূপের পরিচর্য্যা, নিত্যানন্দের বিশ্বরূপ-ভাব গ্রহণ। বিশ্বরূপ ও নিত্যানন্দ দ্বারে সঙ্কর্ষণের তত্ত্ব জানিতে চেষ্টা করিয়াছি। বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণের নিত্যসম্বন্ধ ও আমাদের পার্থিব জগতে সেই সম্বন্ধের আভাস জানিতে যথাসাধ্য উদ্যম করিয়াছি। সেই উদ্যমে কৃষ্ণতত্ত্ব আমাদের সম্মুখীন হইয়াছিল। তদুপলক্ষে বালক বিশ্বম্ভরে, তরুণ অধ্যাপকে আমরা আগ্রহের সহিত অবতারের ভাব দেখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলাম। তাঁহার বাল্যে যাহা দেখি, তারুণ্যে সে ভাব দেখিতে পাই না। ক্রমে উদ্ধত বিশ্বম্ভর এক অসাধারণ আবেশের ভাবমধ্যে পতিত হইলেন। তাঁহার ভক্তগণের মধ্যেও আবেশের ভাব, বিশেষত শ্রীবাসে নারদের ভাব। বিশ্বম্ভরে আবেশের ক্রম দেখিতে চেষ্টা পাইয়াছি। দেখিয়াছি, সে আবেশ রাধাকৃষ্ণের আবেশ।

এখন রাধাকৃষ্ণ কে ? মহাভারতের কৃষ্ণকে সকলেই স্বীকার করেন। মহাভারতের মধ্যেও আবার কেহ কেহ প্রক্ষিপ্ত পাঠ দেখেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ এক জন অসাধারণ মনুষ্য বিশেষ। সে কৃষ্ণের সহিত রাধিকার কোন সম্বন্ধ নাই। আবার পরম ভাগবত বৈষ্ণবগণ গোপীবল্লভ কৃষ্ণে বাসুদেব কৃষ্ণ দেখিতে পান না।

তত্রাপ্যেকান্তিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দহৃত মানসাঃ।
যেষাং শ্রীশপ্রসাদোঽপি মনোহর্ত্তুং ন শক্নুযাৎ॥
সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ২। ৩১

"একান্ত অনুরক্ত ভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা গোবিন্দ কর্ত্তৃক অপহৃতচিত্ত তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ। রুক্মিণীপতি কৃষ্ণের অনুগ্রহও তাঁহাদের মন হরণ করিতে পারে না। যদিচ সিদ্ধান্ত দ্বারা দ্বারকাপতি পরব্যোমাধিপ শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণে ভেদ নাই, তথাপি গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণই উৎকৃষ্ট। তিনি প্রেমময় ও প্রেমের আস্পদ।" মহাভারতের কৃষ্ণ পরব্যোমের অধিপতি বিষ্ণু। ভাগবতের কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। রূপ-গোস্বামী বলেন যে,—

আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ১। ৯

জীবগোস্বামী বলেন,—কৃষ্ণশব্দশ্চ স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তদ্রূপাণাং চান্যেষামপি গ্রাহকঃ।

'অনুকূলভাবে যে কৃষ্ণের অনুশীলন উত্তমা ভক্তি, সে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণরূপী অন্য অন্য কৃষ্ণ।' তবে কি কৃষ্ণ অনেক? তবে কি কোন কৃষ্ণ সত্য, কোন কৃষ্ণ কাল্পনিক? সিদ্ধান্তের দৃষ্টিতে ঈশ্বর কৃষ্ণে ও মধুর কৃষ্ণে ভেদ নাই। তবে কি এ অভেদ—শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।

সেইরূপ রাম ও কৃষ্ণের মত অভেদ?

কেহ বলেন যে, মহাভারতে যে কৃষ্ণের উল্লেখ আছে, তিনি যদি গোপীবল্লভ হইতেন, তাহা হইলে কি দিব্যদৃষ্টি মহামুনি ব্যাস জানিতে পারিতেন না? তাঁহার অপ্রতিহত যোগদৃষ্টিতে কি রাসলীলা অজ্ঞাত থাকিত? অথবা ব্যাসদেব কি জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ লীলা মহাভারতে অপ্রকট রাখিয়াছিলেন? করুণাময় ঋষি সমগ্র বেদের অর্থ নিরূপণ করিয়াছিলেন, তিনি কৃষ্ণের পরম মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছিলেন—তথাপি কি তিনি নির্গুণ ভক্তির চরম পথ দেখাইতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন? যে রাধাকৃষ্ণের মহিমা একবার জানিবে, সে কি রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়া জীবন সার্থক করিবে না? তবে কি শ্রীমতীর কৃষ্ণ, গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণ, মহাভারতের অভিনয়ের পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন? একথাও বরং মানিব, তথাপি বলিব না যে, রাধাকৃষ্ণ কাল্পনিক। বরং বলিব যে, যোগমায়া ভগবতী সেই শুদ্ধ নিত্য লীলা অবিচিন্ত্য অভেদ্য মায়ায় আবৃত রাখিয়াছিলেন,—বলিব যে, ব্রহ্মার অগম্য সেই লীলা প্রকটিত করিবার সময় তখনও হয় নাই,—বলিব যে, বৃন্দাবনের অদৃশ্য চিত্রপটে, যমুনা-লহরীর গভীর অন্তঃস্তরে, ললিতলবঙ্গলতাজড়িত নিভৃত কুঞ্জকাননে, সেই লীলা লুক্কায়িত ছিল; তথাপি বলিবনা যে, রাধাকৃষ্ণ কাল্পনিক। যে গদগদ প্রেমময় ঢল ঢল মূর্ত্তি একবার স্বপনে নিরীক্ষণ করিয়াছি, সেই শ্রীমতীর মূর্ত্তি যদি কাল্পনিক হয়, তবে আমার জীবন কাল্পনিক। সেই অমানুষী মানুষী রূপ, সেই কৃষ্ণগতচিত্তা কৃষ্ণময়-প্রাণার অত্যাশ্চর্য্য ভাব, সেই মহাযোগিনীর মহাযোগ, আমার হৃদয়ের অন্তস্তলে গভীর—অত্যন্ত গভীরভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। যাহা দেখিয়াছি, তাহা ভুলিবার নহে। সে রূপ আমার জীবনের সাথী, ধর্ম্মের চরম উদ্দীপনা, আদর্শের চরম লক্ষ্য। সেই লাবণ্যময় রূপের মধুর অমৃত-মাধুরী আমার জীবনে চিরকাল মধুরতা বিস্তার করিবে। কে বলে শ্রীমতী কাল্পনিক? কে বলে শ্রীমতীর সখীগণ কাল্পনিক? কে বলে রাসলীলা কবির কল্পনা?

যদি কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ সত্য হন, তবে রাসেশ্বর কৃষ্ণও সত্য। যদি মহাভারত

সত্য হয়, তবে ভাগবতও সত্য। যদি ব্যাসদেব সত্য হন্, তাহা হইলে শুকদেবও সত্য।

হইতে পারে--ব্যাসদেবের দৃষ্টি ও শুকদেবের দৃষ্টি স্বতন্ত্র। যখন যোগবলে শুকদেব বিধূম অগ্নির ন্যায় সূর্য্যমণ্ডলাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, তখন মন্দাকিনী-তীরে দেবকন্যাগণ তাঁহাকে নির্গুণ দেখিয়া বিবস্ত্রা হইয়া জলক্রীড়া করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। তাঁহার অন্বেষণে যখন ব্যাসদেব সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন দেবকন্যাগণ ভীত ও লজ্জিত হইয়া কেহ বা জলমধ্যে বিলীন হইলেন, কেহ বা গুল্মলতাদির অন্তরালে দণ্ডায়মান হইলেন এবং কেহ বা সত্বর হইয়া পরিধেয় বসন গ্রহণ করিলেন।

তাং মুক্ততাং তু বিজ্ঞায় মুনিঃ পুত্রস্য বৈ তদা।
সক্ততামাত্মনশ্চৈব প্রীতোঽভূদ্ব্রীড়িতশ্চহ ॥—মহাভারত, শান্তিপর্ব ৩৩৪।

'পুত্রের এই মুক্তভাব ও নিজের আসক্ত ভাব দেখিয়া ব্যাসদেব প্রীত ও লজ্জিত হইলেন।'

ব্যাসদেবে ও শুকদেবে যে ভেদ, সগুণ ও নির্গুণে যে ভেদ, 'শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মঃ' ও 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' এ দু'য়ে যে ভেদ, মহাভারত ও ভাগবতে যে ভেদ, রুক্মিণীরমণ ও রাধারমণে সেই ভেদ।

যদি ব্যাসদেব বৃন্দাবনে যোগমায়াপ্রচ্ছন্ন লীলা না দেখিয়া থাকেন, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? সে লীলার মধুর কৃষ্ণ, ঐশ্বর্য্যময় দ্বারকাধীশ কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র হউন, তাহাতেও ক্ষতি নাই। রাসলীলা কোন্ কালে বৃন্দাবন পবিত্র করিয়াছিল, কোন্ কালে সেই লীলা বৃন্দারণ্যের পূর্ব্ব গগনে উদিত হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে দ্বিধা থাকিলেও কোন হানি নাই। সে লীলা নিত্য লীলা, কখনও প্রকট, কখনও অপ্রকট। প্রেমের রাজ্যে সে লীলা নিত্য বিরাজিত। যেমন অন্ধকার সূর্য্যে স্থান পায় না, সেইরূপ সন্দেহ সে লীলাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না।

তথাপি আমরা মহাভারতের কৃষ্ণমধ্যে রাধাকৃষ্ণ দেখিতে পাই কি না, এ বিষয়ে আলোচনা করিব।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

বেদান্ত-পরিভাষা।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

মূল। সিদ্ধান্তে প্রত্যক্ষত্ব প্রযোজকং কিমিতি চেৎ, কিং জ্ঞানগতস্য প্রত্যক্ষত্বস্য* প্রযোজকং পৃচ্ছসি কিম্বা বিষয়গতস্য ? আদ্যে, প্রমাণচৈতন্যস্য বিষয়াবচ্ছিন্নচৈতন্যাভেদ ইতি ব্রূম:।

তথাহি ত্রিবিধং চৈতন্যং, বিষয়-চৈতন্যং প্রমাণ-চৈতন্যং প্রমাতৃ-চৈতন্যঞ্চেতি। তত্র ঘটাদ্যবচ্ছিন্নং চৈতন্যং বিষয়-চৈতন্যং, অন্তকরণবৃত্ত্যবচ্ছিন্নং চৈতন্যং প্রমাণ-চৈতন্যং, অন্তঃকরণাবচ্ছিন্নং চৈতন্যং প্রমাতৃ-চৈতন্যম্।

ব্যাখ্যা। এখন প্রশ্ন হইতেছে, বেদান্তমতে প্রত্যক্ষের প্রযোজক কি ? অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণে প্রধান নিমিত্ত কি ? উত্তর দিবার পূর্ব্বে, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি কিসের প্রযোজক চাও ? বেদান্তমতে দুইপ্রকার প্রত্যক্ষ আছে, জ্ঞানগত প্রত্যক্ষ ও বিষয়গত প্রত্যক্ষ।* তুমি কোন্ প্রকারের প্রযোজক জানিতে চাও ? প্রথমটির (অর্থাৎ জ্ঞানগত প্রত্যক্ষের) প্রযোজক শুনিবে ? শুন। প্রমাণ-চৈতন্যের সহিত বিষয়-চৈতন্যের অভেদকে আমরা জ্ঞানগত প্রত্যক্ষের কারণ বলি। [তুমি হয়ত বলিবে, এ কথার অর্থ কিছুই বুঝিলাম না। স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। প্রমাণ-চৈতন্য, বিষয়-চৈতন্য প্রভৃতি যে কি, তাহা শুন।]

চৈতন্য তিন প্রকার। প্রমাতৃ-চৈতন্য, প্রমাণচৈতন্য ও বিষয়-চৈতন্য।

আমি একটি ঘট দেখিতেছি। ঘট যে স্থলে আছে, সেই স্থলে বর্ত্তমান যে চৈতন্য, তাহা বিষয়-চৈতন্য। আবার অন্তঃকরণের বৃত্তি-[বৃত্তি কাহাকে বলে পরে বুঝাইতেছি] বিশিষ্ট চৈতন্য প্রমাণ-চৈতন্য ও অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্য প্রমাতৃ-চৈতন্য। [নিম্নলিখিত উদাহরণে ইহা স্পষ্ট হইবে।]

মূল। যথা তড়াগোদকং ছিদ্রান্নির্গত্য কুল্যাত্মনা কেদারান্ প্রবিশ্য তদ্বদেব চতুষ্কোণাদ্যাকারং ভবতি তথা তৈজসমন্তঃকরণমপি চক্ষুরাদিদ্বারা

---

* আমরা যখন একটি ঘট দেখিতেছি, তখন দুই প্রকারে ইহা বর্ণনা করিতে পারি। "মম ঘটঃ প্রত্যক্ষঃ" "ঘটটি আমার প্রত্যক্ষ" কিংবা "ঘটজ্ঞানং মম প্রত্যক্ষম্" "ঘটজ্ঞান আমার প্রত্যক্ষ"। প্রথমটিতে বিষয়গত অর্থাৎ 'ঘট'গত প্রত্যক্ষের উদাহরণ স্পষ্ট। দ্বিতীয়টি "জ্ঞানগত" প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্ত।

ঘটাদিবিষয়দেশং গত্বা ঘটাদিবিষয়াকারেণ পরিণমতে। স এব পরিণামো বৃত্তিরিত্যুচ্যতে।

ব্যাখ্যা। যেরূপ পুষ্করিণীর জল কোন ছিদ্র দিয়া বহির্গত হইয়া ক্ষেত্রে প্রবেশ করে ও ক্ষেত্র ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ বা গোলাকার হইলে জলও সেইরূপ ত্রিকোণাদি আকার ধারণ করে, সেইরূপ স্বচ্ছ অন্তঃকরণও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দিয়া বাহির হইয়া ঘট প্রভৃতি বিষয়ে যায় ও ঘট প্রভৃতিরই ন্যায় আকার প্রাপ্ত হয়। এই যে পরিণাম, তাহাকেই বৃত্তি বলে। ক

মূল। অনুমিত্যাদিস্থলে তু অন্তঃকরণস্য ন বহ্ন্যাদিদেশগমনং, বহ্ন্যাদেশ্চক্ষুরাদ্যসন্নিকর্ষাৎ। তথা চ 'অয়ং ঘট' ইত্যাদি প্রত্যক্ষস্থলে ঘটাদেস্তদাকারবৃত্তেশ্চ বহিরেকত্র দেশে সমবস্থানাৎ তদুভয়াবচ্ছিন্নং চৈতন্যমেকমেব. বিভাজকয়োরপ্যন্তঃকরণবৃত্তিঘটাদিবিষয়য়োঃ একদেশস্থত্বেন ভেদাজনকত্বাৎ। অতএব মঠান্তর্ব্বর্ত্তিঘটাবচ্ছিন্নাকাশো ন মঠাবচ্ছিন্নাকাশাদ্ভিদ্যতে।

ব্যাখ্যা। যেখানে অনুমিতি হয় (যেমন ধূম দেখিয়া অনুমান করিলাম যে, বহ্নি আছে), সেখানে অন্তঃকরণ বহ্নি প্রভৃতি বিষয়ে যায় না, কেননা বহ্নি প্রভৃতির সহিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের কোন সম্বন্ধই নাই। দূর হইতে কেবল ধূম দেখিতেছি। দেখিয়া অনুমান করিলাম যে. অগ্নি সেখানে আছে। কাজেই অনুমিতি প্রত্যক্ষ হইতে ভিন্ন।

"এই ঘট" এইরূপ প্রত্যক্ষ যেখানে হয়, সেখানে ঘট প্রভৃতি যেখানে আছে, অন্তঃকরণের বৃত্তিও সেই স্থলে; বাহিরে একস্থলেই দুইটি থাকাতে এই উভয়-বিশিষ্ট চৈতন্য একটিই। অন্তঃকরণবৃত্তি ও ঘটাদিবিষয় এই উভয়ই একস্থানে থাকাতে ইহাদের ভেদ নাই। যেমন একটি মঠের মধ্যে একটি ঘট আছে। ঘটটি

ক. পাশ্চাত্য দর্শনে এইরূপ ভাবে ইহা ব্যাখ্যাত হয়। Perception বা বস্তুসকলের প্রত্যক্ষ, পঞ্চেন্দ্রিয়ের (চক্ষু,কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা) সাহায্যে সম্পাদিত হয়। যে বস্তু প্রত্যক্ষ হয়, মনোমধ্যে তাহার অনুরূপ এক প্রতিবিম্ব পড়ে। ইহা Image সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। বেদান্তে, অন্তঃকরণ বাহির হইয়া ঘট প্রভৃতির আকার ধারণ করে, এই কথা বলা হইয়াছে। পাশ্চাত্য দর্শনে ঘটপ্রভৃতি, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-সাহায্যে স্নায়ুর উত্তেজনা করিয়া মস্তিষ্কে বিকার উপস্থিত করে ও তাহার পর ঘটাদির একটি প্রতিবিম্ব বা Image এর উৎপত্তি হয়।

শূন্য। তাহার মধ্যে আকাশমাত্র। এখন 'মঠের মধ্যাস্থিত আকাশ' বলিলে ঘট-মধ্যস্থিত আকাশও বুঝাইবে। ঘটমধ্যস্থ আকাশকে ঘটাকাশ বা মঠাকাশ দুই বলিতে পারা যায়, কেবল উপাধিভেদ মাত্র। বাস্তবিক চৈতন্যও সেইরূপ একই।

মূল। তথা চ 'অয়ং ঘট'' ইতি প্রত্যক্ষস্থলে ঘটাকারবৃত্তের্ঘটসংযোগিতয়া ঘটাবচ্ছিন্নচৈতন্যাৎ তদ্বৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যস্য অভিন্নতয়া তত্র ঘটজ্ঞানস্য ঘটাংশে প্রত্যক্ষত্বম্। সুখাদ্যবচ্ছিন্নচৈতন্যস্য তদ্বৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যস্য চ নিয়মেনৈকদেশস্থিতোপাধিদ্বয়াবচ্ছিন্নত্বাৎ নিয়মেন 'অহং সুখী' ইত্যাদি জ্ঞানস্য প্রত্যক্ষত্বম্।

নন্বেবং স্ববৃত্তিসুখাদিস্মরণস্যাপি সুখাদ্যংশে প্রত্যক্ষাপাত্তিরিতি চেৎ; ন। তত্র স্মর্য্যমানসুখস্য অতীতত্বেন স্মৃতিরূপান্তঃকরণবৃত্তের্বর্ত্তমানতয়া উপাধ্বোর্ব্যবচ্ছিন্নকালত্বেন তত্তদবচ্ছিন্নচৈতন্যয়ো র্ভেদাৎ। উপাধ্যোরেকদেশস্থত্বে সতি এককালীনত্বস্যৈব উপাধেয়াভেদপ্রযোজকত্বাৎ, যদি চ একদেশস্থমাত্রং উপাধেয়াভেদপ্রযোজকঃ তদা "অহং পূর্ব্বং সুখী" ইত্যাদিস্মৃতৌ অতিব্যাপ্তি-বারণায় বর্ত্তমানত্বং বিষয়-বিশেষণং দেয়ম্।

ব্যাখ্যা। এইরূপে ''এইঘট'' এইরূপ প্রত্যক্ষস্থলে অন্তঃকরণ ঘটাকার প্রাপ্ত হইয়াছে। অন্তঃকরণের এই পরিণাম বা বৃত্তি ঘটের সহিত মিলিত হইয়াছে। কাজেই ঘটবিশিষ্ট চৈতন্য ও অন্তঃকরণবৃত্তিবিশিষ্ট চৈতন্য এই উভয় এক হওয়াতে ঘটের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইল। এইরূপ "আমি সুখী" এই জ্ঞানও প্রত্যক্ষ। সেখানে সুখ ও অন্তঃকরণের বৃত্তি একই দেশস্থিত। কাজেই উভয়ের ভেদ না থাকাতে প্রত্যক্ষজ্ঞান।

এখন আপত্তি হইতেছে যে, একই দেশে থাকিলেই যদি উপাধি দুইটির অভেদ হয় ও এই অভেদ হওয়াতে যদি প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়, তাহা হইলে ''আমি সুখী ছিলাম'' এইরূপ স্মরণকেও ত প্রত্যক্ষ বলিতে পারি! [কারণ সেখানে সুখ ও অন্তঃকরণের বৃত্তি একই স্থলে রহিয়াছে।] উত্তর "না।" সেখানে উপাধি দুইটি বিভিন্ন সময়ের। সুখ সেখানে অতীত। এবং স্মরণরূপ যে অন্তঃকরণের বৃত্তি, তাহা বর্ত্তমান। কাজেই দুই উপাধির বিভিন্ন কাল। এই প্রভেদ হেতু দুইটি চৈতন্যেরও প্রভেদ।

উপাধি দুইটি কেবল একদেশস্থিত হইলে চলিবে না, এককালীন হওয়াও চাই। এক দেশে এক কালে হইলে তবে উহারা অভিন্ন হইবে।

আর যদিই ধর যে, একদেশে থাকিলেই দুইটি উপাধিকে অভিন্ন বলা যাইবে, তাহা হইলে "আমি পূর্ব্বে সুখী ছিলাম" এইরূপ স্মরণ স্থলেও প্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে, দোষ ত' এইমাত্র। এ দোষ দূর করিবার জন্য "বর্ত্তমান" এই বিশেষণটি "বিষয়" শব্দের পূর্ব্বে ব্যবহার কর। অর্থাৎ এই বল যে, প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের বিষয় সর্ব্বদা বর্ত্তমান হওয়া আবশ্যক। অতীত প্রভৃতি হইলে চলিবে না।

মূল। নন্বেবমপি স্বকীয়ধর্ম্মাধর্ম্মৌ বর্ত্তমানৌ যদা শব্দাদিনা জ্ঞায়েতে তদা তাদৃশ-শাব্দজ্ঞানাদৌ অতিব্যাপ্তিঃ, তত্র ধর্ম্মাদ্যবচ্ছিন্ন-তদ্বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্যয়োরেকত্বাৎ ইতি চেৎ ন, যোগ্যত্বস্যাপি বিষয়বিশেষণত্বাৎ। অন্তঃকরণধর্ম্মত্বাবিশেষেঽপি কিঞ্চিদযোগ্যং কিঞ্চিদ্‌যোগ্যং ইত্যত্র ফলবলকল্প্যঃ স্বভাব এব শরণং। অন্যথা ন্যায়মতেঽপি আত্মধর্ম্মত্বা-বিশেষাৎ সুখাদিবৎধর্ম্মাদেরপি প্রত্যক্ষাপত্তির্দুর্বারা।

ব্যাখ্যা। আচ্ছা, শাব্দজ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলিব কি? মনে কর, একজন লোক তোমাকে বলিল "ভবান্ ধার্ম্মিকঃ" (তুমি ধার্ম্মিক) বা "ভবান্ অধার্ম্মিকঃ" (তুমি অধার্ম্মিক)। এই কথা শুনিয়া তোমার নিজের ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম বিষয়ে জ্ঞান জন্মিল। এইখানে ধর্ম্মবিশিষ্ট চৈতন্য ও অন্তঃকরণবৃত্তিবিশিষ্ট চৈতন্য একই। সুতরাং তোমার মতে ইহা প্রত্যক্ষ বলা উচিত।

ইহার উত্তর "না।" পূর্ব্বে যেমন "বর্ত্তমান" এই বিশেষণটি "ঘট", "সুখ" প্রভৃতি বিষয়ের বিশেষণরূপে ধরিতে হইবে বলা হইয়াছে, সেইরূপ এখানে "যোগ্য" এই বিশেষণটিও বিষয়ের সহিত ধরিতে হইবে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় প্রত্যক্ষের উপযোগী হওয়া চাই। সুখ, দুঃখ যেরূপ অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মও সেইরূপ অন্তঃকরণের ধর্ম্ম তাহা মানি। কিন্তু অন্তঃকরণের ধর্ম্মের মধ্যে কতকগুলি (যেমন সুখ, দুঃখ ইত্যাদি) প্রত্যক্ষের যোগ্য, আর কতকগুলি (যেমন ধর্ম্ম, অধর্ম্ম প্রভৃতি) অযোগ্য। যদি বল, কোন্‌টি যোগ্য কোন্‌টি অযোগ্য জানিব কিরূপে? উত্তর "তাহাদের স্বভাব হইতেই জানিতে পারা যাইবে।" কোন 'বিষয়' জানিবার চেষ্টা করিলে যে ফল হয়, তাহার দ্বারাই বিষয়টির স্বভাব বুঝা যায়। তাহা হইতে বিষয়টি প্রত্যক্ষের যোগ্য কি

অযোগ্য বুঝা যায়। কাজেই তুমি যে আমার সংজ্ঞায় অতিব্যাপ্তি দোষ (অলক্ষ্যে লক্ষণের গমন) দিতে আসিয়াছ, তাহা পারিলে না। আমি "যোগ্য" এই বিশেষণ ব্যবহার দ্বারা সেই দোষ দূর করিতেছি।

আর তুমি নৈয়ায়িক, আমার এই কথা না মানিলে তোমার নিজের কথাতেও দোষ পড়িবে। তুমি 'সুখ', 'দুঃখ' আত্মার ধর্ম্ম বলিয়াছ। তাহাদের যেরূপ প্রত্যক্ষ হয়, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মেরও সেইরূপ তোমার মতেই প্রত্যক্ষ হইবে, কেননা "ধর্ম্ম" ও "অধর্ম্ম" তোমার মতে আত্মার ধর্ম্ম।

মূল। ন চৈবমপি বর্ত্তমানতাদশায়াং 'ত্বং সুখী' ইত্যাদি বাক্যজন্যজ্ঞানস্য প্রত্যক্ষত্বাপত্তিঃ স্যাৎ ইতি বাচ্যম। ইষ্টত্বাৎ। 'দশমস্ত্বমসি' ইত্যাদৌ সন্নিকৃষ্টবিষয়ে শব্দাদপি অপরোক্ষজ্ঞানাভ্যুপগমাৎ।

অতএব "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" ইত্যাদিজ্ঞানমপি বহ্ন্যংশে পরোক্ষং পর্ব্বতাংশেঽপরোক্ষং। পর্ব্বতাদ্যবচ্ছিন্নচৈতন্যস্য বহির্নিঃসৃতান্তঃকরণবৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যাভেদাৎ। বহ্ন্যংশে তু অন্তঃকরণবৃত্তিনির্গমনাভাবেন বহ্ন্যবচ্ছিন্নচৈতন্যস্য অন্তঃকরণবৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যস্য চ পরস্পরং ভেদাৎ। তথাচ অনুভবঃ "পর্ব্বতং পশ্যামি." "বহ্নিমনুমিনোমি" ইতি।

ন্যায়মতে তু "পর্ব্বতমনুমিনোমি" ইত্যনুব্যবসায়াপত্তিঃ, অসন্নিকৃষ্টপক্ষকানুমিতৌ তু সর্ব্বাংশেঽপি জ্ঞানং পরোক্ষম্। "সুরভি চন্দনম্" ইত্যাদিজ্ঞানমপি চন্দনখণ্ডাংশে অপরোক্ষং সৌরভাংশে চ পরোক্ষং, সৌরভস্য চক্ষুরিন্দ্রিয়াযোগ্যতয়া যোগ্যত্বঘটিতস্য নিরুক্তলক্ষণস্যাভাবাৎ।

ব্যাখ্যা। আচ্ছা, 'ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম' অযোগ্য বিষয় বলিয়া যেন প্রত্যক্ষ হইতে পারে না বলিলে। কিন্তু 'সুখ ও দুঃখ' প্রত্যক্ষের যোগ্য বিষয়, তাহা তুমি নিজেই স্বীকার করিয়াছ। যদি বলি "ত্বং সুখী" (তুমি সুখী), তাহা হইলে এই শাব্দ জ্ঞানকে (শব্দ হইতে যে জ্ঞান হইবে) তুমি প্রত্যক্ষ বলিবে কি? উত্তর "হাঁ। বলিব বই কি।" শাব্দজ্ঞান যে প্রত্যক্ষ হইতে পারে, তাহা মানিতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই। কেহ বলিল "তুমি দশম ব্যক্তি"। এখানে বিষয়ের সহিত অন্তঃকরণের বৃত্তির সন্নিকর্ষ রহিয়াছে। কাজেই এরূপ শব্দ হইতে উৎপন্ন জ্ঞানকেও আমরা প্রত্যক্ষ বলিয়া মানি। এই জ্ঞান আমাদের মতে অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ নয়।

আচ্ছা, "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" (ধূম দেখিয়া অনুমান করিলাম, পর্ব্বতে অগ্নি আছে); ন্যায়ের এই যে অনুমিতির উদাহরণ (নৈয়ায়িকগণ ইহা অনুমিতির

উদাহরণরূপেই সর্ব্বত্র ব্যবহার করিয়াছেন), ইহার জ্ঞান তোমার (বেদান্তবাদীর) মতে কিরূপে হয় ?

উত্তর—বহ্নি-অংশে জ্ঞান পরোক্ষ, প্রত্যক্ষ নহে ; কেন না অন্তঃকরণের বৃত্তি বাহিরে গিয়া বহ্নির আকার ধরে না, কাজেই বহ্নিবিশিষ্ট চৈতন্য ও অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট চৈতন্য পরস্পর ভিন্ন। কিন্তু পর্ব্বত অংশে অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। পর্ব্বত সম্মুখে বিদ্যমান। চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা অন্তঃকরণের বৃত্তি বাহির হইয়া পর্ব্বত রূপে পরিণত হইল। পর্ব্বতবিশিষ্ট চৈতন্য ও অন্তঃকরণবৃত্তি-বিশিষ্ট চৈতন্য এ স্থলে অভিন্ন। তাহাতে এইরূপ অনুভব হইল "পর্ব্বত দেখিতেছি ও বহ্নির অনুমান করিতেছি।" পর্ব্বত এখানে প্রত্যক্ষ, বহ্নি কেবল অনুমান-সাধ্য।

ন্যায়মতে "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" এই অনুমিতির উদাহরণ। নৈয়ায়িক ইহাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলেন না, পরোক্ষজ্ঞান বলেন। কেবল তাহাই নয়, ইহার কতক প্রত্যক্ষ, কতক পরোক্ষ, তাহাও বলেন না। কাজেই বেদান্তবাদী দেখাইবেন যে, নৈয়ায়িক এ স্থলে দোষ করিয়াছেন। [ইহা দেখাইবার পূর্ব্বে "অনুব্যবসায়" শব্দটির অর্থ বুঝা প্রয়োজন। ন্যায়মতে জ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞানকে অনুব্যবসায় বলে। "এই ঘট" (অয়ং ঘটঃ)—এই একরূপ জ্ঞান, আর "আমি ঘটকে জানিলাম"—এই আর একরূপ জ্ঞান। শেষোক্ত জ্ঞানকে অনুব্যবসায় বলে। অর্থাৎ "ঘটবিষয়ক জ্ঞান আমার হইতেছে"—এই যে জ্ঞান তাহাই অনুব্যবসায়।] নৈয়ায়িক যখন "পর্ব্বতো বহ্নিমান্"কে অনুমিতি বলিলেন, তখন সেই জ্ঞানের অনুব্যবসায় হইবে। প্রথমে অনুমিতি জ্ঞান হইল, তাহার পর "আমার অনুমিতি জ্ঞান হইল", এইরূপ একটি জ্ঞান (অনুব্যবসায়) হইবে। এখন অনুমিতিজ্ঞান যদি পরোক্ষ হয়, তাহা হইলে অনুব্যবসায়ও পরোক্ষ হইবে। অনুব্যবসায় হইবে, "আমি পর্ব্বত অনুমান করিলাম।" কিন্তু ইহা ভ্রম। আমরা কেবল বহ্নিরই অনুমান করি। পর্ব্বত প্রত্যক্ষ। ন্যায়মতে ইহাই দোষ।

কিন্তু অনুমিতিস্থলে কোন কোন সময়ে যে সম্পূর্ণ পরোক্ষ জ্ঞান হয়, বেদান্ত-বাদী তাহা মানিতে প্রস্তুত। ন্যায়ে সে সকল স্থলকে "অসন্নিকৃষ্টপক্ষকানুমিতি" বলে। [যেমন আমরা বলি "পৃথিবীর পরমাণু গন্ধযুক্ত, কেননা পৃথিবীর গন্ধ আছে।" (পৃথিবীপরমাণু গন্ধবান্ পৃথিবীত্বাৎ, ঘটাদিবৎ") এখানে পৃথিবীর পরমাণু ইন্দ্রিয়ের অগোচর। কাজেই তাহার প্রত্যক্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই স্থলে কেবল অনুমিতি। "পর্ব্বতঃ বহ্নিমান" এরূপ স্থলে কিন্তু পর্ব্বত প্রত্যক্ষ এবং বহ্নিমাত্র অনুমানসাধ্য]

যখন আমরা চন্দন দেখিয়া বলি "সুরভি চন্দন", তখন আমরা চন্দনের ঘ্রাণ লই না, দূর হইতে চন্দন দেখিয়াই বলি, ঐ সুগন্ধি চন্দন রহিয়াছে। সেখানে চন্দন জ্ঞানটিই প্রত্যক্ষ। সৌরভ জ্ঞান পরোক্ষ। কারণ সৌরভ সেখানে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে। কাজেই সৌরভের সে স্থলে "যোগ্যতা" নাই। পূর্ব্বে যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছি যে, যোগ্যতা না থাকিলে কোন বিষয় প্রত্যক্ষ হইবে না, সেই লক্ষণ "সুরভি চন্দন" এই স্থলে সৌরভে খাটে না, কাজেই সৌরভজ্ঞানটি প্রত্যক্ষ নহে, পরোক্ষ। ক্রমশঃ

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

গতি।

কেবল যে ওই নিরবধিই
আপন মনে বইছে নদী,
চায় না কিছুই—লাভ কি ক্ষতি
চলার তরে ;
চলার তরেই এড়িয়ে বাঁধন,
বহাই তাহার আকুল সাধন ;
ঝাঁপ দিতে ধায় শুধুই আপন
পাথার 'পরে।

তেম্‌নি ভুলে' ধরম-সরম,
ছেদন ক'রেই নিয়ম-করম,
বাঞ্ছা জাগে—গোঁয়াই জনম
আবেশ ভরে ;
মিল্‌ব কবে তাঁহার সনে—
সেই বাসনাই জাগ্‌ছে মনে ;
ভাস্‌ছি গো তাই ক্ষণে ক্ষণেই
এমন করে'
নয়ন-লোরে।

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

কর্ম্মদেবী।

১

কঠোর-কর্ত্তব্য-ব্রতা গীতার নন্দিনী,
তুমি কর্ম্মদেবি, জ্ঞানভক্তি-পরায়ণা,
জীবনপথের দীপ্তি, মোহ-বিনাশিনী,
সুপথে চালাও ভ্রান্তে সতর্কনয়না।
হে বিজয়লক্ষ্মি, তব শম দম নীতি
শত প্রলোভন হ'তে সদা রক্ষা করে;
আসে যবে আড়ম্বরে ভয়ঙ্করা ভীতি
তুমি স্বস্তি ঢেলে দাও—সে আহবে অসহায় নরে।

২

আছে হেন কতজন জানেনা তোমায়,
অথচ তোমার নেত্র তাহাদের 'পরে,
প্রেমসত্যপথে তা'রা নিঃসন্দেহে ধায়,
তরুণ আনন্দময় অনুভূতি ভরে।
নিষ্কলঙ্ক ফুল্ল যত হৃদয় বিমল
অজ্ঞাতে তোমার কর্ম্ম নিরত সাধনে;
মায়ার ছলনে ভুলে হইলে বিহ্বল,
হে চিন্ময়ি, তাহাদেরে—প্রবোধিত করিও যতনে।

৩

শান্তি-সুখময় দিন আসিবে জীবনে,
মানবপ্রকৃতি হ'বে সহজ সরল;—
যেদিন ঘুচিবে ভ্রান্তি প্রেমের কিরণে,
কর্ম্মের ধর্ম্মই হ'বে প্রীতি অবিরল।
স্বাধীন হৃদয়ে বটে নহে দুঃসাহসে
সুখময় পথে এবে ধায় কত জনা,—
আপন বিশ্বাস-বশে মনের হরষে;
পুনঃ পথান্তরে ঘোরে—হেরে যদি বিপ্লবসূচনা।

৪

স্বচ্ছন্দতা-প্রিয় বটে আমি মূঢ়মতি,
কিন্তু নহি ক্রীড়নক আবর্ত্তের করে;
আপনি করিয়া স্থির আপনার গতি,
চলেছি বিশ্বাসে নিজ অন্ধ শক্তি ভরে।

কালে প্রত্যাদেশ তব পাইনু হিয়ায়
তখনি উপেক্ষাকরেশ না করি' পালন,
নিজ সুকুমার পথে ধাইনু হেলায় ;
আর নয়— আজি তব—সাধনায় ঢালিব জীবন।

৫

অনুশোচনার ভারে অধীর হৃদয়ে
আসিনি পূজিতে দেবি, তোমার চরণ,
ধ্রুব জ্ঞানে, শুদ্ধ মনে, এ শুভ সময়ে,
এ দাস এসেছে নিতে তোমার শরণ।
নিবেদিত নহে বলি' স্বাচ্ছন্দ্য আমার
কাতর ক'রেছে—আর বাসনা চঞ্চলা ;
তোমাতে অর্পিব তাই সকলি এবার,
আনে যে প্রসাদ তব—প্রাণে সদা শান্তি ও শৃঙ্খলা।

৬

সংযম-দায়িনী অয়ি কঠোর-কোমলা,
এস পার্থসারথীর বিভূতি-ধারিণ।
কি তব সংযত হাসি হে কর্ম্ম-কুশলা,
এ পূত সুষমা, চিত্ত-কলুষ হারিণী।
অনুসরি তব গতি সুরভি সঞ্চরে,
কুঞ্জে কুঞ্জে হাসে পুষ্প তব দরশনে,
দাওনা বিচ্যুত হতে নক্ষত্র-নিকরে,
এ প্রাচীন সৃষ্টি—নিত্য বিকশিত তোমারি কারণে

৭

নিষ্কাম-হৃদয়া দেবি, তোমার চরণে
উৎসর্গিনু আজি মম কায় প্রাণ মন,
তব প্রদর্শিত পথে লহ অকিঞ্চনে,
দেবি, দুর্ব্বলতা মোর করগো হরণ।
আত্মত্যাগে দীক্ষা দাও কর্ম্ম জ্ঞান বাদ
ভকতি, বিশ্বাস, ধর্ম্ম, বিবেক, চেতনা,
তিতিক্ষা, বিনয়, নিষ্ঠা, তোমারি প্রসাদ,
সত্যের আলোকে দাও—ভক্তে তব করিতে সাধনা।

শ্রীরসময় লাহা।

অনুরাগ।

প্রেমের উৎকর্ষহেতু চিত্তমধ্যে দুঃখও যখন সুখরূপে অনুভূত হয়, মনের তদানীন্তন অবস্থার নাম রাগ। যে অবস্থায় প্রেম-পাত্র সদাই অনুভূত হয়, এবং প্রত্যেক অনুভবেই নূতনত্বের আস্বাদ পাওয়া যায়, তাহারই নাম অনুরাগ। মিলনের পূর্ব্বে যেমন পূর্ব্বরাগ, মিলনের পর তেমনি অনুরাগ। গতবর্ষে পূর্ব্বরাগ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলাম, বর্ত্তমান প্রবন্ধে অনুরাগ সম্বন্ধে কিছু বলিব।

প্রথমে রূপানুরাগ। তেজের গুণ রূপ, এবং রূপগ্রহণের ইন্দ্রিয় চক্ষু। পুষ্প-পেলব শিশুর সুকুমার মূর্ত্তি, স্তন্যদানরতা ষোড়শীর কনক-প্রতিমা, ধ্যানস্থ যোগীর প্রশান্ত মুখচ্ছবি, সংকীর্ত্তন-বিহ্বল ভক্তজনের পুলক-চঞ্চল প্রেম-বৈদূর্য্য-বিচ্ছুরিত প্রোজ্জ্বল কান্তি— এ সবই সুন্দর, এ সবার রূপেই চিত্ত বিমোহিত হয়। কিন্তু ইহাদের রূপ—নকল রূপ, নশ্বর; ভাব-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে দেখিতে উপিয়া যায়। দেহীর হৃদ্গত ভাব দেহ-দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া এই রূপের সৃষ্টি করে, এবং ভাবের বিলয়ে সে রূপও লয়-প্রাপ্ত হয়। সাধারণ জীবের দেহ দেহ-স্থিত দেহী হইতে পৃথক্, এবং তন্নিবন্ধন সেই দেহের রূপ স্থূলভাবে বা সূক্ষ্মভাবে বিকশিত হইলেও কালের পরিবর্ত্তনে অথবা ভাবের বিবর্ত্তনে তাহা বিকৃত হইয়া যায়। কিন্তু এই সকল নকল রূপের মূলে যে আসল রূপটি আছে, এই সকল নশ্বর রূপের অন্তরালে যে অনশ্বর রূপের আদি নির্ঝর আছে, যাহার জ্যোতিতে চন্দ্রসূর্য্যাদি উদ্ভাসিত, যাহার অনাবিল রস-স্রোত সমগ্রব্রহ্মাণ্ডে ওত-প্রোত, সে রূপ ত' সামান্য জীবের নশ্বর দেহে প্রকটিত হইতে পারে না। সেই রস-স্বরূপ চিরসুন্দর যখন জীবের কল্যাণ-কল্পে মোক্ষ-মাণিক হাতে করিয়া অবতাররূপে অবনীতে অবতীর্ণ হন্, তখনই তাঁহার অলৌকিক দেহ আশ্রয় করিয়া সেই অপ্রাকৃত রূপ আবির্ভূত হয়। তিনি যখন দেহ ধারণ করিয়া দেহীরূপে দেখা দেন্, তখন তাঁহার দেহ দেহী হইতে ভিন্নরূপে প্রতিভাত হয় না, এবং সেই জন্য তাঁহার রূপ মাংস-শোণিতের সমাশ্রয়ে ফুটিলেও তাহা চিন্ময়; পঞ্চভূতের কৃত্রিম বন্ধনেও তাহা বাঁধা পড়েনা; তাহা যোগীদিগের অনধিগম্য, অনুভবের অতীত, ভোগ দ্বারা অনায়ত্ত। তাহা দেখিয়া শেষ করা যায় না, হৃদয়ে রাখিয়া নির্ব্বিশেষে ভুক্ত হয় না। তাহা কোটিভক্তের উপভোগেও অভুক্ত, ধ্যানে কোটিভাবে

চিন্তিত হইয়াও অচিন্ত্য। ভগবানের পূর্ণাবতার শ্যামসুন্দরের এই যে অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ-ঘন রসময় অপূর্ব্ব রূপ, ইহা নশ্বর তেজ-সংজাত স্থূলনেত্র-গ্রাহ্য ভৌতিক রূপ নহে ; তা'ই ইহাকে ধরিতে পারে, এমন লোক অতি অল্প। কিন্তু কেবল মাত্র সারল্য-সম্বলা এক ব্রজবালিকা কি জানি কোন্ পুণ্যফলে হৃদয় ভরিয়া শ্যামসুন্দরের এই রূপ-জ্যোৎস্না পান করিয়াছিল, এবং এই অমৃতপানে অমর হইয়া উঠিয়াছিল। তাই তাঁহার মুখে আমরা এই কৃষ্ণ-রূপের অনুভূতি বর্ণনাকালে তাঁহার তন্ময়ত্বে আত্মহারা হইয়া যাই। বিদ্যাপতির অমৃত লেখনীতে আমরা তাহার বর্ণনা দেখিতে পাই।—

সখি! কি পুছসি অনুভব মোয়?
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনমু
শ্রুতি-পথে পরশ না গেল।
কত মধু-যামিনী রভসে গোঁয়ায়িনু,
না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখনু,
তব হিয়া জুড়ন ন গেল॥
কত বিদগধ জন রসে অনুমগন,
অনুভ কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহ— প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক॥

যাঁহার রূপ জন্ম-জন্ম ধরিয়া দেখিলেও নয়নের তৃপ্তি হয় না, যাঁহার বাণী নিরন্তর শুনিয়াও শ্রুতিসুখের শেষ হয় না, যাঁহার পবিত্র অঙ্গ লক্ষ লক্ষ যুগ হৃদয়ে ধরিয়াও হৃদয় জুড়ায় না, যুগে যুগে যোগী-গণ যাঁহার ধ্যানে মগ্ন থাকিয়াও পূর্ণানুভূতি প্রাপ্ত হন্ নাই, তাঁহার রূপের কথা ক্ষুদ্র বালিকা কি করিয়া বুঝাইবে? তা'ই তা'র হৃদয়-সেঁচা-ধন নীলমণিটির রূপ লইয়া কিশোরী সিন্ধুর অনন্ততরঙ্গ-বিহ্বলা বেলা-ভূমির ন্যায় আকুল হইয়া যে অপূর্ব্ব সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন, তাহা জ্ঞানদাসের নিম্নোদ্ধৃত কবিতায় মুখরিত হইয়াছে।—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরশ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুধারে।
লহু লহু কহে কথা পিরীতি মিশালে॥
গুরু গরবিত মাঝে রহি নানা রঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে কত করি পরকার।
নয়ানের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের সকল লোক করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে—লাজ-ঘরে ভেজাও আগুণি॥

বর্দ্ধিত-প্রবাহ নদী যেমন একটু একটু করিয়া কুল ভাঙ্গিতে থাকে, শ্যামসুন্দরের রূপ-নদী কিশোরীর হৃদয়-তট নব নব আঘাতে দ্রবীভূত করিয়া তেমনি কুল-শীল-মানের লজ্জা-ঘৃণা-ভয়ের দৃঢ়তা ধীরে ধীরে শিথিল করিতে লাগিল! কাঙ্গালিনী যেমন রত্ন কুড়াইয়া পাইলে আচলে বাঁধিয়া অতি গোপনে বক্ষের তলে দুই হাতে ধরিয়া রাখে, "এই বুঝি কেহ দেখিল, এই বুঝি কেহ চুরি করিল" ভাবিয়া চকিত নেত্রে সর্ব্বদা ইতিউতি চাহিতে থাকে, শ্রীমতীরও সেই দশা ঘটিল। কুল-মানের সহিত কৃষ্ণানুরাগের বিচিত্র দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল।

কি বলিব আরে বন্ধু! কি বলিব আর।
নয়ানের লাজে নাহি ছাড়ে লোকাচার॥
গোকুলে গোয়ালাকুলে কেবা কিনা বলে।
তবু মোর ঝুরে প্রাণ তোমা না দেখিলে॥
'ডরে ডরাইয়া আর বঞ্চিব কত কাল।
তুয়া প্রেম রতন গাঁথিব কণ্ঠমাল॥
নিশিদিশি অবিরত পোড়ে মোর হিয়া।
বিরলে বসিয়া কান্দি তোমা নাম লয়্যা॥
তোমা দেখিবারে বন্ধু আসি নানা ছলে।
লোক ভয় লাগিয়া সে ডরে প্রাণ হালে॥

না দেখিলে মরি যারে তারে কিবা ভয়।
যদুনাথ দাস বলে—দঢ়াইলে হয়॥

কিশোরীর হৃদয়ে কখনো লোক-লজ্জা প্রবল হইয়া উঠে, তখন বিরলে সকলের গোপনে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে থাকেন; আবার যখন শ্যামচন্দ্রের অকৈতব প্রেম তাঁহাকে আত্মহারা করিয়া ফেলে, তখন নিজের অজ্ঞাতে বংশীধ্বনি-মুগ্ধা কুরঙ্গীবৎ শ্যামরূপের জালে আপনা আপনি বিজড়িত হইয়া পড়েন।

এ তোমার ভুবন-মোহন রূপখানি।
ভাবিতে ভাবিতে মোর দগধে পরাণী॥
গুরু-ভয় লোক-লজ্জা নাহি পড়ে মনে।
কাঠের পুতলী যেন থাকি রাতি দিনে॥
কত পরকারে চিত করি নিবারণ।
তবু সে তোমার প্রেম নহে বিসরণ॥
তোমার পিরীতি বন্ধু! পরাণ সনে জড়া।
কহে বলরামদাস—কেমনে যাবে ছাড়া॥

মনের যখন এই জটিল অবস্থা তখন সেই জটিলতাকে জটিলতর করিয়া তুলিবার লোকের অভাব হয় না। শ্বাশুড়ী-ননদী, পাড়াপ্রতিবেশী, সকলে যেন মিলিত হইয়া জ্বালার উপরে জ্বালা দিতে থাকে। সে জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া জীবন দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠে।—

কান্দিতে না পাই বন্ধু! কান্দিতে না পাই।
নিশ্চয় মরিব তোমার চান্দমুখ চাই॥
শাশুড়ী ননদীর কথা সহিতে না পারি।
সবার নিঠুরপনা সোঙরিয়া মরি॥
চোরের রমণী যেন ফুকারিতে নারে।
এমতি রহয়ে পাড়া পড়সীর ডরে॥ (জ্ঞানদাস)

অন্যত্র—

তোমারে বুঝাই বন্ধু! তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া শুধায় মোরে হেন জন নাই॥
অনুক্ষণ গৃহে মোর গঞ্জয়ে সকলে।
নিশ্চয় জানিয়ো মুই ভখিমু গরলে॥
খাইতে সোয়াথি নাই, নাহি টুটে ভুখ্।
কে মোর বেথিত আছে? কারে কব দুখ॥

এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ।
মোর আগে দাঁড়াও, তোমার দেখি চান্দমুখ॥
চণ্ডীদাস বলে—রাই! ইহা না জুয়ায়।
পরের বোলে কেবা প্রাণ ছাড়িবারে চায়॥

স্বজনগণের কঠিন ব্যবহারে কিশোরীর কোমল হৃদয় বাণ-বিদ্ধ বিহঙ্গবৎ নিদারুণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। তবু একজনের মধুময়ী স্মৃতি লইয়া ব্রজবালা প্রাণ বাঁধিতেছিল। কিন্তু একি বিধি-বিড়ম্বনা! কুলশীলে জলাঞ্জলি দিয়া যাঁহার চরণে বালিকা আত্ম-সমর্পণ করিল, কি জানি কি কপালদোষে সেই প্রাণ-বল্লভও বিরূপ হইলেন।

বন্ধু! সকলি আমার দোষ।
না জানিয়া যদি কৈরাছি পিরীতি,
কাহারে করিব দোষ?॥
সুধার সমুদ্র সমুখে দেখিয়া
আইলুঁ আপন সুখে।
কে জানে খাইলে গরল হইবে,
পাইব এতেক দুখে!॥
মো যদি জানিতাঙ অলপ ইঙ্গিতে,
তবে কি এমন করি।
জাতি কুলশীল মজিল সকলি,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি!॥
অনেক আশার ভরসা মরুক্,
দেখিতে করিএ সাধ।
প্রথম পিরীতি, তাহার নাহিক
ভাগের আধের আধ!॥
যাহার লাগিয়া যে জন মরযে,
সেহ যদি করে আনে।
চণ্ডীদাস কহে এমন পিরীতি
করএ সুজন জনে॥

এ কি দারুণ দশা! যাঁহার জন্য সকলি ভুলিল, তাঁহার মন ত' একটুও টলিল না! এমন কপট নিঠুর শ্যাম, তাঁহাকে তবে বালিকা ভুলে না কেন? তাঁহার পাগলকরা স্মৃতি চিত্ত হইতে একেবারে মুছিয়া যায় না কেন?—

যত নিবারিএ তায়, নিবার না যায় রে!
আন পথে যাইতে পদ কানু-পথে ধায় রে ॥
এ ছার রসনা মোরে হইল কি বাম রে
যার নাম নাহি লই, লয় তার নাম রে ॥
এ ছার নাসিকা মুঞি যত করু বন্ধ।
তবুত দারুণ নাসা পায় শ্যাম-গন্ধ ॥
সেনা কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কাণ ॥
ধিক্ রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কাণু হয় অনুভব
কহে চণ্ডীদাসে রাই! ভাল ভাবে আছ।
মনের মরম কথা কাবে জানি পুছ ॥

আগুণ যেমন বস্ত্রে ঢাকিলে বস্ত্র পুড়িয়া গিয়া আগুণের জ্যোতি ফুটিয়া উঠে, শ্যামসুন্দরের প্রেম দেহের আবরণে, উপেক্ষার আস্তরণে, অভিমানের চাপে তেমনি চাপিয়া রাখিতে গেলে, দেহের প্রতি ভঙ্গীতে, ভাষার প্রতি শব্দে সেই গুপ্ত প্রেম জ্বলিয়া উঠে। তাহাকে আর চাপিয়া রাখা যায় না। কিশোরীরও ঠিক সেই অবস্থা। কুলের ভয়ে যাঁহাকে ছাড়িতে হইত, তাঁহারই অনাদরে তাঁহাকে আর শ্রীমতী ছাড়িতে চাহিলেন না।—

সখি হে! ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীয়ন্তে মরিয়া যে আপন খাইয়াছে, তারে তুমি কি আর বুঝাও ॥
নয়ান-পুতলী করি', লয়্যাছি মোহনরূপ, হিয়ার মাঝারে করি' প্রাণ।
পিরীতি-আগুণ জ্বালি' সকলি পোড়াঞাছি,—জাতি কুল শীল অভিমান ॥
না জানিয়া মূঢ় লোকে, কি জানি কি বলে মোকে, না করি এ শ্রবণ-গোচরে।
স্রোত বিথার জলে, এ তনু ভাসাঞাছি, কি করিবে কুলের কুকুরে ॥
খাইতে শুইতে চিতে, আন নাহি হেরি পথে, বঁধু বিনে আন নাহি ভায়।
মুরারীগুপত কহে—পিরীতি এমন হৈলে, তার যশ তিনলোকে গায় ॥

তাই আজ ব্রজ-বধূ সর্ব্ব বাধা দূরে রাখিয়া প্রাণনাথের চরণে নিবে করিতেছেন,—

বঁধু! তোমায় কি বলিব আন।
যে বলে সে বলু লোকে, তুমি সে পরাণ ॥—বলরাম

"রাতি কৈলুঁ দিবস, দিবস কৈলুঁ রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু! তোমার পিরীতি॥
ঘর কৈলুঁ বাহির, বাহির কৈলুঁ ঘর।
পর কৈলুঁ আপন, আপন কৈলুঁ পর॥
বন্ধু! যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে, দাঁড়াইয়া রও॥"
বাশুলি আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়।
পরের লাগিয়া কি আপন পর হয়॥

সত্যই যখন একুলে ওকুলে ছুকুলে গোকুলে আপনার বলিতে আর কেহ থাকে না, সত্যই যখন যা বলে বলুক লোকে, শ্যাম ভিন্ন আর দ্বিতীয় প্রাণ থাকেনা, সত্যই যখন ঘরে থাকিয়া মন বাহিরে পড়িয়া থাকে, আপন পর হইয়া পর আপন হইয়া যায়, তখন প্রেম-সিন্ধু শ্রীভগবান্ তাঁহার পরীক্ষা-নিপুণ ক্ষণিক বিমুখতা দূরে রাখিয়া প্রেমময়ীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাহার আত্মার শ্রবণে মৃদু বচনে বলেন :—

"কোটি রমণী তুয়া পায়ে নিরমঞ্ছিএ,
তুঁহু মঝু জীবন রাই।
তোহারি নামগুণ অবিরত জপি হাম,
সদয় হৃদয় তুয়া চাই॥"
এত কহি মাধব ছল ছল লোচন
হৃদয় উপরি ধনি রাখি।
চরণ পরশি কহে— 'হাম তুয়া অনুগত',
প্রেমদাস তাহে সাখী॥

বারান্তরে শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনে এই কৃষ্ণানুরাগ কি সুধার স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল, ভক্তের আধ্যাত্মিক জীবনে কৃষ্ণের অপার্থিব প্রেম কি আনন্দ আনয়ন করে, তাহার চিত্র পাঠকের মনশ্চক্ষুর গোচরে একবার ধরিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

যোগশিখা-উপনিষদ্।

যোগশিখা-উপনিষদ্ অথর্ব্ববেদীয় উপনিষৎ সমূহের অন্যতম। ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব—এই চারি বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখার সংসৃষ্ট ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদ্ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে অথর্ব্ববেদীয় উপনিষদের সংখ্যাই সমধিক। অথর্ব্ববেদীয় উপনিষদ্ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত;—১। বেদান্ত-উপনিষদ্, ২। যোগ-উপনিষদ্, ৩। সন্ন্যাস-উপনিষদ্ এবং ৪। সাম্প্রদায়িক (শৈব বা বৈষ্ণব)-উপনিষদ্। যোগ-উপনিষদের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা, ক্ষুরিকা, চূলিকা, নাদবিন্দু, ব্রহ্মবিন্দু, অমৃতবিন্দু, ধ্যানবিন্দু, তেজোবিন্দু, হংস, যোগতত্ত্ব ও যোগশিখা পরিগণিত হয়। যোগ-উপনিষদ্ প্রায়ই পদ্যে রচিত। সন্ন্যাস উপনিষদে যেমন চতুর্থাশ্রমীর আচার ব্যবহার বর্ণিত হইয়াছে, যোগ-উপনিষদে সেইরূপ যোগীর সাধনপ্রণালী ও যোগতত্ত্ব সাধারণভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে।

গতবর্ষে আমরা "ব্রহ্মবিদ্যার" পাঠকগণকে ব্রহ্মবিন্দু নামক যোগ-উপনিষদ্ বিবৃতি সহ উপহার দিয়াছিলাম। বর্ত্তমান বর্ষে আরও কয়েকখানি যোগ-উপনিষদ্ বিবৃত করিব।

যোগশিখা-উপনিষদের ভাষা ও রচনার ভঙ্গীতে বোধ হয় যে, ইহা অপ্রাচীন উপনিষদ্। কিন্তু তথাপি ইহাতে যোগতত্ত্ব সম্বন্ধে, বিশেষতঃ হৃদয়ে পরমাত্মার ধ্যান সম্বন্ধে, কয়েকটী গুহ্য উপদেশ নিবদ্ধ আছে। যোগসিদ্ধ ভিন্ন অপরের পক্ষে সে উপদেশের সম্যক্ মর্ম্ম উদ্ঘাটন করা অসম্ভব। এই সকল বিষয়ে যে রহস্য-বিদ্যা ভারতবর্ষে গুরু-পরম্পরায় বহুদিন হইতে উপদিষ্ট হইত, তাহাই বোধ হয় পরবর্ত্তীকালে শ্লোকাকারে নিবদ্ধ হইয়া যোগশিখা প্রভৃতি যোগ-উপনিষদের আকার ধারণ করিয়াছে। অতঃপর আমরা এই উপনিষদের মূল, অন্বয়, অনুবাদ ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

ওঁ যোগশিখাং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বজ্ঞানেষু চোত্তমাম্।
যদা তু ধ্যায়তে মন্ত্রং গাত্রকম্পোঽভিজায়তে ॥ ১

অন্বয়—সর্ব্বজ্ঞানেষু মধ্যে উত্তমাং (শ্রেষ্ঠাং) যোগশিখাং (উপনিষদং) প্রবক্ষ্যামি। যদা তু মন্ত্রং (প্রণবং) ধ্যায়তে, (তদা) গাত্রকম্পঃ অভিজায়তে।

অনুবাদ—যোগশিখা (উপনিষদ্) কথিত হইবে; ইহা সর্ব্বজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ। যখন যোগী মন্ত্র (প্রণব) ধ্যান করেন, তখন তাঁহার গাত্রকম্প উপজাত হয়।

ব্যাখ্যা—যোগতত্ত্ব সম্বন্ধে গুহ্য উপদেশ নিবদ্ধ আছে বলিয়া গ্রন্থকর্ত্তা ঋষি ইহাকে সর্ব্বজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন।

যোগসাধনায় প্রণব-মন্ত্র ওঁকারের প্রয়োজনীতার বিষয় আমরা ব্রহ্মবিন্দু উপনিষদের ব্যাখ্যায় আলোচনা করিয়াছি। অতএব এস্থলে তাহার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যদি পরমপদে উপস্থিত হইতে হয়, তবে পথিককে ওঁকার-রথে আরোহণ করিয়া মোক্ষপথে অগ্রসর হইতে হইবে।

ওঁকারং রথমারুহ্য বিষ্ণুং কৃত্বাতু সারথিম্‌।—অমৃতনাদ উপনিষদ্‌।

ঐ উপনিষদ্‌ অন্যত্র বলিতেছেন :—

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ওমিত্যেকেন রেচয়েৎ।
দিব্যমন্ত্রেণ বহুশঃ কুর্য্যাদাত্মমলচ্যুতিম্‌॥

ওম্‌ এই একাক্ষর দিব্য ব্রহ্মমন্ত্র চিত্ত-মল-শুদ্ধির জন্য পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিবে।'

গীতাও বলিয়াছেন :—ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্‌ মাম্‌ অনুস্মরন্‌।

'ওম্‌ এই একাক্ষর ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারণ করিবে এবং ভগবান্‌কে ধ্যান করিবে।'

ছান্দ্যোগ্য-উপনিষদের আরম্ভ এইরূপ :—ওমিত্যেতদক্ষরং উদ্‌গীথম্‌ উপাসীত।

যোগশিখা-উপনিষদ্‌ও সেইজন্য যোগীকে ওঁকাররূপ ব্রহ্মমন্ত্রের ধ্যান বা জপ উপদেশ দিলেন। এই ওঁকার-ধ্যান অল্পমাত্র অগ্রসর হইলেই গাত্রকম্প উপজাত হয়। যাঁহারা ওঁকারের ধ্যান করেন, এ অবস্থা তাঁহাদের অপরিচিত নহে। মেরুদণ্ডের মধ্যে তিনটী সূক্ষ্ম প্রণালী আছে। ইহাদিগকে ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না বলে। ঐই প্রণালীর মধ্যে সর্ব্বদাই প্রাণের গতাগতি হইতেছে। ওঁকার ধ্যানের ফলে মেরুদণ্ডের মূলে যে মূলাধার চক্র (sacral plexus) অবস্থিত আছে, ঐ চক্রে কুণ্ডলিনী-শক্তি ঈষৎ জাগ্রৎ হইলে মেরুদণ্ডের মধ্যে প্রাণের গতাগতিতে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। গাত্রকম্প তাহারই ফল।

আসনং পদ্মকং বদ্ধা যচ্চান্যদ্বাঽপি রোচতে।
কুর্য্যাৎ নাসাগ্রদৃষ্টিং চ হস্তৌ পাদৌ চ সংযতৌ॥২

অন্বয়—পদ্মকং আসনং (পদ্মাসনং) বদ্ধা, যৎ চ অন্যৎ বাপি (আসনং) রোচতে (রুচিকরং ভবতি), নাসাগ্রদৃষ্টিং কুর্য্যাৎ, হস্তৌ পাদৌ চ সংযতৌ (কুর্য্যাৎ)।

অনুবাদ—পদ্মাসন অথবা যে কোন আসন রুচিকর, সেই আসনে উপবিষ্ট হইয়া নাসাগ্র দৃষ্টি করিবে এবং হস্ত ও পদ সংযত করিবে।

ব্যাখ্যা—অষ্টাঙ্গযোগের মধ্যে আসন অন্যতম ; পদ্মাসন, কূর্ম্মাসন, স্বস্তিকাসন প্রভৃতি নানারূপ আসন যোগীদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। যোগশিখা

উপনিষদ্ বলিলেন—পদ্মাসন অথবা যে কোন আসন রুচিকর, যোগী সেই আসনে উপবিষ্ট হইবেন।

ব্রহ্মসূত্রে বাদরায়ণও এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন ;—'যত্র একাগ্রতা তত্রা-বিশেষাৎ' অর্থাৎ যে অবস্থায় চিত্তের একাগ্রতা হয়, তাহাই গ্রহণীয় ; এ সম্বন্ধে কোন বিশেষ নিয়ম নাই। স্থিরসুখমাসনম্'—পতঞ্জলি আসনের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন। নিশ্চল ও সুখাবহ উপবেশনই আসন। যেরূপ ভাবে উপবিষ্ট হইলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, যোগী সেইরূপ আসনই করিতে পারেন। এসম্বন্ধে গীতার উপদেশ এইরূপ,—

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।

* * *

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।

'যোগী পবিত্র দেশে আপনার স্থির আসন স্থাপন করিবেন এবং কর, শির ও গ্রীবা সমান ও স্থিরভাবে রাখিবেন।'

আসনের সম্বন্ধে ইহাই সারকথা। সর্ব্বপ্রকার আসনেই মেরুদণ্ডকে সরল রাখিতে হয়। উপনিষদ্ অন্যত্র বলিয়াছেন,—ত্রিরুন্নতং সমং স্থাপ্য শরীরং। অর্থাৎ বক্ষ, গ্রীবা ও শির সমান রাখিতে হইবে। যোগী এইরূপে আসন স্থির করিয়া হস্ত পদ সংযত করিবেন (বস্তুতঃ হস্ত পদ সংযত না হইলে স্থির আসন হইতেই পারে না) এবং নাসাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবেন। নাসাগ্র অর্থে নাসিকার ঊর্দ্ধভাগ—ভ্রূমধ্য। গীতাও বলিয়াছেন,—

সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্।

"নিজের নাসিকাগ্রে দৃষ্টি করিবেন এবং অন্যদিকে দৃষ্টি করিবেন না।"

মনঃ সর্ব্বত্র সংযম্য ওঁকারং তত্র চিন্তয়েৎ।

ধ্যায়েত সততং প্রাজ্ঞো হৃৎকৃত্বা পরমেষ্ঠিনম্ ॥৩

অন্বয়—সর্ব্বত্র মনঃ সংযম্য তত্র ওঁকারং চিন্তয়েৎ। প্রাজ্ঞঃ পরমেষ্ঠিনম্ (ঈশ্বরম্) হৃৎ (হৃদি) কৃত্বা সততং ধ্যায়েত (ধ্যাননিরতো ভবেৎ)।

অনুবাদ—সর্ব্বত্র মনকে সংযত করিয়া সেখানে ওঁকারের চিন্তা করিবেন এবং পরমাত্মাকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া যোগী সতত ধ্যান করিবেন।

*ব্যাখ্যা—আসন প্রাণায়ামের পর প্রত্যাহার। স্ব স্ব বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়-*গণকে নিরুদ্ধ করিয়া চিত্তের বশীকরণকে প্রত্যাহার বলা যায়। চঞ্চল মন ইন্দ্রিয়ের পথে বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। এই মনকে একাগ্র করিতে হইবে

এবং বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত করিয়া আত্মাতে স্থাপিত করিতে হইবে। উপনিষদ্‌ প্রথম শ্লোকার্দ্ধে এই উপদেশই দিলেন :—মনঃ সর্ব্বত্র সংযম্য। এ সম্বন্ধে গীতার উপদেশ এইরূপ :—

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥
যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥

'যোগী ধারণার দ্বারা বুদ্ধিকে বশীভূত করিয়া ধীরে ধীরে উপরত হইবেন। আত্মাতে মন স্থাপিত করিয়া কিছুই চিন্তা করিবেন না।'

'চঞ্চল অস্থির মন, যথায় যথায় ধাবিত হইবে, সেখান হইতে তাহাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আত্মাতে নিবিষ্ট করিবেন।'

মন চঞ্চল, অস্থির ও প্রমাথী। অতএব মনঃসংযম বা চিত্তস্থৈর্য্যের উপায় কি? এই শ্লোকে উপনিষদ্‌ সেই উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন—ওঁকারের চিন্তা ও পরমাত্মার ধ্যান। ওঁকার চিন্তার বিষয় প্রথম শ্লোকের বিবরণে আমরা আলোচনা করিয়াছি। পতঞ্জলি তাঁহার যোগসূত্রেও বলিয়াছেন যে, ওঁকার ঈশ্বরের বাচক "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ" এবং যোগীকে ওঁকার জপ করিবার উপদেশ করিয়াছেন "তজ্জপঃ তদর্থভাবনম্"। সমাধির পরিপক্ক অবস্থা ভিন্ন মন নির্ব্বিষয় থাকিতে পারে না। সেইজন্য যোগশিখা উপদেশ দিলেন "ওঁকারং তত্র চিন্তয়েৎ" অর্থাৎ মনকে পার্থিব বিষয়ে যুক্ত রাখিয়া মলিন না করিয়া ওঁকার ভাবনার দ্বারা বিশুদ্ধ করিবে; তাহার পর হৃদয়ে পরমাত্মার ধ্যান করিবে। মূলে 'ঈশ্বর' শব্দের পরিবর্ত্তে 'পরমেষ্ঠী' শব্দ আছে। দীপিকাকার নারায়ণ ইহার অর্থ করিয়াছেন 'ব্রহ্মা'। 'পরমেষ্ঠী' শব্দের অধুনা প্রচলিত অর্থ ইহাই বটে। কিন্তু 'পরমেষ্ঠী'র মৌলিক অর্থ ইহা নহে—পরমে তিষ্ঠতি ইতি পরমেষ্ঠী। যিনি পরব্যোমে (পরমে ব্যোমন্), অপ্রাকৃতধামে প্রপঞ্চের অতীতে অবস্থান করেন, তিনিই পরমেষ্ঠী—পরমাত্মা বা ঈশ্বর।

যোগদর্শনে সমাধি সিদ্ধির জন্য নানা উপায় উপদিষ্ট আছে :—অভ্যাস বৈরাগ্য, প্রাণের নিঃসারণ ও বিধারণ, বিশোক জ্যোতির ধ্যান, বীতরাগ পুরুষের ভাবনা, যথাভিমত-চিন্তা, ঈশ্বর-প্রণিধান ইত্যাদি। *

* অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ।—১।১২ সূত্র। ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা।—১।২৩ সূত্র। প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য।—১।৩৪ সূত্র। বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী। ১।৩৬ সূত্র। বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্। ১।৩৭ সূত্র। যথাভিমতধ্যানাৎ বা।—১।৩৯ সূত্র।

অতএব সে মতে ঈশ্বর-প্রণিধান চিত্তস্থৈর্য্যের নানা উপায়ের মধ্যে অন্যতম উপায়, মুখ্য উপায় নহে।

গীতা প্রভৃতি মোক্ষশাস্ত্রের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ঋষিদিগের অনুমোদিত যোগ ভগবানে চিত্তসংযোগ। গীতা বলিয়াছেন, যোগী মনঃসংযম করিয়া চিত্ত যেন ঈশ্বরে নিহিত করেন। মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ।—৬।১৪

গীতা আরও বলিয়াছেন যে, "যোগের ফলে যে শান্তিলাভ করা যায়, তাহা ভগবানে স্থিতির ফল।" শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি। ৬।১৫

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্ম পরমাত্মনোঃ।

'জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে সংযোগ, তাহারই নাম যোগ'।

আত্মপ্রযত্ন সাপেক্ষা বিশিষ্টা যা মনোগতিঃ।
তস্যা ব্রহ্মণি সংযোগো যোগ ইত্যভিধীয়তে॥—বিষ্ণুপুরাণ। ৬।৭ ৩১

অর্থাৎ 'আত্মার চেষ্টা-সাপেক্ষ যে অসাধারণ মনোবৃত্তি, তাহার ভগবানে সংযোগকেই যোগ বলে।' যোগশিখা উপনিষদ্ও এই উপদেশই দিলেন—'ধ্যায়েত সততং প্রাজ্ঞো হৃৎকৃত্বা পরমেষ্ঠিনম্—' যোগী পরমাত্মাকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া সতত ধ্যান করিবেন। বাস্তবিক যোগ-সিদ্ধির ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যোগসাধনা এক প্রকার বিড়ম্বনা। উপনিষদ্ তাহার অনুমোদন করিলেন না। গীতাও বলিয়াছেন যে, তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী, যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ঈশ্বরে চিত্ত সংযুক্ত করিয়া তাঁহাকে ঐকান্তিক ভাবে ভজনা করেন।

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥—৬।৪৭

ক্রমশঃ

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রত্যুপকার।

অবিশ্রান্ত বারি ঢালি অনন্ত সাগরে,
শ্রান্ত তরঙ্গিণী যবে নিঃস্ব হ'য়ে পড়ে,
জোয়ারে উছলি সিন্ধু তা'রে দেয় জল;
মহতের উপকার না হয় বিফল।

শ্রীযতীশচন্দ্র বসু।

সরল যোগ-সাধন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রশ্ন হইতে পারে, আত্মা অসঙ্গ হইয়া কিরূপে দেহ ও ঘটপটাদিতে সম্বন্ধ ও মমতা সম্পর্ক পাতাইয়া লইয়াছে। আত্মা নিজে দেহ নহে, কিম্বা দেহও আত্মা নহে; কি কারণে তবে ওরূপ অনিত্য দেহে আত্মা বা পুরুষ দেহাভিমান ও মমতা করিয়া সংসারে সকলরূপ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে? পূর্ব্বে অস্মিতা নামক যে দ্বিতীয় ক্লেশ উল্লেখ করা হইয়াছে, এই অস্মিতাই ইহার কারণ।

দৃক্ দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতৈবাস্মিতা ॥

দৃক্-শক্তি যে দর্শন-শক্তির সহিত একীভূতের ন্যায় প্রকাশ পায়, সেই উভয়ের একীভূতের ন্যায় প্রকাশের নাম অস্মিতা। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দৃক্‌শক্তি চেতনাত্মা, দর্শনশক্তি প্রকৃতির শুদ্ধাংশে প্রতিবিম্বিত হইলে শুদ্ধ অহংকারের উদয় হয়, অর্থাৎ 'আমি' এইরূপ একটী পৃথক অস্তিত্বের জ্ঞান হয়; সেই আমি-জ্ঞানই অস্মিতা। ইহাকেই বেদান্তশাস্ত্রে চিদাভাস কহে। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে গীতায় উপদেশ দিয়াছেন,—

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।

পুরুষ অসঙ্গ অবিকারী হইয়াও প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতির যাহা গুণ বা ধর্ম্ম, তাহা ভোগ করিয়া থাকে।

বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধিপ্রকৃতিসম্ভবান্ ॥

সত্ত্ব, রজ, তম এই ত্রিগুণ ও মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার, যাবতীয় অন্তঃকরণের বিকার—প্রকৃতি হইতে সম্ভূত হইয়াছে। একের গুণ বা ধর্ম্ম অপর বস্তুতে আরোপ করিলে তাহাকে অধ্যাস কহে, যেমন তাপ আর লৌহ; ইহাদের সম্বন্ধ হইলে তাপের গুণ লৌহে আরোপিত হয়, আবার লৌহের গুণও তাপে আরোপিত হয়। যখন আমরা বলি, তপ্ত লৌহে হস্ত দগ্ধ হইল, তখন তাপের ধর্ম্ম লৌহে আরোপিত হইল; কারণ অগ্নিরই দাহিকাশক্তি আছে, লৌহের তাহা নাই। পুনরায় এরূপও বলা যায় যে, "এ অগ্নিপিণ্ডটা বড় ভারি"—তখন লৌহের গুণ অগ্নিতে আরোপিত হইয়া থাকে; কারণ অগ্নি কখনও ভারি হইতে পারে না। সেইরূপ প্রকৃতি এবং পুরুষ পরস্পর সম্বন্ধাধীন। বিকারভাবাপন্ন প্রকৃতির গুণ অবিকারী পুরুষে আরোপিত হইয়া থাকে। ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, লজ্জা, ভয়, তৃষ্ণা, সংকল্প, বিকল্পাদি যাহা কিছু প্রকৃতির গুণ আছে,

তৎসমুদয় পুরুষে আরোপিত হইয়া পুরুষই যেন ঐ সকল গুণযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়েন।

ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী।
ত্রিধাশক্তিঃ স্থিতা লোকে তৎপরং জ্যোতিরোমিতি॥

'ইহলোকে ইচ্ছা ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। উক্ত ত্রিধাশক্তি গৌরী, ব্রাহ্মী ও বৈষ্ণবী রূপ ধারণ করিয়াছে। প্রণবের শুদ্ধজ্যোতিঃ উক্ত ত্রিধাশক্তি হইতে পর অর্থাৎ ভিন্ন ও শ্রেষ্ঠ।' বাস্তব পুরুষ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র, অগ্নিপিণ্ডটা বাস্তবিক কখনও ভারি হইতে পারে না। অগ্নির যেমন দাহিকা ও প্রকাশ শক্তি লৌহপিণ্ডে আরোপিত হয়, আত্মারও সেইরূপ প্রকাশ-শক্তি প্রকৃতিতে আরোপিত হইয়া জড়-স্বভাবা প্রকৃতি প্রকাশময়ী চেতনময়ী বলিয়া প্রতীয়মান হয়েন। এইরূপ পরস্পরের গুণ পরস্পরে আরোপিত হইয়া উভয়ের যেন একতা তাদাত্মভাব হইয়াছে। দ্রষ্টা পুরুষ ও দৃশ্য প্রকৃতি—ইহাদের তাদাত্মভাবই অস্মিতা নামে শাস্ত্রে অভিহিত হইয়া থাকে।

যেমন আমাদের এই দেহের মধ্যে শুদ্ধ চৈতন্য ও মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি জড় পদার্থ আছে, কিন্তু এই চৈতন্য ও জড়ের মধ্যে এমন অভিন্নভাব হইয়াছে যে, ইহাদের পার্থক্য আমরা কিছুই অনুভব করিতে পারি না। আমি ও আমার ইচ্ছায় কোন প্রভেদ অনুভব হয় কি? আমি কি আমার ক্রিয়া হইতে ভিন্ন উপলব্ধি করিতে পারি? না, আমি ও আমার জ্ঞানে প্রভেদ বিবেচনা হয়? এই যে আত্ম ও অনাত্মের বিবেক উৎপন্ন হয় না, অস্মিতাই তাহার কারণ। পুরুষ-প্রকৃতির বিবেকজ্ঞান হইলে অস্মিতা নামক ক্লেশ দূর হইয়া থাকে।

শুদ্ধাত্মা নীলবস্ত্রাদিযোগেন স্ফটিকো যথা॥

যেরূপ নীল, পীত, রক্ত বস্ত্রাদির সন্নিকর্ষে শুদ্ধ স্ফটিক নীল পীতাদি রূপে প্রতীয়মান হয়, স্ফটিকে নীল পীতাদিবর্ণ যেমন ভ্রম ও মিথ্যা আরোপ মাত্র, সেইরূপ অবিকারী শুদ্ধ চেতনাত্মা, জীবের অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হইয়া অন্তঃকরণের গুণ প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ 'আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি মনুষ্য, আমি দেবতা' এইরূপ প্রতীয়মান হন, এবং এই মিথ্যা জ্ঞান দ্বারা রাগ দ্বেষাদি ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে।

সুখানুশয়ী রাগঃ॥

সুখের অনুবৃত্তির নাম রাগ, অর্থাৎ যে বিষয়ে একবার সুখানুভব হইয়াছে,

পুনরায় তাহা পাইবার জন্য, ভোগ করিবার জন্য, এমন কি মনে মনে চিন্তা করিবার জন্য চিত্তে যে ইচ্ছা বা বাসনার উদয় হয়, তাহাকে রাগ কহে। রাগ অর্থে প্রচলিত ভাষায় ক্রোধ বুঝায়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; রাগ অর্থে আসক্তি বা অনুরাগ বুঝায়। বিকারগ্রস্ত রোগী যেমন জলপানে অনুরক্ত হয়, সুখের আশায় জলপান করে এবং জলপান সময়ে কিছু সুখ অনুভব করে, পরে কিন্তু জলপান বশতঃ তাহার রোগের বৃদ্ধি হয়; সেইরূপ জীবগণ বিষয়-সুখে অনুরক্ত হইয়া ভবরোগ প্রাপ্ত হইয়া নানারূপ দুঃখ ভোগ করে।

দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ।

অর্থাৎ সুখপ্রদ বস্তু পাইবার যেরূপ ইচ্ছা হইয়া থাকে, সেইরূপ দুঃখপ্রদ বস্তু পুনরায় পাইবার ইচ্ছা হয় না। সেই দুঃখপ্রদ বস্তু বা বিষয়ে যে অনিচ্ছা হয়, তাহাই দ্বেষ নামে অভিহিত হয়।

সংসারঃ স্বপ্নতুল্যোহি রাগদ্বেষাদি সঙ্কুলঃ।
স্বকালে সত্যবদ্ভাতি প্রবোধেহসত্যবদ্ভবেৎ॥

'স্বপ্নবৎ সংসার রাগ দ্বেষাদির দ্বারা পরিপূর্ণ, স্বপ্নাবস্থায় যাহা সত্য বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহা পুনরায় জাগ্রতাবস্থায় অসত্য বলিয়া প্রতীতি হয়।' উন্মাদগ্রস্ত রোগী উন্মাদাবস্থায় যাহাতে সুখ জ্ঞান করিয়া আসক্ত হয়, মলমূত্র অস্পৃশ্য দ্রব্য, কটু তিক্ত আদি তাহার তখন ভাল বলিয়া মনে হয়, কিন্তু উন্মাদ দশা হইতে মুক্ত হইলে সেই ব্যক্তির আর সে সমস্ত চেষ্টায় সুখজ্ঞানে আসক্তি হয় না। যে সকল কার্য্য একসময় সুখপ্রদ ছিল, তাহাতেই আবার দুঃখজ্ঞান হইয়া দ্বেষভাবের উদয় হয়। এইরূপে জীব নিজ প্রীতিকর বিষয়ে সুখজ্ঞান ও অপ্রীতিকর বিষয়ে দুঃখজ্ঞান করিয়া দ্বেষান্বিত হইয়া নানারূপ ক্লেশ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে।

জীব! তুমি সংসারে সুখ-দুঃখময় নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাক, কালস্বরূপ মৃত্যু যে প্রতিক্ষণ তোমার অনুগমন করিতেছে, তাহা কিছুই জ্ঞাত হইতে পার না, এবং নিজ হিতও জানিতে চেষ্টা কর না! জীব! তুমি কখন অলীক ইন্দ্রিয়-সুখ-সাগর-স্রোতে মনের সাধে ভাসিয়া যাইতেছ, আবার কখনও দুঃখরূপ আবর্ত্তে পড়িয়া বিষম ক্লেশ ভোগ করিতেছ, আবার কখন বা জলস্থিত কঠিন পাষাণাদিতে ঘাত-প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া ক্ষত-বিক্ষত হইতেছ!

জীব! তুমি এরূপে সুখদুঃখের স্রোতে ভাসমান হইয়া মৃত্যুর করালগ্রাসের

দিকে অগ্রসর হইতেছ, ইহা তুমি দেখিয়াও দেখিতেছ না। আহা, মানুষের কি ভ্রম! লোকে বলে 'আমার পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইতেছে',—কিন্তু বস্তুত সে বালক কি বয়ঃপ্রাপ্ত হইতেছে? না, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার আয়ুঃক্ষয় হইতেছে!

প্রতিক্ষণময়ং কায়ো জীর্য্যমাণো নিরীক্ষ্যতে।
আমকুম্ভ ইবাম্ভঃস্থো বিশীর্ণ ইব ভাব্যতে॥

১৭৭১৪৪

'জলস্থিত মৃণ্ময় কুম্ভ যেমন অচিরাৎ বিশীর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ শরীর বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্ষণ জীর্ণদশা প্রাপ্ত ও মৃত্যুর নিকটবর্ত্তী হইতেছে।'

ক্রমশঃ

স্বামী পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

কঠোর সাধনা।

প্রভো!

এসেছি দুয়ারে, ফিরা'য়ে দাও,—
আজ হাসিমুখে ফিরিব;
এ নয়ন-বারি পড়িলে ঝরি'
গোপনে বসনে মুছিব।

উড়া'য়ে করম-ফলের নিশান
করিব করিব নীরব-পয়ান;
লিখিব নিশানে "করম-ভূমে
করুণা-কণা না যাচিব"।

ন্যায়ের আসনে আছ উপাসীন,
শাসনে তোমার র'ব চিরদিন;
সত্য জীবন মহিম-রাগে
তুমি যে কেমন, চিনিব।

কামনায় কেন হ'ব প্রাণহীন,
বিধি! বিধি তব করম-অধীন;
স'পিব পরাণ করম-করে,—
কঠোর-সাধনা সাধিব।

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

পঞ্চকোষবিবেক।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে, অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্, ন বিভেতি কদাচনেতি॥"

তৈত্তিরীয় উপনিষৎ। ব্রহ্মানন্দবল্লী—৪ অনুবাক্।

বাচঃ মনসাসহ যৎ অপ্রাপ্য যতঃ নিবর্ত্তন্তে, নিরস্তাঃ ভবন্তি, তস্য ব্রহ্মণঃ আনন্দং বিদ্বান্ যঃ জানাতি সঃ কদাচন ন বিভেতি ইতি—

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে ফিরিয়া আইসে, সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানেন অর্থাৎ সেই পূর্ণানন্দময়কে যিনি জানিয়াছেন, তিনি কদাচ ভয়প্রাপ্ত হয়েন না, ইতি।

"গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠম্পুরাণম্"—১২।২ বল্লী - কঠ

গুহাহিতং ব্রহ্ম যত্তৎ পঞ্চকোষবিবেকতঃ।
বোদ্ধুং শক্যং ততঃ কোষপঞ্চকং প্রবিবিচ্যতে॥১,- পঞ্চদশী।

তৈত্তিরীয় শ্রুতির ব্রহ্মানন্দবল্লীতে উক্ত আছে—"ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্। তদেষাভ্যুক্তা। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। য়ো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ। ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি।" ওঁ ব্রহ্মবিৎ পরমব্রহ্ম আপ্নোতি প্রাপ্নোতি। তৎ তস্মিন্ ব্রহ্মবিষয়ে এষা ঋক্ অভি-উক্তা—সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম। যঃ পরমে প্রকৃষ্টে ব্যোমন্ ব্যোম্নি, হৃদয়াকাশে, গুহায়াম্ বুদ্ধৌ নিহিতম্ বেদ বিজানাতি, সঃ বিপশ্চিতা সর্ব্বজ্ঞেন ব্রহ্মণা সহ সর্ব্বান্ কামান্ অশ্নুতে ইতি। ইহার বঙ্গানুবাদ এই—

ওঁ ব্রহ্মবিৎ পরব্রহ্মকে লাভ করেন। তৎসম্বন্ধে এই ঋক্ উক্ত হইয়াছে। যিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মকে হৃদয়াকাশে বুদ্ধিরূপ গুহাতে স্থিত বলিয়া জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম সহ সমুদায় কামাবস্তু ভোগ করেন, ইতি।

যিনি সর্ব্বজনের হৃদয়ে সদা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছেন, সেই অন্তরাত্মা ব্রহ্ম; পঞ্চকোষ বিচার দ্বারা সেই ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, ইহাই পঞ্চদশীর ১ম শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

১ শ্লোক। সকল জীবের হৃদ্দেশে অবস্থিত যে ব্রহ্ম, তাঁহাকে পঞ্চকোষের

বিচার দ্বারা জানিতে পারা যায়, সেইজন্য পঞ্চকোষের বিশেষরূপে বিচার করিতেছি। প্রবিবিচ্যতে—প্রকর্ষেণ প্রত্যগাত্মনঃ সকাশাৎ বিভজ্য প্রদর্শ্যতে।

দেহাদভ্যন্তরঃ প্রাণঃ প্রাণাদভ্যন্তরং মনঃ।
ততঃ কর্ত্তা ততো ভোক্তা গুহাসেয়ং পরম্পরা॥ ২,—পঞ্চদশী।

২ শ্লোক। সেই গুহাটী কি, যাহাতে নিহিত ব্রহ্মকে পঞ্চকোষবিচার দ্বারা জানিতে পারা যায়? শ্রুতি গুহাশব্দের দ্বারা যাহা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্যার্থ এই:—অন্নময় কোষাভ্যন্তরে প্রাণময়, প্রাণময় কোষাভ্যন্তরে মনোময়, মনোময় কোষাভ্যন্তরে (কর্ত্তা) বিজ্ঞানময়, তদভ্যন্তরে (ভোক্তা) আনন্দময় কোষ, পরম্পরাক্রমে বর্ত্তমান এই পঞ্চকোষকে গুহাশব্দে উক্ত করা যায়।

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে উক্ত আছে, "তস্মাৎ বা এতস্মাদন্নরসময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ।"

বঙ্গানুবাদ। এই অন্নময় কোষ হইতে ভিন্ন আর একটী অন্তর (অভ্যন্তর) আত্মা অর্থাৎ আত্মারূপে পরিকল্পিত কোষ আছে, সেটী প্রাণময়। তদ্দ্বারা অর্থাৎ প্রাণময় কোষ দ্বারা ইহা অর্থাৎ অন্নময় কোষ পূর্ণ। ইহাও অর্থাৎ প্রাণময় কোষও অন্নময় কোষবৎ শির বাহু প্রভৃতি সংযুক্ত মনুষ্যাকার। অন্নময় কোষের মনুষ্যাকারের ন্যায় ইহার অর্থাৎ প্রাণময় কোষের মনুষ্যাকার। ঐরূপ প্রত্যেক কোষে তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর কোষ পূর্ণভাবে অন্তর্নিহিত এবং সকল কোষেরই পূর্ব্ববৎ মনুষ্যাকার, উক্ত শ্রুতিতে বর্ণিত আছে। এবং পূর্ব্ব কোষের যে শরীরস্থ আত্মা, পরবর্ত্তী কোষেরও সেই একই আত্মা, এইরূপ উক্ত আছে—"তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্ব্বস্য।

পিতৃভুক্তান্নজাদ্বীর্য্যাজ্জাতোঽন্নেনৈব বর্দ্ধতে।
দেহ সোঽন্নময়ো নাত্মা প্রাক্‌চোর্দ্ধং তদভাবতঃ॥ ৩,—পঞ্চদশী।

বঙ্গানুবাদ। এই শ্লোকে অন্নময় কোষের স্বরূপ নির্দ্ধারণ ও তাহার অনাত্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। পিতৃমাতৃভুক্ত অন্ন হইতে জায়মান শুক্র-শোণিত হইতে জাত যে স্থূলশরীর, তাহা অন্নরস দ্বারা বর্দ্ধিত হয়, সেইজন্য তাহাকে অন্নময় কোষ কহে; ইহা কেবলমাত্র অন্নরসেরই বিকার; ইহা কদাচ অবিনাশী আত্মা হইতে পারে না; কারণ সেই দেহ অনিত্য—জন্মের পূর্ব্বে তাহা ছিল না এবং মরণের পর তাহার অভাব হইয়া থাকে—পঞ্চভূতে মিশাইয়া যায়।

পূর্ব্বজন্মন্যসন্নেতজ্জন্ম সম্পাদয়েৎ কথম্।
ভাবিজন্মন্যসন্‌কর্ম্ম ন ভুঞ্জীতেহ সঞ্চিতম্॥—পঞ্চদশী ৩।৪।

শুভাশুভ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই জীব নিজ ভাবীজন্ম প্রস্তুত করিয় থাকে। স্থূল শরীরের অস্তিত্ব যখন পূর্ব্বে ছিল না, তখন কি প্রকারে স্থূলশরীর এই বর্ত্তমান জন্মের কারণ হইতে পারে? এবং ভাবী জন্মেও এই শরীরের অভাব হইবে, তখন ইহ জন্মে সঞ্চিত কর্ম্মের ফল কিরূপে সে ভোগ করিবে? সুতরাং এই অন্নময় কোষকে আত্মা বলিতে পারা যায় না — ইহা উৎপত্তি-বিনাশশীল হওয়াতে, পাপপুণ্যরূপ কোন কর্ম্মেরই ফল ভোগ ইহাকে করিতে হয় না।

পূর্ণো দেহে বলং যচ্ছন্নক্ষাণাং যঃ প্রবর্ত্তকঃ।
বায়ুঃ প্রাণময়ো নাসাবাত্মা চৈতন্যবর্জনাৎ॥—পঞ্চদশী ৩।৫।

অন্নময় কোষের অনাত্মত্ব প্রদর্শন করণান্তর এক্ষণে প্রাণময় কোষেরও সেইরূপ অনাত্মত্ব নির্ণয় হইতেছে। যে বায়ু স্থূলদেহের পাদাদি মস্তক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া স্থূলদেহে শক্তি সঞ্চালন করে এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত করে, তাহাকে প্রাণময় কোষ কহে। এই কোষ অন্নময় কোষে পূর্ণভাবে অবস্থিত হইয়া তাহাতে বল সঞ্চার করিতেছে মাত্র—চৈতন্যের অভাব-প্রযুক্ত ইহাকেও আত্মা বলা যায় না।

অহন্তাং মমতাং দেহে গেহাদৌ চ করোতি যঃ
কামাদ্যবস্থয়া ভ্রান্তো নাসাবাত্মা মনোময়ঃ॥—পঞ্চদশী ৩।৬।

অন্নময় ও প্রাণময় কোষের অনাত্মত্ব প্রতিপন্ন করণান্তর, মনোময় কোষের স্বরূপ ও তাহারও অনাত্মত্ব প্রদর্শিত হইতেছে। দেহাদিতে অহংজ্ঞান ও ধন-সম্পত্তিতে মমতা অর্থাৎ আমার বলিয়া অভিমান যদ্দারা উপজাত হয়, সেইটী মনোময় কোষ। উহা কামক্রোধাদিবৃত্তি দ্বারা সদাই চালিত হয়; অতএব উহাও আত্মা নহে—বিকারিত্বাদ্দেহবৎ।

লীনা সুপ্তৌ বপুর্ব্বোধে ব্যাপ্নুয়াদানখাগ্রগা।
চিচ্ছায়োপেতধীর্নাত্মা বিজ্ঞানময়শব্দভাক্॥—পঞ্চদশী ৩।৭।

অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোষের অনাত্মত্ব প্রমাণ করতঃ এক্ষণে বিজ্ঞানময় কোষের স্বরূপ প্রদর্শন ও তাহারও অনাত্মত্ব প্রতিপাদন করা হইতেছে। যে চিদাভাস-যুক্তা বুদ্ধি সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানে লীনা হয় এবং জাগ্রদবস্থায় নখাগ্র হইতে সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে, সেই কোষটী বিজ্ঞানময় নামে অভিধেয়

প্রলয় ও উৎপত্তি প্রভৃতি অবস্থাবিশিষ্ট বলিয়া সেটীও আত্মা নহে। বিলয়াদ্য-বস্থাবত্ত্বাৎ।

কর্ত্তৃত্বকরণত্বাভ্যাং বিক্রিয়েতান্তরিন্দ্রিয়ম্।
বিজ্ঞানমনসী অন্তর্ব্বাহিশ্চেতে পরস্পরম্॥—পঞ্চদশী ৩।৮।

মন এবং বুদ্ধি উভয়ই অন্তঃকরণ; উভয়ের মধ্যে সামান্যমাত্র প্রভেদ বর্ত্তমান। তজ্জন্য উহাদের উভয়কে এক কোষের অন্তর্ভূত না করিয়া বিভিন্ন করিবার কারণ দেখাইতেছেন। বুদ্ধি অন্তরে কর্ত্তৃত্বরূপে পরিণত হওয়াতে উহাকে বিজ্ঞানময়, এবং মন বাহ্যভাবে (করণরূপে) বর্ত্তমান থাকায় উহাকে মনোময় কোষ কহে। ঐ উভয়ে পরস্পর অন্তর্ব্বাহ্যভাবে বিদ্যমান, সেই কারণবশতঃ দুইটী বিভিন্ন কোষ হইল।

কাচিদন্তর্ম্মুখা বৃত্তিরানন্দপ্রতিবিম্বভাক্।
পুণ্যভোগে ভোগশান্তৌ নিদ্রারূপেণ লীয়তে॥—পঞ্চদশী ৩।।

ইদানীং ভোক্তৃশব্দবাচ্য আনন্দময় কোষের অনাত্মত্ব প্রতিপাদন করিয়া তাহার স্বরূপ কহিতেছেন:—পুণ্যকর্ম্মফলানুভবকালে যে বুদ্ধিবৃত্তি অন্তর্ম্মুখা হইয়া আনন্দময় আত্মার প্রতিবিম্ববিশিষ্ট হয়, এবং পুণ্যকর্ম্মফলের ভোগসমাপ্তিতে নিদ্রা-রূপে প্রকৃতিতে লীন হয়, সেইটী আনন্দময় কোষ। উহা আত্মা নহে, আত্মার যান-স্বরূপ

কাদাচিৎকত্বতো নাত্মা স্যাদানন্দময়োঽপ্যয়ম্।
বিম্বভূতো য আনন্দ আত্মাসৌ সর্ব্বদাস্থিতেঃ॥—পঞ্চদশী ৩।১০।

আনন্দময় হইয়াও উহা আত্মা নহে, কারণ সেই আনন্দ সর্ব্বদা স্থায়ী নহে। কিন্তু তাহার অতিরিক্ত বিম্বভূত (কারণ-ভূত) যে নিত্যানন্দ, তাহাই আত্মা; কারণ উহা সর্ব্বদা সমভাবে স্থিত।

নন্বু দেহমুপক্রম্য নিদ্রানন্দান্তবস্তুষু।
মা ভূদাত্মত্বমন্যস্তু ন কশ্চিদনুভূয়তে॥ পঞ্চদশী ৩।১১।

আপত্তি হইতে পারে যে, যদ্যপি অন্নময় কোষ হইতে আনন্দময় কোষ পর্য্যন্ত বস্তুগুলিতে উক্ত হেতুসমূহের জন্য আত্মত্ব না ঘটে, তাহা হইলে কিন্তু অপর কিছুই আত্মা বলিয়া অনুভূত হয় না।

বাঢ়ং নিদ্রাদয়ঃ সর্ব্বেঽনুভূয়ন্তে ন চেতরঃ।
তথাপ্যেতেঽনুভূয়ন্তে যেন তং কো নিবারয়েৎ॥—পঞ্চদশী ৩।১২।

উত্তরে বলিতেছেন :—অন্নময় হইতে আনন্দময় পর্য্যন্ত সকল কোষই অনুভূত হয়, এবং অপর কিছুই অনুভূত হয় না সত্য বটে, তথাপি উক্ত কোষসমূহ যে চৈতন্য কর্ত্তৃক অনুভূত হয়, তাহাকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করিতে কে নিবারণ করে? অর্থাৎ পঞ্চ-কোষের অতিরিক্ত সেই নিত্যচৈতন্যই আত্মা। অর্থাৎ অন্নময়াদি আনন্দময়ান্ত কোষগুলিকে যদি আত্মা বলিয়া স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে উক্ত কোষগুলির অতিরিক্ত অন্য কাহাকে আত্মারূপে অনুভূত কি কারণে হয় না? তদুত্তরে কহিতেছেন,—অন্নময়াদি পঞ্চ-কোষ অনুভূত হয় বলিয়া স্বীকার করিলে,দেখিতে হইবে যে, কাহার দ্বারা ঐগুলি অনুভূত হয়, অর্থাৎ কে অনুভব করিয়া থাকে। অতএব যিনি সেই অনুভবের আশ্রয়, সেই অখণ্ড নিত্য চৈতন্যকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

স্বয়মেবানুভূতিত্বাৎ বিদ্যতে নানুভাব্যতা।
জ্ঞাতৃজ্ঞানান্তরাভাবাদজ্ঞেয়ো ন ত্বসত্তয়া॥—পঞ্চদশী ৩।১৩।

উক্ত পঞ্চকোষের অতিরিক্ত যদি আত্মাস্বরূপ অন্য কোন বস্তু থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ত' জানিতে পারা যাইবে—কিন্তু জানিতে পারা যায় না কি নিমিত্ত? এই প্রশ্নের সিদ্ধান্তস্বরূপে কহিতেছেন :—আত্মা স্বয়ং অনুভূতি তিনি জ্ঞানস্বরূপ; সেই নিমিত্ত তাঁহার অনুভাব্যত্ব নাই। অনুভব-রূপত্ব হইয়াও জ্ঞেয়-স্বরূপ নহেন কেন? অনুভাব্যত্ব নাই কি কারণে? তদুত্তরে কহিতেছেন, জ্ঞাতা ও জ্ঞানান্তরের অভাব হেতু তিনি অজ্ঞেয়; কিন্তু তাঁহার নিজের অসত্ত্বাহেতু যে তিনি অজ্ঞেয়, এরূপ নহে—অর্থাৎ তিনি আছেন।

পরমাত্মা চিদ্রূপ, তিনি জ্ঞানময়, সচরাচর কেহ তাঁহাকে জানিতে পারে না, কিন্তু সকলকেই তিনি জানিতেছেন। জ্ঞানান্তরের অভাবহেতু তিনি অজ্ঞেয়; যদি অন্য কোন বস্তুতে নিত্য জ্ঞান বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাকে সকলেই জানিতে পারিত। আত্মা ভিন্ন যখন অপর সকল বস্তুতেই নিত্য জ্ঞানের অভাব, তখন তাঁহাকে অপর অনাত্ম কোন বস্তুর জানিতে পারা অসম্ভব। সেই নিমিত্তই তাঁহাকে অজ্ঞেয় কহে, নতুবা তাঁহার অসত্ত্বা হেতু তিনি অজ্ঞেয় নহেন।

মাধুর্য্যাদিস্বভাবানামন্যত্র স্বগুণার্পিণাম্
স্বস্মিংস্তদর্পণাপেক্ষা নো ন চাস্ত্যন্যদর্পকম্॥—পঞ্চদশী ৩।১৪

মাধুর্য্যাদি গুণবিশিষ্ট মধু, শর্করা প্রভৃতি অন্য বস্তুতে মিলিত হইলে তত্তৎ বস্তুতে স্ব স্ব গুণ অর্পণ করে; আপনাতে মাধুর্য্যাদি গুণ অর্পণ জন্য অন্য কোন

বস্তুর অপেক্ষা করে না ; এবং মধু, শর্করা প্রভৃতিতে মাধুর্য্যাদিগুণ অর্পণ করিবার অপর কোন বস্তুও নাই। অনুভবরূপস্যাত্মনঃ অনুভাব্যত্বাভাবে দৃষ্টান্তময়ং।

অর্পকান্তররাহিত্যেঽপ্যস্ত্যেষাং তৎস্বভাবতা।

মা ভূত্তথানুভাব্যত্বং বোধাত্মা তু ন হীয়তে॥ - পঞ্চদশী ৩।১৫।

যেরূপ মধু, শর্করাতে মাধুর্য্যগুণ-অর্পণকারী অপর কোন বস্তুর অভাব সত্ত্বেও, তাহাদের স্বাভাবিক মাধুর্য্যগুণ সদা সমভাবে বর্ত্তমান থাকে, সেইরূপ জ্ঞাতা এবং জ্ঞানান্তরের অভাবহেতু আত্মা অজ্ঞেয় হইলেও তাঁহার অস্তিত্ব নাই, বলা যায় না। ইহাতে আত্মার স্বতঃসিদ্ধ নিত্যজ্ঞানস্বরূপের কোন হানি হয় না।

স্বয়ং জ্যোতির্ভবত্যেষ পুরোঽস্মাৎ ভাসতেঽখিলাৎ।

তমেব ভান্তমনেতি তদ্ভাসা ভাসতে জগৎ॥—পঞ্চদশী ৩।১৬।

এই আত্মা স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ, এই অখিল জগৎ বিকাশের পূর্ব্বে তিনি প্রকাশিত হইয়াছিলেন ; জগৎ তাঁহার প্রকাশের অনুগামী, তাঁহার প্রকাশে জগৎ প্রকাশিত।

"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" কঠ, ৫ম বল্লী, ১৫শ শ্লোক।

যেনেদং জানতে সর্ব্বং তৎকেনান্যেন জানতাম্।

বিজ্ঞাতারং কেন বিদ্যাৎ শক্তং বেদ্যে তু সাধনম্॥ - পঞ্চদশী ৩।১৭।

যে নিত্য চৈতন্য দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান অখিল ব্রহ্মাণ্ডকে জানিতে পারা যায়, সর্ব্ব-সাক্ষীস্বরূপ সেই অখণ্ড চৈতন্যকে অন্য কোন অনিত্য বস্তু দ্বারা পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায় ? অর্থাৎ কোন বস্তু-বিশেষের দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না। যিনি বিশ্বের বিজ্ঞাতা, সেই পরমাত্মাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা কিরূপে জানা যায় ? অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা কোনরূপেই তাঁহার উপলব্ধি হয় না। কারণ ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের স্ব স্ব জ্ঞাতব্য বিষয়ে আসক্ত হয়, কিন্তু জ্ঞাতার প্রতি অনুসরণ করিতে সমর্থ হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন :—

"নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।

অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥ ১২,—কঠ, ষষ্ঠবল্লী।

পরমাত্মাকে বাক্য, মন বা চক্ষু দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না ; যাঁহারা "তিনি আছেন" এরূপ বলেন, তাঁহারা ব্যতীত অন্যেরা কিরূপে তাঁহাকে উপলব্ধি করিবে ?

স বেত্তি বেদ্যং তৎ সর্ব্বং নান্যস্তস্যাস্তি বেদিতা।

বিদিতাবিদিতাভ্যাং তৎ পৃথক্ বোধস্বরূপকম্॥— পঞ্চদশী ৩।১৮।

বিশ্বসংসারে যাহা কিছু জ্ঞেয় বস্তু আছে, তিনি সে সকলেরই জ্ঞাতা, কিন্তু তাঁহার জ্ঞাতা অন্য কেহ নাই। তিনি বোধস্বরূপ ব্রহ্ম; তিনি বিদিত ও অবিদিত পদার্থ অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা বিষয়ীকৃত এবং অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত সুতরাং অজ্ঞাত—এই উভয়বিধ পদার্থ হইতেই ভিন্ন বস্তু—কারণ তিনি বোধস্বরূপ, স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ।

বোধেঽপ্যনুভবো যস্য ন কথঞ্চন জায়তে।
তং কথং বোধয়েৎ শাস্ত্রং লোষ্টং নরসমাকৃতিম্॥—পঞ্চদশী ৩।১৯।

বিদিত ও অবিদিত পদার্থের অতিরিক্ত বোধস্বরূপ আত্মার অনুভূতি জড়বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্ভবে না। যে অজ্ঞানী ব্যক্তির ঘটাদিস্ফুরণরূপ বোধেও অনুভব (সাক্ষাৎজ্ঞান) হয় না, সে নরাকৃতি মৃৎপিণ্ডবিশেষ। তাহার বুদ্ধি জড়তাদ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকায়, তাহাকে শাস্ত্রসিদ্ধ পরমাত্মতত্ত্ব কিরূপে বুঝাইবে? অর্থাৎ শাস্ত্রীয় সূক্ষ্ম যুক্তি তাহার কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম হইবে না; সুতরাং ঐরূপ অজ্ঞানী আত্মতত্ত্ববোধের অধিকারী হইতে পারে না।

জিহ্বা মেঽস্তি ন বেত্যুক্তির্লজ্জায়ৈ কেবলং যথা
ন বুধ্যতে ময়া বোধো বোদ্ধব্য ইতি তাদৃশী॥—পঞ্চদশী ৩।২০

তমসাচ্ছন্ন বুদ্ধি প্রযুক্ত বোধস্বরূপকে অনুভব করিতে না পারা সম্বন্ধে একটী স্থূল দৃষ্টান্ত দিতেছেন। 'আমার জিহ্বা আছে কি না, তাহা আমি জানি না' এরূপ বাক্য অত্যন্ত লজ্জাজনক; কারণ জিহ্বা-বিনা বাক্যই সম্ভবে না; সেইরূপ 'নিত্য জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা কোন প্রকারে আমার বোধগম্য হন না'—ইহা বলাও যুক্তি-সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ 'বোধস্বরূপ পরমাত্মা আমার বোধগম্য হন না' বলাতে আমি জ্ঞানকে জানিনা বলা হয়; সুতরাং এরূপ বাক্য নিতান্ত লজ্জার হেতু।

যস্মিন্ যস্মিন্নস্তি লোকে বোধস্তত্তদুপেক্ষণে।
যদ্বোধমাত্রং তদ্‌ব্রহ্মেত্যেবংধীর্ব্রহ্মনিশ্চয়ঃ॥—পঞ্চদশী ৩।২১।

জাগতিক সমুদায় ব্যাবহারিক বিষয়ে যে যে বস্তু পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, সেই সেই বস্তু পরিত্যাগ করিয়া কেবল তত্তদ্বস্তু বিষয়ক যে জ্ঞান মাত্র অবশিষ্ট থাকে, সেই জ্ঞানই ব্রহ্ম—সেই জ্ঞানকেই 'ব্রহ্মজ্ঞান' বলা যায়। জ্ঞানই ব্রহ্মের স্বরূপ, জ্ঞান ব্যতীত অপর কিছুই তাঁহার স্বরূপ নহে।

পঞ্চকোষপরিত্যাগে সাক্ষিবোধাবশেষতঃ।
স্বস্বরূপং স এব স্যাৎ শূন্যত্বং তস্য দুর্ঘটম্॥—পঞ্চদশী ৩।২২।

যদিও ঘটপটাদি বিষয় সকল পরিত্যাগ করিয়া সেই অদ্বৈত বস্তুবিষয়ক জ্ঞান

মাত্রকে পরব্রহ্মরূপে জানিলে পরমাত্মজ্ঞান সিদ্ধ হয়, তথাপি পঞ্চকোষ-বিচার নিষ্প্রয়োজন নহে। ব্রহ্মের প্রত্যগ্‌রূপতাজ্ঞান বিনা সংসার-নিবৃত্তির উপায় নাই; পরন্তু সেই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি পঞ্চকোষ-বিচারের উপযোগিতা আছে। বুদ্ধিপূর্ব্বক অন্নময়াদি পঞ্চকোষ বিশেষরূপে বিচার করিয়া তাহাদের অনাত্মত্ব নিশ্চয় করতঃ তাহাদের পরিত্যাগ করিলে, অবশিষ্ট সাক্ষীস্বরূপ যে জ্ঞান থাকে বা উপজাত হয়, তাহাই পরব্রহ্মস্বরূপ—সেই সাক্ষীরূপে বোধের শূন্যত্ব অর্থাৎ অভাব কখন হইতে পারে না; কারণ সেই জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান, পরমব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান। পূর্ব্বে পঞ্চকোষ সম্বন্ধে জ্ঞান উৎপন্ন না হইলে, তাহার অবশিষ্ট সাক্ষী-জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে?

উপদেশমবাপ্যৈবমাচার্য্যাত্তত্ত্বদর্শিনঃ।
পঞ্চকোষ-বিবেকেন লভন্তে নির্ব্বৃতিং পরাম॥ ৩২.—তত্ত্ববিবেকঃ। পঞ্চদশী।

অনাত্মদর্শী জীবসমূহ পূর্ব্ব সুকৃতিবলে কালক্রমে কোন তত্ত্বদর্শী আচার্য্যের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া পঞ্চকোষ বিচার দ্বারা আত্মাকে তাহা হইতে পৃথক্ জানিয়া পরম নির্বৃত্তি লাভ করেন।

অন্নং প্রাণো মনো বুদ্ধিরানন্দশ্চেতি পঞ্চ তে।
কোষাস্তৈরাবৃতঃ স্বাত্মা বিস্মৃত্যা সংসৃতিং ব্রজেৎ॥ ৩৩,—তত্ত্ববিবেকঃ।

অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চকোষ দ্বারা আত্মা আবৃত। সেই হেতু জীব নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া ঘোর সংসারে বারম্বার প্রবেশ করতঃ কষ্ট পাইয়া থাকে। কোষ শব্দ ব্যবহারের বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। গুটীপোকা নিজের কোষ নির্ম্মাণ করতঃ তদ্দ্বারা জড়িত হইয়া যেরূপ ক্লেশ পায়, জীবের পঞ্চকোষও সেইরূপ ক্লেশের হেতু হইয়া থাকে।

স্যাৎ পঞ্চীকৃতভূতোত্থো দেহঃ স্থূলোঽন্নসংজ্ঞকঃ।
লিঙ্গে তু রাজসৈঃ প্রাণৈঃ প্রাণঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহ॥ ৩৪,—তত্ত্ববিবেকঃ।

পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন স্থূল শরীরকে অন্নময়কোষ বলে; লিঙ্গ শরীরে বর্ত্তমান রজোগুণের বিকার হইতে জাত বাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রাণাপান রূপ পঞ্চ বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া প্রাণময়কোষ নামে খ্যাত হয়।

সাত্ত্বিকৈর্ধীন্দ্রিয়ৈঃ সাকং বিমর্শাত্মা মনোময়ঃ।
তৈরেব সাকং বিজ্ঞানময়োধীর্নিশ্চয়াত্মিকা॥ ৩৫,—তত্ত্ববিবেকঃ।

পঞ্চভূতের পৃথক্ পৃথক্ সত্ত্বগুণাংশ হইতে জাত শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চভূতের সত্ত্বগুণসমষ্টি হইতে উৎপন্ন সংশয়াত্মক মনের সহিত মিলিত হইয়া

মনোময়কোষ হইয়াছে; এবং সেই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, তাহাদের সত্ত্বকার্য্যরূপা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির সহিত একত্রযোগে বিজ্ঞানময়কোষ বলিয়া কথিত হয়।

কারণে সত্ত্বমানন্দময়ো মোদাদির্বৃত্তিভিঃ।
তত্তৎ কোষৈস্তু তাদাত্ম্যাদাত্মা তত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥ ৩৬, — তত্ত্ববিবেকঃ।

কারণশরীরভূত অবিদ্যাতে যে মলিন সত্ত্বগুণ বর্ত্তমান আছে, তাহা প্রীতি আমোদাদি অর্থাৎ ইষ্টদর্শনলাভ জন্য সুখানুভবরূপ বৃত্তির সহিত মিলিত হইয়া আনন্দময়কোষ নামে খ্যাত হয়। উক্ত অন্নময়াদি পঞ্চকোষের প্রত্যেক কোষের সহিত আত্মা যখন তন্ময় হয়েন, তখন তিনি তাদাত্ম্যভাব ধারণ করায়, তত্তৎ কোষময় হইয়া থাকেন। সেই কারণে তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে উক্ত আছে ঃ— "স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ," "এতস্মাদন্নরসময়াদন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ. অন্যো'ঽন্তরঃ আত্মা মনোময়ঃ" ইত্যাদি। অন্নময়কোষে অভিমান বশতঃ আত্মাকে অন্নময় বলা হইয়াছে, প্রাণময়কোষে অভিমান হেতু আত্মাকে প্রাণময়, মনোময়কোষে অভিমানহেতু মনোময়, বিজ্ঞানময়কোষে অভিমানহেতু বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময়কোষে অভিমান হেতু আত্মাকে আনন্দময় বলা হইয়াছে। উক্ত শ্লোকে "তু" শব্দের ব্যবহার কেবল কোষগুলি হইতে আত্মার বৈলক্ষণ্য প্রদর্শনের জন্য হইয়াছে।

অন্বয় ব্যতিরেকাভ্যাং পঞ্চকোষ বিবেকতঃ।
স্বাত্মানং তত উদ্ধৃত্য পরং ব্রহ্ম প্রপদ্যতে ॥ ৩৭, তত্ত্ববিবেকঃ।

এবম্বিধ উপাধিবিশিষ্ট ও পঞ্চকোষাভিমানী আত্মার নির্গুণ ও উপাধিশূন্য পরব্রহ্মের সহিত কিরূপে একত্ব সম্ভবে, এই শ্লোকে তাহা দেখাইতেছেন।

বক্ষ্যমান অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা অর্থাৎ অনুবৃত্তি ও ব্যাবৃত্তি দ্বারা পঞ্চকোষের বিচার করতঃ তদভিমানী আত্মাকে সেইগুলি হইতে পৃথক্ করিয়া 'আত্মা চিদানন্দস্বরূপ' নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা ইহা স্থিরীকৃত হইলে, আত্মার ও পরব্রহ্মের স্বরূপের বৈলক্ষণ্যের অভাব হওয়ায়, উভয়ের ঐক্য প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

অভানে স্থূলদেহস্য স্বপ্নে যদ্ভানমাত্মনঃ।
সোঽন্বয়ো ব্যতিরেকস্তদ্ভানেঽন্যানবভাসনম্ ॥ ৩৮ ॥

স্বপ্নাবস্থায় স্থূলশরীর সম্বন্ধে অপ্রতীতি হইলেও, সেই সময় আত্মার প্রতীয়মানতা অর্থাৎ স্বপ্নসাক্ষীরূপে প্রকাশমান আত্মার যে বিদ্যমানতা, তাহাই আত্মার

অন্বয় ; আর সেই স্বপ্নাবস্থায় আত্মার স্ফুরণ সত্ত্বেও অপরের অর্থাৎ স্থূলদেহের অপ্রকাশ বা অপ্রতীতিই স্থূল দেহ সম্বন্ধে ব্যতিরেক। এইরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা স্পষ্টই জানিতে পারা যায় যে, আত্মা স্থূলদেহ হইতে পৃথক্।

উক্ত প্রকারে সুষুপ্তাবস্থায় প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়কোষে জ্ঞানের অভাব হইলেও, আত্মার প্রকাশমানতা অর্থাৎ সেই অবস্থার সাক্ষীরূপে স্ফুরণই আত্মার অন্বয় এবং আত্মার স্ফুরণ সত্ত্বেও প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়কোষের অজ্ঞানাবস্থা তাহাদের সম্বন্ধে ব্যতিরেক। সেইরূপ সমাধি অবস্থায় আনন্দময় কোষরূপ কারণ-শরীর জড়বৎ অচেতন থাকে, এবং তাহার সাক্ষীস্বরূপ আত্মার বিদ্যমানতা থাকায় তাহার অন্বয়, এবং আনন্দময় কোষের ব্যতিরেক বুঝিতে হইবে। এইরূপে অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা পঞ্চকোষ হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া উদ্ধৃত করিতে পারিলে, সাধক স্বীয় আত্মাকে চিদানন্দরূপ ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারেন। এতদ্দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপন্ন হওয়াতে তত্ত্বমসি মহাবাক্যেরও সফলতা সাধন করা হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

সাধ।

পূর্ণ করিয়া শূন্য আসন
বিনাশি' নিবিড় আঁধারে,—
আশার আলো জ্বাল গো জ্বাল
দীনের কুটীর-দুয়ারে!
আঁখির আগে তুলগো ভাতি
তোমারি মহিমা নীরবে;—
হৃদয়-তন্ত্রী বাজাও নিত্য
পাশরি' আপনা সুরবে!

শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত।

সুখদুঃখ।

চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি—জগৎ দুঃখময়; যতগুলি দর্শন আছে, সকলের আরম্ভ দুঃখবাদে এবং সেই দুঃখ হইতে মানব কি উপায়ে ত্রাণ পাইতে পারে, সেই উপায় নির্দ্ধারণ করাই দর্শনমাত্রের উদ্দেশ্য। আমরা যাহা শুনিয়া আসিতেছি, তাহাই নিঃসংশয় চিত্তে বিশ্বাস করি; একবারও আমরা স্থিরচিত্তে, একাগ্রভাবে বিচার করিয়া দেখি না, দেখিবার চেষ্টাও করি না যে, যাহা শুনিয়া আসিতেছি, তাহা প্রকৃত কি না! এই যে একটী বিশ্বাস আমাদিগের সকলের অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, তাহা আমাদিগকে এতই জড়ীভূত করিয়া রাখিয়াছে যে, আমরা তাহা হইতে এক চুলও এদিক-ওদিক যাইতে ভরসা করি না। মানুষ যে চিরদিন বা অণুক্ষণ দুঃখময়, একথা বিশ্বাস করা যায় না; ক্ষণিক সুখী, ক্ষণিক দুঃখী ইহা বিশ্বাস করিতে পারি। যে ব্যক্তি ক্ষণিক সুখভোগ করিতেছে, তাহাকেও জিজ্ঞাসা কর, সেও অম্লান বদনে বলিবে যে, তাহার আদৌ সুখ নাই। তাহাকে কি বলিব? তাহাকে অসত্যবাদী বলা যায় না; কারণ তাহার মনে মনে ধারণা যে, মানুষ মাত্রেই অসুখী, সুতরাং সুখও যাহা, তাহাও দুঃখ বলিয়া পরিগণিত। সে যাহা বলিতেছে, তাহা হয়ত ঠিক, কিন্তু তাহার উপলব্ধির সহিত উক্তির একতা নাই, ইহাই হইল বিষম সমস্যা। ব্যক্তিবিশেষ যদি আপনাকে সুখী বলিয়া প্রচার করে, তাহা হইলেও তাহার নিস্তার কোথায়? অমনই লোকে তাহাকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিবে। লোকে চাহে—সকলেই বলুক যে, সংসার দুঃখভরা। যদি তাহা হইল তবে হাসি কেন? ফুল ফুটিলে, চাঁদ উঠিলে, কোকিল কুহরিলে, শিশু হাসিলে, প্রাণটা নাচিয়া উঠে কেন? স্নিগ্ধ সমীরণ, নিশীথের নিস্তব্ধতা, স্রোতস্বিনার কল্লোল, আকাশের গভীরতা এ সকল কি বিষাদমাখা, না এ সকলের পানে চাহিলে প্রাণটা দুঃখভাবে আকুল হইয়া উঠে? জননী সস্নেহ মধুর ভাষে আহ্বান করিলে, প্রেমময়ী সহধর্ম্মিণী গদগদ ভাবে সম্মুখীন হইলে, সন্তানসন্ততি উল্লাসিত প্রাণে ঝাঁপাইয়া আসিলে, পাষাণসদৃশ দুঃখরাশি তিরোহিত হয় কি না বল দেখি! যদি সকলই দুঃখোৎপাদক হয়, তাহা হইলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, ধরা দুঃখভরা। একদিকে যেরূপ পৃথিবীর চারিদিকে আনন্দের প্রবাহ ছুটিতেছে, সুখের তরঙ্গে দিক সকল কল্লোলিত হইতেছে, অন্যদিকে আবার দুঃখও যে নাই, তাহা নহে।

দুঃখেরও সেইরূপ প্রবাহ আছে, উত্তাল তরঙ্গ আছে, বিপুল বিভীষিকা আছে, বিয়োগ বিরহ, জ্বালা কর্কশতা, ব্যাধি বিকার এ সকল দুঃখের সহচর, অনুচর। ইহাতেই যেন বুঝা যায় যে, জগৎ কেবল দুঃখময় নহে, সুখময়ও বটে। কিন্তু কিসের মাত্রা অধিক, দুঃখের না সুখের ?

যে দুঃখের চক্ষে বিশ্বপানে তাকায়, সে সর্ব্বত্র দুঃখই দেখে ; কিন্তু যে সুখের চক্ষে দেখে, সে সুখও দেখে, দুঃখও দেখে। ইহাই হইল দুঃখের-সুখের চক্ষুর মধ্যে প্রভেদ। যে কেবল দুঃখ দেখিতে বদ্ধপরিকর, সে চিরদিনই দুঃখই দেখিবে ; ইহজন্মে সুখ উপভোগ করা, সুখের মুখ দেখা কিছুতেই তাহার ঘটিয়া উঠিবে না।

তুমি দুঃখ ভালবাস, দুঃখ লইয়া নীরবে থাক, তোমার দুঃখ জাহির করিয়া জগৎসুদ্ধ মানবকে পাগল করিও না, অপরের সুখের হন্তারক হইও না। মানব মাত্রেই সুখী, জীব মাত্রেই সুখী। সুখই জীবের লক্ষ্য, সুখই তাহার আদর্শ। দুঃখ ক্ষণিক, কিন্তু সুখ অনন্ত কাল। দুঃখ ভগবানের সৃষ্টি নহে, সুখই তাঁহার সৃষ্টি। যিনি আনন্দময়, যিনি আনন্দমধ্যে বিচরণ করেন, আনন্দই যাঁহার ঐশ্বর্য্য, আনন্দই যাঁহার সম্পদ, তাঁহার দ্বারা দুঃখ ক্লেশের সৃষ্টি হইতে পারে না। আমাকে দুঃখ দিয়া তাঁহার লাভ কি ? দুইজন ভগবান্ থাকিলে বিশ্বাস করিতে পারিতাম যে, এক ভগবান্ সুখ, অন্য ভগবান্ দুঃখ সৃষ্টি করিয়া, ভগবানদ্বয় পরস্পরে নিজ নিজ শক্তি পরীক্ষায় ব্যাপৃত। কিন্তু তাহা ত নহে, ভগবান্ যে একমেবাদ্বিতীয়ম্। যিনি সৃজন-পালন-লয়কারী, তিনি আমাকে দুঃখ দিয়া কি মজা দেখিবেন ? আর আমি ক্ষুদ্র কীটানুকীটের মধ্যে একজন, আমাকে আবার তিনি পরীক্ষা করিবেন কি ? তিনি জীবকে পরীক্ষা করেন, একথা মনে করিলেও পাপ সঞ্চিত হয়। আমাদিগকে দুঃখক্লেশ দেওয়াই যদি তাঁহার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে সৃষ্টি করিবারই বা কি প্রয়োজন ছিল ? যদিই সৃজন করিলেন, তবে আমাদিগের সুখ-সম্ভোগের জন্য এত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন কেন ? যাঁহারা বলেন যে, জন্ম মৃত্যু জরা এ সকলই দুঃখকর, আর পৃথিবীতে আসিলেই এ সকল অবশ্য ভোগ করিতে হইবে, তাহাদিগের হাত এড়াইবার যো নাই। জন্মিলে কিসের কষ্ট ? যে নিমেষে মাতৃজঠরে জন্মলাভ হইল, সেইক্ষণ হইতেই জননী তাহাকে পালন করিতে লাগিলেন ; পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব হইতেই মাতৃস্তনে অমৃতসমান দুগ্ধ আসিয়া সঞ্চিত হইল। যে জন্মিল, তাহার দুঃখ

কোথায়? সে অবস্থায় তাহার ভালমন্দ বুঝিবার সামর্থ্যই বা কোথায়? এ স্থলে যদি দুঃখ ভুগিবার কেহ থাকে, তবে সে মাতা। কারণ, তিনি সন্তানকে জীবাণু অবস্থা হইতে দুইশত আশি-দিন কাল আপন শরীর-মধ্যে রক্ষা করিয়া লালন-পালন করিয়াছেন, পাছে গর্ভস্থ শিশু কোনরূপে দুঃখক্লেশ পায়, এই ভয়ে সতত সাবধান, সতত চিন্তিত! তাহার জন্য কত ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন, তাহার অবধি নাই। কিন্তু শিশুর দুঃখ কি? ভূমিষ্ঠ হইলে শিশু ব্যাধিবিকারের অধীন হয় বটে, কিন্তু সে অবস্থায় তাহার ত' কিছুরই অনুভূতি করিবার সামর্থ্য জন্মে না। যতদিন না সে আত্মনির্ভর করিতে পারে, ততদিন তাহার লালন-পালন সুখ-দুঃখ সকলই মাতার উপর নির্ভর করে।

তারপর দেখি, জন্মিলে রোগ শোক আছে বটে, কিন্তু তাহা কি প্রতিদিন না প্রতিক্ষণ? পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাহাও ক্ষণিক, অধিকন্তু তাহার স্মৃতিও ক্ষণিক। যিনি স্বয়ং আনন্দময়, তিনি যে জগৎকে আনন্দে নিমজ্জিত রাখিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। তবে যে শোক তাপ, জরা ব্যাধি দেখি, তাহাদিগের অধিকাংশই নিজ নিজ কৃত দোষের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। তিনি "সত্যস্য সত্যম্"। সুতরাং আমরাও যখন তাঁহারই এক এক অংশ বহুরূপে বিদ্যমান রহিয়াছি, আমরাও 'সৎ' ভিন্ন অন্য কিছুই নহি। সৎকে অসৎ কখনও স্পর্শিতে পারে না। বহুরূপে আমরা যখন প্রেরিত হইয়াছি, আর এই সৃষ্টির মধ্যে অধিষ্ঠান করিতেছি, তখন আমাদিগকে প্রকৃতির সহিত ক্রীড়া করিতেই হইবে। সময়ে সময়ে পদস্খলন হয়—ইহাই হইল দুঃখের কারণ। পথ দেখিয়া চলিলে হোঁচট্ লাগেনা। শ্রীভগবানে লক্ষ্যস্থির রাখিয়া চলিয়া গেলে কোটী দুঃখ আসিয়া কিছুই করিতে পারে না, সুতরাং আনন্দের অভাব থাকে না। আনন্দময় জগতে আনন্দে চলিতে হইবে, কোন মতে দুঃখকে ঘেঁসিতে দেওয়া হইবে না।

আর একটী কথা। মানুষ স্বভাবতঃই সুখী। সুখ লইয়া সে জন্মিয়াছে, এজন্য সুখের কথা ভাবে না, দুঃখে পড়িলেই হা-হুতাস করে। যদি দুঃখেরই প্রাধান্য হইত, তাহা হইলে দুঃখে দুঃখে আমরা জর জর হইয়া যাইতাম, দুঃখের জন্য ভাবিতাম না, দুঃখ হইতে পরিত্রাণের চেষ্টা করিতাম না। কিন্তু সুখময় জীব সামান্য দুঃখের সংস্পর্শে ব্যাকুল ও বিকল হইয়া পড়ি। সৃষ্টির সঙ্গে যেরূপ নানা সামগ্রী দিয়া তিনি আমাদিগের সকল অভাব পূরণ করিয়া রাখিয়াছেন, অন্যদিকে কতকগুলি নিয়মও করিয়া দিয়াছেন। সেগুলি কার্য্যকারণরূপে

এরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ যে, কোথাও সামান্য ভ্রম বা পদস্খলন হইলে, শীঘ্র তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। এইজন্য ভগবানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, তাঁহাতে লক্ষ্য স্থির করিয়া যথাক্রমে নিয়মাবলির ভিতর দিয়া চলিয়া গেলে দুঃখের আঁচটী গায়ে লাগিবে না। যেখান হইতে আসিয়াছি, সেইখানেই ফিরিয়া যাইতে হইবে, কেহই এখানে থাকিতে পাইবে না। কতক্ষণ থাকিতে হইবে বা না হইবে, তাহা তিনিই জানেন। সুতরাং তাহার সম্পদকে উপেক্ষা না করিয়া প্রফুল্লচিত্তে তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে। সংসারে আসিয়া সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিজন-বিপিনে প্রবেশ করিলে চলিবে না।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

নির্ল্লজ্জ।

এত দীন এত হীন
অসহায় বলে'
তুমি কি ভোলনি মোরে
রাজ অধিরাজ !
তুমি ছাড়া আমি নেই
তবে কেন প্রভো !
আমার 'আমিত্ব' এনে'
দাও বড় লাজ !

সতত মঙ্গল হস্ত
রাখিয়াছ শিরে,
নিলাজ হৃদয়ে তবু
মাগি শেষ বার —
আমার হৃদয়ে হউক
তোমারি নিলয়,
তব গানে পূর্ণ কর
রসনা আমার।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

দ্বৈতপ্রপঞ্চ বিবেক।

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহনক্ষত্র, বিবিধ জীবজন্তু এবং উদ্ভিদাদি নানা পদার্থ পরিপূর্ণ এই জড়জগৎ কি, কোথা হইতে কোন্ সময়ে কি প্রকারে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে, "আমি" কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, পরে কোথায়ই বা যাইব—"আমার" কর্ত্তব্য কি? কোথাও গিয়া এই "আমির" বিশ্রাম সম্ভব কি না? এই সকল গভীর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ের শাস্ত্রকর্ত্তাগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত-নিচয় শাস্ত্রাকারে প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত মতবাদ সমূহ নানা বৈষম্যপূর্ণ ও বিবিধ প্রকারের জটিল সমস্যায় লৌহ অর্গলবদ্ধ গৃহের ন্যায় নিতান্ত দুষ্প্রবেশ্য হইয়া রহিয়াছে। যাঁহার ধারণা যে ভাবে প্রধাবিত হইয়াছে, তিনি তদনুরূপ তত্ত্বই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তীগণও সংস্কার শিক্ষার অনুরূপ পথ অবলম্বনে স্বীয় স্বীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দ্বারা সেই সেই তত্ত্বের স্বরূপ-নির্ণয়ে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু এই দ্বৈতপ্রপঞ্চের সম্যক বিচার করিতে হইলে কেবল মাত্র শাস্ত্রকে আশ্রয় না করিয়া তৎসহ যুক্তি-বিচারকেও গ্রহণ করিতে হইবে; নতুবা নিতান্ত একদেশ-দর্শীর ন্যায় কার্য্য করা হইবে।

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন-বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

বৃহস্পতি যেমন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, এই বচনও তদনুরূপ হইয়াছে। যে কোন বিষয়ে আস্থা স্থাপন করার পূর্ব্বে যুক্তিকে গ্রহণ সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে কথিত হইয়াছে,—ব্রহ্মের শক্তি মায়া ও সেই মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে। সেই মায়া-উপাধিযুক্ত ঈশ্বরকর্ত্তৃক এই সমুদায় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।

পঞ্চদশীকারও ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন;—

মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
স মায়ী সৃজতীত্যাহুঃ শ্বেতাশ্বতর শাখিনঃ॥

ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় উপনিষদের "আত্মা বা ইদমেক একাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষতে লোকান্ নু সৃজা ইতি।" ইত্যাদি বাক্যে দেখা যায়, এই জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমাত্মাই ছিলেন; তিনি সংকল্প করিয়াছিলেন যে, আমি জগৎ সৃষ্ট করি। সেই সংকল্প মাত্র এই সমস্ত জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।

অথর্ব্ববেদের মুণ্ডকোপনিষদে বলা হইয়াছে—

"তদেতৎ সত্যং যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাস্তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সৌম্য ভাবা প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি।

যেমন অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ সমূহ উত্থিত হয়, সেই প্রকার অক্ষর অর্থাৎ ক্ষয়োদয়বিহীন পরমাত্মা হইতে এই বিবিধ প্রাণী ও নানা প্রকার জড়পদার্থ সকল উৎপন্ন হইয়াছে।

তিত্তিরীয়, বাজসনেয়, মুণ্ডক প্রভৃতি শ্রুতি বিভিন্ন ভাষায় ঐ একই প্রকার তাৎপর্য্যকে প্রকাশ করিতেছেন। প্রথমাবস্থায় অব্যাকৃত অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে এই জগতের স্থিতির কথা প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে। পরে বিরাট ইত্যাদি নাম রূপ, চেতন অচেতন প্রভৃতি নানা প্রকার দৃশ্য পদার্থ দ্বারা জগৎ ব্যাকৃত অর্থাৎ দ্বৈতরূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

এই সকল শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য একত্রিত করিলে বোধগম্য হইবে যে, পরমেশ্বরই জীবচৈতন্যরূপে সমস্ত প্রাণীর দেহে প্রবেশ করিয়া প্রাণধারণ হেতু জীবনামে ও নির্ব্বিকার অবস্থায় কূটস্থরূপে জড়মধ্যেও অবস্থিত আছেন।

পরব্রহ্ম হইতে সৃষ্টির পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইলে, ব্রহ্মের অনন্তত্বে দোষ উপস্থিত হয়। স্রষ্টা কিরূপে সৃষ্টির অতীত হইতে পারেন? আবার সৃষ্টি কর্ত্তৃক ব্রহ্মচৈতন্য সীমাবদ্ধ—এ কথাও যুক্তিবিগর্হিত এবং প্রলাপবচনের মত হইয়া পড়ে। অনেক শাস্ত্রে পরব্রহ্মের যে ইচ্ছা কল্পিত হইয়াছে, তাহাও সর্ব্ববাদিসম্মত নহে; কেননা, অভাবই ইচ্ছার জনক। পরিপূর্ণ ব্রহ্মবস্তুতে অভাবাত্মক বোধের অসদ্ভাব হেতু ইচ্ছার আরোপ সর্ব্বথা যুক্তিবহির্ভূত। অভাবই দুঃখ, তাহার পূরণই কি সুখ নয়? এই সমস্ত বিচার দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, যাঁহারা ব্রহ্মের ইচ্ছা কল্পনা করিয়াছেন, তাঁহারা ব্রহ্মকে প্রকারান্তরে জীবের ন্যায় সুখ-দুঃখবিশিষ্ট বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। শ্রুতিস্থ "ঈক্ষণ" শব্দের অর্থ পরিষ্কার না বুঝাই এই গোলযোগের কারণ বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। বিবেচনা করিয়া দেখুন, "পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাই ছিলেন"—এই বাক্য ঈক্ষণীয় বস্তুর নিতান্ত অভাব সূচিত করিতেছে নাকি? কোন কিছু না থাকিলে কিরূপে ঈক্ষণ হইতে পারে? এখানে "ঈক্ষণ" শব্দের অর্থ "দর্শন" গ্রহণ না করিয়া ব্রহ্মের "কল্পনা" কিম্বা মনোনেত্রে অবলোকন অঙ্গীকার করা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এবং ইহাই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া অনেকের ধারণা। বাস্তবিক পক্ষে শ্রুতিস্থ

"ঈক্ষণ" ঐ ভাবেই যে ব্যবহৃত হইয়াছে, পরবর্ত্তী শ্রুতি সমূহ আলোচনা করিলে আর সংশয়বুদ্ধি থাকে না। ইহাতেই কি নিস্তার আছে ? কেহ কেহ প্রকৃতি পুরুষ ব্রহ্মমায়া স্বতন্ত্র পদার্থ কল্পনা করিয়া থাকেন এবং এই হিসাবে প্রকৃতি বা মায়াকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের 'মলিকিউল' 'এটম্' 'ইলেক্ট্রণ' (তাড়িতের পরমাণু) প্রভৃতির সঙ্গে এক পর্য্যায়ভুক্ত করিতেও অনেকে কুণ্ঠিত হন না। বেদান্তে ইহা সেরূপ অর্থে আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই। প্রকৃতির ভেদ কল্পনা দ্বারাও ব্রহ্মের অনন্ত সত্তায় যথেষ্ট দোষস্পর্শের সম্ভাবনা আছে।

অগ্নিতে দাহিকাশক্তি, সমীরণে স্পর্শ, মদ্যে মাদকতা, প্রস্তরে কাঠিন্য, সলিলে তারল্য যেমন স্বাভাবিক ধর্ম্ম হেতু গুণবাচ্য নয়, তদ্রূপই ব্রহ্মে মায়া-শক্তি—সুতরাং দ্বৈতাপত্তি ব্যর্থ হইয়া পড়ে এবং বিনা-ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মশক্তি মায়া কখনই অনুভাব্য হয় না।

বীজাভ্যন্তরে বৃক্ষের সত্তার ন্যায় এক চিন্ময় ব্রহ্মেই এই বিরাট বিশ্বের স্থিতি —তিনি ভিন্ন জড়জগতের পৃথক্ অস্তিত্ব অঙ্গীকৃত হইলে অগ্রে বিশ্বসৃষ্টির উপাদান কারণ নির্ণয় আবশ্যক হয়, অথচ ব্রহ্ম কি উপাদানে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার কোনই পর্য্যাপ্ত বিধিসঙ্গত প্রমাণ দেখা যায় না। শ্রুতির মতে আদিতে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তুর সত্তা যদি সম্ভাবিত না হইল, তবে জড় সমূহ আসিল কোথা হইতে ? সৃষ্ট্যোপযোগী কোনও পদার্থের সত্তা যদি আদিতে অঙ্গীকৃত হয়, তাহা হইলে দ্বিবিধ বস্তুর প্রমাণ-বহির্ভূত সত্তা স্বীকার করিতে হয়—এক অপরের কারণ হইয়া পড়ে এবং পরিণামবাদীর মতে বিশ্বাস স্থাপন করিলে দেখা যায়, অনন্ত ঈশ্বরের পরিণামস্বরূপ অনন্ত জগৎ বিযুক্ত হইলে শূন্যমাত্র অবশিষ্ট থাকে। অনন্ত হইতে বিয়োগ কল্পনা মূঢ়ের কল্পনার ন্যায় নিতান্ত অলীক। এই সমস্ত মতবাদ স্বীকার করিলে ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তার আসন দিতে অনেকেই কুণ্ঠিত হইবেন, সন্দেহ নাই। অতএব চিন্ময় ব্রহ্ম দ্বিতীয় পদার্থের অভাব প্রযুক্ত উর্ণনাভের ন্যায় নিজের দ্বারাই এই দৃশ্যমান জড় জগৎ উৎপাদন করিয়াছেন। উপাদান কারণ হইতে কার্য্যের স্বাতন্ত্র্য দর্শনশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য নয়; সুতরাং প্রমাণ হয় যে, জড়—চৈতন্যেরই রূপান্তর বা অবস্থান্তর। জড় বস্তু পরীক্ষা করিলে ও আধুনিক বিজ্ঞান আলোচনা করিলে অনেকাংশে ঐরূপ আভাষ পাওয়া যাইতে পারে। পাশ্চাত্য মনীষিগণ আর একটু অগ্রসর হইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, বহু সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে ভারতের ঋষি যাহা বলিয়া গিয়াছেন; তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য।

এখানে পূজ্যপাদ সোহং স্বামীর একটী অনুভূতির কথা প্রকাশ করিলাম। তিনি বলিয়াছেন ;—"বরফ নামে কোন বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, জল ঘনত্ব প্রাপ্ত হইয়া বরফরূপে প্রতীয়মান হয়। জলেরও কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন নামক (গ্যাস) বাষ্পদ্বয় মিলিত হইয়া জলরূপে প্রতীয়মান হয়। এই গ্যাসদ্বয়ও সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম অবস্থায় পরিণত হইলে জীবজ্ঞানের অতীত হইয়া যায়। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, কোন ঘনাতীত পদার্থই বরফরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। ব্রহ্মকল্পনাই জড়জগৎরূপে অধ্যাসিত হইতেছে। বাস্তব ইহা মরীচিকাবৎ অসত্য। জড়জগতের কোন অস্তিত্ব নাই—আদৌ ইহার সৃষ্টিই হয় নাই। যাহার সৃষ্টি হয় নাই, তাহার স্রষ্টা কিরূপে সম্ভবে? সুতরাং সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরেরও কোন পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, সৃষ্টি অজ্ঞান জীবের অজ্ঞানতা জনিত উপলব্ধি এবং স্রষ্টা তাহার কল্পনা মাত্র।"

জীবের সময়ের সূক্ষ্মজ্ঞান না থাকার জন্য এই সকল অতীন্দ্রিয় তত্ত্বালোচনায় যথেষ্ট বিঘ্ন উৎপাদন করে। জীবের ইন্দ্রিয়গণ সসীম ঘন সীমাবদ্ধ, সুতরাং সর্ব্বজ্ঞত্ব জীবে সম্ভব হয় না। ঋষিবাক্য সত্য হইলেও প্রকৃত বিশ্লেষণ অভাবে অনেক ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবনা রহিয়া যাইতেছে। সময়ের সূক্ষ্মত্ব ও অনন্তত্ব স্থূল জ্ঞানের ধারণাতীত বলিয়াই এই জড়জগৎ উপলব্ধির বিষয়। দেহের ও বৃক্ষাদির ক্রমিক পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত জীবের বোধাতীত। নানাবর্ণবিশিষ্ট কুলালচক্রে যদি অল্প বেগে ঘুরান যায়, তাহা হইলে তাহার প্রত্যেক বর্ণই কালজ্ঞানের সীমানার মধ্যে আসিয়া আমাদের পৃথক্ পৃথক্ বর্ণবোধ জন্মাইয়া দেয়, কিন্তু প্রবল বেগে ঘূর্ণিত কুলাল-চক্রস্থিত বর্ণগুলি সমস্তই একাকার হইয়া পড়ে। ইহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইহার কারণ কি? সময়ের সূক্ষ্মজ্ঞান না হওয়াই ইহার একমাত্র কারণ, নতুবা বর্ণ সকল ত আর এক হইয়া যায় না। সেই জন্যই যোগশাস্ত্রের সৃষ্টি। যোগী ও উচ্চশ্রেণীর ধ্যানী-গণ সময়ের সূক্ষ্মজ্ঞান করতলগত করিয়া সৃষ্টিকে মায়ামাত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

পৃথিবীতে এমন শত সহস্র কীট আছে, যাহাদের জীবনের পরিমাণ ক্ষণকালমাত্র। এই ক্ষণকালমধ্যেই তাহারা যৌবনবার্দ্ধক্যাদি দশায় উপস্থিত হইয়া জীবলীলার অবসান করে। সেই সমস্ত কীটের তুলনায় মানবজীবন অনন্তকাল স্থায়ী। পক্ষান্তরে পৃথিবীর স্থিতির তুলনায় মানবজীবন ক্ষণস্থায়ী মাত্র। আবার অনন্তের সহিত তুলনায় পৃথিবীও ক্ষণস্থায়ী; সমস্ত সংস্থিত যোগীব্যক্তি দেখিয়া থাকেন,

ইহা মায়াময়। পূজনীয় সোহং স্বামী তাঁহার 'সোহংগীতা'য় অতি সুন্দরভাবে এ বিষয় মীমাংসা করিয়াছেন, কৌতুহলী পাঠক তদ্দর্শনে অনেক সত্যজ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

যাহা হউক, পরমেশ্বরের মায়াশক্তিতে যেমন জগৎ সৃষ্টির ক্ষমতা আছে, তেমনি তাহাতে তাঁহার মোহন শক্তিও আছে। জীব সেই অনির্ব্বচনীয় শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া এই বিচিত্র বিশ্বে আসক্তি ও সুখ দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়ে। জীব সেই পরমতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া সংসারের কর্ম্মকোলাহলে আত্মবিস্মৃতের ন্যায় নিতান্ত দীন হীন ভাবে বিচরণপূর্ব্বক নিজের ব্রহ্মস্বরূপ হারাইয়া ফেলে। যখন সে একটু জাগ্রত হয়, তখনও সংসারের মধ্যেই সুখের অন্বেষণ করিতে চেষ্টা করে। ইহাই পরব্রহ্মের সৃষ্ট মানস দ্বৈতপ্রপঞ্চ।

ভাস্করপ্রতিম শ্রীশঙ্করাচার্য্য শ্রুতিভাষ্যে পরব্রহ্মের উভয় লিঙ্গ অর্থাৎ সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ এই দুই ভাবই স্বীকার করিয়াছেন। 'এই আত্মা সর্ব্বকাম, সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস' ইত্যাদি সবিশেষ লিঙ্গ—আর 'ইনি অণুও নহেন, হ্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন'—ইত্যাদি ভাব নির্ব্বিশেষ লিঙ্গ। এখন বিবেচনা করিতে হইবে, একই বস্তুতে উভয় ভাব থাকা সম্ভব কি না? পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম এক বস্তুতে কল্পনা উন্মত্তের ন্যায় হইয়া পড়ে। ইহা কাঁঠালের আমসত্বের ন্যায়। যে স্থূল নহে, সে সর্ব্বরস হইবে কি প্রকারে? রূপহীন বস্তু রূপবান্ হয় কিরূপে? যিনি সগুণ, তিনি নির্গুণ হইবেন কেন? ব্রহ্ম এক নির্ব্বিকল্প বস্তু—তিনি অদ্বিতীয় হইয়া রূপবান্ ও সগুণ কিরূপে হইতে পারেন? অজ্ঞগণ ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণে অক্ষমতা হেতু নানা অনর্থের উৎপত্তি করিয়াছে। সেইজন্যই তিনি শ্রুতিস্থ সবিশেষ লিঙ্গ প্রত্যাখ্যান করিয়া নির্ব্বিশেষকেই শ্রুতি প্রতিপাদ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই সমস্ত বিচারপূর্ব্বক দেখাইয়াছেন যে, একই বস্তুর দ্বিধাভাবকল্পনা নিতান্ত যুক্তিশাস্ত্র বিরহিত হইলেও তাহাতে যদি কোন উপাধির কল্পনা করা যায়, তবে তাহা সম্ভবপর হইতে পারে। সেই জন্য তিনি অবিদ্যা, অজ্ঞান, আবরণ বিক্ষেপাদি শক্তির সাহায্যে এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক মতকে জগতের সম্মুখে স্থাপন করিয়া ইহার গৌরবের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। ব্রহ্মের ঐ সকল ভূয়া উপাধি, অধ্যাস মাত্র। এই হতভাগ্য দেশের যদি কিছু গৌরবের বস্তু থাকে, তবে তাঁহা এই "মায়াবাদ" বা "শুদ্ধাদ্বৈতবাদ"। পৃথিবীর সমস্ত দর্শনের সঙ্গে তুলনা করিলে ইহার গৌরবের মাত্রা বরং বৃদ্ধিই হইবে।

যাহা হউক, এই বিচিত্র দ্বৈতপ্রপঞ্চ-তত্ত্ব সম্যকরূপে নিরূপণ করা অপূর্ণ-জ্ঞানের সাধ্যাতীত। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিকগণ ইহার বিশেষ তত্ত্ব নিরাকরণে একান্ত পরাজিত হইয়া ইহা যে মায়া, ইহা যে মিথ্যা—তাহাই বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। যাঁহারা এই মিথ্যা প্রপঞ্চ লইয়া অনর্থক বাগ্বিতণ্ডা করেন, তাঁহারা ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করিলে যথেষ্ট সুফল লাভের সম্ভাবনা। এ সময়ে এই সকল কথা যথেষ্ট আলোচনার যোগ্য বলিয়া মনে করি। মানবজীবন কালের একটা সীমানার মধ্যে অবস্থিত—কাল পূর্ণ হইলেই জীবনের বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। এ অবস্থায় দ্বৈতপ্রপঞ্চকে মিথ্যাজ্ঞানে শ্রুতিবিশ্বাসপরায়ণ আস্তিক বঙ্গবাসীর যথেষ্ট উপকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যায় অনুরাগ বৃদ্ধিরই আশা সূচিত করিয়া দেয়। এইজন্যই "মায়াবাদ শিক্ষিত সমাজের জীবন-মরণের সঙ্গী"—এ কথা পণ্ডিতবর প্রথমনাথ তর্কভূষণ মহাশয় স্থানান্তরে বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। ভারতীয় "লোকায়ত"গণ তর্কশাস্ত্রে যথেষ্ট বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় প্রদান সত্ত্বেও একমাত্র প্রপঞ্চ বিশ্বাসী বলিয়াই দার্শনিক-সমাজে তাহাদের আসন লাভ হয় নাই। সত্যকে পরিহার করাই চার্ব্বাকের দুর্দ্দশার অন্যতম কারণ।

পঞ্চদশীর বিদ্যারণ্যমুনি অসাধারণ বেদবিদ্যাবিশারদ। তিনি বেদান্তের গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া পরবর্ত্তীদিগের জন্য সুগম রথ্যা রচনা করিয়াছেন। শ্রীমৎ ভারতীতীর্থ নিতান্ত হতাশ হৃদয়ে নানা কূটতর্কের অবতারণা না করিয়া শ্রুতিসঙ্গত দ্বৈতপ্রপঞ্চকে দুইভাগে বিভাগ করতঃ প্রত্যক্ষ দর্শন বহির্জ্জগতের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়া তাহার পারমার্থিক সত্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক যথেষ্ট বেদবিদ্যার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আমি তাঁহারই অনুবর্ত্তী হইয়া সেই কথার যথাসাধ্য আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব।

সৃষ্টির মধ্যে মানবজাতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই মানবে জীব চৈতন্য পূর্ণভাবে বিকশিত আছে। জীব কাহাকে বলে? সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম-চৈতন্য আর ইন্দ্রিয় প্রাণ মন ও বুদ্ধির সমষ্টিরূপ যে লিঙ্গদেহ ও সেই লিঙ্গদেহস্থিত যে চৈতন্য-প্রতিবিম্ব—এই সমুদয়ের সমষ্টিই জীবশব্দে কথিত হইয়াছে।

উক্ত জীব কর্ত্তৃক উৎপাদিত দ্বৈত-প্রপঞ্চকে দুইভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে; এক শাস্ত্রীয়—অপর অশাস্ত্রীয় প্রপঞ্চ। পঞ্চদশীকার বলেন :—"যতকাল পর্য্যন্ত পরমাত্মজ্ঞান উৎপন্ন না হইবে, ততকাল পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় দ্বৈত পুনঃপুন বিচার করিয়া অশাস্ত্রীয় দ্বৈতপ্রপঞ্চকে দূরীভূত করিবে।" ইহা হইতে বুঝিতে

পারা গেল যে, এই যে দ্বৈত—ইহা অদ্বৈততত্ত্বের বিরোধী নহে ; বরং অনেকাংশে সাহায্যকারী। শাস্ত্রাদিপাঠ, শব্দার্থপরিজ্ঞান, সদ্‌গুরুর উপদেশ—এ সমস্ত ভিন্ন এই প্রত্যক্ষ দ্বৈতজ্ঞানকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। আবার ইহা যে মায়ামাত্র, বন্ধনের কারণ—এ জ্ঞানও দৃঢ়ীকৃত করিতে হইবে। এইভাবে গ্রহণ করিলে ইহা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় হইতে পারে না। স্থিরচিত্তে, যথেষ্ট বিবেচনা করিয়া, সুস্থবুদ্ধির বিশুদ্ধ বিচারাশ্রয়ে ইহার অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করাই মানবজীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পরিণামে ইহাতে যথেষ্ট সুখলাভের আশা নিহিত আছে।

সপ্তান্ন ব্রাহ্মণে জীবকর্ত্তৃক সৃষ্ট সমস্ত দ্বৈতবস্তুর বিবরণ লিখিত আছে। জীব স্বীয় জ্ঞান ও নানারূপ কর্ম্ম দ্বারা সপ্ত প্রকার অন্নের সৃষ্টি করিয়াছে। এক অন্ন শস্যাদি (জীবভোগ্য) ; দেবতাদিগের দুই প্রকার অন্ন ; দর্শ ও পৌর্ণমাসযজ্ঞ তৃতীয় ; পশুদিগের দুগ্ধ চতুর্থ ; আর আত্মার মন, বাক্য ও প্রাণ—এই সাত প্রকার অন্ন। শস্যাদি অন্ন জীবসৃষ্ট না হইলেও জীব স্বতঃসিদ্ধ প্রজ্ঞাবলে তাহাতে আপনার ভোগ্যত্ব স্থাপন করিয়াছে। রমণীগণ যেমন পিতৃজন্যা ও পতিভোগ্যা, তদ্রূপ এই জগৎ ঈশ্বরসৃষ্ট এবং জীবভোগ্য।

তবে কি ঈশ্বর স্বর্ণকার কুম্ভকারের অলঙ্কার ও ঘট প্রস্তুতের ন্যায় এই জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন ? এই সন্দেহ নিরসন জন্য নিম্নলিখিত কারিকার অবতারণা :—

মায়াবৃত্ত্যাত্মকো হীশসঙ্কল্পঃ সাধনং জনৌ।
মনোবৃত্ত্যাত্মকো জীব সঙ্কল্পো ভোগসাধনম্।

'মায়াবৃত্তিরূপ জগৎসৃষ্টি বিষয়ে তাঁহার (ঈশ্বরের) যে সঙ্কল্প, সেই সঙ্কল্পই এখানে সৃষ্টিহেতু, আর মনোবৃত্তিরূপ ভোগ বিষয়ে জীবের যে সঙ্কল্প, তাহাই এখানে ভোগসাধন বলিয়া বুঝিতে হইবে'।

ক্রমশঃ

শ্রীতারাদাস চট্টোপাধ্যায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

আশ্চর্য্য আবিষ্কার। প্রাচীন ট্রয়-রাজ্যের অবস্থান-আবিষ্কর্ত্তা পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান প্রত্নতত্ত্ব-বেত্তা ডাক্তার হিনরিচ শ্লিমান সাহেব জীবনের শেষভাগে প্রাচীন আট্‌লান্টিস জাতির বাসভূমির আবিষ্কারসম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার কোন বন্ধুর নিকট একখানি সিল করা মোড়ক রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাহার উপর লেখা ছিল যে, তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে যে কেহ উক্ত মোড়কের ভিতর উল্লিখিত অনুসন্ধান-কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিতে পারিবেন, তিনি উক্ত মোড়ক খুলিতে পারিবেন।

কয়েক বৎসরের পর্য্যবেক্ষণ ও ভ্রমণের পর উক্ত ডাক্তারের প্রসিদ্ধ পৌত্র ডাক্তার পল শ্লিমান সাহেব স্থির করিলেন যে, 'পিতামহের বন্ধুর রক্ষিত মোড়কটী খুলিব; কারণ উহাতে যে কার্য্য নির্দ্দেশিত আছে, তাহা একান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য"। তদনুসারে গত সন ১৯০৬ সালে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া উক্ত মোড়ক খুলিয়া ফেলিলেন।

মোড়কের ভিতর একখানি আদেশ পত্র ছিল, তদনুসারে পৌত্র ডাক্তার সাহেব একটী পেটিকা ভাঙ্গিয়া উন্মুক্ত করিলেন। তাহার মধ্যে কতকগুলি কাগজ পত্র ও আলোকচিত্র (photographs) ছিল। উক্ত কাগজে লেখা ছিল যে, পিতামহ-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত অনুসন্ধানকার্য্যে অগ্রসর হইবার জন্য পেটিকা উন্মোচনকারীকে দৃঢ় পণ করিতে হইবে। তদনুসারে পৌত্র ডাক্তার সাহেব অনুসন্ধান কার্য্য আরম্ভ করেন।

মিশর (Egypt), মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধীয় যাদুঘরে গত ছয় বৎসর কাল অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত কার্য্য করিয়া এক্ষণে তিনি প্রাচীন আটলান্টিয়ান জাতির বাসভূমি আবিষ্কার করিয়াছেন এবং এই ভূভাগের অস্তিত্ব কালে উক্ত স্থান হইতেই যে ঐতিহাসিকযুগের সভ্যতা উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এখন মনে হইতেছে যে, বৃদ্ধ পিতামহ ডাক্তার সাহেব অতীত যুগের পুরাতন ট্রয়রাজ্যের স্থান-নির্দ্দেশ প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তাহা হাসিয়া

উড়াইয়া দেওয়া চলে না এবং সেই আবিষ্কারের সঙ্গে যে অন্যান্য ইঙ্গিত আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া বোধ হয়, সময়ে কোন উপযুক্ত ব্যক্তি চেষ্টা করিলে, আরও পুরাতনকালের সে যুগের অগ্রণীস্বরূপ আটলাণ্টিয়ানদিগের উপনিবিষ্ট নগরাদি সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রকাশ হইতে পারিবেন।

উত্তর ল্যাটীচিউডের ২৫ অংশ হইতে ৩০ অংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ডলফিন রিজ নামক বর্ত্তমান আট্ল্যাণ্টিক সমুদ্রতলস্থিত প্রকাণ্ড পার্ব্বত্য-ভূমিই পুরাতন আট্লাণ্টিক জাতির বাসস্থান ছিল বলিয়া মনে হইতেছে। আর আজোর দ্বীপ-পুঞ্জ, যাহা এখনও আট্লাণ্টিক সমুদ্রের উপর অধিষ্ঠিত আছে, তাহা উক্ত জলমগ্ন ভূভাগের পর্ব্বত-শ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ চূড়া বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

এক সময়ে পূজনীয় এইচ, পি, ব্ল্যাভাট্স্কি মহোদয়া আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মদৃষ্টি দ্বারা ঐ সকল কথা প্রকাশ করিয়া বিজ্ঞান ও ধর্ম্মরাজ্যকে চমকিত ও বিরক্ত করিয়াছিলেন। এখন কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণকর্ত্তৃকই তাহা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হইতে চলিল।

মূর্ত্তির ভিতর মন্দির :—মিশর দেশের পিরামিডের কথা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। কোন্ অতীতযুগে মিশরীরা প্রকাণ্ড পর্ব্বত কাটিয়া কয়েকটি বিরাট্ পিরামিড নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এই সকল পিরামিডের মধ্যে একটি সমধিক প্রসিদ্ধ; তাহাকে 'the great sphinx' বলে। সজীব প্রস্তর ছেদন করিয়া এই বিশাল মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে—অর্দ্ধনারী, অর্দ্ধপশু, বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে দিগন্তপানে চাহিয়া আছে। এই মূর্ত্তির অভ্যন্তরে কোন কিছু প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা এতদিন কেহ জানিত না। সম্প্রতি আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রিস্নার (Reisner) এই মূর্ত্তির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দুইটি মন্দিরের আবিষ্কার করিয়াছেন—একটি মন্দির মূর্ত্তির মস্তকের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল এবং অপর বৃহত্তর মন্দির তাহার হৃদয়দেশ জুড়িয়া অবস্থিত। এই মন্দিরের পাদদেশে মিশরের আদি রাজা মেনিসের সমাধি। গতবারের Illustrated London News পত্রিকায় এই sphinxএর অভ্যন্তরস্থ মন্দিরের চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কৌতূহলী পাঠক সেই চিত্র দেখিতে পারেন। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা আশা করিতেছেন যে, ঐ

দুই মন্দিরের মধ্য হইতে অতীতকালের মিসরীয় সভ্যতার অনেক নিদর্শন সংগৃহীত হইবে।

* * *

পরমাণু তত্ত্ব।—পাশ্চাত্য রসায়ন-বিজ্ঞানে সম্প্রতি পরমাণু লইয়া খুব আলোচনা চলিতেছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও ধারণা ছিল যে, পরমাণু নিত্য; অনাদিকাল হইতে পরমাণু সমভাবে বিদ্যমান আছে। রেডিয়াম্ (Radium) আবিষ্কারের পর তাঁহারা এ ধারণা বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এখন তাঁহারা স্বীকার করিতেছেন যে, পরমাণু নিত্য নহে; বরং অবস্থায় পড়িয়া পরমাণু বিশ্লিষ্ট হইয়া ক্ষুদ্রতর পরমাণুতে পরিণত হয়। এই ক্ষুদ্রতর পরমাণুর নামকরণ হইয়াছে—Ion বা Electron। সম্প্রতি কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, জড়-পরমাণু বলিয়া কোন কিছু নাই; ইহা জীবেরই ভাবান্তর। এ সম্বন্ধে ডাক্তার সালিবি (Saleeby) সম্প্রতি লিখিয়াছেন:—"নব্য রসায়ন সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, জড় (matter) বলিয়া কোন কিছু আছে কি না। পরমাণুর বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইতেছে যে, পরমাণু শক্তির অস্থায়ী কেন্দ্র মাত্র; পরমাণুরও জন্ম-মৃত্যু উৎপত্তি-বিনাশ আছে। কিন্তু পরমাণু মৃত হইলে তাহার শবদেহ পড়িয়া থাকে না; কারণ যে শক্তির প্রস্রবণ পরমাণু, সেই শক্তি মহাশক্তিসাগরে বিলীন হইয়া যায়; তাহার কোন কিছু চিহ্ন থাকে না। তত্ত্ববিদ্যা সভার প্রতিষ্ঠাত্রী ম্যাডাম ব্ল্যাভাস্কি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এই কথাই বলিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাঁহার কথা উপেক্ষিত হইয়াছিল।

* * *

বাস্তবিক যাঁহারা ম্যাডাম ব্ল্যাভাস্কি প্রণীত "গুপ্তবিদ্যা" (Secret Doctrine) অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, অনেক অনেক বিষয়ে বিজ্ঞানের অধুনা কষ্টার্জ্জিত সত্য ম্যাডাম ব্ল্যাভাস্কি ২০ বৎসর পূর্ব্বে প্রচারিত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি এল মহাশয় সম্প্রতি কলিকাতাস্থ তত্ত্ববিদ্যা-সমিতিতে এই সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি ভূরি ভূরি বৈজ্ঞানিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া এবং বহু বহু বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের আলোচনা করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, কি পদার্থ বিদ্যা, কি রসায়ন, কি ভূ-তত্ত্ব, কি প্রত্ন-তত্ত্ব, কি দেহ-বিজ্ঞান, কি ভাষা-বিজ্ঞান, সমস্ত প্রচলিত বিজ্ঞানের

নবাবিষ্কৃত তত্ত্ব সমূহের দ্বারা ম্যাডাম ব্ল্যাভাস্কি রচিত ঐ "গুপ্ত-বিদ্যা" গ্রন্থের সত্যতা প্রমাণিত হইতেছে।

* * *

বঙ্গীয় তত্ত্ববিদ্যাসমিতি কয়েক মাস হইতে তাঁহাদের নবনির্ম্মিত গৃহে (৪ নং কলেজ স্কোয়ারে) প্রতি রবিবার ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতার আয়োজন করিতেছেন। গত মাসে যোগ-দর্শনের সুপরিচিত দিব্যদৃষ্টি সম্বন্ধে কয়েকটী বক্তৃতা হইয়াছিল। রায় বাহাদুর প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় "ত্যাগ ও বিবর্ত্তন" সম্বন্ধে দুইটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অন্যান্য বারে ভাগবতরত্ন শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতসম্বন্ধে কয়েকটী সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ঐ সকল বক্তৃতায় অনেক লোক আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

* * *

গত ১৭ জানুয়ারী বৈজ্ঞানিকপ্রবর টম্‌সন্ সাহেব (Sir J. J. Thomson) বিলাতের রয়েল ইন্‌স্‌টিউসন (Royal Institution) নামক সুবিখ্যাত বিজ্ঞান-সভায় এক নূতন মূল-ভূতের আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। এই মূল-ভূতটি হাইড্রোজেন হইতে গুরুতর ও হিলিয়ম হইতে লঘুতর। ইহার আণবিক গুরুত্ব (atomic weight) "৩"; এই জন্য টমসন্ সাহেব ইহাতে X_3 নামে অভিহিত করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রায় সাত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমতী বেসান্ট ও শ্রীযুক্ত লেড্‌বিটার সাহেব কেবল মাত্র সূক্ষ্ম-দর্শন সাহায্যে অকল্‌টাম (occultum) নামক যে নূতন মূলভূতের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, তাহারও আণবিক গুরুত্ব "৩"। কিন্তু তখন বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহাদিগের কথায় আস্থা স্থাপন করেন নাই। এখন বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, টম্‌সন্ সাহেবের নবাবিষ্কৃত X_3 ও অকাল্‌টাম একই পদার্থ। টম্‌সন্ সাহেব এখনও X_3 এর অন্যান্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে পারেন নাই। শ্রীমতী বেসান্ট ও শ্রীযুক্ত লেড্‌বিটার সাহেব তাঁহাদিগের ১৯০৭ সালে প্রকাশিত "সূক্ষ্ম রসায়ন (Occult Chemistry) নামক গ্রন্থে অকাল্‌টামের অনেক গুণের পরিচয় দিয়াছেন (২১—২৪ পৃঃ)। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে X_3 সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভ করিলে সূক্ষ্ম রসায়ন গ্রন্থের সকল কথাই প্রমাণিত হইবে।

উপরি উক্ত আবিষ্কার ব্যতীত টম্‌সন্ সাহেব আরগন্ (Argon) শ্রেণীভুক্ত একটী নূতন বাষ্পের কথাও প্রকাশ করিয়াছেন। এই বাষ্পটি আণবিক গুরুত্বে

অনেকটা নিয়নের (Neon) ন্যায়, অথচ ইহা ঠিক নিয়ন নহে। শ্রীমতী বেসান্ট ও শ্রীযুক্ত লেড্‌বিটার কৃত পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্মরসায়ন গ্রন্থে (৮৪ পৃষ্ঠায়) এই বাষ্পেরও উল্লেখ দেখা যায়। উক্তগ্রন্থে এই বাষ্পকে মেটানিয়ন্ (Meta Neon) নামে অভিহিত করা হইয়াছে। যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শন বা দিব্যদৃষ্টির কথা বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা অতঃপর কি বলেন ?

চিত্র-প্রসঙ্গ।

নিমাই সন্ন্যাস।

মান্যবর ভ্রাতা, ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের ইটালীয় শিল্পী-কর্ত্তৃক শিক্ষিত, সুনিপুণ চিত্র শিল্পী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় নিমাই সন্ন্যাস ব্যাপার অবলম্বন করিয়া যে একটী মনোহর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, আমরা সেই চিত্র অবলম্বন করিয়া অপর শিল্পী কর্ত্তৃক একটী চিত্র প্রস্তুত করাইয়াছি। আমাদের গ্রাহকগণের জন্য সেই চিত্র এই পত্রিকার প্রথমেই সংযোজিত হইয়াছে। আমরা ঘোষজ মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

চিত্র সন্নিবেশিত স্থান—কাঞ্চন নগর ; সুরধুনী তীরে মনোহর বৃক্ষ ছায়ায়। পশ্চাতে মহামতি কেশব ভারতী দণ্ডায়মান।

"তখন নাপিত আসি, প্রভুর সম্মুখে বসি, ক্ষুর দিল চাঁচর কেশে।
করি অতি উচ্চরব, কান্দে যত লোক সব, নয়ন জলে দেহ ভাসে॥
হরি হরি কিনা হৈল কাঞ্চন নগরে।
যতেক নগর-বাসী, দিবসে হইল নিশি, প্রবেশিল শোকের সায়রে॥
মুণ্ডন করিতে কেশ, হৈয়া অতি প্রেমাবেশ, নাপিত কান্দয়ে উচ্চরায়।
কি হৈল কি হৈল বলে, ক্ষুর আর নাহি চলে, প্রাণ ফাটি বিদরিয়া যায়॥
মহা উচ্চস্বর করি, কান্দে কুলবতী নারী, সবাই সবার মুখ চাইয়া।
ধৈরজ ধরিতে নারে, নয়নযুগল-নীরে, ধারা বহে বয়ান বাহিয়া॥"

বাসু ঘোষ।

অথর্ব্ববেদের মুণ্ডকোপনিষদে বলা হইয়াছে—

"তদেতৎ সত্যং যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাস্তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সৌম্য ভাবা প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি।

যেমন অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ সমূহ উত্থিত হয়, সেই প্রকার অক্ষর অর্থাৎ ক্ষয়োদয়বিহীন পরমাত্মা হইতে এই বিবিধ প্রাণী ও নানা প্রকার জড়পদার্থ সকল উৎপন্ন হইয়াছে।

তিত্তিরীয়, বাজসনেয়, মুণ্ডক প্রভৃতি শ্রুতি বিভিন্ন ভাষায় ঐ একই প্রকার তাৎপর্য্যকে প্রকাশ করিতেছেন। প্রথমাবস্থায় অব্যাকৃত অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে এই জগতের স্থিতির কথা প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে। পরে বিরাট ইত্যাদি নাম রূপ, চেতন অচেতন প্রভৃতি নানা প্রকার দৃশ্য পদার্থ দ্বারা জগৎ ব্যাকৃত অর্থাৎ দ্বৈতরূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

এই সকল শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য একত্রিত করিলে বোধগম্য হইবে যে, পরমেশ্বরই জীবচৈতন্যরূপে সমস্ত প্রাণীর দেহে প্রবেশ করিয়া প্রাণধারণ হেতু জীবনামে ও নির্ব্বিকার অবস্থায় কূটস্থরূপে জড়মধ্যেও অবস্থিত আছেন।

পরব্রহ্ম হইতে সৃষ্টির পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইলে, ব্রহ্মের অনন্তত্বে দোষ উপস্থিত হয়। স্রষ্টা কিরূপে সৃষ্টির অতীত হইতে পারেন? আবার সৃষ্টি কর্ত্তৃক ব্রহ্মচৈতন্য সীমাবদ্ধ—এ কথাও যুক্তিবিগর্হিত এবং প্রলাপবচনের মত হইয়া পড়ে। অনেক শাস্ত্রে পরব্রহ্মের যে ইচ্ছা কল্পিত হইয়াছে, তাহাও সর্ব্ববাদিসম্মত নহে; কেননা, অভাবই ইচ্ছার জনক। পরিপূর্ণ ব্রহ্মবস্তুতে অভাবাত্মক বোধের অসম্ভাব হেতু ইচ্ছার আরোপ সর্ব্বথা যুক্তিবহির্ভূত। অভাবই দুঃখ, তাহার পূরণই কি সুখ নয়? এই সমস্ত বিচার দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, যাঁহারা ব্রহ্মের ইচ্ছা কল্পনা করিয়াছেন, তাঁহারা ব্রহ্মকে প্রকারান্তরে জীবের ন্যায় সুখ-দুঃখবিশিষ্ট বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। শ্রুতিস্থ "ঈক্ষণ" শব্দের অর্থ পরিষ্কার না বুঝাই এই গোলযোগের কারণ বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। বিবেচনা করিয়া দেখুন, "পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাই ছিলেন"—এই বাক্য ঈক্ষণীয় বস্তুর নিতান্ত অভাব সূচিত করিতেছে নাকি? কোন কিছু না থাকিলে কিরূপে ঈক্ষণ হইতে পারে? এখানে "ঈক্ষণ" শব্দের অর্থ "দর্শন" গ্রহণ না করিয়া ব্রহ্মের "কল্পনা" কিম্বা মনোনেত্রে অবলোকন অঙ্গীকার করা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এবং ইহাই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া অনেকের ধারণা। বাস্তবিক পক্ষে শ্রুতিস্থ

"ঈক্ষণ" ঐ ভাবেই যে ব্যবহৃত হইয়াছে, পরবর্ত্তী শ্রুতি সমূহ আলোচনা করিলে আর সংশয়বুদ্ধি থাকে না। ইহাতেই কি নিস্তার আছে ? কেহ কেহ প্রকৃতি পুরুষ ব্রহ্মমায়া স্বতন্ত্র পদার্থ কল্পনা করিয়া থাকেন এবং এই হিসাবে প্রকৃতি বা মায়াকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের 'মলিকিউল' 'এটম্' 'ইলেক্‌ট্রণ' (তাড়িতের পরমাণু) প্রভৃতির সঙ্গে এক পর্য্যায়ভুক্ত করিতেও অনেকে কুণ্ঠিত হন না। বেদান্তে ইহা সেরূপ অর্থে আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই। প্রকৃতির ভেদ কল্পনা দ্বারাও ব্রহ্মের অনন্ত সত্তায় যথেষ্ট দোষস্পর্শের সম্ভাবনা আছে।

অগ্নিতে দাহিকাশক্তি, সমীরণে স্পর্শ, মদ্যে মাদকতা, প্রস্তরে কাঠিন্য, সলিলে তারল্য যেমন স্বাভাবিক ধর্ম্ম হেতু গুণবাচ্য নয়, তদ্রূপই ব্রহ্মে মায়া-শক্তি—সুতরাং দ্বৈতাপত্তি ব্যর্থ হইয়া পড়ে এবং বিনা-ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মশক্তি মায়া কখনই অনুভাব্য হয় না।

বীজাভ্যন্তরে বৃক্ষের সত্তার ন্যায় এক চিন্ময় ব্রহ্মেই এই বিরাট বিশ্বের স্থিতি—তিনি ভিন্ন জড়জগতের পৃথক্ অস্তিত্ব অঙ্গীকৃত হইলে অগ্রে বিশ্বসৃষ্টির উপাদান কারণ নির্ণয় আবশ্যক হয়, অথচ ব্রহ্ম কি উপাদানে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার কোনই পর্য্যাপ্ত বিধিসঙ্গত প্রমাণ দেখা যায় না। শ্রুতির মতে আদিতে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তুর সত্তা যদি সম্ভাবিত না হইল, তবে জড় সমূহ আসিল কোথা হইতে ? সৃষ্ট্যোপযোগী কোনও পদার্থের সত্তা যদি আদিতে অঙ্গীকৃত হয়, তাহা হইলে দ্বিবিধ বস্তুর প্রমাণ-বহির্ভূত সত্তা স্বীকার করিতে হয়—এক অপরের কারণ হইয়া পড়ে এবং পরিণামবাদীর মতে বিশ্বাস স্থাপন করিলে দেখা যায়, অনন্ত ঈশ্বরের পরিণামস্বরূপ অনন্ত জগৎ বিযুক্ত হইলে শূন্যমাত্র অবশিষ্ট থাকে। অনন্ত হইতে বিয়োগ কল্পনা মূঢ়ের কল্পনার ন্যায় নিতান্ত অলীক। এই সমস্ত মতবাদ স্বীকার করিলে ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তার আসন দিতে অনেকেই কুণ্ঠিত হইবেন, সন্দেহ নাই। অতএব চিন্ময় ব্রহ্ম দ্বিতীয় পদার্থের অভাব প্রযুক্ত উর্ণনাভের ন্যায় নিজের দ্বারাই এই দৃশ্যমান জড় জগৎ উৎপাদন করিয়াছেন। উপাদান কারণ হইতে কার্য্যের স্বাতন্ত্র্য দর্শনশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য নয়; সুতরাং প্রমাণ হয় যে, জড়—চৈতন্যেরই রূপান্তর বা অবস্থান্তর। জড় বস্তু পরীক্ষা করিলে ও আধুনিক বিজ্ঞান আলোচনা করিলে অনেকাংশে ঐরূপ আভাষ পাওয়া যাইতে পারে। পাশ্চাত্য মনীষিগণ আর একটু অগ্রসর হইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, বহু সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে ভারতের ঋষি যাহা বলিয়া গিয়াছেন; তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য।



সারনাথের বুদ্ধমূর্ত্তি।

ব্রহ্মবিদ্যা

২য় বর্ষ।] জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০। [২য় সংখ্যা।

বুদ্ধমূর্ত্তি।

কি ধ্যানে নিমগ্ন দেব, প্রদীপ্ত কি প্রতিভায়,
কি অনন্ত শান্তি ছায়া ভাসিছে ও প্রতিমায়;
ক্লিষ্ট ছিল একদিন ও মুখমণ্ডল খানি,
ধরার অনন্ত দুঃখে শান্তি সুখ নাহি জানি;
ঝরিত অজস্রধারে ও আঁখিতে অশ্রুধারা,
অশ্রুময় ধরণীর অশ্রুমাঝে আত্মহারা;
উদ্বেল হৃদয়-সিন্ধু, কাতর জীবের তরে,
করুণার সম্প্লাবনে ব্যাপ্ত হ'ল চরাচরে;
সেথা সিন্ধুসম দুঃখ মগ্ন হ'ল বিন্দুপ্রায়
সিন্ধুসম মহাসুখে, মহাসিন্ধু মহিমায়;
সে মহাসিন্ধুর নীরে বিন্দু সিন্ধু একাকার,
অমৃত অমৃতে শুধু হইতেছে পারাপার;
কে চাহিবে কোন্ ইষ্ট, কে কাঁদিবে কার তরে?
বাসনা বাসনাহীন চিরপূর্ণ তৃপ্তিভরে;
নির্ব্বাণ সকলরূপ, নির্ব্বাণ সকল মায়া,
বিষাদ-আহ্লাদ-শূন্য প্রসাদের পুণ্য ছায়া।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র।

গীতার ঈশ্বরতত্ত্ব ও ভক্তিযোগ। *

গীতার প্রথম ছয় অধ্যায় লইয়া প্রথম ষট্‌ক। সপ্তম অধ্যায় হইতে দ্বিতীয় ষট্‌কের আরম্ভ। এই ষট্‌কে ঈশ্বরতত্ত্ব এবং ভক্তিযোগ প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায় তাহার সূচনা।

পূর্ব্বে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগ উপদেশকালে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥

ভগবান্ ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে বলিয়াছেন,—

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

অর্থাৎ 'যোগীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ, যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ও আমাতে অর্পিতচিত্ত হইয়া আমাকে ভজনা করেন'। ইঁহারা শ্রেষ্ঠ যোগী কেন, তাহার কারণ এই সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। সে কারণ এই যে, তাঁহারা নিশ্চয় সমগ্র ভগবান্‌কে তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন। বিজ্ঞান সহিত এই ভগবৎতত্ত্বজ্ঞান এই অধ্যায়ে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা আমাদের বুঝিতে হইবে। কেন না, এই জ্ঞান লাভ হইলে, আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে না, সকল তত্ত্বই অধিগত হয়, তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শন সিদ্ধ হয়।

গীতায় ঈশ্বরবাদ।—ঈশ্বর নিখিল জগতের প্রভব ও প্রলয়। আমাদের এই সৌর জগৎ ও অন্যান্য কোটী কোটী যে সৌর বা নাক্ষত্র-জগৎ আছে, সে সমুদায় জগৎ এই ঈশ্বর হইতে সমুদ্ভূত ও প্রলয়কালে তাঁহাতেই প্রলীন হয়। তিনিই সমুদায় জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। এই ঈশ্বর হইতে পরতর আর কিছুই নাই। তিনিই পরম কারণ,—তাঁহাতেই সমুদায় প্রতিষ্ঠিত। সূত্রে যেমন মণিগণ বিধৃত, এই অনন্ত স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সত্ত্ব সমুদায় তাঁহাতেই সেইরূপ বিধৃত। ঈশ্বরই সকল বস্তুর সার (essence)। তিনি যেমন নিত্য অব্যাকৃত কারণরূপে সমুদায় কার্য্যাত্মক জগৎ ধারণ করেন, সেইরূপ প্রত্যেক বস্তুর সত্তারূপে—তাহার সার (essence) রূপে, সকলকে ধারণ করেন। তিনি জলের রসতন্মাত্র (thing-in-itself), আকাশের শব্দতন্মাত্র, পৃথিবীর গন্ধতন্মাত্র, অগ্নির তেজস্তন্মাত্র। তিনি শশি-সূর্য্যের প্রভা, সর্ব্ববেদে প্রণব, সর্ব্বভূতে জীবন, তিনি পুরুষের পৌরুষ, তপস্বীর তপ, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, তেজস্বীর তেজ, বলবানের বল, কামীর কাম ইত্যাদি।

* শ্রীযুত দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয় গীতার যে বিস্তৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহার প্রথম ষট্‌ক মুদ্রিত হইয়া শীঘ্রই প্রচারিত হইবে। আমরা এ প্রবন্ধে তাঁহার দ্বিতীয় ষট্‌কের মুখবন্ধ ব্রহ্মবিদ্যার পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি। ব্রঃ বিঃ সম্পাদক।

ঈশ্বরের দুইরূপ প্রকৃতি আছে, এক—অপরা প্রকৃতি, আর এক—পরা প্রকৃতি। অপরা প্রকৃতি জড়, তাহা আট ভাগে বিভক্ত। বুদ্ধি, মন, অহঙ্কার ও আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত, এই আট প্রকার অপরা প্রকৃতি। আর যাহা জীবভূত হইয়া জগৎ ধারণ করে, তাহা ভগবানের পরা প্রকৃতি। সাংখ্যোক্ত লিঙ্গরূপ এই দুই প্রকৃতিই সমুদায় ভূতযোনি, অথবা ভূতগণের উৎপত্তি স্থান। ভগবান্‌ই সর্ব্বভূতের বীজ। পরে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান্ উক্ত পরা ও অপরা প্রকৃতিরূপ বা মহৎ ব্রহ্মরূপ ভূতযোনিতে বীজ নিষেক করেন বলিয়া, সেই প্রকৃতি বা অব্যক্ত হইতে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয়। ঈশ্বর হইতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব সকল উৎপন্ন হয়, এবং তাঁহাতেই অবস্থিত থাকে। কিন্তু ঈশ্বর এই ত্রিবিধ ভাবের অধীন নহেন। তিনি তাহাদের মধ্যে নহেন—তাহাদের অতীত তত্ত্ব। এই তিন গুণময় ভাবের দ্বারা এই সমুদায় জগৎ মোহিত থাকে; এজন্য এই ত্রিবিধ ভাবের অতীত যে পরম অব্যয় ঈশ্বর, তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। এই ত্রিবিধ গুণময় ভাবই দৈবী মায়া। জীবের পক্ষে এই গুণময়ী দৈবীমায়া দুরতিক্রম্য। যে জীব এই ত্রিগুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে—এই ত্রিবিধ ভাবের অতীত হইতে পারে, সে-ই ঈশ্বরকে জানিতে পারে। যে ঈশ্বরকে প্রপন্ন হয়, সে-ই এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে।

ঈশ্বর অজ অব্যয়। তাহার পরম ভাব—উক্ত ত্রিগুণময়ভাবের অতীত। তিনি এই ত্রিগুণময়ী দৈবী যোগমায়ার দ্বারা সমাবৃত। এজন্য তিনি সকলের নিকট প্রকাশিত নহেন। মূঢ় লোকে তাঁহাকে জানিতে পারে না। অল্পবুদ্ধি জনগণ অব্যক্ত যোগমায়া-সমাবৃত-হেতু অপ্রকাশ ঈশ্বরকে ব্যক্তিভাবাপন্ন মনে করে, তাহারা তাঁহার অব্যক্ত পরম ভাব জানিতে পারে না। ঈশ্বর অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ ভূতগণকে জানেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানে না। এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে ঈশ্বরতত্ত্ব এইরূপে বিবৃত হইয়াছে। ইহা হইতে আমরা এই জানিতে পারি যে,—

(১) ঈশ্বরই সমুদায় জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। তিনিই পরম তত্ত্ব।

(২) নিখিল জগতে যাহা কিছু আছে, ঈশ্বরই সে সকলের ধারক। তিনি সকলের সত্তাভাবকে বিধৃত করেন। তিনি সকলের আত্মা।

(৩) ঈশ্বরের প্রকৃতি আছে। সেই প্রকৃতি দুইরূপ,—পরা ও অপরা প্রকৃতি। পরা প্রকৃতি জীবভূত হইয়া জগৎ ধারণ করে; আর অপরা প্রকৃতি—বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ও পঞ্চ মহাভূতরূপে অষ্টধা বিভক্ত হইয়া জগতের উপাদান হয়। এই দুই প্রকৃতিই সমুদায় ভূতযোনি, আর ঈশ্বর সর্ব্বভূতের বীজস্বরূপ—সর্ব্বভূতের জীবন।

(৪) সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ গুণময় ভাবের দ্বারা যে এই জগৎ মোহিত হয়, তাহা ভগবানেরই দৈবী যোগমায়া। তাহা ভগবান্ হইতেই উৎপন্ন হয়। ভগবান্ এই যোগমায়া সমাবৃত হইয়া অপ্রকাশিত থাকেন।

ইহা ব্যতীত অধ্যায়-শেষে আরও উক্ত হইয়াছে যে, যাহারা 'মুমুক্ষু' হইয়া ঈশ্বরকে আশ্রয়পূর্ব্বক যোগযুক্ত হয়, তাহারা 'তদ্‌ব্রহ্ম' কৃৎস্ন অধ্যাত্ম, অখিল কর্ম্ম ও সাধিভূত, সাধিদৈব, সাধিযজ্ঞ ঈশ্বরকে জানিতে পারে। এই 'তদ্‌ব্রহ্ম' অধ্যাত্ম প্রভৃতি তত্ত্ব পরে অষ্টম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু এই অধ্যায়োক্ত ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিবার জন্য এস্থলে ব্রহ্মতত্ত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করিবার প্রয়োজন। সুতরাং আমরা এক্ষণে ব্রহ্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব ও প্রকৃতিতত্ত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করিব। এই চারিতত্ত্বই এক অর্থে ব্রহ্মতত্ত্বের অন্তর্গত। এই তত্ত্ব সম্যক্ বুঝিলে আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে না।

ব্রহ্মতত্ত্ব। গীতায় বিভিন্ন স্থানে ব্রহ্ম শব্দ যে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা আমরা তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু এস্থলে ব্রহ্ম অর্থে পরমব্রহ্ম। এইঅধ্যায়ের শেষে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

তে ব্রহ্ম তদ্ বিদুঃ।

ইহাতে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন,— কিং তদ্ ব্রহ্ম?

ভগবান্ ইহার উত্তরে বলিয়াছেন,— অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্।

এই অক্ষর পরমব্রহ্ম—ঈশ্বরতত্ত্ব হইতে এক অর্থে অভিন্ন হইলেও ভিন্ন ভাবে ধারণা করিতে হইবে, এবং ব্রহ্মতত্ত্বের সহিত ঈশ্বরতত্ত্বের সম্বন্ধ কি তাহা বুঝিতে হইবে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন, কিন্তু কোথাও আপনাকে পরব্রহ্ম বলেন নাই। ভগবান্ এই অব্যক্ত অক্ষর পরমব্রহ্মকে পরমগতি ও আপনার পরমধাম বলিয়াছেন।

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥
ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥

এই অক্ষর পরব্রহ্মই পরম পদ,—

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥

এই পরমব্রহ্ম, যাহা পরমপদ পরমগতি, যাহা ভগবানের পরম ধাম, তাহাই সগুণ ভাবে ভগবানের অব্যক্ত মূর্ত্তি -

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।

ইহাই ভগবানের পরম অব্যক্ত ভাব।

ভগবান্ পরমেশ্বররূপে নির্গুণ পরব্রহ্মেরই প্রতিষ্ঠা -

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং।

অতএব গীতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ঈশ্বরতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব ঠিক এক নহে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন, কিন্তু পরব্রহ্মকে তাঁহার পরমধাম, পরমপদ,

তাঁহার অব্যক্ত মূর্ত্তি ও তিনিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, এইরূপ কথা বলিয়া ঈশ্বরতত্ত্ব হইতে ব্রহ্মতত্ত্বের পার্থক্য দেখাইয়া দিয়াছেন।

ভগবান্ এই অধ্যায়ে 'সমগ্র' ঈশ্বর-তত্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন; কিন্তু ঈশ্বর যে জ্ঞেয়, তাহা কোথাও বলেন নাই। ঈশ্বরে আসক্তমন হইয়া ঈশ্বরের আশ্রয়ে যোগযুক্ত হইলে সমগ্র ঈশ্বরকে জানা যায়। সেই অনন্যা অব্যভিচারিণী ঈশ্বরভক্তি, অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্য স্থিতি ও তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন প্রভৃতি যে জ্ঞানের স্বরূপ, ইহা পরে উক্ত হইয়াছে। সেই জ্ঞানে ব্রহ্মই একমাত্র জ্ঞেয়—সেই ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই অমৃতত্ব লাভ হয়। এই ব্রহ্ম—পরম অনাদিমৎ ও সৎ বা অসৎ কিছুই বাচ্য নহেন। এই ব্রহ্মতত্ত্ব পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথমেও অর্জ্জুনের প্রশ্ন ও ভগবানের উত্তর হইতে এ কথা জানা যায়। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন,—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥

ভগবান্ উত্তর করিলেন,—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥

* * * *

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥

অতএব গীতা অনুসারে ব্রহ্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব পৃথক্। ব্রহ্ম—পরমব্রহ্ম, অক্ষর, অব্যক্ত, অনির্দ্দেশ্য, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব, সর্ব্বত্রগ। ব্রহ্ম পরমপদ, পরম গতি, ঈশ্বরেরও পরমধাম। ব্রহ্ম সর্ব্বতঃ-পাণিপাদ, সর্ব্বতঃ-অক্ষিশিরোমুখ, সর্ব্বতঃ শ্রুতিযুক্ত, সর্ব্বইন্দ্রিয়-গুণাভাস, সর্ব্বইন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত, সমস্ত আবৃত করিয়া অবস্থিত।

ব্রহ্ম অসক্ত হইয়াও সর্ব্বভৃত, নির্গুণ হইয়াও গুণভোক্তা। ব্রহ্ম চরাচর সর্ব্বভূতের অন্তরে বাহিরে, নিকটে দূরে অবস্থিত, অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের ন্যায় সর্ব্বভূতে অবস্থিত। ব্রহ্ম জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞানগম্যরূপে সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। ব্রহ্ম সকল জ্যোতিষের জ্যোতিঃ। কিন্তু ব্রহ্ম সূক্ষ্ম হেতু অবিজ্ঞেয়। ব্রহ্ম জ্ঞেয় হইলেও অবিজ্ঞেয়।

এজন্য ব্রহ্ম জ্ঞানে জ্ঞেয় থাকেন, তাঁহাকে কখনও সম্যক্ জানা যায় না। বিজ্ঞান সহিত সমগ্র ব্রহ্মজ্ঞান কেহ লাভ করিতে পারে না। এই ব্রহ্ম নির্গুণ হইয়াও গুণভোক্তা ও সগুণ। ব্রহ্মের দুইভাব বেদান্তে উপদিষ্ট হইয়াছে—সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্ম। নির্গুণ ব্রহ্ম তৎ শব্দ বাচ্য। ওঁ "তৎসৎ" তাঁহার নির্দ্দেশক হইলেও 'নেতি নেতি বা তন্ন তন্ন'—এই নিষেধ মুখেই কেবল তাঁহাকে নির্দ্দেশ করা যায়। আর সগুণভাবে ব্রহ্ম,

ঈশ্বর জীব ও জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হন। সগুণভাবেই ব্রহ্ম এই 'জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ। 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'—এই বেদান্ত সূত্র এই সগুণ ব্রহ্মেরই তটস্থ লক্ষণ। এই জগৎকারণ সগুণ ব্রহ্মই ঈশ্বর। ঈশ্বরই জগতের প্রভব ও প্রলয়, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

যাহা হউক, সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বর জগৎকারণ হইলেও, পরব্রহ্মই জগতের মূল কারণ। এই মূল কারণ (first cause) অবশ্য অনাদি, অনন্ত। বেদান্ত মতে এই কারণ 'সৎ'। জগৎরূপ কার্য্য ইহাতে বিবর্ত্তিত হয় মাত্র। সে কারণ কখনও কার্য্যরূপে পরিণত হয় না। তাহা নিত্য, এক, অদ্বয় তত্ত্ব। যাহা হউক, এস্থলে ব্রহ্মতত্ত্বের আর বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন নাই। পরে স্থানে স্থানে ইহার উল্লেখ করিতে হইবে। বিশেষতঃ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ইহা বিবৃত হইবে। এক্ষণে আমরা ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব।

ঈশ্বরতত্ত্ব।—সৃষ্টি প্রসঙ্গে বা সৃষ্টি সম্বন্ধে পরব্রহ্মের প্রথম অভিব্যক্তিই তাঁহার সগুণ ভাব। তাহাই ঈশ্বরভাব। পরব্রহ্মে সৎরূপে যে অনন্ত শক্তিবীজ নিহিত, বিকাশোন্মুখ সেই শক্তিযুক্ত হইয়া ব্রহ্ম সগুণ হন, তিনি ঈশ্বর হন। ঈশ্বর, ব্রহ্মরূপ সাগরে আকাশে সূর্য্যের ন্যায় এই অনন্তরূপ শক্তিযুক্ত হইয়া, যেন অভিব্যক্ত হন। পরব্রহ্মের যে পরমাত্ম-ভাব, সেই ভাবযুক্ত হইয়া ঈশ্বর অভিব্যক্ত হন। ব্রহ্মে যে জ্ঞান নির্ব্বিকল্প—জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই ত্রিবিধ ভাবের অতীত, তাহা পরম জ্ঞাতৃরূপে যেন পৃথক হইয়া সেই নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মজ্ঞান ঈশ্বরভাবে অভিব্যক্ত হন। অতএব ঈশ্বর—ব্রহ্মের এই পরম জ্ঞাতা, পরমাত্মা, সর্ব্বশক্তিমান্ রূপ। কেহ কেহ ইঁহাকে প্রত্যগাত্মা বলেন, কেহ শব্দব্রহ্ম বলেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকের ভাষায় ইহা Logos বা Word বা Christos। কিন্তু শব্দব্রহ্ম ও ঈশ্বর ঠিক এক নহেন। ঈশ্বর হইতে এক অর্থে শব্দব্রহ্মের অভিব্যক্তি হয়। যাহা হউক, সে কথা এস্থলে আলোচ্য নহে।

পরমেশ্বরই গীতা অনুসারে সমুদায় জগতের উদ্ভব ও প্রলয়। অতএব তাঁহাকে যদি Logos বলিতে হয়, তবে তিনিই একমাত্র Logos। বিভিন্ন জগতে যে বিভিন্ন logosএর অভিব্যক্তি হয়, তাহা এই এক পরমেশ্বর (Logos) হইতেই উদ্ভূত। আমাদের এ ব্রহ্মাণ্ডের যিনি logos—তিনি হিরণ্যগর্ভ-প্রথম জায়মান পুরুষ। পরমেশ্বরই বিশ্বাত্মা বিশ্বরূপ—তিনিই পরমপুরুষ। তিনি পুনঃ পুনঃ কল্পের আদিতে অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতি হইতে সর্ব্বভূত সৃষ্টি করেন, এবং কল্পান্তে সেই অব্যক্তে সকলকে লয় করেন। সর্ব্বভূত কল্পান্তে তাঁহারই মূল প্রকৃতিতে লীন থাকে এবং কল্পারম্ভে তাঁহারই সেই প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হয়। ভগবান্ নিজ প্রকৃতিতে অবস্থান করিয়া এইরূপ পুনঃ পুনঃ জগতের সৃষ্টি ও লয় করেন। ভগবান্ এই সৃষ্টিলয়-কর্ম্মে স্বয়ং উদাসীনবৎ থাকিলেও তাঁহার অধিষ্ঠাতৃত্বে বা অধ্যক্ষতায় প্রকৃতিই জগৎ সৃষ্টি করেন ও লয় করেন। অতএব এই সৃষ্টি-লয়ের এক কারণ ভগবানেরই প্রকৃতি।

পূর্ব অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান্ ধর্ম্ম-সংস্থাপনাদি অলৌকিক কর্ম্মের জন্য অবতীর্ণ হন বা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আত্মমায়ার দ্বারা স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক এই জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান্ স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করেন বলিয়া, তাঁহার অধ্যক্ষতায় যে প্রকৃতি এই জগৎ সৃষ্টি করে তাহারও মূল এই মায়া। ইহা দৈবী গুণময়ী মায়া—ভগবানের যোগমায়া। ভগবান্ স্বীয় যোগমায়ার দ্বারা স্বপ্রকৃতিতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক এ জগৎও সৃষ্টি করেন। এক্ষণে আমরা সেই প্রকৃতি ও মায়াতত্ত্ব সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

প্রকৃতিতত্ত্ব।—ভগবান্ পরে বলিয়াছেন,—

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥

এই অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত, সনাতন, অবিনাশিভাবই 'অক্ষর'। তাহাই পরব্রহ্ম—তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই সনাতন অব্যক্ত হইতেও অব্যয় পরব্রহ্মই এই 'অব্যক্ত' ভাবে সর্ব্বপ্রভবের কারণ সেই অব্যক্ত হইতে সৃষ্টিকালে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয়, এবং লয়কালে সেই অব্যক্তেই লীন হয়। এই অব্যক্ত সাংখ্যের মূল প্রকৃতি হইলেও ইহা পরব্রহ্মেরই এক ভাব। এই জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান-স্বরূপ পরব্রহ্মের যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভাবে নিত্য অভিব্যক্তির কথা বলিয়াছি, পরমেশ্বরই সেই পরম জ্ঞাতা রূপ, আর এই অব্যক্ত মূল প্রকৃতি তাঁহার পরম জ্ঞেয় রূপ; নিত্য জ্ঞানস্বরূপ পরমব্রহ্ম যেন আপনাকে পরম জ্ঞাতা ও পরম জ্ঞেয় রূপে বিভক্ত করেন। এই পরম জ্ঞাতা পরমেশ্বরের জ্ঞানে ব্রহ্মই পরম জ্ঞেয়-রূপে যে ভাবে বিবর্ত্তিত হন, বা প্রকাশিত হন ভগবান্ তাহাকেই অব্যক্ত বলিয়াছেন। এই অব্যক্ত জ্ঞাতা-ঈশ্বরের জ্ঞেয়। ব্রহ্ম পরম জ্ঞাতৃরূপে পরমেশ্বর—পরমপুরুষ। আর ব্রহ্মই পরমজ্ঞেয়রূপে—পরমাপ্রকৃতি।

সৃষ্টিতে এই পুরুষ প্রকৃতিরূপে পরব্রহ্ম নিত্য অভিব্যক্ত। এজন্য উভয়েই অনাদি। সৃষ্টি প্রসঙ্গে অদ্বয় নির্ব্বিকল্প জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্বে এই দ্বৈতরূপ নিত্য-অভিব্যক্ত।

এই জন্য এই মূল প্রকৃতিকে গীতায় মহদ্ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। এই মূলপ্রকৃতিরূপ মহৎ ব্রহ্মকে বা পরম জ্ঞাতা পরমেশ্বরের পরম জ্ঞেয়কে 'যোনি' কল্পনা করিয়া তাহাতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক পরমেশ্বর তাহাতে নিজ আত্মস্বরূপ বীজ নিষিক্ত করেন,—তাহা হইতে এই জগতের বা সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয়।

প্রথমে ঈশ্বরের ঈক্ষণ হেতু এই অব্যক্ত মূল প্রকৃতি হইতেই পরা ও অপরা রূপ প্রকৃতির অভিব্যক্তি হয়। এই পরা ও অপরা প্রকৃতি—সাংখ্যের প্রকৃতি ও বিকৃতিরূপ সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীর। তাহাই সাক্ষাৎ সর্ব্বভূতযোনি। পরব্রহ্ম অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতি রূপে কিরূপে ভূতযোনি হন, তাহা ধারণা করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম প্রথমে 'ঈক্ষণ' করেন, কামনা করেন বা সংকল্প করেন—'আমি বহু হইব'। এই সংকল্প বা ঈক্ষণ পূর্ব্বক তিনি নামরূপ দ্বারা এই সৃষ্টি ব্যাকৃত করেন, এবং তাহার মধ্যে আত্মস্বরূপে অনুপ্রবিষ্ট হন। ব্রহ্ম সগুণ ভাবে পরম জ্ঞাতা পরমেশ্বর রূপে এই 'বহুর' ঈক্ষণ করেন। কিন্তু কোথায় কোন্ অধিকরণে এই ঈক্ষণ করেন? কি উপাদান হইতেই বা এই বহুর সৃষ্টি করেন? বলিয়াছি ত ব্রহ্ম জ্ঞাতা হইয়া আপনাকেই জ্ঞেয়রূপে যেন বিভক্ত করেন, আপনাকেই জ্ঞেয়রূপে ঈক্ষণ করেন, এবং সেই জ্ঞেয়রূপকে উপাদান ও অধিকরণ করিয়া, তাহাতেই সেই বহু হইবার কল্পনা নাম ও রূপ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং তাহাতে আত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হন। ইহা হইতেই বহুত্বময় জগতের উৎপত্তি হয়।

অতএব গীতা অনুসারে এই মূল প্রকৃতিই অব্যক্ত, তাহাই মহদ্‌ব্রহ্ম। তাহাই ভগবানের যোনি বা জগৎ উৎপত্তির অধিকরণ। সাংখ্যের মূল প্রকৃতি বা অব্যক্ত হইতে এই মূলপ্রকৃতির প্রভেদ আছে। সাংখ্যের মূলপ্রকৃতি স্বতন্ত্র তত্ত্ব। তাহা হইতে স্বতঃই বুদ্ধি প্রভৃতি বিভিন্ন তত্ত্বের পরিণাম হয়। সে পরিণামের জন্য কেবল বহু বদ্ধ পুরুষের সন্নিধিমাত্র প্রয়োজন,—কোন পুরুষের বা পরমেশ্বরের 'ঈক্ষণ' বা নিয়ন্তৃত্বের প্রয়োজন হয় না। গীতায় স্পষ্ট ভাবে এই পরিণাম জন্য—প্রকৃতির এই জগৎ প্রসব জন্য—ভগবানের অধ্যক্ষতা উপদিষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ ও গীতার প্রকৃতিবাদের সহিত যে পার্থক্য, তাহা এস্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। তাহা যথা স্থানে বিবৃত হইবে।

আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, পরব্রহ্মই এক অর্থে মূল প্রকৃতি। কিন্তু মূল প্রকৃতি পরব্রহ্ম নহেন। বলিয়াছি ত', পরমেশ্বর পরমজ্ঞাতৃরূপে ঈক্ষণ করিলে, তাঁহার নিকট পরব্রহ্ম জ্ঞেয়রূপে যে ভাবে ঈক্ষিত হন, যেরূপে প্রকাশিত হন, তাহাই পরমেশ্বরের নিকট অব্যক্ত মূলপ্রকৃতি-রূপ মহদ্‌ব্রহ্ম। মূলপ্রকৃতিরূপ আবরণে আবৃত হইয়াই যেন পরব্রহ্ম জ্ঞেয়রূপে পরমেশ্বরের জ্ঞানে প্রতিভাত হন। পরব্রহ্ম জ্ঞাতৃরূপে আপনার কাছে অব্যক্ত মূলপ্রকৃতিরূপ আবরণে আবৃত হইয়া যেন জ্ঞেয়রূপে প্রকাশিত হন। পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায় অক্ষর অব্যক্ত The Absolute Unmanifest—যেন সৃষ্টি সম্বন্ধে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া এক ভাবে Absolute Subject বা Absolute Self (পরমজ্ঞাতা) ও আর একভাবে Absolute Object (পরমজ্ঞেয়) হইয়া প্রকাশিত (manifest) হন। এই পরমজ্ঞেয়ের পাশ্চাত্য

দার্শনিক নাম Nature—তাহাই মূল প্রকৃতি। ভগবান্ এই মূল প্রকৃতিকে আপনার করিয়া লইয়া, তাহাতে মমত্বভাবযুক্ত হইয়াই যেন তাহাতে অধিষ্ঠিত হন। ইহাই গীতোক্ত প্রকৃতিতত্ত্ব।

মায়াতত্ত্ব।—পরব্রহ্মের এইরূপে আপনাকে দ্বিধা বিভক্তের ন্যায় প্রকাশ করিবার কারণ—মায়া। ইহা অপরিচ্ছিন্ন তত্ত্বকে পরিচ্ছিন্ন করিবার শক্তি। এজন্য মায়াকে ব্রহ্মের পরাখ্য শক্তি বলা হয়। এই মায়াশক্তি হেতু পরব্রহ্ম পরমেশ্বররূপে প্রকাশিত হইলে, মায়া সেই পরমেশ্বরকেই আশ্রয় করে। পরমেশ্বর এই মায়ার সহায়েই জগৎ সৃষ্টি করেন। এইজন্য এই মায়া ভগবানেরই যোগমায়া, তাঁহারই দৈবী গুণময়ী মায়া। এই শুদ্ধমায়া-যুক্ত হইয়া ভগবান্ সচ্চিদানন্দঘন হন, এই মায়াশক্তি ভগবানের স্বাভাবিক। এ শক্তি বিবিধ, একরূপ, অনন্ত। এজন্য শ্রুতিতে মায়া বহু বচনে উক্ত হইয়াছে।

ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপঃ।—ইতি ঋগ্বেদ ও বৃহদারণ্যক ২।৫।১৯।

যাহা হউক, এই মায়াশক্তি প্রধানতঃ দুইরূপ, তাহার ক্রিয়াও দুইরূপ—এক জ্ঞান ক্রিয়া, আর এক বলক্রিয়া।

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥

এই মায়া প্রথমে জ্ঞানরূপে জ্যোতিঃরূপে শব্দরূপে প্রকাশিত হন। ভগবান্ তাহাতেই সমাবৃত হন। এই মায়ার আবরণ হেতু ভগবানের স্বরূপ আমাদের নিকট প্রকাশিত হয় না।

এই মায়া হেতু ভগবানের জ্ঞানে 'কাম' ও 'ঈক্ষণ' প্রকাশিত হয়। তিনি ঈক্ষণ করেন বা কামনা করেন—'আমি বহু হইব'। এই ঈক্ষণ বা কামনা করিয়া তিনি উক্ত মূলপ্রকৃতিকে তাঁহারই করিয়া লইয়া তাঁহাকেই ঈক্ষণ করেন, এবং কামনা ও সংকল্পপূর্ব্বক সেই 'বহু হইব'-রূপ সংকল্প তাহাতে ব্যক্ত করেন।

চিত্রকর যেমন চিত্র কল্পনা করিয়া পট গ্রহণ করেন, এবং সেই পটরূপ আধারে নানা বর্ণ দ্বারা নিজ কল্পিত চিত্র অঙ্কিত করেন, সেই প্রকার মূল প্রকৃতিরূপ অব্যক্ত পটে ভগবান্ তাঁহার গুণময়ী মায়াজাত কল্পনার বিকাশ করেন।

মূল প্রকৃতিতে পরমেশ্বরের এই বহু হইবার কল্পনার প্রতিষ্ঠা হেতু মূলপ্রকৃতি একদিকে আকাশাদি পঞ্চভূতরূপে পরিণত বা বিবর্ত্তিত হয়; অন্যদিকে বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন প্রভৃতিরূপে প্রকাশিত হয়, এবং পরস্পর সম্মিলিত হইয়া অপরা প্রকৃতিরূপে প্রকটিত হয়। সেইরূপ ভগবানের মায়াশক্তি হইতে যে জগৎ-ধারক প্রাণশক্তি প্রকাশিত হয়, তাহা মূল প্রকৃতিতে অভিব্যক্ত হইয়া তাহাকে পরা প্রকৃতিরূপে ব্যক্ত করে। তখন এই পরা ও

অপরা প্রকৃতি মিলিত হইয়া সর্ব্বভূত-যোনি হয়। পরব্রহ্মকেই পরমেশ্বরই এই পরা ও অপরা প্রকৃতি রূপে ঈক্ষণ করিয়া, তাঁহাতে তাঁহার বহুভূত বা নানাজাতীয় জীবের সম্যক্ কল্পনা (Idea) নাম ও রূপ দ্বারা ব্যাকৃত করিয়া, তাহাতে আত্মরূপে অনুপ্রবেশপূর্ব্বক বীজ নিষেক করেন। তাহা হইতেই সর্ব্ব ভূতের উৎপত্তি হয়। এইরূপে মায়া হইতেই সৃষ্টি হয়।

এইরূপে গীতা হইতে আমরা 'মায়া' ও 'প্রকৃতি' তত্ত্ব বুঝিতে পারি। মায়া ব্রহ্মেরই পরাখ্য শক্তি। তাহা পরমেশ্বরের যোগমায়া। ভগবানের এই মায়া অব্যক্তে প্রতিফলিত হইয়া প্রকৃতিরূপে প্রতীয়মান হয়। মায়া গুণময়ী বলিয়া, প্রকৃতিও সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিন গুণযুক্ত হয়, এবং সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবের বিকাশ হয়। এই তিন গুণময় ভাব দ্বারা সমুদায় জগৎ মোহিত হয়। এক অর্থে মায়া ও প্রকৃতি একই। শ্রুতিতে আছে,—

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ।—শ্বেতাশ্বতর

এতদনুসারে মায়াই প্রকৃতি। মায়া কারণরূপ, আর প্রকৃতি তাহার কার্য্যরূপ বা কার্য্যোন্মুখরূপ। মায়া ভগবানের, প্রকৃতিও ভগবানের,—উভয়েই ভগবানের শক্তি। শক্তির দুই অবস্থা, এক—কার্য্যাবস্থা ও আর এক কারণাবস্থা। কারণাবস্থায় এই শক্তি মায়া, আর কার্য্যাবস্থায় ইহা প্রকৃতি। কারণাবস্থায় মায়া-শক্তি রূপে ইহা ভগবান্‌কে আশ্রয় করে; আর কার্য্যাবস্থায় ইহা মায়াশক্তি হইতে প্রকাশিত হইয়া, অব্যক্তাখ্য পরব্রহ্মকে আবৃত করিয়া, সেই আধারেই ব্যক্ত হয়।

এই মায়া দুইরূপ—ইহা আবরণ ও বিক্ষেপাত্মক। আবরণরূপে ইহা যেমন একদিকে জ্ঞানকে অজ্ঞানাবরিত করে, অন্যদিকে সেইরূপ ব্রহ্মকেও তাহার নিকট আবৃত করিয়া প্রকৃতিরূপে তাহাকে দেখায়। আর বিক্ষেপরূপে মায়া প্রকৃতি হইয়া জগৎকে পরিণত করে, ব্রহ্মে এ জগদ্রূপের অধ্যাস করে। জীবসম্বন্ধে এই মায়া মলিন, তাহা অজ্ঞান বা অবিদ্যা। বেদান্তমতে এই মায়া সদসদাত্মিকা। মায়ার স্বতন্ত্র সত্তা নাই। মায়া পরমেশ্বরই শক্তি। শক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ নাই। ব্রহ্মসত্তাতেই এই মায়ার সত্তা।

যাহা হউক, পূর্ব্বে ৪।৬ শ্লোকের ও ৭।১৩ শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই মায়াতত্ত্ব ও প্রকৃতিতত্ত্ব কতক বিবৃত হইয়াছে। পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১৯ প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যায় ইহা আরও বিশেষরূপে বিবৃত হইবে। অতএব এ স্থলে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। এ অধ্যায়ে ঈশ্বর তত্ত্বোপদেশ প্রসঙ্গে ব্রহ্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব ও প্রকৃতিতত্ত্ব এই চারি তত্ত্বই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাই মূল জ্ঞাতব্য তত্ত্ব। এজন্য এই চারিতত্ত্বের পরস্পর সম্বন্ধ কি, তাহাই এস্থলে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। গীতার প্রকৃত অর্থ বুঝিবার ইহাই মূল সূত্র বলিয়া বোধ হয়। এ সকল তত্ত্ব না বুঝিলে, গীতার ঈশ্বরবাদ স্বরূপতঃ বুঝা যাইবে না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই ঈশ্বরতত্ত্ব গীতাতেই প্রথম স্পষ্টভাবে ও 'সমগ্র'রূপে বিবৃত

হইয়াছে। এক অর্থে এই ঈশ্বরবাদ গীতার নিজস্ব। যাহা হউক, সে কথা এ স্থলে আলোচ্য নহে।

শুদ্ধ অদ্বৈতবাদে এই ঈশ্বরতত্ত্ব স্থাপিত হয় না। অদ্বৈতবাদ মতে ব্রহ্মই সত্য, পারমার্থিক ভাবে ঈশ্বর জীব জগৎ—এ সমুদায় মিথ্যা, মায়িক। যে মায়াহেতু রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মে এই জগৎ কল্পিত হয়, অথবা ঈশ্বর জীব ও জগৎ কল্পিত হয়, সে মায়াও মিথ্যা, তাহা ইন্দ্রজালবৎ অলীক। সুতরাং পারমার্থিক অর্থে ঈশ্বর সত্য নহে। একমাত্র ব্রহ্মই পারমার্থিক সত্য। তিনি নির্গুণ, নিরুপাধি, 'নেতি নেতি' বাচ্য—প্রপঞ্চাতীত ইহাই শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত।

বিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদ অনুসারে নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব পারমার্থিক সত্য নহে। ব্রহ্ম সগুণ—অনন্ত কল্যাণ-গুণবিশিষ্ট ঈশ্বর। জীব ও জগৎ সেই ব্রহ্মেরই শরীর। ব্রহ্মের তিন নিত্যভাব—ঈশ্বর, জীব (চিৎ) ও জগৎ (অচিৎ)। সুতরাং রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-অনুসারে পরমেশ্বরই পরম তত্ত্ব—তিনিই বাসুদেব। কোন কোন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী পণ্ডিতের মতে পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের বিভূতি মাত্র। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ন্যায় দ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণের মতে বাসুদেব পরমেশ্বরই পরম তত্ত্ব। ব্রহ্ম শুদ্ধ জীবাত্মাদি আর কিছুই [illegible]হ তাহা পরমেশ্বরের আশ্রিত।

যাহা হউক, বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে নিম্বার্কাচার্য্য যে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ সমন্বয়পূর্ব্বক দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তদনুসারে পরব্রহ্ম এক হইলেও তাঁহার দুই ভাব: এক সগুণ ভাব, আর এক নির্গুণ ভাব। ব্রহ্মের এই দুই ভাব বস্তুতঃ এক, এবং উভয়েই পরমার্থতঃ সত্য। ব্রহ্মের নির্গুণ ভাব অক্ষর; আর সগুণ ভাব ঈশ্বর, জীব ও জগৎ, অথবা ঈশ্বর, চিৎ ও অচিৎ। এই মত অনুসারে গীতার ব্যাখ্যা সর্ব্বত্র যেরূপ সঙ্গত হয়, অন্যমতে সেরূপ হয় না। এজন্য আমরা এই মত প্রধানতঃ গ্রহণ করিয়া গীতা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ স্থলে ব্রহ্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব প্রভৃতি আমরা যেরূপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা অনেকটা এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদের সমর্থক। আমরা বলিতে পারি যে, প্রকৃতিতত্ত্ব দ্বৈতও নহে, অদ্বৈতও নহে। এই উভয় বিরোধী ভাব সামঞ্জস্য করিয়া (এই Thesis ও Antithesis হইতে তাহার সামঞ্জস্য বা মীমাংসা অর্থাৎ Synthesis পূর্ব্বক) উপরের ভূমিতে আরোহণ করিয়া, যে তত্ত্বলাভ হয়, তাহাই প্রকৃত তত্ত্ব। কেবল সগুণ (Immanent) ব্রহ্মবাদ বা কেবল নির্গুণ (Transcendent) ব্রহ্মবাদের পরিবর্ত্তে উভয়বাদের সামঞ্জস্য করিয়া যে পরব্রহ্ম তত্ত্বজ্ঞান, তাহাই পারমার্থিক সত্যজ্ঞান।

স্মৃতিতে আছে,—

> ন দ্বৈতং নাপি চাদ্বৈতং ইত্যেতৎ পারমার্থিকম্।—দক্ষ-সংহিতা।

গীতায় এই পারমার্থিক তত্ত্বই উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতির মধ্যে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এই তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। গীতা অনুসারে ঈশ্বরতত্ত্ব পারমার্থিক সত্য। তাহা কেবল

ব্যাবহারিক বা প্রতিভাসিক সত্য নহে, অথবা পারমার্থিকভাবে মিথ্যা নহে। যাহা পারমার্থিক সত্য নহে, তাহা কোন অবস্থায় স্বয়ং ভগবান্ কাহাকেও উপদেশ দিতে পারেন না। এই ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝা অতি কঠিন। ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কচিৎ কেহ সিদ্ধির জন্য যত্ন করে, তাহাদের মধ্যে কচিৎ কেহ সিদ্ধ হয়। আর সিদ্ধগণের মধ্যে কচিৎ কেহ ঈশ্বরকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারে।

যাহা হউক, এইরূপে সামান্যভাবে আমরা গীতার উক্ত ঈশ্বরতত্ত্ব এ স্থলে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই অধ্যায়ে ঈশ্বরতত্ত্ব যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাও সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে এ অধ্যায়ে ভক্তিতত্ত্ব যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে।

ভক্তিবাদ।—ঈশ্বরে প্রপন্ন হওয়া, ঈশ্বরকে ভজনা করাই ভক্তির লক্ষণ। যাহারা ত্রিগুণময় ভাবের দ্বারা মোহিত, তাহারা ঈশ্বরকে জানিতে পারে না। তাহারা অজ্ঞানী। যাহারা অল্পজ্ঞানী বা অবোধ, তাহারা ঈশ্বরের পরম ভাব জানে না। যাহারা মূঢ়, দুষ্কৃতকারী, নরাধম, আসুরভাবযুক্ত, তাহারা ঈশ্বরে প্রপন্ন হয় না। তবে যাহাদের বিশেষ সুকৃত থাকে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত উৎকট পুণ্য সংস্কার থাকে, তাহারা এ জন্মে অতি পাপকারী হইলেও, যদি সেই সংস্কারের বিকাশ হয়, তবে ঈশ্বরে প্রপন্ন হইতে পারে। যে সকল সুকৃতিসম্পন্ন লোক ঈশ্বরকে ভজনা করে, তাহাদিগকে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। তাহারা আর্ত্ত, অর্থার্থী জিজ্ঞাসু অথবা জ্ঞানী। সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান না হইলে যে ঈশ্বরকে ভজনা করা যায় না, তাহা নহে। এই ভজনার পরিণামে যে সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান লাভ হইতে পারে, তাহা গীতায় উক্ত হইয়াছে।

উক্ত চতুর্ব্বিধ ঈশ্বর-ভজনাকারীর মধ্যে নিত্যযুক্ত এক ভক্তি জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানবান্ বহু জন্ম পরে 'বাসুদেব সর্ব্ব' এই জ্ঞানে সিদ্ধ হইয়া ঈশ্বরে প্রপন্ন হয় ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হয়। যাহারা সকাম, তাহারা সাধারণতঃ আশু-ফললাভ-কামনায় ইন্দ্রাদি অন্য দেবতার যজনা করে, তাহারা ঈশ্বরকে ভজনা করে না। তাহাদের চিত্ত এই কামদ্বারা অভিভূত থাকে। তাহারা যদি আর্ত্ত বা অর্থার্থী হইয়া সুকৃতি-বলে ঈশ্বরকে ভজনা করে, তবে তাহাদের ক্রমে শ্রেয়োমার্গে গতি হয়। অজ্ঞানীর দেব-যজনার দ্বারা যে ফললাভ হয়, তাহা অন্তবৎ বা ক্ষয়শীল, কিন্তু ঈশ্বর-ভজনা দ্বারা তাহারা অক্ষয় ঈশ্বরপ্রাপ্তিরূপ ফললাভ করে। বহু পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা যাহাদের অনাদিকাল-প্রবর্ত্তিত পাপসংস্কার ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহারা সেই হেতু ইচ্ছা-দ্বেষ-সমুদ্ভূত দ্বন্দ্ব মোহ বা অবিদ্যা হইতে মুক্ত হইয়াছে, তাহারাই দৃঢ়ব্রত হইয়া ঈশ্বরকে ভজনা করে। তাহারা মুমুক্ষু হইয়া ঈশ্বরকে আশ্রয়পূর্ব্বক যোগরত হয়, এবং তাহার ফলে সে যোগী সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করে।

এইরূপে গীতার এই অধ্যায়ে ভক্তিতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। যাহা শ্রেষ্ঠ ভক্তি, তাহা জ্ঞানীর ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি—অনন্যচিত্তে ঈশ্বরকে ভজনা, একান্তভাবে ঈশ্বরকে প্রপন্ন হওয়া। জ্ঞানীর এই ঈশ্বর ভজনা—কোন ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বরকে ভজনা নহে। যাহারা

অল্পবুদ্ধি, তাহারাই ঈশ্বরের পরম অব্যয় অনুত্তম ভাব না জানিয়া ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বরকে ভজনা করে। যাঁহারা জ্ঞানী—তাঁহারা 'একত্বে অবস্থিত' হইয়া, সর্ব্ব-ভূতস্থিত পরমাত্মস্বরূপ ঈশ্বরকে ভজনা করেন। তাঁহারা সর্ব্বত্র ঈশ্বরকে দর্শন করেন এবং সকলকে অর্থাৎ এই সমুদায় জীবজড়ময় জগৎকে ঈশ্বরের মধ্যে দর্শন করেন। তাঁহারা সর্ব্বভূতস্থিত পরমাত্মাকে এবং সর্ব্বভূতকে সেই পরমাত্মাতে দর্শন করেন। তাঁহারা "বাসুদেব সর্ব্ব" এ জ্ঞানলাভ করিয়া সেই পরমেশ্বর বাসুদেবে প্রপন্ন হন। ইহাই গীতোক্ত ভক্তিতত্ত্ব। কেবল জ্ঞানীই এই ভক্তি লাভ করিতে পারেন। জ্ঞানীই সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া অর্থাৎ ঈশ্বর বা ব্রহ্ম সর্ব্বভূতে সমভাবে স্থিত—ইহা দর্শন করিয়া, সেই সর্ব্বগত ঈশ্বরে ভক্তিমান্ হইতে পারেন। এই ভক্তির নাম 'পরাভক্তি'। কেবল এই ভক্তিতেই ভগবান্ যাদৃশ ও যাহা, তাহা তত্ত্বতঃ জানা যায়, এবং সেই জ্ঞানলাভ করিয়া ঈশ্বরে প্রবেশ করা যায়।

অতএব এই ভক্তির নাম জ্ঞান পূর্ব্বিকা ভক্তি। ভগবান্ পূর্ব্বে চতুর্ব্বিধ সুকৃতি সম্পন্ন লোক মধ্যে জ্ঞানীর একভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন, এবং সেই এক-ভক্তিমান্ জ্ঞানী তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় এ কথা বলিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই গীতোক্ত ভক্তিকে বাহ্য বলিয়াছেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে রামানন্দ রায়ের সহিত শ্রীচৈতন্য-দেবের কথোপকথন প্রসঙ্গে এই কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু গীতা অনুসারে এই জ্ঞানীর একভক্তি বা পরাভক্তিই শ্রেষ্ঠ ভক্তি; ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কোন ভক্তি হইতে পারে না? ইহাই অহৈতুকী ভক্তি—প্রকৃত নিষ্কাম ভক্তি। আর্ত্ত, অর্থার্থী বা জিজ্ঞাসুর ভক্তি কখন ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। বিষ্ণুপুরাণোক্ত প্রহ্লাদের ভক্তি—এই গীতোক্ত পরাভক্তি। প্রহ্লাদ সর্ব্বভূতে সর্ব্বত্র সর্ব্বব্যাপী ভগবান্‌কে দর্শন করিতেন। "বাসুদেব সর্ব্ব" এই জ্ঞানে তিনি সর্ব্বদা অবস্থিত ছিলেন। তাই স্তম্ভমধ্যে ভগবান্ আছেন, এ কথা দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত তাঁহার পিতাকে বলিয়াছেন, এবং বিষ্ণুকে স্তব করিতে গিয়া, স্বীয় উপাস্যের সহিত তন্ময় হইয়া, আপনাকেই বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বরূপে দেখিয়াছিলেন। তিনি এই ভক্তিসাধনে সিদ্ধ হইয়া ঈশ্বরে যোগযুক্তাত্মা হইয়াছিলেন।

অতএব এই গীতোক্ত জ্ঞানীর পরাভক্তিই শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা মহাত্মা, দৈবী প্রকৃতি আশ্রিত, তাঁহারা ভূতাদি অব্যয় পরমাত্মস্বরূপ ঈশ্বরকে জানিয়া অনন্যমনে তাঁহাকে যে ভজনা করেন, ঈশ্বরের সেই ভজনাই শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা ভগবানের বিভূতি জানেন, তাঁহার বিশ্বরূপ দেখিতে পারেন, যাঁহারা তাঁহার ঐশ্বরীয় যোগতত্ত্ব জানেন, যাঁহারা ঈশ্বরকে সমুদায় জগতের প্রভব এবং ঈশ্বর হইতে সমুদায় প্রবর্ত্তিত হয়, এ তত্ত্ব জানেন, সেই বুধগণই ভাবসমন্বিত হইয়া ভগবান্‌কে ভজনা করেন। তাঁহারা দৃঢ়ব্রত হইয়া ঈশ্বরজ্ঞান লাভ জন্য যত্ন করেন, ঈশ্বর-তত্ত্ব সতত কীর্ত্তন করেন, ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরকে নমস্কার করেন, নিত্যযুক্ত হইয়া তাঁহাকে উপাসনা করেন। তাঁহারা ঈশ্বরগত-চিত্ত

হইয়া ঈশ্বরকে চিন্তা করেন, তাঁহার তত্ত্ব আলোচনা করেন, তাঁহার যাহাতে তুষ্টি হয়, সেই কর্ম্ম করেন, তাঁহাতে রত থাকেন। কেহ বা জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা ঈশ্বরের ভজনা ও উপাসনা করেন, কেহ বা স্বধর্ম্ম-আচরণ দ্বারা তাঁহাকে অর্চনা করেন, কেহ সর্ব্ব কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করেন, অথবা ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করেন। এইরূপে এই ভজনার স্বরূপ কি, প্রকার কি, প্রণালী কি, তাহা পরে উক্ত হইয়াছে ; এস্থলে তাহার আর উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

এই ভক্তিযোগে ভাবসমন্বিত হইয়া ভজনার কথা ও উপাসনার কথা উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ আপনাকে এ জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সুহৃৎ প্রভৃতি বলিয়াছেন। অতএব এই পিতা, মাতা, ভর্ত্তা, সুহৃৎ, প্রভু, প্রভৃতি ভাবে ভগবান্‌কে ভজনা—ভাবসমন্বিত ভজনা। শ্রীভাগবতে ভর্ত্তা, সুহৃৎ, প্রভু, প্রভৃতি সম্বন্ধ হইতে ভগবান্‌কে মধুর সখ্য দাস্য প্রভৃতি ভাবে ভজনা করিবার তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিশেষতঃ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে সেই সকল বিভিন্নভাবে ভজনার তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। সে তত্ত্ব এ স্থলে আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। গীতোক্ত ভক্তিতত্ত্ব বুঝিবার জন্য এস্থলে সে তত্ত্ব আলোচনার বিশেষ আবশ্যকতাও নাই।

গীতায় পরে দ্বাদশ অধ্যায়ে পরাশ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পরমাত্মস্বরূপ ঈশ্বরে মন সম্পূর্ণ সমাবেশিত করিয়া, নিত্যযুক্ত হইয়া, উপাসনার কথা আছে, এবং এইরূপ ঈশ্বরযোগী বা ঈশ্বরোপাসকই যে শ্রেষ্ঠ তাহা উক্ত হইয়াছে। ঐ দ্বাদশ অধ্যায়ে ঈশ্বরের উপাসনা-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে এবং ভগবানের প্রিয় ভক্ত কে, তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে। সে স্থলে ভগবান্ ভক্তের প্রকৃত স্বরূপ যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতেও এই ভক্তির লক্ষণ বুঝা যায়। সে কথা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

যাহা হউক এইরূপে এই সপ্তম অধ্যায়ে ঈশ্বরতত্ত্ব ও ভক্তিযোগ সম্বন্ধে উপদেশ আরম্ভ হইয়াছে, এবং তাহা পরবর্ত্তী অষ্টম হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। গীতার এই দ্বিতীয় ষট্‌ক বুঝিবার জন্য যে মূলতত্ত্ব বা যে মূল-সূত্রগুলি জানা আবশ্যক, তাহাই এস্থলে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

স্তোত্র।

(হরিবংশ অবলম্বনে রচিত)

(১)

হে ভূতেশ দেবদেব জগতের পতি।
হে ভূত-ভাবন ওহে অগতির গতি ॥
হে অনন্ত আদিদেব জগৎ-নিবাস!
পরম পুরুষ তুমি বিশ্ব-পরকাশ ॥
তুমি জ্ঞেয়, তুমি জ্ঞাতা, তুমি বায়ু, যম।
তুমিই বরুণ, অগ্নি, তুমি অনুপম ॥
তুমি চন্দ্র, তুমি সূর্য্য, তুমিই তারকা।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা তুমি একা ॥
প্রণাম পরম পিতা চরণে তোমার।
অধম তনয়া বলি' করহে উদ্ধার ॥

(২)

তুমি চিন্তা, ধ্যান, জ্ঞান, তুমিই আশ্রয়।
তোমাতে উৎপত্তি সব তোমাতেই লয় ॥
তুমি পিতা, ভ্রাতা, মাতা, তুমি ইষ্টদেব।
তুমিই আরাধ্য মাত্র, দেব মহাদেব ॥
বিশ্বম্ভর বিশ্বমূর্ত্তি অজেয় অজিত।
চরাচর ব্যাপ্ত দিব্য বিভূতিলাঞ্ছিত ॥
তুমি বুদ্ধি, তুমি মন, সত্য, ক্ষমা, ধৃতি।
তুমিই শরণ, তুমি মেধা, বাণী, স্মৃতি ॥
প্রণাম পরম পিতা চরণে তোমার।
অধম তনয়া বলি' করহে উদ্ধার ॥

(৩

অচিন্ত্য অব্যক্ত চিৎ নিত্য সত্য তুমি।
বাক্য-মন-অগোচর, তেজ বায়ু ভূমি ॥
শাশ্বত পুরুষ তুমি, তুমি সূক্ষ্ম স্থূল।
তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সকলের মূল ॥

তুমি মন্ত্র, তুমি জপ, তুমি হব্য, হোতা।
জগৎ প্রপঞ্চ তুমি পরম বিধাতা ॥
গুণাতীত নিরাকার অক্ষর অব্যয়।
বিশ্বের নিদান তুমি নিত্য তেজোময় ॥
প্রণাম পরম পিতা চরণে তোমার।
অধম তনয়া বলি' করহে উদ্ধার ॥

(২)

আকাশ মস্তক তব, বাহু দিক্‌চয়।
ধরাতল পাদযুগ, দেহ দেবময় ॥
চন্দ্র সূর্য্য চক্ষু তব, তপ সত্য বল।
অগ্নি তেজ, বায়ু শ্বাস, স্বেদ তব জল ॥
বিরাট্ পুরুষ তুমি বিরাট্ আকার।
পুনঃ সূক্ষ্ম রূপে সত্তা জীব মূলাধার ॥
সংসার মায়ায় মুগ্ধা মূঢ়া হীনা নারী।
শকতি কি তব স্তব করিবারে পারি ॥
প্রণাম পরম পিতা চরণে তোমার।
অধম তনয়া বলি' করহে উদ্ধার ॥

শ্রীমতী শশিপ্রভা দাসী।

সমস্যা।

মরণের পরপারে কি আছে কোথায়,
জানি না মানব মোরা নিতান্ত অজ্ঞান ;
অস্ফুট একটী রেখা অদৃষ্টের প্রায়,
বিরাজে নেত্রের পরে মৃণাল সমান।
দেখিতে বুঝিতে তাহা চলে গেল দিন,
শমন শিয়রে আসি দাঁড়াল যখন,
কিছু না বুঝিতে পারি হনু জ্ঞানহীন।
পুন সংজ্ঞা পেয়ে বুঝি হয়েছে মরণ ॥
মরিয়া মরণে আমি পাইনু দেখিতে।
জীবন স্বপন সম ভাঙ্গিল চকিতে।
ভেদ মাত্র নাহি হেরি জীবনে মরণে,
বিষম সমস্যা ইহা বুঝি গো কেমনে।

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

যোগশিখা-উপনিষদ্।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

একস্তম্ভে নবদ্বারে ত্রিস্থূণে পঞ্চদৈবতে।
ঈদৃশে তু শরীরে বা মতিমানুপলক্ষয়েৎ ॥
আদিত্যমণ্ডলং দিব্যং রশ্মিজ্বালাসমাকুলম্ ॥৪॥

অন্বয়—একস্তম্ভে (একঃ স্তম্ভঃ মেরুদণ্ডঃ যস্য তাদৃশে) নবদ্বারে, ত্রিস্থূণে (ত্রিস্রঃ স্থূণাঃ ঈড়াপিঙ্গলাসুষুম্নাখ্যাঃ যস্য তাদৃশে), পঞ্চদৈবতে (পঞ্চ দেবতা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্র্যঃ যস্য তাদৃশে), ঈদৃশে তু শরীরে বা মতিমান্ (যোগী) উপলক্ষয়েৎ। কিং উপলক্ষয়েৎ ? রশ্মিজ্বালা-সমাকুলম্ দিব্যং আদিত্যমণ্ডলং।

অনুবাদ—এই যে একস্তম্ভ, নবদ্বার, ত্রিস্থূণ এবং পঞ্চদৈবত শরীর, এই শরীরে মতিমান্ যোগী রশ্মিজ্বালাসমাকুল দিব্য আদিত্যমণ্ডল দর্শন করিবেন।

ব্যাখ্যা - তৃতীয় শ্লোকে উপনিষদ্ যোগ-সিদ্ধির জন্য যোগীকে হৃদয়ে পরমাত্মার ধ্যান করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

ধ্যায়েত সততং প্রাজ্ঞঃ হৃৎকৃত্বা পরমেষ্ঠিনম্।

এই চতুর্থ শ্লোকে যোগ সাধনার অন্যবিধ উপায় উপদিষ্ট হইতেছে। সে উপায় শরীরের মধ্যে জ্যোতির্ম্মণ্ডল ভাবনা করা এবং সেই মণ্ডলের মধ্যে দীপ-কলিকার ন্যায় অবস্থিত 'অঙ্গুষ্ঠ মাত্র' পুরুষের চিন্তা করা।

প্রথমতঃ শরীরের কিছু পরিচয় দিতেছেন। শরীর একস্তম্ভ, নবদ্বার, ত্রিস্থূণ এবং পঞ্চদৈবত। শরীরের একটী সাধারণ নাম পুর। পুরুষ এই পুরীতে বসতি করেন বলিয়া ইহার নাম পুর। এই পুরের নয়টি দ্বার বা রন্ধ্র—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ প্রভৃতি। গীতাও বলিয়াছেন,—"নবদ্বারে পুরে দেহী"। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তেবহিঃ।—৩।৩।১৮

"জীবরূপী হংস এই নবদ্বার পুরে ক্রীড়া করে"। এই শরীররূপ পুর একটী স্তম্ভের উপর নির্ম্মিত। সে স্তম্ভ অন্য কিছু নয়—আমাদের মেরুদণ্ড (Spinal column) এবং ইহা তিনটী স্থূণার (দণ্ডের) উপর প্রতিষ্ঠিত; ইহাদিগের নাম,—ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। মেরুদণ্ডের মধ্যে এই তিনটী সূক্ষ্ম প্রণালী আছে, তাহার অভ্যন্তরে প্রাণের গতাগতি হয় এবং তদ্দ্বারাই শরীর বিধৃত থাকে। পুনশ্চ এই শরীর পঞ্চদেবতার দ্বারা রক্ষিত। ইহারা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ অধিষ্ঠাতা দেবতা। এই পঞ্চ দেবতার ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃত্ব, এইরূপে ঐতরেয় উপনিষদ্ বর্ণন করিয়াছেন,—

বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশদাদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বাক্ষিণী প্রাবিশদ্দিশঃ শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণৌ প্রাবিশন্নোষধিবনস্পতযো লোমানি ভূত্বা ত্বচং প্রাবিশন্।—১।২।৪

অর্থাৎ "বায়ু প্রাণরূপে নাসিকায় প্রবেশ করিলেন, আদিত্য চক্ষুরূপে অক্ষিতে প্রবেশ করিলেন, দিক্ শ্রোত্ররূপে কর্ণে প্রবেশ করিলেন, ওষধি-বনস্পতি লোমরূপে ত্বকে প্রবেশ করিলেন, ইত্যাদি"।

এই যে শরীররূপ ব্রহ্মপুর, যেখানে মতিমান্ যোগী ব্রহ্ম চিন্তা করিবেন, সেই ধ্যানের প্রকার এই চতুর্থ শ্লোকে ও পরবর্ত্তী পঞ্চম শ্লোকে উপদিষ্ট হইয়াছে।

নাভির দশাঙ্গুলি-উপরিস্থ যে স্থান, যোগের ভাষায় তাহাকে হৃদয় বলে। সেই স্থানে আকাশ বা অবকাশ কল্পনা করিয়া তাহার মধ্যে আদিত্যবর্ণাভ জ্যোতির্ম্মণ্ডল কল্পনা করিতে হইবে। মনে করিতে হইবে যে, হৃদয়ের সেই অবকাশ যেন দীপ্ত পীতাভ কিরণ-মণ্ডলে পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং তাহার মধ্যস্থলে দীপকলিকার ন্যায় ভাস্বর অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষের ভাবনা করিতে হইবে। এইরূপ ভাবনা যোগসিদ্ধির একটী সুগম অথচ অমোঘ উপায়। উপনিষদ্ এখানে তাহার ইঙ্গিত মাত্র করিলেন; কিন্তু যাঁহারা এই প্রণালীর যোগসম্বন্ধে দীক্ষালাভ করিয়াছেন, এই ইঙ্গিত তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট। প্রাচীন শাস্ত্রকার-দিগের রীতিই এই। তাঁহারা সমস্ত কথা গ্রন্থে নিবদ্ধ করেন নাই; কতক অংশ প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন। ক্রিয়াক্ষেত্রে অবতীর্ণ ব্যক্তি সেই সকল প্রচ্ছন্ন অংশ গুরুর মুখে অবগত হন। ম্যাডাম্ ব্লাভাট্স্কি সেইজন্য বলিতেন যে, হিন্দুশাস্ত্রে অনেক blinds আছে; সাধক ভিন্ন অপরে তাহার মর্ম্ম ভেদ করিতে পারেন না।

তস্য মধ্যে গতো বহ্নিঃ প্রজ্বলেদ্ দীপবর্ত্তিবৎ।
দীপশিখায়াঃ যা মাত্রা সা মাত্রা পরমেষ্ঠিনঃ ॥৫

অন্বয়,—তস্য (আদিত্যমণ্ডলস্য) মধ্যে গতঃ (প্রবিষ্টঃ) বহ্নিঃ দীপবর্ত্তিবৎ প্রজ্বলেৎ। দীপশিখায়াঃ যা মাত্রা সা পরমেষ্ঠিনঃ (হার্দ্দ পুরুষস্য) মাত্রা (পরিমাণং)।

অনুবাদ—তাহার মধ্যগত বহ্নি যেন দীপশিখার ন্যায় দীপ্তিমান্। দীপশিখার যে পরিমাণ, দেহগত পরমাত্মারও সেই পরিমাণ।

ব্যাখ্যা—হৃদয়ের মধ্যে কল্পিত জ্যোতির্ম্মণ্ডল মধ্যে দীপকলিকাবৎ পরমাত্মার রূপ কিরূপে ধ্যান করিতে হইবে—এই শ্লোকে তাহাই উপদিষ্ট হইতেছে। উপনিষদ্ বলিতেছেন যে, দীপশিখার যে পরিমাণ, পরমাত্মারও সেই পরিমাণ। বলা বাহুল্য যে, নিরাকার ব্রহ্মের কোনরূপ পরিমাণ নির্দ্দেশ সম্ভবপর নহে; তবে ধ্যানের স্থান উপলক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। সে পরিমাণ কিরূপ? দীপশিখার যে পরিমাণ, হৃদয়স্থিত ব্রহ্মের (যাঁহাকে 'হার্দ্দপুরুষ' বলে) সেই পরিমাণ অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ। উপনিষদ্ অন্যত্র বলিয়াছেন,—

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।

সেইজন্য তাঁহাকে 'বামন' বলা হয়। এই বামনকে যাঁহারা দর্শন করেন, তাঁহাদের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

মধ্যে বামনমাসীনং সর্ব্বে দেবা উপাসতে।—কঠ-উপনিষদ্।

এই হৃদয়কে উপনিষদ্ স্থানে স্থানে গুহা বলিয়াছেন,—"গুহাহিতম্ গহ্বরেষ্ঠম্ পুরাণং"। কোথাও বা ইহার নাম পুণ্ডরীক বা হৃৎপদ্ম,—

পদ্মকোশ প্রতীকাশং সুষিরঞ্চাপ্যধোমুখম্।
হৃদয়ং তদ্‌বিজানীয়াদ্ বিশ্বস্যায়তনং মহৎ॥—ব্রহ্মোপনিষৎ, ৪০।
হৃৎপুণ্ডরীকং বিরজং বিশুদ্ধং বিচিন্ত্য মধ্যে বিশদং বিশোকম্॥—কৈবল্য, ১।৫

কোথাও কোথাও ইহাকে হিরণ্ময় কোষ বলা হইয়াছে। এই কোষকে লক্ষ্য করিয়া নারায়ণ উপনিষদ্ এইরূপ বলিয়াছেন,—

নীলতোয়দমধ্যস্থা বিদ্যুল্লেখেব ভাস্বরা।
নীবারশূকবৎ তন্বী পীতা ভাস্বত্যণূপমা॥

এই কোষ অতি সূক্ষ্ম, নবজাতধান্যের অগ্রভাগের ন্যায় সূক্ষ্ম, বিদ্যুতের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়। ইহার মধ্যে পরমাত্মা অবস্থান করেন।

তস্যাঃ শিখায়া মধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিতঃ।

মৈত্রায়ণী উপনিষদ্ও এই মর্ম্মে বলিয়াছেন,—

হৃদ্যাকাশময়ং কোশম্ আনন্দং পরমালয়ম্। ১।৮।৭

নারায়ণ উপনিষদেরও উপদেশ এই,—

দহ্রং বিপাপং পরবেশ্মভূতং যৎপুণ্ডরীকং পুরমধ্যসংস্থম্।
তত্রাপি দহ্রং গগনং বিশোকস্তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্॥ ১১।৩

অর্থাৎ "দেহরূপ পুরের মধ্যে একটী অতি ক্ষুদ্র পুণ্ডরীক বিরাজিত আছে। সেই পুণ্ডরীকে যে পরম-দেবতা শোকহীন পাপহীন গগন-সদৃশ অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাকে উপাসনা করিতে হইবে।"

এই পরম-দেবতাই ব্রহ্ম এবং সেইজন্য দেহকে ব্রহ্মপুর বলে। এ সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদের উপদেশ এইরূপ,—

অথ যদিদম্ অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরোঽস্মিন্ অন্তর আকাশঃ। তস্মিন্ যদন্তঃ তদ্ অন্বেষ্টব্যং তদ্ বিজিজ্ঞাসিতব্যম্। ৮।১।১

"এই ব্রহ্মপুরে (দেহে) ক্ষুদ্র পুণ্ডরীকরূপ এক গৃহ আছে; তথায় ক্ষুদ্র অন্তর আকাশ বিরাজিত। তাহাতে যাহা অন্তর্গত, তাহার অন্বেষণ করা, তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।"

ভিন্দন্তি যোগিনঃ সূর্য্যং যোগাভ্যাসেন বৈ পুনঃ
দ্বিতীয়ং সুষুম্নাদ্বারং পরিশুদ্ধং বিসর্পতি।
কপালসংপুটং ভিত্ত্বা ততঃ পশ্যন্তি তৎপরম্॥ ৬

অন্বয়,—যোগিনঃ যোগাভ্যাসেন বৈ পুনঃ সূর্য্যং (সূর্য্য নাড়ীং) প্রথমং ভিন্দন্তি। ততঃ পরিশুদ্ধং সুষুম্নাদ্বারং দ্বিতীয়ং বিসর্পতি। ততঃ কপালসংপুটং (ব্রহ্মরন্ধ্রং) ভিত্ত্বা তৎ পরম্ (পরতত্ত্বম্) পশ্যন্তি।

অনুবাদ—যোগীরা যোগাভ্যাসের দ্বারা প্রথমতঃ সূর্য্যনাড়ী ভেদ করেন। অনন্তর বিশুদ্ধ সুষুম্নাদ্বারে উপস্থিত হন। তাহার পর ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া সেই পরমতত্ত্ব সাক্ষাৎ করেন।

ব্যাখ্যা—এইরূপে যোগী যোগ বিষয়ে পরিপক্ক হইলে কিরূপে সুষুম্নামার্গে উত্থিত হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া পরমজ্যোতিঃ দর্শন করেন, উপনিষদ্ এই শ্লোকে তাহাই বর্ণন করিতেছেন। যোগী যোগাভ্যাসের দ্বারা মূলাধার প্রভৃতি নিম্নতর চক্রসকল ভেদ করিয়া প্রথমে সূর্য্যনাড়ী (পিঙ্গলা) ভেদ করেন। মেরুদণ্ডের মধ্যে যে তিনটী অতি সূক্ষ্ম প্রণালী আছে, তাহাদিগের নাম ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না ; মধ্যভাগে সুষুম্না এবং বামে ও দক্ষিণে ঈড়া ও পিঙ্গলা। এই দুই নাড়ীকে যোগের পরিভাষায় চন্দ্র নাড়ী ও সূর্য্য নাড়ী বলে। শাণ্ডিল্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন, ঈড়া নাড়ীতে চন্দ্র এবং পিঙ্গলা নাড়ীতে সূর্য্য বিচরণ করেন। যোগী প্রথমতঃ সূর্য্যনাড়ী (পিঙ্গলা) ভেদ করিয়া সুষুম্না দ্বার অর্থাৎ যেখানে সুষুম্না ব্রহ্মরন্ধ্র বা সহস্রারকে (pineal glandকে) স্পর্শ করিয়াছে, সেই স্থানে উপনীত হইবেন। পরে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া পরমজ্যোতিঃ দর্শন করিবেন।* এই সুষুম্নামার্গ ভেদের ফল বর্ণন করিয়া কঠ উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যঃ
তাসাং মূর্দ্ধানম্ অভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্দ্ধ্বমায়ন্ অমৃতত্বমেতি॥

অর্থাৎ "হৃদয় হইতে ১০১ নাড়ী উত্থিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটী নাড়ী (সুষুম্না) ব্রহ্মরন্ধ্রের পথে গিয়াছে। (উপনিষদের ভাষায় এই সুষুম্নার নাম হিতা বা পুরীতত্তী)। সেই নাড়ী দিয়া যিনি ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করেন, তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন।" উপনিষদে এই ব্রহ্মরন্ধ্রকে বিদৃতি বলা হইয়াছে,—

স এতমেব সীমানং বিদার্য্যৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত। সৈষা বিদৃতির্নাম। ঐত, ৩।১২।

এই সুষুম্নামার্গে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদকারী যোগীকে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মসূত্রে বলিয়াছেন,—

তদোকোঽগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারো হার্দ্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া ৪।২।১৭।

* মূলে আছে "ভিন্দন্তি যোগিনঃ সূর্য্যম্।" আমি "সূর্য্য" অর্থে "সূর্য্যনাড়ী" বুঝিয়াছি ; কিন্তু দীপিকাকার নারায়ণ "সূর্য্য" অর্থে "সহস্র দলস্থম্ অধিদৈবতম্ আদিত্যম্" বুঝিয়াছেন। নারায়ণ আরও বলেন যে,সুষুম্নার দুইটী দ্বার আছে—পূর্ব্বদ্বার ও পশ্চিমদ্বার ; পূর্ব্বদ্বার কর্ম্মমার্গ এবং পশ্চিমদ্বার যোগমার্গ। এখানে উপনিষদ্ সুষুম্নার পশ্চিম দ্বার লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রমাণ স্বরূপ নারায়ণ বলিতেছেন "উক্তং চ স্বাত্মারামেণ—" "পূরয়েন্মারুতং দিব্যং সুষুম্না পশ্চিমে মুখে" ইতি।

"বিদ্বান্ সাধকের ব্রহ্মাগার (হৃদয়) উজ্জ্বলিত হয়। সেই উজ্জ্বলনে তিনি (নির্গমন) দ্বার দেখিতে পান এবং শতাধিক নাড়ী (সুষুম্নামার্গে) 'হার্দ্দানুগৃহীত' সাধক নিষ্ক্রান্ত হন।"

হার্দ্দানুগৃহীতঃ—হৃদয়ালয়েন ব্রহ্মণা সমুপাসিতেন অনুগৃহীতঃ।—শঙ্কর।

অর্থাৎ এইরূপ সাধকের প্রতি হৃদিস্থিত উপাসিত ভগবানের অনুগ্রহ হয়। এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া খেচরী তন্ত্র বলিতেছেন,—

মনসা সহ বাগীশ্যা ভিত্বা ব্রহ্মার্গলং ক্ষণাৎ॥

পরামৃতমহাম্ভোধৌ বিশ্রান্তিং তত্রকারয়েৎ॥

অর্থাৎ "ব্রহ্মরন্ধ্র (সহস্রার) ভেদ করিলে যোগী পরম অমৃতসিন্ধু ভগবানে বিশ্রামলাভ করেন।"

অথ ন ধ্যায়য়েজ্জন্তুরালস্যাচ্চ প্রমাদতঃ।

যদি ত্রিকালমাবর্ত্তেৎ স গচ্ছেৎ পরমং পদম্॥ ৭

অন্বয়,—অথ জন্তুঃ (দেহী) আলস্যাৎ প্রমাদতঃ বা যদি ন ধ্যায়েৎ (ধ্যানং কুর্য্যাৎ); তর্হি যদি (এতৎ গ্রন্থং) ত্রিকালং (ত্রিসন্ধ্যম্) আবর্ত্তেৎ (আবৃত্তিং কুর্য্যাৎ), তদা স পরমং পদং গচ্ছেৎ।

অনুবাদ—যদি জীব আলস্য বা প্রমাদ বশতঃ সেইরূপ ধ্যান করিতে না পারে, তবে সে যদি ত্রিসন্ধ্যা এই গ্রন্থের আবৃত্তি করে, তবে পরম পদ প্রাপ্ত হয়।

ব্যাখ্যা—সাধক যতদিন না যোগসিদ্ধ হইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিতে নিশ্চল হয়েন, ততদিন তাঁহার ব্যুত্থানদশা অবশ্যম্ভাবী। এই অবস্থায় চিত্ত—যাহা ত্রিগুণাত্মক ("চিত্তং হি প্রখ্যা-প্রবৃত্তি স্থিতিশীলত্বাৎ ত্রিগুণং" ব্যাসভাষ্য) সময়ে সময়ে তমোগুণের অধীন হয়। তমো-গুণের ধর্ম্ম আলস্য ও প্রমাদ। যোগীর চিত্ত যখন এইরূপে তমোগুণের দ্বারা অনুবিদ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রমাদ ও আলস্যপর করিবে, যখন তিনি ধ্যান করিতে অসমর্থ হইবেন, উপনিষদ্ সেই অবস্থার ব্যবস্থা করিতেছেন। উপনিষদ্ বলিতেছেন, সে অবস্থায় সাধক যেন ত্রিসন্ধ্যা এই উপনিষদ্ গ্রন্থের আবৃত্তি করেন। শাস্ত্রকারেরা আবৃত্তিকে অর্থবোধের অপেক্ষাও গরীয়সী বলিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, উপনিষদাদি মন্ত্রশাস্ত্র এমন শব্দ ক্রমে গ্রথিত এবং এরূপ স্বর-ব্যঞ্জনে সজ্জিত, যে তাহার আবৃত্তির ফলে চিত্তের ক্ষোভ স্থগিত হয়, মন বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল হয় এবং তমোগুণ ও রজোগুণ সাময়িক ভাবে অভিভূত হইয়া সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয়। সেই জন্যই উপনিষদ্ ত্রিসন্ধ্যা আবৃত্তি করিবার উপদেশ দিলেন "ত্রিকালমাবর্ত্তয়েৎ।" যোগের প্রধান শত্রু প্রমাদ ও আলস্য; সেই শত্রুদমনের সহজ উপায় মন্ত্রশাস্ত্রের আবৃত্তি বা 'পারায়ণ' করা। উপনিষদ্ সাধককে উৎসাহিত করিয়া বলিলেন, এরূপ করিলে যোগী পরমপদ লাভ করিবেন।

পুণ্যমেতৎসমাসাদ্য সংক্ষেপাৎকথিতং ময়া

লব্ধযোগেন বোদ্ধব্যং প্রসন্নং পরমেষ্ঠিণম্॥৮

অন্বয়—পুণ্যম্ এতৎ (যোগতত্ত্বং) সমাসাদ্য (প্রাপ্য) ময়া সঙ্ক্ষেপাৎ কথিতং। প্রসন্নং পরমেষ্ঠিনম্ (প্রাপ্য) লব্ধযোগেন (শিষ্যেণ) বোদ্ধব্যং। (ন অন্যেন)।

অনুবাদ—এই পুণ্য যোগতত্ত্ব লাভ করিয়া আমি ইহা সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। পরমাত্মার প্রসাদে লব্ধযোগ ব্যক্তির ইহা বোধগম্য হইবে (অপরের নহে)।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্বশ্লোকে আবৃত্তির কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু আবৃত্তিই অর্থবোধের পক্ষে যথেষ্ট নহে। উপনিষৎকার ঋষি বলিতেছেন,—এই পবিত্র যোগতত্ত্ব সাধনার ফলে লাভ করিয়া জগতের কল্যাণের জন্য আমি প্রচার করিলাম। ইহার সমগ্র অর্থ উদ্‌ঘাটন করিতে হইলে শিষ্যকে 'লব্ধযোগ' হইতে হইবে এবং যোগমার্গে স্থিতিলাভ করিয়া পরমাত্মার প্রসাদ লাভ করিতে হইবে। এই কথা আমরা পূর্ব্বশ্লোকের আলোচনায় ব্রহ্মসূত্র উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছি "হার্দ্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া"—হৃদিস্থিত ভগবান্ উপাসিত হইয়া যখন সাধকের প্রতি প্রসন্ন হইবেন এবং সাধকের প্রতি অনুগ্রহ করিবেন, তখনই সাধক এই যোগতত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

জন্মান্তরসহস্রেষু যদা নাশ্নাতি কিল্বিষম্
তদা পশ্যন্তি যোগেন সংসারচ্ছেদনং পরং
সংসারচ্ছেদনং পরমিতি ॥ ৯ ॥

অন্বয়,—জন্মান্তরসহস্রেষু (বহুনাং জন্মনাং অন্তে) যদা জীবঃ কিল্বিষং (পাপং) ন অশ্নাতি (বিশুদ্ধাত্মা ভবতি), তদা যোগেন সংসারচ্ছেদনং পরং (ব্রহ্ম) পশ্যন্তি। (দ্বিরুক্তিঃ গ্রন্থসমাপ্ত্যর্থা)।

অনুবাদ—বহু জন্ম অন্তরে যখন জীব বিশুদ্ধ হয়েন, তখন যোগের দ্বারা সংসারচ্ছেদন পরব্রহ্মকে দর্শন করেন।

ব্যাখ্যা—কিন্তু পরমাত্মাকে প্রসন্ন করিয়া যোগে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া এক জন্মের সাধনার কার্য্য নহে, তাহার জন্য জন্মান্তর-সহস্রব্যাপী সাধনা করিতে হয়। যোগীর উদ্দেশ্য সম্যক্ প্রকারে চিত্ত নিরুদ্ধ করিয়া জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া। কিন্তু এই চিত্ত অনাদি বাসনায় অনুবিদ্ধ,—

অনাদি বাসনানুবিদ্ধম্ ইদং চিত্তং।—ব্যাস ভাষ্য।

সংস্কাররূপে রাগ, দ্বেষ, কামনা, ভাবনা চিত্তের সহিত জড়িত হইয়া চিত্তকে মলিন, অশুদ্ধ কি ষবযুক্ত করিয়াছে। বহুজন্মব্যাপী সাধনার দ্বারা এই চিত্তমল ক্ষালিত করিতে হইবে। বাসনা-কষায় চিত্ত এইরূপে যখন স্বচ্ছ হইবে, তখনই চিত্তশুদ্ধি যোগীর আয়ত্ত হইবে। তখন চিত্তের স্বাভাবিক পাপ-প্রবণতা একেবারে বিদূরিত হইবে; তখনই প্রকৃত যোগের আরম্ভ। উপনিষদ্ এখানে এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিলেন,—"যদা নাশ্নাতি কিল্বিষং"। উপনিষদ্ অন্যত্রও বলিয়াছেন,—"নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ"। সাধন-মন্দিরের এই প্রথম সোপান। সেইজন্য পতঞ্জলি যোগীকে প্রথমতঃ যম নিয়মের

অভ্যাস করাইয়া (যম-নিয়মের মধ্যে সমস্ত নৈতিক গুণ অন্তর্ভুক্ত), পরে আসন-প্রাণায়ামের উপদেশ করিয়াছেন। এইরূপে সহস্র সহস্র জন্মের পর যখন যোগী নিষ্পাপ এবং যোগপূত হয়েন, তখনই তাঁহার সংসারচ্ছেদন ব্রহ্ম বস্তুর সাক্ষাৎকার হয়। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন,—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।

অর্থাৎ "বহু বহু জন্মের অন্তে জ্ঞানবান্ ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন। তখন তিনি দেখেন যে, সমস্তই ভগবান্। এরূপ মহাত্মা সুদুর্লভ"।

ভগবানের সাক্ষাৎ হইলে যে সংসারের বারণ হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। উপনিষদ্ ভূয়ঃ ভূয়ঃ এই উপদেশ দিয়াছেন,—

"জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ"

"সেই পরমদেবতাকে জানিলে সমস্ত মায়াপাশ ছিন্ন হইয়া যায়।"

তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

"তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যু উত্তীর্ণ হওয়া যায়। সংসার তরণের আর অন্য উপায় নাই।"

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

"সেই পরাৎপর পরমাত্মাকে দর্শন করিলে সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যায়।"

যোগশিখা-উপনিষদ্ সম্পূর্ণ।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

দ্বৈতপ্রপঞ্চ বিবেক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট পদার্থ সকল জীব দ্বারা পুনঃসৃষ্টির সম্ভব না হইলেও জীব আপন বুদ্ধিবলে তাহাতে ভোগত্ব স্থাপন করিয়াছে। স্ত্রীমূর্ত্তির আকার প্রকারে কোন ভেদ না থাকিলেও এক রমণীই মাতা, মাতামহী, ভগ্নী, ভাগিনেয়ী, বধূ, ননন্দা ইত্যাদি সম্বন্ধযুক্ত। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, জীবসৃষ্ট ভোগ্য এ কথা কিরূপে সম্ভব হয়? উত্তরে বলা হইয়াছে, বাহ্য গঠনপ্রণালীতে ভেদ না হইলেও অন্তঃকরণ বৃত্তিহেতু নানা আকারে কল্পিত হয়। বাহ্যবস্তু দুইভাগে বিভক্ত; পাঞ্চভৌতিক ও মনোময়। বাহ্যবস্তুর মনোময়ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার আবশ্যক। জীবের স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রৎ বস্তু মনোময়রূপে প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু জাগ্রদাবস্থায় বুদ্ধিবৈপরীত্যের কারণ কি? বিবেচনা করিতে হইবে, সূর্য্য স্বপ্রকাশ—স্বপ্রকাশ পদার্থ অন্য কর্ত্তৃক প্রকাশের অপেক্ষা রাখে না। স্বপ্রকাশ বস্তু যে পদার্থকে যখন প্রকাশিত করে, সে তদাকারই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সূর্য্যকিরণ যে বস্তুর উপর পতিত হয়, তখন তাহা তদাকারই প্রাপ্ত হয়; এই হিসাবে বাহ্যবস্তুর প্রতি অন্তঃকরণ সংযুক্ত হইলে জীবচৈতন্যবলে বাহ্যপদার্থ সেই সেই আকারেই অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হয়। এই কারণেই বাহ্যবস্তুর মনোময়ত্ব সম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে। ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার এ বিষয়ে যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা দৃষ্টি করিলেই চলিতে পারে। নেত্রাদি ইন্দ্রিয় সমূহ গৃহের গবাক্ষের ন্যায়; অন্তঃকরণ-শক্তিবলেই উক্ত ইন্দ্রিয়গবাক্ষে বাহ্যবস্তুর নামরূপ পতিত হইয়া থাকে। তরল পদার্থ ছাঁচে ঢালিলে যেমন ছাঁচের আকারে আকারিত হয়, তদ্রূপ বুদ্ধিস্থ প্রমাতৃচৈতন্য অন্তঃকরণ বৃত্তির ছাঁচ স্বরূপ; আভাস-সত্তা মরুজলের ন্যায় বস্তুর স্বরূপ জ্ঞানে অন্তর্হিত হইয়া যায়। এই সমস্ত কারণে বুঝিতে পারা যায় যে, ভৌতিক ও মনোময় এই দুই প্রকার বিভেদে জীব ও ঈশ্বরের কার্য্য বিদ্যমান আছে। মৃণ্ময় ঘট ঈশ্বরসৃষ্ট, আর মনোময় ঘট জীব-সৃষ্ট। বাহ্যঘট চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞেয়—আর মনোময় ঘট সাক্ষীচৈতন্য-প্রকাশিত। এখন দর্শনের অন্বয়ব্যতিরেক দ্বারা জানা যাইতেছে যে, মনোময় বস্তু সকলই জীবের বন্ধনের কারণ। যাহার বিদ্যমানে লাভের জন্য যত্ন ও অবিদ্যমানে দুঃখানুভব হয়, এমন পদার্থ বন্ধনকারণ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—জীবের এই অবস্থাত্রয়ের কোন অবস্থাই বন্ধনশূন্য নহে। সুষুপ্তিতে বন্ধনের কারণ মনোময় প্রপঞ্চ না থাকিলেও সূক্ষ্ম বাসনা বীজরূপে নিহিত থাকে, ইহা আচার্য্যগণ বলিয়া গিয়াছেন। অতএব মনোময় জগৎ যে বন্ধনের কারণ, তাহাতে সংশয় নাই।

বিদ্যারণ্য মুনি বাহ্যজগৎকে নষ্ট করেন নাই। তিনি বেদান্তসম্মত নানা প্রমাণ দ্বারা ইহার যথার্থ স্বরূপ প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন। বাহ্যপ্রপঞ্চ থাকিতেই বা ক্ষতি কি? আমি যদি তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিয়া চলিতে পারি, তবে তাহা থাকাই মঙ্গলের নিদান। বিচার দ্বারা ইহার নশ্বরতা হৃদয়ঙ্গম হইলেই যথেষ্ট। যতদিন পর্য্যন্ত এই মনোময় দ্বৈত-প্রপঞ্চ জীবহৃদয় হইতে অপসৃত না হয়, ততদিন জীব আত্মজ্ঞানের দুরারোহ সোপানে অধিরোহণ করিতে সক্ষম হয় না। পুনঃ পুনঃ বিচারই ইহার একমাত্র নিবারণোপযোগী ঔষধ। ইহাতেও যদি অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞান না হয়, তবে নিদিধ্যাসন কর। মনোনিরোধাত্মক যোগাভ্যাস দ্বারা পরমপদে স্থিতিলাভ করিতে পারিলে প্রপঞ্চ আপনাপনি বাধিত হইবে ও জন্ম মরণরূপ সংসার-দাহও নিবৃত্তি পাইবে।

পরমাত্মার সহিত অভেদরূপ ব্রহ্মবিচারই বেদান্তশাস্ত্রে মানস-প্রপঞ্চ নামে কথিত হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ "তৎ"-এর জ্ঞান উদিত না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ বেদান্ত বিচার করিতে হয়। নদী-সন্তরণকারী ব্যক্তি যেমন হস্ত ও পদ উভয়ই সঞ্চালিত করেন, তদ্রূপ বিচার ও বৈরাগ্য এই দুই সমভাবে যিনি গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহার নিকট স্বপ্রকাশ আত্মা মধ্যাহ্ন তপনের ন্যায় অতি শীঘ্র প্রকাশিত হইয়া তাঁহার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া দেন ও চরমে পরম পদ লাভ করিয়া তিনি ধন্য হইয়া থাকেন।

এইরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব অধিগত হইলে শাস্ত্রাদি-বিচার পরিত্যাগ করিবার উপদেশ আছে। শ্রুতিও তাহার সমর্থন করিয়াছেন।

গ্রন্থমভ্যস্য মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞানতৎপরঃ॥
পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেদ্ গ্রন্থমশেষতঃ॥
উত্তীর্ণে তু সরিৎপারে নাবা বা কিং প্রয়োজনম্॥

ইত্যাদি প্রমাণ রূপে দেখা যাইতে পারে।

ইহার কারণ কি? ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে অগণিত-সৈন্যপরিবৃত ও ভাবী স্বজনবধজনিত শোকে মুহ্যমান-হৃদয় ধনঞ্জয় বাত্যাতাড়িত কদলীবৃক্ষের ন্যায় কম্পিত কলেবরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই ভাবের কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "প্রভু! আমার মনে হয়, বায়ুবশ যেমন কঠিন ব্যাপার, মদমত্ত মাতঙ্গকে ফিরান যেমন দুষ্কর, এই মনকে বশীভূত করা তাহা অপেক্ষাও ভীষণ বলিয়া মনে হয়।" সুবৃহৎ মসকে সরিষা প্রমাণ ছিদ্র থাকিলে যেমন আশঙ্কার কারণ হইয়া থাকে, সেইরূপ সাধন পথে অগ্রসর হইলেও মনকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই। সাধক বলিয়া কেহ জ্ঞাত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে দুই এক জন উপদেশ-প্রার্থীর আগমন, তাঁহাদের দ্বারা আরও দশজনের নিকট পরিচয় সঙ্গে সঙ্গে একটু জ্ঞানের অভিমান; এইরূপে মনের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি—ক্রমে সর্ব্বনাশ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে ঠিক এই ভাবেই বুঝাইয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা বিষয় কামনা করে, তাহার তাহাতেই আসক্তি, পরে তাহা লাভের জন্য কামনা, পশ্চাৎ প্রাপ্তিজন্য চেষ্টা ও

অপ্রাপ্তিতে ক্রোধ উপস্থিত হয়। ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতি-বিভ্রম, বুদ্ধিনাশ প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া অবশেষে কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হয়। ইহা অপেক্ষা অনিষ্ট-জনক আর কি হইতে পারে? অতএব মনোরাজ্য সম্পূর্ণ পরাজিত হইলে তবে বৃত্তিশূন্য মন ব্রহ্মভাবে পূর্ণ হয়। বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে এই বিষয়ে যে সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও আমাদের স্মরণীয়। এই প্রকারে মনোরাজ্য পরাজিত হইলে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির অন্তঃকরণ আর বিক্ষিপ্ত হয় না—সেই ব্যক্তিকে তখন ব্রহ্মজ্ঞ বলা কর্ত্তব্য। কেন না, স্বয়ং শ্রুতি বলিয়াছেন;—

ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।

মানব! এই পথের যাত্রী হইতে কি তোমার সাধ হয় না?

যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ।

"ইঁহাতে দ্যুলোক, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, মন ও ইন্দ্রিয়গণ আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে জান এবং অন্য বাক্য সমূহ পরিত্যাগ কর। ইনি অমৃতের সেতু।"

তা'ই বলিতেছি, এই হতভাগ্য দেশের পুরাতন ঋষিগণ একদিন হৃদয়ের সকল সন্দেহ নিরসন করিয়া জগতের সুউচ্চ মঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া গভীর বজ্রনিনাদে এই মহাবাণীর ঘোষণা করিয়াছিলেন যে,—"হে দিব্যধামবাসী অমৃতের সন্তানগণ! তোমরা শ্রবণ কর, আমি তিমিরাতীত সেই অতি জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি।"

সেই বংশের বংশধর আমরা সেই পরিষ্কার কণ্ঠে—সেই অমৃতসিক্ত সুরে—আমাদের সুর মিলাইয়া কি বলিতে পারিব না যে,—হে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ! সৃষ্টি মিথ্যা—চন্দ্রসূর্য্য মিথ্যা—কেবলমাত্র তোমারই জ্যোতিঃকণায় এই জগৎ আলোকিত! একমাত্র তুমিই সত্যস্বরূপ। হে পরমাত্মন্! আইস, এই দুর্ব্বল জগতের হৃদয়ে আসিয়া সমস্ত কলুষ ধৌত করিয়া দাও এবং সেই মহান্ সুধাসিক্ত পথের যাত্রী করিয়া লইয়া আমাদিগকে ধন্য কর।

শ্রীতারাদাস চট্টোপাধ্যায়।

যোগ।

লোকো বশীভূতো যেন যেন চাত্মা বশীকৃতঃ।
ইন্দ্রিয়ার্থো জিতো যেন তং যোগং প্রব্রবীম্যহম্।—দক্ষসংহিতা।

যাহা দ্বারা জগৎ, আত্মা ও ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হয়, সেই যোগের কথাই বলিতেছি। প্রাণায়াম, ধ্যান, প্রত্যাহার, ধারণা, তর্ক ও সমাধি,—ইহারা যোগের এক একটী অঙ্গ। কে বলে,—বহুবিধ গ্রন্থ-চিন্তন-কার্য্যে, স্বভাবের নির্জ্জন সমাধি-ভবন-বনভূমি-সেবনে, ব্রত, যজ্ঞ ও তপস্যার আচরণ এবং অনুষ্ঠানে, প্রকৃত ষড়ঙ্গ যোগের স্বর্ণসিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে? যে বলে, সে হয়ত কাব্যকলাকুশলতার কোমলতা অনুভব করিয়া থাকিবে, কিন্তু যোগানুষ্ঠানের কঠোরতার পর 'যোগিজনের পরমপদে আত্মসমর্পণের রমণীয়তা' বুঝিতে সে অক্ষম। অনেকে মৌন, মন্ত্র ও নানাবিধ কুহক যোগ-সিদ্ধির উপায়-স্বরূপ মনে করেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উহাদের কোনটির দ্বারাই যোগসিদ্ধির সফলতা সম্ভাবিত নহে।

তবে যাঁহারা নির্ম্মোক-নির্ম্মুক্ত সর্পবৎ লোক যাত্রা এবং মোহমায়ার আবরণ হইতে বিনির্ম্মুক্ত, যোগে কৃতনিশ্চয় ও যোগাভ্যাসে দৈবশক্তি-সম্পন্ন দৃঢ় সাধক, তাঁহারাই জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্যপ্রভাবে ভূয়োভূয়ঃ নির্ব্বেদ-লাভের পর যোগসিদ্ধ হন। আর যাঁহারা সতত আত্মরতিরত, স্বভাবতঃ আত্মধ্যান-পরায়ণ, আত্মনিষ্ঠ, আত্মচিন্তায় অবহিত সাধক, স্বয়ং সন্তুষ্ট ও অনন্যচিত্ত, এই সংসারে সেই জীবন্মুক্ত পুরুষগণও করামলকবৎ যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি সুষুপ্ত ও জাগ্রতাবস্থায় আত্মপূজার বা আত্মধ্যানের অকৃত্রিম উপাসক, এই সংসারে সেই ব্যক্তিই সার্থকজন্মা। স্যমন্তক-সুশোভিত-মুকুট-ধারী সম্রাটও তাঁহার পদরেণু মাখিয়া পরিতৃপ্ত হন। সংসারের সমূহ অশান্তি অতৃপ্তি, সূর্য্যোদয়ে তমোরাশির ন্যায় তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করে। দেবতা আর কে? ব্রহ্মবাদিগণের মধ্যে সেই যোগিকুলের কোহিনুর,—সেই গরীয়ান্ মহীয়ান্ মনুষ্যই এ জগতে দেবতা।

এই যোগাভ্যাস করিতে হইলে সাধকমাত্রেরই প্রধান কর্ত্তব্য—বিষয় দাবদাহের লেলিহান রসনা হইতে আত্মার সংস্পর্শ দূর করা। অনল মধ্যে অবস্থিত ব্যক্তির শান্তির আশা যেমন সুদূর-পরাহত, বিষয়-বহ্নিতে বিদহমান ব্যক্তির শান্তির আশাও তদ্রূপ আবার শান্তিহীন মনুষ্য আত্মধ্যান করিবার অধিকার হইতে চিরবঞ্চিত থাকে। বস্তুতস্ত বিষয় ত্যাগ ব্যতীত—শান্তিসংস্থান ব্যতীত—যোগসাধন হওয়া একেবারেই অসম্ভব। এই যে যোগ,—বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে যোগের বিষয় অবতারণা করা হইয়াছে, ইহার আনন্দ এক অপূর্ব্ব, অনাস্বাদিতপূর্ব্ব, অননুভূতপূর্ব্ব। এই যোগ-পারগ যতি পুরুষ অব্যক্ত হইতে মহীয়ান্ পুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া—তদনন্তর তদ্দেহে সম্মিলিত হইয়া ত্রিব্যাধি ও ত্রিতাপ-জ্বালার অবসান করেন।

কেহ কেহ বলেন, বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগের নাম যোগ। এক ইন্দ্রিয়ই যোগসাধনার অশেষ অন্তরায়, তাহার উপর আবার বিষয়। একে অগ্নি, আবার ঘৃত। ঘৃতের সংযোগে অগ্নি কেবল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকে—স্নিগ্ধ শীতল সুধাবারি সেচন করে না। এই ঘৃত নিক্ষেপ-সমন্বিত অগ্নিতে সংসার ও সাধনা পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। তবু সেই অগ্নি, তবুও সেই ঘৃত চাইই—চাই।

এ অগ্নি হোমাগ্নি নহে, আর এ ঘৃত হবিঃ নহে। মন্ত্রপূত-হবিঃপ্রদত্ত হোম-বহ্নিতে দেবতার পূজা হয় বটে, কিন্তু শ্মশানাগ্নিতে ঘৃত ঢালিলে কাহার পূজা হয়? বলা বাহুল্য, 'বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগের নাম যোগ' এই মতের প্রবর্ত্তকেরা অধর্ম্মকে ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিয়া যোগ সাধনেচ্ছুক ব্যক্তিগণের হৃদয়ে ভ্রান্তির পথ পরিষ্কার করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, আত্মা ও মনের সংযোগের নামই যোগ। ইহাও অতি বিচিত্র কথা। কামনা, প্রার্থনা প্রভৃতি দ্বারা যোগ সাধন হয় না।

কামনা প্রার্থনার দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না; কেননা তিনি মনের অতীত ও শ্রুতিতে বধির। পুরাকালের ইতিহাসে অপ্সরা কিন্নরীর দ্বারা যোগভঙ্গের উপাখ্যান আছে, সেই অপ্সরা কিন্নরীই কামনা ও প্রার্থনা। ইহারা চিরকালই যোগীর যোগ ভঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত থাকিবে, নাচিয়া গাহিয়া বিষয়ের পরপার হইতে যোগিজনকে টানিয়া বিষয়ের মধ্যে আনিয়া একালেও উৎপাত উপদ্রব করিবে! ঐ দুইটি গায়িকা ও নর্ত্তকী মনঃপ্রেরিত; যোগী উহার কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সততই সচেতন।

যাহারা সূর্য্যভাতিপ্রতিবিম্বিত কাচের আভা দর্শন করিয়া "কোহিনুর দেখিলাম" মনে করে, তাহাদের যেমন কোহিনুরের অপূর্ব্ব উজ্জ্বল আভা দর্শন করা হয় না সেইরূপ যাহারা বিষয় ও ইন্দ্রিয়-সংযোগে, কিম্বা আত্মা ও মনের সংযোগে যোগধ্যেয় পুরুষের পরম জ্যোতিঃ দর্শন করিলাম বলিয়া মনে করে,—তাহারাও কখন জগজ্জ্যোতির ধ্যান দর্শনীয় অদৃষ্টপূর্ব্ব অনন্ত অতুলনীয় জ্যোতিঃ সন্দর্শনে বিমলানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

হায়! এ সংসারে যোগবঞ্চিত জনগণ অবিদ্যা-কুহক মদিরায় আত্মভ্রান্ত হইয়া রজ্জুতে সর্পভ্রম জন্মাইয়া যথার্থ "ভোগকে" যথার্থ "যোগরূপে" নির্দ্দেশ করিয়া মোহান্ধ মানবের অন্তঃকরণে কি মহা ভ্রান্তিই উৎপাদন করিতেছে!

তবে প্রকৃত ও প্রধান যোগ কি?

বৃত্তিহীনং মনঃ কৃত্বা ক্ষেত্রজ্ঞং পরমাত্মনি।
একীকৃত্য বিমুচ্যেত যোগোঽয়ং মুখ্য উচ্যতে।—দক্ষসংহিতা।

অর্থাৎ মনকে বৃত্তিহীন করিয়া জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত একীকৃত সম্পাদন করিলে মুক্তিলাভ হইবে, ইহাই প্রধান যোগ।' ইহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। কামনা, প্রার্থনা, দুঃখ সুখানুভূতি, ভোগস্পৃহা প্রভৃতি থাকিলে কি মনকে বৃত্তিহীন করা

যায়? প্রকৃতির নিয়ম, উৎপন্ন বস্তু উৎপত্তি স্থানে মিশিয়া যায়! মেঘ হইতে জল হইতেছে, জল আবার প্রকারান্তরে মেঘে মিশিয়া যাইতেছে—ইহাই জড় পদার্থের যোগ। প্রকৃতির নিয়ম মানবীয় যোগকে পরিত্যাগ করিবে কেন?

পুরাকালীন ত্রিকালদর্শী যোগবিৎ ঋষিগণ "জীবাত্মা পরমাত্মার সংযোগের নামই যে প্রকৃত ও প্রধান যোগ." তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন,—তদুপলক্ষে বলিয়াছেন, "সৃষ্টির পূর্ব্বে জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই মুক্ত আকাশে এক হইয়া বিরাজমান ছিলেন, পরে সৃষ্টির সময় জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে পৃথক হইয়া পড়িল।" ইহা হইতে প্রকৃত যোগ বা মহাযোগের উদ্দেশ্য কি বুঝিতে পারা যায়। মোক্ষ আর কিছুই নহে, পরমাত্মা ও জীবাত্মার সম্মিলন। এইরূপ সম্মিলনের উপায়ই যোগ।

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

অমৃত-উৎস।

হৃদয়-মরুর হায়, কোন্ গুপ্ত-স্তরে
চির-অমৃতের উৎস রয়েছে গোপন,
পিপাসিত আত্মা মোর জন্ম-জন্ম ধরে
করে আসিতেছে নিত্য বৃথা অন্বেষণ!

বাহিরের এত সুখ, এত হাসি-গান,
আনন্দের কলরব, গৌরব-প্রেরণা, -
আর না জাগায়ে তুলে ধূলি-লিপ্ত প্রাণ,
নাহি ঘুচে মরমের নিভৃত বেদনা!

কোথা হতে আসে সব, কোথায় মিলায়,
কোথা সে অমৃত-উৎস শাশ্বত অক্ষয়,—
সকল আকাঙ্ক্ষা-সাধ মিটিবে যেথায়,
চিরতরে অতৃপ্তির ঘটিবে বিলয়!

কে দেখাবে পথ মোরে—কে নিবে সেথায়—
যাত্রা মোর সমাপন হবে বুঝি হায়!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

সাধনায় বিপদ।

সাধনমার্গ বড় বিপদ-সঙ্কুল। এই পথকে সাধনশীল মনস্বী-গণ নিশিত ক্ষুর-ধারের ন্যায় দুর্গম ও দুরত্যয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। একটু অনবধান হইলেই সাধনমার্গ হইতে বিচ্যুত হইতে হয় ও যিনি যত উচ্চে উঠিয়া পতিত হন, তাঁহার আঘাত ততই গুরুতর হয়। অহংজ্ঞান, অভিমান, ধর্ম্মধ্বজিতা, ভাবদুষ্টতা ও কপটাচার প্রভৃতি কতকগুলি সাধন পথের সাধারণ বিপদ। এ বিপদগুলি সকল সাধনাই সমূলে নষ্ট করিয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত বিশেষ বিশেষ সাধনার বিশেষ বিশেষ বিপদ আছে। এই প্রবন্ধে সেগুলির আলোচনা করিলে, আশা করি কাহারও অপ্রীতিকর হইবে না।

মহামুনি বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতকে পারমহংস্য-সংহিতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই শাস্ত্রগ্রন্থ প্রোজ্ঝিতকৈতব নির্ম্মৎসর সাধুবৃন্দের সেব্য। বাস্তবিকই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ইহার অনুশীলন করিলে অক্লেশে তাপত্রয় নিঃশেষে নির্ব্বাপিত হয় ও সংসারতপ্ত জীব নিবৃত্তিমার্গের পথিক হইয়া সকল মঙ্গলালয় পরমপদে বিশ্রান্তি লাভ করে। এই গ্রন্থপাঠে শ্মশান-বৈরাগ্য নহে, পরন্তু বিচারলব্ধ ও একাত্ম-বিজ্ঞানসম্ভূত পর-বৈরাগ্যের উদয় হয়। এই গ্রন্থ রত্নই বৈষ্ণবদিগের আরাধ্য প্রামাণিক শাস্ত্র। সজীব-প্রেমভক্তি-বিগ্রহ নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব শ্রীভাগবত-লিখিত বিশুদ্ধ ভক্তিরসের উৎস ছুটাইয়া সার্দ্ধ চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে হিমগিরির পাদদেশ হইতে কুমারিকা ও গুর্জ্জর হইতে চট্টগ্রাম অবধি ভগবৎ-প্রেমের পূত পীযূষবন্যায় প্লাবিত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ও প্রদর্শিত মার্গ অনেকে যথাযথ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল না, অথবা গ্রহণ করিতে কাহারও রুচি হইল না। কোথায় তাঁহার সেই অপূর্ব্ব অপার্থিব অন্তঃশীতল বহির্চঞ্চল মিলনোৎকণ্ঠা, যাহাতে গোবিন্দবিরহিত এক মুহূর্ত্তও যুগায়িত হইত, যাঁহার পবিত্র উদ্দীপনায় অমরাবতীর ভোগ-বিলাসও দগ্ধরেণুবৎ দুঃসেব্য হইত; আর কোথায় আমাদের এই অবিরাম গৃহসেবা, অন্তরে অন্তরে নানাবিধ ইন্দ্রিয়সেব্য দ্রব্যের আহরণ নিমিত্ত ব্যগ্রতা, আর দিনান্তে সুবিধামত সকল বজায় রাখিয়া মুখে এক একবার হরিনাম। পাঠক-পাঠিকাগণ! মানস-চক্ষে পুরুষোত্তমের একবার সেই স্বর্গীয় দৃশ্য হৃদয়-পটে অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করুন। শ্রীজগন্নাথদেবের রথের অগ্রে উদ্দাম নৃত্যকীর্ত্তন, গরুড়স্তম্ভের নিকট হইতে অনিমেষ-দর্শনে প্রেমাশ্রু-পরিপ্লুত করুণার্দ্র হৃদয়ের অধীর স্পন্দন, ভগবৎ-সাক্ষাৎকার আশায় কত বিনিদ্র-রাত্রি-যাপন—এই সকল ভাব একবার ভাবিয়া লউন। এবং যদি রুচি হয়, তাহা হইলে এখনকার সেবাদাসী বা প্রকৃতি পরিবেষ্টিত স্নেহাক্ত পীবরাঙ্গ "বাবাজীর" আখড়াও ভাবিয়া দেখুন। দেখুন, কি ছিল আর কি হইয়াছে! মানুষের দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি শিবকে মর্কটে পরিণত করিয়াছে। ইহার কারণ কি! কারণ—শাস্ত্রের

অপব্যবহার, শাস্ত্রের তত্ত্বার্থের অনুপলব্ধি ও শাস্ত্রসাধনার ব্যপদেশে নিজের কুপ্রবৃত্তি-চরিতার্থ-চেষ্টা।

চিত্ত যতদিন না জ্ঞানমার্জ্জিত ও বিচার-সংস্কৃত হইয়াছে, ততদিন ভক্তিলাভের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। একথা শ্রীভাগবতে কতস্থানে কতপ্রকারেই না বলা হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। অগ্রে ভজনীয় বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় হইলে তবে ভজন আরম্ভ হইবে। তিনি জ্ঞান স্বরূপ। "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যৎ জ্ঞানমদ্বয়ং" -- তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা অনন্ত অবিনশ্বর জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। শ্রীভাগবতে বিষ্ণুর সেই পরম পদের উপদেশ করা হইয়াছে, "যৎ পারমহংসেন পথাধিগম্যতে"—অর্থাৎ যে পদ জ্ঞানমার্গের দ্বারাই লভ্য। প্রথমতঃ "বিধূয় মায়াং বয়ুনোদয়েন"—জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা মায়ামল ধৌত হইলে তবে সেই বিরজস্ক বৈকুণ্ঠধামের বার্ত্তা লইতে হয়। তাহার পূর্ব্বে সে রাজ্যের তথ্য আমাদের মায়া-মলিন ইন্দ্রিয়ের নিকট অপ্রকাশিত। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন, "শাস্ত্রীয় জ্ঞানং তু অত্র পরত্র চ দ্বারভূতং স্বীকার্য্যং ইতরথা প্রবৃত্ত্যনুপ-পত্তেঃ।" শাস্ত্রীয় জ্ঞান উভয়ত্র দ্বারভূত অর্থাৎ কি জীব বাচক ত্বং পদার্থের অনুস-ন্ধানে নিযুক্ত অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমেশ্বর বাচক তৎ পদার্থের অনুসন্ধানে প্রযুক্ত পরমাত্মজ্ঞান, কি শুদ্ধ ভক্তি বিজ্ঞান, এই উভয় স্থানেই শাস্ত্রীয় জ্ঞান বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। শাস্ত্র-জ্ঞান ব্যতিরেকে কে আমাদিগকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানে বা সবিশেষ পরমেশ্বর জ্ঞানে প্রবৃত্ত করিবে! আবার বলেন, "ভক্তিরূপেণ তু জ্ঞান বিশেষেণ পুরুষার্থো ভবতি।" পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামীপাদও বলেন যে, "ভক্তেরেব অবান্তর ব্যাপারো জ্ঞানং ন পৃথক্"—পরাভক্তি ও পরজ্ঞানে কিছুমাত্র প্রভেদ নহে। সম্প্রতি কোন কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায় এঁহেন জ্ঞানকেই একটা কুৎসিত কদর্য্য পূতিগন্ধ-বিশিষ্ট দ্রব্য বোধে ত্যাগ করিয়াছেন। কাজেই তাঁহাদের রাগ-মার্গের ভজনা নেড়ানেড়ীর কীর্ত্তনে পরিণত হইবে না ত আর কি! রাগমার্গের ভজনার একমাত্র অধিকারী—বিগত-বিষয়-স্পৃহ, জ্ঞান-কুঠার দ্বারা ছিন্ন-মায়া-বন্ধন, পরিশুদ্ধবুদ্ধি, শমদমাদি-সম্পন্ন সাধু পরমহংসকুল। এখন অনেকস্থলে রাগ মার্গের ভজনা করেন - নিরক্ষর শাস্ত্র-জ্ঞানান্ধ ভোগলোলুপ বদ্ধ জীব। প্রকৃত বৈষ্ণবের তুল্য শ্রেষ্ঠ মানব আর নাই। তিনি চরাচর সকল বস্তুতেই একমাত্র ব্যাপক সত্তার স্ফুরণ দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়েন। তাঁহার ভজনানন্দ বা ভক্তি অহেতুকী, সুরসরিৎ মন্দাকিনীর অবিচ্ছেদ প্রবাহের ন্যায় আপনা-আপনিই অবিরাম প্রবাহিত—কোনও বাহিরের বস্তুর অপেক্ষা করে না। তাঁহাদের চরণে কোটী নমস্কার। অতএব অগ্রে জ্ঞানার্জ্জন দ্বারা মার্জ্জিতবুদ্ধি না হইলে, ভক্তি বা রাগ মার্গের ভজনা না করাই শ্রেয়,—করিলে নিঃসন্দেহ ব্যভিচার ঘটিবে।

কলিকল্মষদীন জীবগণের সাধন-সৌকর্য্যার্থে ভগবান্ শ্রীসদাশিব আগমের উপদেশ

করিয়াছেন। আগম বা তন্ত্রশাস্ত্রকে যদি ব্রহ্মজ্ঞানলাভের প্রথম সোপান না বুঝিয়া কেবল কতকগুলি অর্থহীন কর্ম্মকাণ্ডের সমষ্টি বলা যায়, তাহা হইলে আগমের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। এই জন্যই আশুতোষ মহানির্ব্বাণতন্ত্রের প্রথমেই ব্রহ্মজ্ঞানের কথাই বলিয়াছেন। হৃদয়কমলমধ্যে নির্ব্বিশেষ নিরীহ হরি-হর-বিধি-বেদ্য যোগীদিগের ধ্যানগম্য জনন-মরণ-ভীতি-নিবারণ সকল-ভুবন-বীজ সচ্চিৎস্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্যের ধ্যানই উপদেশ দিয়াছেন। রীতি এই যে, প্রথমে যেটি বলা হয়, সেইটি সাধারণ বা মুখ্য নিয়ম, তাহার পর বিশেষ বা গৌণ নিয়ম সকল বলা হয়। মুখ্য নিয়ম পালনে অসমর্থ হইলে গৌণ নিয়ম পালন বিধি। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে প্রথমে ব্রহ্মোপাসনা, পরে অন্য সকল ক্রিয়াকাণ্ডের অবতারণা করা হইয়াছে। যাঁহার মন এখনও ব্রহ্ম-উপলব্ধি করিবার যোগ্য হয় নাই, তিনিই শেষোক্ত কর্ম্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইবেন—নিজের মনকে উপযোগী করিবার জন্য।

শক্তি, প্রকৃতি বা মহামায়া শাক্তদিগের উপাস্য দেবতা। ইহাঁকেই ভূতভাবন ভবানীপতি বলিতেছেন, "মমরূপাসি দেবি! ত্বং" "হে দেবি! তুমি আমারই রূপ, তোমাতে আমাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।" শক্তিমান্ ও শক্তির কি কেহ প্রভেদ কল্পনা করিতে পারে? এই মহামায়াই পুনঃ পুনঃ জগৎ সৃষ্টি ও লয় করিতেছেন—ইনিই জগৎস্বরূপিনী। ইনি এক হইয়াও বহু। "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা"। দৈত্যেন্দ্র শুম্ভকে তিনি নিজেই এই কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করা জীবের সাধ্য নয় বলিয়াই তিনি অনির্ব্বচনীয়া। তাই সদাশিব বলিতেছেন,—

ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে॥
মহদাদ্যণুপর্য্যন্তং যদেতৎ সচরাচরং।
ত্বয়ৈবোৎপাদিতং ভদ্রে ত্বদধীনমিদং জগৎ॥
ত্বমাদ্যা সর্ব্ববিদ্যানামস্মাকমপি জন্মভূঃ।
ত্বং জানাসি জগৎ সর্ব্বং ন ত্বাং জানাতি কশ্চন॥
ত্বমেব সূক্ষ্মা স্থূলা ত্বং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিনী
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি॥

এই প্রকৃতিকে জানিতে পারিলেই, মহামায়ার এই দুরত্যয়া মায়া অতিক্রম করিতে পারিলেই—পুরুষের দর্শন লাভ হয়। পুরুষ নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিশেষ, প্রকৃতি সক্রিয় ও সবিশেষ। পুরুষ কারণ, প্রকৃতি কার্য্য। পুরুষ ত্রিগুণের অতীত! প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। শ্রীদেবীভাগবত বলেন,—

প্রকৃষ্টবাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ
সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা।
ত্রিগুণাত্মস্বরূপা যা সা চ শক্তিসমন্বিতা
প্রধানা সৃষ্টিকরণে প্রকৃতিস্তেন কথ্যতে॥

প্রকৃষ্টরূপে যিনি সৃষ্টি করেন, যিনি ত্রিগুণাত্মিকা, যিনি শক্তি-সমন্বিতা,তাঁহাকেই প্রকৃতি বলা যায়। এই প্রকৃতিকে জানিতে পারিলে মায়া জয় করা হয়। হে পাঠক-পাঠিকাগণ! এখন দেখুন, বুঝুন, প্রকৃত শাক্ত কে? বাস্তবিক সকল ব্রাহ্মণই শাক্ত।

ব্রাহ্মণাঃ শাক্তিকাঃ সর্ব্বে ন শৈবা নচ বৈষ্ণবাঃ।
যত উপাসতে দেবীং গায়ত্রীং বেদমাতরং॥

এই শাক্তদিগের স্থান কত উচ্চে। কিন্তু সমাজের ও বিশেষ করিয়া তাঁহাদের নিজের দুর্ভাগ্যবশতঃ অধিকাংশ শাক্ত সাধক পঞ্চ-মকার লইয়াই বিব্রত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পঞ্চ-মকারের মুখ্যার্থ ইঁহারা গ্রহণ না করিয়া শব্দার্থই গ্রহণ করেন। কারণ তাহাতে ভোগ-লালসা-পরিতৃপ্তি করার অবাধ সুযোগ।

পঞ্চ-মকার যথাযথ সাধন করিলে মনুষ্য জীবন্মুক্ত হইয়া যায়, একথা সত্য।

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রাং মৈথুনমেবচ।
মকার পঞ্চকং কৃত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

কিন্তু এই পঞ্চ-মকার, যাহাতে জীবের পুনরাবৃত্তি হয় না,তাহা কি প্রাকৃত মদ্যাদি হইতে পারে? তবে কি? ভক্ত যখন ভগবদ্‌ভাবে বিভোর হইয়া আত্মহারা হইয়া পড়েন, তখন তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে একরূপ নির্য্যাস বিন্দু বিন্দু নির্গত হয়। তিনি তাহাই পান করিয়া উন্মত্ত হন। ইহাই প্রকৃত মদ্য—শৌণ্ডিকালয়ে প্রস্তুত বারুণী-বিশেষ নহে। এই মদ্যই "সোমধারাক্ষরেদ্‌ সা তু ব্রহ্মরন্ধ্রাৎ বরাননে"॥ আবার শুনুন মদ্য কি?

যদুক্তং পরমং ব্রহ্ম নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনং।
তস্মিন প্রমদনজ্ঞানং তন্মদ্যং পরিকীর্ত্তিতম্‌॥

নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করিলে, যে মাদকতা আইসে, তাহাই মদ্য। সে মাদকতায় বহির্জ্জগৎ, দেহ প্রভৃতি সব ভুলাইয়া দেয়।

ভগবান্‌ বলিয়াছেন,যে সকল কর্ম্ম আমাতে অর্পিত হয়,তাহাই "মাংস"—"মাং সনোতি হি যৎকর্ম্ম তন্মাংসং পরিকীর্ত্তিতং।" তিনি হিংসালব্ধ মাংস গ্রহণ করেন না।

মৎস্যমানং সর্ব্বভূতে সুখদুঃখমিদং প্রিয়ে।
ইতি যৎ সাত্ত্বিকং জ্ঞানং তন্মৎস্যং পরিকীর্ত্তিতং॥

অথবা

গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে মৌমৎস্যৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েৎ যস্তু স ভবেন্মৎস্য-সাধকঃ॥

দুই ভ্রূর মধ্যবর্ত্তী স্থানকে গঙ্গা যমুনার মধ্য বলা হইয়াছে। সাধকগণ বুঝিয়া লউন, সেখানে কোন্‌ মৎস্য বিচরণ করে।

সৎসঙ্গেন ভবেন্মুক্তিরসৎসঙ্গেষু বন্ধনং।
অসৎসঙ্গ মুদ্রনং যৎ তন্মুদ্রা পরিকীর্ত্তিতা॥

এইক্ষণে তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া তোমার আরও কিঞ্চিৎ অধিক হইল যে, অশেষ প্রকার লোক নিন্দাও সহ্য করিতে হইল। তোমার তত্ত্বজ্ঞানের কি মহিমা! অতএব অদ্বৈতত্ত্বজ্ঞানী! তুমি যথেচ্ছাচারী হইয়া শূকর বরাহাদির সাদৃশ্য প্রার্থনা করিও না, কাম-ক্রোধাদি সমুদায় মনোদোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবতার স্থায় সর্ব্বলোক পূজ্য হও।"

অতএব যদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে চাও, অগ্রে কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি কর, নচেৎ তোমার উপায় নাই। বৃহদারণ্যক-ভাষ্যে ভগবান্ আচার্য্য বলিয়াছেন, "নহি সংসার বিষয়াৎ সাধ্যসাধনাদি-ভেদলক্ষণাদবিরক্তস্যাত্মৈকত্বজ্ঞানবিষয়েঽধিকারো তৃষিতস্যেব পানে।"—অতৃষিত ব্যক্তির পানে যেমন অধিকার নাই, তেমনই যাহার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় নাই, তাহার আত্মজ্ঞানে অধিকার নাই। অগ্রে বৈরাগ্য অভ্যাস কর—শ্বশৃগালভক্ষ্য এই দেহে অনাস্থাবান্ হও, রিপু সকল জয় করিয়া তাহাদের উপর একাধিপত্য স্থাপন কর,—তবে অদ্বৈত-তত্ত্বের কথা মুখে আনিও। অদ্বৈত শেষের জিনিষ, আগের নয়।

সাধনকার্য্যের নিমিত্ত অধিকারী-বিশেষে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান – এই তিন পন্থা ঋষিগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার কোনটিই উপেক্ষণীয় নহে। এই তিনের সদ্ব্যবহারে জীবনকে মুক্তিমার্গে লইয়া যায়, অসদ্ব্যবহারে জীবের বন্ধন দৃঢ়তর করিয়া দেয়। কর্ম্ম - আধ্যাত্মিক জগতের স্থূল দেহস্বরূপ, ভক্তি ঐ দেহের হৃদয় বা কোমল প্রবৃত্তিসমষ্টি, জ্ঞান উহার মস্তিষ্ক। দেহ না থাকিলে হৃদয় ও মস্তিষ্ক কার্য্যকর হইবে কাহাকে লইয়া? আবার দেহ আছে, যদি হৃদয় ও মস্তিষ্ক না থাকে, তাহা হইলে সে দেহ জড়পিণ্ড মাত্র। দেহে কেবল যদি হৃদয় থাকে, আর মস্তিষ্ক না থাকে, তাহা হইলে হৃদয়কে সংযম-প্রগ্রহে নিয়মিত করিয়া কে সুপথে চালাইবে? আর যদি দেহে হৃদয়বিহীন মস্তিষ্ক থাকে, তাহা হইলে সে দেহ একটা কুৎসিৎ কঠোর স্বার্থপরতার উর্ব্বর ক্ষেত্রে পরিণত হইবে। অতএব ইহাই স্থির যে, এই তিনের সুকৌশল সংমিশ্রণে সুফল দান করে। বুদ্ধিপূর্ব্বক ও বিচার-সহায়ে কর্ম্ম না করিলে কর্ম্মজড় হইতে হয়। কর্ম্মতত্ত্ব জানিয়া কর্ম্ম কর,—কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানে উপনীত করিয়া দিয়া নিজে বিদায় গ্রহণ করিবে। জ্ঞান-বিবর্জ্জিত ভক্তি, ভক্তি-পদবাচ্য হইতে পারে না; তাহার আখ্যা অত উচ্চ নহে। সে ভক্তি বা ভাব কখনও স্থায়ী হয় না, একটি বৃত্তির সাময়িক উদ্রেকমাত্র। জ্ঞানহীন ভক্তি ধর্ম্ম-ধ্বজিতায় লইয়া যায়। আবার ভক্তিহীন জ্ঞান মানুষকে দাম্ভিক ও কুতর্কপরায়ণ জীবে পরিণত করে। অতএব সকল নিষ্কপট সাধক মাত্রেরই উচিত যে, জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী সৎগুরুকে কর্ণধার পদবীতে সুস্থাপন করিয়া, জ্ঞান-ক্ষেপণী ও ভক্তি-পবনের সাহায্যে দেহতরী ধীরে ধীরে অনাদি অনন্ত অনাম-গোত্র ঊর্ম্মি-বিরহিত ব্রহ্মবারিধি অভিমুখে সঞ্চালিত কর।

শ্রীনলিনীরঞ্জন মিশ্র।

সিদ্ধার্থ ও বুদ্ধমার্গ।

সুখ ও দুঃখ লইয়াই মানব-সংসার। সংসারী মর্ত্ত্যবাসী সুখ-সম্ভোগ ও দুঃখ-বর্জ্জন অভিলাষেই কর্ম্মপরায়ণ। অভীষ্ট সুখলাভ ও অনভীপ্সিত-দুঃখ-পরিহার কিন্তু তাহার ইচ্ছাধীন নহে। সুখাগম ও দুঃখ-নিবৃত্তি কাল-কর্ম্ম-গুণাধীন হইলেও মায়াচ্ছন্ন মানব উহাদিগকে আপন আপন ইচ্ছাধীন মনে করিয়াই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে সংসারে গতাগতি করে। অবশেষে বহু জন্ম পরে সংসার-তরুর তিক্ত ফল আস্বাদন করিতে করিতে, প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা কর্ম্মফলের বৈপরীত্য উপলব্ধি করিলে, তাহার স্বাধীনত্ববুদ্ধি তিরোহিত হয়,—সে তখন বুঝে যে অভীপ্সিত হইলেও সুখসম্ভোগ বা দুঃখ-নিবৃত্তি তাহার সম্পূর্ণ অধীন নহে। এই স্বাধীনত্বজ্ঞানের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ নিষ্কামভাব ও বৈরাগ্য হৃদয়ে বদ্ধ মূল হইতে থাকে যেমন সকাম কর্ম্ম দ্বারা এতদিন বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছিল, সেইরূপ আবার নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্ম-বন্ধন শ্লথ হইতে থাকে। তখন মানব বুঝিতে আরম্ভ করে যে, মনই যত ইষ্টানিষ্টের হেতু। মনের বৃত্তি অনুসারেই কর্ম্ম এবং তদনুসারেই তাহার গতি হইয়া থাকে। মনই দেহকে আত্মা এবং পুত্রাদির শরীরকে মদীয় বলিয়া স্বীকার করিয়া দুস্তর সংসার-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। দেহে আত্মাভিমান নিবন্ধনই সুখ-দুঃখের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মনের বিষয়-নিষ্ঠাই অভিমানের মূল। আত্মনিষ্ঠা দ্বারাই সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়। কিন্তু মন নিগৃহীত করিতে যাইয়া মানব দেখে যে, তাহা চঞ্চল-স্বভাব, বুদ্ধির ক্ষোভকর, দুর্জ্জয় ও দুর্ভেদ্য; মনের নিগ্রহ বায়ু-নিগ্রহের ন্যায় সুদুষ্কর।

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥ গীতা, ৬।৩৪

মানবের যখন এই অবস্থা,—যখন তাহার অন্তর কাঁদিয়া বলিতে থাকে,—"এ সংসারে সমস্তই বিষম, বিশেষতঃ বিষমদর্শনই জীবের স্বভাব; ঐ স্বভাব আবার দুরতিক্রমনীয়; অতএব জীব কি প্রকারে নিজের দুরতিক্রমনীয় স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বত্র ও সর্ব্বাবস্থায় সমদর্শী হইবে? কি উপায়ে চঞ্চল মনকে স্ববশে আনিবে? তাহাকে বাহ্য বিষয় হইতে ফিরাইয়া আত্মস্থ করিবে?"—যখন মানব এইভাবে ব্যাকুল হয়; একদিকে বহির্ম্মুখ বিষয়ের টান, সংস্কারের টান, অপরদিকে অন্তর্ম্মুখতারূপিনী আত্মনিষ্ঠা জনিত কেন্দ্রাভিমুখ আকর্ষণ,—যখন মানবচিত্তে এই দুই বিপরীত শক্তি প্রায় তুল্যবলশালিনী হইয়া ঘাত-প্রতিঘাত করিতে থাকে,—তখন তাহাকে এক প্রকার সাধনাবিধি শিক্ষা দেওয়া হয়। ঐ সাধনার প্রণালী বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নহে। অবশ্য বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ইহার অনুকূল সাধনা। বেদ-বিহিত, মনুপ্রচারিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালন করিতে করিতে প্রাণের এই প্রকৃত ব্যাকুলতা জন্মে;

প্রবৃত্তির দাস মানব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালন করিতে করিতে নিবৃত্তিমার্গের এই মূলদেশে অতি সহজে উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু আমি যে সাধনার কথা এই স্থলে উল্লেখ করিতেছি, তাহা ঐ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম নহে। সৃষ্টি অনাদি; মানব-অভিব্যক্তিও অনাদি। মানবীয় সাধনা-ইতিহাসের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে, কত মানব অভিব্যক্তির এই মহান্ সন্ধিস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, কত মানব-তীর্থযাত্রী কালে কালে সাধন-জীবনের পবিত্র তীর্থস্থান এই "ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র" উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা এই স্থলে উপস্থিত হইয়া যে সমস্ত নিয়ম পালন করিয়া অবশেষে মানব-অভিব্যক্তির চরম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সমস্ত অমোঘ নীতি কখনও লোপ পায় নাই এবং কখনও লোপ পাইবে না। ইহাই আর্য্য-পথ, এবং আমি এখানে ইহারই উল্লেখ করিতেছি। ইহার বিপরীত মার্গকে অনার্য্যমার্গ বলা হয়। ভগবান্ গীতায় অর্জ্জুনের মোহকে "অনার্য্যজুষ্টং" সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন এবং শ্রীমধুসূদন সরস্বতী টীকায় অর্থ করিতেছেন,—"আর্য্যৈর্মুমুক্ষুভিঃ ন জুষ্টমসেবিতং।" বৌদ্ধেরা পালিভাষায় ইহাকে "অরিয়" শব্দে অভিহিত করেন। "সোতাপত্তি, সকদাগামি, অনাগামি এবং অরহত্ত মগ্গো,—এই চারি প্রকার ব্যক্তিগণকে অরিয় কহে।" ইহার অপর নাম "আর্য্যাহতপথ"। ইহাকেই বুদ্ধধর্ম্ম বলা হইয়া থাকে। ইহাকেই উদ্দেশ করিয়া ভগবান্ বলিতেছেন,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া উপনিষদ্ বলিতেছেন,—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥

উপনিষদ্ ইহাকে "বর" (মুক্ত পুরুষ) রক্ষিত পথ বলিয়া উল্লেখ করিলেন।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অর্থাৎ অধ্যয়ন-বিধি-অনুসারে সাঙ্গ-বেদাধ্যয়ন, কাম্য-নিষিদ্ধ-কর্ম্ম-পরিবর্জ্জন বা অন্যান্য ধর্ম্মানুমোদিত নিত্য নৈমিত্তিক আচার ও সাধনা অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্ত নির্ম্মল হইলে পূর্ব্বালোচিতরূপে সংসার মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। এই মিথ্যা জ্ঞান হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত যাঁহার বৈরাগ্য ও ব্যাকুলতা আসে, তিনিই এই মার্গে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। তথায় নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক, ইহামুত্র ফলভোগ-বৈরাগ্য, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা এই ছয়টি সাধন-সম্পত্তি এবং মুমুক্ষুত্ব —এই সাধন-চতুষ্টয়ে অধিকারী হইলে তবে সাধক প্রকৃত দীক্ষালাভ করেন। এই সাধনা কয়টি প্রকৃতপক্ষে আর্য্যমার্গের বা "বর"-রক্ষিত ক্ষুরধারাবৎ নিশিত দুর্গমপথের সোপান। রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা ইহাকে বলিয়াছেন "the Path of Purgation." বা শোধনমার্গ। বৌদ্ধগণ আর এক ভাষায় সেই সাধনারই উল্লেখ করিতেছেন,—দান, শীল, ক্ষান্তি, বৈরাগ্য, বীর্য্য ও ধ্যান, এই ছয়টি পারমিতা সাধনা। সাধারণের অজ্ঞাত বলিয়া আমি এই পারমিতা কয়টির একটু পরিচয় দিতেছি। দান অর্থে বৌদ্ধ বুঝেন—জীবের

প্রতি দয়া। শ্রীধর স্বামীও দানের এই অর্থ করিয়াছেন—"দণ্ডো ভূতদ্রোহস্তস্য ত্যাগো দানং ন ধনার্পণং"—ভূতদ্রোহের নাম দণ্ড, তাহার ত্যাগকে দান বলে। শীল দমগুণের সাধনা। সামর্থ্য থাকিলেও অপকারীর অপকার সহ্য করাই ক্ষান্তি—"সত্যাপি সামর্থ্যে অপকারিণি অপকারাচিকীর্ষা।" ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত সুখসাধন উপস্থিত হইলেও বা যে কোন দুঃখের কারণ আসিলেও তাহাদিগের উভয়ের প্রতি আসক্তি ও বিরক্তি-শূন্যতাই বৈরাগ্য। সেই অদম্য শক্তি, যাহার সাহায্যে সাধক মোহরূপ কর্দম হইতে সত্য-লাভের জন্য অমিততেজে অগ্রসর হন, তাহার নাম বীর্য্য। তাহার পর ধ্যান। শান্তি-দেবকৃত "বোধিচর্য্যাবতারঃ" নামক পুস্তকের অষ্টম পরিচ্ছেদে, ধ্যান পারমিতার আলোচনা আছে। প্রকৃত যাহা সৎ, তাহার ধ্যান কখন্ সম্ভব? কাহার দ্বারাই বা সম্ভব? যে আপনার যশঃ প্রচারে লালায়িত, বা আত্মম্ভরিতা ও অভিমান যাহার এখনও সহচর, সে ধ্যানী হইতে পারে না। যে অপরের দোষ অন্বেষণ ও প্রচার করে, তাহারও এখনও ধ্যান-পারমিতা-সাধনের সময় হয় নাই। যে সমস্ত পুণ্য কার্য্য আপন উন্নতি লক্ষ্য করিয়া কৃত হয়, তৎসমুদয় প্রকৃত পুণ্য কার্য্য নহে; কারণ সেগুলি মানবের অহঙ্কার বৃদ্ধি করে। যিনি ধ্যানী হইতে চাহেন, তিনি এইরূপ ভাবে কার্য্য করিলে চলিবে না; জগতের শুভ হউক, কেবল এই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে সৎকার্য্য করিতে হইবে। এতাদৃশ ব্যক্তিই ধ্যান-পারমিতা-সাধনের অধিকারী।

এইরূপভাবে সুসংস্কৃত হইয়া মানব দীক্ষালাভের উপযোগী হন এবং প্রকৃত আর্য্যপথে প্রবেশ করেন। এতদিন গুরু বা গুরুশক্তি অপ্রকাশভাবে, তাঁহার মন, বুদ্ধি বা চিত্তের ভিতর দিয়া অলক্ষ্যে তাঁহার সাহায্য করিতেছিলেন। এইবার তিনি শিষ্য-সমীপে প্রত্যক্ষ হন। প্রথম দীক্ষার পর শিষ্য পরিব্রাজক নামে অভিহিত হন। এই দীক্ষা তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে নূতন মানব করিয়া দেয়, তাঁহার যেন নূতন জন্ম হয়। এখন আর স্থূল জগতের মোহ তাঁহাকে আবদ্ধ রাখিতে পারে না। বায়ুর মত স্বাধীনভাবে তিনি বিচরণ করেন। পরিব্রাজক অর্থে ইহা বুঝায় না যে, তিনি কোন নির্দ্দিষ্ট গৃহে থাকিবেন না বা নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাস করিবেন না। ইহার এই অর্থ যে, তিনি সংসারে থাকিয়াও আসক্ত সংসারী হইবেন না। দ্বিতীয় দীক্ষা লাভ করিয়া তিনি কুটীচক হন। কিন্তু ইহা লাভ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে ত্রিদোষ হইতে মুক্ত হইতে হয়,—(১) বিশিষ্টতা জ্ঞান-মোহ, (২) সংশয় ও (৩ সংস্কার। তিনি ভাবেন যে, জগতের প্রাণী হইতে তিনি বিশিষ্ট নহেন;—কেহ আনন্দ বোধ করিলে সে আনন্দ তিনি বোধ করেন, অপরের দুঃখে তাঁহার দুঃখ হয়। ইহা চিন্তা বা ভাবনার দ্বারা অপরকে আত্মীয়বোধ নহে, ইহা অপর চৈতন্যে আপন চৈতন্য সম্পূর্ণভাবে মিলাইয়া দেওয়া। সংশয়-বন্ধন হইতে মুক্ত হইলে কর্ম্মবাদ, জন্মান্তরবাদ, মহাপুরুষদিগের অস্তিত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না; কারণ এতৎ সমুদয় তখন তাঁহার প্রত্যক্ষীভূত সত্য-রূপে প্রতিভাত হয়। তিনি সংস্কারাতীত হন। তিনি কর্ম্মকাণ্ডে আবদ্ধ থাকেন না। এইরূপে

ত্রিদণ্ড হইতে মুক্ত হইয়া তিনি কুটীচক হইলে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত হয়। কুটীচক অবস্থায় শিষ্য সিদ্ধ হইয়া থাকেন। তৃতীয় দীক্ষার পর তিনি হংসনামে অভিহিত হন। এ অবস্থায় আত্মা হইতে তিনি যে পৃথক নহেন, ইহা প্রত্যক্ষ করিতে থাকেন। তৃতীয় দীক্ষা-লাভানন্তর পৃথকত্বভাব সর্ব্বথা বিনাশ পূর্ব্বক চতুর্থ দীক্ষালাভ করিয়া তিনি পরমহংস নামে অভিহিত হয়েন। পরমহংস জাগ্রৎ অবস্থায় থাকিয়াও তুরীয় অবস্থার চৈতন্য অনুভব করেন। এইরূপে দীক্ষাচতুষ্টয় লাভান্তে সাধক জীবন্মুক্ত হন।

এই সাধনা-প্রণালী হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের রাজগুহ্য বা রাজবিদ্যার অন্তর্গত। সকল ধর্ম্মেই ইহার কথা আছে। রোমান ক্যাথলিক ইহাকেই the Path of Illumination বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যিশু জন্মিবার পূর্ব্বেও ইহা "Way of the cross" নামে জগতে প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীও ইহাকে পঞ্চধা বিভক্ত করেন, যথা,—(১) the Birth of the Christ ; (২) the Baptism ; (৩) the Transfiguration ; (৪) the Passion এবং (৫) the Resurrection or Ascension. এই পঞ্চম অবস্থাই জীবন্মুক্তি।

বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রেও সেই একশিক্ষা, সাধনমার্গের সেই একই প্রকার বিভাগ। দীক্ষালাভের পূর্ব্বে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত সাধন-চতুষ্টয়ে স্থিত সাধককে তাঁহারা শ্রাবক ও শ্রমণ এই নামদ্বয়ে অভিহিত করেন "শ্রু"-ধাতু হইতে "শ্রাবক" শব্দের উৎপত্তি। যিনি বুদ্ধ-ধর্ম্ম-কথা শ্রবণ করেন (Silent Hearer) তাঁহাকে "শ্রাবক" বলা হয়। তাহার পর যখন শ্রুত জ্ঞান সাধনায় পরিণত হয়, তখন তিনি "শ্রমণ" আখ্যা প্রাপ্ত হন। এই দুইটি রোমান ক্যাথলিক-দিগের Path of Purgation এর অন্তর্গত। তাহার পর তিনি যে সাধনমার্গ অবলম্বন করেন, তাহার চারিটি ক্রম আছে,—(১) স্রোত-আপত্তি ; (২) সকৃদাগমন, (৩) অনাগমন, (৭) অর্হত্ব এবং শেষে (৫) মুক্তি।

আমরা এই যে আর্য মার্গ বা বুদ্ধ-ধর্ম্মের আলোচনা করিয়া আসিলাম, তাহার ভিত্তি লোক-হিত-আকাঙ্ক্ষার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। এই মার্গে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া শিষ্য যে সাধনা করিয়া আসিয়াছেন, তাহার সহিত সেবা বা আত্মোৎসর্গভাব পূর্ণভাবে জড়িত। তা'ই এই মহামার্গে অবস্থিত শিষ্য, স্রোত-আপত্তি দীক্ষালাভ করিয়া, সকৃদাগামী দীক্ষালাভ করিয়া, অনাগামী দীক্ষালাভ করিয়া, অর্হত্ব দীক্ষার পর, জরা-ব্যাধি জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে চিরকালের জন্য মুক্ত হইয়া, যখন মধুর গম্ভীর স্বরে গাহিয়া উঠেন,—

"অনেকজাতি সংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং।
গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং॥
গহকারক। দিট্ঠোহসি পুন গেহং ন কাহসি।
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্গা গহকূটং বিসঙ্খিতং।
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তণ্হানং খয়মজ্ঝগা॥"

(দেহরূপ গৃহ নির্ম্মাতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে, কিন্তু তাহাকে না পাইয়া, কতবার জন্মগ্রহণ করিলাম, কত সংসারই পরিভ্রমণ করিলাম; পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ কি দুঃখকর! হে গৃহকারক, এইবার তোমাকে দেখিয়াছি, আর গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না; তোমার সকল কাষ্ঠদণ্ড ভগ্ন হইয়াছে, গৃহাবলম্বন নষ্ট হইয়াছে, নির্ব্বাণগত আমার চিত্তে সকল তৃষ্ণা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে;)—

এইরূপ ভাবে সংসারের শেষ কলঙ্করেখা হইতে মুক্ত হইয়া, পবিত্র নীলাম্বরে নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, সকল দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি সেই মহালয়ে, প্রজ্ঞা-জ্যোতিঃ-বিমণ্ডিত, জীবন্মুক্ত সাধক যখন বিরাজ করেন; সংসার-লবণাম্বুধির উত্তালতরঙ্গভঙ্গের গম্ভীর গর্জ্জন হইতে বহুদূরে, অতি পবিত্র, অতি সুমধুর, দৈব সুরলহরী-মালার ঐক্যতান-মধ্যে যখন তিনি নিহিত থাকেন; তখন সেই দেবমানব-বাঞ্ছিত অবিচ্ছিন্ন নিত্যশান্তির আনন্দময় অঙ্কে অবস্থিত থাকিয়াও, তিনি, তাঁহার পরিত্যক্ত পৃথিবীতে অবস্থিত, মায়াবিমোহিত, নরনারীর কথা বিস্মৃত হইতে পারেন না; তখন তিনি অবিদ্যা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ, সংসার-ঘূর্ণীতে বিকল-চিত্ত, তাঁহার অতীত-জীবনের সহচর-সহচরীদিগের করুণ ক্রন্দন শুনিতে পান; তখন তিনি অজ্ঞানান্ধ অসহায় মর্ত্ত্যবাসীর গভীর তিমিরঘোরে বৃথা পথানুসন্ধানের আকুল চেষ্টা দেখিতে পান। তিনি দেখেন, যে দুঃখ, যে মোহ, যে হৃদয়-দৌর্ব্বল্য হইতে তিনি এখন উত্তীর্ণ, অসংখ্য জীব তাহা দ্বারাই হতচেতন। এখন যেন তাঁহার সেই দুঃখ মহাশান্তিতে পরিণত হইয়াছে; সেই মোহ এখন যেন বিদ্যায় পরিণত হইয়াছে; সেই হৃদয়-দৌর্ব্বল্য অনন্ত বীর্য্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাহাতেই বা কি? নিজে মুক্ত বলিয়া, অসহায় মানবদিগের অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া তিনি কি উদাসীন থাকিবেন? না, তাহা তিনি থাকিতে পারেন না। তিনি যে জন্ম জন্ম পরকল্যাণ-কামনায় কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছেন! তিনি যে জন্ম জন্ম আপন শান্তি অপরের মঙ্গলার্থে উৎসর্গ করিয়া আসিয়াছেন! তাই তিনি জীবের আর্ত্তনাদে এখন বধির হইতে পারেন না। মুক্ত তিনি, সকল শৃঙ্খল ছিন্ন করিলেও একটি মাত্র শৃঙ্খল স্বেচ্ছায় রাখিয়া দিয়াছেন; তাহা করুণার শৃঙ্খল, তাহা প্রেমের শৃঙ্খল, তাহা অনুকম্পার শৃঙ্খল। ঐ কোমল শৃঙ্খল সুদূর অতীত কাল হইতে তিনি রচনা করিয়া আসিয়াছেন,—এই চরমকালে জীব-মঙ্গলার্থে তাহার দ্বারা তিনি স্বেচ্ছায় আবদ্ধ হইবেন বলিয়া।

তাই, মানব-জীবনের চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়া, তিনি দেখেন, —"তাঁহার সম্মুখে ইন্দ্রধনুর মত সাতটি বিভিন্ন পথ বিস্তৃত, তাঁহার অবলম্বনীয় সাতটি মার্গ বিদ্যমান। অমানুষিক শক্তি ও মহিমায় মণ্ডিত হইয়া তিনি অনন্ত বিশ্বের মধ্যে নানা ভাবে কার্য্য করিতে পারেন। এখন প্রকৃতি তাঁহার দাসী, তিনি ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত রাজা,—তিনি বিশ্বযজ্ঞের মহা হোতা। তিনি এই মার্গসপ্তের মূলদেশে দণ্ডায়মান হইয়া দেখেন যে, ইহাদিগের মধ্যে একটি আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া পৃথিবীর অভিমুখে গিয়াছে। ইহা অবলম্বন করিলে, আবার স্বেচ্ছায়

পার্থিব দেহ-রূপ মলিন পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হইবে, পার্থিব ভূতের গুরুতার আবার বহন করিতে হইবে। এই মার্গ অবলম্বন করিলে, আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া তথায় কার্য্য করিতে হইবে।" * জীবন্ত শক্তি এখন তাঁহার করায়ত্ত। সেই ঐশী শক্তি তাঁহাকে এখন ইন্দ্রত্ব বা অধিকতর উচ্চপদ দিতে পারে বা আত্মশান্তি আনিয়া দিতে পারে। কিন্তু তিনি তাহা লইলেন না। "তিনি আর ছয়টি মার্গ পরিত্যাগ করিয়া যে ধারাটি ভাগীরথীর মত মর্ত্ত্যলোকে অবতরণ করিয়া সগরবংশের উদ্ধার ও পাতকিত্রাণ করে, তিনি তাহাই অবলম্বন করিলেন। পৃথিবী ধন্য হইল! তিনি স্বেচ্ছায় পার্থিক সংস্রব রক্ষা করিলেন,—জীবের মহোপকার সাধন করিবার জন্য। এইরূপে অনন্ত চৈতন্য-জ্যোতিতে বিমণ্ডিত চৈতন্যরূপী তিনি, জীবকে মুক্ত করিবেন বলিয়া, আবার দীন মানব-দেহ ধারণ করিয়া আসিলেন।" *

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, মোক্ষ-ধর্ম্ম বা বুদ্ধ-ধর্ম্ম এই সমস্ত মহাপুরুষ কর্ত্তৃক প্রচারিত ও রক্ষিত আছে। যিনি তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান, তাঁহাকে হিন্দু জগৎ-গুরু ও বৌদ্ধ বোধিসত্ত্ব নামে অভিহিত করেন। ইনিই কালে কালে নানাস্থানে আবির্ভূত হইয়া, দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া, মানবের সাধনোপায় প্রচার করেন। তাই প্রজ্ঞাপারমিতার স্তুতিতে আছে,—

বিনেয়ং জনমাসাদ্য তত্র তত্র তথাগতৈঃ।
বহুরূপা ত্বমেবৈকা নানানামভিরীড্যসে ॥

বোধিসত্ত্বের পরের অবস্থা হইতেছে বুদ্ধত্ব। যে মহাযজ্ঞের ফলে, যে মহা উৎসর্গের জন্য বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ হন, তাহা আমরা জানি না। বুদ্ধত্বের সাধনা অতি কঠোর; তাঁহার যে ত্যাগ, তাহা মানব-কল্পনাতীত। বহুকাল পরে, তবে একজন বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। অনন্ত মানব সমষ্টির মধ্যে আমরা কেবল চারিজন বুদ্ধের নাম জানি,—ক্রকুচ্ছণ্ড, কনকমুনি, কশ্যপ এবং গৌতম। আমরা ইহাও জানি যে, মৈত্রেয় ঋষি – এখন যিনি বোধিসত্ত্বপদে সমাসীন, তিনিও কালে বুদ্ধ-পদ প্রাপ্ত হইবেন। যখন বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ-পদে অধিরোহণ করেন, তখন ত্রিলোক মধ্যে একটী আধ্যাত্মিক শক্তিস্রোত প্রবাহিত হয় এবং তৎসাহায্যে প্রস্তর তৃণ হইতে মানব দেবতা পর্য্যন্ত সকলেই কিয়ৎপরিমাণে আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইয়া পড়ে। তাই শুদ্ধোধন-পুত্র শাক্যসিংহ, তাই মহাজ্ঞানী বোধিসত্ত্ব, তাঁহার বহু জন্মের সাধনার সহচর পরম কারুণিক ভক্তপ্রবর মৈত্রেয় ঋষিকে নিজপদে অভিষিক্ত করিয়া দেবমানবের, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণার্থে, অনন্ত সুখ ও শান্তি বিসর্জ্জন দিয়া, নির্ম্মাণ-কায়ার † দীন বেশ

* লেখক-সম্পাদিত "প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র" দ্রষ্টব্য।

† নির্ব্বাণ-জ্ঞান-লাভ করিয়া বা বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণব্রত, পার্থিব দেহত্যাগের পর পূর্ণজ্ঞান লইয়া যে সূক্ষ্মদেহ আশ্রয় করেন, তাহাই নির্ম্মাণ-কায়া। যখন তিনি বোধিসত্ত্ব অবস্থায় থাকেন, তখন এই দেহ সৃষ্টি করেন। অদীক্ষিত কেহই এই দেহ-স্থিত তাঁহাকে দেখিতে পায় না। জগতে যে ঐশ্বরিক করুণা প্রবাহিত, যাহার জন্য মানব-দেবের উন্নতি সম্ভবপর, তাহা ঐ নির্ম্মাণ-কায়ার সাহায্যেই পৃথিবীকে স্পর্শ করে।

গ্রহণ করিয়া বুদ্ধপদে সমারূঢ় হইলেন; নির্ব্বাণ-পদ করায়ত্ত হইলেও, করুণার প্রস্রবণ তিনি, জীবহিতের জন্ম, তাহা ত্যাগ করিলেন। সমস্ত প্রকৃতি, স্বর্গ মর্ত্ত্য এই উৎসর্গানন্দে আপ্লুত হইয়া যেন নূতন বেশ ধারণ করিয়া উঠিল; ত্রিলোক তাঁহার করুণা-স্রোতে ভাসিয়া গেল; সমগ্র সংসার এক অনাস্বাদিত শান্তি-সুধা প্রাপ্ত হইল। ঘাতকহস্ত হইতে তীক্ষ্ণ ছুরিকা পতিত হইল; দস্যু হৃতধন প্রত্যর্পণ করিল; পাপী পুণ্যবান্ হইল; নিষ্ঠুর দয়াময় হইল; আততায়ী শত্রুতা ভুলিয়া গেল; রোগী রোগ-যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইল। স্বর্গ মর্ত্ত্য সমস্বরে গাহিয়া উঠিল,—

"স্বস্তি, স্বস্তি, হে মর্ত্ত্যবাসিন্! সৃষ্টির অপর পার হইতে একজন মহাযাত্রী ফিরিয়া আসিয়াছেন। আবার একজন বুদ্ধ আবির্ভূত হইলেন।"

বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন তিনি বোধিসত্ত্বপদ প্রাপ্ত হন নাই, এমন কি হয়তঃ জীবন্মুক্তও হ'ন নাই, সেই সময় তিনি এই কঠোর অঙ্গীকার করিয়াছিলেন,—এই বুদ্ধ-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার নাম ছিল সুমেধ। তাহার পর বহু জীবন অতিবাহিত হইয়াছে। প্রতি জীবনেই তিনি সেই দুরূহ ব্রতের কথা স্মরণ করিয়াছেন এবং তদর্থে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, লোক-কল্যাণে আপন কল্যাণ যজ্ঞাহুতি দিয়া আসিয়াছেন। যে উদ্দেশ্য সাধন জন্য তাঁহার আবির্ভাব, সুমেধ-জীবনের সেই মহাব্রত এই জীবনে সিদ্ধ হইবে বলিয়া, তিনি সিদ্ধার্থ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই মহাযজ্ঞ সমাপন করিয়া, দেব-মানব, ভূত-প্রেত, কীট-পতঙ্গ সকলের প্রাণে শান্তির ধারা বর্ষণ করিয়া, যে মহাসাধন অবলম্বনে তিনি এই পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন, তাহার গুহ্য-রহস্য মানব-মধ্যে প্রচার করিয়া এবং তাঁহার প্রিয় সহচর মৈত্রেয় ঋষির করে দেবমানবের শিক্ষকতার ভার অর্পণ করিয়া, তিনি মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিলেন।

মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিলেন! এতকাল যেই জীবের কল্যাণার্থে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, সেই জীবকুলকে মায়াচ্ছাদনে ফেলিয়া তিনি কি মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিলেন! না, তাহা তিনি করেন নাই। শিক্ষকতার ভার ভগবান্ মৈত্রেয় ঋষিকে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াও তিনি পৃথিবীকে একেবারে ত্যাগ করেন নাই। বৈশাখী-পূর্ণিমার পবিত্র বাসরে, প্রতিবৎসর এখনও তাঁহার দেহ-বিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ দিন একবার তিনি আবির্ভূত হ'ন এবং জ্ঞানী ও বরেণ্য তাঁহার মার্গানুবর্ত্তীদিগকে এবং অবিকশিত অজ্ঞানী, কিন্তু ভক্তিরসার্দ্র মানব-শিশুদিগকে প্রতিবৎসর আশীর্ব্বাদ করেন।

তিনি পৃথিবীতে না আসিলেই বা কি? যেখানেই অবস্থান করুন, যে অবস্থায় অবস্থিত হইয়া বিলাস করুন, তিনি অনন্তে বর্ত্তমান, তিনি মহাশান্তির অঙ্কে সংস্থাপিত। সেই নির্ব্বাণ-অবস্থায় বা অসম্ভৃতধাতুতে, সেই অচ্যুত, অনুত্তর, সেই পরম-সুখরূপ শূন্যে অবস্থিত থাকিয়াও বাঁশরী-বিনিন্দিত সুরে তিনি দেব-মানবকে তাঁহার স্বধামাভিমুখে আহ্বান করিতেছেন এবং উত্তপ্ত পদার্থ যেইরূপ চতুর্দ্দিকে উত্তাপ বিকীর্ণ করে, তিনি সেইরূপ স্বর্গে,

মর্ত্ত্যে, অন্তরীক্ষে, ঊর্দ্ধে, অধে, চতুর্দ্দিকে সেই অপ্রমেয়, অসখ্যেয়, অক্ষর, অনিমিত্ত, শান্তিপূর্ণ স্ব-ভাব প্রসার করিতেছেন, আর ব্রহ্মানন্দে বা প্রজ্ঞানন্দে অবস্থিত থাকিয়া বলিতেছেন,—

প্রজ্ঞাপারমিতাং স্তুত্বা যন্ময়োচিতং শুভম্।
তেনাস্ত্বাশু জগৎ কৃৎস্নং প্রজ্ঞাপারপরায়ণম্ ॥—প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র—২১।

উঠ, জাগ মর্ত্ত্যবাসিন্! ভক্তবৎসল করুণাময়ের আশীর্ব্বচন দেবতার অর্ঘ্যের মত ভক্তি-পূর্ব্বক সাদরে গ্রহণ কর এবং বল,—"হে মানব-তরুর পূর্ণ বিকশিত কুসুম! এই মহা-জাতির - এই পঞ্চম জাতির ইতিহাসে মানবের প্রথম পূর্ণ পরিণাম! আমরা তোমায় নমস্কার করিতেছি। সংসার-নিলয় মধ্যে মার কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত অসংখ্য মানব যেন তোমার পবিত্র চরিত্র ও উৎসর্গ-কাহিনী হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তোমার অনন্ত করুণা সংস্পর্শে পবিত্র হইয়া তোমার মার্গ অনুবর্ত্তন করে!

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ।

শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

পদধ্বনি।

দিবস রজনী গণি; তাঁর পদধ্বনি—
আসিছে সে! এই এল! আসিবে এখনি;
নিশা অবসানে ঊষা যেমন করিয়া
আসে ধীরে, গগনের প্রান্ত উজ্জ্বলিয়া,
কনক চরণ পাতে, শিরোদেশে ধরি'
রতন মুকুট, কিরণের বাস পরি'
সিন্দূর-রঞ্জিত ভালে; মলয় পবন
আসে যথা বন-মাঝে তুলিয়া স্পন্দন
মৃদুমন্দ, মধুমাসে; সুখ-স্বপ্ন সম
সুগভীর নিশাকালে; স্নিগ্ধোজ্জ্বল কম
জ্যোৎস্না-ধারা-প্রায়। ঐ বুঝি আসিছে সে!
চুপ্! যাও সবে হেথা হ'তে! চারিপাশে
শুনা যায় পদধ্বনি! রহিব একাকী—
না হ'লে সে চলে' যাবে দিয়ে বড় ফাঁকি!

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কবিরত্ন।

বেদান্ত-পরিভাষা।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

[২]

মূল। ন চৈবমেকত্র জ্ঞানে পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বয়োরভ্যুপগমে তয়োর্জ্জাতিত্বং ন স্যাদিতি বাচ্যম্। ইষ্টত্বাৎ। জাতিত্বোপাধিত্ব-পরিভাষায়াঃ সকল-প্রমাণা-গোচরত্বেন অপ্রামানিকত্বাৎ। "ঘটোঽয়ম্" ইত্যাদি প্রত্যক্ষং হি ঘটত্বাদিসদ্ভাবে মানম্ ন তু তস্য জাতিত্বেঽপি জাতিত্বরূপসাধ্যস্য অপ্রসিদ্ধৌ তৎসাধকানুমানস্যাপি অনবকাশাৎ সমবায়সিদ্ধ্যা ব্রহ্মভিন্ননিখিলপ্রপঞ্চস্য অনিত্যতয়া চ নিত্যসমবেতত্ব-ঘটিতজাতিত্বস্য ঘটত্বাদাবসিদ্ধেশ্চ। এবমেবোপাধিত্বং নিরসনীয়ম্।

ব্যাখ্যা। ন্যায়মতে জাতি ও সমবায় এক একটি পদার্থ সমবায় অর্থে নিত্যসম্বন্ধ। "সমবায়ত্বং নিত্যসম্বন্ধত্বম্"। কার্য্য ও কারণের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ আছে। এইরূপ নিত্য সম্বন্ধকে সমবায় সম্বন্ধ বলে। নিত্যত্ব ও অনেকে সমবেতত্ব জাতির লক্ষণ। "নিত্যত্বে সতি অনেকসমবেতত্বম্।" যেরূপ গোজাতি পৃথক্ পৃথক্ গো সমূহ ধ্বংস হইতে পারে, কিন্তু ন্যায়মতে গো জাতির কখনও ধ্বংস হইবে না। অর্থাৎ যে গুণসমূহের সমষ্টিকে সকল গো-তে আছে বলিয়া, আমরা জাতিরূপে পৃথক্ করিয়াছি সেই সমষ্টির আর ধ্বংস কি? কাজেই নিত্যত্ব ও অনেকে সমবেতত্ব (অনেক গো-তে বর্ত্তমানত্ব) জাতির লক্ষণ। * গোজাতি বলিলে কোন বিশেষ গো-কে বুঝি না। পৃথিবীর সমস্ত গো যদি আজ ধ্বংস হইয়া যায়, তাহা হইলেও গোজাতি বলিলে একটা অনুভব হইবে। সকল গো-র যাহা সাধারণ লক্ষণ, তাহার সমষ্টিরূপ অনুভব হইবে। এখানে দেখা যাইতেছে, এই সকল গো-তে বর্ত্তমান সাধারণ লক্ষণ হওয়াতে (অনেকসমবেতত্ব) ও নিত্য হওয়াতে (পৃথক্ পৃথক্ গো ধ্বংস হইলেও গোজাতি বলিলে একটা অনুভব হয়। জাতির লক্ষণ সমাধা হইল।

এখন জাতির কয়েকটি বাধক আছে। সেগুলির একটি থাকিলেই আর জাতি হয় না; যেমন আকাশ। আকাশ আর দুইটি নাই। কাজেই জাতির লক্ষণ "অনেক-সমবেতত্ব" এখানে ঘটিল না। এখানে বাধা হইল, "ব্যক্তির অভেদ অর্থাৎ ব্যক্তির একটি মাত্র।" এইরূপ স্থলে জাতিত্ব নাই, কিন্তু উপাধিত্ব বিদ্যমান।

* পাশ্চাত্য দর্শনে ইহাকে class আখ্যা দেওয়া হয়। Concept যখন আমাদের মনে গঠিত হয়, তখন আমরা প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন একজাতীয় বস্তু দেখি, তাহার পর তাহাদের সাধারণ লক্ষণগুলি পৃথক্ করি ও একটি জাতি স্থির করিয়া তাহার একটি নাম দিই। ন্যায়ের অনেক-সমবেতত্ব এই সাধারণ লক্ষণগুলি সম্বন্ধে প্রযুক্ত। গোজাতির সাধারণ লক্ষণ গল-কম্বল, লাঙ্গুল প্রভৃতি।

জাতির নিম্নলিখিত বাধক হইতে পারে—

"ব্যক্তেরভেদস্তুল্যত্বং সঙ্করোঽথানবস্থিতিঃ।
রূপহানিরসম্বন্ধো জাতিবাধকসংগ্রহঃ॥"—[উদয়নাচার্য্য কৃত কিরণাবলী]

এখানে কেবল 'সঙ্কর'-রূপ বাধকটি বুঝিলেই আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইবে। দুইটি বস্তু যদি এরূপ হয়, যে একটি হইলে অপরটি হইতে পারে না, বা একটি থাকিলে অপরটি থাকিতে পারে না, কিন্তু এরূপ হইলেও যদি তাহাদের একত্র সমাবেশ হয়, তাহা হইলে সঙ্কর দোষ হইল। পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ। তাহাদের যদি একত্র সমাবেশ হয়, তাহা হইলে সঙ্কর দোষ হইবে। পূর্ব্বে বেদান্তবাদী বলিয়াছেন যে, "পর্ব্বতো বহ্নিমান্"; এস্থলে পর্ব্বত অপরোক্ষ ও বহ্নি পরোক্ষ। কাজেই এস্থলে পরোক্ষ ও অপরোক্ষের একত্র সমাবেশ হওয়াতে সঙ্কর দোষের উৎপত্তি হইল; কাজেই তাহারা জাতি হইতে পারে না। তাই নৈয়ায়িক বেদান্তবাদীকে বলিতেছেন, ["তুমি যেরূপ বলিতেছ, সেইরূপ হইলে] একস্থলে জ্ঞানেতে পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব ধরিতে হয়; কাজেই তাহারা জাতি হইতে পারে না।"

বেদান্তবাদী উত্তর করিতেছেন, "নাই বা হইল। [জাতি আবার কি? আমি জাতি আছে বলিয়াই স্বীকার করি না। তুমি আর আমার কি দোষ দেখাইতেছ?] 'জাতিত্ব,' 'উপাধিত্ব' (পূর্ব্ব উল্লিখিত আকাশের উদাহরণ দ্রষ্টব্য) প্রভৃতি নৈয়ায়িক পরিভাষার কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং আমি এ সকল মানি না।"

'"এই ঘট" এইরূপ যখন প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, তখন "ঘটত্ব" বলিয়া এক পদার্থ আছে, তাহা মানি; কিন্তু ঘটত্ব যে জাতি, তাহার কোন প্রমাণ নাই। যে গুণগুলির সমষ্টি ঘটকে অন্যান্য বস্তু হইতে পৃথক্ করে, তাহাই ঘটত্ব। ঘটত্ব বেদান্তবাদী স্বীকার করিতেছেন, কিন্তু অনুমান দ্বারা আবার জাতি নামক পদার্থের প্রমাণ-চেষ্টা বেদান্তবাদীর মতে অনুপযুক্ত]। [নৈয়ায়িক যদি বলেন, অনুমিতি দ্বারা প্রমাণ করিব যে, জাতি আছে—"ঘটত্বাদিকং জাতিঃ, উপাধিভিন্নসামান্যধর্ম্মত্বাৎ, সত্তাবৎ,"—তাহার উত্তর এই]—জাতি এখানে সাধ্য অর্থাৎ জাতিকে এখানে প্রমাণ করিতে হইবে। সাধ্যই যখন অপ্রসিদ্ধ, জাতি বলিয়া যখন কিছুই নাই, তখন তাহার সাধক অনুমিতির প্রয়োগ হইবে কিরূপে? [কোন বস্তুর যদি পৃথিবীতে অস্তিত্ব থাকে, তবে ত আমরা তাহার অনুমান করি; যাহা নাই, তাহার আবার অনুমান কি?]

নিত্যসম্বন্ধ বা সমবায় অসিদ্ধ। নৈয়ায়িক জাতির সংজ্ঞা করিয়াছেন নিত্যত্ব ও অনেক সমবেতত্ব। 'ঘটত্ব' প্রভৃতিতে এই লক্ষণ খাটে না। এক ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্তই অনিত্য। ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুতেই নিত্যত্ব নাই। সমবায়ও অসিদ্ধ, কাজেই জাতির লক্ষণ ঘটত্ব প্রভৃতিতে প্রযুক্ত হইতে পারে না।

এইরূপ যুক্তি দ্বারা "উপাধিত্ব"ও (পূর্ব্বোল্লিখিত আকাশের উদাহরণ দ্রষ্টব্য) খণ্ডন করা যাইতে পারে।

মূল। "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" ইত্যাদৌ চ পর্ব্বতাংশে বহ্ন্যংশে চ অন্তঃকরণবৃত্তি-ভেদাঙ্গীকারেন তত্তদ্‌বৃত্ত্যবচ্ছেদকভেদেন পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বয়োরেকত্র চৈতন্যে ন বিরোধঃ। তথাচ তত্তদিন্দ্রিয়যোগ্যবর্ত্তমানবিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যাভিন্নত্বং তত্তদাকার বৃত্ত্যবচ্ছিন্নজ্ঞানস্য তত্তদংশে প্রত্যক্ষত্বম্।

[প্রথমে 'অবচ্ছেদক' শব্দের অর্থ বুঝা যাউক। পর্ব্বত দেখিলে অন্তঃকরণের বৃত্তি পর্ব্বতের আকার ধারণ করে। এই পর্ব্বতত্বরূপ ধর্ম্ম এই বৃত্তিকে অন্যান্য বৃত্তি হইতে পৃথক্ করিতেছে। যেমন অগ্নি দেখিবার সময় অন্তঃকরণের বৃত্তি অগ্নিত্বরূপ এক বিশেষ গুণ অবলম্বন করে। অগ্নিত্ব, পর্ব্বতত্বে নাই। এই অন্য বৃত্তি হইতে পৃথক্‌কারী ধর্ম্মকে অবচ্ছেদক বলে। "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" এই বাক্যের মধ্যে দুইটি অবচ্ছেদক আছে। পর্ব্বতত্ব ও বহ্নিত্ব।] "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" ইত্যাদি বাক্যে পর্ব্বত অংশ ও বহ্নি অংশে বিভিন্ন অন্তঃ-করণের বৃত্তি ; কেন না বৃত্তির অবচ্ছেদক দুইটি বিভিন্ন। কাজেই একই জ্ঞানে পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব থাকার বিরোধ হইতেছে না।

[এতক্ষণে প্রত্যক্ষের একটি বিস্তৃত সংজ্ঞা দিবার সময় আসিয়াছে।] তাহা এই,—ইন্দ্রিয়গণের গ্রাহ্যযোগ্য ও বর্ত্তমান বিষয়ের জ্ঞানের সহিত ঐ বিষয়ের আকারধারী অন্তঃকরণ-বৃত্তিরূপ জ্ঞানের অভেদই প্রত্যক্ষ। [ইহার ব্যাখ্যাই এতক্ষণ ধরিয়া করা হইতেছিল। শেষে এই সার কথা পুনর্ব্বার স্পষ্ট করিয়া বলা হইল।]

মূল। ঘটাদের্ব্বিষয়স্য প্রত্যক্ষত্বং প্রমাত্রভিন্নত্বম্। নন্বু কথং ঘটাদেরন্তঃকরণা-বচ্ছিন্নচৈতন্যাভেদং 'অহমিদং পশ্যামি' ইতি ভেদানুভববিরোধাৎ ? ইতি চেৎ, উচ্যতে। প্রমাত্রভেদো নাম ন তাবদৈক্যং কিন্তু প্রমাতৃসত্তাতিরিক্তসত্তাকত্বাভাবঃ। তথাহি ঘটাদেঃ স্বাবচ্ছিন্নচৈতন্যেঽধ্যস্ততয়া বিষয়চৈতন্যসত্তৈব ঘটাদিসত্তা, অধিষ্ঠান-সত্তাতিরিক্তারোপিতসত্তায়া অনঙ্গীকারাৎ। বিষয়চৈতন্যঞ্চ পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ প্রমাতৃচৈতন্য মেবেতি প্রমাতৃচৈতন্যস্যৈব ঘটাদ্যধিষ্ঠানতয়া প্রমাতৃসত্তৈব ঘটাদিসত্তা নান্যেতি সিদ্ধম্ ঘটাদেরপরোক্ষত্বম্।

ব্যাখ্যা। [পূর্ব্বে দুইটি প্রশ্ন করা হইয়াছিল। জ্ঞানগত প্রত্যক্ষের প্রয়োজক কি ও বিষয়গত প্রত্যক্ষের প্রয়োজক কি ? প্রথমটির উত্তর দেওয়া হইয়াছে।] প্রত্যক্ষের জ্ঞান কিরূপে হয়, তাহাও বুঝান হইয়াছে। এক্ষণে প্রত্যক্ষের বিষয় যাহা, তাহার সম্বন্ধে কিছু বলা হইতেছে।

ঘটাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাতৃর সহিত অভেদের ভাব। যদি বল, ঘটাদি ও অন্তঃকরণ বিশিষ্ট চৈতন্য যে এক, তাহা কিরূপে সম্ভব ? "আমি, ইহা দেখিতেছি'—এইরূপ যখন জ্ঞান হয়, তখন 'আমি' ও 'ইহা' যে পৃথক্ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না ! তবে প্রমাতৃর সহিত বিষয়ের অভেদ কিরূপে হইতে পারে ?

উত্তরে বলিতেছি, প্রমাতৃর সহিত অভেদ—ইহার অর্থ উভয়েই যে এক, তাহা নয়। প্রমাতৃর অস্তিত্ব ব্যতীত বিষয়ের একটি পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, এই কথা বলিতেছি মাত্র। ঘট প্রভৃতির ভ্রমজ্ঞান ঘটাদি বিষয়-চৈতন্যে হয়। [এই মিথ্যা জ্ঞানকে অধ্যাস বলে। অধ্যাসকে "তদভাববতি তৎপ্রকারকং জ্ঞানম্" বলা হইয়াছে। অর্থাৎ যাহাতে কোন বস্তুর অভাব, তাহাতে যদি সেই বস্তুর জ্ঞান হয়, তাহা হইলে তাহা অধ্যাস। যথা শুক্তিতে রজতজ্ঞান।] এখন আরোপিত সত্তা ও অধিষ্ঠিতসত্তার পৃথক্ অস্তিত্ব কেহ স্বীকার করেন না। [শুক্তিকে যখন রজত বলিয়া ভ্রম করি, তখন সেই শুক্তি ও যে রজত বলিয়া ভ্রম করিতেছি, তাহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব বিদ্যমান নাই।] বিষয়-চৈতন্যের অস্তিত্ব ও ঘটাদির অস্তিত্ব এইরূপে পৃথক্ নহে। আবার পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দেখান যাইতে পারে যে, বিষয়-চৈতন্য ও প্রমাতৃ-চৈতন্যের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই; প্রমাতৃ-চৈতন্যেরই অধিষ্ঠিত সত্তা। বিষয়-চৈতন্যের আরোপিত সত্তা। কাজেই প্রমাতৃ-সত্তাই ঘটাদিসত্তা, পৃথক্ নহে। এইরূপে ঘটাদির অপরোক্ষত্ব সিদ্ধ হইল।

[তর্ক এইরূপ – শুক্তিতে যখন রজতজ্ঞান হয়, তখন শুক্তির অস্তিত্বকে অধিষ্ঠিতসত্তা বলি, আর রজতের অস্তিত্বকে আরোপিত সত্তা বলি; কেননা রজতের অস্তিত্ব শুক্তিতে আরোপিত হইয়াছে। কিন্তু জিনিষ একটিই। কাজেই এই অধিষ্ঠিত সত্তা ও আরোপিত সত্তার পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। সেইরূপ ঘটাদিসত্তা আরোপিত সত্তা, বিষয়-চৈতন্য-সত্তা অধিষ্ঠিত সত্তা। ইহাদেরও পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। আবার এইরূপেই বিষয়-চৈতন্য আরোপিত সত্তা, প্রমাতৃ-চৈতন্য অধিষ্ঠিতসত্তা। তাহাদেরও পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। কাজেই দাঁড়াইল, ঘটাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষ-প্রমাতৃর সহিত অভিন্নত্ব।]

মূল। অনুমিত্যাদিস্থলেঽন্তঃকরণস্য বহ্ন্যাদি দেশনির্গমনাভাবেন বহ্ন্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্যস্য প্রমাতৃচৈতন্যানাত্মকতয়া বহ্ন্যাদিসত্তা প্রমাতৃসত্তাতো ভিন্নেতি ইতি নাতিব্যাপ্তিঃ।

নন্বেবমপি ধর্ম্মাধর্ম্মাদিগোচরানুমিত্যাদিস্থলে ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ প্রত্যক্ষত্বাপত্তিঃ। ধর্ম্মাদ্যবচ্ছিন্নচৈতন্যস্য প্রমাতৃচৈতন্যাভিন্নতয়া ধর্ম্মাদিসত্তায়াঃ প্রমাতৃসত্তান-তিরেকাদিতি চেন্ন, যোগ্যত্বস্যাপি বিষয়বিশেষণত্বাৎ।

ব্যাখ্যা। কিন্তু অনুমিতির স্থলে (যেমন ধূম দেখিয়া বহ্নি অনুমান করিলাম) অন্তঃকরণ অগ্নি প্রভৃতি দেশে যায় না (পূর্ব্বে ইহা বুঝান হইয়াছে); কাজেই বহ্নিবিশিষ্ট চৈতন্য ও প্রমাতৃ-চৈতন্য এক নহে। কাজেই বহ্নি প্রভৃতির অস্তিত্বও প্রমাতৃর অস্তিত্ব হইতে পৃথক্। সুতরাং প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা যাহা আমরা করিয়াছি তাহা অনুমিতিতেও খাটিতেছে, এই কথা বলা চলে না। এরূপ অতিব্যাপ্তি দোষ হইতেই পারে না।

আবার ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম প্রভৃতি জ্ঞানের অনুমিতিস্থলে (পূর্ব্বে ইহা বুঝান হইয়াছে) ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম প্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে, এই আপত্তিও করিতে পারে না। যদি বল, যে ধর্ম্মাদিবিশিষ্ট

চৈতন্য ও প্রমাতৃ চৈতন্য একই, কাজেই ধর্ম্মাদিসত্তা ও প্রমাতৃসত্তাও অভিন্ন। তাহার উত্তরে আমরা বলি যে, আমাদের সংজ্ঞায় "বিষয়" শব্দটির একটি বিশেষণ প্রয়োগ করিলেই সেই রূপ দোষের অবকাশ থাকিবে না। সেই বিশেষণটি "যোগ্য"। [পূর্ব্বে ইহা আর এক প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।]

মূল। নম্বেবমপি "রূপী ঘট" ইতি প্রত্যক্ষস্থলে ঘটগত পরিমাণাদেঃ প্রত্যক্ষত্বাপত্তিঃ রূপাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যস্য পরিমাণাদ্যবচ্ছিন্নচৈতন্যস্য চ একতয়া রূপাদ্যবচ্ছিন্নচৈতন্যস্য প্রমাতৃচৈতন্যাভেদেন পরিমাণাদ্যবচ্ছিন্নচৈতন্যস্যাপি প্রমাত্রভিন্নতয়া পরিমাণসত্তায়াঃ প্রমাতৃসত্তাতিরিক্তত্বাভাবাৎ ইতি চেৎ, ন। তত্তদাকারবৃত্ত্যুপহিতত্বস্যাপি প্রমাতৃবিশেষণত্বাৎ। রূপাকারবৃত্তিদশায়াং পরিমাণাকারবৃত্ত্যভাবেন পরিমাণাকারবৃত্ত্যুপহিত প্রমাতৃচৈতন্যাভিন্নসত্ত্বাকত্বাভাবেন অতিব্যাপ্ত্যভাবাৎ।

ব্যাখ্যা। এখন যেখানে "রূপবিশিষ্ট ঘট" এই জ্ঞান হইতেছে, সেখানে 'রূপ' নামক ধর্ম্ম ঘটে বিদ্যমান। ঘটের আরও অনেক ধর্ম্ম আছে। 'পরিমাণ' প্রভৃতি [বেদান্তের মতে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী (অর্থাৎ যাহার ধর্ম্ম আছে) সে অভিন্ন। "ধর্ম্মধর্ম্মিণোরভেদঃ।" কাজেই আপত্তি হইতে পারে যে, যখন একটি ধর্ম্ম (যেমন রূপ) প্রত্যক্ষ, তখন অন্য ধর্ম্মই বা (যেমন পরিমাণ প্রভৃতি) প্রত্যক্ষ হয় না কেন?] এখন 'রূপবান্ ঘট' এই প্রত্যক্ষ স্থলে ঘটের পরিমাণ প্রভৃতি ধর্ম্মেরও প্রত্যক্ষ হউক, কেননা রূপবিশিষ্ট চৈতন্য ও পরিমাণাদি-বিশিষ্ট চৈতন্য এক। রূপবিশিষ্ট চৈতন্য যদি প্রমাতৃ-চৈতন্যের সহিত অভিন্ন হয়, তাহা হইলে পরিমাণবিশিষ্ট চৈতন্যও প্রমাতৃ-চৈতন্যের সহিত অভিন্ন। তাই যদি হয়, তাহা হইলে পরিমাণসত্তা ও প্রমাতৃসত্তা এক হউক।

এই আপত্তির উত্তরে বলিতেছি না। প্রমাতৃ শব্দের একটি বিশেষণ লইতে হইবে; তাহা এই "(যে যে বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইবে) সেই সেই আকারের বৃত্তির সহিত সংযুক্ত।" এই বিশেষণটি ধরিয়া লইলে আর কোনও গোলযোগের সম্ভাবনা নাই। কেননা, যখন "রূপবান্ ঘট" এই প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন অন্তঃকরণের বৃত্তি রূপাকার। পরিমাণাকার কোনও বৃত্তি তখন নাই। কাজেই রূপযুক্তবৃত্তি দ্বারা যে প্রমাতৃ-চৈতন্য জনিত, তাহার সহিত পরিমাণ-যুক্তবৃত্তি দ্বারা জনিত প্রমাতৃ-চৈতন্যের একত্র অস্তিত্ব নাই। (সুতরাং পরিমাণ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ হইতে পারে না।) অতিব্যাপ্তি দোষ এইরূপে নিরাকৃত হইল।

মূল। নম্বেবং বৃত্তৌ অব্যাপ্তিঃ। অনবস্থাভিয়া বৃত্তিগোচরবৃত্ত্যনঙ্গীকারেণ তত্র স্বাকারবৃত্ত্যুপহিতত্বঘটিতোক্ত লক্ষণাভাবাৎ ইতি চেৎ, ন। অনবস্থাভিয়া বৃত্ত্যোর্বৃত্ত্যন্তরাবিষয়ত্বেঽপি স্ববিষয়ত্বাভ্যুপগমেন স্ববিষয়—বৃত্ত্যুপহিত প্রমাতৃচৈতন্যাভিন্নসত্তাকত্বস্য তত্রাপি সত্ত্বাৎ।

ব্যাখ্যা। [অতিব্যাপ্তি দোষ দেখাইবার জন্য চেষ্টা করা হইল। তাহা নিষ্ফল। এক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ দেখাইবার চেষ্টা করা হইতেছে।] আচ্ছা, দেখ বৃত্তিতে তোমার সংজ্ঞা খাটিতেছে না। [অন্তঃকরণ বিবিধ বস্তুর আকার ধারণ করে। এই পরিণামকে বৃত্তি বলে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এখন এই বৃত্তির জ্ঞানের জন্য আর একটি বৃত্তির প্রয়োজন, তাহা প্রমাতৃকে প্রথম বৃত্তি জানাইবে। আবার এই দ্বিতীয় বৃত্তির জ্ঞানের জন্য তৃতীয় একটি বৃত্তির প্রয়োজন। এইরূপ বৃত্তির পর বৃত্তি চলিতে থাকিল।] বেদান্তবাদী যদি বলেন যে, একটি বৃত্তিকে জানিতে আর একটি বৃত্তির দরকার নাই, তাহা হইলে তাঁহার সংজ্ঞায় দোষ পড়িল ; কেননা তিনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, "(যে যে বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইবে) সেই সেই আকারের বৃত্তির সহিত প্রমাতৃ অভিন্ন হইবে।"

তাহার উত্তরে বলিতেছি, "যদিও পাছে বৃত্তির পর বৃত্তি অনবরত ধরিতে হয়, এই ভয়ে আমরা (বেদান্তবাদী) একটি বৃত্তি আর একটি বৃত্তির বিষয় ইহা স্বীকার করি না বটে, তাহাতে আমাদের সংজ্ঞায় কোনও দোষ পড়ে না। কেননা এখানে বৃত্তি নিজেই নিজের বিষয় হইবে। বৃত্তিটি নিজেকেই নিজে জানিবে ; আর একটি বৃত্তি যে এই বৃত্তিকে জানিবে তাহা নয়। কাজেই "নিজেই নিজের বিষয় এমন যে বৃত্তি তাহার দ্বারা জনিত যে প্রমাতৃ-চৈতন্য তাহার সহিত বিষয়চৈতন্যের অভিন্ন অস্তিত্ব সম্পূর্ণ সম্ভব।

[সোজা কথা এই,—বেদান্তবাদী বলিয়াছেন যে, বিষয়চৈতন্য ও প্রমাতৃ-চৈতন্যের এক অস্তিত্ব। প্রমাতৃ-চৈতন্য যে যে বিষয়ের জ্ঞান হইবে, সেই সেই বিষয়ের ন্যায় বৃত্তি দ্বারা জনিত। এখন যদি ধরা যায় যে, 'বৃত্তি'টিই বিষয়। বৃত্তিটিকেই জানিতে হইবে। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্তমতে এই বৃত্তির ন্যায় আর একটি বৃত্তি প্রমাতৃ-চৈতন্য জন্মাইবে এই দ্বিতীয় বৃত্তি জানিতে তৃতীয় বৃত্তির প্রয়োজন। এইরূপ অনন্ত বৃত্তি চলিতে লাগিল। বৃত্তির এই ধারাবাহিক গতি বেদান্তবাদীও মানিতে প্রস্তুত নন। কাজেই তাঁহার সংজ্ঞায় দোষ পড়িবার যোগাড় হইল। তাঁহার সংজ্ঞা অন্য বিষয়ে খাটিতে পারে, কিন্তু 'বৃত্তি' যখন বিষয় তখন কিরূপে খাটিবে ? যদি তখনও খাটান যায়, তাহা হইলে ধারাবাহিক বৃত্তি সকল বেদান্তবাদীকে স্বীকার করিতে হয়। এই দোষ দূর করিবার জন্য বেদান্তবাদী বলিলেন, "বৃত্তিই বৃত্তির বিষয়। নিজেই নিজের জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

সরল যোগ-সাধন।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

জরাদর্শিত পন্থানং প্রচণ্ড ব্যাধি-সৈনিকম্।
মৃত্যুং শত্রুসমাদিষ্টং আয়ান্তং কিংন পশ্যসি ॥—কুলার্ণব

জরা পথ প্রদর্শন করাইতেছে, প্রচণ্ড ব্যাধি-সৈন্য লইয়া মৃত্যুরূপ শত্রু আসিতেছে, তাহা কি দেখিতে পাইতেছ না।

শরীর রক্ষণায়াসঃ ক্রিয়তে সর্ব্বদাজনৈঃ।
নহীচ্ছন্তি তনুত্যাগমপি কুষ্ঠাদিরোগিনঃ ॥—কুলার্ণব

শরীর রক্ষণের জন্য সকলেই সর্ব্বদা ইচ্ছা করিয়া থাকে, এমন কি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তিও তনুত্যাগের ইচ্ছা করেনা। যাহা বাস্তব থাকিবার বস্তু নহে, একদিন না একদিন অবশ্য তাহার নাশ হইবে; তখন তাহার প্রতি মমতা করিয়া নিজ শ্রেয় সাধনে পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নহে।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং ॥—মহাভারত।

প্রত্যহ শত শত জীব যম-মন্দিরে গমন করিতেছে, তাহা দেখিয়াও অবশিষ্ট সকলে "আমায় যেন মরিতে না হয়, এক্ষণে যেমন স্থির আছি, সেইরূপ স্থির ভাবে যেন থাকিতে পারি" এইরূপ ইচ্ছা করিয়া থাকে; ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্য কি হইতে পারে? "আমি যেন না মরি, অর্থাৎ আমায় যেন মরিতে না হয়", চিত্তের এইরূপ ভ্রমকে শাস্ত্রে "অভিনিবেশ" নামক ক্লেশ কহে।

স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ।—যোগদর্শন।

জীব পুনঃ পুনঃ মৃত্যুদুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছে; কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী, সকলের সেই মৃত্যু সময়ের নানারূপ যন্ত্রণায় সংস্কারগুলি সূক্ষ্মভাবে চিত্তে বদ্ধমূল আছে। উক্ত যন্ত্রণার সংস্কারগুলি শাস্ত্রে স্বরস নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দুঃখের প্রতি যখন সকল জীবের দ্বেষভাব স্বাভাবিক হইয়া থাকে, তখন মৃত্যু, যাহা সকল দুঃখের চরমাবস্থা, তাহাতে কি জন্য বিদ্বেষ ভাব না হইবে? চিত্তে এইরূপ যে মৃত্যুভয় বর্ত্তমান থাকে, তাহা চিত্তের বন্ধনের কারণস্বরূপ একটী প্রধান ক্লেশ। শাস্ত্রে ইহাকে অভিনিবেশ কহে।

অপত্যং মে কলত্রং মে ধনং মে বান্ধবাশ্চ মে ॥

আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদি, আমার ধন সম্পদ্ গৃহাদি, আমার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব স্বজনগণ এইরূপ ধারণায় জীব তুমি সুখের সংসার পাতিয়া বিরাজ করিতেছ।

ইদং কৃতমিদং কার্য্যমিদমন্যৎ কৃতাকৃতম।—হিতোপদেশ।

এই কার্য্য সমাধা করিয়াছি, এক্ষণে এই কার্য্য করিতে হইবে, এবং যাহা করা হইয়াছে তাহার অবশিষ্ট পরে করিতে হইবে,—জীব এইরূপ বিবিধ বাসনায় মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। জীব! তুমি জন্মাবধি সুখের সংসারে অবস্থান করিয়া বিষয়বাসনারূপ লতাকে যত্নে হৃদয়ে পরিপোষণ করিয়া আসিতেছ। দুই একবার যাহা কিছু দুঃখের ঝটিকা সহ্য করিয়া সামান্য কাতর হইয়াছ, তাহাতে হৃদয়ের বিষয় বাসনার লতাটী ম্লান হইয়া তাহার অঙ্গ শিথিল হইয়াছে; দুঃখ বিপদাদির জন্য হৃদয়ে ক্ষণেকের তরে শ্মশান বৈরাগ্য উদয় হইয়াছে। জীব! তোমার সুখের ও যত্নের বিষয় বাসনারূপ লতা এরূপ ম্রিয়মান হইতেছে দেখিয়া কি তুমি স্থির থাকিতে পার? আবার তোমার যত্নের লতাটিকে আশারূপ লতা দ্বারা অন্য স্ত্রী পুত্র ধন গৃহাদিরূপ মমতা-স্তম্ভে সুদৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া দাও এবং ঝটিকা যেন আর তোমার সাধের লতাটিকে ভূমিসাৎ করিতে না পারে তাহার জন্য সততঃ চেষ্টা কর। জীব তুমি ত এরূপ কোন কার্য্য করিয়া সংসারে আগমন কর নাই যে তুমি সতত: সমভাবে সুখে অবস্থান করিবে; মধ্যে মধ্যে দুঃখরূপ ঝটিকা তোমাকে অবশ্য সহ্য করিতে হইবে।

জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুঃ॥

জন্মগ্রহণ করিলে অবশ্য মৃত্যু হইবে। তোমার সাধের বিষয়লতিকা অবশ্যই একদিন ঝটিকার প্রবল বেগে ধরাশায়িনী হইবে; শত সহস্র আশায় বুক বাঁধিতে চেষ্টা কর, কিন্তু একদিন না একদিন তোমার সমস্ত সাধের স্ত্রী পুত্র ধনাদি ত্যাগ করিয়া তোমায় লতিকার ন্যায় ধরাশায়ী হইতে হইবে।

নহি প্রতীক্ষতেমৃত্যুঃকৃতমস্য নবা কৃতম্॥—হিতোপদেশ

কোন কার্য্য হইল বা না হইল, তাহা দেখিবার জন্য মৃত্যু অপেক্ষা করিবে না। মনের সাধ মনেই থাকিয়া যাইবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমায় সাধের সংসার ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।

বাল্য যৌবন বৃদ্ধত্বং যথা দেহান্তরাদিকং।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তির্গৃহাদ্ গৃহমিবাগতিঃ॥—কুলার্ণব

বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য, দেহান্তরাদি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা মাত্র। মনুষ্য যেরূপ এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে গমন করে, দেহান্তর প্রাপ্তিও তদ্রূপ। ইহাতে বাস্তব কোন শোক বা দ্বেষের কারণ নাই। যাহা অবশ্যম্ভাবী প্রাকৃতিক নিয়ম, তাহার অন্যথা করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। তত্রাচ যে, মনুষ্য, মৃত্যুর প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হইয়া অমরণ-ইচ্ছায় দেহরক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, তাহাই অভিনিবেশ নামক অন্যতম ক্লেশ, এবং ইহার বশীভূত হইয়া জীব পরজন্মে নানারূপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে।

ইহৈব নরকব্যাধেশ্চিকিৎসাং ন করোতি যঃ।
গত্বা নিরৌষধং দেশং ব্যাধিস্থঃ কিং করিষ্যতি॥—কুলার্ণব।

ইহলোকে যে নরক-ব্যাধির চিকিৎসা না করে, সে পরলোকে ঔষধ-বর্জ্জিত দেশে ব্যাধি-গ্রস্ত দেহ লইয়া কি করিবে? অর্থাৎ ইহজন্মে যে ভবরোগ হইতে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা না করে, তাহার আর ঐ ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভের উপায় থাকে না, মৃত্যু হইলেই পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।

কো দীর্ঘরোগো ভব এব সাধো।
কিমৌষধং তস্য বিচার এব —মণিরত্নমালা।

হে সাধো! ভবরোগই অতি দীর্ঘরোগ, বিচারই উহার পরমৌষধ। ভবরোগাক্রান্ত এই মানব চিত্তকে জয় করিতে পারিলে, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত নিরুদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারিলে, রোগমুক্ত হইয়া ক্রমে ব্রহ্মমার্গ অনুসরণ করতঃ তাহাতে লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর জন্মমৃত্যুরূপ সংসার-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

সদ্ভিশ্চ সহ কর্ত্তব্যঃ সতাং সঙ্গোহি ভেষজং।
জন্মমৃত্যুজ-দুঃখানাং শান্তিকৃন্নাস্তি তৎপরং ॥—যোগবাশিষ্ঠ।

সজ্জনগণের সহিত সঙ্গ করা কর্ত্তব্য, কারণ সজ্জনগণের সঙ্গ সংসার-তাপ নিবারণের পরম ঔষধ। জন্ম-মরণ-জন্য যাবতীয় দুঃখের শান্তিকর সৎসঙ্গ ভিন্ন আর অন্য কোন উপায় নাই।

সৎসঙ্গো বাসনাত্যাগোঽধ্যাত্মবিদ্যা বিচারণ।
প্রাণস্পন্দনিরোধশ্চেত্যুপায়া শ্চেতসো জয়ে ॥—যোগবাশিষ্ঠ।

সৎসঙ্গ, বাসনাত্যাগ, অধ্যাত্ম-বিদ্যাবিচার ও প্রাণস্পন্দ-নিরোধ (প্রাণায়াম), এই সমস্ত চিত্তজয়ের উপায়। পূর্ব্বে ক্ষিপ্তাদি চিত্তের বিভিন্ন অবস্থার কথা যাহা বলা হইয়াছে, এবং অবিদ্যাদি ক্লেশের উল্লেখ করা হইয়াছে, তৎসমুদায় এই সৎসঙ্গ-বাসনাত্যাগাদি দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই চারিটী পরস্পর সম্বন্ধ আছে, একটী প্রাপ্ত হইলে ক্রমে অন্যগুলি লাভ হইয়া থাকে। অধুনা সৎসঙ্গ অতি দুর্লভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চারিদিকেই বিষয়-বাসনার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, রাগ, দ্বেষ, ঈর্ষায় জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে। যাহা আবার দুই চারিটী সৎসঙ্গের লোক পাওয়া যায়, যাঁহারা ঈশ্বর-চর্চ্চায় অধিক সময় অতিবাহিত করেন, তাঁহাদের সহিত সঙ্গ করিতে যাইয়া মত-প্রভেদ হওয়া বশতঃ সময় সময় অসৎসঙ্গের মত মনে ক্রোধ-দ্বেষ-ভাবের উদয় হয়। চিত্তে ক্রোধ-দ্বেষ-ভাবের উদয় হইলে চিত্তবিক্ষেপ হইয়া থাকে। যে ক্লেশের নিবৃত্তির জন্য সৎসঙ্গ করিতে যাওয়া হয়, তাহাতে তাহার নিবৃত্তি না হইয়া বরং ক্লেশের উৎপত্তি হয়। সাধারণতঃ, মনুষ্যের সৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া যদি ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রের সঙ্গ করা যায়, তাহাতে মধ্যে মধ্যে সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়, নানারূপ বাদ-বিতণ্ডা উপস্থিত হয়; সংশয়বাদ উপস্থিত হইলে প্রকৃত সৎসঙ্গ হইল না। বস্তুতঃ অভিমানশূন্য হইয়া গুণগ্রাহী হইতে না পারিলে, প্রকৃত সৎসঙ্গ-সুখলাভ হয় না। সেই জন্যই ঋষিগণ বলিয়াছেন,—

ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা।

ক্ষণমাত্র সজ্জনসঙ্গ এই ভবসাগর পার হইবার একমাত্র নৌকা স্বরূপ। পাঠকগণ, পুরাকালের একটী ইতিহাস এই সৎসঙ্গ উপলক্ষে মনে উদয় হইল। কোন সময়ে কোন এক আচার্য্য তাঁহার শিষ্যকে উপদেশ দিয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আমার নিকট আগমন কর। আর প্রত্যাবর্ত্তন কালে আমার জন্য, যাহা সকলের অপেক্ষা অসৎ বস্তু, তাহাই আনয়ন করিবে।" শিষ্য এইবাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীগুরুদেবের চরণে প্রণাম ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণানন্তর তীর্থ পর্য্যটনে গমন করিলেন। কিছুকাল পরে শিষ্য সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়া শ্রীগুরু-সন্নিধানে আগমন কালে তাঁহার মনে হইল যে, যাহা সংসারে সকলের মধ্যে অসৎ, তাহাই শ্রীগুরুসমীপে লইয়া যাইতে হইবে। এদিকে বহুতীর্থ পর্য্যটন করিয়া শিষ্যের চিত্ত কতক পরিমাণে শুদ্ধ হওয়া বশতঃ তিনি সকল বস্তু অন্বেষণ করিয়াও অসৎ কিছু দেখিতে পাইলেন না। পরে কাঞ্চীতীর্থে যাইয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে, বিষ্ঠা সকল বস্তুর মধ্যে অসৎ; কারণ প্রত্যেক জীবেরই নিকট স্ব স্ব বিষ্ঠা অস্পৃশ্য ও অসৎ। এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া বিষ্ঠা উত্তোলন করিতে যেমন উদ্যত হইলেন, তৎক্ষণাৎ সেই পুরীষ-পিণ্ড হইতে শব্দ হইল,—"না, না, তুমি আমায় আর স্পর্শ করিও না। একবার তোমার সংসর্গে আমার এ অবস্থা প্রাপ্তি হইয়াছে, এক্ষণে পুনরায় তোমার সংস্পর্শে না জানি ইহাপেক্ষা আরও কি নীচগতি হইবে। কল্য আমি দেবসেব্য অন্ন ছিলাম, তোমার সংসর্গে আমার এ বর্ত্তমান অবস্থা! অতএব তুমি আমাপেক্ষাও অসৎ।" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শিষ্যের আত্মাভিমান ত্যাগ হইল। পরে শিষ্য তীর্থ-পর্য্যটন করিয়া গুরুসমীপে উপস্থিত হইলেন। শ্রীগুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তোমার তীর্থ-পর্য্যটন হইয়াছে? চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে?" শিষ্য কহিলেন, "স্বামিন্, তীর্থযাত্রা সমাপন করিয়া আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি, এবং চিত্তক্ষেত্র আপনার সমীপে (শ্রীচরণে) সমর্পণ করিয়াছি। শুদ্ধ অশুদ্ধ সকলই আপনি জ্ঞাত আছেন।" গুরু বলিলেন, "বৎস, অসৎবস্তু কি আমার জন্য আনয়ন করিয়াছ?" "দেব তাহাও আনয়ন করিয়াছি",—ইহা বলিয়া শিষ্য নিজ মস্তক শ্রীগুরুপদে স্থাপন করিলেন। শ্রীগুরুদেব শিষ্যের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া বলিলেন, "বৎস! উত্থিত হও, অদ্য তুমিই ধন্য, অসৎবস্তু আত্মাভিমান সদ্‌গুরুপদে মিলাইয়া দিলে, সৎসঙ্গের প্রকৃত অধিকার লাভ করিলে। বৎস, এই তোমার ও আমার উভয়ের এক অন্তরের সৎবস্তু গ্রহণ কর",—বলিয়া মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করিলেন। "এ স্থূল শরীর, তোমার স্থূল শরীরের পরিণাম কাল পর্য্যন্ত সৎসঙ্গ পাইল এবং অন্তরের সৎবস্তু তোমার ভবরোগ নিবৃত্তিকাল পর্য্যন্ত সৎসঙ্গ লাভ করিল।" সাধকগণ! এইরূপ শ্রীগুরুপদে আত্মাভিমান বিসর্জ্জন না করিতে পারিলে সৎসঙ্গ লাভ হয় না। স্থূলভাবে সদ্‌গুরুসেবারূপ সঙ্গই সৎসঙ্গ; এবং অন্তরে মন্ত্রের সেবা-সঙ্গ করাই সৎসঙ্গ। মন্ত্র শব্দের অর্থ যাহা দ্বারা এ দীর্ঘ ভবরোগ হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়।

অপার সংসার সমুদ্র মধ্যে
নিমজ্জতো মে শরণং কিমস্তি
গুরো কৃপালো কৃপয়া বদৈতদ্
বিশ্বেশ পাদাম্বুজ দীর্ঘ নৌকা ॥"—মণিরত্নমালা

শ্রীগুরুদেব দয়াময়! এ অপার সংসার সমুদ্রে আমি নিমগ্ন রহিয়াছি, আমার আশ্রয় কি কৃপা করিয়া বলিয়া দিন। শ্রীগুরু বলিলেন বিশ্বনাথের পাদপদ্ম রূপ সুদীর্ঘ নৌকাই তোমার আশ্রয়।

এইরূপ স্থূল শরীরে সদ্‌গুরু সঙ্গ লাভ এবং অন্তরে সৎস্বরূপ মন্ত্রের সঙ্গলাভ করিতে পারিলে সহজেই অনিত্য সংসারবাসনা ক্ষয় হইয়া থাকে। বাসনা ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাত্মবিদ্যার বিচার চিত্তে উদয় হয়; অধ্যাত্মবিদ্যার বিচার হইতে অনায়াসে প্রাণস্পন্দন নিরোধ হইয়া থাকে। তখন চিত্তরোগ মুক্ত হইয়া সাধক যোগযুক্ত হয়।

ক্রমশঃ।

শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

বিবিধ সংবাদ।

রুম্যানিয়ার রাণী, 'কারমেন্ সিল্‌ভা'র (Carmen Sylva) নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে Nineteenth Century নামক মাসিক পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন যে, অনেক সময় সঙ্গীতের সুরের সহিত তিনি নানা বিচিত্র বর্ণের ছটা দেখিতে পান। শব্দের শুধু ধ্বনি আছে তাহা নহে; ইহার বর্ণও আছে। সেই জন্য সংস্কৃতে অক্ষরকে বর্ণমালা বলে। শব্দের যেরূপ বর্ণ আছে, সেইরূপ বর্ণেরও শব্দ আছে। সেই জন্য সকল বর্ণের আধার সূর্য্যকে 'রবি' বলে। রবি ও রব একই 'রু' ধাতু হইতে উৎপন্ন। উপনিষদে একস্থলে লিখিত আছে যে, সূর্য্য যখন উদিত হন, তখন আকাশময় এক বিচিত্র শব্দতরঙ্গ আন্দোলিত হয়। অতএব রুম্যানিয়ার রাণীর সঙ্গীতের সুরের সহিত বর্ণের সাক্ষাৎ পাওয়া বিচিত্র নহে।

* * * *

রুম্যানিয়ার ঐ রাণী সম্প্রতি Fortnightly Review পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে, তিনি যদি ক্রোরপতি হইতেন তবে এমন একটী মন্দির নির্ম্মান করিতেন যেখানে সকল ধর্ম্মের জন্য স্বতন্ত্র কক্ষ নির্দ্দিষ্ট থাকিত। এইরূপ মন্দিরই থিওসফির অনুকূল; কারণ থিওসফি সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয়।

* * * *

থিওসফিক্যাল সভার নেত্রী ও প্রতিষ্ঠাত্রী ম্যাডাম্ ব্ল্যাভাস্কি ১৮৯১ সালের ৮ই মে তারিখে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার উইলে তিনি এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া-

ছিলেন যে, ঐ দিন যেন তাঁহার বন্ধুবর্গ সমবেত হইয়া ভগবদ্গীতা ও বুদ্ধদেবের কাব্য-জীবনী Light of Asia গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ পাঠ করেন। তদনুসারে তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে পৃথিবীর যেখানে যেখানে তত্ত্ববিদ্যাসমিতির শাখা-সভা আছে, সেখানে দরিদ্রকে অন্নদান করা হয় এবং ঐ ঐ গ্রন্থ হইতে এবং ম্যাডাম্ ব্ল্যাভাস্কির "গুপ্তবিদ্যা" (Secret Doctrine) গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ পাঠ করা হয় এবং জগতের হিতার্থে তিনি যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করা হয়। এই উৎসবের নাম শ্বেত-সরোজ উৎসব। বিগত ৮ই মে বঙ্গীয় তত্ত্ববিদ্যা সভার কলেজ স্কোয়ারস্থ গৃহে অনেক সভ্য সমবেত হইয়া ম্যাডাম ব্ল্যাভাস্কির উদ্দেশে শ্বেত সরোজ উৎসব (White Lotus day) সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ঐ দিন দরিদ্র অনাথদিগকে অন্নদান করা হইয়াছিল এবং কয়েকটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা পঠিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ভবানীপুর শাখাসভার সভ্য শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি এল মহাশয়ের বক্তৃতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

* * * *

অনেকেই অবগত আছেন যে, তত্ত্বসভার বর্ত্তমান নেত্রী শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্টের নামে কিছু দিন হইতে মাদ্রাজ হাইকোর্টে একটী মামলা চলিতেছিল। ঐ মামলার বাদী তত্ত্বসভার সহিত সংসৃষ্ট একজন প্রধান পুরুষ মিষ্টার লেড্ বিটারের নামে কয়েকটী কুৎসাপূর্ণ অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল। সম্প্রতি আদালতের বিচারে ঐ সকল কুৎসা যে অমূলক ও বিদ্বেষমূলক তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। জজ সাহেব বাদীর এই অন্যায় আচরণ ও মিথ্যা সাক্ষীর জন্য বিরক্ত হইয়া তাহাকে মামলার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিবার আদেশ দিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে আদালত মিসেস্ বেসাণ্টের উপর অনুমতি দিয়াছেন যে, বাদী তাহার যে দুইটী বালকের শিক্ষার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়াছিল, তিনি যেন বাদীকে সেই বালকদ্বয় প্রত্যর্পণ করেন। মিসেস বেসাণ্ট এই হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল করিয়াছেন।

* * * *

মিসেস বেসাণ্ট জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে ইয়ুরোপ যাত্রা করিবেন। আষাঢ় মাসে সুইডেন প্রদেশে তত্ত্ববিদ্যা সমিতির য়ুরোপীয় শাখাসভা সমূহের সম্মিলন হইবার কথা ধার্য্য আছে। বিশেষতঃ এই সম্মিলনে উপস্থিত হইবার জন্য বেসাণ্ট বিলাত যাত্রা করিতেছেন। তিনি শ্রাবণ মাসের প্রথমেই আবার ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবেন। বিধাতা তাঁহার সমুদ্রযাত্রা নিরাপদ করুন।



জগদ্গুরু মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব।

(সিংহল হইতে গৃহীত।)

ব্রহ্মবিদ্যা

২য় বর্ষ।] আষাঢ়, ১৩২০। [৩য় সংখ্যা।

অন্তর্য্যামী।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩য় অধ্যায়, ৭ম ব্রাহ্মণ।

বক্তা—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য।

ধরণীর মর্ম্ম রূপে আছেন যে এ ধরায়,
ধরণী যাঁহারে কভু পারেনা জানিতে হায়!
এ ধরণী দেহ যাঁর, ধরণীতে রহি যিনি
করেন চালিত তারে, অন্তর্য্যামী নিত্য তিনি।

সলিলের মর্ম্ম রূপে যে জনা সলিলে রাজে,
সলিল জানিতে যাঁরে পারে না জীবন মাঝে;
সলিল শরীর যাঁর, সলিলে রহিয়া যিনি
করেন চালিত তারে, অন্তর্য্যামী নিত্য তিনি।

অনলের মর্ম্ম রূপে অনলে যে জনা রয়,
অনল জানিতে যাঁরে নাহি পারে সুনিশ্চয়;
অনল যাঁহার কায়, অনলে রহিয়া যিনি
করেন চালিত তারে, অন্তর্য্যামী নিত্য তিনি।

আকাশের মর্ম্ম রূপে যে জনা আকাশে থাকে,
আকাশ কখনো হায়, জানিতে পারে নি যাঁকে;
আকাশ যাঁহার বপু, আকাশে রহিয়া যিনি
করেন চালিত তারে, অন্তর্য্যামী নিত্য তিনি।

পবনের মর্ম্ম রূপে পবনে যে জনা রয়,
পবন স্বরূপ যাঁর জ্ঞাত কভু নাহি হয়;
পবন যাঁহার দেহ, পবনে রহিয়া যিনি
করেন চালিত তারে, অন্তর্য্যামী নিত্য তিনি।

স্বরগের মর্ম্ম রূপে স্বরগে বসতি যাঁর,
স্বরগ জানিতে নারে যাঁর কিছু সমাচার ;
স্বরগ শরীর যাঁর, স্বরগে রহিয়া যিনি
করেন চালিত তারে, অন্তর্য্যামী নিত্য তিনি।

তপনের মর্ম্ম রূপে তপনে যে জনা রন,
তপন জানিতে যাঁরে নাহি পারে কদাচন ;
তপন যাঁহার দেহ, তপনে রহিয়া যিনি
করেন চালিত তারে, অন্তর্য্যামী নিত্য তিনি।

দিক্‌গণ মর্ম্ম রূপে আছেন যে দিক্‌গণে,
দিক্‌গণ যাঁরে কভু জানে নি পরাণ মনে ;
দিক্‌গণ অঙ্গ যাঁর, দিক্‌গণে রহি যিনি
চালিত করেন তায়, অন্তর্য্যামী নিত্য তিনি।

শশীতারা মর্ম্ম রূপে র'ন শশীতারকায়,
শশীতারা কভু যাঁরে পারে না জানিতে হায় !
শশীতারা যাঁর দেহ, তা'সবে রহিয়া যিনি
করেন চালিত তারে, অন্তর্য্যামী নিত্য তিনি।

ভূতাকাশ মর্ম্ম রূপে ভূতাকাশে যাঁর ঠাঁই,
ভূতাকাশ যাঁরে কভু জানিবারে পারে নাই ;
ভূতাকাশ কায় যাঁর, ভূতাকাশে রহি যিনি
করেন চালিত তারে, অন্তর্য্যামী নিত্য তিনি।

অধিভূত মর্ম্ম রূপে অধিভূতে যেবা রয়,
অধিভূত যাঁরে কভু অবগত নাহি হয় ;
অধিভূত দেহ যাঁর, অধিভূতে রহি যিনি
করেন চালিত তারে, অন্তর্য্যামী নিত্য তিনি।

প্রাণের মরম রূপে বিরাজেন যেবা প্রাণে,
পরাণ যাঁহারে হায়, কোন দিন নাহি জানে ;
প্রাণ যাঁর বর বপু, প্রাণেতে রহিয়া যিনি
করেন চালিত তারে, অন্তর্য্যামী নিত্য তিনি।

বাক্যের মরম রূপে বাক্যেতে প্রতিষ্ঠা যাঁর,
বাক্য যাঁরে জানিবারে পায় নাই অধিকার;
বাক্য যাঁর কলেবর, বাক্যেতে রহিয়া যিনি
করেন চালিত তারে, অন্তর্য্যামী নিত্য তিনি।

নয়নের মর্ম্ম রূপে যে জন নয়নে রাজে,
নয়ন জানিতে যাঁরে পারেনি অন্তর মাঝে;
নয়ন শরীর যাঁর, নয়নে রহিয়া যিনি
করেন চালিত তারে, অন্তর্য্যামী নিত্য তিনি।

শ্রবণের মর্ম্ম রূপে আছে যে শ্রবণ মূলে,
শ্রবণ কখনো যাঁরে জানিতে পারে নি ভুলে।
শ্রবণ যাঁহার দেহ, শ্রবণে রহিয়া যিনি
করেন চালিত তারে, অন্তর্য্যামী নিত্য তিনি।

মনের মরম রূপে যে জন। মনেতে রয়,
মনও জানিতে যাঁরে অক্ষম অশক্ত হয়;
মন যাঁর কম কায়, মনেতে রহিয়া যিনি
করেন চালিত তারে, অন্তর্য্যামী নিত্য তিনি।

ত্বকের মরম রূপে আছেন যে ত্বকময়,
ত্বক্ যাঁরে জানিবারে অপারগ হ'য়ে রয়;
ত্বক্ যাঁর কলেবর, ত্বকেতে রহিয়া যিনি
করেন চালিত তারে, অন্তর্য্যামী নিত্য তিনি।

বুদ্ধির মরম রূপ রাজেন যে বুদ্ধি মাঝে,
বুদ্ধি যাঁরে নাহি জানি গুমরে বিষাদে লাজে!
বুদ্ধি যাঁর কলেবর, বুদ্ধিতে রহিয়া যিনি
করেন চালিত তারে, অন্তর্য্যামী নিত্য তিনি।

বীর্য্যের মরম রূপে বীর্য্যে যে করেন বাস,
বীর্য্যও কখনো হায়, জানে না যে স্বপ্রকাশ;
বীর্য্য যাঁর দিব্য দেহ বীর্য্যেতে রহিয়া যিনি
করেন চালিত তারে, অন্তর্য্যামী নিত্য তিনি।

অদৃষ্ট হ'য়েও তিনি, দ্রষ্টা তিনি ত্রিলোকের !
অশ্রুত হ'য়েও তিনি, শ্রোতা তিনি অন্তরের !
অচিন্ত্য হয়েও তিনি, কর্ত্তা তিনি মননের !
অজ্ঞেয় হ'য়েও তিনি, জ্ঞাতা তিনি জগতের !
তিনি ছাড়া দ্রষ্টা নাই, নাই শ্রোতা, ধ্যাতা আর ;—
তিনিই অমৃত, নিত্য, অন্তর্য্যামী, মূলাধার !

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

মুমুক্ষুর প্রার্থনা

শান্ত কর হরি আমার এ অশান্ত ভ্রান্ত মন,
অহঙ্কারের কোল আঁধারে বসে ভাবে অনুক্ষণ ;
আমার হলনা কিছু আমার কল্পনা মত
এইত জল্পনা তার দেখি চিত্তে অবিরত ;
কিসে এ ভাবনা তার, সে কি বিশ্বে অধিরাজ,
তার ইচ্ছা পূর্ণ করা সৃষ্টির আদিষ্ট কাজ ?
প্রাণের এ ছায়া তার, পড়েছে বিরাট গায়,
অকলঙ্ক চাঁদে তাই সে কলঙ্ক দেখা যায়।
কেন এই ক্ষুদ্র গৃহে রেখেছ কবাট দিয়ে ?
সদাব্যস্ত সদা সে যে তার ইষ্টানিষ্ট নিয়ে,
উঠিতে বসিতে তারই ভাল মন্দ আলোচনা,
হারাতেছে দিন দিন চিরন্তন সে রচনা ;
উদার অনন্ত ছেড়ে কেন এ গণ্ডির ঘেরে
এধার ওধার করে শ্রান্ত হয়ে সদা ফেরে ?
অনুতে এ অনুরক্তি বৃথা শক্তি করে ক্ষয়,
অকিঞ্চনে এ কাঞ্চন কেন বিজড়িত রয় ?
কবাট খুলিয়া দাও, দেখাও অনন্ত মেলা,
দেখাও সে মুক্ত পথে বিমুক্ত প্রাণের খেলা।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র।

চৈতন্য কথা।

মহাভারত ও গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণ।

বঙ্কিম বাবু তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রে বলেন,—"মহাভারতে ব্রজগোপীদিগের কথা কিছুই নাই। সভাপর্ব্বে শিশুপাল-পর্ব্বাধ্যায়ে শিশুপাল-কৃত সবিস্তার কৃষ্ণনিন্দা আছে। যদি মহাভারত প্রণয়ন কালে ব্রজগোপীগণ-ঘটিত কৃষ্ণের এই কলঙ্ক থাকিত, তাহা হইলে, শিশুপাল অথবা যিনি শিশুপাল-বধ-বৃত্তান্ত প্রণীত করিয়াছেন,তিনি কখনই কৃষ্ণ-নিন্দাকালে তাহা পরিত্যাগ করিতেন না। অতএব নিশ্চিত যে. আদিম মহাভারত-প্রণয়ন কালে এ কথা চলিত ছিল না; তাহার পরে গঠিত হইয়াছে।

মহাভারতে কেবল ঐ সভাপর্ব্বে দ্রৌপদী বস্ত্রহরণ কালে, দ্রৌপদীকৃত কৃষ্ণস্তবে 'গোপীজন প্রিয়' শব্দটা আছে, যথা—

আকৃষ্যমাণে বসনে দ্রৌপদ্যা চিন্তিতো হরিঃ।
গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়॥

বৃন্দাবনে গোপীদিগের বাস। গোপ থাকিলেই গোপী থাকিবে। কৃষ্ণ অতিশয় সুন্দর, মাধুর্য্যময় এবং ক্রীড়াশীল বালক ছিলেন,এজন্য তিনি গোপ গোপী সকলেরই প্রিয় ছিলেন। হরিবংশে আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন; এবং যমলার্জ্জুন ভঙ্গ প্রভৃতি উৎপাত কালে শিশু কৃষ্ণকে বিপন্ন দেখিয়া গোপরমণীগণ রোদন করিত, এরূপ লেখা আছে। অতএব এই 'গোপীজনপ্রিয়' শব্দে শিশুর প্রতি স্ত্রীজনসুলভ স্নেহ ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না।"

শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন-লীলা উল্লেখ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে মহাভারতে কেবল নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি মাত্র আছে—

পূতনাঘাত পূর্ব্বাণি কর্ম্মাণ্যস্য বিশেষতঃ। ত্বয়া কীর্ত্তয়তাস্মাকং ভূয়ঃ প্রব্যথিতং মনঃ॥
যস্য কুৎসা প্রয়োক্তব্যা ভীষ্ম বালতরৈর্নরৈঃ। তমিমং জ্ঞানবৃদ্ধঃ সন্ গোপং সংস্তোতুমিচ্ছসি॥
যদ্যনেন হতা বাল্যে শকুনিশ্চিত্রমত্র কিম্। তৌ বাশ্ববৃষভৌ ভীষ্ম যৌ ন যুদ্ধ বিশারদৌ॥
চেতনারহিতং কাষ্ঠং যদ্যনেন নিপাতিতম্। পাদেন শকটং ভীষ্ম তত্র কিং কৃতমদ্ভুতম্॥
বল্মীকমাত্রং সপ্তাহং যদ্যনেন ধৃতোঽচলঃ। তদা গোবর্দ্ধনোভীষ্ম ন তচ্চিত্রং মতং মম॥

—সভাপর্ব্ব, ৪১ অধ্যায়।

"কৃষ্ণের পূতনাঘাত প্রভৃতি কর্ম্মসকল বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিয়া তুমি আমাদিগের অন্তঃকরণে অত্যন্ত বেদনা দিলে। নিতান্ত অনভিজ্ঞ মনুষ্যেরাও যাহার প্রতি কুৎসা প্রয়োগ করিতে পারে, তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়া সেই গোপালকে কি বলিয়া স্তব করিতে সমুৎসুক হইয়েছে? ওহে ভীষ্ম! কৃষ্ণ বাল্যকালে যদি একটা শকুনি বধ করিয়া থাকে,

অথবা সেই যুদ্ধানভিজ্ঞ অশ্ব ও বৃষভকে বিনষ্ট করিয়া থাকে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি? অপিচ যদি এ চেতনাশূন্য কাষ্ঠের শকট পদদ্বারা নিপাতিত করিয়া থাকে, তাহাতেই বা কি অদ্ভুত কর্ম্ম করা হইয়াছে? অহে ভীষ্ম! বল্মীক-পিণ্ডতুল্য গোবর্দ্ধন-গিরি যদিও এক সপ্তাহ কাল ধারণ করিয়া থাকে, তথাপি আমার বিবেচনায় তাহা বিচিত্র নহে।"

—বঙ্গবাসীর অনুবাদ।

যদি এ কথা স্বীকার করা যায় যে, বৃন্দাবন-কেলিবার্ত্তা সে সময়েও অপ্রকট ছিল, কেবল ভীষ্মদেব প্রভৃতি ভক্তগণ জানিতেন, তাহা হইলে ইহাও সম্ভব যে, লজ্জাবশতঃ ভীষ্মদেব গোপী-রমণ-লীলা সভা মধ্যে প্রকাশ করেন নাই, এবং সেই জন্য শিশুপাল তাহার উল্লেখ করেন নাই।

কিন্তু পূতনা বধাদি লীলা সকলেই জানিতেন। গোপী-রমণ-লীলা কি কেহই জানিতেন না? কাতরা দ্রৌপদী প্রাণভরে রোদন করিয়া বলিলেন,—

গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়। কৌরবৈঃ পরিভূতাং মাং কিং ন জানাসি কেশব॥
হে নাথ হে রমানাথ ব্রজনাথার্ত্তিনাশন। কৌরবার্ণবমগ্নাং মামুদ্ধরস্ব জনার্দ্দন॥

'ব্রজনাথার্ত্তিনাশন'— এটি যেন ব্রজগোপীর কাতরোক্তির প্রতিধ্বনি।

বিষ জলাপ্যয়াদ্‌ব্যালরাক্ষসাদ্ বর্ষমারুতাদ্ বৈদ্যুতানলাৎ।
বৃষময়াত্মজাদ্বিশ্বতো ভয়াদ্ ঋষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ॥

এই জন্যই মহাভারতের হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয় ছিলেন এবং ব্রজগোপীরাও এই জন্য তাঁহাকে 'ব্রজজনার্ত্তিহন্' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন।

বনপর্ব্বে অর্জ্জুন বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার উল্লেখ করিয়াছিলেন।

যানি কর্ম্মাণি দেব ত্বং বাল এব মহাবলঃ।
কৃতবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ বলদেব সহায়বান্।
কৈলাসভবনে চাপি ব্রাহ্মণৈর্বিদিতঃ সঃ॥ — বনপর্ব্ব—১২

নীলকণ্ঠ বলেন, — 'কর্ম্মাণি পূতনাবধাদীনি'। অর্জ্জুনও কি গোপী-রমণ-লীলা জানিতেন না? কৃষ্ণসখা, স্বয়ং নর ঋষি — তিনিও গোপীলীলা জানিতেন না?

মনে সন্দেহ অবশ্য হইতে পারে। এমনই কি যোগমায়ার প্রাদুর্ভাব যে ব্যাসদেব, দ্রৌপদী, শিশুপাল, ভীষ্মদেব এবং অর্জ্জুন বৃন্দাবনলীলার কথা অবগত হইলেও গোপী-লীলার কথা কিছুই জানিতেন্ না? তবে কি গোপীলীলার শ্রীকৃষ্ণ অন্য। রাসরসবিহারী কি রুক্মিণীবল্লভ হইতে প্রকৃতই ভিন্ন?

রাজা ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হইলেও সঞ্জয়ের দিব্যদৃষ্টি-বলে, বিদুরের উপদেশে, ঋষিগণের শিক্ষায় সকল কথা জানিতেন। তিনি যে কৃষ্ণরহস্য জানিতেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দিয়াছিলেন। বৃন্দাবন-লীলা যতদূর জানা সম্ভব ছিল, তিনি অবগত ছিলেন। তথাপি

অত্যাশ্চর্য্য অপরূপ মহাযোগেশ্বরেশ্বরের মহাযোগময় রাসলীলার কথা তিনি কিছুই জানিতেন না। ধৃতরাষ্ট্র উবাচ,—

শৃণু দিব্যানি কর্ম্মাণি বাসুদেবস্য সঞ্জয়।
কৃতবান্ যানি গোবিন্দো যথানান্যঃ পুমান্ ক্বচিৎ॥
গোকুলে বর্দ্ধমানেন বালেনৈব মহাত্মনা।
বিখ্যাপিতং বলং বাহ্বো স্ত্রিষু লোকেষু সঞ্জয়॥
উচ্চৈঃশ্রবস্তুল্যবলং বায়ুবেগসমং জবে।
জঘান হয়রাজং তং যমুনাবনবাসিনম্॥
দানবং ঘোরকর্ম্মাণং গবাং মৃত্যুমিবোত্থিতম্।
বৃষরূপধরং বাল্যে ভুজাভ্যাং নিজঘানহ॥
প্রলম্বং নরকং জম্ভং পীঠঞ্চাপিমহাসুরম্।
মুরঞ্চামরসঙ্কাশ মবধীৎ পুষ্করেক্ষণঃ॥—দ্রোণপর্ব্ব. ১০।

যখন শ্বেতদ্বীপাধিপতি নারায়ণ নারদ-ঋষির প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ভবিষ্যৎ-কৃষ্ণলীলা বর্ণন করেন, তখনও গোপী-রমণ-লীলার কোন আভাস পাওয়া যায় না। (শান্তিপর্ব্ব ৩৩৯)। হয়তঃ কোনও নির্দ্দিষ্ট প্রসঙ্গে, রাসলীলার কথা না থাকিতে পারে; কিন্তু সমগ্র মহাভারতে এমন কি প্রসঙ্গ নাই, যাহাতে রাসলীলার আভাস থাকিতে পারে?

যদি রাসেশ্বর কৃষ্ণ অন্য হন, তবে তিনি কে? পূর্ব্বে জানিয়াছি, নরনারায়ণ ঋষি কার্য্যের অবসানে শেষশায়ী নারায়ণের নিকট গমন করেন। মহাভারতে স্বর্গারোহণ-পর্ব্বে কথিত আছে,—

যঃ স নারায়ণো নাম দেবদেবঃ সনাতনঃ।
তস্যাংশো বাসুদেবস্তু কর্ম্মণোহন্তে বিবেশহ॥

"দেবদেব সনাতন নারায়ণের অংশে যিনি বাসুদেবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি কার্য্যাবসানে নারায়ণে প্রবিষ্ট হন।"

অংশরূপী শ্রীকৃষ্ণের লীলামধ্যে রাসলীলা দেখিতে পাই না। তবে কি স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ অন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া রাসলীলা করিয়াছিলেন। যদি তাহাই হয়, তবে কোন্ প্রকৃতি অধিষ্ঠান করিয়া তিনি এইরূপ লীলা করেন। শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ নারায়ণ-ঋষি অন্তর্ধানের পূর্ব্বে মৈত্রেয় ঋষিকে তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া যান। রাসলীলার জন্য কি তবে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ মৈত্রেয় ঋষির শরীর আশ্রয় করিয়াছিলেন?

প্রকট লীলা ও অপ্রকট লীলা গোস্বামীদিগের মতে ভিন্ন। অপ্রকট লীলার মধ্যেই তাঁহারা স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণকে দেখিতে পান। দেখি যদি বৈষ্ণব গ্রন্থে এ বিষয়ে কোন আলোক পাওয়া যায়। ক্রমশঃ।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

অনুরাগ।

(২)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি—কেমন করিয়া কৃষ্ণানুরক্তি শ্রীরাধার অন্তরে তিলে তিলে বর্দ্ধিত হইয়া, কুল-মানের তটভূমি ছাপাইয়া, কৃষ্ণের চরণ-সিন্ধুতে অবশেষে নিপতিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা দেখিব—কৃষ্ণ-প্রেমের প্রাবল্যে ভক্তির অবতার গৌরাঙ্গের হৃদয় কতদূর মথিত, বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল, কেমন করিয়া সে অনুরাগ পরিশেষে তাঁহাকে চিন্ময়ের চরণ-তলে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল।

কুলের রমণী, গৃহস্থের ঘরণী, রাজ-নন্দিনী রাধা; গৃহমধ্যে সখিগণসহ গৃহ-কর্ম্ম করিবে; পিতামাতা যাঁহার সহিত বিবাহ বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাঁহারি গার্হস্থ্য-সুখ বিধানে জীবন যাপন করিবে; শাশুড়ী ননদীর ইঙ্গিতে উঠিবে, বসিবে, বধূর কর্ত্তব্য পালন করিবে। কিন্তু, যে মুহূর্ত্তে কিশোরী ব্রজ-বধূ কৃষ্ণচন্দ্রের বংশীধ্বনিতে বিশ্ব-পতির সপ্রেম আহ্বান শুনিতে পাইল, নন্দ-নন্দনের মুখারবিন্দে চির-সুন্দরের ইন্দ্রিয়াতীত অরূপ সৌন্দর্য্য অনুভব করিল, সেই মুহূর্ত্তে ব্রজ-বালার বিষয়-বুদ্ধি বিলুপ্ত হইল, সংসারের ভোগ-বাসনা তিরোহিত হইল, জনক-জননী, শাশুড়ী-ননদী, স্বামী-সমাজ, আত্মীয়-স্বজন, সর্ব্ব-প্রকার ঐহিক বন্ধন দেখিতে দেখিতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল; কুলমান, খ্যাতি নিন্দা, ধর্ম্মকর্ম্ম, বিধি-কর্ত্তব্য সকলই সেই কৃষ্ণ-চরণে সমর্পিত হইল; নবানুরাগের প্রবল-বন্যায় সমাজ-শাসন, কলঙ্ক-ভীতি, সকলই ভাসিয়া গেল। গুরু-গঞ্জনায় সে চিত্ত বিচলিত হইল না, লোকাপবাদে সেই একমুখী প্রীতি মন্দীভূত হইল না, কিশোরীর প্রতিপল কৃষ্ণধ্যানে অতিবাহিত হইতে লাগিল। তা'র পর এমন এক শুভ মুহূর্ত্ত আসিল—যখন ব্রজবধূর ঐকান্তিকী একনিষ্ঠা কৃষ্ণচন্দ্রের অপার করুণাপাতে যোগিজন-বাঞ্ছনীয় পরম সাফল্যলাভে কৃতার্থ হইল।

আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণের বংশে জন্ম; বৈধী ক্রিয়া করণীয়া; অধ্যাপনা দৈনন্দিন কার্য্য; সতীসাধ্বীর চিত্ত-বিনোদন, জননীর চরণ-সেবা, সমাজের উন্নতি-বিধান, বন্ধুগণের সহিত ক্রীড়া-কৌতুক,—ইহাই ত গৃহস্থের জীবন। কিন্তু, শচীমাতার একমাত্র গৃহবাসী পুত্র, বিবাহিতা-পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ-বল্লভ, ভক্তি-পরায়ণ ছাত্রগণের শিক্ষা-গুরু, স্নেহ-নিবদ্ধ বন্ধুবর্গের নয়নানন্দ, সুবিশাল নবদ্বীপ-সমাজের মাথার মণি, সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ নিমাইচাঁদ,—আজ তাঁহার একি দশা! কি জানি কি অজ্ঞাত ক্ষণে, প্রেতনিবহের লীলালয় গয়াক্ষেত্রে কোন্ দেবতায় তাঁহাকে পাইয়া বসিল, কোন্ কৌতুকী যাদুকরের কুহক লাগিল, অমনি ব্রাহ্মণকুমারের জীবনের গতি অভূতপূর্ব্ব ভাবে পরিবর্ত্তিত হইল, তাঁহার জীবন-কাব্যে এক নূতন অধ্যায় সূচিত হইল! কি জানি সে কোন্ জন্মের কেমন বন্ধু—

যাহার স্মৃতি-বংশীর অমৃত-মধুর অব্যক্ত ধ্বনি, দিন নাই, রাত নাই, মর্ম্মমধ্যে গুঞ্জরিয়া উঠিতেছে! কি জানি সে কেমন প্রেমিক—যাহার প্রেমে সমাজ-বন্ধন শিথিল হইয়া যাইতেছে, বিষয়ের বোধ-গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইতেছে, গুরুর কর্ত্তব্য নির্ম্মূল হইয়া যাইতেছে, বন্ধুর আলাপ কর্কশতায় পরিণত হইতেছে, পত্নীর আলিঙ্গন শবস্পর্শবৎ অনুভূত হইতেছে, মাতার আদর হৃদয়ে বিষের জ্বালা ঢালিয়া দিতেছে! এমন ত কেহ কখনো দেখে নাই, কেহ কখনো শুনে নাই, স্বপ্নেও কখনো ভাবিতে পারে নাই,—থাকিয়া থাকিয়া পুলক-কদম্ব, রহিয়া রহিয়া নেত্র পথে গঙ্গা-প্রবাহ, খাইতে বসিয়া বাহ্যজ্ঞান-শূন্যতা, জাগিয়া জাগিয়া স্বপ্ন-মগ্নতা, প্রহরে প্রহরে ভাব-সমাধি, সারা রজনী ধরিয়া প্রাঙ্গনমধ্যে উদ্দণ্ড নৃত্য! ঘৃণা-লজ্জাভয়, কুলশীলমান, সমাজসংসার, কোনো চিন্তাই আর হৃদয়ে ঠাঁই পায়না! কত লোকে কত কথা বলিতেছে, কেহ নিন্দা করিতেছে, কেহ পাগল বলিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে, কেহ ভণ্ড বলিয়া গালি পাড়িতেছে;—তবুত সে অদ্ভুত অভিভব ঘুচিবার নয়! তবুত সে প্রাণ-বন্ধুর স্মৃতি মুছিয়া যায় না!

গো-কুলে গোয়ালাকুলে কেবা কিনা বলে!
তবু মোর ঝুরে প্রাণ তোমা না দেখিলে॥

কতবার মনে হয়—আর তাহার কথা ভাবিবে না, কিন্তু ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মূর্ত্তি অচ্ছেদ্যবন্ধনে বিজড়িত হয়! কতবার ইচ্ছা হয়—রসনায় তাহার নাম লইবে না, কর্ণে তাহার কথা শুনিবে না, যেখানে তাহার প্রসঙ্গ, সে পথের ছায়া মাড়াইবে না; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের অতীত যে, ইন্দ্রিয়-রোধে তাহার চিন্তা কেমন করিয়া রুদ্ধ রহিবে? কতবার সাধ যায়—ভোলা মন বাঁধিয়া রাখিবে, মনের ভাব মনেই চাপিয়া রাখিবে, গুপ্ত-নিধি অন্তরের অন্তরে গোপন করিয়া রাখিবে, চিত্তের বিভোরতা বাহ্য উন্মাদনায় ফুটিতে দিয়া স্বজনের মনে আর বেদনা দিবে না। কিন্তু—

গুরু গরবিত মাঝে রহি নানা রঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে কত করি পরকার।
নয়ানের ধারা তবু বহে অনিবার॥

কুল-বধূর ন্যায় ভক্তের হৃদয় প্রাণ-বঁধুয়ার গুপ্তপ্রেম যতই গোপন করিতে চায়, ততই তাহা দেহের প্রতি প্রত্যঙ্গে, বাক্যের প্রতি অকথিত ভঙ্গিতে, কার্য্যের প্রতিবিভ্রমে ফুটিয়া উঠে। কুলটা কুল-বধূ যেমন গর্ভ-স্থিত সন্তানের সঞ্চালন অনুভব করিয়া অব্যক্ত হর্ষে, অসহ যন্ত্রণায়, পুলকিত বা শিহরিয়া উঠে,—কৃষ্ণ-প্রেমিক তেমনি মরমে মরমে কৃষ্ণ-প্রেমের অপূর্ব্ব সঞ্চার, মিলন-বৈকল্যের দারুণ বেদনা অনুভব করিয়া অব্যক্ত হর্ষে, অস্ফুট দুঃখে কণ্টকিত হয়। কিন্তু জগতে কে এমন ব্যথার ব্যথী, ভাবের ভাবুক, মনের মানুষ আছে, যে তাহার এই বিচিত্র ভাব বুঝিবে, মর্ম্ম-কথা শুনিবে?

আরে মোর গৌরকিশোর। পুরব-প্রেম-রস-ভোর ॥
কহে মৃদু গদ গদ ভাষ। ঘন বহে দীঘ নিশাস ॥
কহে পঁহু হইয়া বিভোর। "মরম না কেহ বুঝে মোর ॥
কেন বা এ প্রেম বাঢ়াইলুঁ? জীয়ন্তে পরাণ খোয়াইলুঁ ॥"
নিঝরে ঝরএ দুনয়ান। নরহরি মলিন বয়ান ॥

গৌরাঙ্গের চিত্তের যখন এমন অবস্থা,—মাতা স্নেহ-বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে চান, বনিতা মায়া-জালে জড়াইয়া রাখিতে চান, বন্ধু-মণ্ডলী সৌহার্দ্দ্য-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে চান, সমাজ বৈধী ভক্তির ক্ষুদ্র কূপে ডুবাইয়া রাখিতে চায়, সকলেই প্রিয়তমের নামে বিমুখ,—তখন আর উপায় কি? কিন্তু, তখন উপায়ের কথা ভাবিবার আর অবসর রহিল না, গৃহ-ধর্ম্ম বৈধকর্ম্ম কিছুই চিন্তা করিবার অবকাশ রহিল না; মন্ত্র-মুগ্ধ ভুজঙ্গবৎ, বংশীধ্বনি-মুগ্ধ কুরঙ্গবৎ, দূরসিন্ধুর আহ্বান-মুগ্ধ নদবৎ, গৌরচন্দ্র গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া, সংসার-সুখ নিষ্ঠীবনবৎ পরিত্যাগ করিয়া, প্রাণবন্ধুর সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলেন; সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

হয়ত লোকাপবাদ সহ্য করিয়া, অন্তরের ব্যথা অন্তরে চাপিয়া আমাদের গৌরচন্দ্র সংসারারণ্যে সঙ্গ-হীন সাধুর জীবন যাপন করিতে পারিতেন; এ সকলই সহ্য করা তাঁহার পক্ষে হয়ত সহজ হইত; কিন্তু, যে বধুয়ার অশব্দবংশী তাঁহাকে পাগল করিয়াছিল, যে বঁধুয়ার অমৃতায়মান আলিঙ্গন-সুখ একবার অনুভূত হইয়াছিল, যে বঁধুয়া নিশিদিন অন্তর জুড়িয়া অবস্থান করিতেছিল, তাহার অদর্শন সহনীয় হইলেও তাহার নিষ্ঠুর অনাদর কেমন করিয়া সহ্য হইবে?

যাহার লাগিয়া যে জন মরয়ে, সেই যদি করে আন—

তাহা হইলে আর প্রেমিক ভক্ত কেমন করিয়া সংসারে প্রাণ বাঁধিয়া জীবন রাখিবে? তাই বুঝি প্রেমের পাগল প্রেমের জন্য গৃহ ছাড়িয়া পথে বসিল, সংসার ছাড়িয়া বনে চলিল, পণ করিয়া বসিল—যাহাকে ভালবাসিয়াছে, তাহার ভালবাসা লাভ না করিতে পারিলে এ জীবন সাগরের জলে বিসর্জ্জন দিবে! তাই বুঝি সন্ন্যাস-গ্রহণের পর অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের আকুলি বিকুলিতে আকুল হইয়াও নবীন সন্ন্যাসী চিরবিদায় লইবার কালে তাহাদিগের উদ্দেশে বলিতেছেন,—

"সখা হে! ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীয়ন্তে মরিয়া যে আপন খাইয়াছে,
তারে তুমি কি আর বুঝাও?
নয়ান-পুতলি করি' লয়াছি মোহন রূপ,
হিয়ার মাঝারে করি' প্রাণ।

পিরীতি আগুন জ্বালি' সকল পোড়াঞাছি
জাতি কুল শীল অভিমান ॥
না জানিয়া মূঢ়লোকে কি জানি কি বলে মোকে
না করি এ শ্রবণ গোচরে।
স্রোত-বিথার জলে এ তনু ভাসাঞাছি,
কি করিবে কুলের কুকুরে ॥
খাইতে শুইতে চিতে আন নাহি পথে,
বঁধু বিনে আন নাহি ভায়।
মুরারী গুপত কহে পিরীতি এমন হৈলে
তার যশ তিন লোকে গায় ॥

গৌরাঙ্গের অন্তরে এমনি প্রেম ছিল বলিয়া, আজ তিনলোক তাঁহার যশোগানে মুখরিত হইতেছে, অলৌকিক সৌরভে ভক্তমাত্রের প্রাণ বিভোর হইয়া যাইতেছে!

সন্ন্যাসগ্রহণের পর, গৃহ সংসার ছাড়িয়া, মাঠে বাটে, পথে ঘাটে, গ্রামে বনে, গিরি গহনে পাগলিনীবৎ ভ্রমণ করিতে করিতে, আমাদের গোরাচাঁদের কখনও বা বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইত, কখনও বা বঁধুসহ কাল্পনিক মিলনে প্রলাপ-বাণী স্ফুটিত, কখনও বা প্রাণনাথের উপেক্ষায় অন্তস্তল পর্য্যন্ত পুড়িয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইত!

কনকচন্দ গোরাচান্দে। ভূমিতে পড়িয়া কেন কান্দে ॥
খেনে উঠে কহি'—"হরি! হরি! কে করিল আমারে বাউরি?"
আজানুলম্বিত বাহু তুলি'। বিধিরে পাড়য়ে সদা গালি ॥
কহে—"ধিক্ বিধির বিধানে। এমত জোটন করে কেনে?"
কোন ভাবে কহে গোরারায়। নরহরি শুধিয়া বেড়ায় ॥

এমনই বাতুলের মত পথে বিপথে চলিতে চলিতে তৃণ-কণ্টকে পদতল ব্যথিত; অশ্রুর প্রবল পীড়নে নেত্র অন্ধপ্রায়; ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা, ক্ষণে ক্ষণে ক্রন্দন; ক্ষণে অট্ট হাস, ক্ষণে উন্মাদবৎ নৃত্য; কিন্তু গমনের বিরাম নাই। কে যেন অদৃশ্য হস্তে কেশে ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে; কাহার যেন নূপুর-ধ্বনি কর্ণকুহর পরিপূরিত করিতেছে; কাহার যেন মুরলী-রব আগে আগে সমীরণে ভাসিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে—মন্ত্র-মুগ্ধ পদযুগল তাহারই যেন অনুসরণ করিতেছে!

চমকি কহয়ে—"আরে! আরে!" খেণে খেণে রহিয়া বাঁশীরে ॥
পুন কহে—"সকলি টুটিল। বাঁশী মোর জাতিকুল নিল ॥
ধ্বনি কানে পশিয়া রহিল। বধির সমান মোরে কৈল।"
নরহরি মনে মনে হাসে। দেখি' এই গৌরাঙ্গ-বিলাসে ॥

শোনা ছিল—সিন্ধুতটে শ্রীক্ষেত্রধাম; সেখানে প্রাণবন্ধু, জগন্নাথ সাজিয়া, জগতের

সর্ব্ব জীবের মুখে নির্ব্বিচারে আনন্দ-অন্ন বিতরণ করেন। তাঁই আমাদের কৃষ্ণপ্রেমের অপূর্ব্ব পাগল সেই দেশে ছুটিয়াছে—যেখানে সাগরের প্রতি-তরঙ্গ গোপী-ভাবে বিভাবিত হইয়া নিরন্তর হরিধ্বনি করিতেছে, যেখানে যুগ-যুগান্তরের যত ভক্ত শ্রীমন্দিরের জড়পাষাণ সোপান-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবরুদ্ধ নিঃশ্বাসে হরি-ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছে, যেখানে স্বয়ং জগতের নাথ শ্রীবিগ্রহ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, আপনাতে আপনি মগ্ন থাকিয়া, আত্ম-রতির ভূমানন্দ আস্বাদন করিতেছেন।

নেত্রে স্বপ-চিহ্ন, কণ্ঠে হরিধ্বনি, অঙ্গে শ্রীমন্দিরের পবিত্রধূলি, সুপ্তোত্থিতবৎ নবীন সন্ন্যাসী জগন্নাথের সিংহাসন-সমীপে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শ্রীমুখের পানে অপলক নেত্রে চাহিয়া আছেন। বিগ্রহ মৃণ্ময়, অর্দ্ধ গঠিত; আমাদের চক্ষু চর্ম্ম-গঠিত, দৃষ্টি স্থূল। আমরা কি বুঝিব—ওই মৃণ্ময় মূর্ত্তির দিকে অনিমেষ-লোচনে সন্ন্যাসী কেন চাহিয়া আছেন! যাঁহার শুদ্ধ চিত্ত, শুদ্ধ মন, যাঁহার নির্ম্মল অন্তরে কৃষ্ণ-প্রীতি স্বচ্ছ প্রবাহে প্রবাহিত, তিনিই শুধু ওই মৃণ্ময় বিগ্রহে চিন্ময় মূর্ত্তি অবলোকন করিবার অধিকারী, তিনিই শুধু ওই অর্দ্ধ-গঠিত প্রতিমার মধ্যে সৌন্দর্য্যের আদি নির্ঝরের সন্ধান পাইতে পারেন। তাই বুঝি এই শুদ্ধাত্মা প্রেমের যোগী, নয়ন-পাত্রে, ওই মৃণ্ময়রূপী চিন্ময় দেবতার, ওই জন্মজন্মান্তরীণ হৃদয়েশ্বরের অপরূপ রূপ-সুধা অবিশ্রান্ত পান করিয়াও তৃপ্ত হইতেছেন না! চিত্ত যতই ওই রূপ-সমুদ্রে অবগাহন করিতেছে, ততই যেন তৃষ্ণা বিবর্দ্ধিত হইতেছে, চিরসুন্দরের রূপতরঙ্গে হৃদয় ততই উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে!

দেখিতে দেখিতে বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইল, প্রাণ আসিয়া কণ্ঠে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, দেহ উপল-শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। কিন্তু যখন অর্দ্ধ বাহ্যদশা দেহের কূলে দেখা দিল, তখন সন্ন্যাসী হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; তাঁহার নেত্র হইতে সহস্রোন্মুক্ত নির্ঝরের ন্যায় লক্ষ ধারা বর্ষিত হইল। অর্দ্ধ জাগরণে সন্ন্যাসী যেন দেখিতে লাগিলেন—তাঁহার প্রাণবল্লভ দুই বাহু উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন! যাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য তিনি সংসার ছাড়িলেন, দিবাকাল রজনীতে এবং যামিনী দিবসে পরিণত করিলেন, আপন পর এবং পর আপন করিলেন, জননীর বিদায়কালীন উচ্চ ক্রন্দনে, সতীর নীরব অশ্রুপাতে, প্রাণাদপি প্রিয় বন্ধুগণের আকুল আহ্বানে বধির হইলেন, পথের পর্ব্বত-প্রমাণ বাধায় একবারও ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, আর, আজ এতকাল পরে যাঁহার দর্শন পাইয়া, আপনাকে ধন্য মনে করিলেন,—সেই প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের সখী, তাঁহারি প্রীতি বিমুখ!

বিভোর হইয়া গোপী-ভাবে। কহে পঁহু করিয়া আক্ষেপে॥—
"আমি তোমা না দেখিলে মরি। উলটি না চাহ তুমি ফিরি!॥
করিলা পিরীতিময় ফান্দ। হাতে দিলা আকাশের চান্দ॥
এবে তুঁহি বিমুখ আমারে।" কহে গোরা মনের বিকারে॥

ঝর ঝর নিঝর নয়ান। রস রস বিরস বয়ান ॥
অপরূপ গৌরাঙ্গ-বিলাস। কহে কিছু নরহরি দাস ॥

কিন্তু এ ভাব ক্ষণিক। দেখিতে দেখিতে মেঘাক্রান্ত গগনে মেঘমুক্ত সূর্য্যের প্রকাশবৎ, ভক্তের অভিমান-ভরা, ভয়-বিহ্বল হৃদয়ে, জগন্নাথের হাস্যোজ্জ্বল প্রেম-তরল আনন্দ-ঘন মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল। প্রেম-বিহ্বল নেত্রে সন্ন্যাসী এবার চাহিয়া দেখিলেন—বঁধুয়ার দুই বাহু উত্তোলিত রহিয়াছে, প্রত্যাখ্যানের শেল বিদ্ধ করিতে নহে, আলিঙ্গনে বাঁধিবার নিমিত্ত! তখন, পূর্ণ জাগরণে অপূর্ণ মিলন সম্পূর্ণ করিয়া, মন্দের প্রতি কক্ষ মধুর মুরলী রবে মুখরিত করিয়া কে যেন গাহিয়া উঠিল,---

"কোটি ভকত তুয়া পায়ে নিরমঞ্ছিএ,
তুঁহু মঝু জীবন সার॥
তোহারি রূপগুণ অবিরত জপি হাম,
তুয়া বিনু নাহি জানি আর ॥"

সে দিন সহসা শ্রীমন্দিরের বিশাল কবাট আপনা-আপনি পড়িয়া গেল। হায়! গৌরভক্তগণ! বলিতে পার কি কবে আবার সে কবাট খুলিয়া যাইবে?

শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী।

গান।

করুণার আলো ঢাল দেব! ঢাল,
ভেদিয়া নিবিড় তিমির করাল,
সুপথে লও হে হরি।
কি ভীষণ রাতি এ আঁধার পুরে,
ঘর ছেড়ে আমি ঘুরিতেছি দূরে,
এ চরণ যেন না হয় স্খলন,
তুমি হও মম দিক্ দরশন,
সুপথে লও হে হরি।
বরষি আশিস্, তোমার শকতি
করিছে সরল এ জীবন গতি,
ভুলোকে, দ্যুলোকে, প্রেমের পুলকে
মায়া মোহ রাশি বিনাশি পলকে,
সুপথে লও হে হরি।
আসিছে প্রভাত, পোহায় এ নিশা,
ও চরণামৃতে মিটাইব তৃষা,
জাগিব হরষে তোমার পরশে,
তোমারি সেবায়, প্রেমানন্দ রসে
রব প্রেমময় হরি।

শ্রীরসময় লাহা।

দুঃখবাদের ফলাফল।

বিগত বৎসর 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' দুঃখবাদের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছিলাম যে, দুঃখবাদ প্রাচ্য জীবনের মর্ম্মকথা, প্রাচ্যদর্শনের মূল ভিত্তি; কিন্তু ইহা পাশ্চাত্য জীবনের অবান্তর ঘটনা, পাশ্চাত্য দর্শনের আনুসঙ্গিক মত। এক্ষণে দেখা যাউক, এই দুঃখবাদ প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে কি বিভিন্ন ফল প্রসব করিয়াছে।

এই দুঃখবাদের ক্রিয়া দর্শনে, জীবনে, ইতিহাসে ও কাব্যে আমরা লক্ষ্য করিতে চাই; তাহা হইলে একই মতবাদ পূর্ব্বে ও পশ্চিমে কিরূপ বিভিন্নভাবে কার্য্য করিয়াছে, তাহার উপলব্ধি করিতে পারিব।

পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মধ্যে হার্টম্যানই (Hartman এই দুঃখবাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাঁহার Philosophy of the Unconscious গ্রন্থ পশ্চিমদেশে দুঃখবাদী-দিগের বাইবেল। সোপেনহয়ারের (Shopenhauer) দুঃখবাদ বৌদ্ধ দুঃখবাদের ক্ষীণ প্রতিধ্বনিমাত্র। অতএব আমরা হার্টম্যানকেই পাশ্চাত্য দুঃখবাদী দার্শনিকদিগের প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করিব। তাঁহার Philosophy of the Unconscious গ্রন্থ পাঠ করিয়া এমিয়েলের (Amiel) মত সহৃদয় পাঠকের হৃদয়ে কিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহার পরিচয় জানিলে ইয়োরোপীয় দার্শনিক দুঃখবাদের ফলাফল জানা যাইবে। এমিয়েল লিখিতেছেন (৮ই ডিসেম্বর, ১৮৬৯):—

"আজ প্রাতে সমস্তই কেমন ক্লিষ্ট বোধ হইতেছে। শীত ঋতুর শৈত্য, প্রকৃতির অসাড় ভাব এবং সর্ব্বোপরি হার্টম্যানের গ্রন্থ (Philosophy of the Unconscious) ইহার কারণ। এই গ্রন্থের ভীষণ প্রতিপাদ্য এই যে, সৃষ্টি একটা ভ্রম। সত্তার অপেক্ষা অসত্তা ভাল। জীবনের চেয়ে মৃত্যু ভাল। এই গ্রন্থ পাঠে হৃদয়ে একটা প্রগাঢ় বিষাদের ছায়া সঞ্চিত হইয়াছে, যেন বৌদ্ধ ধর্ম্মের গভীর বিষণ্ণতা আমাকে আচ্ছন্ন ও আবৃত করিয়াছে। বস্তুতঃ যদি মায়াই এই জগতের ভীষণতাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া থাকে এবং জীবনকে সহনীয় করিয়া থাকে, তবে সৃষ্টি জঞ্জাল মাত্র—এ জীবন হেয়। তাহা হইলে গ্রীসদেশীয় অ্যানিকেরিকের মত আমাদেরও আত্মহত্যার পরামর্শ করা উচিত, কিংবা বুদ্ধ ও সোপেনহওয়ারের মত আশা ও ইচ্ছার সমূলচ্ছেদ করিয়া জন্ম ও জন্মান্তর নিদানের উচ্ছেদ করাই শ্রেয়স্কর। জলবুদ্বুদের যেন পুনরুত্থান না হয়, মৃত্যু যেন নবজীবনের দ্বার না হয়—ইহাই সমস্যা; নির্ব্বাণই তাহা হইলে আমাদের সার উপাদেয়।"*

* 8th December 1869.—Everything has chilled me this morning: the cold of the season, the physical immobility around me, but, above all, *Hartman's Philosophy of the Unconcious.* This book lays down the terrible thesis that creation is a mistake, Being, such as it is, is not as good as non-being, and death is better than life.

উপরে এমিয়েলের যে উক্তি উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, এমিয়েল বুদ্ধদেব-প্রচারিত নির্ব্বাণ-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। সেই জন্যই তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের নৈরাশ্য বিষাদের কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু সে কথা এখন আমাদের বিবেচ্য নহে। আমরা দেখিলাম পাশ্চাত্য দার্শনিক দুঃখবাদ (Hartmanএর গ্রন্থকে যাহার প্রতিনিধিরূপে আমরা গ্রহণ করিয়াছি) সহৃদয় পাঠকের হৃদয়ে কিরূপ বিষাদ ও ব্যাকুলতার সঞ্চার করিয়াছে। অন্যপক্ষে প্রাচ্য দার্শনিক দুঃখবাদের ফলাফল বিচার করা যাউক।

ভারতের ষড়দর্শনকে প্রাচ্য-দার্শনিক-দুঃখবাদের প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। আমরা জানি, ভারতের ষড়দর্শনের একই উদ্দেশ্য—জীবদুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি। ভারতীয় দর্শনের মতে সংসার দুঃখময়—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক নানা দুঃখের স্বাধিকৃত আবাস-ভূমি। জগতে সুখ নাই; যাহাও আছে, তপ্ত সৈকতে বারিবিন্দুর মত তাহাও দুঃখপক্ষে নিক্ষেপণীয়। এই ভারতীয় ষড়দর্শনের আলোচনা করিয়া অধ্যাপক ম্যাক্‌স্‌মুলার লিখিয়াছেন,—

"ভারতীয় দার্শনিকেরা কেবল যে জীবনের দুঃখরাশির গণনা করেন, তাহা নহে। তাঁহারা যে সর্ব্বদা বিলাপ ও আর্ত্তনাদ করিতেছেন যে, জীবন অপেক্ষা মৃত্যু ভাল—তাহা নহে। তাঁহাদের দুঃখবাদ এ জাতীয় নহে। তাঁহারা ভাবিতেন যে, ঈশ্বরের জগতে দুঃখের স্থান নাই; দুঃখটা হেয়। অতএব দুঃখের নিদান আবিষ্কার করিয়া তাহার প্রশমন করা আবশ্যক। তাঁহাদের চক্ষে দুঃখ একটা অভাব, একটা অপূর্ণতা। তাঁহাদের চেষ্টা—কোথা হইতে দুঃখ আসিল, তাহার আবিষ্কার করিয়া দুঃখের মূলচ্ছেদ করা। পাশ্চাত্য দেশে যাহাকে আমরা সচরাচর দুঃখবাদ (pessimism) বলি, ইহা সে জাতীয় নহে। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে কোথাও ভগবানের অবিচার সম্বন্ধে আক্রোশ নাই, ভারতীয় দার্শনিকেরা আত্মঘাতী হইবার উৎসাহ দেন না।"*

ভারতীয় চিন্তার সহিত অধ্যাপক ম্যাক্‌স্‌মুলারের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলেও ঘনিষ্ঠ

I felt the same mournful impression that Oberman left upon me in my youth. The black melancholy of Buddhism encompassed and overshadowed me. If, in fact, it is only illusion which hides from us the horror of existence and makes life tolerable to us, then existence is a snare and life an evil. Like the Greek Annikeris, *we ought to counsel suicide*, or rather with Buddha and Schopenhauer we ought to labour for the radical extirpation of hope and desire, the causes of life and resurrection. Not to rise again, there is the point and there is the difficulty. Death is simply a beginning again, whereas it is annihilation that we have to aim at. (Amiel's Journal, page, 162-163.)

* Indian Philosophers are by no means dwelling for ever on the miseries of life. They are not always whining and protesting that life is not worth living. That is not *their* pessimism. They evidently thought that in a perfect world suffering had no place, that it is something anomalous, something that ought at all events to be accounted for, and, if possible, overcome. Pain, certainly, seems to be an imperfection and, as such, may well have caused the question why it existed, and how it could be annihilated. But this is not the disposition which we are accustomed to call pessimism. *Indian Philosophy* contains no outcry against divine injustice, and in no way encourages suicidal expedients. (Six Systems of Indian Philosophy, Max Muller, page 110.)

পরিচয় ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুঃখবাদের মর্ম্মান্তিক প্রভেদ তিনি অতি বিশদভাবেই প্রদর্শন করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমরা আর এক জন পাশ্চাত্য মনীষীর মত উদ্ধার করিব —তিনি শ্রীমতী অ্যানিবেসান্ট। বেসান্ট মহোদয়া বিশ বৎসরের অধিক কাল ভারতবর্ষের অধিবাসী হইয়া এবং ভারতবাসীর সুখে দুঃখে সহানুভূতি করিয়া, ভারতীয় চিন্তার সহিত একান্ত পরিচিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার যোগদর্শনের ভূমিকা গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"হিন্দুরা বাস্তবিক দুঃখবাদী নহে। জগতের মধ্যে যদি কেহ শুভবাদী থাকে, তবে সে হিন্দু। হিন্দুদিগের সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জীবের দুঃখ হানি। তবে হিন্দু প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ। হিন্দু জানেন যে, সুখের জন্য আমাদের অন্বেষণ করা নিষ্প্রয়োজন। সুখ আমাদের স্বাভাবিক, সুখ আমাদের আত্মার স্বরূপ। সুখের উৎস নিরন্তর আমাদের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইতেছে। সুখ আমাদের সহজ অবস্থা। দুঃখের মত সুখ অবান্তর ঘটনা নহে। দুঃখের অবস্থার বারণ করিতে পারিলেই সুখ আপনিই প্রকাশিত হইবে। ক্লেশের নিবৃত্তি হইলে আপনা হইতে সুখের প্রবৃত্তি হইবে। দুঃখ জীবের স্বভাব নহে। দুঃখ একটা আকস্মিক, একটা নৈমিত্তিক ঘটনা। আনন্দস্বরূপ আত্মা যখন জগতের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছেন, তখন এখানে দুঃখের স্থান হইতেই পারে না। ইহাই হিন্দুদর্শনের মুখ্য কথা। হিন্দুদর্শন শুভবাদী—একেবারেই অশুভবাদী নহে।" *

দর্শনের উচ্চ ভূমি ছাড়িয়া যদি আমরা জীবনের নিম্নভূমিতে অবতরণ করি, তাহা হইলেও আমরা প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের মধ্যে এই দুঃখবাদের তারতম্য দেখিতে পাই না। নানা কারণে ভারতবর্ষ দুর্ভিক্ষের লীলা-ভূমি হইয়াছে। বৎসরের পর বৎসর অনশন পিশাচমূর্ত্তিতে এই শস্য-শ্যামল দেশে বিচরণ করে। তথাপি ভারতবাসী ক্ষুধার তাড়না, রোগের যন্ত্রণা, আত্মীয়ের বেদনা, নৈরাশ্যের উৎপীড়না এবং মর্ম্মান্তিক অবমাননা কিরূপ ধীরতা ও সাহসের সহিত সহ্য করে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। প্রাণান্ত-পণ করিয়া দুর্ভিক্ষ রাক্ষসের সহিত এই ভীষণ মল্লযুদ্ধ অতি বড় বীরেরও বরণীয় বস্তু। লর্ড কার্জ্জন যখন ভারতের ভাগ্যবিধাতা ছিলেন, সে সময় এক দুর্দ্ধর্ষ দুর্ভিক্ষ ভারতবর্ষকে অভিভূত করিয়াছিল। সেই সময় তিনি ভারতবাসীর এই বিষণ্ণ সহিষ্ণুতাকে লক্ষ্য করিয়া যে অভিনন্দন করিয়াছিলেন, তাহা আমাদিগের স্মরণীয়।

* The Hindu is not pessimistic. He is the most optimistic of men. He has not got one solitary school of philosophy that does not put in its foreground that the object of all philosophy is to put an end to pain. But he is profoundly reasonable. He knows that we need not go about seeking happiness. It is already ours, for it is the essence of our own nature. Happiness exists perennially within you. It is your normal state. Happiness is not a secondary thing but pain is and these painful things are obstacles to be gotten rid of. Pain is an excrescence. It is a transitory thing. The Self who is bliss being the all-permeating life of the universe, pain has no permanent place in it. Such is the Hindu position, the most optimistic in the world.

ভারতবাসী যে দুঃখ ক্লেশ, যে অনশন-নিপীড়ন এইরূপ ধীরতার সহিত সহ্য করে, তাহার শতাংশের একাংশ যদি পাশ্চাত্য জাতিকে সহিতে হয়, তবে ইয়োরোপ ও আমেরিকায় প্রচণ্ড রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে। ১৮৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যৎসামান্য অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল; সেই কষ্টের ফলে সমাজ-শরীরে যে প্রচণ্ড আন্দোলন উত্থিত হইয়াছিল, ইতিহাস-পাঠকের তাহা অবিদিত নাই। একজন মনস্বী ইংরাজ লিখিয়াছিলেন*,—"এই কি ইংলণ্ডের ধ্বংসের পূর্ব্বরূপ?" কারলাইল (Carlyle) ভাবী জাতীয় দুর্ঘটনার আশঙ্কায় আতঙ্কিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, দুইটী বাত্যাবিক্ষুব্ধ অশনি-বিপ্লুষ্ট প্রলয়ের মেঘ পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে। তাহাদের প্রচণ্ড আস্ফালনে ইংলণ্ড চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া হয়ত কোন্ দিন অন্তর্হিত হইবে! অথচ ইংলণ্ডে যে ক্ষুদ্র ব্যাপার, যে সামান্য অন্নকষ্ট এই সকল আতঙ্ক-কল্পনার নিদান ছিল, তাহা ভারতবর্ষের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। অথচ ইংলণ্ড এই তুচ্ছ পবনের মৃদু আন্দোলনে আলোড়িত হইয়াছিল, কিন্তু ভারতবর্ষ ইহার অপেক্ষা শতগুণ প্রচণ্ড বাত্যার আস্ফালনেও অকম্পিত থাকে।

জীবনের দৈনন্দিন ঘটনা ছাড়িয়া যদি আমরা ইতিহাসের বিশাল ক্ষেত্রে প্রবেশ করি, তাহা হইলেও আমরা এই ব্যাপারই প্রত্যক্ষ করিব। পাশ্চাত্য ইতিহাসের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা ফরাসী-বিপ্লব। অষ্টাবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসী-জীবনের নাট্যশালায় এই যে বিরাট্ অভিনয় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, ইহা এবং তাহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সুদূর পাশ্চাত্য আমেরিকায় সাম্য ও স্বাধীনতার জন্য যে সকল চেষ্টার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল,—এই দুই ঘটনার দ্বারা পাশ্চাত্য ইতিহাস রূপান্তরিত হইয়া নূতন শ্রী ও সম্পদ ধারণ করিয়াছে। কিন্তু এই দুই উদ্যমের প্রতিষ্ঠা কোথায়? প্রতিষ্ঠা মানবের সাম্য-জনিত অধিকার-তত্ত্বের উপর। এই দুই অনুষ্ঠানের মূল মন্ত্র এই যে, + সকল মনুষ্য সমান, সকলেরই সুখে তুল্য অধিকার? একজন সুখী, অপরে দুঃখী কেন হইবে? সকলেই বলিতে পারে অপরে সুখী, আমি কেন দুঃখী; অপরের যেমন সুখে অধিকার, আমারও তেমন তুল্য অধিকার। সমাজের অত্যাচারে আমি এই অধিকার হইতে চ্যুত হইয়াছি; শাসনতন্ত্রের অবিচারে আমার সুখের উপকরণ অপরে কাড়িয়া লইয়াছে। অতএব সমাজ ও শাসন-তন্ত্র আমি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িব। ঐ যুগে সমাজ ও শাসনতন্ত্রের সংস্কার যে আবশ্যক ছিল, ইহা কেহ অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই দুই মহা অনুষ্ঠানের মূলে মানুষের স্ব স্ব অধিকার (rights)—স্ব-ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য (duty) নহে। এ দেশে কিন্তু স্বাধিকার অপেক্ষা স্বধর্ম্মের প্রাবল্য অধিক। হিন্দুগ্রন্থে আমরা রাজধর্ম্ম, স্ত্রীধর্ম্ম প্রভৃতি স্বধর্ম্ম বা মানবের অবস্থা-সুলভ কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের প্রসঙ্গই পাই; কাহার কি অধিকার (rights), তাহার উল্লেখ দেখি না। বস্তুতঃ এখন আমরা

---

* Is this the beginning of the end?

\+ All men are born equal, they have all equal rights.

'rights'এর অনুবাদ করিতেছি 'অধিকার' শব্দ দ্বারা, কারণ 'rights'এর প্রতিরূপ শব্দ সংস্কৃতে বিরল; কিন্তু 'অধিকারের' মৌলিক অর্থ তাহা নহে। প্রাচীন সংস্কৃতে 'অধিকার' শব্দের অর্থ 'ভার'—যাহার উপর যে কর্ম্মের ভার, যে কর্ম্ম করিতে যে ব্যক্তি কর্ত্তব্যানুরোধে বাধ্য, সেই তাহার অধিকার। সেই জন্য আমরা মেঘদূতের আরম্ভে দেখিতে পাই যে, কালিদাসের যক্ষ "স্বাধিকার-প্রমত্ত" হওয়াতে "কান্তা-বিরহ-গুরু" অভিশাপ ভোগ করিয়াছিল। বেদান্ত-সূত্রেও দেখিতে পাই,—"যাবদধিকারং অবস্থিতিঃ আধিকারিকাণাম্।"

অর্থাৎ,—"যাঁহারা অধিকারী পুরুষ, ভার-প্রাপ্ত জীবন্মুক্ত কর্ম্মচারী, তাঁহারা অধিকারের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত অর্থাৎ কর্ত্তব্যানুরোধে যিনি যে কর্ম্মের ভার লইয়াছেন, সেই ভার সমাপ্তি পর্য্যন্ত, নির্ব্বাণ-মুক্তি গ্রহণ না করিয়া নিজের নিজের অধিকারে অপ্রমত্ত থাকেন।"

সুখের বিষয়, পাশ্চাত্য দেশেও কিছুদিন হইতে এই ধরণের কথা শুনা যাইতেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষকেরাও এখন শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, সুখ মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে—আর হইলেও, সুখ আত্মপ্রতিষ্ঠায় নহে, আত্মবিসর্জ্জনে।* সুখান্বেষণ মানুষের আত্মাদরের ফল। মানুষ ভাবে, সুখী হইতে তাহার পূর্ণ অধিকার; তাহার মত অশেষ গুণে গুণী, সুখী হইতে পাইবে না? মানুষ বুঝেনা যে, অভাবই দুঃখ; অভাবের নাশে দুঃখের অত্যন্তাভাব, অর্থাৎ পূর্ণ সুখ।†

কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে ও প্রাচ্যদেশে দুঃখবাদের ফলাফলের সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলে উভয় দেশের কাব্য আলোচনা করিতে হয়। কাব্য জাতীয়-জীবনের সমালোচনা, অর্থাৎ যে সময় যে জাতির আশা উৎসাহ, উদ্যম বিষাদ, বিপত্তি ব্যাকুলতায়, যে বিশেষত্ব থাকে, কবির কাব্যে তাহারই ছায়াপাত হয়। সেই জন্য কাব্যের মুকুরে জাতীয় জীবনের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়। অতএব আমরা যদি দেখি যে, পাশ্চাত্য কাব্য তমোময় নৈরাশ্যবহুল এবং প্রাচ্য কাব্য আশাময় ও আলোকবহুল, তবে বুঝিব যে, পাশ্চাত্য জাতির ও প্রাচ্যজাতির জীবন-সমালোচনায় কোন গূঢ় প্রভেদ আছে, যাহার দ্বারা সাহিত্যের এই পার্থক্য সংসাধিত হইয়াছে।‡

---

* It is only with renunciation that Life properly so called, can be said to begin. —Goethe.

† I tell thee blockhead it all comes of thy vanity ; of what thou fanciest these same deserts to be * * The fraction of life can be increased in value, not so much by increasing your numerator as by decreasing your denominator. Make thy claim of wages a zero, then ; thou hast the world under thy feet.——Carlyle.

‡ সন ১২৯৯ সালের ফাল্গুনের "জন্মভূমিতে" আমি "নিরাশা কাব্য" নামক প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে কতক আলোচনা করিয়াছিলাম। ঐ প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। ঐ প্রবন্ধে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য কাব্যের যে সমালোচনা করিয়াছিলাম, তাহার কতক অংশ আবশ্যকবোধে এই প্রবন্ধে নিবদ্ধ করিলাম।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, পাশ্চাত্য-সাহিত্য-মন্দিরের এক আয়ত প্রকোষ্ঠ নিরাশা-কাব্যে (Literature of Despair) পরিপূর্ণ। ইয়োরোপের অনেক প্রধান কবি নিরাশ কবি। এই নিরাশা-কাব্যের স্বরূপ কি? এ শ্রেণীর কাব্যের আস্বাদন করিলে দেখা যায় যে, ইহাতে শুধুই দুঃখজনিত করুণ ক্রন্দন অথবা তীব্র আর্ত্তনাদ এবং সুখের উদ্দেশ্যে আকাঙ্ক্ষাব্যাকুলিত দীর্ঘশ্বাস। এ জগৎ দুঃখভূমি; এখানে আশা পূরে না, আকাঙ্ক্ষা মিটে না; এ মরুদেশে কেবলই আতপ, ছায়া নাই; কেবলই অন্ধকার, আলোক নাই। এ পৃথিবীতে সুখের স্থানমাত্র নাই; এখানে বিচ্ছেদ আছে, মিলন নাই; অশ্রু আছে, হাসি নাই; শোক আছে, শান্তি নাই; পাপ আছে, পুণ্য নাই; অভিশাপ আছে, আশীর্ব্বাদ নাই—ইহাই এই নিরাশা কাব্যের ধুয়া। নিরাশা-কাব্যের কবিরা এই তত্ত্বকে সাকার করিবার জন্য তমোময় সুখহীন দুঃখাচ্ছন্ন মানবচরিত্রের অবতারণা করিয়া তাহার আত্মায় এই বিচ্ছেদ, অশ্রু, শোক, পাপ, অভিশাপ পুঞ্জীভূত করেন; তাহাতে এই আতপ আরও প্রচণ্ড হয়, এই অন্ধকার আরও নিবিড় হয়।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে এ জাতীয় কাব্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ জার্ম্মাণ কবি গেটের 'বারতর-বিলাপ' (Sorrows of Werter)। কবির লেখনীমুখে বিধুর বারতরের প্রতপ্ত হৃদয় হইতে যে উচ্ছল শোকোচ্ছ্বাস প্রবাহিত হয়, তাহা ভাবের বৈচিত্র্যে কখন করুণ ক্রন্দনের অনুচ্চ তানে, কখন বা তীব্র আর্ত্তনাদের বিকট বজ্র-নির্ঘোষে ধ্বনিত হইতে থাকে। কিন্তু সর্ব্বত্র ধুয়া একই—দুঃখ দুঃখ; সুখ নাই। ইংলণ্ডেও নিরাশা-কাব্যের স্বরূপ এই। ইংলণ্ডে বারতর বিলাপের প্রতিধ্বনি, করিয়া শেলী আল্যাষ্টর (Alastor, Revolt of Islam) এবং বায়রন্ হ্যারল্ডের পর্য্যটন (Childe Harold's Pilgrimage) ম্যানফ্রেড (Manfred) প্রভৃতি কাব্যরচনা করিয়াছেন; ইঁহাদিগেরও সুর ঐ—দুঃখ দুঃখ দুঃখ; সুখ নাই। শেলীর কাব্যে করুণ-ক্রন্দনের অর্দ্ধস্ফুট উচ্ছ্বাস, বায়রণের কাব্যে তীব্র আর্ত্তনাদের বিকট বজ্র-নির্ঘোষ। পরবর্ত্তী কবি ক্লাফ্ (Clough) এবং ম্যাথিউ আরণল্ড (Mathew Arnold) এই নিরাশা-কাব্যে একটা মর্ম্মান্তিক বিষাদের রেখাপাত করিয়াছেন। তাহার ফলে এই কাব্যের সুর করুণতর হইয়াছে। কিন্তু সেই ধুয়া ঠিক আছে—দুঃখ দুঃখ দুঃখ; সুখ নাই।

কেহ কেহ মনে করেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য কবিদিগের এই নিরাশা-কাব্য ঐ যুগের একটা বিশেষ ব্যাধি (Maladie de cycle)—কতকটা সংক্রামকও বটে! তাঁহারা ভাবেন যে, জার্ম্মাণির মহাকবি গেটের প্রথম জীবনে কাব্যজগতে যে বাত্যা-বিক্ষোভ (Strum und dring) উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতেই সাহিত্য-গগন কিছুকাল আলোড়িত হইয়াছিল মাত্র। এই মত কিন্তু সমীচীন মনে হয় না। পাশ্চাত্য-সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে মনে

হয় যে, নিরাশা-কাব্য যেন পাশ্চাত্য-সাহিত্যের অবশ্যম্ভাবী সহচর। ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম্মবিপ্লব বা বিশ্বাস-হানির যুগ ছাড়িয়া দিয়া ইয়োরোপের মধ্য-যুগের সেক্সপিয়র-মিল্টনের কথা ধরা যাউক। সেক্সপিয়রের হ্যামলেট (Hamlet), লিয়ার (King Lear) টাইমন (Timon of Athens) কি নিরাশা-কবির কাব্য নহে? সেই নৈতিক পূতিগন্ধময় দীনেমার রাজ্যে, সেই অসৎ রাজা, অসতী রাণী, অকর্ম্মণ্য অমাত্য-বিড়ম্বিত রাজপুরে, পিতৃ-হত্যা, মাতৃদ্রোহ, প্রণয়-প্রত্যাখ্যানে জর্জ্জরিত হ্যামলেটের সেই মহাবিরাগ কাব্য কি নিরাশা কাব্য নহে? সেই বাত্যাবিক্ষুব্ধ, ধারাতাড়িত, অশনিবিপ্লুষ্ট, বিজন বনে, সেই স্নেহবিমুখ, কৃতজ্ঞতাহীন-মানবরূপিণী পিশাচিনী কন্যাদ্বয়ের আজ্ঞায় নির্ব্বাসিত, ক্রোধপ্রদীপ্ত লিয়রের সেই গৈরিক ধারা-নিস্রাবের ন্যায় উৎকট শাপানল-উদ্গীরণ কি নিরাশা-কাব্য নহে? অথবা সেই বীচিতাড়িত, জনহীন সাগর-সৈকতে, গ্রীসের সেই নিদারুণ অধঃপতনের দিনে, বন্ধুর কাপট্যে, স্বজনের মুখসর্ব্বস্বতায় মর্ম্মাহত অধীর তাইমনের রোষে, ক্ষোভে, অভিমানে সেই আত্ম-নির্ব্বাসন কি নিরাশা-কাব্য নহে? সেক্সপিয়ার ছাড়িয়া যদি মিল্টনের কথা ধরা যায়,—তাঁহার Paradise Lost, তাঁহার Samson Agonistis, পাঠ করা যায়, তাহাতেও কি আমরা ঐ নিরাশা-কাব্যের অনুতাপ-অভিশাপ, আক্রোশ-প্রতিহিংসার তীব্র আর্ত্তনাদ শুনিতে পাই না? আরও পিছাইয়া যদি আমরা গ্রীকযুগে উপস্থিত হই, তাহা হইলেও ঈদিপস্, প্রমিথিউস, অ্যাণ্টিগনি প্রভৃতি নাটকের স্রষ্টা কবিদিগের কাব্যেও ঐ নিরাশা-কাব্যেরই রেখাপাত উজ্জ্বল বর্ণে দেদীপ্যমান দেখিতে পাই।

প্রাচ্য-সাহিত্যের প্রকৃতি ইহার বিপরীত। সমগ্র সংস্কৃত-সাহিত্য এবং প্রাচীন বাঙ্গলাদি সাহিত্য আলোচনা করিয়া দেখিলে কোথাও নিরাশা-কাব্যের অণুমাত্র ছায়াপাত পাওয়া যায় না। বাল্মীকি, ব্যাস প্রভৃতি প্রাচীন কবি অথবা কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি, মাঘ, বাণভট্ট, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম প্রভৃতি নবীন কবি, কাহারও কাব্যই নিরাশা-কাব্য নহে; অথচ সীতা-সাবিত্রী অথবা রাম-যুধিষ্ঠিরাদি যে তাড়না, যন্ত্রণা, বিড়ম্বনা অকাতরে সহ্য করেন, যে অবিচার, অত্যাচার অনায়াসে বুক পাতিয়া লয়েন, দুঃখের যে তুষানলে অহরহঃ দগ্ধ হয়েন, হ্যাম্‌লেট বা লিয়ার বা তাইমন্, ঈদিপাস্ বা প্রমিথিউস, বায়রন, সেলী বা বায়রণ কেহই তাহার শতাংশের এক অংশও সহেন নাই। "স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু তাঁহার "হিন্দুত্ব" গ্রন্থে যথার্থ ই বলিয়াছেন,—"অগণ্য, অসংখ্য শোক, দুঃখ, ক্লেশ, যন্ত্রণার কথায় হিন্দুশাস্ত্র পরিপূর্ণ। বোধ হয়, এত শোক, এত, দুঃখ, এত যন্ত্রণার কথা, আর কোন শাস্ত্রে নাই।" অথচ এ দেশের কাব্য নিরাশা-কাব্য নহে, এ দেশের কবি নিরাশ-কবি নহেন, এ দেশে দুঃখ জন্য করুণ ক্রন্দনের অনুচ্চ তান অথবা তীব্র আর্ত্তনাদের বিকট বজ্র-নির্ঘোষ নাই। এক কথায় এ দেশের কাব্যে নিরাশা-

কাব্যের সেই "দুঃখ – দুঃখ—দুঃখ ; সুখ নাই"—এ ধুয়া নাই। * অথচ আমরা দেখিয়াছি যে, এ দেশের দর্শনে এবং জীবনে, কাব্যে এবং ইতিহাসে, দুঃখবাদের পূর্ণ প্রভুত্ব। পাশ্চাত্যে ও প্রাচ্যে দুঃখবাদের ফলাফলসম্বন্ধে এই বৈষম্য কেন ? বারান্তরে আমরা এই সমস্যার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

বাঁশরী।

সিন্ধু খাম্বাজ – যৎ

শ্যামের বাঁশী বাঁশের নয়
(বাঁশী পঞ্চ ধাতুময়)
পঞ্চভূতে গড়া বাঁশী, নিজে সুরের সুর তাল লয়॥
মায়া মোহের মোহন সুরে,
মন গোপিনী নে'যায় ধ'রে
কুহক দিয়ে ভোলায় পরে,
ঘরে ফির্‌তে নাহি দেয়॥

এ বাঁশীর মজা যে পেয়েছে।
সে যাবার কথা ভুলে গেছে,
বারে বারে তাই ফিরে আস্‌ছে,
মিটাইতে বাসনায়॥

তাই এ দেহ বাঁশরী হতে,
ছয়টী রাগ একটী পথে,
যে জন পারে বাজাইতে,
তারই হয়রে প্রেমোদয়॥

দ্বিজ বলে ভাই সুর ব্রহ্ম,
এ যার বোধের হবে গম্য,
বাঁশী ছেড়ে সে হবে ধন্য,
ব্রহ্ম তানে পাবে লয়॥

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

---

* যাঁহারা বাঙ্গলা-সাহিত্যের গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, আমাদের জাতীয় সাহিত্যেও এই নিরাশা-কাব্যের ছায়াস্পর্শ হইয়াছে। ইহা বিদেশী শিক্ষা ও অনুকরণের ফল, যাহার ফলে আমাদের চরিত্রের দার্ঢ্য কমিতেছে, আমাদের জাতীয় জীবনের মজ্জা শ্লথ হইতেছে। আমাদের সীতা-সাবিত্রীরা যাহা অম্লানমুখে সহিতেন, এখনকার রোহিণী-শৈবলিনীদের তাহার শতাংশ সহিতে হইলে তাঁহারা করুণ ক্রন্দনের উচ্চ তান তুলেন। আমাদের রাম-যুধিষ্ঠির-আদি যাহা অনায়াসে বুক পাতিয়া লইতেন, আমাদের সীতারাম গোবিন্দলালকে তাহার কণাংশ স্পর্শ করিলে তাঁহারা তীব্র আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ করেন। ইহা পাশ্চাত্য অনুকরণের ফল, প্রাচ্যের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব নহে। অতএব প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দুঃখবাদের আলোচনায় তাহা ধর্ত্তব্য নহে।

যোগপন্থা।

চৈত্র সংখ্যা-'ব্রহ্মবিদ্যায়' আমাদের যোগদর্শন ও নব্যজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ শেষ হইয়াছে, কিন্তু উহাতে আমাদের বক্তব্যের শেষ হয় নাই। যোগদর্শনবিষয়ক আরও দুই চারিটী কথা না বলিলে প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে, সেই জন্য এই বিষয়টি লইয়া পুনরায় পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত হইতে হইল।

পূর্ব্বোক্ত সাধন ভিন্ন যোগপন্থায় আর কি কি আবশ্যক? ইহার উত্তর সাধন-পাদে পাওয়া যায় এবং ইহা ক্রিয়াযোগ নামে অভিহিত হইয়াছে। ক্রিয়াযোগ তিনটি—"তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি"—অর্থাৎ "তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান"। তপস্যা ভিন্ন কোন মহৎকার্য্য করিতে পারা যায় না; মনুষ্য মাত্রেই প্রকৃতির জীব, সুতরাং প্রকৃতির যে সকল শক্তি আছে, তাহাতে প্রথমে অভ্যস্ত হইতে হইবে। উত্তাপ, শীত, বায়ু এবং ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতির প্রকোপ সহ্য করিতে হইবে; উত্তাপ বা শীতে কাতর হইলে তাহার দ্বারা কি কাজ হইতে পারে? স্পার্টা দেশে সদ্যঃপ্রসূত সন্তানকে রাজকীয় নিয়মানুসারে তিন দিন কোন পাহাড়ের উপর নিঃসহায় অবস্থায় ফেলিয়া রাখা হইত; যদি এই ভীষণ পরীক্ষায় শিশু বাঁচিত, তবেই তাহাকে গৃহে আনয়ন করা হইত। জাপানীরা তাহাদের সেনাগণকে শীতকালে উত্তর জাপানে পাঠাইয়া দেয়, কারণ সেখানে শীতের মাত্রা অত্যন্ত অধিক এবং ইহার উদ্দেশ্য যে, প্রত্যেক সৈনিক যেন শীত সহ্য করিতে শিখে। "স্বাধ্যায়" অর্থে মোক্ষ-শাস্ত্রাধ্যয়ন, প্রণব আদি পবিত্র শব্দ জপ। পবিত্র শব্দ মনের উপর একটা শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে, এমন কি, যে ব্যক্তিকে আমরা সম্মান ও শ্রদ্ধা করি, তাঁহার নাম কেহ উচ্চারণ করিলে চিত্তের ভাবান্তর হয়; শ্রীশঙ্করাচার্য্য বা শ্রীচৈতন্যের নাম কেহ উচ্চারণ করিলে হৃদয়ের ভাব পরিবর্ত্তন হয়। ঈশ্বর-প্রণিধানের অর্থ—ঈশ্বরে ভক্তি এবং সমস্ত কর্ম্ম সেই পরমগুরুতে অর্পণ ও ত্যাগ। যোগদর্শনমতে ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয় হইতে নিত্যমুক্ত পুরুষ-বিশেষই ঈশ্বর। সত্য বটে যোগীরও ক্লেশ নাই, কর্ম্ম নাই, বিপাক বা কর্ম্ম-জনিত ফল নাই এবং আশয় বা বাসনা নাই; তবে তাঁহার এই সকল এককালে ছিল, সুতরাং যোগী নিত্যমুক্ত নহেন। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের সহিত কাহারও তুলনা হইতে পারে না, তাঁহাতেই ঐশ্বর্য্যের পরাকাষ্ঠা এবং তিনি নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ তাঁহাতেই সর্ব্বজ্ঞতার বীজ অতি মহৎ পরিমাণে আছে। তাঁহার নিজের কোনই প্রয়োজন নাই, তবে কেবল জীবের প্রতি অনুগ্রহ বা করুণা প্রকাশ করাই তাঁহার প্রয়োজন। তিনি কালাতীত, সুতরাং তিনি ব্রহ্মাদিরও স্রষ্টা ও গুরু। ঈশ্বর-প্রণিধানে জীব ঈশ্বর-অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয় এবং আশু সমাধি লাভ করে।

চিত্তকে সমাহিত করিতে হইলে আরও কতকগুলি আবশ্যক সাধন আছে—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। এই আটটিকে যোগাঙ্গ

বলে এবং ইহাদের মধ্যে প্রথম পাঁচটি বহিরঙ্গ-সাধন এবং শেষোক্ত তিনটি অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—অন্তরঙ্গ-সাধন। প্রথম পাঁচটি মোটামুটি বাহ্যিক দেহেরই ব্যাপার, সুতরাং উহারা বহিরঙ্গ-সাধন; এবং ধারণা প্রভৃতি চিত্তের ব্যাপার, কাজেই উহারা অন্তরঙ্গ-সাধন। দেহের ও মনের কি পরিমাণ উৎকর্ষ লাভ হইলে সমাধি হয়, এই অষ্ট যোগাঙ্গ দ্বারা তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ, ইহাদিগকে যম বলে। সকল প্রাণীর প্রতি অদ্রোহভাব অহিংসা; মনে যে ভাব থাকে, বাক্যে তাহা প্রকাশ করিলে তাহাকে সত্য বলে; পরদ্রব্য অপহরণ না করাকে অস্তেয় বলে; ইন্দ্রিয়-সংযমকে ব্রহ্মচর্য্য বলে; অর্থ প্রভৃতি গ্রহণ না করাকে অপরিগ্রহ বলে। শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর-প্রণিধান—ইহাদিগকে নিয়ম বলে। শৌচ শব্দে শরীরের অশুচি ও মনের অশুদ্ধতা এই উভয়ের প্রক্ষালন বুঝায়; শরীর পরিষ্কার না রাখিলে ব্যাধিগ্রস্ত হইতে হয় এবং ব্যাধি যোগের অন্তরায় বলিয়া শরীর-শুদ্ধি বিশেষ আবশ্যক এবং উহা উত্তম মৃত্তিকা ও জল প্রভৃতির দ্বারা করিতে হইবে; মনের শুদ্ধি প্রতিপক্ষ ভাবনার দ্বারা করিতে হইবে; ইহার আর অন্য কোনও উপায় নাই। যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই তৃপ্ত হওয়া এবং আরও অধিক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা না করাকে সন্তোষ বলে। তপ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সুতরাং আর অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই। এইগুলি স্বতন্ত্রভাবে অনুশীলন করিতে হইবে এবং পতঞ্জলি বলেন, তাহা দ্বারা বিশেষ বিশেষ ফললাভ হয়। চিত্ত সমাহিত করিতে হইলে আসন অভ্যাস করিতে হয়; কারণ আসন স্থির না হইলে সমাধি হইতে পারে না। চাঞ্চল্য-রহিত হইয়া স্বচ্ছন্দে অবস্থিতিকে আসন বলে এবং পদ্মাসন, বীরাসন, ভদ্রাসন, স্বস্তিকাসন প্রভৃতি হস্ত পদাদির বিভিন্ন সংস্থান অনুসারে বহুবিধ আসন আছে। আসন স্থির হইলে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি রোধ করিতে হয় এবং তদ্দ্বারা প্রাণায়াম সিদ্ধ হয়। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম সম্বন্ধে এক প্রকার বলা হইল—এখন প্রত্যাহারের কথা। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ আপন আপন বিষয়ে রত থাকিলে চিত্তের একাগ্রতা লাভ হয় না। ইন্দ্রিয়সমূহকে স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করা অর্থাৎ টানিয়া লওয়াকে প্রত্যাহার বলে, এবং চিত্ত নিরোধ হইলে তৎসঙ্গে ইন্দ্রিয়সমূহেরও নিরোধ হইয়া যায়। ভাষ্যকার বলেন,—"যথা মধুকররাজং মক্ষিকা উৎপতন্তমনুৎপতন্তি নিবিশমানমনু নিবিশন্তে তথেন্দ্রিয়াণি চিত্তনিরোধে নিরুদ্ধানি।" যেমন মক্ষিকারাজ (কুইন বী) ও মক্ষিকা; মক্ষিকারাজ উড্ডীন হইলে মক্ষিকাসমূহও উড্ডীন হয় এবং বসিলে বসিয়া পড়ে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণও চিত্তের অনুসরণ করে।

এই সকল বহিরঙ্গ-সাধনের কথা। বিভূতি-পাদে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি বা অন্তরঙ্গ-সাধন সম্বন্ধে যে উপদেশ আছে, তাহা দেখা যাউক। বাহ্য বা আন্তর যে কোন বিষয় হউক, তাহাতে চিত্ত স্থির করাকে ধারণা বলে। মণিপুর চক্র, অনাহত চক্র, জ্যোতিঃ

প্রভৃতি যে কেন্দ্র, নাভি হৃদয় ও মস্তকে আছে ; যোগমতে চিত্তকে সেই সকল স্থানে নিবদ্ধ করিতে পারা যায়। এ সকল বিষয়ে আমাদের কোনও কথা বলিবার অধিকার নাই ; কারণ যোগীরই ইহা প্রত্যক্ষগম্য। যাহা হউক, সম্মুখস্থিত বিশ্বরূপের অঙ্গস্বরূপ দেব-মূর্ত্তিতে চিত্ত নিবদ্ধ হইতে পারে, আবার সে মূর্ত্তি সম্মুখে উপস্থিত না থাকিলেও সেই মূর্ত্তির সংস্কারের প্রতিও চিত্ত স্থির হইতে পারে। * * "ধ্যেয়ালম্বনস্য প্রত্যয়স্যৈকতানতা সদৃশঃ প্রবাহঃ প্রত্যয়ান্তরেণাপরামৃষ্টো ধ্যানম্",—ধ্যেয় বস্তু অবলম্বন করিয়া কেবলমাত্র সেই বস্তুরই প্রতীতি এবং চিত্তে তাহারই ধারাবাহিক অবাধিত প্রবাহকে ধ্যান বলে। তৎপরে ধ্যান যখন প্রগাঢ় হইয়া কেবল মাত্র ধ্যেয় বস্তুই চিত্তকে অধিকার করিয়া থাকে এবং "আমি ধ্যান করিতেছি"—এ ভাবটাও লুপ্ত হয়, তখন তাহাকে সমাধি বলে। এই সকল বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ সাধন করিলে জীব যোগপথে অগ্রসর হইতে পারে।

যোগ অভ্যাস করিলে কি ফললাভ হয়, তাহা এখনও বলা হয় নাই। সাধনপাদ-পঞ্চদশ-সূত্রের ভাষ্যে ব্যাস বলিয়াছেন যে, যোগশাস্ত্র চতুর্ব্যূহ বিশিষ্ট,—"যথা চিকিৎসা-শাস্ত্রং চতুর্ব্যূহং রোগঃ, রোগহেতুঃ আরোগ্যং ভৈষজ্যমিতি এবমিদমপি শাস্ত্রং চতুর্ব্যূহমেব তদযথা সংসারঃ সংসারহেতুঃ মোক্ষঃ মোক্ষোপায় ইতি।" আবার বিভূতিপাদ অষ্টাদশ সূত্রের ভাষ্যে এইরূপ উল্লেখ আছে। আবট্য মুনিকে জৈগীষব্য মুনি বলিলেন, "(যোগ দ্বারা) আমার বুদ্ধি নির্ম্মল হইয়াছে, আমি দশ মহাকল্পের জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করিতে সমর্থ হইয়াছি, আমি নরক ও তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্তি হেতু দুঃখ সকল অনুভব করিয়াছি এবং দেবতা ও মনুষ্য যোনিতে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়াছি ; কিন্তু এ সকলই দুঃখময়।" ভগবান্ আবট্য আবার বলিলেন, "আপনার যে প্রধান-বশিত্ব রূপ ঐশ্বর্য্য হইয়াছে, তাহাও কি সুখ নহে ?" তদুত্তরে জৈগীষব্য বলিলেন, "বিষয়-সুখের তুলনায় ইহা উত্তম সুখ বটে, কিন্তু কৈবল্যের সহিত তুলনায় ইহা দুঃখ বলিয়া গণ্য।" অতএব যোগের দুই ফল,—ঐশ্বর্য্য (মিরাকল্) ও কৈবল্য বা মোক্ষ। ঐশ্বর্য্য শব্দের অর্থ অনৈসর্গিক বা অতি-প্রাকৃত শক্তি, যাহা কেবল ঈশ্বরেরই আছে। যোগীর পরচিত্তজ্ঞান (থট-রিডিং) হয়, যোগী হস্তীর ন্যায় এবং বায়ুর ন্যায় বলশালী হইতে পারেন ; তাঁহার সূক্ষ্ম, ব্যবহিত এবং বিপ্রকৃষ্ট জ্ঞান, অর্থাৎ অণুর ন্যায় সূক্ষ্ম বস্তু, ইন্দ্রিয়ের অন্তরালস্থিত বস্তু এবং অতি বৃহৎ বস্তুরও জ্ঞান হইয়া থাকে এবং তাঁহার প্রাতিভ জ্ঞানেরও উদয় হয় ; এই জ্ঞান উৎপন্ন হইলে যোগী সকল বিষয়ই জানিতে পারেন অর্থাৎ জগতে পূর্ব্বে যাহা হইয়াছে ও ভবিষ্যতে যাহা হইবে, যোগী তাহা জানিতে পারেন। তবে যোগীদের মধ্যেও গুণভেদে প্রকারভেদ আছে। যোগ দর্শনে চারিপ্রকার যোগীর উল্লেখ আছে,—কল্পিক, মধুভূমিক, প্রজ্ঞাজ্যোতি ও অতিক্রান্তভাবনীয়। পূর্ব্বোক্ত অতিপ্রাকৃত শক্তিগুলি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যোগী লাভ করিয়া থাকেন। তৃতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ প্রজ্ঞাজ্যোতি যোগী ভূতজয়ী ইন্দ্রিয়-সম্পৎ-বিশিষ্ট হইয়া থাকেন। ইঁহারা অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য,

বশিত্ব, ঈশিত্ব, কামাবসায়িত্ব,এই অষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন,অর্থাৎ ইঁহারা অণুর আকার ধারণ করিতে পারেন, তুলা অপেক্ষাও লঘু হইতে পারেন, বিরাট আকার ধারণ করিতে পারেন, অঙ্গুলি দ্বারা দূরস্থ চন্দ্রলোক স্পর্শ করিতে পারেন ; তাঁহাদের ইচ্ছা কোনও বাধা প্রাপ্ত হয় না ; ইচ্ছা করিলে তাঁহারা ভূমির মধ্যে যাতায়াত করিতে পারেন, জড় তাঁহাদের সম্পূর্ণ বশে আসে ; তাঁহাদের দিব্যকান্তি লাভ হয় ও শরীর বজ্রের ন্যায় দৃঢ় হয়, ইহাকেই কায়সম্পৎ বলে। ইহা ভিন্ন যোগী আরও অনেক প্রকার অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতে পারেন ; বাহুল্য ভয়ে তাহার উল্লেখ করা হইল না। তবে এ সকল শক্তি সম্প্রজ্ঞাত সমাধি দ্বারা লাভ হইয়া থাকে। যে যোগী অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার এ সকল শক্তিও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয় এবং ইহাতেও যে বৈরাগ্য হয়, তাহাই পূর্ব্বোক্ত পর-বৈরাগ্য। যোগী তখন বুঝেন, যে প্রকৃতি বাহ্যভাবে লীলা করিতেছে, সেই প্রকৃতিই চিত্তরূপে আপনার লীলা আপনিই দেখিতেছে। এই প্রজ্ঞার উদয় হইলে অবিদ্যার অবসান হয়, অবিদ্যা নাশে পঞ্চক্লেশের ক্ষয় হয় এবং ধর্ম্মমেঘ নামক সমাধির উদয় হয়। তখন প্রকৃতি পুরুষকে পরিত্যাগ করে এবং পুরুষও ঐ অবস্থায় স্বস্থ হন ও প্রকৃতি-বিরহিত হইয়া কেবল মাত্র তিনিই থাকেন ; ইহাই কৈবল্য।

যোগদর্শন জগতে যে কেবল এক নূতন তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহা নহে। ইহার দার্শনিক ভাগও অতি গভীর। কার্য্যকারণ, দেশ কাল, কূটস্থ-পরিণামিত্ব প্রসঙ্গ, চিত্ত ও আত্মা, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি দার্শনিক বিষয়গুলির আলোচনা অতি উপাদেয় ও সারবান্। এই সকল বিষয়ের আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, তবে কালসম্বন্ধে যে বিচার আছে, তাহার একটু আভাস এ স্থলে না উল্লেখ করিয়া থাকিতে পারা যায় না। কাল-জ্ঞান কি করিয়া হয়, ইহা লইয়া দার্শনিক জগতে একটা ঘোরতর বিতণ্ডা আছে ; কারণ কাল বা সময় বলিয়া একটা কোনও বস্তু নাই, অথচ তাহার জ্ঞান হইয়া থাকে। কেহ বাহ্য বস্তুর গতিকেই কাল বলেন এবং প্রাচীন কালে সূর্য্যের গতি ও তৎপরে বালির ও জলের গতি অনুসারেই কাল পরিমাণ করা হইত। তখন বালির ও জলের ঘড়ি প্রচলিত ছিল। এখনও আমরা ঘড়ির কাঁটার গতি দেখিয়া কাল অনুমান করি। ইহাতে পূর্ব্বেও যে দোষ ছিল, এখনও তাহা রহিয়া গিয়াছে। এখন যাহাকে এক সেকেণ্ড বলা যায়,তাহার কোনও নির্দ্দিষ্ট, স্থায়ী পরিমাণ নাই, ইহা পরস্পর গৃহীত ব্যবহার (কনভেনসন্) মাত্র। বৈজ্ঞানিক জগৎ এ অভাব এখনও বিশেষভাবে অনুভব করিতেছেন। ক্লার্ক ম্যাক্স্ওয়েল নামক প্রসিদ্ধ ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ও গণিতজ্ঞ পণ্ডিত প্রস্তাব করেন যে, পরমাণুর প্রকম্পন হইতে কালের একটা আদর্শ পাওয়া যাইতে পারে ; কারণ পরমাণুর প্রকম্পনের ক্রম ও আনন্তর্য্য সর্ব্বদা স্থায়ী ও একভাবেই হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয়, বিভূতিপাদ ৫২ সূত্রের ব্যাস-ভাষ্যে ঐ উক্তিই পাওয়া যায়। "যথাঽপকর্ষপর্য্যন্তং দ্রব্যং পরমাণুঃ ; এবং পরমাপকর্ষপর্য্যন্তঃ কালঃ ক্ষণঃ ; যাবতা বা সময়েন চলিতঃ পরমাণুঃ পূর্ব্বদেশং জহ্যাদুত্তরদেশমুপসম্পদ্যেত স কালঃ

ক্ষণঃ ; তৎপ্রবাহাবিচ্ছেদস্ত ক্রমঃ।" এ বিষয়টি অতি জটিল, এবং ইহার বিষয়ে অনেক বলিবার আছে, কিন্তু প্রবন্ধে সে স্থান নাই।

যোগদর্শন সম্বন্ধে অন্যান্য হিন্দু-শাস্ত্রে কি রূপ উক্তি আছে, সেই বিষয়ে দুই চারিটী কথা বলা আবশ্যক। পৌরাণিক শাস্ত্র যোগ-মত সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। হিন্দু দার্শনিক গ্রন্থের মধ্যে কেবল পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনে যোগমতের সমর্থন নাই। এতদ্ভিন্ন অপর সকল দর্শনেই এবং এমন কি বৌদ্ধ-দর্শনেও যোগ-প্রক্রিয়ার উপর বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হইয়াছে এবং ধর্ম্ম, আত্মা, পরমাণু প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় বিষয় যোগীর প্রত্যক্ষগম্য, তাহাও স্বীকৃত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার শারীরক-ভাষ্যে স্পষ্টই বলিয়াছেন, যোগ শ্রুতি-বিরোধী নহে ; কারণ নিদিধ্যাসন শ্রুতির একটি অঙ্গ, সুতরাং যোগমত সকলেরই গ্রহণের বিষয়। শঙ্করাচার্য্য সাংখ্য-দর্শনের কতকগুলি মূল মত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন বটে, কিন্তু যোগসম্বন্ধে তাঁহার কোনও বিরোধ নাই। জয়ন্ত ভট্ট একজন ন্যায়-তন্ত্রের আচার্য্য-স্বরূপ। চার্ব্বাক সম্প্রদায়ের যোগসম্বন্ধে আপত্তি লক্ষ্য করিয়া তিনি উহা যেরূপ ভাবে খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার কিছু পরিচয় এস্থলে দেওয়া যাইতেছে। আপত্তিকারী বলিতেছেন, অতীন্দ্রিয় বিষয় মানুষ জানিতে পারে, তাহার কি প্রমাণ আছে ? জয়ন্ত বলেন, "অতিশয়তা উহার প্রমাণ ; ইন্দ্রিয়, জীব জন্তু হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেরই আছে, কিন্তু দর্শনশক্তি, ঘ্রাণশক্তি সকল জীবের সমান নহে ; মার্জ্জার অন্ধকারেও তাহার ভক্ষ্য জীব দেখিতে পায়, কিন্তু তুমি দেখিতে পাও না ; সুতরাং তোমা অপেক্ষা মার্জ্জারের দর্শনাতিশয় আছে। অতিশয়ের কোথায় শেষ, তাহা আমরা জানি না ; সুতরাং যোগীগণ যে সূক্ষ্ম, ব্যবহিত স্থানের বস্তু দেখিতে পাইবেন, ইহাতে অসম্ভব কি আছে ? এই জ্ঞান যোগীগণ অভ্যাসদ্বারা লাভ করিয়া থাকেন ; কিন্তু তোমরা বলিয়া থাক, অভ্যাস-ফলের সীমা আছে ; কারণ যে ব্যক্তি প্রতিদিন অনন্যকর্ম্মা হইয়া লম্ফ দিতে অভ্যাস করে, সে প্রত্যেক দিন অল্প অল্প পরিমাণে অধিকতর স্থান অতিক্রম করিতে পারে ; কিন্তু তাই বলিয়া সে পর্ব্বত ও সাগর লঙ্ঘন করিতে পারে না। তোমার এ আপত্তি ঠিক নহে ; কারণ মন ও শরীর এক ধর্ম্মবিশিষ্ট নহে ; শরীরের ক্রিয়ার একটা সীমা থাকিতে পারে, কিন্তু মনের সে সীমা কোথায় ? মন সর্ব্ব-বিষয়গামী, তাহার অবিষয় কিছুই নাই। যোগীগণ সেই জন্য জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারেন। মনের জড়তা দূর হইলে মন সর্ব্বব্যাপী হইতে পারে।" বৈশেষিকাচার্য্য শ্রীধর ভট্টও ঐরূপ ভাবেরই কথা বলিয়াছেন। অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লইয়াই এস্থলে বিবাদ, তাহার উত্তরে শ্রীধর বলিতেছেন, "দৃষ্টং তাবৎ সমাহিতেন মনসাভ্যস্যমানস্য বিদ্যাশিল্পাদেরজ্ঞাতস্যাপি জ্ঞানম্"। কথাটি বড় সারবান্। নব্য শিক্ষার্থী যে সকল বিষয় জানে না, তাহা চিন্তাদ্বারা শিখিতে ও বুঝিতে পারে। বিজ্ঞান, শিল্প, গণিত প্রভৃতি শিক্ষা করিতে হইলে অভিনিবেশ দ্বারা তাহাতে প্রবেশ করিতে হয় এবং এইরূপে ক্রমশঃ ক্রমশঃ ঐ সকল বিষয়ে অধিকার জন্মে। মানসিক শক্তির যদি এই তারতম্য না থাকিত, তাহা

হইলে বালক, বৃদ্ধ ও যুবার কোনও প্রভেদ থাকিত না এবং সভ্য ও অসভ্যজাতি এই উভয়ের মধ্যে কোনই পার্থক্য থাকিত না। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, এখন যে বিষয়টি জানি তাহাতে একটু মনঃসংলগ্ন করিলে আরও অধিকতর জানা যায়। এইরূপে একাগ্রতার পরিমাণের সহিত জ্ঞানের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। আজ যাহা বুঝিতে পারা গেল না, পুনঃ পুনঃ চেষ্টায় তাহা বুঝা যায়। একাগ্রতার ফলে জ্ঞানের কেন প্রসারতা বৃদ্ধি হয়, মনোবিজ্ঞান তাহার কোনও কারণ বলিতে পারে না। এডিসনের ফনোগ্রাফ আবিষ্কারের পূর্ব্বে কোনও ফরাসী বৈজ্ঞানিক, ফনোগ্রাফে যে রেকর্ড ব্যবহার হয়, তাহা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন; কিন্তু যে যন্ত্রের সাহায্যে রেকর্ডগৃহীত শব্দগুলির পুনরুৎপাদন করিতে পারা যায়, তাহা তিনি নির্ম্মাণ করিতে পারেন নাই। এডিসন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এটুকু আপনার দ্বারা কেন হয় নাই"? তদুত্তরে ফরাসী বৈজ্ঞানিক বলেন যে, উহা তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। সুতরাং তাঁহার পক্ষে যেটুকু অজ্ঞাত ছিল, এডিসনের পক্ষে তাহা জ্ঞাত। অতএব অজ্ঞাতের জ্ঞানই মনুষ্য-জীবনে একটি অদ্ভুত রহস্য এবং শ্রীধরের মতে এই জ্ঞানের তারতম্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে এবং এই জ্ঞান যাঁহার "অতিশয়" পরিমাণে আছে, তিনিই যোগী। শ্রীধর আরও বলিয়াছেন যে. কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, জ্ঞানের তারতম্য কে অস্বীকার করে? এখানে সংশয়ের বিষয় অতীন্দ্রিয় জ্ঞান। জল গরম করিলে তাহা ক্রমশঃ উত্তপ্ত হয়; এখন উহাতে যে পরিমাণে উত্তাপ আছে, তাহার পরে উহা অপেক্ষা অধিক, তৎপরে আরও অধিক—এইরূপে তাপ বাড়িয়া যায়, ইহা কে অস্বীকার করে? তবে যদি তুমি বল, জল গরম হইয়া বহ্নিশিখায় পরিণত হয়, তাহা কেহ বিশ্বাস করিবে না। ইহার উত্তরে শ্রীধর বলেন যে, এ দৃষ্টান্ত ঠিক নহে; কারণ জল স্থির পদার্থ নহে. উত্তাপ সংযোগে উহার ক্ষয় হয় এবং অবশেষে সমস্তই বাষ্প হইয়া যায়। কাজেই উত্তাপের চরম অবস্থা বহ্নিশিখা উহাতে আসিতে পারে না। সাধারণ চিত্ত সর্ব্বদাই মলিনতায় আচ্ছন্ন, চিত্তকে স্বস্থ করিতে হইলে এই মলিনতা দূর করিতে হয়; যেমন স্বর্ণের অসার ভাগ অগ্নির দ্বারা দূর হইয়া নির্ম্মলভাবে প্রকাশিত হয়, যোগীও তাঁহার চিত্ত হইতে সেইরূপ অসার ভাগ দূর করিয়া চিত্তের স্বীয় অবস্থায় পরিণত করিতে পারেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, যোগ-প্রকরণ হিন্দুজাতির সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে। যোগপন্থা যদি অলীক বা অসার হইত, তাহা হইলে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুজাতির সকল তন্ত্রেই উহা প্রবেশ করিতে পারিত না এবং উহা অতীতের গর্ভে নির্ব্বাসিত হইত। প্রজ্ঞা-পারমিতা নামক প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে চৌষট্টি প্রকার দর্শনের উল্লেখ আছে; সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহকার মাধবাচার্য্য ষোলটি দর্শনের বিবরণ দিয়াছেন অতএব তাঁহার সময়েও ষোলটি দর্শন অক্ষুণ্ণভাবে ছিল। কিন্তু এতগুলি দর্শনের মধ্যে এখন ছয়টি দর্শন জীবিত আছে; অপর দর্শনগুলি, বোধ হয়, তাহাদের অসার গুরুভারে নিমজ্জিত হইয়াছে। জ্ঞানজগতে অসার বস্তু স্থান পায় না; অসারবর্জ্জন জ্ঞানের একটি নিয়ম।

সম্প্রতি পাশ্চাত্য অধ্যাত্মতত্ত্বানুশীল সমিতি (সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটি) মানবচিত্তের যে সকল অদ্ভুত রহস্য উদ্ঘাটন করিতেছেন,তাহাতে যোগদর্শনের উক্তিসমূহ দৃঢ়ীভূত হইতেছে। অধ্যাত্ম-তত্ত্বানুশীলন সমিতির যে সকল সদস্য আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এবং তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক মত, জ্ঞানজগতে বিশেষ আদৃত ; সুতরাং তাঁহারা যে জগৎকে প্রতারণা করিতেছেন, এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। তাঁহাদের ইহাতে কোনও স্বার্থ নাই, বরং এই সকল বিষয় চর্চ্চা করিয়া তাঁহারা নাস্তিক্য বাদীদের নিকট শ্লেষ প্রাপ্ত হইতেছেন। যোগের পরচিত্ত জ্ঞান এবং সূক্ষ্ম ও ব্যবহিত বস্তুর জ্ঞান সম্বন্ধে উক্ত অধ্যাত্ম-সমিতি এত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন যে, তাহা আর আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। "থট্ রিডিং" ও "ক্লেয়ারভয়েন্স" এখন বহুপরিমাণে হিপ্‌নটিজমের মত সাধারণ ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। যোগদর্শনোক্ত প্রণালীগুলি অধ্যয়ন করিলে বোধ হয় যে, উহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে মনুষ্যের অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করা অসম্ভব নহে। দেখা যায় যে, একই শক্তি জীব-শরীরে প্রাণ ও মনরূপে কার্য্য করিতেছে ; মনের সহিত প্রাণের একটা নিকট সম্বন্ধ আছে। যে শক্তির দ্বারা শ্বাস বহে, রক্ত চলে, খাদ্যের পরিপাক হয়, তাহাই প্রাণ। মন ইচ্ছা করিলে শ্বাস বন্ধ করিতে পারে, মন অবসন্ন হইলে পরিপাক হয় না এবং প্রাণের আধার শরীরও অবসন্ন হয় ; অতএব মন ও প্রাণ একই বস্তুর শক্তিভেদ মাত্র। যদি শ্বাস-প্রশ্বাস রোধ করিয়া প্রাণের কার্য্য রোধ করা সম্ভবপর হয় এবং মনকে সম্পূর্ণভাবে বাহ্য এবং অন্তর যে কোন বিষয় হইতে সম্যক্ ভাবে অপসারিত করিয়া শূন্যাকারে পরিণত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে এই উভয় শক্তি একত্র হইয়া অলৌকিক কার্য্য করিতে সক্ষম হয়—এরূপ কল্পনা অনায়াসে করিতে পারা যায়। পতঞ্জলি বলেন, বহু জীবন ধরিয়া চেষ্টা কর, তাহা হইলে মন ও প্রাণ উভয়ই নিরোধ করিতে পারিবে, প্রকৃতির ব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ হইবে এবং এক নূতন অজ্ঞাত জগতের দৃশ্য তোমার সম্মুখীন হইবে। যাহা হউক, জগৎ যেরূপভাবে প্রতিষ্ঠিত ও নিয়ন্ত্রিত, তাহাতে সকলেই যোগী বা মুক্ত পুরুষ হইতে পারে না ; তবে যোগী পুরুষ আমাদের পথ-প্রদর্শক, আমাদের আদর্শ। যোগী ধর্ম্মজগৎ হইতে তত্ত্ব আহরণ করিয়া আমাদের যে উপদেশ দেন, আমরা তাহারই অনুসরণ করি। ব্যাস, কপিল, বুদ্ধ এবং খৃষ্ট প্রভৃতি ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণ যে পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, লোকে তাহাই অদ্যাবধি অনুসরণ করিতেছে। আর এক শ্রেণীর যোগী আমাদিগকে প্রকৃতির অন্তস্তল হইতে অজ্ঞাত সত্য আনয়ন করিয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন, আমরা তাহাই বিশ্বাস করিয়া চলিতেছি। আয়ুর্ব্বিদ্যা বা চিকিৎসা-শাস্ত্র, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, নিরুক্তবিদ্যা বা ভাষাতত্ত্ব এবং ইহাদের অনুগত রসায়ন, ধাতুবিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্র বিভিন্ন যোগীর ধ্যান-প্রসূত। আমরা আজকাল মনে করি যে, বিজ্ঞান কেবল পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ মাত্র ; কিন্তু বাস্তবিক ইহা ভ্রম। নিউটনের মনে পদার্থতত্ত্ব অগ্রে প্রতিভাত হয় ; তিনি প্রথমে আলোক ও বর্ণের স্বরূপ অনুভব করিয়াছিলেন, পরে,

তাহা সাধারণ লোকের জন্য পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করেন। ফ্যারাডেও তাড়িত ও চৌম্বক শক্তি যে একই পদার্থের বিভিন্ন আকার মাত্র, ইহা প্রথমে অনুভব করেন এবং পরে লৌকিক উপায়ের দ্বারা তাহা দেখাইয়া দেন আর এক সম্প্রদায়ের প্রতিভাকে আমরা যোগ-প্রতিভা বলিতে পারি। যাঁহারা সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতে মনুষ্যলোকে নূতন ভাব, নূতন রসের সৃষ্টি করেন,তাঁহারাও যোগী, তাঁহারাও সমাহিতচিত্ত। ব্যাস, বাল্মীকি ত' অবিসম্বাদী যোগী, ঐ সঙ্গে সাহিত্য-রস-রসিক কালিদাসকেও যোগী বলিতে আপত্তি নাই। আবার যে অজ্ঞাত ভাস্কর বুদ্ধদেবের সুঠাম ও সৌম্যমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া কঠোর প্রস্তরে তাহা বিকসিত করিয়া দেন, তিনিও যোগী; যিনি ঋষি-উল্লিখিত রূপময় কৃষ্ণমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনিও যোগী; আবার যিনি অকল্পনীয়, কারুকার্য্য সহিত প্রশান্ত, গম্ভীর, প্রাচীন দেব মন্দির সকল নির্ম্মাণ করিয়া দেন, তিনিও যোগী। ঋষিরা বেদ গান করিতেন, নারদ ভগবানের নাম গান করিতেন; সুতরাং অমৃত-মধুর সঙ্গীত যাঁহারা ধরাধামে আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাও যোগী। তবে আবার বলিতে হয়, যোগীরা আমাদের আদর্শ পুরুষ; আমাদের যাহা অজ্ঞাত, যোগী আমাদের তাহা জানাইয়া দেন; যোগী আমাদের সৎপথ দেখাইয়া দিয়াছেন; যোগী আমাদের বুঝিতে শিখাইয়াছেন; এক কথায়, আমরা যাহা জানি, আমরা যাহা ভাবি, সে সকলই কোন না কোন উন্নত পুরুষের নিকট হইতে প্রাপ্ত। তাই বলিয়া আমাদের নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আমরা এক মুহূর্ত্ত কর্ম্ম ছাড়া থাকিতে পারি না। আমরা যোগী হইতে পারি না বটে, নূতন তত্ত্ব জগতে দেখাইবার সামর্থ্য আমাদের নাই সত্য; কিন্তু মহাপুরুষেরা যে সকল পন্থা দেখাইয়া দিয়াছেন, যে সকল নূতন সামগ্রীর আস্বাদ আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহাকে আমরা সজীব রাখিতে পারি, তাহাকে আরও সাধারণগম্য করিতে পারি। ধর্ম্ম-তত্ত্ব ও বিজ্ঞান প্রভৃতি আমরা যাহা মহাপুরুষদের নিকট হইতে পাইয়াছি, আমাদের অজ্ঞতার জন্য তাহা শুষ্ক ও নির্জ্জীব হইয়া আসিতেছে। ধর্ম্মের ত' কথাই নাই, লোক অভাবে চরক, সুশ্রুত-প্রদত্ত চিকিৎসাশাস্ত্র; যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি-প্রদত্ত জ্যোতির্ব্বিদ্যা ক্রমশঃ মৃতপ্রায় হইতেছে। অতএব ঋষি-প্রদত্ত এই সকল বিদ্যা, জ্ঞান প্রভৃতি সজীব রাখিতে হইলে,আমাদের যথাসাধ্য যোগমার্গ অনুসরণ করিতে হইবে; ইহাতে আমাদের মুক্তি হইবে না বটে, কিন্তু ধর্ম্ম হইবে। সেই উদ্দেশ্যে আমাদের যোগ-উপদেশ অনুসারে আলস্য ত্যাগ করিতে হইবে, শরীর সবল রাখিতে হইবে, মন দৃঢ় রাখিতে হইবে, সর্ব্বভূতে মৈত্রী স্থাপন চেষ্টা করিতে হইবে, কষ্ট সহ্য করিতে হইবে, ইন্দ্রিয়-সংযম করিতে হইবে; ইহার ফলে বৈরাগ্য লাভ হইবে। সর্ব্বশেষে স্থূল বিষয়েই হউক আর সূক্ষ্ম বিষয়েই হউক,অর্থাৎ বিজ্ঞানেই হউক বা ধর্ম্মেই হউক,একটি কোন উচ্চ বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া অসার ভাবনা বিসর্জ্জন দিয়া এক মনে ধ্যান ও চিন্তা অভ্যাস করিতে হইবে। এই সকল করিতে পারিলে, তবে দেশের মঙ্গল হইবে—নচেৎ নহে। শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য।

জগদগুরু—আবাহন।

১

জয় জয় গুরুদেব, কৃপা-অবতার,
প্রেমময় মূর্ত্তি তব. জগতের সার।
অনন্ত অব্যয় দেব, ব্রহ্ম সনাতন,
শিরস্থ সহস্রদল তোমার আসন।
করুণার সিন্ধু তুমি ওহে দয়াময়!
প্রসন্ন বদন সদা, চরণ অভয়।
জগতের গুরুদেব, হৃদয়ের নাথ!
ভক্তিভরে তব পদে করি প্রণিপাত।

২

নাহি জানি কিছু তত্ত্ব তুমি তত্ত্বজ্ঞান,
তুমি তপ, তুমি জপ, তুমি মহাধ্যান।
নাহি আছে কোন জ্ঞান, অগতির গতি!
কৃপা বিতরণ কর জগতের পতি।
স্নেহ পরিপূর্ণ গুরো সর্ব্বগুণাকর,
সত্ত্ব, রজ, তম তুমি, তুমি হরিহর।
রত্নের আকর তুমি ব্রহ্মার নন্দন,
প্রণমি প্রণমি দেব ত্রিতাপ-হরণ।

৩

দেব-দেব আদিদেব দ্বন্দ্বের অতীত,
যুগল শ্রীপদে তব রয়েছি পতিত।
ওহে শান্তিময় গুরো! মহাশান্তিদানে
সুস্থ কর সুখময় সকল সন্তানে।
ওহে ভক্তীশ্বর হর, ভক্তি প্রদানিয়া,
কৃতার্থ করহ সবে জগতে আসিয়া।
তুমি মুক্তি, মুক্তীশ্বর, জ্যোতি-পূর্ণ-জ্যোতি,
প্রণমি শ্রীপদে প্রভু দাও হে ভকতি।

৪

বিভু বিশ্বনাথ তুমি, সর্ব্ব-সাক্ষী-রূপী,
তুমি জল, তুমি স্থল, তুমি সর্ব্বব্যাপী।
তুমি দেব, গুরুদেব, তুমি সদাশিব,
তুমি কাল, মহাকালী, তুমি প্রভো! জীব।

তুমি ক্ষুধা, তুমি তৃষা, তুমি অন্নজল,
তুমি দেব, তুমি দ্বিজ, তুমি মহাবল।
ত্রিগুণ-রহিত দেব, ভাবের অতীত,
শ্রীপদ-পঙ্কজে তব হই হে পতিত।

৫

নিখিল-কারণ তুমি, নিত্য নিরঞ্জন,
নির্ব্বিকার, ভোলানাথ, ভকত-জীবন।
তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি প্রাণসখা!
অজ্ঞান-তিমিরে দেব! রহিয়াছি ঢাকা।
জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় সে তিমির নাশি,
সম্মুখে করুণা করি দাঁড়াও হে আসি।
কোথাহে করুণাময় সর্ব্বগুণাধার,
প্রণিপাত করি আমি চরণে তোমার।

৬

দরশন দাও প্রভু জ্যোতির্ম্ময় বেশে,
বিকচ-কমল-পদ দেখিহে হরষে।
প্রসন্ন মূরতি খানি হেরি প্রাণভ'রে
মাখিব শ্রীপদ-রজ হৃদয়-মাঝারে।
জয় জয় সনাতন ওহে পশুপতি!
প্রাণেশ্বর! থাকে যেন তব পদে মতি।
ওহে কৃষ্ণ বাসুদেব, গুরুদেব মম,
প্রণমি যুগল পদে নাশ' মায়া ভ্রম।

৭

জন্মজরা-নাশকারী, এস শ্রীনিবাস,
চরণ পূজিতে তব আছে শুধু আশ।
এস ত্বরা ইষ্টদেব, মদনের অরি
এস পঞ্চাক্ষর-রূপী, শিবরূপ ধরি।
এস সাধনের ধন, এস মৃত্যুঞ্জয়,
শমন নাশুক, তাহে নাহি মোর ভয়!
এস প্রভু, এস দেব শমন-দমন,
করজোড়ে সদা তব প্রণমি চরণ।

শ্রীরাধা।

মৃত্যুর পরপারে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মরিলেই কি সব ফুরাইল ?

মরিলেই কি সব ফুরাইল ? অথবা মৃত্যুর পরে আর এক জীবন আছে ? ইহা লইয়া মানবের মধ্যে বহুকাল তর্কবিতর্ক ও গবেষণা চলিতেছে। চলিবারই কথা। কারণ, প্রথমতঃ, সকল মানুষই একদিন না একদিন মরিবে ; সুতরাং মরিয়া সে কোন্ দেশে যাইবে, কি অবস্থায় থাকিবে, অথবা এই দেহের সহিত সবই শেষ হইবে,—ইত্যাদি জানিবার জন্য তাহার একটা স্বাভাবিক বাসনা জাগিয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ, মানুষমাত্রই কোন না কোন প্রিয়তম ব্যক্তিকে হারাইয়াছেন। কেহ পিতা কেহবা মাতা, কেহ পত্নী কেহ স্বামী, কেহ পুত্র কেহ কন্যা, কেহ ভ্রাতা কেহ ভগিনী, কেহ বন্ধু কেহ আত্মীয়—প্রায় সকলেই—একটি না একটির বিচ্ছেদ-শোক অনুভব করিয়াছেন। সুতরাং প্রিয়তমগণ পৃথিবী ছাড়িয়া কোথায় ও কি অবস্থায় আছে, আমাদের কথা স্মরণ করে কি না, তাহাদের সহিত আমরা মিলিত হইতে পারিব কি না,—ইত্যাদি জানিবার জন্য আমরা নিয়তই উৎসুক ও উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকি। এই জন্যই পরলোক-প্রসঙ্গ আমাদের এতই চিত্তাকর্ষক, এতই হৃদয়-গ্রাহী।

সে যাহা হউক, মৃত্যুসম্বন্ধে একটি কথা সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে বুঝিয়া রাখিতে হইবে, সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইবে। তাহা এই যে, মৃত্যু একটা অস্বাভাবিক অনৈসর্গিক ব্যাপার নহে, ইহা জীবনের অন্যান্য ঘটনার ন্যায় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সহজ। গীতাতে ভগবান্ ইহা স্পষ্টাক্ষরে ইঙ্গিত করিয়াছেন,—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

অর্থাৎ, জীবের দেহে বাল্য, যৌবন, জরা প্রভৃতি যেরূপ স্বাভাবিক, দেহত্যাগও সেইরূপ স্বাভাবিক। যাহা স্বাভাবিক, তাহা বিধাতারই নিয়ম। যদি আমাদের প্রকৃত বিশ্বাস থাকে যে, ভগবান্ পরম কারুণিক ও মঙ্গলময়, তাহা হইলে তিনি যাহাই করুন, না কেন, আমাদের ভয়ের কি কারণ আছে ? জরাই আসুক আর মৃত্যুই আসুক, পুত্রনাশই হউক বা বিত্তনাশই হউক, দেহ ছিন্নভিন্ন হউক, ধরিত্রী রসাতলে যাক্, চন্দ্রসূর্য্য কক্ষচ্যুত হউক, আমরা টলিব কেন ? মঙ্গলময় হইতে কি কখন অমঙ্গল আসিতে পারে ? স্বভাব-মধুরে তিক্তরস থাকা সম্ভব কি ? যিনি আলোক ও জীবন, তাঁহা হইতে অন্ধকার ও মৃত্যু কিরূপে আসিবে ? অতএব যাহাকে আমরা মৃত্যু বলিয়া শিহরিয়া উঠি, তাহা প্রকৃত মৃত্যু নহে ;

আমাদের মঙ্গলের জন্য, ক্রমোন্নতির নিমিত্ত একটি অতি প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন। "উন্নতি" শব্দের অর্থই পরিবর্ত্তন, এক অবস্থা হইতে উচ্চতর অবস্থাপ্রাপ্তি। পরবর্ত্তী অবস্থা পাইতে হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার বিলোপ অনিবার্য্য। বৃক্ষত্ব পাইতে হইলে বীজত্বের বিলোপ হওয়া চাই, পুষ্পের বিলোপ না হইলে ফল হয় না, ফলের বিলোপ ব্যতীত বীজ পাওয়া যায় না; এই বিলোপকেই সাধারণ ভাষায় "মৃত্যু" বলে। একটি পক্ষিশিশু ক্ষুদ্রপিঞ্জরে বর্দ্ধিত হইতেছে। যখন পিঞ্জরটী ভগ্নপ্রায় হইল, অথবা সে এরূপ বাড়িল যে, ঐ পিঞ্জরে তাহার আর স্থান হয় না, তখন প্রভু দয়া করিয়া তাহাকে এক নূতন পিঞ্জরে স্থাপন করিলেন। পুরাতন পিঞ্জরটি পড়িয়া রহিল ও ক্রমশঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। ইহারই নাম মৃত্যু। অতএব, মৃত্যু একটি উচ্চতর অবস্থালাভের সোপান, একটি নূতন জীবনে প্রবেশ করিবার দ্বার। পাশ্চাত্য জগতে জড়বাদের সঙ্গে সঙ্গে লোকের মনে মৃত্যুসম্বন্ধে যে একটা অন্ধ কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে তাহা একান্ত ভ্রমপূর্ণ ও অমূলক। তাঁহারা ভাবেন, ইহজীবনই সব, মরিলেই সব ফুরাইল, মৃত্যুর পর কিছুই থাকে না, চৈতন্যের চির-অবসান (total annihilation) হয়। এই অবস্থায় তত্ত্ববিদ্যা (Theosophy) একটি জ্ঞান-বর্ত্তিকা হস্তে লইয়া পাশ্চাত্য জগতে উপনীত হইয়াছেন। ইনি মুহ্যমান নরনারীর অন্তরে আশা ও আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়া জলদ-গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিতেছেন, "হে অমৃতের সন্তানগণ! তোমরা কেন মৃত্যুভয়ে কাতর হইতেছ? তোমরা সকলেই অমর। পরলোক মিথ্যা নহে, ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ ধ্রুব সত্য। এবং ইহা অজ্ঞেয় ও দুর্ভেদ্য নহে। যেমন তোমাদের গ্রামের বা নগরের প্রত্যেক রাস্তা ঘাট, প্রত্যেক গলি পল্লী, তোমরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত আছ, ইচ্ছা করিলে, চেষ্টা করিলে, এই পরলোকও তোমরা সেইরূপ তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে পার।"

এই আশ্বাসবাণী শুনিয়া কেহ কেহ ভাবেন, "কথাগুলি বেশ সুন্দর ও সুমিষ্ট বটে; কিন্তু ইহা যে সত্য, তাহা বুঝিব কিরূপে?" পরলোক যে মিথ্যা নহে ইহা বুঝিবার অনেক উপায় আছে। তন্মধ্যে আমরা দু একটির উল্লেখ করিতেছি। প্রথমতঃ আধুনিক মনস্তত্ত্বানুসন্ধান-সমিতির (Psychical Research Societyর) রিপোর্ট বা বিবরণী পাঠ। এই সমিতি ইয়োরোপ ও আমেরিকার প্রায় প্রত্যেক দেশে প্রতিষ্ঠিত এবং সুশিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিচালিত। কোন স্থানে কোন অলৌকিক বা অভিনব ঘটনা ঘটিতেছে, এরূপ শুনিবামাত্র ইঁহারা তথায় উপস্থিত হন এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উহা তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া পরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ করেন। এইরূপ বহু-বর্ষ-ব্যাপী পরীক্ষা দ্বারা তাঁহারা যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তন্মধ্যে একটি এই:—পরলোক হইতেও মানুষ ফিরিয়া আসিতে পারে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বিলাতী কবি সেক্সপীয়র বলিয়াছিলেন, "পরলোক এরূপ একটি স্থান, যাহার সীমা হইতে কোনও পথিক ফিরিয়া আইসে না" ("From whose bourne no traveller returns")। আধুনিক

অনুসন্ধানের ফলে আমরা দেখিতেছি, শত সহস্র "পথিক" সেই রাজ্য হইতে ফিরিয়া তাঁহাদের আত্মীয় বন্ধুর সহিত সাক্ষাদাদি করিয়া যাইতেছেন। Psychical Research Societyর এই সিদ্ধান্তটি পূর্ব্বে অনেকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক শিরোমণি সার উইলিয়াম ক্রুক্‌স্ (Sir William Crookes) ও সার অলিভার লজ (Sir Oliver Lodge) এবং বিলাতের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিতাগ্রগণ্য মিষ্টার ব্যাল্‌ফোর (Mr. Balfour) যে দিন হইতে এই সমিতিতে যোগদান পূর্ব্বক ইহার সিদ্ধান্তগুলি অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিলেন, সেই দিন হইতে ইহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ও আস্থা শত-গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। ক্রুক্‌স্ ও লজের নাম বিজ্ঞান জগতে সুপরিচিত। ক্রুক্‌স্ Royal Societyর সভাপতি ছিলেন এবং থেলিয়ম্ (Thalliam) নামক ধাতু ও রেডিওমেটার প্রভৃতি যন্ত্র আবিষ্কারপূর্ব্বক চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। লজ্ তড়িৎ-বিজ্ঞানে অসাধারণ উন্নতি ও আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত, আধুনিক অনেক শিক্ষিত ও শ্রদ্ধার্হ ব্যক্তি স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করিয়া যে সকল তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তদ্দ্বারাও পরলোকের অস্তিত্ব নিঃসংশয়ে সিদ্ধ হয়। মহামতি ষ্টেড্ (Stead) বা ক্যামিল ফ্লামেরিয়ান্ (Camille Flammarion) অনেকেরই নিকট সুপরিচিত। ষ্টেড্ Real Ghost Stories এবং ফ্লামেরিয়ান Le Inconnee নামক গ্রন্থে যে সকল পরলোক প্রত্যাগত ব্যক্তির ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা অতীত যুগের বা দূরদেশের ঘটনা নহে; বর্ত্তমান যুগে এবং আমাদেরই মধ্যে যাহা ঘটিয়াছে তাহারই ঠিক ইতিবৃত্ত। এখনও অনেকে জীবিত আছেন, যাঁহারা স্বচক্ষে ঐ সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

পরলোকের দ্বিতীয় প্রমাণ আধুনিক প্রেততত্ত্ববিদ্‌গণের দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে। প্রেত-তত্ত্ব বা Spiritualism এর নাম শুনিলেই অনেকে হয়ত "জাল জুয়াচুরি প্রতারণা" বলিয়া গালি বর্ষণ করিতে থাকিবেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকে নিরপেক্ষ অনু-সন্ধানের দ্বারা জানিয়াছেন যে, ইহার মধ্যে সত্য আছে, সর্ব্বৈব মিথ্যা নহে। অবশ্য কোন কোন স্থানে জাল জুয়াচুরি হইয়াছে বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র নহে। আমরা নির্ভয়ে ও সাহসের সহিত বলিতেছি যে, ইহাতে পরলোকের অনেক তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে। যে কেহ ধীরভাবে ও কিছু দীর্ঘকাল প্রেত-তত্ত্ব আলোচনায় রত থাকিবেন, তিনিই আমাদের কথার যথার্থতা উপলব্ধি করিবেন। অনেকেরই হয়ত তাদৃশ সময় ও ধৈর্য্য নাই, অথবা তাঁহারা এত পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নহেন, এরূপ হইতে পারে। কিন্তু অনুসন্ধান না করিয়াই, ভিতরের কথা না জানিয়াই, একটা সম্প্রদায়কে "জুয়াচোর প্রতারক" বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া ভাল কি,—উড়াইয়া দিবার অধিকার কাহারও আছে কি? আর যাঁহারা অনুসন্ধান দ্বারা ভিতরের তথ্য জানিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও "প্রতারিত" বা "নির্ব্বোধ" বলিয়া উপহাস করা কতদূর বিবেচনা ও রুচিসঙ্গত?

পরলোকের বিষয় জানিবার তৃতীয় উপায়—স্বাধীন অনুসন্ধানের দ্বারা প্রত্যক্ষ জান-

লাভ। ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় এবং তত্ত্ববিদ্যা-সমিতির বিশেষ অনুমোদিত। প্রত্যেক মানবে এরূপ শক্তি আছে, যাহা দ্বারা তিনি পরলোক বা সূক্ষ্ম জগৎ দেখিতে সমর্থ; কিন্তু অধিকাংশ মানবেই এই শক্তি প্রচ্ছন্ন বা অস্ফুট অবস্থায় রহিয়াছে। ইহার বিকাশ সাধনা-সাপেক্ষ। সাধনা দ্বারা যখন এই শক্তি পরিস্ফুট হয়, তখন মানব অনায়াসে সূক্ষ্ম জগৎ দর্শন করিতে পারেন। যেমন এক জন্মান্ধ ব্যক্তির চারিদিকে নানাবিধ বস্তু থাকিলেও, তিনি কিছুই দেখিতে পান না, কিন্তু হঠাৎ যদি তাঁহার চক্ষু খুলিয়া যায়, তবে সকল জিনিষই দৃষ্টিগোচর হয়, সেইরূপ আমরা অনেকে এখন পরলোক দেখিতে পাইতেছি না বটে, কিন্তু যেমন সূক্ষ্মদৃষ্টিটি খুলিয়া যায়, অমনিই উহা নয়নগোচর হয়। এই সূক্ষ্মদৃষ্টিকে ইংরাজীতে Clairvoyance বলে এবং আর্য্য ঋষিগণ ইহাকে দিব্যদৃষ্টি বা যোগদৃষ্টি বলিতেন। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। সে যাহা হউক, আধুনিক যুগে তত্ত্ববিদ্যা-সমিতির অনেক সভ্য কঠোর সাধনা ও পরিশ্রম করিয়া উক্ত দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন। সুতরাং পরলোক তাঁহাদের নিকট আর যুক্তি, বিচার বা অনুমানের বিষয় নহে, কলিকাতা সহর বা সিমলা পাহাড়ের ন্যায় প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানই আমরা পাঠকবর্গকে উপহার দিব।

ইহা শুনিয়া অনেকে হয়ত ভাবিবেন আমাদের বড়ই দুঃসাহস বা অসম সাহস। এ পর্য্যন্ত কেহ কখনও যে কথা বলিতে সাহস করে নাই, আমরা তাহাই বলিতেছি। অদ্যাবধি পৃথিবীর কোন ধর্ম্মের বা সম্প্রদায়ের কোন নেতা বা প্রচারক স্বর্গাদি সম্বন্ধে একথা বলেন নাই,—"আমি স্বয়ং ইহা দেখিয়াছি এবং পরীক্ষা দ্বারা সত্য বলিয়া জানিয়াছি।" সকলেই বলিয়াছেন, "আমরা এইরূপ শুনিয়াছি", "শাস্ত্রে এই কথা আছে", "বাইবেলে ইহা উক্ত হইয়াছে", "কোরাণ ইহা বলিতেছেন" ইত্যাদি। কিন্তু আজ আমরা আনন্দ ও সাহস-পূর্ব্বক ইহা বলিতে সক্ষম, "আমরা যাহা বলিব, ইহা পুস্তকের কথা নহে, জনশ্রুতি নহে। আমাদের মধ্যে অনেকেই যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তন্ন তন্ন করিয়া পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা-দ্বারা যাহার সত্যতা নিঃসংশয়ে স্থাপিত হইয়াছে, তাহাই আজ প্রচার করিতেছি। যাঁহার ইচ্ছা, তিনি সাধনাদ্বারা দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া আমাদের কথা সত্য কি মিথ্যা, পরীক্ষা করিতে পারেন। আমরা সকলকেই আহ্বান করিতেছি। আমরা যাহা বলিব, তাহা যদি সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত ও সন্তোষজনক বলিয়া মনে না হয়, উহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন না, করা উচিত নহে। পক্ষান্তরে নিরুদ্যম ও উদাসীন থাকাও উচিত নহে। উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত স্বয়ং অনুসন্ধান কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন, দিব্যদৃষ্টি লাভ করুন, প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করুন। সত্য বল-হীনের লভ্য নহে।" এখন দেখা যাক্, আমরা অনুসন্ধানের দ্বারা কি কি জানিতে পারিয়াছি। ক্রমশঃ

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী।

বেদান্ত-পরিভাষা।

[৫]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মূল। এবঞ্চান্তঃকরণ তদ্ধর্ম্মাদীনাং কেবলসাক্ষিবিষয়ত্বেঽপি তত্তদাকারবৃত্ত্য-ভ্যুপগমেন উক্ত লক্ষণস্য তত্রাপি সত্বান্নাব্যাপ্তিঃ।

ব্যাখ্যা। [বৃত্তি নিজেই নিজের বিষয় বলিয়া পূর্ব্বে সংজ্ঞার অব্যাপ্তিদোষ খণ্ডিত হইয়াছে। এখন দেখান হইতেছে, অন্তঃকরণ ও অন্তঃকরণের ধর্ম্ম (কাম ক্রোধাদি স্থলেও) অব্যাপ্তি দোষ হইবে না]

যদিও অন্তঃকরণ ও তাহার ধর্ম্ম (কাম ক্রোধাদি) কেবল সাক্ষী দ্বারাই অনুভূত হয়, তথাপি (প্রমাতৃকে) অন্তঃকরণ ও তাহার ধর্ম্মের বৃত্তির সহিত জড়িত করিলে অব্যাপ্তি দোষ হইবে না। (অর্থাৎ অন্তঃকরণ ও অন্তঃকরণের ধর্ম্মকে নিজ নিজ বৃত্তির বিষয় মানিয়া লইলে অব্যাপ্তি দোষ হইতে পারে না।)

মূল। ন চ অন্তঃকরণতদ্ধর্ম্মাদীনাং বৃত্তিবিষয়ত্বাভ্যুপগমে কেবলসাক্ষিবিষয়-ত্বাভ্যুপগমবিরোধ ইতি বাচাম্। নহি বৃত্তিং বিনা সাক্ষিবিষয়ত্বং কেবলসাক্ষিবেদ্যত্বং কিন্ত্বিন্দ্রিয়ানুমানাদিপ্রমাণব্যাপারমন্তরেণ সাক্ষিবিষয়ত্বম্।

অতএব অহঙ্কারটীকায়াং আচার্য্যৈঃ অহমাকারান্তঃকরণবৃত্তিরঙ্গীকৃতা। অতএব চ প্রাতিভাসিকরজতস্থলে রজতাকারাবিদ্যাবৃত্তিঃ সাম্প্রদায়িকৈরঙ্গীকৃতা। তথাচ অন্তঃকরণতদ্ধর্ম্মাদিষু কেবলসাক্ষিবেদ্যেষু বৃত্ত্যুপহিতত্বঘটিতলক্ষণস্য সত্বান্না-ব্যাপ্তিঃ।

ব্যাখ্যা। এখন আপত্তি হইতে পারে, অন্তঃকরণ ও তদ্ধর্ম্ম কেবল সাক্ষীর জ্ঞানের বিষয় ইহা বলা হইয়াছে, এখন আবার কি করিয়া বলি যে, অন্তঃকরণ ও তদ্ধর্ম্ম তাহাদের নিজানুরূপ বৃত্তির বিষয়। অন্তঃকরণ ও তদ্ধর্ম্মকে বৃত্তির বিষয় বলিলে (পূর্ব্বে স্বীকৃত) তাহাদের কেবল-সাক্ষিত্ব-বিষয়ের কথার সহিত বিরোধ হইতেছে। উত্তর—এরূপ বলিতে পারেন না। কেবল সাক্ষী কোন কিছুর জ্ঞান করেন, ইহার অর্থ কি ? ইন্দ্রিয় দ্বারা ও অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা যে সকল জ্ঞান হয়, তাহা ব্যতিরিক্ত জ্ঞানকে কেবল সাক্ষিজ্ঞান বলা হয়। [কোনও দ্রব্য দেখিলাম, ইহা চক্ষুরিন্দ্রিয়-সাহায্য-সাপেক্ষ। ধূম হইতে বহ্নির অস্তিত্ব জানিলাম, ইহা অনুমান-সাপেক্ষ। কিন্তু আমার মনে ক্রোধ হইয়াছে, তাহার জ্ঞান ইন্দ্রিয়জন্যও নহে, অনুমানজন্যও নহে। ইহাকে বলি কেবল-সাক্ষিসাপেক্ষ। সাক্ষীই কেবল নিজে অন্য সাহায্য (ইন্দ্রিয় অনুমান প্রভৃতি) ব্যতিরেকে জ্ঞান করিতেছে।] সুতরাং

কেবল সাক্ষীর বিষয় বলিলে এরূপ বুঝায় না যে. বৃত্তিবিনা সাক্ষীর বিষয়ত্বই কেবলসাক্ষি-বেদ্যত্ব। [অর্থাৎ অন্তঃকরণ ও তদ্ধর্ম্ম নিজ নিজ বৃত্তির বিষয় হইলেও তাহারা কেবল সাক্ষীর জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে, কেননা বৃত্তির বিষয় হইলে যে কেবল সাক্ষীর জ্ঞানের বিষয় হইতে পারিবে না, এমন কিছু নিয়ম নাই। কেবল সাক্ষীর জ্ঞানের বিষয়, এ কথার অর্থ এই যে, ইন্দ্রিয় ও অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন কিছুর জ্ঞান হইতেছে]

অতএব অহঙ্কারটীকায় আচার্য্য "অহমাকার" অন্তঃকরণবৃত্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন। সাম্প্রদায়িকেরাও (শুক্তিতে) রজতের ভ্রমজ্ঞানস্থলে রজতাকার একটি অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন।

সুতরাং আমাদের সংজ্ঞা "(প্রমাতৃ) বৃত্তির সহিত মিলিত হইবে" ইহা কেবল সাক্ষী কর্ত্তৃক জ্ঞাত অন্তঃকরণ ও তদ্ধর্ম্মাদিতেও খাটিতেছে। কাজেই অব্যাপ্তি দোস হইতে পারে না।

মূল। তদয়ং নির্গলিতার্থঃ। "স্বাকারবৃত্ত্যুপহিতপ্রমাতৃচৈতন্যসত্তাতিরিক্ত-সত্তাকত্ব-শূণ্যত্বে সতি যোগ্যত্বং বিষয়স্য প্রত্যক্ষত্বম্।"

ব্যাখ্যা। [এতক্ষণ পরে, আপত্তি প্রভৃতি খণ্ডন করিয়া প্রত্যক্ষের সার সংজ্ঞা প্রদত্ত হইতেছে।] অতএব এই সার কথা। প্রত্যক্ষের বিষয়টি নিজের মত একটি বৃত্তি দ্বারা যে প্রমাতৃচৈতন্য উপস্থিত করিবে, তাহার অস্তিত্বের সহিত বিষয়টির অস্তিত্বের কোনও পার্থক্য থাকিবে না এবং বিষয়টি প্রত্যক্ষের যোগ্য হওয়া চাই।

মূল। তত্র সংযোগ-সংযুক্ততাদাত্ম্যাদীনাং সন্নিকর্ষাণাং চৈতন্যাভিব্যঞ্জকবৃত্তি-জননে বিনিয়োগঃ।

ব্যাখ্যা। প্রত্যক্ষে সংযোগ, সংযুক্ত-তাদাত্ম্য প্রভৃতি সন্নিকর্ষগুলির চৈতন্যবোধক বৃত্তির উৎপাদনে প্রযুক্ত হয়।

[বেদান্তমতে সন্নিকর্ষ ছয়টি। সংযোগ, সংযুক্ত-তাদাত্ম্য, সংযুক্তাভিন্নতাদাত্ম্য, তাদাত্ম্য, তাদাত্ম্যাবদভিন্ন ও বিশেষ্যবিশেষণভাব।

ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষকে সংযোগ বলে। বস্তু ও ইন্দ্রিয়ের যোগ ইহার অর্থ। 'ঘটাকার' বৃত্তি উৎপাদন করিতে হইলে সংযোগ-সন্নিকর্ষ প্রযুক্ত হইবে।

সংযুক্ততাদাত্ম্যে ইন্দ্রিয়ের সহিত পদার্থের সংযোগ আছে ও ঘটত্বের সহিত ঘটের তাদাত্ম্য (অভিন্নত্ব) হইতেছে। বেদান্তমতে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর পার্থক্য নাই; "ধর্ম্মধর্ম্মিণোর-ভেদবশাৎ"। "রূপবান্ ঘটঃ" এই বৃত্তি উৎপাদন করিতে হইলে সংযুক্ত-তাদাত্ম্য-সন্নিকর্ষের প্রয়োগ হইবে।

সংযুক্তাভিন্নতাদাত্ম্য। ঘটসংযুক্ত; ঘটরূপ, অভিন্ন; ও রূপত্বের সহিত রূপের একত্বই তাদাত্ম্য। সুতরাং "রূপত্ববিশিষ্টরূপবান্ ঘটঃ" এই বৃত্তি উৎপাদনে সংযুক্তাভিন্নতাদাত্ম্য-সন্নিকর্ষ প্রযুক্ত হয়।

তাদাত্ম্য। শব্দপ্রত্যক্ষে শব্দের সহিত আকাশের (শব্দ-ধর্ম্মবিশিষ্ট) কোনও প্রভেদ নাই।

তাদাত্ম্যাবদভিন্ন। শব্দের সহিত আকাশের অভিন্নত্ব ও শব্দত্বের সহিত শব্দের অভিন্নত্ব। ইহাই তাদাত্ম্যাবদভিন্ন সন্নিকর্ষ।

বিশেষ্যবিশেষণভাব। "ঘটাভাববদ্‌ভূতলম্" এখানে ভূতল বিশেষ্য, ঘটাভাববৎ বিশেষণ। এই ঘটাভাবের জ্ঞান অনুপলব্ধিনামক প্রমাণ হইতে জন্মে।

মূল। সা চ বৃত্তিশ্চতুর্ব্বিধা। সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণমিতি। এবংবিধবৃত্তিভেদেন একমপি অন্তঃকরণং মন ইতি, বুদ্ধিরিতি, অহঙ্কার ইতি, চিত্তমিতি ব্যাখ্যায়তে। তদুক্তং—

মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণমান্তরম্।
সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে॥

ব্যাখ্যা। এই বৃত্তি চারি প্রকার। সংশয়, নিশ্চয়, গর্ব্ব ও স্মরণ। এই বৃত্তিভেদেই অন্তঃকরণ একটি হইলেও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই বিবিধ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে, "মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত, ইহারা অন্তঃকরণ এবং সংশয়, নিশ্চয়, গর্ব্ব ও স্মরণ, যথাক্রমে এই অন্তঃকরণগুলির বিষয়।"

মূল। তচ্চ প্রত্যক্ষং দ্বিবিধম্ সবিকল্পকনির্ব্বিকল্পকভেদাৎ।

ব্যাখ্যা। সেই প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ—সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক।

মূল। তত্র সবিকল্পকং বৈশিষ্ট্যাবগাহি জ্ঞানম্। যথা ঘটমহং জানামীত্যাদি জ্ঞানম্। নির্ব্বিকল্পকন্তু সংসর্গানবগাহি জ্ঞানম্। যথা "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যজন্যং জ্ঞানম্।

ব্যাখ্যা। [বিশেষ্য ও বিশেষণের সম্বন্ধের নাম বৈশিষ্ট্য বা সংসর্গ। যে জ্ঞানে বিশেষ্য-বিশেষণের সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকে, অর্থাৎ যে জ্ঞান বিশেষ্য ও বিশেষণের সম্বন্ধের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা সবিকল্পক ও যাহা এরূপ সম্বন্ধের সহিত সম্পর্কশূন্য, তাহা নির্ব্বিকল্পক।] বৈশিষ্ট্যে (বিশেষ্য ও বিশেষণের সম্বন্ধে) যে জ্ঞান অনুপ্রবিষ্ট, তাহা সবিকল্পক। যথা "আমি ঘট জানিতেছি" (আমার ঘটজ্ঞান হইতেছে)। [এখানে ঘটত্বরূপ বিশেষণ ও ঘটরূপ বিশেষ্যের সম্বন্ধবিষয়ক জ্ঞান হইতেছে।] যেখানে সংসর্গে (বিশেষ্য-বিশেষণ সম্বন্ধে) জ্ঞান অনুপ্রবিষ্ট হয় না, তাহা নির্ব্বিকল্পক। যথা "এই সেই দেবদত্ত", "তুমি সেই-ই" ইত্যাদি বাক্যজন্য জ্ঞান। [এখানে পূর্ব্বকার দেবদত্তের যে বিশেষণগুলি ছিল, তাহার সহিত দেবদত্তের সম্বন্ধ, অথবা বর্ত্তমান দেবদত্তের বিশেষণগুলির সহিত দেবদত্তের সম্বন্ধ প্রভৃতির জ্ঞান হইতেছে না। অতীত দেশকাল প্রভৃতিতে বর্ত্তমানত্ব পূর্ব্বকার দেবদত্তের বিশেষণ, এইরূপ বর্ত্তমান দেশে ও কালে স্থিতি প্রভৃতি ধর্ম্ম বর্ত্তমান দেবদত্তের বিশেষণ। কিন্তু এই বিশেষ্য-বিশেষণের সম্বন্ধকল্পনা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া উভয়ের

অভেদ কল্পনা করা হইয়াছে'। তাই এখানে জ্ঞান নির্ব্বিকল্পক। সবিকল্পক জ্ঞানে কিন্তু বিশেষ্য-বিশেষণসম্বন্ধ বিশেষরূপে বিদ্যমান। ঘট দেখিবার সময় ঘটত্বরূপ ধর্ম্মগুলি এই দ্রব্যে রহিয়াছে, সুতরাং এটি ঘট, ইহা বুঝিতে পারি। কাজেই ঘটত্ব বিশেষণ ও ঘট বিশেষ্যের সম্বন্ধ জানিবার পর তবে ঘটজ্ঞান হয়। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের উদাহরণে দেবদত্তেরও কতকগুলি বিশেষণ সম্ভবপর। যে গুণগুলি দ্বারা দেবদত্ত অন্য পদার্থ হইতে পৃথক্, তাহাই তাহার বিশেষণ। কিন্তু "এই সেই দেবদত্ত" এই বাক্যে, 'সেই দেবদত্ত' ইহার ধর্ম্মের মধ্যে অতীত দেশ ও কাল আছে। কিন্তু 'এই দেবদত্তের' ধর্ম্ম বর্ত্তমান দেশ ও কাল। সুতরাং এই বিভিন্ন বিশেষণ মনে রাখিলে "এই সেই দেবদত্ত" এইরূপ অভেদ-জ্ঞান হয় না। কিন্তু এই বিশেষ্য ও বিশেষণ সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিলে আর এইরূপ জ্ঞান হইবার কোন বাধা থাকে না।]

মূল। নন্বু শাব্দমিদং জ্ঞানং, ন প্রত্যক্ষং, ইন্দ্রিয়াজন্যত্বাৎ, ইতি চেৎ, ন। নহি ইন্দ্রিয়জন্যত্বং প্রত্যক্ষত্বে তন্ত্রং, দূষিতত্বাৎ, কিন্তু যোগ্যবর্ত্তমানবিষয়কত্বে সতি প্রমাণচৈতন্যস্য বিষয়চৈতন্যাভিন্নত্বমিত্যুক্তম্। তথাচ "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" ইতি বাক্যজন্যজ্ঞানস্য সন্নিকৃষ্টবিষয়তয়া বহির্নিঃসৃতান্তঃকরণবৃত্ত্যভ্যুপগমেন দেবদত্তা-বচ্ছিন্নচৈতন্যবৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যয়োরভেদেন "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" ইতি বাক্যজন্য-জ্ঞানস্য প্রত্যক্ষত্বম্।

ব্যাখ্যা। যদি বল "সেই-ই তুমি" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহা শাব্দজ্ঞান, প্রত্যক্ষ নয়, কেননা ঐ জ্ঞান ইন্দ্রিয় দ্বারা উৎপাদিত নহে; তাহার উত্তর এই,—ইন্দ্রিয় দ্বারা উৎপাদিত না হইলেও প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে পারে ইন্দ্রিয় দ্বারা উৎপন্ন হইলেই সেই জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইবে, প্রত্যক্ষের এই সংজ্ঞা ভ্রমাত্মক; পূর্ব্বেই তাহা দেখাইয়াছি। প্রত্যক্ষে প্রমাণ-চৈতন্য ও বিষয়চৈতন্য অভিন্ন হইবে ও বিষয়টি বর্ত্তমান ও প্রত্যক্ষের যোগ্য হওয়া চাই—ইহাই প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা। "এই সেই দেবদত্ত" এই প্রত্যক্ষজ্ঞান নিম্নলিখিত প্রকারে হয়। "এই সেই দেবদত্ত" এই বাক্য উচ্চারিত হইলে দেবদত্তরূপ বিষয় সন্নিকটে আছে, অন্তঃকরণ বাহিরে নির্গত হইয়া (দেবদত্তরূপ) বৃত্তি ধারণ করিল, পরে দেবদত্ত-বিশিষ্ট-চৈতন্য ও তদ্বিষয়ক বৃত্তিবিশিষ্ট-চৈতন্য এক হইয়া গেলে, "এই সেই দেবদত্ত"—এই বাক্যজন্য জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয়।

মূল। এবং 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদিবাক্যজন্যজ্ঞানস্যাপি, তত্র প্রমাতুরেব বিষয়তয়া তদুভয়াভেদস্য সত্ত্বাৎ।

ব্যাখ্যা। এইরূপ "সেই-ই তুমি" ইত্যাদি বাক্যজন্য জ্ঞানও প্রত্যক্ষ, সেখানে প্রমাতৃই বিষয় ও উভয়রূপ দুইটি চৈতন্য এক হইয়া থাকে।

মূল। নন্বু বাক্যজন্যজ্ঞানস্য পদার্থসংসর্গাবগাহিতয়া কথং নির্ব্বিকল্পকত্বম্?

উচ্যতে। বাক্যজন্যজ্ঞানবিষয়ত্বে হি ন পদার্থসংসর্গত্বং তন্ত্রং, অনভিমতসংসর্গস্যাপি বাক্যজন্যজ্ঞানবিষয়তাপত্তেঃ, কিন্তু তাৎপর্য্যবিষয়ত্বম্।

প্রকৃতে চ "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যুপক্রম্য "তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" ইত্যুপসংহারেণ বিশুদ্ধে ব্রহ্মণি বেদান্তানাং তাৎপর্য্যমবসিতম্ ইতি কথং তাৎপর্য্যাবিষয়ং সংসর্গমববোধয়েৎ।

ব্যাখ্যা। আচ্ছা, বাক্যজন্য জ্ঞান নির্ব্বিকল্পক কিরূপে হইতে পারে? সম্বন্ধে অপ্রবিষ্ট জ্ঞানই নির্ব্বিকল্পক। বাক্যজন্য জ্ঞানে ত প্রত্যেক পদের অর্থের সহিত পরস্পর সম্বন্ধ রহিয়াছে। ["গামানয়", "গাভী আনয়ন কর"— এই বাক্যে নিম্নলিখিতরূপে জ্ঞান হয় (আপত্তিকারীর মতেই এইরূপ জ্ঞান হওয়ার কথা বলা হইতেছে।) গোপদার্থ যাহার কর্ম্ম, এমন যে আনয়নরূপ ক্রিয়া, সেই ক্রিয়ার আবার অনুকূল যে কার্য্য, সেই কার্য্যকে আশ্রয় করিয়া দেবদত্ত প্রভৃতি কর্ত্তা, এইরূপ জ্ঞান হইবে। কাজেই গো, আনয়নক্রিয়া প্রভৃতির সম্বন্ধও সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগিয়া উঠিবে। শাব্দবোধটি এইরূপ হইবে "গোকর্ম্মকং যদানয়নং তাদৃশা-নয়নানুকূলা বর্ত্তমানকালিকা যা কৃতিঃ তাদৃশকৃত্যাশ্রয়ো ভব।" কাজেই আপত্তি-কারী বলিতেছেন, পূর্ব্বোক্ত উদাহরণের ন্যায় "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যজন্য জ্ঞানেও সম্বন্ধ জ্ঞান হয়, সুতরাং সে জ্ঞান নির্ব্বিকল্পক নহে।]

উত্তরে বলিতেছি। বাক্যজন্য জ্ঞান হইতে হইলে প্রত্যেক পদের অর্থের সহিত পরস্পর সম্বন্ধ থাকা চাই, এমন কিছু কথা নাই। ববং ঐরূপ সম্বন্ধ জানিলে, যে সম্বন্ধ আমাদের অভিপ্রেত নয়, তাহারও জ্ঞান হইতে পারে। [একজন ভোজন করিতে বসিয়া বলিল, "সৈন্ধব আন"। এখানে সৈন্ধব অর্থে লবণই বুঝায়। সৈন্ধব শব্দের অপর অর্থ 'অশ্ব' বুঝিয়া কেহ ঘোটক আনিয়া উপস্থিত করে না। কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যেক পদের সম্বন্ধ জানিতে হইলে, ঘোটকই বা জ্ঞান না হইবে কেন?] কাজেই বাক্যজন্য জ্ঞানে তাৎপর্য্যই প্রধান, ওরূপ সম্বন্ধ কিছু নয়।

[ছান্দোগ্য উপনিষদে উদ্দালক নিজ পুত্র শ্বেতকেতুকে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইয়াছিলেন।] "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" [হে প্রিয়দর্শন, এই (পরিদৃশ্যমান্ জগৎ) পূর্ব্ব হইতে সদ্রূপেই বর্ত্তমান ছিল] এই বলিয়া উদ্দালক আরম্ভ করিয়াছেন। তার পর "তৎসত্যং স আত্মা" (সেই সত্যস্বরূপ আত্মা), "তত্ত্বমসি" (সেই-ই তুমি) এইরূপ বাক্যদ্বারা উপসংহার করিয়াছেন। (সকলই ব্রহ্ম, ইহাই উদ্দালকের প্রতিপাদ্য) এই বাক্যের তাৎপর্য্য বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সর্ব্বময় ব্রহ্ম। এই বাক্যে সেই জ্ঞানই হইবে। যাহা তাৎপর্য্য নয়, এমন সমস্ত সম্বন্ধ কেন বুঝাইতে যাইবে?

ক্রমশঃ

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

অপূর্ব্ব শ্রীফল।

একটী অতি বিপুল বিমল বিল্বফলের কথা শুনাইতে ইচ্ছা করি। ঐ ফল বহু সহস্র যোজন ব্যাপিয়া বিরাজিত; সুতরাং তাহার বিপুলতা কত, সহজেই তাহা অনুমেয়। কত যুগযুগান্তর অতীত হইয়াছে, ভবিষ্যতে আরও কত হইবে; তথাচ বিল্বফল শীর্ণ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবেও না। উহার রস অনপায়ী এবং স্বাদ সুধা-সম সুমধুর। উহা অনাদিসিদ্ধ হইলেও পুরাতন নহে; ঐ ফল নিত্যই নূতন এবং নিত্যই চন্দ্রকলার ন্যায় সুন্দর ও কমনীয়তায় সমুজ্জ্বল। উহা ভুবন-ব্যূহের মধ্যভাগে বিরাজিত এবং মন্দরাচলবৎ সুদৃঢ়। মহাপ্রলয়ের বাত্যাবেগেও ঐ ফল বিচলিত হয় না এবং উহার বিশালতা এত যে কত কোটি কোটী অযুত অযুত যোজন অতিক্রম করিলেও তাহার ইয়ত্তা করা অসাধ্য। ঐ বিল্বফলই জগৎ স্থিতির আদি মূল। এই মূল কোথায় কিরূপে অবস্থিত, তাহা অবধারণ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। এ বিশাল ব্রহ্মাণ্ড-পরম্পরা ঐ বিল্বফলেরই উপরে স্থিত। যদি নিকটে গিয়া দেখা যায়, তবে বোধ হইবে, যেন পর্ব্বতের উপরিগত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সর্ষপ সকল বিরাজমান। ঐ ফলের রসধারা বড় মধুর - বড়ই চমৎকার। এমন কোন ষড়িন্দ্রিয়-ভোগ্য রস কোথাও দেখিনা, যাহা উহার রসধারাকে অতিক্রম করিতে পারে।

শুনিয়াছি এ ফল নিত্য নিত্য এইরূপই সুবসময়; অথচ ইহা পাকিয়াও কখন পড়ে না - বা কখন জীর্ণ হয় না। কি ব্রহ্মা, কি বিষ্ণু, কি রুদ্র, কি ইন্দ্র, কি অন্য কোন চিরজীবী জীব, এপর্য্যন্ত কেহই ঐ বিল্বফলের আদি, অন্ত বা মধ্য, কোন কিছুরই প্রকৃত সংবাদ জানিতে পারেন নাই। এই যে বিশালকায় ফলের কথা কহিলাম, উহার শাখা, মূল, স্তম্ভ, অঙ্কুর, বৃক্ষ বা কুসুম কিছুই দেখা যায় না। ঐ ফল দেখিতে যেন একটী ঘনাকার পিণ্ড; উহা অতি বিতত ও অতি স্থূল। ইহার উৎপত্তি বা পরিণাম কখনও দৃষ্ট হয় না। ঐ মহাকৃতি ফল সমস্ত ফলের সার। উহার মজ্জা নাই, অস্থি নাই, উহা নির্ব্বিকার ও নিরঞ্জন। শিলাখণ্ডের অভ্যন্তর ভাগের ন্যায় ঐ ফল নীরন্ধ্র। ইহার রস সুধাকরের সুধা অপেক্ষাও সুস্বাদু; পরন্তু তাহা সম্বিন্মাত্রেরই আস্বাদ্য। এই রসই সকল প্রকার সুখের আকর এবং শীতলতা ও আলোকের নিদান। দেখিতে এ ফল শৈল বা পিণ্ডীভূত অমৃত সদৃশ এবং ইহাই আত্মার কর্ম্মফল-স্থিতির মজ্জা বা সার। হৈরণ্যগর্ভ আনন্দ ফল অপেক্ষাও যাহা পরমোত্তম, তাহার যাহা অব্যক্ত মজ্জা, ঐ শ্রীফলেরও সেই একই মজ্জা এবং এই মজ্জা আত্মচমৎকৃতি বলিয়া আখ্যাত। ত্রিবিধ-পরিচ্ছেদ-পরিহীন স্বভাব কর্তৃকই উহা রক্ষিত এবং উহাই অদ্বৈত শ্রীফলমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজিত। আত্মচমৎকৃতির অধ্যাসবশেই ভেদবুদ্ধি জন্মিয়া

থাকে। পরম প্রয়োজনীয় বলিয়াই ঐ আত্মচমৎকৃতি ফলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ ভেদ-বুদ্ধি-জনিত অন্যত্ব বা দ্বিতীয়ত্বের এই যাহা পরম প্রয়োজনীয় চিন্ময় রস-মজ্জাকৃতি তাত্ত্বিক সংস্থান-বৈচিত্র্য, ইহারই দ্বারা এই আত্মচমৎকৃতি গঠিত। এই আত্মচমৎকৃতি অণু হইতেও অণীয়সী, মহান্ হইতেও মহীয়সী। ইহা সনাতনী; সুতরাং ইহাতে বার্দ্ধক্যাদি বিকার কিছুই নাই। এই আত্মচমৎকৃতি সর্ব্বদাই নিতান্ত বালিকার ন্যায় বিরাজিত। 'এই আমি স্ত্রী, এই আমি ক্লীব' এবম্বিধ ভেদের প্রতি ঐ আত্মচমৎকৃতিকেই কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। যাহা অবিদ্যামল, তাহাই 'ইহা অন্য, উহা ভিন্ন,' এবম্বিধ ভেদ-প্রতীতির কারণ। বাস্তব পক্ষে দেখিতে গেলে, উহা অকিঞ্চিৎ বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। যিনি স্বপ্রকাশ চিন্ময় মূর্ত্তি, তাঁহার নিকট উহা আকাশ-কুসুমবৎ অসম্ভব বলিয়াই অবধারিত। অথচ ঐ সকল দ্বৈত-ভেদ-প্রতীতি-রূপ অবিদ্যা-মালিন্যের প্রতি ঐ আত্মচমৎকৃতিই হেতু বলিয়া উল্লিখিত। এখন বুঝিতে হইবে, পূর্ব্বোক্ত বিল্বফলের স্বরূপ যখন ঐ আত্ম-চমৎকৃতিই, তখন উহা অদ্বৈত সৎ বলিয়াই নিশ্চিত। ঐ যে আত্মচমৎকৃতি শক্তি, উহাই অহঙ্কার আবির্ভাবের অব্যবহিত পরক্ষণেই আকাশ, আকাশ গুণ শব্দ এবং এই ত্রিভুবনের ব্যষ্টি সমষ্টি পরমাণু-বিশেষে অহঙ্কার বিস্তারপূর্ব্বক আভিমানিক আবরণ প্রাপ্ত হইয়া বিরাজমানা। ঐ শ্রীফল-মজ্জা আত্মচমৎকৃতির কৃতিত্ব এই খানেই যে, উহা স্বীয় স্বরূপের পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন না করিয়া ক্রমশঃ সম্বিৎ-শক্তি রূপেই বিরাজ করিতে থাকে। ঐ মজ্জার সেই যে সম্বিৎ শক্তি, তাহাই তরলাকারে নিজ নির্ব্বিকারভাবে জাগতিক দৃষ্টি প্রসারিত করে। ঐ যে অনন্ত বিস্তীর্ণ নভোমণ্ডল, এই যাহা কালকলা, এই যাহা নিয়তি নামে নির্দ্দিষ্ট, এই যে স্পন্দরূপিণী ক্রিয়া, এই যে বিবিধ সঙ্কল্প বিস্তার, এই যে আশা, এই যে ভ্রান্তি, এই যে রাগ-দ্বেষের ব্যবস্থা, এই যাহা হেয় ও উপাদেয়, এই যে 'তুমিত্ব', 'আমিত্ব' ও তত্ত্ব এবং এই যে ব্রহ্মাণ্ড-পরম্পরা, আর যে কিছু ঊর্দ্ধ, অধঃ, পূর্ব্ব, পশ্চাৎ, সম্মুখ, পার্শ্ব, দূর, নিকট, ভূত, ভাবি, ও বর্ত্তমান, এতৎ সমস্তই সেই সম্বিত-শক্তি হইতে বিস্তারিত এবং ঐ ঐ রূপ যাহা কিছু আছে, সকলই তাহাতে প্রতিষ্ঠিত। সেই বিল্বফলের মজ্জা মধ্যেই সমস্তের অস্তিত্ব এবং সেই মজ্জাই ঐ ঐ পদার্থরূপে বিরাজিত।

শ্রীক্ষেত্রচন্দ্র বসু মল্লিক।

পঞ্চকোষ ও আত্মা।

বৈশাখের ব্রহ্মবিদ্যায় পঞ্চকোষের অবস্থান বর্ণনকালে বলা হইয়াছে যে, একের অভ্যন্তরে অপরটী, তাহার অভ্যন্তরে তদপেক্ষা সূক্ষ্মটী বর্ত্তমান,—সূক্ষ্মতা অনুসারে অন্নময় হইতে আনন্দময় পর্য্যন্ত কোষগুলি পরে পরে স্থাপিত। প্রাচীরাদিতে যেরূপ স্তরে স্তরে ইষ্টকাদি স্থাপিত থাকে, সেরূপে নহে—কোষ সমূহ ওতপ্রোতভাবে সন্নিবিষ্ট। আর একটি বিষয় এখানে বলা আবশ্যক যে, প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মাণ্ডের এবং মানবের সাতটি কোষ আছে— অতি সূক্ষ্মতম দুইটীর সাধারণস্থলে উল্লেখ হয় না,—তাহা আমাদের ধারণায় আসে না,— প্রথমটিকে 'আদিতত্ত্ব' বা 'মহত্তত্ত্ব' এবং দ্বিতীয়টীকে 'অনুপাদক' বা 'অহঙ্কারতত্ত্ব' কহে। মুণ্ডক উপনিষদে দেখিতে পাই,—

সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ সপ্তার্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ।
সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা গুহাশয়াং নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥—২।১।৮।

সপ্ত ইন্দ্রিয়, সপ্ত দীপ্তি (অর্থাৎ বিষয় প্রকাশরূপ ইন্দ্রিয় কার্য্য), সপ্ত সমিধ (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়), সপ্ত হোম (অর্থাৎ বিষয় জ্ঞান), আর এই সপ্ত লোক, যাহাতে হৃদয়-নিহিত এবং (প্রতি প্রাণীতে) সপ্ত সপ্ত ক্রমে স্থাপিত প্রাণ সকল কার্য্য করে।

উক্ত উপনিষদে অপর এক স্থানে "হিরণ্ময়" নামে অপর একটী কোষেরও উল্লেখ দেখা যায়; "হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।" 'জ্যোতিষ্ময় শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে নির্ম্মল অখণ্ড ব্রহ্ম প্রকাশিত আছেন।'

সপ্তম কোষের উল্লেখ কোথাও দেখিতে পাই নাই। কিন্তু সাপ্তকোষিক ব্রহ্মচৈতন্য আমাদের স্বকপোল-কল্পিত নহে, মনু স্মৃতি প্রভৃতিতেও উহা ভাবান্তরে ব্যক্ত আছে। কঠোপনিষদের তৃতীয় বল্লীর ১৩শ শ্লোকে এবং ষষ্ঠ বল্লীর ৭ম ও ৮ম শ্লোক হইতেও সপ্তভাগ গ্রহণ করিতে পারা যায়।

যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥ ১৩ ॥ ৩য় বল্লী, কঠ।

(১) অন্নময় ও (২) প্রাণময় কোষের অভ্যন্তরে ইন্দ্রিয়াদি সূক্ষ্ম করণরূপ সূক্ষ্ম শরীর— এস্থলে বাগিন্দ্রিয়দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়কেই বুঝাইতেছে। (৩) ইন্দ্রিয়গণকে মনে (মনোময় কোষে) সংযত করিবে, (৪) মনকে জ্ঞানরূপী আত্মাতে (বুদ্ধিতে), (৫) সেই বুদ্ধিকে আবার হিরণ্যগর্ভের উপাধি স্বরূপ (৬) মহত্তত্ত্বে এবং তাহাকেও আবার (৭) শান্ত (নিষ্ক্রিয়) আত্মাতে নিয়োজিত করিবে। এইরূপে অন্নময় শরীর হইতে মূল প্রকৃতি পর্য্যন্ত সাতটী বিভাগ ধরিতে পারা যায়।

এক্ষণে দেখা যাউক, কোষ-পঞ্চ-বিচারের জন্য যে যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের

দ্বারা কি প্রতিপাদিত হইতেছে। সেইগুলির আলোচনায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কোষরূপ উপাধি-বিশিষ্ট ব্রহ্মচৈতন্যই জীব। যতক্ষণ কোন কোষে তাঁহার অভিমান থাকে, ততক্ষণই তিনি জীবরূপে আখ্যাত, এবং ঐ সকল উপাধিকে যখন তিনি আপনা হইতে পৃথক বলিয়া অনুভব করিতে পারেন, তখনই তিনি ব্রহ্ম। ঐ উপাধিগুলির অতিরিক্ত যে নিত্য চৈতন্য বা নিত্য জ্ঞানানন্দ আত্মা, তিনিই পরব্রহ্ম। উক্ত নিত্যচৈতন্যের ছায়া (আভাস) প্রাপ্ত হইয়া বিজ্ঞানময় কোষ বা বিজ্ঞানময় আত্মা কর্ত্তা স্বরূপে, এবং সেই নিত্য জ্ঞানানন্দের প্রতিবিম্ব প্রাপ্ত হইয়া আনন্দময় কোষ বা আনন্দময়কোষাভিমানী আত্মা ভোক্তাস্বরূপে বিরাজমান। ইহার সমর্থনের জন্য ঐ পঞ্চকোষ-বিবেক হইতে আর একটী শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি; "কোষোপাধিবিবক্ষায়াং যাতি ব্রহ্মৈব জীবতাম্।"—৪১। পঞ্চকোষরূপ উপাধির বিবক্ষাকালে, অর্থাৎ যখন ব্রহ্মের কোষ-পঞ্চে অভিমান থাকে, তখন তিনি জীবভাব পাইয়া থাকেন। উপাধির অভাবে নিরুপাধি অবস্থায় তিনি স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচৈতন্য। 'ভূতবিবেক' মধ্যে পঞ্চভূত বিচারকালে ঐরূপে মায়াকল্পিত 'আকাশ, বায়ু, তেজ, অপ্ ও ক্ষিতি'রূপ অসদ্বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের আশ্রয়স্বরূপ সদ্বস্তুকে পৃথকরূপে গ্রহণ করিলে, অবশিষ্ট সমুদায় মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়,—মায়ার বিকার-সমূহে সদ্ব্রহ্মের অনুপ্রবেশ জন্য যাহা সদ্রূপে প্রতিভাত হইয়াছিল, সেই সদ্বস্তু বিবিধ মূর্ত্তামূর্ত্ত হইতে অন্তর্হিত হইলে, তাহারা পূর্ব্বে যে 'অসৎ' ছিল, সেই অসৎ হইয়া যায়। এক বস্তুকে অন্য প্রকারে কল্পনা করা মায়ার স্বভাব। পরব্রহ্মের মায়াশক্তি সদ্বস্তুস্বরূপ পরব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া তাঁহাতেই বিবিধপ্রকার বিকার অর্থাৎ কার্য্য কল্পনা করে, যেমন ভিত্তিকে আশ্রয় করিয়া তাহাতে নানা বর্ণের চিত্রকার্য্য হইয়া থাকে।

> সত্তত্ত্বমাশ্রিতা শক্তিঃ কল্পয়েৎ সতি বিক্রিয়াঃ।
> বর্ণা ভিত্তিগতা ভিত্তৌ চিত্রং নানাবিধং যথা॥ ৫৩॥ ভূতবিবেকঃ, পঞ্চদশী।

আরও একটু মায়াসম্বন্ধে বিশেষরূপে জানা উচিত;—

> পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।
> ইত্যেকদেশবৃত্তিত্বং মায়ায়া বদতি শ্রুতিঃ॥ ৫৫॥ — ঐ — ঐ

'পরমাত্মার এক পাদে মাত্র চরাচর বিশ্ব অবস্থিত এবং তিন পাদ অমৃতস্বরূপ,—নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, স্বপ্রকাশ। এই প্রকারে পরব্রহ্মে মায়ার একদেশবৃত্তিত্ব শ্রুতি উপদেশ দিয়াছেন।' গীতাতেও ভগবান্ স্বয়ং কহিয়াছেন,—"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ,"— আমার শরীরের একাংশ দ্বারা সমুদায় জগৎকে ব্যাপিয়া আমি অবস্থিতি করিতেছি।

পূর্ব্বোক্ত মায়াশক্তি ব্রহ্মের সর্ব্বাবয়বব্যাপিনী নহে। শারীরক সূত্রেও সেই সম্বন্ধে ৪র্থ অধ্যায়, ৪র্থ পাদ, ১৯ সূত্রে বলিয়াছেন,—"বিকারাবর্ত্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ"। শাঙ্কর-ভাষ্যে এই সূত্রের এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে,—পরমেশ্বর যে কেবল বিকারভূত সূর্য্যমণ্ডলাদির অধিষ্ঠাতৃরূপে বর্ত্তমান আছেন, তাহা নহে, তিনি বিকারাবর্ত্তী, অর্থাৎ,

নিত্যমুক্ত বিকারাতীতরূপেও বিরাজ করিতেছেন; শ্রুতিতেও তাঁহার এইরূপ দ্বিরূপে স্থিতি বর্ণিত আছে, যথা,—

"তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ", "পাদোঽস্য সর্ব্বাভূতানি", "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইত্যাদি। 'এই সমস্তই পরমেশ্বরের বিভূতি; তিনি এই সকল অতিক্রম করিয়াও আছেন, ইহাদের হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ; এই সমুদায় ভূত তাহার একপাদ মাত্র, অবশিষ্ট তিন পাদ অমৃত, স্বর্গে অবস্থিত।'

এস্থলে বলা আবশ্যক যে, পঞ্চভূত বিচারকালে মায়া বা প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ পঞ্চীকৃত কঠিনতম ক্ষিতিতত্ত্ব পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু পঞ্চকোষের বিচার-ক্রম তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত,—স্থূল হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্মতম পর্য্যন্ত যাইয়া, তৎপরে অনাত্মবোধে কোষগুলিকে ত্যাগ করত তদতিরিক্ত অখণ্ড ব্রহ্মচৈতন্যে উপনীত হইয়াছে। এইরূপ বিপরীত ক্রমের বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। সৃষ্টিতত্ত্বের দুইটা প্রণালী,—প্রথমটীকে অবনয়ন ও দ্বিতীয়টীকে উন্নয়ন প্রণালী কহে। আর্য্য ঋষিগণ এই দুই প্রণালী অবলম্বনে ভূত-বিবেক দ্বারা সূক্ষ্ম হইতে স্থূল ও পঞ্চকোষবিবেক দ্বারা স্থূল হইতে সূক্ষ্ম পদার্থের মীমাংসা-দ্বারা সৃষ্টির গূঢ় রহস্য বিশদরূপে বুঝাইয়া গিয়াছেন। বিবিধ তত্ত্বের উৎপত্তির ক্রম নিবিষ্টচিত্তে দেখিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন, কি অনির্ব্বচনীয় কৌশলে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব রচনা হইয়াছে, কিরূপে সমস্ত পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ভগবান্ সমগ্র জগৎ ধারণ করিতেছেন এবং কিরূপেই বা সমস্ত নামরূপ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি বহু হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥ ৫॥ মনুসংহিতা।

পরিদৃশ্যমান এই বিশ্ব-সংসার এককালে গাঢ় তমসাচ্ছন্ন ছিল; তখনকার অবস্থা প্রত্যক্ষের গোচরীভূত নহে, কোনও লক্ষণ দ্বারা অনুমেয় নহে; তখন ইহা তর্ক ও জ্ঞানের অতীত হইয়া সর্ব্বতোভাবে যেন প্রগাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল। ইহাকে অব্যাকৃত অবস্থা কহে।

ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তোব্যঞ্জয়ন্নিদম্।
মহাভূতাদি বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীৎ তমোনুদঃ॥ ৬॥ ঐ

পরে স্বয়ম্ভূ অব্যক্ত ভগবান্ মহাভূতাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে প্রবৃত্ত-বীর্য্য হইয়া, এই বিশ্ব-সংসারকে ক্রম প্রকটিত করিয়া, সেই তমোভূত অবস্থার ধ্বংসক-রূপে প্রকাশিত হন। কিরূপে ভগবান্ ব্রহ্মারূপে প্রকাশিত হইয়া জগৎ রচনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে। মহাপ্রলয়কালে এই বিশ্বের বীজ সূক্ষ্মভাবে গাঢ় তমোভূত অব্যক্তের মধ্যেই নিহিত ছিল। নাম রূপ তখন কিছুই ছিল না—তখন কেবল এক সৎমাত্র ছিলেন।

সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।—ছান্দোগ্য ৬।২।১।

'হে সৌম্য ! সৃষ্টির পূর্ব্বে অর্থাৎ মহাপ্রলয়কালে এক সৎস্বরূপী অদ্বিতীয় ব্রহ্মই ছিলেন।'

তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়।—ঐ ৬।২।৩।

'ঐ ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব এবং প্রকৃষ্টরূপে জায়মান হইব'। ভগবানের ইচ্ছা হইতে কিরূপে এই বিশ্ব প্রকটিত হইল, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের সৃষ্টি-প্রকরণ মধ্যে যেরূপে বর্ণিত আছে, তাহা দেখিলে আমরা কথঞ্চিৎ বিশদরূপে বুঝিতে পারিব।

সৃষ্টি দুই প্রকার, (১) কারণ সৃষ্টি বা তত্ত্বসৃষ্টি এবং (২) কার্য্যসৃষ্টি বা জীবসৃষ্টি। পুরুষের (জীবের) ভোগাপবর্গসাধনার্থ প্রথমে কারণ-সৃষ্টির প্রয়োজন; সুতরাং তত্ত্বসৃষ্টি কি প্রকারে হইয়াছিল, তাহাই এক্ষণে দেখা যাউক।

ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনা বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মানানামত্যুপলক্ষণঃ ॥ ২৩ ॥
সবা এষ তদা দ্রষ্টা নাপশ্যদ্দৃশ্যমেকরাট্।
মেনেঽসন্তমিবাত্মানং সুপ্তশক্তিরসুপ্তদৃক্ ॥ ২৪ ॥
সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা।
মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ ॥ ২৫ ॥
কালবৃত্ত্যাত্মমায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্ ॥ ২৬ ॥
ততোঽভবন্ মহত্তত্ত্ব মব্যক্তাৎ কালচোদিতাৎ।
বিজ্ঞানাত্মাত্মদেহস্থং বিশ্বং ব্যঞ্জং স্তমোনুদঃ ॥" ২৭ ॥ ভাগবত, ৩য় স্কন্ধ, ৫ অঃ।

'জীবগণের আত্মাস্বরূপ ভগবান্ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র ছিলেন—সৃষ্টিকালে সেই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা নানা বুদ্ধিতে উপলক্ষিত হন। তাঁহার মায়াশক্তি তখন তাঁহাতেই লীনা ছিল। সেই সময় অন্য দ্রষ্টা বা দৃশ্য কিছুই ছিল না—তখন তিনি ভিন্ন অপর কিছুই প্রকাশিত না থাকায়, তিনি স্বয়ং দ্রষ্টা হইয়াও অন্য দৃশ্য কিছুই দেখিতে পান নাই—সুতরাং দৃশ্যের অভাবে দ্রষ্টৃত্বাভাব প্রযুক্ত, আপনিও যেন নাই, এইরূপ মনে করিয়াছিলেন (তথাপি চিচ্ছক্তি জাগরিত থাকায় একেবারে আপনাকে 'অসন্তমিব' নাই বলিয়া মনে করেন নাই)। তখন তাঁহার দৃক্শক্তিরূপ (বহির্দৃষ্টি) চৈতন্য প্রকট হইয়াছিল। দ্রষ্টাস্বরূপ ভগবানের কার্য্য-কারণরূপা শক্তির নাম মায়া। সেই মায়াদ্বারাই ভগবান্ এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব রচনা করিয়াছেন। চিচ্ছক্তিযুক্ত সেই পরমাত্মা, কাল-শক্তিবশতঃ মায়ার গুণ ক্ষুভিত হওয়াতে, পুরুষরূপী স্বীয় অংশ দ্বারা সেই মায়াতে আত্মবীর্য্য অর্থাৎ চিদাভাস আধান করিলেন। তদনন্তর কালপ্রেরিত অব্যক্ত অর্থাৎ মায়া হইতে মহত্তত্ত্ব উদ্ভূত হইল। বীজগত অঙ্কুর যেমন বৃক্ষ প্রকাশ করে, তদ্রূপ সত্ত্বপ্রধান বিজ্ঞানাত্মা, সেই মহত্তত্ত্ব, আত্মদেহস্থ বিশ্ব প্রকাশ করিয়া তমঃ-সংহর্ত্তারূপে বিরাজমান হইল।' উক্ত স্কন্ধে ২৬ অধ্যায় ২০ শ্লোকেও ঐরূপ বর্ণনা আছে,—

বিশ্বমাত্মগতং ব্যঞ্জন্ কূটস্থো জগদঙ্কুরঃ।
স্বতেজসাপিবৎ তীব্রমাত্মপ্রস্বাপনং তমঃ ॥

পূর্ব্ব প্রলয়সময়ে বিবিধতত্ত্ব তাহাদের কারণে বিলোমক্রমে লীন হইলে, ক্ষিত্যাদি অহংতত্ত্ব পর্য্যন্ত মহত্তত্ত্বে বিলীন হইয়াছিল এবং পরিশেষে মহত্তত্ত্বও সংস্কারবিশিষ্ট হইয়া মূল প্রকৃতিতে ও মূল প্রকৃতিও পরব্রহ্মে লীন হওয়াতে কেবল প্রগাঢ় তমোমাত্র ছিল। সেই জন্য "তমঃ" শব্দটীর বিশেষণস্বরূপ 'আত্মপ্রস্বাপনং' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। উক্ত তমোপ্রভাবে যেন সকলই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত ছিল। প্রকাশ-বহুল মহত্তত্ত্ব স্বীয় তেজদ্বারা প্রলয়কালীন সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত করিয়াছিল—তখন মহত্তত্ত্ব ব্রহ্মতেজে তেজোময়। প্রকৃতপক্ষে ভগবানই আত্মদেহস্থ বিশ্বকে এইরূপে প্রকাশ করিলেন। এই মহত্তত্ত্বই জগতের অঙ্কুরস্বরূপ—সৃষ্টির এই আরম্ভ।

যদিও ঈশ্বরেচ্ছা সৃষ্টির মূল কারণ, তথাপি তাঁহার মায়াশক্তি এবং কালশক্তি গৌণ কারণরূপে পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু কোন বস্তু ও তাহার শক্তি পৃথক্ হইতে পারে না; সুতরাং ঈশ্বরই একমাত্র কারণ বুঝিতে হইবে! তাঁহার প্রয়োজন অনুসারে বিশ্বপ্রকাশে তাঁহার সকল শক্তিই ব্যবহার করিতে পারেন, সেই জন্য কার্য্য তাঁহারই বলিতে হইবে—বিশেষতঃ কালশক্তি ঐশ্বরিক-শক্তি। ভগবান্ স্বয়ং কালস্বরূপ।

অন্তঃ পুরুষরূপেণ কালরূপেণ যো বহিঃ।—৩।২৬।১৮, শ্রীমদ্ভাগবত।
চেষ্টা যতঃ স ভগবান্ কাল ইত্যুপলক্ষিতঃ।"—৩।২৬।১৭, শ্রীমদ্ভাগবত।

কালশক্তি ও মায়াশক্তি দ্বারা সৃষ্টিকার্য্যে কি সহায়তা হয়?

কালাদ্ গুণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ।
কর্ম্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদভূৎ॥ ২।৫।২২, শ্রীমদ্ভাগবত।

'পরমেশ্বর কাল, কর্ম্ম ও প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইলে, কালকর্তৃক গুণক্ষোভ হয় অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তম, এই ত্রিগুণের সাম্যত্যাগ হয়, স্বভাব (মায়া) হইতে রূপান্তরের উৎপত্তি হয়, এবং কর্ম্ম হইতে মহত্তত্ত্বের উদ্ভব হইয়া থাকে।'

জগতের স্থিতিকালে গুণ সকল ক্রিয়াশীল থাকে, এবং প্রলয়ে সমস্ত নিষ্ক্রিয় হইয়া সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। পুনরায় নির্দ্ধারিত সময়ে প্রলয় শেষ হইলেই গুণক্ষোভ হইয়া থাকে; সুতরাং কাল সৃষ্টিকার্য্যে বিশেষ সহায়। মায়া বা প্রকৃতি সদাই পরিণামশীল,—তাহার বিবিধ বিকার হইতে জীবের উপাধি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, দৃশ্যমান্ পদার্থ সকল জীবের ভোগাপবর্গ সম্পাদন জন্য উপাদানস্বরূপ।

কর্ম্ম জীবাদৃষ্ট। সৃষ্টি কালে ঈশ্বর জীবের পূর্ব্ব কর্ম্ম সকল অনুসরণ করেন। প্রলয়কালে জীবের শরীর নাশ হয় বটে, কিন্তু সকলের কর্ম্মনাশ হয় না। ঐ সকল কর্ম্ম সংস্কাররূপে প্রকৃতিতে লীন থাকে, ইহাই জীবের অদৃষ্ট। ঐ অদৃষ্ট অনুসারে জীবের ভোগ্যস্থান হইয়া থাকে।

এই কারণ সৃষ্টি সঙ্কল্পময়ী। ঈশ্বর সৃষ্টির কল্পনা বা তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবামাত্র সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভাবরূপে তাঁহাতে উদয় হয়। মহত্তত্ত্বে সেইভাব Divine Ideation,

বা বিশ্বের ছায়া প্রতিবিম্বিত হওয়ায়, মহত্তত্ত্ব মহামানসাকাশে বা মহৎবুদ্ধিরূপে প্রস্ফুটিত হইল।

স্বচ্ছত্বমবিকারিত্বং শান্তত্বমিতি চেতসঃ।
বৃত্তিভির্লক্ষণং প্রোক্তং যথাঽপাং প্রকৃতিঃ পরা।—৩৷২৬৷২২

যেরূপ জলের উৎকৃষ্ট স্বভাব—স্বচ্ছ, ফেণ-তরঙ্গাদিরহিত, মধুর ও শান্ত, মহত্তত্ত্ব সেইরূপ বিশদ ও রাগাদিরহিত বলিয়া ভগবদ্বিম্ব গ্রহণে সক্ষম ; তজ্জন্য উহাকে "বাসুদেবাখ্যংচিত্তং" কহিয়াছেন। বৃত্তিভেদে চিত্তের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ হয়। যদিও মহত্তত্ত্বে তিন গুণই বর্ত্তমান, তথাপি ঐ তত্ত্বে ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি অধিক পরিমাণে থাকাতে উহা রজঃ ও সত্ত্ব প্রধান। রজঃ ও তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, ভগবানের বীর্য্য হইতে উদ্ভূত ঐ মহত্তত্ত্বের বিকার হইয়াছিল এবং তাহা হইতে দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়াত্মক অহঙ্কার তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। অহঙ্কারতত্ত্ব তমঃ-প্রধান ; সুতরাং মহৎজ্ঞানের আবরক-অহঙ্কারের কার্য্যে তামস আকাশাদিবহুল এবং রাজস ও সাত্ত্বিক কার্য্য তত্ত্বসমূহ অল্পমাত্র। অতএব যে সকল জীবের সেই তত্ত্বগুলি উপাধি, তাহাদিগের মধ্যেও সেইরূপ তামসাধিক্য হইয়া থাকে। সেই অহঙ্কার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই তিন ভাগে বিভক্ত তন্মধ্যে সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন ও ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাগণ উৎপন্ন হয়। রাজসিক অহঙ্কার হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ এবং তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয়। ভগবানের প্রভাবে তামস অহঙ্কার বিকারপ্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে শব্দ-তন্মাত্র উৎপন্ন হয়। উহা হইতে আকাশ এবং শব্দগ্রাহক শ্রোত্র হইয়া থাকে। ঐরূপে ভগবদেচ্ছাকর্ত্তৃক আকাশের শব্দ-তন্মাত্র বিকার প্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে স্পর্শ-তন্মাত্র এবং তৎপরে বায়ু ও স্পর্শের গ্রাহকস্বরূপ ত্বক্ উৎপন্ন হয়। বায়ুর স্পর্শ-তন্মাত্র উক্তরূপে বিকার-প্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে রূপ-তন্মাত্র এবং তৎপরে তেজ ও রূপের গ্রাহক চক্ষু উৎপন্ন হয়। আবার তেজের রূপতন্মাত্র পূর্ব্বোক্তরূপে বিকার-প্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে রস-তন্মাত্র, এবং তৎপরে জল ও যদ্দ্বারা রসগ্রহণ করিতে পারা যায়, সেই রসনেন্দ্রিয় উদ্ভূত হয়। পরিশেষে, জলের রস-তন্মাত্র পূর্ব্বরূপ ঈশ্বরেচ্ছায় বিকার পাইলে, তাহা হইতে গন্ধ-তন্মাত্র উৎপন্ন হয়। ঐ গন্ধ-তন্মাত্র হইতে পৃথ্বী এবং গন্ধগ্রহণকারী ঘ্রাণেন্দ্রিয় জন্মিয়া থাকে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, পরমেশ্বর সকল তত্ত্বে, প্রতি বিভাগে এবং প্রতি পরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট ; যাঁহার দ্বারা সমুদায় তত্ত্ব ঐরূপে অনুপ্রবিষ্ট, প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা সেই পুরুষকে, প্রথম পুরুষ কহে। তিনিই সুতরাং মহতের স্রষ্টা।

পঞ্চভূতগুলি এইরূপে যথাক্রমে উদ্ভূত হইলে, পর পর নিকৃষ্টগুলিতে তাহাদের ঊর্দ্ধতন কারণের গুণও প্রবেশ করিয়াছে। আকাশে কেবলমাত্র শব্দগুণ। বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ ; তেজে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ ; জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, এবং ভূমিতে আকাশাদি

ভূত-চতুষ্টয়ের অনুপ্রবেশ জন্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ অর্থাৎ সকল কারণেরই গুণ বর্ত্তমান আছে।

প্রথম পুরুষদ্বারা তত্ত্বগুলি উক্তরূপে প্রকাশিত হইলে, তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া জীবদেহ বা জীবভোগ্য স্থান রচনা করিতে অসমর্থ হইয়া পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিতি করিতে লাগিল। ভগবান্ তখন সংহনন-কারিণী প্রকৃতির সহিত অন্তর্যামী-স্বরূপে ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বমধ্যে যুগপৎ প্রবেশ করিলেন। তত্ত্বগণকে পরস্পর মিলিত করিয়া তদ্দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন লোক রচনা ও জীবদেহ নির্ম্মাণ দ্বিতীয় পুরুষ কর্ত্তৃক সাধিত হইল। সুতরাং দ্বিতীয় পুরুষ প্রকৃতির সহিত একত্রযোগে আত্মা-বুদ্ধিরূপে বিরাজিত হইলেন, এবং প্রথম পুরুষ তত্ত্বসমূহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া তিনি তত্ত্বসমূহের আত্মা। দ্বিতীয় পুরুষ এইরূপে তত্ত্বসমূহকে সংযোজিত করাতে তত্ত্বসমূহের এবং জীবগণের সুপ্তকর্ম্ম জাগরিত হইয়াছিল। তত্ত্বসমূহ ভগবান্‌কর্ত্তৃক শক্তিপ্রাপ্ত হইয়া হিরণ্ময় অণ্ডাকার এক বিরাট্ দেহ প্রস্তুত করিল, সেই দেহে সচরাচর সমস্ত লোক অবস্থিত হইল। ভগবান্ তন্মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বহুকাল অনুশায়ী জীবগণ লইয়া বাস করেন। ইনিই নারায়ণ এবং ঐ অণ্ডকে ব্রহ্মাণ্ড কহে। উহা দ্বিতীয় পুরুষদ্বারা অনুপ্রাণিত। এই দ্বিতীয় পুরুষই আদ্য অবতার এবং অন্যান্য অবতারের বীজস্বরূপ। তিনি পরমাত্মার অংশ (জীব), এই আদ্য অবতার সমগ্র জীবের আত্মা। ব্রহ্মা তাঁহারই নাভিপদ্ম হইতে বাহির হইয়াছেন এবং তাঁহারই অংশ। প্রলয়কাল অবসান হইলে ভগবান্ তাঁহাতে লীন সূক্ষ্ম অর্থসমূহে (ষট্ অবিশেষরূপে পরিণত সূক্ষ্ম পদার্থে, দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সেই সূক্ষ্ম অর্থসকল কালবশে রজোগুণদ্বারা ক্ষোভিত হইয়া জগৎপ্রসবার্থ তদীয় নাভিদেশ হইতে উৎপন্ন হইল। জীবগণের অদৃষ্ট প্রবুদ্ধ হইয়া পদ্মকোষাকারে পরিণত হইল—নারায়ণই পদ্ম কোষের উৎপত্তির মূল কারণ।

স পদ্মকোশঃ সহসোদতিষ্ঠৎ কালেন কর্ম্মপ্রতিবোধনেন।
স্বরোচিষা তৎ সলিলং বিশালং বিদ্যোতয়ন্নর্ক ইবাত্মযোনিঃ॥ ৩।৮।১৪—ভাগবত
তল্লোকপদ্মং স উ এব বিষ্ণুঃ প্রাবীবিশৎ সর্ব্বগুণাবভাসম্।
তস্মিন্ স্বয়ং বেদময়ো বিধাতা স্বয়ম্ভুবং যং স্ম বদন্তি সোঽভূৎ॥ ৩।৮ ১৫—ভাগবত।

'ঐ পদ্মকোষ পরিপুষ্ট হইয়া সূর্য্যের ন্যায় আত্মজ্যোতিতে প্রলয়কালীন মহাসমুদ্রের জলকে উদ্দ্যোতিত করিয়া জলরাশির উপরে উত্থিত হইল। বিষ্ণু অন্তর্য্যামীস্বরূপে তাহার জীবভোগ্য সমস্ত ভূতসূক্ষ্মের প্রকাশক সেই লোকপদ্ম মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন বেদময় সয়ম্ভূ ব্রহ্মার আবির্ভাব হইল।' মনুস্মৃতিতেও ঐরূপ বর্ণিত আছে,—

তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্। তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥ মনু. ১ অঃ, ৯

'সেই অণ্ড সুবর্ণবর্ণ ও সূর্য্যসম প্রভাবিশিষ্ট হইয়াছিল, সর্ব্বলোকের পিতামহ ব্রহ্মা তাহাতেই উৎপন্ন হইয়াছিলেন।'

দ্বিতীয় পুরুষ উক্ত হিরণ্ময় অণ্ডের মধ্যে জীবসমূহসহ অবস্থিত হইলে, একত্র পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে; তত্ত্বসকলও ভগবানের শক্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ভাবী জীবের দেহ-রচনায় সক্ষম হয়। তখন তত্ত্ব সকলের কার্য্যস্বরূপ বিরাট্ মূর্ত্তি, দৈবশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও আত্মশক্তিবিশিষ্ট হইয়া, এক, দশ ও তিন প্রকারে বিভক্ত হইল;—জ্ঞানশক্তি দ্বারা হৃদয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপে এক প্রকার, ক্রিয়াশক্তি দ্বারা প্রাণরূপে দশ প্রকার, এবং আত্ম-শক্তি দ্বারা অধ্যাত্ম, অধিদৈব ও অধিভূতভেদে তিন প্রকার। বিরাট্ পুরুষ জীবশরীরে উক্ত তিনরূপে অনুভূত হন। জীব সকল পৃথক্‌ভাবে প্রকাশিত হইলে ভগবান্ তৃতীয় পুরুষ হইয়া ব্যষ্টি জীবের আত্মারূপে পরিগণিত হয়েন। বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি;—প্রথমং মহতঃ স্রষ্টৃ, দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতম্।...তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং। তাহা হইলে দেখিতেছি যে, ব্রহ্ম প্রথম পুরুষরূপে তত্ত্বসমূহের আত্মা ও মহেশ্বর—দ্বিতীয় পুরুষরূপে তিনি সকল ব্রহ্মাণ্ডের ও ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি জীবের আত্মা এবং তৃতীয় পুরুষরূপে ব্যষ্টি জীবের আত্মা। একেরই তিনভাব মাত্র; প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বতঃ কোন ভেদ নাই।

দ্বিতীয় পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে আপনাকে ত্রিমূর্ত্তিতে বিভক্ত করিয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য্য সাধন করেন। সৃষ্টিকার্য্য ব্রহ্মা করিয়াছেন, তাঁহাতে রজোগুণের আধিক্য, সত্ত্বগুণ অবলম্বনে বিষ্ণু জগদ্ধারণ ও পালন করিতেছেন এবং তমোগুণ প্রভাবে শিব সংহার বা লয় কার্য্য সম্পাদন করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে গুণাবতার কহে—ইহাও কেবল ত্রিগুণের কার্য্যভেদ দেখাইবার জন্য; বস্তুতঃ সৃষ্টিকার্য্যে সকলেরই সহায়তার প্রয়োজন এবং গুণত্রয়েরও কার্য্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ররূপে হইতে পারে না, একের ক্রিয়ার সময় অপর দুইটী পশ্চাতে থাকিয়া তাহার সহায়তা করে কিংবা নিস্তেজভাবে অবস্থান করে।

> যত্তৎ কারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্।
> তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষো লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্ত্যতে॥"—মনু, ১ম অঃ, ১১।

'যিনি আদি কারণ, অব্যক্ত, নিত্য ও সদসদাত্মক, তৎকর্ত্তৃক উৎপাদিত ঐ পুরুষকে লোকে ব্রহ্মা বলিয়া থাকে। আদ্যাবতার দ্বিতীয় পুরুষ হইতে প্রকাশিত ব্রহ্মা গুণাবতার মধ্যে পরিগণিত।'

ব্রহ্মা নারায়ণদ্বারা উপদিষ্ট হইয়া বহুকাল তপস্যা করিলেন। উক্তরূপ তপস্যা করায় ব্রহ্মার আত্মস্থিতবিদ্যা ও বিজ্ঞানবল প্রবুদ্ধ হইল এবং পূর্ব্বকল্পে যেরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সে সমুদয় তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। যে পদ্মে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই পদ্ম ও তাহার আধারস্বরূপ প্রলয়কালীন জল প্রবল-বায়ুদ্বারা কম্পিত হইতেছে, তিনি তখন দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি অবলীলাক্রমে সেই জল ও বায়ু পান করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার আসনস্বরূপ সেই পদ্ম আকাশব্যাপী হইল; তৎপরে তিনি ধ্যানদ্বারা সেই অণ্ডরূপ বিশাল পদ্মমধ্যে প্রবেশ করতঃ সেই পদ্মকোষ তিনভাগে বিভক্ত করিলেন। এইরূপে

ত্রিলোকীর সৃষ্টি হইল। তদনন্তর অহঙ্কারাদি তত্ত্ব ও সূক্ষ্মভূতসমূহ, আত্মমাত্রাতে অর্থাৎ স্ববিকার ইন্দ্রিয়গণ এবং পঞ্চভূতের সহিত যোজনা করিয়া, জীবের ভোগসাধনোপযোগী স্থান ও দেহ নির্ম্মিত হইল। ক্রমে জগৎ রচনার জন্য যেখানে যাহা প্রয়োজন, সকলই যথা-নিয়মে ও যথাপূর্ব্ব সৃষ্টি হইছল। অনন্তর বিবিধ জীব, দেব, মানব প্রভৃতি সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছিল।

অহঙ্কারতত্ত্বের পূর্ব্বে মহত্তত্ত্বের স্ফুরণ হইয়াছিল। ব্রহ্মা স্বয়ং মহত্তত্ত্বাভিমান লাভ করিয়া উৎপন্ন হইয়াছিলেন। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব এবং পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটি সূক্ষ্মমাত্রা হইতে এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ সাতটি অতীব বীর্য্যশালী (দ্বিতীয় পুরুষের বলে); কারণ দ্বিতীয় পুরুষরূপে ভগবান্ তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন।

পতঞ্জলি যে সূত্রে দৃশ্যগুণগুলির স্বরূপভেদ দেখাইয়াছেন, ব্যাসদেব তাঁহার ভাষ্যে তৎসম্বন্ধে এইরূপ বিভাগ করিয়াছেন ;—

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, উদক ও ভূমি এই পঞ্চমহাভূত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্ররূপ 'অবিশেষে'র (unspecific modifications of Mahat or Consciousnessএর) 'বিশেষ' (specific modifications or effects) এবং অস্মিতা বা অহঙ্কারও ঐরূপ মহতের একটি 'অবিশেষ'। উক্ত ছয়টি 'অবিশেষ', সত্তামাত্র মহত্তত্ত্বরূপ আত্মার পরিণাম। মহত্তত্ত্ব অবিশেষ সকল হইতে শ্রেষ্ঠ ও সত্তামাত্র। 'বিশেষ'রূপে (তত্ত্বরূপে পরিণত হইবার পূর্ব্বে মহত্তত্ত্বের ভিতর থাকিয়া তাহারা বৃদ্ধির কাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়।

ব্রহ্মা প্রলয়কালের জলরাশি এবং প্রবল বায়ু পান করিয়া সমস্ত নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। তৎপরে স্বীয় শক্তিপ্রভাবে সকল তত্ত্বে এবং সকল ভূতে স্বীয় শক্তি অর্পণ করিয়া জীবের ক্রমাভিব্যক্তির উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। ত্রিলোকী কেবল ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক লইয়া হইয়াছে। কাম্য কর্ম্মদ্বারা জীব ত্রিলোকী মধ্যে কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। কল্পে কল্পে তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ হয়। মহঃ, জন, তপঃ ও সত্যলোক নিষ্কাম ধর্ম্মের ফল। দ্বিপরার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ ব্রহ্মার শতবৎসর আয়ু পর্য্যন্ত উপরিতন ঐ কয় লোকের বিনাশ নাই।

ক্রমশঃ।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

ভারতে বেদান্ত।

নাহি দেশ,—বিরতির নাহি কোন স্থান।
বিমুক্ত প্রবাহে কাল স্বভাবের বশে
চলিয়াছে অবিরাম। সে মুক্ত প্রবাহে
মুক্তজ্ঞানে মুক্তানন্দ দিতেছে নিয়ত
পূর্ণতার পরিচয়,—প্রকৃতি আপন।
আত্মরতি, আত্মতৃপ্তি, আত্ম-অধিকার
পরাধীনতার কভু দেখেনা স্বপন।
পরিমুক্ত বেদান্তের অচিন্ত্য প্রভাবে
জীবন সংগ্রাম জয়ী, মোহমুক্ত জীব,
স্বরাজের অধিকারী, সম্রাট্ স্বাধীন।
স্বরাজের মহিমায় স্বাতন্ত্র্যের ভাব,
বৈষম্যের কোলাহল, স্বার্থের হুঙ্কার,
অভেদ্য অভেদ জ্ঞানে কোথা ডুবে যায়।
দীর্ঘ পর্য্যটন শেষে ডুবিয়াছে মন
অহঙ্কারে, অহঙ্কার হ'য়েছে বিলয়
পে'তে গিয়া বেদান্তের পূর্ণ পরিচয়।
রহে শুধু আত্ম-স্মৃতি অনন্ত অসীম;
মুক্ত আনন্দের অঙ্কে লভি মুক্ত প্রাণ
আপনারে সর্ব্বভূতে দেখে বর্ত্তমান।
বেদান্তের মহিমায় লভি মুক্তজ্ঞান
আপনারে দেখে জীব সর্ব্বশক্তিমান্।
তাঁহারা মানুষ বটে, বেদান্তের ঋষি!
তাঁহাদের চক্ষে মুখে, শরীরে সর্ব্বত্র,
লভি স্ফূর্ত্তি বেদান্তের বিমুক্ত প্রভাব,
সারা জীব জগতের প্রতিনিধি পদে
করেছিল প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন ভারতে
কত মহাপরাক্রান্ত রাজরাজেশ্বর,
তাঁহাদের পদতলে লভিয়া আসন,
তাঁহাদের তেজোগর্ভ অঙ্গুলি-সঙ্কেতে,
প্রভুভক্ত আজ্ঞাধীন কিঙ্করের মত,
করিতেন বিধিমতে স্বরাজ্য পালন

তাঁহারা মানুষ বটে ; বেদান্তের ঋষি !
মহেষ্বাস মহাবল ক্ষত্রিয়-তনয়,
তাঁহাদের অপার্থিব, অচিন্ত্য প্রভাবে,
সভক্তি আপনা হ'তে হইত প্রণত
তাঁহাদের পদতলে ; সেবকের মত •
জানাইত সসম্মানে নিজ অভিমত।
তাঁহাদের বাহুবলে নৃপতি সমাজ
হয় নাই পদানত ; অস্ত্রের সাহায্যে
করে নাই কভু তাঁরা প্রভুত্ব স্থাপন।
নাহি জানি কি কারণে, কি অশুভ ক্ষণে
পরশুরামের সেই শাণিত কুঠারে
উঠিল ফুটিয়া বেগে, কাঁপায়ে ভূতল,
ঋষিদের কি প্রভাব ? কি তীব্র অনল ?
অতীত যুগের এক বিংশতি বারের
সেই নরমেধযজ্ঞ করিছে প্রচার,—
ঋষি প্রভাবের কাছে কি তুচ্ছ অসার
ক্ষত্রিয়ের বাহুবল, অস্ত্রের ঝঙ্কার ?
অস্ত্রমুখে ব্রহ্মতেজ রোধিবার তরে
কতবার নিঃক্ষত্রিয় হইল ধরণী,
উঠেছিল গৃহে গৃহে রোদনের ধ্বনি।
না দেখিলে বিশ্বামিত্র ব্রহ্মাস্ত্র তাঁহার
বশিষ্ঠের ব্রহ্মদণ্ডে চূর্ণ শতধায়,
লভিবারে ব্রহ্মতেজ, ব্রহ্মর্ষির পদ,
করিত কি আজীবন তপস্যা কঠোর,
ভাঙ্গিত গায়ত্রী মন্ত্রে অজ্ঞানতা ঘোর ?
ঋষিত্বের সংঘর্ষণ ক্ষাত্র বল সহ
হ'ত যদি স্বাভাবিক বিধির বিধানে,
কবে বিশ্ব পরিণত হইত শ্মশানে ;
বেদান্ত রহিত দূরে, করিত শমন
সৃষ্টি বিশ্বে নৈরাশ্যের তীব্র কোলাহল।
বেদান্তের মহিমায় শান্তনু নন্দন
ভ্রমিতেন মুক্তভাবে বক্ষে বসুধার।

অপ্রকাশ ঋষিত্বের প্রভাব তাঁহার
ক্ষত্রিয়ের বাহুবল না জানিয়া যবে
হইল তাঁহার সনে প্রবৃত্ত সমরে,
ক্ষত্র-ঋষি ভীষ্মদেব, বেদান্ত প্রভাবে
অস্ত্রমুখে ব্রহ্মতেজ করিয়া নির্গত
করিলেন ঋষিত্বের মহিমা প্রচার।
যেই তেজ ব্রহ্মভাবে অমৃত শীতল,
বিমুক্ত আনন্দরূপে উচ্ছ্বসিয়া প্রাণে
কহিত প্রবুদ্ধ জীবে বেদান্তের তত্ত্ব;
দেখাইত ব্যক্তাব্যক্ত, প্রাকৃত জগত
আত্মভাবে সুমধুর স্বপনের মত;
বহির্জ্জগতের মাঝে সেই ব্রহ্মতেজ
শত বজ্রাগ্নির সৃষ্টি করিয়া নিমেষে
ছুটিল প্রলয় বেগে; প্রকম্পনে তার
ধরিত্রীর প্রতি অণু কাঁপিল তেমন,
চমকিল গোবিন্দের প্রতিজ্ঞা অটল!
এক ভীম তুচ্ছ কথা? শত বৃকোদরে
সেই তেজ মৃত্যুরূপে করিত আশ্রয়;
করিয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ, যদি না সে তেজ
করিতেন ভগবান্ আপনাতে লয়।
চাহি যদি ধর্ম্মপানে শান্তনু তনয়
বরিয়া না লইতেন মৃত্যু আপনার,
পাণ্ডবের ধর্ম্মরাজ্য, আশা সমুজ্জ্বল,
স্বপ্নরাজ্যে পরিণত হইত কেবল।

শ্রীআশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

মৃত্যুর পরপারে কি আছে তাহা জানিবার জন্য সকলেরই ঔৎসুক্য আছে। অথচ সাধারণ চক্ষুদ্বারা মৃত্যুর রহস্যোদ্ভেদ করা অসম্ভব। সেই জন্য সেক্সপীয়র মৃত্যুর পরপারকে অনাবিষ্কৃত দেশ (Undiscovered Country) বলিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ দৃষ্টির অগোচর হইলেও দিব্যদৃষ্টি মৃত্যুর যবনিকা ভেদ করিতে সক্ষম। এইরূপ দৃষ্টির সাহায্যে থিওসফিক্যাল সভার একজন প্রধান সদস্য Mr. C. W. Leadbeater পরলোক সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি শোকার্ত্তের সান্ত্বনার জন্য "To those who mourn" এই নাম দিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহার মূল্য এক আনা মাত্র অথচ মৃত্যুর পরপার সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। যাঁহারা শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দিতে চান, এই গ্রন্থ তাঁহাদের প্রয়োজনে লাগিবে।

* * *

শ্রীযুক্ত সোঽহং স্বামী "Truth" নাম দিয়া বেদান্তের প্রধান প্রতিপাদ্য তত্ত্বগুলি ইংরাজী কবিতাকারে নিবদ্ধ করিয়াছেন ইংরাজী কবিতায় বেদান্তের উপদেশ বোধ হয় এই প্রথম। সোঽহং স্বামীর সকল মতের সমর্থন করা যায় না। তবে সমাধি সম্বন্ধে ও শুদ্ধাদ্বৈতবাদের প্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে এই গ্রন্থে তিনি কয়েকটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন।

* * *

ব্রুনোর নাম বোধ হয় অনেকেই শুনিয়াছেন। দুঃখের বিষয় তিনি যখন ইয়োরোপ খণ্ডে আবির্ভূত হন, তখন ইয়োরোপ অনুদারতার ও সঙ্কীর্ণতার আবাসভূমি ছিল। তিনি বেদান্তের অনুযায়ী বাইবেলের ব্যাখ্যা করিতেন, সেই জন্য তাঁহাকে রোমের খৃষ্টীয় প্রধানদিগের আদেশ-অনুসারে জীবন্তে অগ্নিদগ্ধ করা হয়। সে আজ তিন শত বৎসরের অধিক দিনের কথা। যেখানে ব্রুনো স্বাধীন মত প্রকাশের জন্য অগ্নিদগ্ধ হইয়াছিলেন, কিছু দিন পূর্ব্বে তথায় তাঁহার প্রস্তর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ইয়োরোপ অনুদার ভাব এখন অনেকটা পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন। ব্রুনো যদি জন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া থাকেন এবং এই যুগে নিজের স্বাধীন চিন্তা প্রকাশ করিতে সাহসী হন, তবে এখন আমরা তাঁহাকে কি করি? এখন আর জীবন্ত দেহ পোড়াইবার রীতি নাই। তবে বিদ্রূপ ও কুৎসার অগ্নিবাণ নিক্ষেপের ব্যবস্থা আছে।

* * *

সম্প্রতি mysticism লইয়া ইংলণ্ডে বেশ আলোচনা চলিতেছে। এক জন খৃষ্টীয় প্রধান পাদ্রি বলিয়াছেন যে, mysticism ধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ। যে ধর্ম্ম হইতে mysticism তিরোহিত হইয়াছে তাহা শবদেহ মাত্র। আশা করা যায়, খৃষ্টীয় ধর্ম্মে রহস্যবিদ্যা আবার ফিরিয়া আসিবে। এ সম্বন্ধে বারান্তরে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

* * *

গৃহধর্ম্ম। সাধারণতঃ হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনাস্থার সহিত আমাদের পূর্ব্বপ্রচলিত বিধিব্যবস্থানুসারী ক্রিয়া-কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতিও লোকে হতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। সুতরাং আমাদের সাংসারিক কর্ম্ম-কাণ্ডে বিলক্ষণ স্বেচ্ছাচারিতার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পিতৃ-পুরুষের শ্রাদ্ধ-তর্পণ, পূজা, হোম, যাগযজ্ঞ ত দূরের কথা, পরিবারের মধ্যে পরস্পরের প্রতি উপযুক্ত আচরণ, সন্তান-প্রতিপালন, সন্তান-সন্ততির শিক্ষাদান-ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়েও বিলক্ষণ ব্যতিক্রম উপস্থিত হইয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে অশিক্ষিতা গৃহ-কর্ত্রীগণ দ্বারা গৃহকর্ম্ম সকল যেরূপ সুব্যবস্থানুসারে অনুষ্ঠিত হইত, এক্ষণকার শিক্ষিতা মহিলাগণ তাহাতে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া নূতন ব্যবস্থায় সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করায় এক্ষণে ক্ষতি ভিন্ন লাভ দেখা যায় না। তাঁহারা যেরূপে সন্তান-লালন-পালন, সন্তানদিগের স্বাস্থ্য-সংরক্ষণের উপায়-অবলম্বন, সন্তানসন্ততির নীতি-শিক্ষাদির নূতন ব্যবস্থা প্রচলন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় সুফল পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু পুরাতন প্রথানুসারে যে সংসারে উক্ত কার্য্য সকল এখনও সম্পন্ন হইতেছে, সে সংসারে সুফলের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। বস্তুতঃ, এক্ষণে অনেক সংসারে আধুনিক গৃহকর্ত্রীগণ অনুশীলন অভাবে সেই সকল গৃহ-কর্ম্মের পদ্ধতি-ব্যাপারে একবারে অনভিজ্ঞ আছেন। তাঁহাদিগকে উপদেশ-প্রদান ছলে ইণ্ডিয়ান আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ, "শিল্প ও সাহিত্য" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, জাতীয় এ নীতিমূলক ও শিক্ষাপ্রদ পুস্তকের যতই প্রচার হইবে, ততই সমাজের মঙ্গল সাধন হইবে।

* * *

ঠাকুরমা। স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে পিতামহীর উপদেশ। "শিল্প ও সাহিত্য" কার্য্যালয়ের পুস্তকবিভাগ হইতে শ্রীযুক্ত শ্যামলাল চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে অতি সরল ভাষায়, বাঙ্গালি সংসারে কথিত মেয়েলি ভাষায়, পিতামহী নিজ পৌত্রীকে উপদেশ দিতেছেন। পৌত্রীর বিবাহের পর হইতে তাহার সন্তান-প্রসব করা পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম "একাদশটী সোপানে" পর পর বিবৃত হইয়াছে। শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী, দেবর, প্রভৃতি শ্বশুর-সংসারের সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণের প্রতি কিরূপ আচরণ করা উচিত, দাসদাসী বা অধীনস্থ জনগণের প্রতি কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, নিরলসভাবে সুশৃঙ্খলার সহিত কিরূপে গৃহ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়, সংসারের বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিরূপে মিতব্যয়িতা প্রয়োগ দ্বারা সংগ্রহ করিতে হয়, নানারোগের টোট্কা ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ, রোগী-পরিচর্য্যা, প্রসূতি-পরিচর্য্যা প্রভৃতি নানা অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে সুন্দর ও সহজ সহজ উপদেশ ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই পুস্তকে নীতি-শিক্ষার সহিত বিদ্যা শিক্ষা ও গৃহধর্ম্ম শিক্ষার সামঞ্জস্য সুকৌশলে প্রদর্শিত হইয়াছে! আমরা বিশ্বাস করি, এ পুস্তকখানি পড়িলে প্রত্যেক গৃহস্থ-বধূ ও গৃহস্থ-কন্যার ইহাতে স্বতঃই আগ্রহ সঞ্চার হইবে ও উল্লিখিত উপদেশগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে আপনা-আপনিই বাসনার উদয় হইবে। আরও আশা হয়, উক্ত উপদেশগুলি কার্য্যে পরিণত করিলে গৃহস্থ-বধূ কালে আদর্শ গৃহিণী হইতে সমর্থা হইবেন।



ক্যাপেলা প্যালেটিনার খ্রীষ্টমূর্ত্তি।

ব্রহ্মবিদ্যা

২য় বর্ষ।] শ্রাবণ, ১৩২০। [৪র্থ সংখ্যা।

গঙ্গা-স্তোত্রম্।

(দরাফ্ খাঁ-বিরচিতম্)

(১)

যত্ত্যক্তং জননীগণৈর্যদপি ন স্পৃষ্টং সুহৃদ্বান্ধবৈ-
র্যস্মিন্ পান্থদৃগন্তসন্নিপতিতে তৈঃ স্মর্য্যতে শ্রীহরিঃ।
স্বাঙ্কে ন্যস্য তদীদৃশং বপুরহো স্বীকুর্ব্বতী পৌরুষং (১)
ত্বং তাবৎ করুণাপরায়ণপরা মাতাঽসি ভাগীরথি ॥

মাতাও ফেলিয়া দেয়,—যা না রাখে ঘরে,
সুহৃদ্ বান্ধব যাহা স্পর্শ নাহি করে;
পথিক কটাক্ষে যাহা করিলে দর্শন
মনে মনে হরিনাম স্মরে অনুক্ষণ;
হায় রে সে মৃতদেহ পরম আদরে
পৌরুষ ভাবিয়া মাগো! রাখ কোলে ক'রে।
সংসারে করুণাময়ী মাতা যত রয়,
তুমিই সবার শ্রেষ্ঠ,—বলিব নিশ্চয়!

(২)

অচ্যুতচরণতরঙ্গিণি (২) শশিশেখরমৌলিমালতীমালে।
ত্বয়ি তনুবিতরণসময়ে দেয়া হরতা ন মে হরিতা ॥ (ক)

রঙ্গে ভঙ্গে তরঙ্গের করিয়া বিস্তার
বিষ্ণুর চরণে গঙ্গে! করহ বিহার।

---

(১) "স্বীক্রিয়তে পৌরুষং" ইত্যপি নষ্টচ্ছন্দা দুষ্টঃ পাঠো দৃশ্যতে।
(২) "অচ্যুতচরণতরঙ্গিণি গঙ্গে" ইত্যপি আর্য্যাচ্ছন্দোবিরুদ্ধো দুষ্টঃ পাঠো দৃশ্যতে।
(ক) অন্তিমকালে পতিত-পাবনী গঙ্গাদেবীর গর্ভে দেহত্যাগ করিলে মনুষ্য শিবত্ব বা বিষ্ণুত্ব লাভ

শিবের জটায় সদা থাকিয়া সাদরে
মালতী-মালার শোভা রাখিয়াছ ধ'রে।
তাই বলি, ওমা গঙ্গে! তোমায় যখন
এই মোর দেহখানি করিব অর্পণ,
দেখ মা! শিবত্ব মোরে দেওয়া যেন হয়,
বিষ্ণুত্ব পাইতে মোর ইচ্ছা নাহি রয়!

(৩)

শূন্যীভূতা শমননগরী নীরবা রৌরবাদ্যা
যাতাযাতৈঃ প্রতিদিনমহো ভিদ্যমানা বিমানাঃ। (৩)
সিদ্ধৈঃ সার্দ্ধং দিবি দিবিষদঃ সার্ঘ্যপাত্রৈকহস্তা
মাতর্গঙ্গে যদবধি তব প্রাদুরাসীৎ প্রবাহঃ॥

যে অবধি এ সংসারে প্রবাহ তোমার,
সে অবধি এই সব দেখি অনিবার,—
শূন্য হ'য়ে প'ড়ে আছে যমালয় হায়,
রৌরব-নরক-নাদ শুনা নাহি যায়;
প্রতিদিন যাতায়াত করিয়া করিয়া
কত শত স্বর্গ-রথ যেতেছে ভাঙ্গিয়া;
স্বর্গধামে সিদ্ধগণ সহ দেবগণ
অর্ঘ্য-পাত্র ল'য়ে করে করে সম্ভাষণ!

(৪)

পয়ো হি গাঙ্গং ত্যজতামিহাঙ্গংপুনর্নচাঙ্গং যদি যান্তি চাঙ্গম্। (৪)
করে রথাঙ্গং শয়নে ভুজঙ্গং যানে বিহঙ্গং চরণে চ গাঙ্গম্॥

আছে বটে নানাবিধ জল ত্রিভুবনে,
না হয় তুলনা কিন্তু গঙ্গা-জল সনে।

করিয়া থাকেন, ইহা শাস্ত্রীয় কথা। এই দ্বিবিধ পদার্থই নশ্বর মানবের চির-প্রার্থনীয় ধন। কিন্তু গঙ্গাভক্ত সাধক কবি এই শ্লোকে গঙ্গার নিকটে বিষ্ণুত্ব কামনা না করিয়া শিবত্ব কামনা করিতেছেন। শিবত্ব লাভ করিলে তিনি গঙ্গাদেবীকে পরম সুখে মস্তকে ধারণ করিতে পারিবেন, কিন্তু বিষ্ণুত্ব লাভ করিলে অবশ্যই তাঁহাকে পরম-কষ্টে চরণে ফেলিয়া রাখিতে হইবে। এজন্যই সাধক কবি এই শ্লোকে গঙ্গাদেবীর নিকটে বিষ্ণুত্ব প্রার্থনা না করিয়া শিবত্ব প্রার্থনা করিতেছেন।

(৩) "ভেদ্যমানা বিমানাঃ" ইতি পাঠান্তরম্।

(৪) "পুনর্ন চাঙ্গং যদি বাপি চাঙ্গম্", "পুনর্ন চাঙ্গং যদি যাতি চাঙ্গম্" ইতি দ্বাবপি পাঠৌ দৃষ্টৌ।

এই জলে যেই জন দেহত্যাগ করে,
সে জন এ দেহ আর কভু নাহি ধরে।
পুনর্ব্বার দেহ যদি ধরে সেই জন,
ধরিবেক বিষ্ণু-দেহ অমনি তখন,—
রথাঙ্গ লইবে করে, ভুজঙ্গ শয়নে,
বিহঙ্গ গমনে, আর গঙ্গাম্বু চরণে!

(৫)

কত্যক্ষীণি করোটয়ঃ কতি তি দ্বীপিদ্বিপানাং ত্বচঃ
কাকোলাঃ কতি পন্নগাঃ কতি সুধাধাম্নশ্চ খণ্ডাঃ কতি।
কিঞ্চ ত্বঞ্চ কতি ত্রিলোকজননি ত্বদ্বারিপূরোদরে
মজ্জজ্জন্তুকদম্বকং সমুদয়ত্যেকৈকমাদায় যৎ॥ (৫)

ত্রিলোক-জননি গঙ্গে! জঠরে তোমার
কতই এসব বস্তু আছে অনিবার,—
নরের কপাল, চক্ষুঃ, বিষ, সর্প কত,
ব্যাঘ্র-চর্ম্ম, হস্তি-চর্ম্ম, চন্দ্র-খণ্ড শত;
তুমিই যে কত আছ তোমারি ভিতরে
কোন্ জন রহে তার গণনা যে করে?
সংসারে যে কোন জীব স্নানের সময়
তোমার পবিত্র জলে যদি মগ্ন হয়,
এক এক করি মাগো! এসব লইয়া
সে জীব তখনি উঠে শঙ্কর সাজিয়া।

(৬)

কুতোঽবীচির্বীচিস্তব যদি গতা লোচনপথং
ত্বমাপীতা পীতাম্বরপুরনিবাসং বিতরসি। (৬)
ত্বদুৎসঙ্গে গঙ্গে যদি পততি কায়স্তনুভৃতাং
তদা মাতঃ শাতক্রতবপদলাভোঽপ্যতিলঘুঃ॥

যার চক্ষে পড়ে মাগো! তরঙ্গ তোমার,
"অবীচি"-নরক-ভয় নাহি থাকে তার।
বিন্দুমাত্র তব জল যে করিবে পান,
তাহারেই দাও তুমি শ্রীবৈকুণ্ঠে স্থান।

(৫) কালিদাসকৃতগঙ্গাস্তবেঽপি শ্লোকোঽয়ং দৃশ্যত ইতি বুধৈশ্চিন্ত্যম্।
(৬) "কুতো বাপী" "ত্বমাপ্রীতা" ইত্যত্র দ্বাবেব পাঠৌ নিবর্ত্তকৌ।

শরীরী শরীরখানি যদি একবার
অর্পণ করিতে পারে সলিলে তোমার,
তা' হ'লে তাহার মাগো! যে সৌভাগ্য রয়,
ইন্দ্রপদ তার কাছে অতি তুচ্ছ হয়!

(৭)

ত্বমম্ভো লোকানামখিলদুরিতান্যেব দহসি
প্রগন্ত্রী নিম্নানামপি নয়সি সর্ব্বোপরি নতান্।
স্বয়ং জাতা বিষ্ণোর্জনয়সি মুরারাতিনিবহান্
অহো মাতর্গঙ্গে কিমিহ চরিতং তে বিজয়তে॥

হইয়াও জলময়ী তুমি সর্ব্বক্ষণ
মানবের পাপরাশি করিছ দহন।
নিম্ন স্থানে যাও তুমি চিরদিন ধরি;
কিন্তু পতিতেরে স্থান দাও সর্ব্বোপরি।
বিষ্ণু হ'তে জন্ম তব, কিন্তু মাগো! হায়
কত শত বিষ্ণু জন্মে তোমারি কৃপায়।
একি অপরূপ রীতি দেখি গো তোমার,
তোমার চরিত্র মাগো! বুঝে উঠা ভার!

(৮)

সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং স তরতি নিজপুণ্যৈস্তত্র কিন্তে মহত্ত্বম্।
যদি চ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং তদিহ তব মহত্ত্বং তন্মহত্ত্বং মহত্ত্বম্॥

শুন গঙ্গে সুরধুনি! জহ্নুর নন্দিনি!
পুণ্যবান্ জনে তুমি তরাও জননি!
নিজ পুণ্যে পুণ্যবান্ নিত্য তরে যায়,
তোমার মহিমা মাগো! কিবা রহে তায়?
আমি অতি দীনহীন, নাহি মোর গতি,
মহাপাপে পূর্ণ আমি,—পরম দুর্মতি।
আমারে তরাতে যদি পার একবার,
মহিমা মহিমা তবে মহিমা তোমার!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর।

চৈতন্য কথা।

কৃষ্ণের বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন।

শ্রীকৃষ্ণের উদ্ধব-প্রেরিত সন্দেশ একটি গূঢ় রহস্য।

কংশ-নিধনের পর নন্দকে সম্বোধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

যাত যূযং ব্রজং তাত বয়ঞ্চ স্নেহদুঃখিতান্।
জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টু মেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্॥ ভাঃ পুঃ ১০-৪৫ ২৩

'হে পিতঃ! ব্রজবাসীদিগের সহিত তুমি এখন ব্রজে ফিরিয়া যাও। আমরা জ্ঞাতিবর্গের সুখ বিধান করিয়া আবার তোমাদিগকে দেখিতে গমন করিব।'

এই আশা-বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া ব্রজবাসীরা অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আশা ক্রমে দুরাশা হইতে লাগিল। কতদিনের পর শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে তাঁহার সংবাদ লইয়া বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন।

উদ্ধব নন্দকে বলিলেন—

আগমিষ্যত্যদীর্ঘেণ কালেন ব্রজমচ্যুতঃ।
প্রিয়ং বিধাস্যতে পিত্রোর্ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ॥
হত্বা কংসং রঙ্গমধ্যে প্রতীপং সর্ব্বসাত্বতাম্।
যদাহ বঃ সমাগত্য কৃষ্ণঃ সত্যং করোতি তৎ॥

'অদীর্ঘকালে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আগমন করিবেন এবং মাতা-পিতার প্রিয় বিধান করিবেন। তিনি রঙ্গ মধ্যে কংসকে নিধন করিয়া প্রত্যাগমন সম্বন্ধে যে বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ করিবেন।'

উদ্ধব ব্রজগোপীদিগকে কিন্তু একথা বলিলেন না। তিনি তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের নিম্নলিখিত সংবাদ শুনাইলেন—

যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্ত্তে প্রিয়োদৃশাম্।
মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যান কাম্যয়া॥
যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে মন আবিশ্য বর্ত্ততে।
স্ত্রীণাঞ্চ ন তথা চেতঃ সন্নিকৃষ্টেঽক্ষগোচরে॥
ময্যাবেশ্য মনঃ কৃৎস্নং বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ।
অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথ॥
যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেঽস্মিন্ ব্রজআস্থিতাঃ।
অলব্ধরাসাঃ কল্যাণ্যো আপুর্মদ্বীর্য্য চিন্তয়া॥ ভাঃ পুঃ ১০-৪৭

'আমি যে আপনাদিগের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিতেছি, তাহার কারণ এই যে, আপনারা আমার সতত ধ্যান করিলে আমি আপনাদের মানসিক সন্নিকর্ষ লাভ করিব।

প্রিয়তম ব্যক্তি যদি দূরে থাকে, তাহা হইলে স্ত্রীলোকের মন তাঁহাতে আবিষ্ট হয়। চক্ষুর নিকটবর্ত্তী লোক প্রিয়তম হইলেও মন তাহাতে আবিষ্ট হয় না। সমগ্র মন আমাতে আবিষ্ট করিয়া, অশেষ মনোবৃত্তি হইতে বিমুক্ত হইয়া, আমাকে নিত্য অনুস্মরণ করিলে আপনারা আমাকে অচিরাৎ প্রাপ্ত হইবেন। আমি যখন 'ব্রজে রাসক্রীড়া করি, তখন কোন কোন গোপ-রমণী পতিকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া সেই ক্রীড়ায় যোগ দিতে পারেন নাই। কিন্তু হে কল্যাণময়ী ব্রজসুন্দরীগণ! আমার বীরত্ব চিন্তা করিয়া তখনই আমাকে তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।'

ইহা ত নিত্য লীলা, বিয়োগ-শূন্য নিত্য যোগের কথা। ইহা ত পার্থিব বিরহের অত্যন্ত অভাব। ইহা ত স্থূল দেহে অভিমান-শূন্যতা। হয়ত এখানে নারায়ণ ঋষিও নাই, মৈত্রেয় ঋষিও নাই। হয়ত আবশ্যক হইলে, নিত্য লীলার অভিনায়ক মধুর কৃষ্ণচন্দ্র, মৈত্রেয় ঋষির দেহ পরিচ্ছদরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। হয়ত তিনি এইরূপে নারায়ণ ঋষির দেহ পরিচ্ছদরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই অদ্বয় নিত্য তত্ত্ব বস্তুতঃ নারায়ণ ঋষিও নহেন, মৈত্রেয় ঋষিও নহেন; তিনি "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"

"ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু" নামক অপরূপ গ্রন্থে শ্রীরূপগোস্বামী গোপদিগের বিরহ বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন—

প্রোক্তেয়ং বিরহাবস্থা স্পষ্টলীলানুসারতঃ।
কৃষ্ণেন বিপ্রয়োগঃ স্যান্ন জাতু ব্রজবাসিনাম্॥

প্রোচ স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—

বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ সদা ক্রীড়তি মাধবঃ।
বৃন্দাবনান্তরগতঃ সরামো বালকৈর্বৃতঃ॥ ১৫৭

'এই যে বিরহাবস্থার বর্ণনা করা গেল, সে প্রকট লীলার অনুসারে। অপ্রকট নিত্য লীলায়, ব্রজবাসীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কখনই বিয়োগ হয় না।'

জীব গোস্বামী বলেন, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে পুনরাগমন করিলে, প্রকট লীলা ও অপ্রকট লীলা দুই একীভূত হয়। তখন প্রকট-লীলা-গত বিরহের শান্তি হয়।

শ্রীকৃষ্ণ কবে বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, এই বিষয় লইয়া জীব গোস্বামী এক তুমুল বিচার তুলিয়াছেন। বাৎসল্য-রসের স্থায়ী ভাব দেখাইতে রূপ গোস্বামী বিদগ্ধ-মাধবের এক শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ শ্লোক ভিত্তি করিয়া জীব গোস্বামী নিত্য স্থিতির বিচার আরম্ভ করিতেছেন।

তত্র সত্যসঙ্কল্পতয়া বেদাদিগীতস্য তস্য 'জ্ঞাতীন বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখ'মিতি প্রত্যাগমনসংকল্পঃ শ্রীদশমে স্পষ্ট এব।

'ভগবান্ সত্যসংকল্প। বেদাদি বাক্যে ইহা গীত হইয়াছে। ভাগবতের দশমস্কন্ধে সেই ভগবান্ স্পষ্টই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, জ্ঞাতিবর্গের সুখ বিধান করিয়া তিনি বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিবেন।'

তদেতদেব বিবৃতং শ্রীমদুদ্ধবেন। হত্বা কংসং রঙ্গমধ্যে ইত্যাদি।

'উদ্ধব মহাশয়ও এই কথা নন্দের নিকট বলিয়াছিলেন।'

অত্র পিত্রোঃ প্রিয়বিধানং খলু সদা তৎ সংযোগ এবেতি।

'পিতামাতার প্রিয় বিধান সর্ব্বদা কৃষ্ণসংযোগ দ্বারাই হইতে পারে।'

তদেতদাগমন সময়শ্চ দন্তবক্রবধানন্তরমেব।

'দন্তবক্রবধের পরই শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।'

যথা সূচিতং স্বয়মেব।

অপি স্মরথ নঃ সখ্যঃ স্বানামর্থচিকীর্ষয়া।
গতাংশ্চিরায়িতান্ শত্রুপক্ষ ক্ষপণ চেতসঃ॥ ইতি ভাঃ পুঃ ১০৮২

ভগবান্ নিজেই একথার সূচনা করিয়াছেন। তিনি কুরুক্ষেত্রে গোপীদিগের সহিত পুনর্মিলিত হইয়া বলিয়াছিলেন—'হে সখীগণ! আমাদিগকে কি তোমরা স্মরণ কর? আত্মীয়গণের প্রিয়সাধনেচ্ছায় আমাদের অনেক বিলম্ব হইয়াছে। এখন শত্রুপক্ষ-নাশের জন্যই আমাদের চিত্ত নিবিষ্ট।'

এখন জীব গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাস্য এই যে, কুরুক্ষেত্র-মিলন ভাগবতের দশম-স্কন্ধের ৮২ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে; কিন্তু ৭৮ অধ্যায়ে দন্তবক্রবধের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। "দন্তবক্রবধের পর আমরা বৃন্দাবনে যাইব"—এরূপ সূচনা ভগবদুক্তিতে কোথায় পাইলেন?

তদিদং শত্রুবধান্তে দন্তবক্রেঽপি শান্তে নিজাগমনং ভাবীতি কুরুক্ষেত্রযাত্রায়াং শ্রীভগবদ্বচনং। যাত্রা চেয়ং দন্তবক্রবধাৎ পূর্ব্বমেব।

'দন্তবক্র নিহত হইলে, শত্রুবধান্তে, বৃন্দাবন গমন করিবেন, এইরূপ কথা ভগবান্ কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় বলিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র-যাত্রা দন্তবক্রবধের পূর্ব্বেই হইয়াছিল।'

এখন জানিলাম, জীবগোস্বামীর মতে, অধ্যায়ের অগ্রপশ্চাৎ এখানে ধর্ত্তব্য নয়। কেন?

অত্র বনপর্ব্বরীত্যা শাল্ববধসহিতস্যাস্য দন্তবক্রবধস্য সমকালমেবহি পাণ্ডবানাং বনগমনং। তেষাং আগমনানন্তরমেবচ ভীষ্মাদিবধময় ভারতযুদ্ধম্। সা যাত্রা চ ভীষ্মাদ্যাগমনময়ীতি।

'মহাভারতের বনপর্ব্ব অনুসারে শাল্ববধ ও দন্তবক্র-বধের সমকালেই, পাণ্ডবেরা বনে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বন হইতে প্রত্যাগমন করিলে, ভারত-যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, যাহাতে ভীষ্মাদি নিহত হইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় ভীষ্মাদির আগমন-কথা শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত হইয়াছে।'

এইজন্য জীবগোস্বামী বলিতে চাহেন যে, কুরুক্ষেত্র-যাত্রার পর দন্তবক্র নিহত হইয়াছিল এবং দন্তবক্র-বধের পর শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু কথাটি ভাল বুঝা গেল না।

শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগকে বলিয়াছিলেন যে, শাল্ববধে ব্যাপৃত থাকায় তিনি হস্তিনায় গমন

করিতে পারেন নাই। "আমি গমন করিলে হয়ত দুর্য্যোধন জীবিত থাকিত না, কিম্বা দ্যূতক্রীড়া হইত না।"

তদেতৎ কারণং রাজন্ যদহং নাগসাহ্বয়ম্।
নাগমং পরবীরঘ্ন নহি জীবেৎ সুযোধনঃ॥
ময্যাগতেঽথবা বীর দ্যূতং ন ভবিতাতথা।
অদ্যাহং কিং করিষ্যামি ভিন্নসেতুরিবোদকম্॥—বনপর্ব্ব ২২

ইহা হইতে এইমাত্র বুঝা যায় যে, শাল্ববধের সমকালে পাণ্ডবেরা বনগমন করিয়াছিলেন; এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে কোনও সময়ে কুরুক্ষেত্র যাত্রা হইয়াছিল।

তথা শ্রীবলদেব তীর্থযাত্রা কুরুক্ষেত্রযাত্রাতঃ পূর্ব্বং পঠিতা তত্তীর্থযাত্রা চ দুর্য্যোধনবধদিনে পূর্ণেতি।

'শ্রীবলদেবের তীর্থযাত্রা কুরুক্ষেত্র যাত্রার পূর্ব্বেই ভাগবতে লিখিত হইয়াছে। তাঁহার তীর্থযাত্রা দুর্য্যোধন-বধের দিনে পূর্ণ হইয়াছিল।'

একথা বেশ বোধগম্য হয়। ভাগবতের দশম স্কন্ধে ৭৮ অধ্যায়ে দন্তবক্র-বধের কথা লিখিত হইয়াছে। আর ঐ অধ্যায়ে বলদেবের তীর্থযাত্রার কথাও আছে।

শ্রুত্বা যুদ্ধোদ্যমং রামঃ কুরূণাং সহপাণ্ডবৈঃ
তীর্থাভিষেক ব্যাজেন মধ্যস্থঃ প্রযযৌ কিল॥

৮২ অধ্যায়ে বর্ণিত কুরুক্ষেত্র যাত্রার পূর্ব্বেই, বলদেবের তীর্থযাত্রা ভাগবতে লিখিত হইয়াছে। দুর্য্যোধন-বধের দিন বলদেব তীর্থযাত্রা হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, একথা মহাভারতে স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

দন্তবক্রবধানন্তরং প্রত্যাগমনঞ্চ তস্য পাদ্মোত্তর খণ্ডে স্ফুটং দৃশ্যতে। কৃষ্ণোঽপি তং হত্বা যমুনামুত্তীর্য্য নন্দব্রজং গত্বা সোৎকণ্ঠৌ পিতরাবভিবাদ্যাশ্বস্য তাভ্যাং সাশ্রুকণ্ঠ মালিঙ্গিতঃ সকল গোপবৃদ্ধান্ প্রণম্যাশ্বস্য বহুবস্ত্রাভরণাদিভিস্তত্রস্থান্ সর্ব্বান্ সন্তর্পয়ামাসেতি গদ্যেন।

'দন্তবক্র-বধের পর শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, এ কথা ভাগবতে স্পষ্টরূপে না থাকিলেও পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে স্পষ্ট দেখা যায়। 'কৃষ্ণ দন্তবক্রকে বধ করিয়া যমুনায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি নন্দব্রজে গমন করিয়া উৎকণ্ঠিত পিতা-মাতাকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আশ্বাসবাক্য প্রদান করিয়াছিলেন। নন্দ ও যশোদা সাশ্রুকণ্ঠে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সকল গোপবৃদ্ধকে প্রণামানন্তর আশ্বাসিত করিয়া, প্রভূত বস্ত্রাভরণাদি দ্বারা বৃন্দাবনস্থ সকলকে সন্তর্পিত করিয়াছিলেন।'

জীবগোস্বামীর কথা বজায় থাকিল বটে, কিন্তু আমাদের কায হইল না। কৃষ্ণ যদি একদিনের জন্য বৃন্দাবনে যাইয়া পিতামাতাকে দেখা দিয়া আসেন, তাহা হইলে হয়ত নন্দের নিকট সত্য রক্ষা করা হইবে।

যাতযূয়ং ব্রজং তাত বয়ঞ্চ স্নেহদুঃখিতান্।
জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্॥

কিন্তু ব্রজগোপীর নিকট তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহার কি হইবে? উদ্ধব-

প্রমুখাৎ তিনি যে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন সে ত একদিনের মিলন নয়। সে যে চিরমিলন, নিত্য মিলন। আচ্ছা দেখি, জীবগোস্বামী আর কি বলেন।

অতঃ শ্রীভাগবতেচ ভারতযুদ্ধানন্তরং শ্রীকৃষ্ণস্য দ্বারকাপ্রবেশে প্রথমস্কন্দস্থ দ্বারকাপ্রজাবচনং 'যর্হ্যম্বুজাক্ষা-পসসার ভো ভবান্কুরূন্মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া' ভাঃ পুঃ ১।১১।৯ তত্রমধূন্ মথুরাংশ্চেতি স্বামি টীকাচ সুহৃদশ্চ তদা তত্র শ্রীব্রজস্থা এব।

'ভারত-যুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকা-প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন দ্বারকার প্রজাবর্গ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে অম্বুজাক্ষ, তুমি সুহৃদ্গণকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়া যখন কুরু ও মধু প্রদেশে গমন করিয়াছিলে, তখন এক মুহূর্ত্তও আমাদের কাছে কোটি বৎসর বলিয়া মনে হইয়াছিল। এখানে শ্রীধর স্বামী 'মধু' শব্দের অর্থ মথুরা প্রদেশ বলেন। তাহা হইলেই সুহৃদ্গণ ব্রজবাসী ভিন্ন আর কে হইতে পারে?' এইরূপে জীবগোস্বামী মহাশয় দন্তবক্রবধের অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন প্রত্যাগমন সাব্যস্ত করিলেন। তাহার পর আর একটি নূতন কথার তিনি অবতারণা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিলে, নন্দাদির এক ভাবান্তর হয়। পদ্মপুরাণে সেই গূঢ় কথা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

"তত্রস্থা নন্দাদয়ঃ পুত্রদারসহিতাঃ পশুপক্ষিমৃগাদয়শ্চ বাসুদেবপ্রসাদেন দিব্যরূপধরা বিমানমারূঢ়াঃ পরমং বৈকুণ্ঠ লোকমবাপুরিতি। কৃষ্ণস্তু নন্দগোপ ব্রজৌকসাং সর্ব্বেষাং নিরাময়ং স্বপদং দত্বা দিবি দেবগণৈঃ সংস্তূয়মানো দ্বারবতীং বিবেশেতি চ।"

'বৃন্দাবনবাসী পশু-পক্ষি-মৃগাদি এবং পুত্রদার-সহিত নন্দাদি বাসুদেবের অনুগ্রহে দিব্য-রূপ ধারণ করিয়া বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও নন্দগোপ প্রভৃতি ব্রজবাসীদিগকে নিরাময় নিজপদ প্রদান করিয়া স্বর্গে দেবগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া দ্বারাবতী প্রবেশ করিয়াছিলেন।'

এইবার জীব গোস্বামীর চক্ষু স্থির হইল। একি? নন্দ পুত্র ও যশোদার সহিত বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইলেন। নন্দের পুত্র ত' কৃষ্ণ, নন্দের স্ত্রী যশোদা। তবে নিত্যবৃন্দাবনের কি হইবে?

তত্র নন্দাদয়ঃ পুত্রদার-সহিতা ইতি। শ্রীমন্নন্দস্য তদ্বর্গমুখ্যস্য পুত্রঃ শ্রীকৃষ্ণ এব। দারাচ শ্রীযশোদৈব। ইতি প্রসিদ্ধমপি পুত্রাদি শব্দোক্তা তত্তদ্রূপৈরেব তৈঃ সহ তত্র প্রবেশ ইতি গম্যতে।

'বাস্তবিক পুত্রাদির সহিত নন্দ বৈকুণ্ঠে যান নাই। তত্তৎ রূপবিশিষ্টের সহিত তিনি বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিয়াছিলেন।'

অতো ব্রজং প্রতি প্রত্যাগমনরূপেণ বাসুদেবপ্রসাদেন দিব্যরূপধরা ইতি উল্লাসেন পরম বিরাজমান রূপত্বমেব বিবক্ষিতম্। বিমানেন তেষাং পরমবৈকুণ্ঠপ্রাপনঞ্চ প্রাপঞ্চিকজনস্য বঞ্চনার্থমেব প্রপঞ্চিতম্। বস্তুতস্তু তদ্দৃষ্টে বৃন্দাবনস্যৈব প্রকাশ বিশেষে প্রবেশনং প্রবেশ্য চ তত্র স্থিতানামপ্রকট প্রকাশানামেষু প্রকটপ্রকাশেষন্তর্ভাবনং কৃতম্।

'শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে প্রত্যাগমন এক মহা উল্লাসের কারণ হইয়াছিল। সেই উল্লাসে নন্দ

আদির পরম শোভমান রূপ হইয়াছিল। তাই পদ্মপুরাণে ‘বাসুদেব প্রসাদেন দিব্যরূপ ধরাঃ’ বলা হইয়াছে। বিমান দ্বারা তাঁহাদের বৈকুণ্ঠ প্রস্থাপন—এটা কেবল প্রাকৃত লোকের বঞ্চনার্থ প্রপঞ্চ বাক্য। বাস্তবিক তাঁহারা বৃন্দাবনের অদৃশ্য প্রকাশ-বিশেষে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। সেই অদৃশ্য বৃন্দাবনে তাঁহারা অপ্রকট হইয়াছিলেন। অপ্রকট ও প্রকটরূপের মিলনই পদ্মপুরাণের বৈকুণ্ঠ গমন।’

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইল; কিন্তু কথার মীমাংসা হইল না। পদ্মপুরাণের বাক্য সহজে বঞ্চনা বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে চাহিনা। আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, পদ্মপুরাণের বাক্য ও ভগবানের বাক্য এক। তাহাতে বঞ্চনা নাই। পরন্তু তাহার মধ্যে গূঢ় রহস্য নিবিষ্ট রহিয়াছে। মহাপ্রভুর বাক্য দ্বারা সেই রহস্যের সমাধান করিতে চেষ্টা করিব। হয়ত আমার বামনের প্রয়াস। মহাপ্রভুর অনুগ্রহই একমাত্র বল।

ক্রমশঃ

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

ব্রহ্মানুভূতি।

ভৈরবী, কাওয়ালী।

কিবা প্রয়োজন সন্ন্যাসী-বসনে।
যবে বাসনা হবে বাদ সন্ন্যাসী সাজ মনে ॥
যদি পেতে চাও ব্রহ্মময়ী ধন,
সর্ব্ব জীবে ব্রহ্ম ভাব অনুক্ষণ,
তারই সৃজিত এ তিন ভুবন,
আছেন অন্তরে জড়ে চেতনে ॥
যে ভাবে যেজন করয়ে ভজনা,
সে ভাবে এ ভবে লভে সেই জনা,
কানা অন্ধ খঞ্জ কারু নাই মানা,
জপ জপ নাম যাবে না বিফলে।
ত্যজ মোহ-বাস, অহং-অলঙ্কার,
ত্যজ রিপুকুল বিষম বিকার,
দিবানিশি ভজ সেই নির্ব্বিকার,
জগত-জীবন, জগত কারণে ॥

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

সরল যোগসাধন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভবরোগ হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানকে লাভ করিবার সোপান—যোগ ; ভক্তি-জ্ঞান তাহার সহকারী সাধন-বিশেষ। আত্মাভিমান, অর্থাৎ নিজের-কর্ত্তৃত্ব ভাব, ত্যাগ করিয়া, সাধনেচ্ছু শিষ্য ভবরোগ হইতে মুক্ত হইবার অভিলাষে, শ্রীগুরু সমীপে গমন করিবেন। কারণ শ্রীগুরুদেব স্বয়ং ভগবানের স্বরূপ, ভগবান সগুণ মূর্ত্তিতে শ্রীগুরু-রূপ ধারণ করিয়া আছেন। সাধারণতঃ এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, মনুষ্যকে কিরূপে ভগবান্ বলিয়া ভাবনা করা যায়। সংসারে বাল্যকাল হইতে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহা অবশ্য গুরূপদেশ-সাপেক্ষ। আমাদের বর্ত্তমান অভিজ্ঞতার কিয়দংশ গুরূপদেশলব্ধ ও কিয়দংশ বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও সমাজের প্রথানুসারে লব্ধ হইয়া থাকে। গুরূপদেশ ব্যতীত কোন শিক্ষাই লাভ হয় না। পিতা মাতা ইহজীবনের আদিগুরু, পরে স্ব স্ব বর্ণের আশ্রমোচিত এবং পাঠাভ্যাস কালীন শিক্ষকও গুরু হইয়া থাকেন ; কিন্তু তাঁহাদিগকে ভগবানের সগুণরূপ বলিয়া ভাবিতে পারা যায় না। তবে যোগ জ্ঞান ও ভক্তি-মার্গের গুরুকে কিরূপে ভগবানের সগুণমূর্ত্তি বলিয়া মনে ধারণা করিব ? বস্তুতঃ শিষ্য প্রথমে শ্রীগুরুদেবের মূর্ত্তিতে ভগবান-বুদ্ধি ধারণা করিতে পারে না। শিষ্য যেরূপ ক্রমশঃ সাধন-মার্গে উন্নতি লাভ করিতে থাকে, তদ্রূপ শ্রীগুরু-মূর্ত্তিতে ক্রমে ঈশ্বর-বুদ্ধি ধারণা হইতে থাকে। শিশু যেরূপ নিজ পিতাকে শৈশবাবস্থায় পূজনীয় বলিয়া জ্ঞান করিতে পারে না, ক্রমশঃ যেরূপ শিশুর বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত সংসারে সকল বিষয়ে জ্ঞান জন্মে, এবং সে পিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে, সেইরূপ শিষ্য যতদিন সাধন-মার্গে উন্নত হইতে না পারে, তাবৎ শিশুর ন্যায়, শ্রীগুরুদেব যে ভগবানের সগুণ মূর্ত্তি, তাহা জ্ঞাত হইতে পারে না ; সাধন-মার্গে উন্নত হইয়া জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে, শিষ্যের তখন শ্রীগুরুদেবকে ভগবানের সগুণ মূর্ত্তি বলিয়া জ্ঞান হয়। নদী উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষী ব্যক্তি যেরূপ কাণ্ডারীর প্রতি বিশ্বাস করিয়া তাহার নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করে, তদ্রূপ ধর্ম্মপিপাসু, ভবসাগর পার হইবার অভিলাষে, ভবকাণ্ডারী স্বরূপ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম-রূপ নৌকায় আশ্রয় লইয়া থাকেন।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥—গুরুগীতা।

'অখণ্ড-মণ্ডলাকার অর্থাৎ যাহার আদি-অন্ত নাই, যাহা আকাশের ন্যায় বিশ্ব-চরাচরে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, এইরূপ ব্রহ্মপদ যিনি দেখাইয়া দেন, সেই গুরুদেবকে প্রণাম করি।'

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥—গুরুগীতা।

'যিনি অজ্ঞানরূপ তিমিরে অন্ধ শিষ্যের চক্ষু, জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা প্রস্ফুটিত করিয়া দেন, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান-উপদেশ দ্বারা শিষ্যের অজ্ঞান নষ্ট করিয়া জ্ঞানচক্ষু দান করেন, সেই শ্রীগুরু-পদে প্রণাম।' বস্তুতঃ তাদৃশ মহাত্মাই শ্রীগুরুপদ-বাচ্য।

শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্।
শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্॥
আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ তন্ত্রমন্ত্রবিশারদঃ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে॥ তন্ত্রসার।

'শান্ত' অর্থাৎ যাঁহার স্রক্-চন্দন-বনিতাদি বিষয়-অনুরাগ নাই; যাঁহার অন্তরেন্দ্রিয় বিষয়ের প্রতি মমতা ত্যাগ করিয়া শান্তভাব ধারণ করিয়াছে।

দান্ত—তপঃক্লেশ-শীতোষ্ণাদি-দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, সংযত-বাহেন্দ্রিয়।

কুলীন—অর্থাৎ যিনি সৎকুলোদ্ভব।

বিনীত—বিনয়ী, অভিমানাদি দ্বারা প্রমত্ত নহেন, সতত ক্ষমাশীল।

শুদ্ধবেশবান্—পবিত্র বেশধারী, অর্থাৎ বেশভূষার কোন কপটতা নাই; পবিত্র ধর্ম্মবেশ ধারণ করিয়া ভণ্ড নহেন।

শুদ্ধাচার—আপন বেদোক্ত সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্যে নিরত। যাঁহার আচরণ সতত শুদ্ধ।

সুপ্রতিষ্ঠ—সৎকার্য্যাদির অনুষ্ঠান জন্য যশস্বী।

শুচি—বাহ্যাভ্যন্তর শৌচযুক্ত, পবিত্রাচারী; পুণ্যময়ী জাহ্নবী আদি নদীতে স্নানাদি করিয়া পুষ্কর, প্রয়াগ, কাশী ইত্যাদি তীর্থ-পর্য্যটন করিয়া যাঁহার শরীর সর্ব্বদা পবিত্র।

দক্ষ—অর্থাৎ সকল প্রকার কার্য্যে পারদর্শী।

সুবুদ্ধিমান্—অর্থাৎ যাঁহার বুদ্ধি অসৎমার্গে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সৎমার্গে নিরত।

আশ্রমী—যিনি ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, কিংবা যতি, যে কোন আশ্রমভুক্ত; অর্থাৎ, যাঁহার নির্দ্দিষ্ট যোগ-সাধনোপযোগী আশ্রম আছে, এবং তথায় অতিথি-আদির সৎকার হয়।

ধ্যাননিষ্ঠ—ধারণা-ধ্যান-সমাধিবান্; অর্থাৎ, ধ্যানাদি দ্বারা যিনি আত্মসাক্ষাৎকার-লাভ করিয়াছেন।

মন্ত্র-তন্ত্র-বিশারদ—মন্ত্র-তন্ত্রাদি শাস্ত্রে পারদর্শী।

নিগ্রহানুগ্রহশক্তিবিশিষ্ট—অর্থাৎ, যিনি কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, দ্বেষ আদি রিপুগণকে নিগ্রহ করিয়া অহিংসা, সন্তোষ, দয়া, ক্ষমা, ধৈর্য্যাদি বৃত্তি সকলকে অনুগ্রহ করেন।

বস্তুতঃ এই সকল গুণ-বিশিষ্ট মহাপুরুষ গুরুরূপে সংসারে সকল লোকের বরণীয়।

গু শব্দস্ত্বন্ধকারঃ স্যাদ্রু শব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকার-নিরোধিত্বাদ্ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥ গুরুগীতা।

'"গু" শব্দে অন্ধকার, "রু" শব্দে তাহার নিবারক; অর্থাৎ গুরু অর্থে প্রকাশ। বস্তুতঃ

যিনি শিষ্যের হৃদয়ের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশ করিয়া নিজ-প্রকাশ-স্বরূপে নিজে বিরাজিত হইয়া থাকেন, তিনিই গুরু-পদবাচ্য।' ভগবৎ-প্রেমের পিপাসুগণ এরূপ মনে করিতে পারেন যে, অনেক সময় প্রকৃত গুরুলাভ করা সহজে সংঘটন হয় না ; অতএব যে সকল গ্রন্থে ভগবৎ-গুণানুবাদ, ইষ্ট সাধনের যন্ত্র, মন্ত্র ও তত্ত্বজ্ঞানাদি সন্নিবেশিত আছে, সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া তদনুরূপ সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে পারিলে ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারা যায়। বস্তুতঃ এইরূপে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও তদনুসারে সাধন করিলে কি ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারা যায় ? তাহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। ভক্তচূড়ামণি পঞ্চমবর্ষীয় বালক ধ্রুব একাকী অরণ্য মধ্যে মনের আবেগে প্রাণ ভরিয়া ভগবান্‌কে ডাকিয়াছিলেন ; পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম আদি দেখিয়া শিশু ধ্রুব কাতর হৃদয়ে তাহাদিগকে ভগবান্ বলিয়া আহ্বান করিয়াছিলেন ; কিন্তু সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ সেই সকল বৃক্ষ লতাদি হইতে আবির্ভূত হইয়া ধ্রুবকে দর্শন দেন নাই। পরে নারদ গুরুরূপে তথায় আবির্ভূত হইয়া ধ্রুবের হৃদয়ের তমোরাশি দূর করিয়া, ভগবানের সর্ব্বপ্রকাশময় রূপ দর্শন করাইয়াছিলেন। পিপাসু ব্যক্তির সম্মুখে বিস্তীর্ণ নীরদবর্ণ সমুদ্র থাকিলেও তাহার পিপাসার শান্তি হয় না, লবণাক্ত-জল-পানে তাহার পিপাসার শান্তি না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু সেই জল তমোহা রূপী সূর্য্যদেবের তেজে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া ধারাধররূপ ধারণপূর্ব্বক বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া ধরণীর ও পিপাসু হৃদয়ের পিপাসার তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকে ; বস্তুতঃ ধরণী কিংবা পিপাসুর হৃদয় লবণাক্ত জলে তৃপ্ত হয় না। সেইরূপ ধর্ম্মপিপাসু সাধকগণ স্ব-ইচ্ছায় সমুদ্রবিশেষ শাস্ত্র হইতে ভগবৎ-সাধন-প্রণালী নিজে নির্ব্বাচন করিয়া লইলে পিপাসার নিবৃত্তি হয় না, বরং উত্তরোত্তর 'ইহা জানিব, উহা জানিব, এইরূপ সাধন করিব' ইত্যাদি পিপাসার বৃদ্ধি হয়, এবং অবশেষে তাহারা সংশয়-আবর্ত্তে পড়িয়া ভ্রমচক্রে ঘুরিতে থাকে, ভবসমুদ্র আর উত্তীর্ণ হইতে পারে না, পরে কালরূপ ঊর্ম্মিচক্রে পড়িয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া থাকে।

ইদং জ্ঞানমিদং জ্ঞেয়ং যৎ সর্ব্বং জ্ঞাতুমিচ্ছসি।
অপি বর্ষ সহস্রায়ুঃ শাস্ত্রান্তং নাধি গচ্ছসি ॥—উত্তরগীতা।

'এই বস্তু জ্ঞান, এই বস্তু আমাদের জানিবার যোগ্য, অর্থাৎ, জ্ঞেয় পদার্থ—এই ভাবে সমস্ত পদার্থের তত্ত্ব জানিতে অভিলাষী হইলে সহস্র বর্ষ পরমায়ু হইলেও শাস্ত্ররূপ মহাসাগর পার হইতে পারিবে না, পিপাসাও নিবৃত্তি হইবে না।' সূর্য্য যেরূপ লবণাক্ত জল ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করিয়া তাহা পুনরায় বর্ষণ করেন, এবং লবণাক্ত-দোষ-শূন্য হইলে পিপাসার নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ শিষ্যের হৃদয়ের তমোরাশি নাশ করিয়া, সূর্য্য-সদৃশ গুরু সমুদ্র-বিশেষ শাস্ত্র হইতে মন্ত্র ও সাধন-প্রণালী উদ্ধার করতঃ পুনরায় পিপাসুর হৃদয়ে অর্পণ করিলে পিপাসুর পিপাসা নিবৃত্তি হইয়া তৃপ্তি হইয়া থাকে। সাধনেচ্ছুক পুরুষ প্রকৃত গুরুর অভাবে শাস্ত্র হইতে স্বেচ্ছায় মন্ত্র ও তৎসাধনাদি নির্ব্বাচন করিয়া সাধন-মার্গে প্রবৃত্ত হইলে পিপাসার

নিবৃত্তি হইবে না, অপিচ নানারূপ সংশয় উপস্থিত হইবে। সেই জন্য ধর্ম্ম-পিপাসুগণের সর্ব্বাগ্রে গুরু-করণ বিধেয়। অনেকে এরূপ মনে করেন, সদ্‌গুরু অন্বেষণ জন্য আবার কোথায় বনে বনে জঙ্গলে জঙ্গলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইব, সময় উপস্থিত হইলে সদ্‌গুরু আপনি আসিয়া দর্শন দিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা সকলের ভাগ্যে সকল সময় ঘটে না, সেই জন্য সদ্‌গুরু-লাভের অধিকারী হওয়া শিষ্যের প্রধান কর্ত্তব্য; সে অধিকার একমাত্র বিশ্বাসরূপ ভিত্তির উপর স্থাপিত। বিশ্বাসই ধর্ম্মজীবনের মূল। বৃক্ষের মূলদেশে জলসেচন করিলে যেরূপ বৃক্ষের সমস্ত শাখা-প্রশাখা পল্লবাদি রসপূর্ণ হইয়া পুষ্ট ও ফলবান্ হয়, সেইরূপ গুরুপদে স্থির বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ভক্তি-শ্রদ্ধারূপ বারি সিঞ্চন করিতে পারিলে, সাধকের হৃদয়ে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ ফলে সুশোভিত কল্পবৃক্ষের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

'শিষ্যস্তু কো বা গুরুভক্তএব'॥

'শিষ্য হইবার উপযুক্ত কে?—যাহার অকপট গুরুভক্তি আছে।' এইরূপে ভক্ত শিষ্য গুরু-সমীপে গমন করিয়া প্রার্থনা করিবেন—

কথং তরেয়ং ভবসিন্ধু মেতম্
কা বা গতি র্মে কতমোঽস্ত্যুপায়ঃ।
জানে ন কিঞ্চিৎ কৃপয়াঽবমাং প্রভো
সংসার দুঃখ ক্ষতি মাতনুষ॥—বিবেক চূড়ামণি—৪০।

'প্রভো! এই ভবসাগর আমি কিরূপে পার হইব? আমার গতি কি হইবে? ইহার উপায় কি? আমি অজ্ঞ, কিছুমাত্র হিতাহিত জ্ঞান নাই; কৃপা করিয়া সংসার-দুঃখ হইতে আমায় রক্ষা করুন।'

অহং প্রপন্নোঽস্মি পদাম্বুজং প্রভো
ভবাপবর্গং তব যোগিভাবিতং।
যথাঞ্জসাঽজ্ঞানমপার বারিধিং
সুখং তরিষ্যামি তথানুশাধি মাং॥ রামগীতা-৫।

'হে প্রভো! যোগীদিগের চিন্তনীয় এবং সংসারের মুক্তিদায়ক আপনার পাদ-পদ্মে আমি নিতান্ত অনন্যগতি হইয়া শরণাপন্ন হইতেছি। আপনার যোগ-সাধন-বলে সংসারে মোক্ষ সাধন হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, আমি যে প্রকারে অনায়াসে এই দুস্তর ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারি, আপনি আমাকে সেইরূপ সদুপদেশ প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন।'

আশা নাম নদী মনোরথ জলা তৃষ্ণাতরঙ্গাকুলা।
রাগ গ্রাহবতী বিতর্ক বিহগা ধৈর্য্য দ্রুম ধ্বংসিনী॥
মোহাবর্ত্ত সুদুস্তরাঽতি গহনা প্রোত্তুঙ্গ চিন্তা তটী।
তস্যাঃ পারগতা বিশুদ্ধ মনসো নন্দন্তি যোগীশ্বরাঃ॥—ভর্ত্তৃহরি, বৈরাগ্য-শতক—৪৫।

'আশা নামক এক নদী *। সকল প্রকার মনোরথ তাহার জল; নানারূপ তৃষ্ণাই সেই নদীর তরঙ্গমালা; অনুরাগ তাহাতে মকররূপে অবস্থিত; নদীতে যেরূপ নানা জাতীয় পক্ষী অবস্থান করে, সেইরূপ নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক আশা-নদীর বিহঙ্গ বিশেষ; নদীর উভয় তটস্থ বৃক্ষ সকলের মূল তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে যেরূপ শিথিল হইয়া অবশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মানব-হৃদয়ের তরঙ্গ-বিশেষ তৃষ্ণাই ধৈর্য্যরূপী বৃক্ষের মূল ছেদন করিয়া ধ্বংস করিয়া থাকে; নদীর জলস্রোতের মধ্যে যেরূপ কোন কোন স্থানে আবর্ত্ত (ঘূর্ণী) থাকে, এবং সেই ঘূর্ণীর মধ্যে পতিত হইলে নদীগর্ভে মগ্ন হইতে হয়, সেইরূপ আশা-স্বরূপ ভবনদীতে মোহ সুদুস্তর গহন আবর্ত্ত-বিশেষ, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদিরূপ সংসার-মোহে একবার পতিত হইলে তাহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া অতি সুকঠিন। আর সেই আশারূপ ভবনদীর চিন্তাই অতি উচ্চতট বিশেষ। এইরূপ গহন বৈতরণী নদী যোগীশ্বর জন বিশুদ্ধান্তঃকরণে পার হইয়া পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।'

মাভৈষ্ট বিদ্বংস্তব নাস্ত্যপায়ঃ সংসারসিন্ধোস্তরণেঽস্ত্যুপায়ঃ।
যেনৈব যাতা যতয়োঽস্য পারং তমেব মার্গং তব নির্দ্দিশামি॥ বিবেকচূড়ামণি—৪৫।

'হে বিদ্বন্ শিষ্য! সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায় নাই বলিয়া ভয় করিও না। সংসার-সাগর পার হইবার উপায় আছে; যতিগণ যে উপায় অবলম্বন করিয়া সংসার-পারাবার পার হইয়া থাকেন, সেই মার্গ তোমার প্রতি নির্দ্দেশ করিতেছি।'

আদৌ স্ববর্ণাশ্রমবর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ
কৃত্বা সমাসাদিত শুদ্ধমানসঃ।
সমাপ্য তৎপূর্ব্বমুপাত্তসাধনঃ
সমাশ্রয়েৎ সদ্গুরুমাত্মলব্ধয়ে।—রামগীতা—৭

'সর্ব্বপ্রথমে স্বীয় বর্ণাশ্রমের প্রথানুসারে নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া এবং আমি অন্তর্যামী ভগবানের অধীন হইয়া কার্য্য করিতেছি, এইরূপে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া ও বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।' বাস্তবিক সদ্গুরুর কৃপা না হইলে চিত্ত শুদ্ধ হইতে পারে না, এবং চিত্ত শুদ্ধ না হইলেও সদ্গুরু লাভ হয় না। স্বর্ণকার যেরূপ খনি হইতে সংগৃহীত মলিন স্বর্ণপিণ্ডকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহার মলিনতা দূর করিয়া থাকে, এবং বারংবার যথাযোগ্য তাপ ও আঘাত প্রদান করতঃ ক্রমে সেই পিণ্ডকে ভূষণাকারে পরিণত করিয়া থাকে, (দস্তা, পিত্তল কিম্বা অন্যান্য ধাতু দ্বারা সেরূপ আদরণীয় ভূষণ হয় না), সেইরূপ স্বভাবতঃ গুরুভক্ত শিষ্য মলিনাবস্থায় থাকিয়াও গুরু-পদে আশ্রয় লইলে গুরুর জ্ঞান-উপদেশরূপ অগ্নি দ্বারা তাহার হৃদয়ের মলিনতা দূর হইয়া ক্রমে ভূষণ রূপে জগতের

* এই যে রূপক নদীর কথা ভর্ত্তৃহরি উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাই ভবনদী; জীবের হৃদয়েই বিরাজ করিতেছে, চিত্ত শুদ্ধ হইলে গুরুকৃপায় তাহা অনায়াসে পার হইতে পারা যায়।

আদরণীয় ও পূজ্য হইয়া থাকেন। ভূষণাকারে পরিণত হইবার যোগ্য স্বাভাবিক গুণগুলি স্বর্ণে আছে বলিয়াই স্বর্ণকার তাহাকে গ্রহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ শিষ্যের স্বভাবজ অমানিত্ব, অদাম্ভিকত্ব, অহিংসা, শান্তি, আর্জব, দয়া, সন্তোষাদি দৈবী গুণগুলি থাকিলে তবে স্বর্ণকার-সদৃশ সদ্‌গুরু-সঙ্গলাভ হইয়া থাকে। স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত ক্রিয়ানুষ্ঠান ও তাহার ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিলে, শিষ্যের হৃদয়ে উপরোক্ত গুণগুলি স্বয়ংই উদয় হইয়া থাকে। পতঞ্জলি ঋষি বলিয়াছেন,—

তপঃ স্বাধ্যায় ঈশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ।

তপ অর্থাৎ কায়ক্লেশসাধ্য শাস্ত্রোক্ত ব্রত নিয়মাদি পালন, স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং ঈশ্বরপ্রণিধান অর্থাৎ ভগবানের পূজাদিকে ক্রিয়াযোগ কহে। এইরূপ ক্রিয়াযোগ দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ হইয়া থাকে।

মৈত্রী করুণা মুদিতোপেক্ষাণাং সুখ দুঃখ পুণ্যাপুণ্য বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্ত প্রসাদনম্॥

যোগসূত্র পাঃ, ১।৩৩।

'সুখ, দুঃখ, পুণ্য ও পাপ বিষয়ে যথাক্রমে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা করিলে ইহাতে চিত্তের মলিনতা দূর হইয়া চিত্তপ্রসাদ জন্মে।' পরের সুখ দেখিয়া তাহাতে সুখী হইও; পরের সুখে সুখী হইতে পারিলে তোমার হৃদয়ে ঈর্ষারূপ মলিনতা দূর হইবে। পরের দুঃখ কষ্ট দেখিয়া নিজের দুঃখ কষ্টের ন্যায় জ্ঞান করিবে; নিজের দুঃখ কষ্ট দূর করিতে যেরূপ তুমি সতত চেষ্টা কর, পরের দুঃখ দূর করিবার জন্য তদ্রূপ যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে; ইহাতে তোমার হৃদয়ের হিংসা-দ্বেষাদি মল বিদূরিত হইয়া চিত্ত দয়া-ক্ষমাদি গুণে সুশোভিত হইবে। তোমার নিজের পুণ্যকর্ম্মের শুভানুষ্ঠানে তুমি যেরূপ সন্তোষলাভ করিয়া থাক, সেইরূপ পরের কার্য্যানুষ্ঠানে সন্তোষলাভ করিয়া, সেই পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠানী ব্যক্তিকে আরও উৎসাহ প্রদান করিবে।

পরের পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান দেখিয়া,—অবিধি-পূর্ব্বক হইতেছে, লোক প্রশংসার জন্য পুণ্যকর্ম্ম করিতেছে, কামনাযুক্ত হইয়া দেবসেবা করিতেছে, ইত্যাদি রূপ দোষ দেখা উচিত নহে। আর পুণ্যানুষ্ঠাতা ব্যক্তিকে কোনরূপে নিরুৎসাহ করা উচিত নহে, বরং তাহাকে শুভ-কার্য্যের প্রবৃত্তির জন্য উৎসাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য। আনন্দের সহিত মধুর বাক্যে সদালাপ করিলে চিত্তে ভগবৎকৃপার সঞ্চার হয়। আর এক কথা—সংসারে সকলেরই কিছু না কিছু দোষ আছে, দোষ গুণে মিলিয়াই সৃষ্টি; অতএব আত্মাভিমান-প্রযুক্ত পরের পুণ্য কার্য্য দেখিয়া বৃথা দোষারোপ করিয়া নিজের চিত্ত মলিন করা ও পরের চিত্তকে নিরুৎসাহিত করা সাধকগণের উচিত নয়; বস্তুতঃ প্রকৃত সাত্ত্বিক সাধকগণের এরূপ ইচ্ছাও হয় না। পরের পাপ কার্য্য দেখিয়া তাহাতে ভালমন্দ নিজের কোনরূপ মত প্রকাশ না করিয়া উপেক্ষা করিবে অর্থাৎ উদাসীনবৎ অবস্থান করিবে। যদিও পাপীর পাপাচরণ কার্য্য দেখিয়া তাহার দণ্ডবিধান করিবার নীতি আছে, কিন্তু তাহা সাধকগণের জন্য নহে। ভূপতি

তাঁহার প্রজার পাপাচরণ জ্ঞাত হইয়া নীতি অনুসারে দণ্ডবিধান করিবেন। দুইজন দুষ্ট বালক কর্দ্দমময় পথে কর্দ্দম লইয়া খেলা করিতেছিল, কোন সদ্ব্যক্তি তাহাদিগকে বলিল, "তোমরা কর্দ্দম লইয়া এরূপ কুৎসিৎভাবে কেন খেলা করিতেছ?" এইরূপ বলাতে একটি বালক একখণ্ড প্রস্তর লইয়া কর্দ্দমে নিক্ষেপ করিলে তাহাতে সেই কর্দ্দম সদ্ব্যক্তির সমস্ত গাত্রে লাগিয়া গেল। পরে বালকদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করাতে বলিল, "আমরা ত তোমার গাত্রে কর্দ্দম নিক্ষেপ করি নাই, আমরা খেলা করিতেছি এবং প্রস্তরখণ্ড তোমার গাত্রে কর্দ্দম নিক্ষেপ করিয়াছে; তাহাতে আমাদের দোষ কি?" দুষ্টের দুষ্টকার্য্যে মত প্রকাশ করিলে এইরূপে সময় সময় সৎ ব্যক্তিকেও মলিন হইতে হয়। আর যদি নিজের প্রতাপ থাকে, তবে দুষ্টের দমন করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু ভাই ধার্ম্মিক সাধকগণ! তোমাদের দণ্ড দিবার ক্ষমতা নাই। গুরুদেব প্রথমেই উপদেশ দিয়াছেন,—

"ক্ষমার্জব-দয়া-তোষ সত্যং পীযূষবৎ ভজ।"

নিজের গাত্রে কর্দ্দম লাগিয়াছে বলিয়া যেন বৃথা ক্রোধের উদয় না হয়, দুষ্ট বালকদ্বয়কে ক্ষমা করিতে হইবে, তাহাদের প্রতি দয়া করিতে হইবে এবং সন্তোষের সহিত দুষ্টকে উপেক্ষা করিয়া উদাসীনবৎ নিজের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। এইরূপে প্রত্যেক রাজস ও তামস বৃত্তির বিপরীত সত্যঃ সাত্ত্বিক বৃত্তির উদয় হইলে, ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা, অসূয়া, পরনিন্দা ইত্যাদি মলিনতা দূর হইয়া চিত্ত ক্রমে শুদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপ চিত্ত-শুদ্ধি সদ্‌গুরুর কৃপা ও জন্মান্তরের তপস্যার ফলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ক্রমশঃ

শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

জাগরণ।

বেলা ব'য়ে যায়, ডাকি বার বার, কোথা গো ঘাটের পাটনি!
সাঁজের আঁধার আসে যে ঘনা'য়ে, নিয়ে এস তব তরণী।
নিঃসঙ্গ পথিক, স্নিগ্ধ তরু-তলে, একা পড়েছিনু ঘুমায়ে।
সাঁজের আঁধার আসিছে ঘনায়ে, কেহ দেয় নাই জাগা'য়ে।
নিদাঘ-গগনে মেঘের গর্জ্জন পশিয়াছে আজি শ্রবণে;
দিকে দিকে দেখি উঠিয়াছে ঝড় সভয়-ব্যাকুল-নয়নে।
সুখের স্বপন ভুলে গেছি সব---ভুলে গেছি আমি আমারে।
উঠে'ছে তুফান, ঘাটের পাটনি! অকূল-সাগর পাথারে!
উঠেছে তুফান, দেখ গো চাহিয়ে, ওগো ও ঘাটের পাটনি!
মরণ-আঁধার আসে যে ঘনা'য়ে, নিয়ে এস তব তরণী!

শ্রীমনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

বেদান্ত-পরিভাষা।

[৮]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মূল। ইদমেব 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদিবাক্যানাম্ অখণ্ডার্থত্বং যৎ সংসর্গানবগাহি যথার্থজ্ঞানজনকত্বম্ ইতি। তদুক্তম্,

সংসর্গাসঙ্গসম্যগ্-ধী-হেতুতা যা গিরামিয়ম্।
উক্তাখণ্ডার্থতা যদ্বা তৎপ্রাতিপদিকার্থতা॥

প্রাতিপদিকার্থমাত্রপরত্বং বা অখণ্ডার্থত্বম্ ইতি চতুর্থপাদার্থঃ।

ব্যাখ্যা। এইরূপ "সেই-ই তুমি" প্রভৃতি বাক্যসমূহের অখণ্ডার্থত্ব কি? এই বাক্য গুলি যখন সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত সম্পর্কবিরহিত হইয়া কেবল যথার্থ জ্ঞান উৎপাদন করে, (তখন সেই জ্ঞানই উহার অখণ্ডার্থ। চিৎসুখাচার্য্য কর্ত্তৃক) কথিত হইয়াছে "বাক্যসকলের সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত সম্পর্কহীন যথার্থ জ্ঞানের যাহা হেতু, তাহাই অখণ্ডার্থতা। অথবা প্রাতিপদিকের অর্থতাই অখণ্ডার্থতা।"

চতুর্থ পাদটির অর্থ এই, "কেবল মাত্র প্রাতিপদিকের অর্থ বোধজনকত্বই অখণ্ডার্থত্ব।"

মূল। তচ্চ প্রত্যক্ষং পুনর্দ্বিবিধং জীবসাক্ষী ঈশ্বরসাক্ষী চেতি। তত্র জীবো নাম অন্তঃকরণাবচ্ছিন্নং চৈতন্যং, তৎসাক্ষী তু অন্তঃকরণোপহিতং চৈতন্যম্। অন্তঃকরণস্য বিশেষণত্বোপাধিত্বাভ্যাম্ অনয়োর্ভেদঃ। বিশেষণঞ্চ কার্য্যান্বয়ি, উপাধিশ্চ কার্য্যানন্বয়ী, ব্যাবর্ত্তকো বর্ত্তমানশ্চ। "রূপবিশিষ্টো ঘটোঽনিত্য" ইত্যত্র রূপং বিশেষণং, "কর্ণশষ্কুল্যবচ্ছিন্নং নভঃ শ্রোত্রম্" ইত্যত্র কর্ণশষ্কুল্যুপাধিঃ। অয়মেবোপাধি-র্নৈয়ায়িকৈঃ পরিচায়ক ইত্যুচ্যতে।

প্রকৃতে চান্তঃকরণস্য জড়তয়া বিষয়ভাসকত্বাযোগেন বিষয়ভাসকচৈতন্যো-পাধিত্বম্, অয়ঞ্চ জীবসাক্ষী প্রত্যাত্মং নানা, একত্বে তু চৈত্রাবগতে মৈত্রস্যাপ্যনু-সন্ধান-প্রসঙ্গঃ।

ব্যাখ্যা। [পূর্ব্বে প্রত্যক্ষের সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পকরূপ দুই ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রত্যক্ষের আর এক প্রকার বিভাগ দেখান হইতেছে।] সেই প্রত্যক্ষ আবার (আর এক রকমে) দুই প্রকার। জীবসাক্ষী ও ঈশ্বরসাক্ষী। অন্তঃকরণ দ্বারা বিশিষ্ট চৈতন্য জীব ও অন্তঃকরণ দ্বারা জনিত চৈতন্য জীব-সাক্ষী। অন্তঃকরণকে বিশেষণ ও উপাধি এই দুই ভাবে ধরিলে (জীব ও জীবসাক্ষী) এই উভয়ের ভেদ প্রতীয়মান হয়।

[বাস্তবিক কিন্তু চৈতন্যটি এক। একই বস্তুকে দুই ভাবে ধরাতে ভেদ কল্পনা হইতেছে।] বিশেষণ কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট। উপাধি কার্য্যের সহিত অসংশ্লিষ্ট, ব্যাবর্ত্তক (অন্য সকল বস্তু হইতে পৃথক্-কারক) ও বর্ত্তমান। "অনিত্য ঘট রূপ-বিশিষ্ট" এখানে 'রূপ' বিশেষণ; "কর্ণশস্কুলীবিশিষ্ট আকাশ শ্রোত্র" এখানে কর্ণশস্কুলী (কর্ণের বহির্দৃশ্যমান চর্ম্মময় অংশ) উপাধি। এই উপাধিই নৈয়ায়িকগণ কর্ত্তৃক 'পরিচায়ক' নামে কথিত হইয়াছে।

এখানে অন্তঃকরণ, বিষয়-প্রকাশক জ্ঞানের উপাধি; কেননা অন্তঃকরণ জড়, তাহার নিজের কোনও বিষয় প্রকাশ করিবার শক্তি নাই।

এই জীবসাক্ষী প্রতি আত্মায় বিভিন্ন। যদি জীবসাক্ষী একটিমাত্র হইত, তাহা হইলে চৈত্রের কোন বিষয়ে জ্ঞান হইলে, মৈত্রেরও তাহার চিন্তনাদি হইতে পারিত।

মূল। ঈশ্বর-সাক্ষী তু মায়োপহিতং চৈতন্যং, তচ্চৈকং, তদুপাধি-ভূতমায়ায়া একত্বাৎ। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" ইত্যাদি-শ্রুতৌ মায়াভিরিতি বহুবচনস্তু মায়াগতশক্তিবিশেষাভিপ্রায়তয়া মায়াগত-সত্ত্ব-রজ-স্তমোরূপগুণাভি-প্রায়তয়া চোপপত্তিঃ।

"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্",
"তরত্যবিদ্যাং বিততাং হৃদি যস্মিন্নিবেশিতে।
যোগী মায়ামমেয়ায় তস্মৈ বিদ্যাত্মনে নমঃ॥"
"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥"

ইত্যাদি-শ্রুতিষু একবচনেন লাঘবানুগৃহীতেন মায়ায়া একত্বং নিশ্চীয়তে।

ততশ্চ তদুপহিতং চৈতন্যম্ ঈশ্বরসাক্ষী, তচ্চানাদি, তদুপাধের্মায়ায়া অনাদিত্বাৎ। মায়াবচ্ছিন্নং চৈতন্যঞ্চ পরমেশ্বরঃ মায়ায়া বিশেষণত্বে ঈশ্বরত্বং, উপাধিত্বে সাক্ষিত্বং, ইতীশ্বরত্বসাক্ষিত্বয়োর্ভেদঃ, ন তু ধর্ম্মিণোরীশ্বরতৎসাক্ষিণোঃ।

স চ পরমেশ্বর একোঽপি স্বোপাধিভূতমায়ানিষ্ঠসত্ত্বরজস্তমোগুণভেদেন ব্রহ্ম-বিষ্ণুমহেশ্বরাদি শব্দবাচ্যতাং ভজতে।

ব্যাখ্যা। মায়া দ্বারা জনিত চৈতন্যই ঈশ্বরসাক্ষী। এই চৈতন্যের উপাধি মায়া এক, বহু নহে। কাজেই এই চৈতন্যও এক। [কিন্তু ঋগ্বেদে (৬।৪৭।১৮) একস্থলে 'মায়া' শব্দটি বহুবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহা হইতে আমরা বলিতে পারি যে, মায়া এক নহে—বহু, নহিলে ঋগ্বেদে উহা একবচনে ব্যবহৃত না হইয়া বহুবচনে ব্যবহৃত হইল কেন? তাহার মীমাংসা করা হইতেছে।] "ইন্দ্র মায়াসকলের দ্বারা বহুরূপ ধারণ করেন" প্রভৃতি

শ্রুতিতে "মায়াভিঃ" এই বহুবচন, মায়াগত বিবিধ শক্তি বুঝাইবার জন্য ও মায়াগত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ বুঝাইবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে। [মায়া একটি, কিন্তু তাহার বিবিধ শক্তি ও গুণ আছে। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে মায়ার এই বিবিধ শক্তি ও গুণ বুঝাইবার জন্যই বহুবচন প্রয়োগ করা হইয়াছে।]

[নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যসমূহে সংক্ষেপার্থ মায়া একবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে নিশ্চিত বুঝা যাইবে যে, মায়া একটিমাত্র] "মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে ও মহেশ্বরকে মায়াবিশিষ্ট বলিয়া জানিবে।"— শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৪।১০।

"যোগী যাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া বিস্তৃত মায়া অতিক্রম করেন, চৈতন্যস্বরূপ অপ্রমেয় তাঁহাকে নমস্কার।"

"লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ তিন বর্ণে প্রতিস্ফুট) নিজের ন্যায় বহু প্রজা সৃষ্টিকারিণী এক উৎপত্তিরহিত (মায়াকে) এক উৎপত্তিরহিত (মায়ার যথার্থ তত্ত্বে অনভিজ্ঞ) উপভোগ করে (অর্থাৎ মায়ার কার্য্য প্রভৃতিতে তাদাত্ম্যবুদ্ধি প্রাপ্ত হয়)। অপর উৎপত্তিরহিত ঈশ্বর, বিবেকী বা পুরুষ। উপভুক্তা ইহাকে পরিত্যাগ করে (মায়াপাশ দূর করে)।"— শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৪।৫।

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতি প্রভৃতিতে সংক্ষেপার্থ গৃহীত একবচনের দ্বারা মায়ার একত্ব নিশ্চয়রূপে নির্ণীত হইতেছে।

এখন মায়ার দ্বারা উপহিত চৈতন্য ঈশ্বর সাক্ষী। এই চৈতন্য অনাদি, কেননা তাহার উপাধি মায়া অনাদি। মায়া দ্বারা বিশিষ্ট চৈতন্য পরমেশ্বর। মায়াটিকে একবার বিশেষণভাবে ও একবার উপাধিভাবে লইলে ঈশ্বরত্ব ও সাক্ষিত্বের মধ্যে ভেদ কল্পনা করিতে পারি। বাস্তবিক কিন্তু ধর্ম্মী ঈশ্বর ও ঈশ্বরসাক্ষী—এই দুইয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। [মায়াকে বিশেষণ ও উপাধি এই উভয়রূপ কল্পনা করিয়া একই চৈতন্যকে দুই দিক্ হইতে দেখি। তাহাতেই উভয়ের যেন ভেদ বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ কিন্তু চৈতন্য সেই একটিই। ঈশ্বরত্ব ও সাক্ষিত্বের মধ্যেই ভেদ। ঈশ্বর ও ঈশ্বরসাক্ষীর মধ্যে ভেদ নাই]।

সেই পরমেশ্বর এক হইলেও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি শব্দবাচ্য হন। পরমেশ্বরের উপাধি মায়া। সেই মায়াতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণভেদ বর্ত্তমান। পরমেশ্বরও এই নিজ উপাধির গুণভেদে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি নামে কথিত হন।

মূল। **ননু ঈশ্বরসাক্ষিণোরনাদিত্বে "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদৌ সৃষ্টিপূর্ব্বসময়ে পরমেশ্বরস্যাগন্তুকমীক্ষণমুচ্যমানং কথম্ উপপদ্যতে? উচ্যতে। যথা বিষয়েন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদিকারণবশেন জীবোপাধ্যন্তঃকরণস্য বৃত্তিভেদা জায়ন্তে তথা সৃজ্যমানপ্রাণিকর্ম্মবশেন পরমেশ্বরোপাধিভূতমায়ায়া বৃত্তিবিশেষাঃ "ইদমিদানীং**

স্রষ্টব্যম্" "ইদমিদানীং পালয়িতব্যম্" "ইদমিদানীং সংহর্ত্তব্যম্" ইত্যাদ্যাকারা জায়ন্তে, তাসাঞ্চ বৃত্তীনাং সাদিত্বাৎ, তৎপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যমপি সাদীত্যুচ্যতে।

ব্যাখ্যা। ঈশ্বরসাক্ষীকে অনাদি বলা হইয়াছে।] কিন্তু ঈশ্বর-সাক্ষী অনাদি হইলে ছান্দোগ্যোপনিষদের (৬।২।৩) নিম্ন বাক্য সকলের কিরূপে সঙ্গতি হইতে পারে? ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হইয়াছে, "সে (ব্রহ্ম) দেখিল, আমি বহু হইব, সৃষ্টি করিব।" [এই বাক্যসমূহে সৃষ্টির পূর্ব্বকার কথা বলা হইতেছে। ব্রহ্ম সৃষ্টির ইচ্ছা করিলেন, তাহার পর সৃষ্টি হইল। এই ইচ্ছা তাঁহার আগে ছিল না, সুতরাং ইচ্ছা প্রভৃতি অনাদি নয়, আদিযুক্ত। কিন্তু পূর্ব্বে ঈশ্বরসাক্ষীকে অনাদি বলিয়া আসিয়াছি। এখন এই উভয়ের সামঞ্জস্য হইবে কিরূপে?] উত্তর দিতেছি। যেমন দ্রব্য ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ প্রভৃতি কারণ হেতু জীবের উপাধি-স্বরূপ অন্তঃকরণের বিবিধ বৃত্তি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ যে সকল প্রাণী সৃষ্ট হইবে, তাহাদের কর্ম্ম দ্বারা পরমেশ্বরের উপাধিস্বরূপ মায়ার, "এবার ইহা সৃষ্টি করিব", "এবার ইহা পালন করিব", "এবার ইহা ধ্বংস করিব", প্রভৃতি বৃত্তি-সমূহ উৎপন্ন হয়। এই সকল বৃত্তি আদিযুক্ত, কাজেই তাহাতে প্রতিফলিত চৈতন্যকেও আদিযুক্ত বলা হইয়াছে।

মূল। এবং সাক্ষিদ্বৈবিধ্যেন প্রত্যক্ষজ্ঞানদ্বৈবিধ্যং প্রত্যক্ষত্বঞ্চ জ্ঞেয়গতং জ্ঞপ্তিগতঞ্চ নিরূপিতম্। তত্র জ্ঞপ্তিগতপ্রত্যক্ষত্বস্য সামান্যলক্ষণং চিত্ত্বমেব, "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" ইত্যাদৌ অপি বহ্ন্যাদ্যাকারবৃত্ত্যুপহিতচৈতন্যস্য স্বাত্মাংশে স্বপ্রকাশতয়া প্রত্যক্ষত্বাৎ। তত্তদ্বিষয়াংশপ্রত্যক্ষত্বন্তু পূর্ব্বোক্তমেব। তস্য চ ভ্রান্তিরূপপ্রত্যক্ষে নাতিব্যাপ্তিঃ, ভ্রমপ্রমাসাধারণ প্রত্যক্ষত্বসামান্যনির্ব্বচনে তস্যাপি লক্ষ্যত্বাৎ। যদা তু প্রত্যক্ষপ্রমায়া এব লক্ষণং বক্তব্যং তদা পূর্ব্বোক্ত-লক্ষণেঽবাধিতত্বং বিষয়বিশেষণং দেয়ম্, শুক্তিরূপ্যাদিভ্রমস্য সংসারকালীনবাধবিষয়প্রাতিভাসিক-রজতাদিবিষয়কত্বাৎ।

ব্যাখ্যা। এইরূপ দ্বিবিধ সাক্ষী হইতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরও দুই প্রকার ভেদ—জ্ঞেয়গত প্রত্যক্ষ ও জ্ঞপ্তিগত প্রত্যক্ষ নিরূপিত হইতেছে। [জ্ঞেয়গত অর্থাৎ বিষয়গত,—যে দ্রব্য প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহার সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট। জ্ঞপ্তিগত অর্থে জ্ঞানগত,—জ্ঞানের সহিত প্রত্যক্ষত্বের সম্বন্ধ।] এখন জ্ঞপ্তিগত প্রত্যক্ষের সাধারণ সংজ্ঞা এই "[প্রত্যক্ষ কেবল] চৈতন্যমাত্র"। "পর্ব্বত বহ্নিমান্" ইত্যাদি স্থলে বহ্নি-প্রভৃতির আকারধারী বৃত্তির দ্বারা জনিত যে জ্ঞান, তাহাই প্রত্যক্ষ হয়। কেননা চৈতন্য নিজেই নিজকে প্রকাশ করে। এবং এই সকলের বিষয়গত প্রত্যক্ষের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

['পর্ব্বত বহ্নিমান্' এই অনুমিতিস্থলে পর্ব্বত সম্মুখে রহিয়াছে। ধূমও দেখিতেছি।

এখানে ধূম ও পর্ব্বত প্রত্যক্ষের বিষয়। বহ্নি নহে। বহ্নি অনুমান করিতেছি। কাজেই যদি বিষয়গত প্রত্যক্ষের কথা ধরি, তাহা হইলে 'বহ্নি' এস্থলে অপ্রত্যক্ষ।

কিন্তু জ্ঞানগত প্রত্যক্ষের কথা ধরিলে বহ্নিবিষয়ক জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলিতে পারা যায়। কাজেই বিষয়গত ও জ্ঞানগত এই উভয় ভেদ প্রত্যক্ষে দেখান হইল।]

[পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষের সংজ্ঞাতে অতিব্যাপ্তি দোষ হইবে না। যদি আপত্তি কর যে, পূর্ব্বোক্ত সংজ্ঞা মানিয়া লইলে শুক্তি দেখিয়া রজত-জ্ঞানরূপ ভ্রম প্রত্যক্ষেও উহা প্রযুক্ত হইবে। আমাদের উত্তর এই ;—] তাহার (উক্ত সংজ্ঞার) ভ্রান্তিরূপ প্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্তি (দোষ) হইবে না। [আমরা] যথার্থ ও অযথার্থ (ভ্রান্ত) প্রত্যক্ষের যে সাধারণ সংজ্ঞা দিয়াছি, তাহার মধ্যে উহাও (ভ্রান্তিরূপ প্রত্যক্ষও) পড়িয়াছে। যখন কেবল যথার্থ প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা বলিতে হইবে, তখন পূর্ব্বোক্ত লক্ষণে "বিষয়" শব্দটির সহিত 'অবাধিত' এই বিশেষণটি দিলেই হইবে। শুক্তিতে রজত ভ্রম প্রভৃতি স্থলে, মিথ্যা রজত প্রভৃতি বিষয় সংসারদশাতেই বাধিত হইয়া থাকে।

[পূর্ব্বে প্রত্যক্ষের এই সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে "স্বাকারবৃত্ত্যুপহিত প্রমাতৃচৈতন্য-সত্তাতিরিক্তসত্তাকত্বশূন্যত্বে সতি যোগ্যত্বং বিষয়স্য প্রত্যক্ষত্বম্।" এই সংজ্ঞা যথার্থ প্রত্যক্ষে এবং ভ্রান্তিরূপ প্রত্যক্ষে খাটিবে। তবে যদি ভ্রান্তিরূপপ্রত্যক্ষকে বাদ দিয়া কেবল যথার্থ প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে "সতি যোগ্যত্বং" ইহার পর "বিষয়স্য" এই শব্দটির পরিবর্ত্তে "অবাধিত বিষয়স্য" এই শব্দটি ব্যবহার করিলেই চলিবে।]

মূল। নন্বু বিসম্বাদিপ্রবৃত্ত্যা ভ্রান্তিজ্ঞানস্য বিষয়সিদ্ধাবপি তস্য প্রাতিভাসিক-তৎকালোৎপন্নরজতাদিবিষয়কত্বে ন প্রমাণং, দেশান্তরীয়রজতস্য কৢপ্তস্যৈব তদ্বি-ষয়ত্বসম্ভবাদিতি চেৎ, ন, তস্য অসন্নিকৃষ্টতয়া প্রত্যক্ষ বিষয়ত্বাযোগাৎ। ন চ জ্ঞানং তত্র প্রত্যাসত্তিঃ, জ্ঞানস্য প্রত্যাসত্তিত্বে তত এব বহ্ন্যাদেঃ প্রত্যক্ষত্বাপত্তৌ, অনুমানাদ্যুচ্ছেদাপত্তেঃ।

ব্যাখ্যা। বেদান্তবাদী বলিতেছেন, শুক্তিতে রজত ভ্রম হয়। ইহা প্রাতিভাসিকী সত্তা অর্থাৎ মিথ্যা অস্তিত্বজ্ঞান। যথার্থ রজত সেখানে থাকে না বটে, কিন্তু সেই খানেই রজত জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। নৈয়ায়িক বলেন, ইহা প্রাতিভাসিকী সত্তা নয়, অন্যথাখ্যাতি। নৈয়ায়িকের মতে, পূর্ব্বে কোনও স্থলে আমরা রজত দেখিয়াছিলাম, তাহাই ভ্রমবশতঃ এখানে শুক্তিতে দেখিতেছি। বেদান্তবাদী নৈয়ায়িকের দোষ দেখাইয়া বলিতেছেন, "তাহা কিরূপে হইবে? ইন্দ্রিয়ের সহিত কোনও বিষয়ের সন্নিকর্ষ হইলে তবে ত প্রত্যক্ষ হইবে? অন্যত্র বিদ্যমান রজতের সহিত কিরূপে ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ হইতে পারে? কাজেই অন্যত্র-দৃষ্ট রজত শুক্তিতে দেখিতেছি, এরূপ বলা চলিতে পারে না।"

ন্যায়মতে লৌকিক ও অলৌকিক দুইপ্রকার প্রত্যক্ষ আছে। অলৌকিক প্রত্যক্ষের

সন্নিকর্ষ (বা প্রত্যাসত্তি) তিন প্রকার। নৈয়ায়িক বলেন, অলৌকিক প্রত্যক্ষের তিন প্রকার সন্নিকর্ষের মধ্যে জ্ঞানলক্ষণাপ্রত্যাসত্তি (জ্ঞানবিষয়ক * সন্নিকর্ষ) দ্বারা ভ্রমজ্ঞান বুঝান যাইতে পারে। পূর্ব্বে চন্দন আঘ্রাণ করিয়া জানিয়াছি, ইহার সৌরভ আছে। এখন দূর হইতে চন্দন দেখিয়া ঘ্রাণ না লইয়াই বলিলাম, 'সুরভি চন্দন'। এইরূপে পূর্ব্বে দৃষ্ট রজত হইতে রজতত্ব জ্ঞান আছে, তাহা শুক্তিতে হওয়াতে অলৌকিক প্রত্যক্ষ হইতেছে সুরভি চন্দনের বেলা যথার্থ জ্ঞান হইয়াছিল, এখানে না হয় ভ্রম-জ্ঞান হইতেছে ; তাহাতে কিছু আসে যায় না। ইহাই নৈয়ায়িকের কথা

বেদান্তবাদী নৈয়ায়িককে বলিতেছেন, এরূপ কথা বলিলে তোমার অনুমান প্রভৃতি প্রমাণেও এইরূপ ঘটিবে। 'পর্ব্বত বহ্নিমান্" এই অনুমিতিতে ধূম দেখিয়াই 'বহ্নির' রূপ অলৌকিক প্রত্যক্ষ হউক না কেন, বহ্নি অনুমান করার দরকার কি ?" নৈয়ায়িকের এ কথায় নিরস্ত হইতে হইল ; নহিলে অনুমান প্রভৃতি প্রমাণেও অলৌকিক প্রত্যক্ষ আসিয়া পড়ে।]

এখন নিষ্ফল চেষ্টা দ্বারা ভ্রান্তিজ্ঞানের একটি বিষয় আছে, তাহা যেন মানিলাম। [শুক্তিতে রজতভ্রম করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে গেলে যে নিষ্ফল চেষ্টা হইবে, তাহা হইতে ভ্রম-জ্ঞানের যে একটি বিষয় আছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।] কিন্তু সে বিষয়টি যে তৎকালে উৎপন্ন মিথ্যা রজতাদি বিষয় তাহার প্রমাণ কি ? অন্য দেশস্থিত রজতও ত' তাহার বিষয় হইতে পারে। [বেদান্তবাদী নৈয়ায়িকের এই কথার উত্তরে বলিতেছেন] না, (অন্যদেশস্থিত রজত) যখন নিকটে নাই তখন "(ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ জন্য জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্" এই সংজ্ঞা অনুসারে অসন্নিকৃষ্ট বলিয়া তাহা প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না। জ্ঞান সেখানে প্রত্যাসত্তি (সন্নিকর্ষ) নহে। জ্ঞানকে প্রত্যাসত্তি বলিয়া ধরিলে ঐ নিয়মে [পর্ব্বত বহ্নিমান্' প্রভৃতি অনুমিতি স্থলেও] বহ্নিপ্রভৃতি (অনুমান-সাধ্য বস্তু) প্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে। ['পর্ব্বত বহ্নিমান্' এস্থলে ধূম দেখিয়া বহ্নি অনুমান করি। কিন্তু জ্ঞানকে প্রত্যাসত্তি বলিয়া ধরিলে বহ্নি অলৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া পড়িবে। এবং] অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ নির্ম্মূল হইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

* "লক্ষণ-শব্দস্তু বিষয়োঽর্থঃ"।—সিদ্ধান্তমুক্তাবলী।

মলিনার আত্ম-কাহিনী।

১। কালোপাখী।

কোথা হ'তে এক কালো পাখী আসি' সঙ্গীতে চিত হরি'
পরাণ কাড়িয়া গেলরে উড়িয়া, না পানু নাগাল মরি!
কাছে এসেছিল, বুঝি ধরা দিল, উল্লাসে বাড়ানু হাত,
ধরি' ধরি' করি' ধরিতে নারিনু, মাথায় বজর পাত!

সে অবধি হায় ঢুঁড়ি বনে বনে, ডালে ডালে রাখি আঁখি,
পাতার শবদে চমকিয়া চাই কেঁদে উঠি থাকি থাকি।
এখনো যে তার কানে বাজে সুর, মরমে মূরতি হেরি,
সে ত নহে কালো, মরমের আলো, খুঁজি তারে বেরি বেরি*।

পাগলিনী পারা খুঁজি' দেশে দেশে পশিনু বরজ†-ধাম,
সহসা শুনিনু ডাকিতেছে পাখী ধরিয়া আমার নাম।
শিহরি' শবদে হেরিনু উরধে হেম-পিঞ্জর পাশে,
কনক-বরণী রাজার ঝিয়ারী কালো পাখী নিয়ে হাসে!

দেয় করতালি, নাচে তালে তালে, বঙ্কিম আঁখি ঠারে;
বুঝিনু আমার ভেঙ্গেছে কপাল, আর না পাইব তারে।
সে রাজ-কুমারী, নিরমল নারী, পাখী নিয়ে করে খেলা,
কেন না সে পাখী পাগলা ভিখারী আমারে করিবে হেলা?

লাজ-মাথা খেয়ে মুখপানে চেয়ে রহিনু ক্ষণেক কাল,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কাঁদিল মরম, ধরমে পূরিল ভাল।
ভাবিলাম, গিয়া ধরি' দুটি পায় মাগিয়া আনিব পাখী,—
সরমে, ভরমে পদ না উঠিল, নীরবে ঝরিল আঁখি।

ভকতি-বিহীনা হায় যে মলিনা নারী মাঝে অভাগিনী,
পাখীর বুলিতে পাগলিনী হ'য়ে ছুটে এনু একাকিনী।
গেহ তেয়াগিনু, পাখী না পাইনু, উদাসিনী হ'য়ে ফিরি,
বনে বনে বনে স্বর-পাশ শুধু রহে সদা মোরে ঘিরি!

২। ব্রজ-ধাম।

ছাড়িতে না সরে মন, না চলে চরণ,
পরাণ কাড়িয়া নিল বরজ-ভুবন।
বরজের তরুলতা, বরজের ফুল,
বধুর পরশ ঢালি' করিল আকুল।
বধুর চরণ-রেণু বরজের ধূলি,
বধুর মধুর নাম গায় পাখীগুলি।
ওনহে যমুনা, ওযে বাঁশরীর সুর,
ভাবের লহরে দোলে রস ভরপূর।
শ্যামলী, ধবলী নহে, যশোদার প্রাণ
ধরিয়া গাভীর দেহ করে ক্ষীর-দান।
চলে ব্রজ-গোয়ালিনী মাথে ল'য়ে ভার,
দুধের পসরা ঘন পিরীতির সার।
ধরণী ধূলির দেহ, বরজ হৃদয়,
সে বরজে মলিনার প্রাণ পড়ে' রয়!

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

---

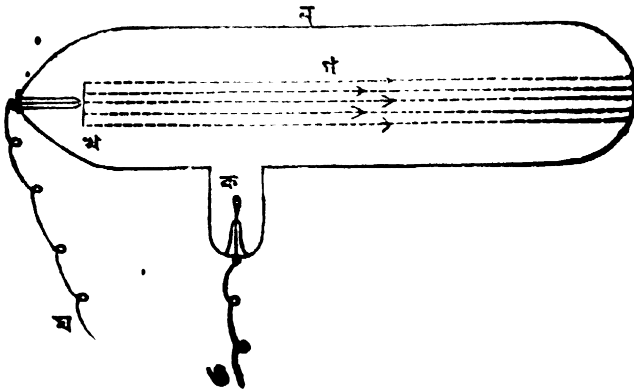
* বেরি বেরি—বারবার, † বরজ—ব্রজ

নূতন ও পুরাতন বিজ্ঞান।

(বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে পঠিত)

পদার্থতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রাচীন ঋষিগণের সহিত আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মতবিরোধ চিরপ্রসিদ্ধ; কিন্তু এতদিনে সেই বিরোধের সমাধান হইবার উপক্রম হইয়াছে। বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই বৈজ্ঞানিকগণ প্রাচীন ঋষিগণের প্রজ্ঞালব্ধ তত্ত্বগুলি একে একে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছেন। প্রাচীন বিজ্ঞানের সহিত নূতন বিজ্ঞানের এই অপূর্ব্ব সমন্বয় কিরূপভাবে সাধিত হইতেছে তাহাই প্রদর্শন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কোন সম্পূর্ণ শূন্যগর্ভ কাচনলের ভিতর নিরতিশয়-বিরলীকৃত (extremely rarefied) বায়ু বা অন্য কোন বাষ্প অত্যল্প পরিমাণে রাখিয়া তন্মধ্যে তাড়িত-প্রবাহ চালনা করিলে নলাভ্যন্তরে বিচিত্র রশ্মির বিকাশ দেখা যায়। এই রশ্মি তাড়িত-যন্ত্রের স্ত্রী-মেরু-(negative pole) সংলগ্ন ধাতু-পত্র হইতে নির্গত হয়। তাড়িতযন্ত্রের স্ত্রী মেরু-সংলগ্ন ধাতুপত্রকে ইংরাজিতে ক্যাথোড (kathode) বলে, তজ্জন্য এই রশ্মিকে "ক্যাথোড-রশ্মি" (kathode ray) নাম দেওয়া হইয়াছে (নিম্নে চিত্র দেখুন)। সুপ্রসিদ্ধ সার উইলিয়ম্ ক্রুক্‌স্ (Sir William Crookes)-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ নানা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে এই রশ্মি সাধারণ আলোকের ন্যায় ইথার (ether)-তরঙ্গ মাত্র নহে, পরন্তু অতি ক্ষুদ্র জড়-কণার দ্বারা ইহা গঠিত। এই কণাগুলি কি পদার্থ?



ন—শূন্যগর্ভ কাচনল।
ক—পুংমেরু-সংলগ্ন ধাতুপত্র (Anode)।
খ—স্ত্রীমেরু-সংলগ্ন ধাতুপত্র (Kathode)।
গ—ক্যাথোড্ রশ্মি।
ঘ—যন্ত্র-সংলগ্ন স্ত্রী-তাড়িতবাহী তার।
ঙ—যন্ত্র-সংলগ্ন পুং-তাড়িতবাহী তার।

যে পদার্থ (বা যে সকল পদার্থ) জগতের আদি উপাদান—যতদূরসাধ্য বিশ্লেষণ করিলেও যাহা রূপান্তরিত হয় না, তাহাকে মূলভূত element) কহে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতে এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে সোণা, রূপা, অঙ্গার, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতি ৮০।৯০ প্রকার মূলভূত আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের পরমাণু atom) স্বতন্ত্র। এক প্রকার পরমাণু অন্য প্রকার পরমাণু হইতে কি আকার, কি গুণ, কি গুরুত্ব সকল বিষয়েই বিভিন্ন। সুতরাং এক প্রকার পরমাণু লইয়া অন্য প্রকার পরমাণু গড়া যায় না, একপ্রকার মূলভূত অন্য মূলভূতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না (Law of the conservation of the elements)। পরমাণু মূলভূতের চরম ভগ্নাংশ, তাহা আর ভাঙ্গিবার উপায় নাই। সকল প্রকার পরমাণুর মধ্যে হাইড্রোজেন বাষ্পের পরমাণু লঘুতম ও ক্ষুদ্রতম। সুতরাং হাইড্রোজেন বাষ্পের পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অণু থাকিতে পারে ইহা বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু বৈজ্ঞানিকপ্রবর টমসন সাহেব (Sir J. J. Thomson) হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ক্যাথোড রশ্মির এক একটী কণা গুরুত্বে হাইড্রোজেন-পরমাণুর ১/১৭০০ অংশ মাত্র এবং ইহার ব্যাসার্দ্ধ হাইড্রোজেন-পরমাণুর ব্যাসার্দ্ধের লক্ষভাগের এক ভাগ। টমসন সাহেব এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণাগুলির নাম দিয়াছিলেন কর্পাস্‌ল্ (corpuscle) ; এখন ইহাদিগকে সাধারণতঃ ইলেক্‌ট্রন (electron) বা তাড়িতাণু নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

ক্রুক্‌স্ সাহেব যখন তাড়িতাণু আবিষ্কার করেন তখন তিনি ইহাদিগকে জ্যোতিষ্ময় পদার্থ (radiant matter) আখ্যা দিয়াছিলেন। তিনি বলেন, ইহা পদার্থের চতুর্থ অবস্থা (fourth state of matter)। পূর্ব্বে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে পদার্থের ক্ষিতি বা কঠিন (solid), অপ বা তরল (liquid), এবং তেজঃ বা বাষ্প (gas) এই তিন অবস্থা মাত্র স্বীকৃত হইত। কিন্তু এখন দেখা গেল যে তেজঃ বা বাষ্প অপেক্ষাও সূক্ষ্মাকার পদার্থ আছে। বস্তুতঃ ইলেক্‌ট্রন্ আবিষ্কৃত হওয়াতে আমরা আমাদের শাস্ত্রোক্ত মরুতের সন্ধান পাইয়াছি। কিন্তু ইহাও পদার্থের চরম অবস্থা নহে, ইহাও সূক্ষ্মতর পদার্থের বিকার (modification)। সুবিখ্যাত বিজ্ঞানাধ্যাপক লারমোর সাহেব (Sir J. Larmor) অকাট্য যুক্তি সহকারে প্রমাণ করিয়াছেন যে ইথারে বা ব্যোম-পদার্থে কোনরূপ টান বা মোচড়ের (strain) ফলে তাড়িতাণু সৃষ্ট হয়। এক একটি তাড়িতাণু ব্যোমসাগরের এক একটি ক্ষুদ্র আবর্ত্ত (strain-centre) মাত্র। টম্‌সন্ সাহেবও এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। এইরূপে পাশ্চাত্য জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ ক্রমশঃ আমাদের শাস্ত্রোক্ত পঞ্চভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

আর একটি কথা—বিভিন্ন মূলভূতের 'পরমাণু' বিভিন্ন প্রকার বটে, কিন্তু তাড়িতাণু-গুলির পরস্পরের মধ্যে কোন বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না। টম্‌সন্ সাহেব দেখাইয়াছেন যে, যে কাচনলের মধ্যে তাড়িতাণু উৎপন্ন হয় তাহার ভিতর যে বাষ্পই থাকুক না কেন,

এবং যে ধাতুপত্র হইতে ইহা নির্গত হয় তাহা যে ধাতুরই নির্ম্মিত হউক না কেন, সকল তাড়িতাণু এক প্রকারেরই হইয়া থাকে। ইহাতে বৈজ্ঞানিকেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে তাড়িতাণুগুলি 'পরমাণু'র সাধারণ উপাদান; প্রত্যেক 'পরমাণু' বহু তাড়িতাণুর সমবায়ে উৎপন্ন। সমভাবে-ব্যাপ্ত পুং-তাড়িত (positive electricity)-যুক্ত ক্ষেত্রে, স্ত্রী-তাড়িত (negative electricity)-বিশিষ্ট, সবেগে আবর্ত্তিত, সহস্র সহস্র তাড়িতাণুর-সমষ্টির নাম 'পরমাণু' (The atom consists of a system of electrons in rapid revolution within a sphere of positive electrification)। এই সকল তাড়িতাণুর সংখ্যার উপর 'পরমাণু'র গুরুত্ব ও তাহাদের গঠন ও বিন্যাস-প্রণালীর উপর 'পরমাণু'র ধর্ম্ম নির্ভর করে। মনে করুন, হাইড্রোজেনের আণবিক গুরুত্ব (atomic weight) ১ ও পারদের আণবিক গুরুত্ব ২০০। ইহার কারণ হাইড্রোজেন-বাষ্পের পরমাণুতে যতগুলি তাড়িতাণু আছে, পারদের পরমাণুতে তাহার দুইশত গুণ আছে। হাইড্রোজেন পারদ হইতে বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত, কারণ হাইড্রোজেন-পরমাণুর ভিতর তাড়িতাণুগুলি যে ভাবে সাজান আছে, পারদ-পরমাণুর ভিতর সে ভাবে নাই। নচেৎ এক পরমাণু হইতে অন্য পরমাণুর উপাদানগত কোন প্রভেদ নাই। একই মূলভূত বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া বহু হইয়াছে। বলা বাহুল্য প্রাচীন ঋষিগণ বহু পূর্ব্বে এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন।

নিষ্ক্রিয় (passive) পুং-তাড়িতযুক্ত ক্ষেত্রের উপর স্ত্রী-তাড়িতযুক্ত কণার আবর্ত্তন আমাদিগকে শবরূপী শিবের বক্ষে মহামায়ার নর্ত্তন স্মরণ করাইয়া দেয়। বস্তুতঃ বিরাট বিশ্বে প্রকৃতি পুরুষের যে লীলা দেখা যায় ক্ষুদ্রতম অণুতেও তাহা দৃষ্ট হয়। এক একটি পরমাণু বাস্তবিকই এক একটি ব্রহ্মাণ্ড; অপিচ মহাব্রহ্মাণ্ড যে ছাঁচে ঢালা, অনুব্রহ্মাণ্ডও সেই ছাঁচে ঢালা। পণ্ডিতবর দা'লুবে (E. Fournier d' Albe) তাঁহার "Two New Worlds" নামক সুন্দর গবেষণা-পূর্ণ গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন যে পরমাণুগণ যে কেবল ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিরূপ তাহা নহে, বাস্তবিকই এক একটি ব্রহ্মাণ্ড (not only *resembles* a solar system but is *actually* a solar system in an infra-universe)। পরমাণুর মধ্যে তাড়িতাণুগণ গ্রহ উপগ্রহাদির ন্যায় অবিরত স্ব স্ব কক্ষায় প্রবল বেগে ঘুরিতেছে, সে বেগ এত প্রবল যে প্রতি সেকেণ্ডে তাহারা শত শত কোটিবার আবর্ত্তন করিতেছে। কেবল তাহাই নহে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে এক একটি পরমাণু একটি ব্রহ্মাণ্ড নহে, পরন্তু বহু ব্রহ্মাণ্ডের সমবায়। এই ক্ষুদ্রতর ব্রহ্মাণ্ডসমূহের প্রত্যেক-টির কেন্দ্রস্থলে একটি করিয়া পুং-তাড়িতযুক্ত অণু সূর্য্যরূপে বিরাজ করিতেছে এবং তাহাকে ঘেরিয়া স্ত্রী-তাড়িতযুক্ত তাড়িতাণুপুঞ্জ আবর্ত্তিত হইতেছে। গ্রহ উপগ্রহগণের মধ্যে যেরূপ ব্যবধান আছে, তাড়িতাণুগণের মধ্যেও সেইরূপ ব্যবধান বিদ্যমান। এই সকল ব্যবধান এত অধিক যে একটি তাড়িতাণুর তুলনায় সমগ্র পরমাণুর আয়তন অতিশয় বৃহৎ বোধ হয়। একটা পরমাণুকে যদি কলিকাতার টাউনহলের সমান বলিয়া ধরিয়া

লওয়া যায়, তাহা হইলে তদন্তর্গত একটা তাড়িতাণু একটি ক্ষুদ্র মটরের অপেক্ষা বড় হইবেনা। ব্যাপার বুঝুন! একটা পরমাণু এত ক্ষুদ্র যে আমরা তাহারই আকার ধারণা করিতে পারি না, অতএব তাড়িতাণু যে কত ক্ষুদ্র তাহা কি করিয়া উপলব্ধি করিব? প্রাচীন ঋষিগণ যে বলিয়াছিলেন ব্রহ্ম কেবল "মহতো মহীয়ান্" নন, তিনি "অণোরণীয়ান্" এখন তাহার তাৎপর্য্য কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি। অণু-ব্রহ্মাণ্ড ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ড, মহাব্রহ্মাণ্ড সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ড। ব্যষ্টি সমষ্টিরই প্রতিকৃতি। উপনিষদের ভাষায় বলিতে গেলে, অণুব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব, মহাব্রহ্মাণ্ড বিরাট।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ বৈজ্ঞানিক জগতের একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরের শেষভাগে সুবিখ্যাত জর্ম্মান বৈজ্ঞানিক রন্টগেন (Romtgen) সাহেব এক্স্ রশ্মি নামক অদৃশ্য রশ্মি আবিষ্কার করেন। উপরে যে ক্যাথোড্-রশ্মির কথা বলিয়াছি তাহা পাতলা এলিউমিনামের পাত ভেদ করিয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু কাচ ভেদ করিতে পারে না। সুতরাং যে কাচ-নলের ভিতর ইহা উৎপন্ন হয় ইহা তাহার বাহিরে যাইতে পারে না। ইহা ক্যাথোড্ হইতে সরল পথে ছুটিয়া গিয়া সম্মুখস্থ কাচনলের গাত্র দ্বারা প্রতিহত হয় (উপরে চিত্র দেখুন)। এবং নলের যে স্থানে ইহা পতিত হয় সে স্থানটা বিচিত্রভাবে উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান (fluorescent) হইয়া উঠে।

হীরক প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ আছে যেগুলিকে আলোকে রাখিলে সেই আলোক আহরণ করে ও পরে তাহা বিকিরণ করে। এইরূপ আহৃত-দীপ্তি-বিচ্ছুরক পদার্থকে ইংরাজিতে ফস্‌ফোরেসেণ্ট (phosphorescent) বা ফ্লুয়রেসেণ্ট (fluorescent) পদার্থ বলে। ফস্‌ফোরেসেণ্ট ও ফ্লুয়রেসেণ্ট পদার্থের পরস্পরের মধ্যে মোটামুটী প্রভেদ এই যে, যে আলোক হইতে ইহারা আলোক আহরণ করে তাহা সরাইয়া লইয়া যাইবার পরও ফস্‌ফোরেসেণ্ট পদার্থ কিয়ৎকাল দীপ্তি বিকিরণ করে, ফ্লুয়রেসেণ্ট পদার্থ যতক্ষণ আলোক নিকটে থাকে কেবল ততক্ষণই দীপ্তিমান থাকে। একদিন যখন রন্টগেন সাহেব ক্যাথোড্-রশ্মি সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময় যে কাচনলের ভিতর ক্যাথোড্-রশ্মি উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার নিকটে ঘটনাক্রমে বেরিয়াম প্লাটিনোসাইয়া-নাইড্ (barium platinocyanide) নামক ফস্‌ফোরেসেণ্ট পদার্থ মাখান এক কাগজের পর্দ্দা ছিল। রন্টগেন সাহেব দেখিলেন সেই কাগজের পর্দ্দা দীপ্তিমান হইয়াছে। এ দীপ্তি কোথা হইতে আসিল? নলের ভিতর ফসফোরেসেণ্ট পদার্থ রাখিলে তাহা ক্যাথোড্-রশ্মির আঘাতে দীপ্তিমান হইতে পারে বটে, কিন্তু পর্দ্দাটি নলের বাহিরে ছিল, অধিকন্তু কাচনলটি একটি কাল কার্ডবোর্ডের বাক্সের ভিতর ছিল। এরূপ স্থলে পর্দ্দার উপর ক্যাথোড্-রশ্মি পতিত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। অতএব রন্টগেন সাহেব সিদ্ধান্ত করিলেন যে কোন 'অদৃশ্য' রশ্মিই এই অপূর্ব্ব দীপ্তির কারণ। তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে ক্যাথোড্-রশ্মি কাচনলের যে স্থানে পতিত হইয়া তাহাকে দীপ্তিমান

করে সেই স্থান হইতে রশ্মি উদ্ভূত হয় ; এবং সাধারণ আলোকের পক্ষে অনচ্ছ (opaque) অনেক পদার্থই ইহা ভেদ করিয়া যাইতে পারে। তিনি ঐ পর্দা ও কাচনলের মধ্যে একটি মুদ্রা রাখিয়া দেখিলেন যে পর্দার উপর ঐ মুদ্রার সুস্পষ্ট ছায়া পড়িয়াছে, কিন্তু একটি কাষ্ঠখণ্ড বা এলিউমিনিয়ামের ন্যায় পাতলা ধাতুখণ্ড রাখিলে তাহার অতি অস্পষ্ট ছায়া পড়ে। কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় আরো অনেক অনচ্ছ পদার্থ এই রশ্মির পক্ষে স্বচ্ছ। সাধারণ আলোক আমাদের মাংস ভেদ করিতে পারে না, কিন্তু এই অদ্ভুত রশ্মি তাহা অবাধে ভেদ করিয়া যায়। ফলে এখন এই রশ্মির সাহায্যে শরীরাভ্যন্তরস্থ অস্থি ও যন্ত্রাদি প্রত্যক্ষ করিয়া চিকিৎসা করার সুবিধা হইয়াছে। এই রশ্মির প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে এখনও বিস্তর মতভেদ আছে। তবে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণের মতে, এই রশ্মি ইথার-স্পন্দনজাত ক্যাথোড্-রশ্মি কোন কঠিন পদার্থ দ্বারা প্রতিহত হইলে সেই প্রতিঘাতে পার্শ্বস্থ ইথার স্পন্দিত করিয়া এই রশ্মি উৎপন্ন করে। এই রশ্মির প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান ছিলনা বলিয়াই রন্তগেন সাহেব ইহাকে X ray বা অনিশ্চিত রশ্মি নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। এখন সাধারণে ইহাকে আবিষ্কর্ত্তার নামানুসারে "রন্তগেন-রশ্মি" নাম দিয়াছে।

পরবৎসর (রন্তগেন-রশ্মি আবিষ্কৃত হইবার কয়েক মাস পরেই) বিজ্ঞান আর একপদ অগ্রসর হইল। ক্যাথোড্-রশ্মি প্রতিহত হইয়া কাচনলের যেস্থান দীপ্তিময় করে সেই স্থান হইতে রন্তগেন রশ্মি উদ্ভূত হয় দেখিয়া বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক বেকারেল সাহেব (Prof. Henri Becquerel) অনুমান করিলেন যে হয়ত এই প্রকার রশ্মি নির্গমন করা আহৃত-দীপ্তি-বিস্ফুরক পদার্থগণের (phosphorescent & fluorescent substances) স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তিনি এই অনুমান ঠিক কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য একটি ফটো তুলিবার ফলক (photographic plate) কৃষ্ণবর্ণ কাগজে মুড়িয়া তাহার উপর খানিকটা ইউরেনিয়াম পোটাসিয়াম সালফেট (Uranium potassium sulphate) নামক ইউরেনিয়াম-ধাতু-সংযুক্ত এক প্রকার যৌগিক পদার্থ রাখিয়া সেটিকে সূর্য্যালোকে স্থাপন করিলেন। ইউরেনিয়াম ধাতুর এই মিশ্রটি 'ফস্ফোরেসেণ্ট' ধর্ম্মাক্রান্ত, সুতরাং আলোক পাইয়া তাহা দীপ্তিময় হইয়া উঠিল এবং দেখা গেল যে ফলক অনচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ কাগজে আবৃত থাকা সত্ত্বেও তাহাতে এক অদৃশ্য রশ্মি প্রবেশ করিয়া ছায়াপাত করিয়াছে। অতঃপর সূর্য্যালোকের সাহায্য না লইয়া অন্ধকারে এই পরীক্ষা করা হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এবারও ফলকে ছায়া দেখা গেল। তখন বেকারেল সাহেব বুঝিলেন এই ব্যাপারের সহিত উক্ত ইউরেনিয়ামমিশ্রের "ফস্ফরোসেণ্ট" ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নাই। ইউরেনিয়াম ধাতুর যে সকল মিশ্র এই ধর্ম্মাক্রান্ত নহে, অতঃপর তিনি সেই সকল মিশ্র লইয়া পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। সে সকল পরীক্ষাতেও একই ফল প্রাপ্ত হইলেন। তখন তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে উল্লিখিত অনচ্ছ-পদার্থ-ভেদী অদৃশ্য

রশ্মি মূল ইউরেনিয়াম ধাতু হইতেই নির্গত হয়, ইউরেনিয়ামের সহিত মিশ্রিত অন্য কোন পদার্থের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই, বরং বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম এ বিষয়ে মিশ্রিত ইউরেনিয়ামের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী। এইরূপে পদার্থবিশেষের অদৃশ্য-রশ্মি-নির্গমন-শক্তি আবিষ্কৃত হইল ইংরাজিতে পদার্থের এই ধর্ম্মের নাম রেডিও-একটিভিটি (radio-activity), আমরা বাঙ্গলায় ইহাকে "রশ্মি-বিকিরকত্ব" বলিব।

উল্লিখিত 'বেকারেল-রশ্মি' আবিষ্কৃত হইবার পর কয়েকজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কোন্ কোন্ পদার্থ ইউরেনিয়ামের ন্যায় 'রশ্মি বিকিরক' তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সকল বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে ম্যাডাম ক্যুরী (Madame Curie)র নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই পোলাণ্ড দেশীয়া মহিলা নিজ প্রতিভাগুণে আজ সমস্ত সভ্যসমাজে আদৃতা হইয়াছেন। ইনি ও অপর দুই একজন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে পরিচিত মূলভূতগুলির মধ্যে কেবল থোরিয়াম (thorium) ইউরেনিয়ামের ন্যায় রশ্মি-বিকিরক। ইউরেনিয়াম ধাতু আকরে প্রধানতঃ পিচ্ব্লেণ্ড (pitch blende) নামক পদার্থের সহিত মিশ্রিত থাকে। ম্যাডাম ক্যুরি খানিকটা পিচ্ব্লেণ্ড পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে তাহাতে যে পরিমাণ ইউরেনিয়াম আছে তাহার তুলনায় তাহার রশ্মি-বিকিরক শক্তি অনেক অধিক। তখন তিনি অনুমান করিলেন যে নিশ্চয় তাহাতে উক্ত শক্তি-বিশিষ্ট অন্য পদার্থ আছে। কিন্তু সেই অজ্ঞাত পদার্থ তাহাতে অতি সামান্য পরিমাণে থাকাতে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা গেল না। অতঃপর তিনি ও তাঁহার স্বামী অধ্যাপক ক্যুরী রাশি রাশি পিচ্ব্লেণ্ড লইয়া বিশ্লেষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বহু চেষ্টার পর অজ্ঞাত মূলভূতের সন্ধান মিলিল। যাহা পাওয়া গেল তাহার পরিমাণ খুব সামান্য বটে, কিন্তু তাহার রশ্মি-বিকিরণ-শক্তি অদ্ভুত,—ইউরেনিয়াম অপেক্ষা ১৮ লক্ষ গুণ অধিক! ম্যাডাম ক্যুরী এই অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের নাম দিলেন রেডিয়াম (radium) বা জ্যোতিষ্মান্। ইতঃপূর্ব্বে এই পদার্থের অনুসন্ধানকালে তিনি পিচ্ব্লেণ্ডের মধ্যে আর একটি রশ্মি-বিকিরক মূলভূতের সন্ধান পান ও স্বদেশের নামানুসারে তাহাকে পোলোনিয়াম (polonium) নাম দেন। ইহার পর পিচ্ব্লেণ্ড হইতে একটিনিয়াম বা ইমানিয়াম (actinium or emanium) ও আইওনিয়াম (ionium) নামে আর দুইটি রশ্মি বিকিরক মূলভূত পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি রশ্মি-বিকিরক মূলভূত আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশেরই কার্য্যকারিতা অচিরস্থায়ী।

রেডিয়াম ও অন্যান্য রশ্মি-বিকিরক পদার্থের কয়েকটি অসাধারণ গুণ দেখা যায়। সে গুণগুলির পরিচয় দিবার জন্য স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক রশ্মি-বিকিরক পদার্থের গুণ বর্ণনার প্রয়োজন নাই। কেবল রেডিয়ামের পরিচয় দিলেই যথেষ্ট হইবে। রেডিয়াম বড়ই দুষ্প্রাপ্য পদার্থ, ২০।২৫ মণ পিচ্ব্লেণ্ড বিশ্লেষণ করিলে দুই এক গ্রেণ মাত্র পাওয়া যাইতে পারে, তাহাও বিশুদ্ধ অবস্থায় নহে। বিশুদ্ধ রেডিয়াম একেবারেই পাওয়া যায় না।

সুতরাং রেডিয়াম সম্বন্ধে পরীক্ষা রেডিয়াম-ব্রোমাইড (radium bromide) প্রভৃতি মিশ্রিত রেডিয়াম লইয়াই করা হইয়া থাকে। এরূপ অবিশুদ্ধ রেডিয়ামও সুলভ নহে। এক গ্রেণ রেডিয়াম-ব্রোমাইড বা অন্য কোন রেডিয়াম-মিশ্র "সাত রাজার ধন," পৃথিবীর মধ্যে অল্প লোকেরই তাহা আছে কিন্তু রেডিয়ামের শক্তি এত অধিক যে এই অবিশুদ্ধ রেডিয়ামের একটি অতি ক্ষুদ্র বিন্দু হইতেও তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

রেডিয়ামের কীর্ত্তি দেখিয়া বোধ হয় ইহা একটি "সৃষ্টি-ছাড়া" পদার্থ। বস্তুতঃ রেডিয়াম আবিষ্কারের ফলে বৈজ্ঞানিক জগতে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। এতকাল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যে সকল নিয়ম জানা ছিল সে সকল নিয়ম যেন রেডিয়ামকে স্পর্শ করিতে পারে না। ধরুন, আমরা চিরকাল জানি যে শক্তি ব্যয় করিলে ক্রমশঃ তাহার ভাণ্ডার ফুরাইয়া যায়। অক্ষয় তূণীরের কথা কাব্যে পড়িয়াছি, চক্ষে দেখি নাই। কিন্তু রেডিয়ামকে বাস্তবিকই অক্ষয় শক্তির ভাণ্ডার বলিয়া বোধ হয়। একটি অতি ক্ষুদ্র, প্রায় চর্ম্মচক্ষের অগোচর, রেডিয়ামবিন্দু অনবরত প্রচুর পরিমাণে সুতীব্র রশ্মি বিকিরণ করে অথচ বহুবৎসরেও তাহার কণামাত্র ক্ষয় হইতে দেখা যায় না। এই 'অফুরন্ত' শক্তি কোথা হইতে আসে তাহাও বুঝা যায় না। বাহিরের কোন বস্তু হইতে রেডিয়ামকে শক্তি আহরণ করিতে দেখা যায় না, ইহার অভ্যন্তরেও শক্তি-উৎপাদক কোনরূপ রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে দেখা যায় না, অথচ তাহার রশ্মি নির্গমনের বিরাম নাই! কোন পদার্থ চতুষ্পার্শ্বস্থ পদার্থসমূহের অপেক্ষা অধিকতর উষ্ণ হইলে তাহা তাপ বিকিরণ করিয়া ক্রমশঃ অন্য পদার্থগুলির সহিত সমান শীতলতা প্রাপ্ত হয়, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। অমন যে প্রচণ্ড সূর্য্য তাহাও শুনিতে পাই এই নিয়মানুসারে ক্রমশঃ নিবিয়া যাইতেছে। কিন্তু রেডিয়াম স্বচ্ছন্দে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ শীতলতর বস্তুর মধ্যে আপন উষ্ণতা রক্ষা করে। তদ্ব্যতীত রেডিয়াম রশ্মি রন্টগেন রশ্মির ন্যায় অনেক পদার্থকে দীপ্তিমান (fluorescent) করে। অনচ্ছ পদার্থ ভেদ করিবার শক্তিও ইহার অল্প নহে, স্থূল কাষ্ঠ বা ধাতুখণ্ড ইহা অনায়াসে ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। সাধারণতঃ বায়ু প্রভৃতি বাষ্পীয় পদার্থের তাড়িত-পরিচালন-শক্তি (electrical conductivity) অতি সামান্য, নাই বলিলেই চলে, কিন্তু রেডিয়াম-রশ্মি যে বায়ুরাশির মধ্য দিয়া যায় তাহাকে তড়িত্বান্-অণু (ion)-বিশিষ্ট করিয়া বিশেষরূপে তাড়িত-পরিচালক করিয়া তোলে (cause an intense ionisation of the air through which they pass)। রেডিয়ামের রাসায়নিক শক্তিও কম নয়; ইহার সান্নিধ্যে অক্সিজেন বাষ্প ওজোন বাষ্পে রূপান্তরিত হয়, ইহা হইতে উৎপন্ন লবণ জলে গুলিলে জল ক্রমশঃ বিশ্লিষ্ট হইয়া অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনে পরিণত হয়। যে কাচের আধারে রেডিয়াম রক্ষিত হয় তাহা ক্রমশঃ বিবর্ণ হইয়া যায়। জীবদেহের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া দেখা যায়। অধ্যাপক ক্যুরী কিছুক্ষণ রেডিয়াম-রশ্মি মধ্যে হাত রাখিয়াছিলেন, তাহার ফলে সেই হাতে তীব্র বেদনাযুক্ত প্রদাহ উপস্থিত

হইয়াছিল। দুশ্চিকিৎস্য কর্কট-রোগ (Cancer) রেডিয়ামের সাহায্যে আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। বার্লিনের ডাক্তার সৌবরমান্ (Dr. Saubermann) বলেন, রেডিয়াম-নিঃস্রবযুক্ত জলপান করিলে প্রৌঢ়-বয়সে-কাঠিন্যপ্রাপ্ত ধমনীসকল পুনরায় যুবজনসুলভ কোমলতা প্রাপ্ত হয় এবং এইরূপে পরমায়ু-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই "অমৃত-বারি" প্রস্তুত করাও দুরূহ নয়। কোনও মৃৎপাত্রে একটি অতিক্ষুদ্র রেডিয়ামখণ্ড রাখিয়া পাত্রটি একটি কাচের বোতলের তলায় রাখিতে হয় ও তাহার পর সেই বোতল জলপূর্ণ করিলে জল কিয়ৎকাল পরে রেডিয়াম-নিঃস্রবযুক্ত হয়। রেডিয়াম-খণ্ডটি শত শত বৎসরেও ক্ষয় হয় না, সুতরাং তাহার সাহায্যে যত ইচ্ছা তত বোতল রেডিয়াম-জল প্রস্তুত হইতে পারে। রেডিয়ামের আণবিক গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক—২২৬'৪। এক ইউরেনিয়াম (আণবিক গুরুত্ব ২৩৮'৫) ও থোরিয়াম (আণবিক গুরুত্ব ২৩২'৪) ভিন্ন আর কোন মূলভূত এত গুরু নহে।

রেডিয়াম-রশ্মি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে তিনটি বিভিন্ন প্রকার রশ্মি লইয়া এই রশ্মি গঠিত। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা গ্রীক বর্ণমালানুসারে এই তিন প্রকার রশ্মির যথাক্রমে নাম দিয়াছেন, α (অ্যালফা), β (বিটা) ও γ (গামা) রশ্মি। আমরা ইহাদিগকে যথা ক্রমে ক, খ, ও গ রশ্মি বলিব। ইহার মধ্যে ক-রশ্মি পুংতাড়িত-বিশিষ্ট কণা সমূহের দ্বারা গঠিত। পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রত্যেক পরমাণুর ভিতর অনেকগুলি পুং-তাড়িতযুক্ত কণা সূর্য্যরূপে বিরাজিত থাকে, তাহাদিগকে ঘেরিয়া স্ত্রীতাড়িতযুক্ত তাড়িতাণু-পুঞ্জ আবর্ত্তিত হয়; খুব সম্ভবতঃ রেডিয়াম-পরমাণুস্থিত এই সকল কণাই ক-রশ্মির উপাদান। খ-রশ্মিটি স্ত্রী-তাড়িত-যুক্ত কণার সমষ্টি ও উল্লিখিত ক্যাথোড্-রশ্মির অনুরূপ। গ-রশ্মিটি রন্তগেন-রশ্মির অনুরূপ ও সম্ভবতঃ ইথার-তরঙ্গ। ক-রশ্মির গতি এক খণ্ড কাগজ বা দুই এক ইঞ্চি স্থূল বায়ুস্তরের দ্বারা প্রতিহত হয়। খ-রশ্মি একটা পাতলা এলুমিনি-য়ামের পাত ভেদ করিয়া যাইতে পারে। কিন্তু গ-রশ্মি ৭।৮ ইঞ্চি স্থূল লোহার পাত অনায়াসে ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। এই সকল রশ্মি ব্যতীত রেডিয়াম হইতে এক প্রকার বাষ্প বহির্গত হয়, তাহাকে রেডিয়াম-নিঃস্রব (radium emanation) বলে। এই নিঃস্রব ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া যথাক্রমে রেডিয়াম ক (radium A) রেডিয়াম খ (radium B), রেডিয়াম গ (radium C), রেডিয়াম ঘ (radium D), রেডিয়াম ঙ (radium E), রেডিয়াম চ (radium F) ও রেডিয়াম ছ (radium G) এই সপ্ত প্রকার পদার্থে পরিণত হয়।

যে পুংতাড়িত-যুক্ত কণা সমূহ লইয়া রেডিয়ামের ক-রশ্মি গঠিত সেগুলিকে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে সেগুলি হিলিয়াম (helium) নামক ধাতু হইতে অভিন্ন। এই ধাতুর আণবিক গুরুত্ব ৪ মাত্র। রেডিয়াম হইতে এই ধাতুর উৎপত্তির কারণ কি? ক ও খ-রশ্মিরআবিষ্কর্তা অধ্যাপক রদারফোর্ড (Rutherford) ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক-

গণ এ সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রেডিয়াম ও অন্যান্য রশ্মি-বিকিরক মূলভূতের পরমাণু গুলির গাঁথনি খুব দৃঢ় ও স্থায়ী নহে (unstab'e)। বোধ হয় যেন খুব বেশী তাড়িতাণু একসঙ্গে গাঁথিতে গিয়া গোড়া কিছু আল্‌গা হইয়া পড়িয়াছে। ফলে পরমাণুগুলি ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। কিন্তু সকল পরমাণু এক সঙ্গে ভাঙ্গে না। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেবল নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক পরমাণু ভাঙ্গে, তাহার কম বেশী হয় না। প্রতি সেকেণ্ডে যতগুলি করিয়া পরমাণু ভাঙ্গে পদার্থস্থিত সমস্ত পরমাণুর সংখ্যার তুলনায় তাহার সংখ্যা অতি সামান্য, এত সামান্য যে বহু বৎসর ধরিয়া এইরূপ ধ্বংস কার্য্য চলিলেও পদার্থের কোনরূপ ক্ষয় অনুভূত হয় না। একটা উদাহরণ দিই, মনে করুন একটি ক্ষুদ্র রেডিয়াম-খণ্ডে পরার্দ্ধ পরমাণু আছে, এরূপস্থলে যদি প্রতি সেকেণ্ডে সহস্রটা করিয়াও পরমাণু ভাঙ্গে, তাহা হইলেও শত শত বৎসরে তাহার যে কোন ক্ষয় হইয়াছে তাহা বুঝা যাইবে না।

সে যাহা হউক, রেডিয়াম পরমাণু ভাঙ্গিয়া কি হয়? বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, তাহার এক অংশ হিলিয়াম হয় ও অবশিষ্টাংশ রেডিয়াম-নিঃস্রবে রূপান্তরিত হয়। এই হিলিয়ামই ক-রশ্মির উপাদান। রেডিয়ামের পরমাণু ২২৬টি হাইড্রোজেন-পরমাণুর সমান, তাহা হইতে ৪টি হাইড্রোজেন-পরমাণুর সমান একটি হিলিয়াম-পরমাণু বাহির হইয়া গেলে যাহা পড়িয়া থাকে তাহাই রেডিয়াম-নিঃস্রব কিন্তু পরমাণুতে একবার ভাঙ্গন ধরিলে সহজে তাহার নিবৃত্তি হয় না। অল্পকাল পরেই রেডিয়াম-নিঃস্রব হইতে আর এক টুকরা হিলিয়াম বাহির হইয়া যায় ও রেডিয়াম-নিঃস্রব রেডিয়াম ক পদার্থে পরিণত হয়। কয়েক মিনিট পরেই রেডিয়াম ক হইতে আর একটা হিলিয়াম পরমাণু বাহির হইয়া যায় এবং রেডিয়াম খ এর উৎপত্তি হয়। এইরূপে ক্রমশঃ রেডিয়াম গ, রেডিয়াম ঘ, রেডিয়াম ঙ, রেডিয়াম চ, এবং অবশেষে রেডিয়াম ছ এর উৎপত্তি হইয়া তবে পরমাণুটি স্থির হয়। এই সকল রেডিয়াম-জাত পদার্থের মধ্যে হিলিয়াম ব্যতীত রেডিয়ম চ ও রেডিয়ম ছ বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, রেডিয়াম চ ও পূর্ব্বোল্লিখিত পোলোনিয়াম নামক ধাতু একই পদার্থ; এবং রেডিয়াম ছ খুব সম্ভবতঃ আমাদের চির পরিচিত সীসক। ইহার পর আরও পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে, ইউরেনিয়াম ধাতু রেডিয়ামের "পূর্ব্ব-পুরুষ," ইউরেনিয়াম-পরমাণু উল্লিখিত প্রকারে ভাঙ্গিয়া ক্রমশঃ রেডিয়াম-পরমাণুতে পরিণত হয়।

যখন এইরূপে একটি মূলভূত হইতে অন্য একটি বা ততোধিক মূলভূতের উৎপত্তি হইতে দেখা গেল, তখন বৈজ্ঞানিকেরা মূলভূত সম্বন্ধে পূর্ব্বসংস্কার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। পূর্ব্বে তাঁহাদের মূলভূতের অপরিবর্ত্তনীয়তায় (Law of the conservation of the elements) দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু রশ্মি-বিকিরক পদার্থ সমূহে পরমাণুর ধ্বংস-প্রবণতা (atomic disintegration) দেখিয়া তাঁহাদের সে বিশ্বাস টলিয়াছে। তাঁহারা

যাহাকে 'পরমাণু' বলেন তাহা যে বাস্তবিক চরম অণু নহে, তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অণু আছে, তাড়িতাণু আবিষ্কৃত হওয়া অবধি একথা তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এতদিন পরমাণুর চিরস্থায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের সন্দেহ ছিল না। কয়েকটি তাড়িতাণু একত্র হইয়া একবার একপ্রকার পরমাণুর সৃষ্টি করিলে তাহা আর পরিবর্ত্তিত হয় না, ইহাই তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু এখন তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন যে, একটা বৃহৎ পরমাণু ভাঙ্গিয়া তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর নানা পরমাণুর সৃষ্টি হইতে পারে। সুতরাং এই সকল তথা কথিত পরমাণুকে চিরস্থায়ী বলা আর চলে না এমন কি কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেন যে, কেবল রশ্মিবিকিরক পদার্থের পরমাণু নয়, সকল পদার্থেরই পরমাণু ভাঙ্গিতেছে, তবে এত ধীরে যে তাহা বুঝা যায় না। সুতরাং এক হিসাবে সকল পদার্থেরই রশ্মি-বিকিরণ-শক্তি আছে বলিতে হইবে।

বিজ্ঞান এই পর্য্যন্ত আসিয়াই থামে নাই। বর্ত্তমান বর্ষে (১৯০৩) বৈজ্ঞানিক-প্রবর রাম্‌সে (Sir William Ramsay) যে আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন তাহার ফলে বিজ্ঞান-জগতে আর একটি নূতন যুগ সূচিত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। রাম্‌সে সাহেব একটি সম্পূর্ণরূপে বায়ুশূন্য কাচনলের ভিতর অতি সামান্য পরিমাণ নিরতিশয় বিরলীকৃত হাইড্রোজেন-বাষ্প রাখিয়া তন্মধ্যে তাড়িত-প্রবাহ চালিত করিয়া দেখিলেন যে, নলের ভিতর হিলিয়াম (helium) ও নিয়ন (neon) বাষ্পের আবির্ভাব হইয়াছে। নলের ভিতর এই দুই বাষ্প কোথা হইতে আসিল? সকলেই জানেন এই বাষ্পদ্বয় বড়ই দুষ্প্রাপ্য; বায়ু মধ্যে অতি সামান্য পরিমাণে ইহাদের অস্তিত্ব অনুভূত হয় বটে, কিন্তু উক্ত পরীক্ষাকালে নল মধ্যে এক কণিকাও বায়ু প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। এ পরীক্ষা রাম্‌সে সাহেব একবার করেন নাই, অনেকবার করিয়াছেন এবং প্রতিবারই এক ফল পাইয়াছেন। তদ্ভিন্ন অধ্যাপক কোলি ও পেটারসন (Prof. Colli and Patterson) নামক অন্য দুইজন বৈজ্ঞানিক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে এই পরীক্ষা করিয়া রাম্‌সে সাহেবের সহিত একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এরূপ স্থলে হিলিয়াম ও নিয়নের আবির্ভাবের দুইটি মাত্র কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে:—হয় বলিতে হইবে যে, নলের ভিতর প্রযুক্ত তাড়িত প্রবাহ হইতে ইহারা উৎপন্ন হয়, নতুবা বলিতে হইবে যে, নলাভ্যন্তরস্থ হাইড্রোজেন-পরমাণু ভাঙ্গিয়া তাহাদের নূতন প্রকার সমবায়ে ইহারা গঠিত হয়। যদি প্রথম ব্যাখ্যাটি প্রকৃত হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে সূক্ষ্ম-শক্তির বিকারে স্থূল জড়ের সৃষ্টি হইতে পারে। আর যদি দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি ঠিক হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, পরমাণু সুধু ভাঙ্গে না, তাহার ভগ্নাংশগুলি লইয়া গুরুতর পরমাণুর সৃষ্টি হইতে পারে। উপরে বলিয়াছি, প্রথমে বৈজ্ঞানিকগণ মূলভূতের পরমাণুর অপরিবর্ত্তনীয়তা ও চিরস্থায়িত্বে বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু রেডিয়ামের ব্যাপার দেখিয়া তাঁহারা সে মত বর্জ্জন করেন এবং বলেন, যে, একটি গুরু মূলভূতের পরমাণু ভাঙ্গিয়া দুইটি লঘুতর মূলভূতের পরমাণু উৎপন্ন হইতে

পারে, কিন্তু লঘুতর পরমাণু হইতে গুরুতর পরমাণু সৃষ্টি তাঁহারা অসম্ভব মনে করিতেন। কিন্তু হিলিয়াম ও নিয়ন উভয় বাষ্পই হাইড্রোজেন অপেক্ষা গুরুতর। হাইড্রোজেনের আণবিক গুরুত্ব ১, হিলিয়ামের ৪, ও নিয়নের ২০। সুতরাং রাম্‌সে সাহেব ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত না হইলে বৈজ্ঞানিকগণ আবার মত-পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইবেন। পূর্ব্বে যাঁহারা কিমিয়া-বিদ্যার (Alchemy) অনুশীলন করিতেন, তাঁহারা সীসক প্রভৃতি হীন ধাতুকে সুবর্ণে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেন। বৈজ্ঞানিকেরা তাহা অসম্ভব মনে করিয়া তাঁহাদের চেষ্টাকে বাতুলতা বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন। কিন্তু যদি হাইড্রোজেন হইতে হিলিয়াম ও নিয়নের উৎপত্তি হইতে পারে, তাহা হইলে সীসক হইতে সুবর্ণ হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। সুতরাং আশা করা যায়, এখন হইতে বৈজ্ঞানিকেরা কিমিয়া-বিদ্যাকে আর অসার বলিয়া উপেক্ষা করিবেন না; পরন্তু নূতন উদ্যমে নূতন ভাবে এই বিদ্যার অনুশীলন করিয়া নূতন নূতন পদার্থের সৃষ্টি করিয়া সংসারে যুগান্তর আনয়ন করিবেন। রাম্‌সে সাহেবের আবিষ্কার উপলক্ষ্য করিয়া বিলাতের বিখ্যাত "জনবুল" (John Bull) পত্রিকার সম্পাদক বড় দুঃখে বলিয়াছেন;—"The discovery, or rather rediscovery, of the fact that one element can be changed into another has been puffed as an amazing example of the ingenuity of modern scientific progress. It is really one more proof of the blind prejudice of modern scientists. For generations they have been railing superciliously at the wisdom of mediæval lore which was the foundation of all the knowledge today. They could find no mockery too bitter for the patient labours of alchemists but now they eat their words and vaunt themselves for learning at last that the alchemists were right. We wonder how long astronomers will take to find out that astrology is true."

অর্থাৎ "এক মূলভূত অন্য এক মূলভূতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, এই সত্যের আবিষ্কার বা পুনরাবিষ্কার আধুনিক বিজ্ঞানের একটা আশ্চর্য্য-জনক উন্নতির দৃষ্টান্ত বলিয়া গর্ব্ব করা হইতেছে। বস্তুতঃ ইহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের অন্ধ কুসংস্কারের আর একটি প্রমাণ মাত্র। মধ্যযুগে অনুশীলিত বিদ্যাই বর্ত্তমান যুগের সকল জ্ঞানের ভিত্তি, অথচ পুরুষানুক্রমে বৈজ্ঞানিকগণ তাহার উপর ঘৃণাদম্ভসহকারে উপহাসরাশি বর্ষণ করিয়া আসিতেছেন। বিদ্রূপ যতই কটু হউক না কেন তাহা তাঁহারা সহিষ্ণু ও অধ্যবসায়ী কিমিয়াবিদ্‌গণের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে করিতেন না, কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা তাঁহাদের সকল কথা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং অবশেষে কিমিয়া-বিদ্যার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছেন। আমরা কেবল ভাবিতেছি যে, বর্ত্তমান জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণ কতদিনে পুরাতন ফলিত-জ্যোতিষের সত্যতা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন।"

রাম্‌সে সাহেবের আবিষ্কারসম্বন্ধে বাদানুবাদ এখনও শেষ হয় নাই। কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইলে আর একটি কথার মীমাংসা হইবে। লর্ড কেলভিন (Lord Kelvin) প্রমুখ অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বৈজ্ঞানিক জগতে কেবল ধ্বংসের লীলাই ("degradation of energy") দেখিয়া থাকেন তাঁহাদের মতে এই বিশ্ব সৃষ্ট হইবার পরক্ষণ হইতেই ধ্বংসের পথে ধাবিত হইয়াছে, কেবল শক্তির ক্ষয় হইতেছে, নূতন শক্তি আর জন্মাইতেছে না, যে পরমাণু ভাঙ্গিতেছে তাহা আর জোড়া লাগিতেছে না। কিন্তু এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, এক পরমাণু ভাঙ্গিয়া তদপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী পরমাণু উৎপন্ন হইতে পারে। সুতরাং বলিতে হইবে, একদিকে যেমন ধ্বংস হইতেছে, অন্যদিকে তেমনই সৃষ্টি স্থিতির কার্য্য চলিতেছে, অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রত্যেক পরমাণুতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রিমূর্ত্তিতেই বিরাজমান রহিয়াছেন। পরমাণু জন্মিতেছে, পুষ্ট হইতেছে এবং অবশেষে খণ্ড খণ্ড হইয়া মহত্তর পরমাণু সৃষ্টি করিতেছে। মহাব্রহ্মাণ্ডে যাহা ঘটিতেছে, প্রত্যেক অণু-ব্রহ্মাণ্ডেও ঠিক তাহাই হইতেছে। বস্তুতঃ জগতের পরিণাম ধ্বংস নহে ক্রমোন্নতি (evolution)।

রন্তগেন-রশ্মি ও রেডিয়াম হইতে উদ্ভূত রশ্মিগুলি সম্বন্ধে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। এই রশ্মি গুলিকে আমরা চর্ম্ম-চক্ষে দেখিতে পাইনা; কেবল তাহাদের কার্য্যের দ্বারা আমরা তাহাদের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি। ব্রহ্মাণ্ডে এরূপ কত "অদৃশ্য" রূপতরঙ্গ খেলিয়া বেড়াইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

সুধু রূপতরঙ্গ কেন? অসংখ্য শব্দতরঙ্গ, স্পর্শতরঙ্গ, রসতরঙ্গ, গন্ধতরঙ্গ আসিয়া আমাদিগকে অবিরত আঘাত করিতেছে, তাহার মধ্যে কয়টাই বা আমরা অনুভব করিতে পারি? তাহাদের অধিকাংশের সম্বন্ধেই আমরা অন্ধ, বধির, অনুভব-শক্তি-হীন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এইরূপ স্থূল ইন্দ্রিয়ের অগোচর কেবল দুই চারিটি মাত্র তরঙ্গ অসাধারণ-কৌশলে-নির্ম্মিত যন্ত্রের সাহায্যে ধরিতে পারিয়া গর্ব্বে ও আহ্লাদে স্ফীত হইয়া পড়িয়াছেন। বাস্তবিক এ বিষয়ে তাঁহাদের কঠোর সাধনা ও বিপুল অধ্যবসায়ের কথা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। কিন্তু প্রাচীন ঋষিগণ বলেন, এ সকল সূক্ষ্ম-তরঙ্গ প্রত্যক্ষ করিবার প্রকৃষ্ট উপায় নিজের সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়গণের বিকাশ-সাধন। বৈজ্ঞানিকগণ যতদিন কেবল বাহ্য যন্ত্রের উন্নতি সাধনে ব্যস্ত থাকিবেন ততদিন এ ক্ষেত্রে অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিবেন না। কিন্তু আশা করা যায়, বৈজ্ঞানিকগণ শীঘ্রই আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। তাঁহারা এখন সূক্ষ্ম-স্পন্দনসমূহের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এইবার আর এক পদ অগ্রসর হইয়া সেই সকল সূক্ষ্ম-স্পন্দন অনুভব করিবার উপযোগী সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়গণের সন্ধান পাইলেই তাঁহারা ঋষি-প্রদর্শিত পন্থার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারিবেন। যতদূর বুঝা যাইতেছে, সে দিনেরও অধিক বিলম্ব নাই। সূক্ষ্ম-দর্শন ও শ্রবণ-শক্তির (Clairvoyance and Clairaudience) অস্তিত্ব ইতোমধ্যেই স্বীকৃত হইয়াছে, তবে, বৈজ্ঞানিক মহলে তাহার নানা রূপ ব্যাখ্যা চলিতেছে বটে।

সকল জড় পদার্থ এক মূল প্রকৃতি হইতে জাত—ইহা বলিয়াই আধুনিক বিজ্ঞান ক্ষান্ত হয় নাই। বিজ্ঞান আর জড় পদার্থকে কঠিন জড় বলিয়াই স্বীকার করিতে সম্মত নহে। তাহার মতে যাহাকে আমরা জড় পদার্থ বলি তাহা শক্তির রূপান্তর মাত্র। ইহা অবশ্য আমাদিগের পুরাতন ঋষিগণের পুরাতন কথারই প্রতিধ্বনি। সাংখ্যেরা বলেন, মূল প্রকৃতি সত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণ বা শক্তির সমবায় মাত্র। যতক্ষণ এই তিন গুণ সাম্যাবস্থায় থাকে ততক্ষণ প্রকৃতি অব্যক্ত; সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিলেই প্রকৃতি ব্যক্ত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করে। জড়পদার্থ মাত্রেই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন; সুতরাং যাহাকে জড় বলা যায় তাহা প্রকৃতির উপাদান শক্তিত্রয়েরই বিকার বা পরিণতি মাত্র। বেদান্তের মতেও সমস্ত জগৎ শক্তির লীলা মাত্র। এক্ষণে সুবিখ্যাত লিপজিগ্ (Leipzig) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব রসায়নাধ্যাপক বৈজ্ঞানিক-শিরোমণি ডাক্তার উইলহেলম্ ওস্ওয়াল্ড্ (Dr. Wilhelm Ostwald কি বলিতেছেন শুনুন। ইনি ১৯০৯ খৃঃ অব্দে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ রসায়নবিৎ বলিয়া নোবেল-পুরস্কার (Nobel prize) লাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং ইঁহার সিদ্ধান্ত আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ইনি বলিতেছেন:—We may define matter as a complex of gravitational, kinetic and chemical energies which are found to cling together in the same space অর্থাৎ 'কতকগুলি মাধ্যাকর্ষক, গতিজনক ও রাসায়নিক শক্তির একস্থানে সম্মিলনকে জড়পদার্থ বলে।' The most general concept science has developed to express the variety of experiences is *energy* and in terms of energy all observed and observable experiences are to be described অর্থাৎ 'আমরা যাহা কিছু দেখি শুনি অনুভব করি, তাহাদের বিজ্ঞানাবিষ্কৃত সর্ব্বাপেক্ষা সাধারণ নাম হইতেছে "শক্তি"। যে কোন পদার্থ প্রত্যক্ষ করা যায় বা যাইতে পারে তাহাকে শক্তিরূপে বর্ণনা করাই সঙ্গত।'

এইবার আমরা সাংখ্যোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত পদার্থ-সৃষ্টি সম্বন্ধে আধুনিক-বিজ্ঞান-সম্মত সিদ্ধান্তের তুলনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সাংখ্যদের মতে সৃষ্টি নিম্নলিখিত ক্রমে হইয়া থাকে,—(১) মূল প্রকৃতি (২) মহৎ (৩) অহঙ্কার (৪) তন্মাত্র (৫) ভূত। অব্যক্ত মূল প্রকৃতি জগতের মূল উপাদান। তাহার পরিণাম হইয়া প্রথমে মহতের সৃষ্টি হয়, মহতের পরিণাম অহঙ্কার, অহঙ্কারের বিকারের ফলে তন্মাত্রের উৎপত্তি হয়, তন্মাত্র ভূতে পরিণত হয়।

মহতের আর একটি নাম বুদ্ধি অর্থাৎ যাহা বুদ্ধি-গ্রাহ্য পদার্থ। বিশ্বের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বে দেখা বুদ্ধির কার্য্য। অতএব মহৎ শব্দে সমগ্র বিশ্বের (universe যাবতীয় বিভিন্ন পদার্থের অবিশেষ (homogeneous) উপাদান বুঝিতে হইবে। অহঙ্কার শব্দ স্বাতন্ত্র্য-ব্যঞ্জক; ইহা মনোগ্রাহ্য পদার্থ। বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে পার্থক্য দেখা মনের কার্য্য। অতএব

অহঙ্কার শব্দে বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডের (solar systems) স্বতন্ত্রী-কৃত উপাদান (cosmic matter or aether) বুঝায়। তন্মাত্র ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থ; শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ তরঙ্গসমূহ অনুভব করা ইন্দ্রিয়ের কার্য্য, ব্রহ্মাণ্ডের কারণার্ণবে অথবা (বৈজ্ঞানিকের ভাষায় বলিতে গেলে) ইথার-সমুদ্রে তরঙ্গ না উঠিলে তাহার অস্তিত্ব আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর হয় না। অতএব তন্মাত্র শব্দে ইথার সমুদ্রের শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের তরঙ্গ কেন্দ্র সমূহকে (অর্থাৎ তাড়িতাণুগণকে) বুঝিতে হইবে। এই সকল তরঙ্গ-কেন্দ্রই স্থূল ভূতের বিভিন্ন অণুসমূহের (অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকগণের পরমাণু সমূহের) অবিশেষ উপাদান। অতএব মোটামুটী বুঝা গেল,—

মূল প্রকৃতি অব্যক্ত আদি-শক্তি (unmanifest primordial energy); মহৎ—সমগ্র ব্যক্ত বিশ্বের অবিশেষ বা অবয়ব-শূন্য উপাদান unindividualised homogenous chaotic matter); অহঙ্কার—বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির জন্য স্বতন্ত্রীকৃত উপাদান (individualised cosmic matter or aether); তন্মাত্র—শব্দস্পর্শাদি তরঙ্গের কেন্দ্র সমূহ ও স্থূল ভূতের অবিশেষ উপাদান (strain-centres in aether and common constituents of all atoms *i.e.* electrons); ভূত—স্বতন্ত্র স্থূল অণু (atoms)

প্রথমে অব্যক্ত শক্তি ছিল, তাহা ব্যক্ত হইয়া দৃশ্যমান বিশ্বের অবয়ব-শূন্য উপাদান সৃষ্ট হইল। অতঃপর সেই অবিশেষ উপাদান বিভক্ত ও পৃথগ্‌ভূত হইয়া বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির স্বতন্ত্র উপাদানে পরিণত হইল। এই উপাদানের বিকারে স্থূল-ভূতের অবিশেষ উপাদান শব্দস্পর্শাদি তরঙ্গসমূহ সৃষ্টি হইল ও তাহাদের সংহননে বিভিন্ন স্বতন্ত্র স্থূলভূত সমূহ উৎপন্ন হইল।

উপরে দেখাইয়াছি, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও ঠিক এই কথাই বলেন। তাঁহাদের মতে ইথার বা ব্যোম-পদার্থে টান পড়িয়া তাড়িতাণু উৎপন্ন হয় ও তাড়িতাণু সমূহের বিভিন্ন প্রকার সমবায়ে বিভিন্ন মূলভূতের পরমাণুর সৃষ্টি হয়। এই ইথার স্বতন্ত্র ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির প্রথম উপাদান, সাংখ্যের অহঙ্কার-তত্ত্ব; তাড়িতাণুগুলি সাংখ্যের তন্মাত্র। ইথারের উৎপত্তি কেমন করিয়া হইল বা ইহার পূর্ব্বের অবস্থা কি, সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ এখনও একটা সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। কিন্তু আশা করা যায়, তাঁহারা পদার্থের ক্ষিতি, অপ, তেজঃ—এই তিন অবস্থার উপর যেমন আর দুই অবস্থার (মরুৎ ও ব্যোমের) সন্ধান পাইয়াছেন, সেইরূপ ক্রমশঃ তাঁহারা সাংখ্যোক্ত সৃষ্টির প্রথম দুই সোপানেরও সন্ধান পাইবেন। সাংখ্যেরা পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চ ভূতের কথা বলেন। ইহাতে বুঝায় যে সমগ্র জগৎ সৃষ্টির যেমন পাঁচটি সোপান আছে, তন্মাত্র ও ভূত-সৃষ্টিরও সেইরূপ ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চ ক্রম আছে। সূক্ষ্মতম পদার্থ মূল প্রকৃতি যেমন ক্রমশঃ স্থূলতম ভূতে পরিণত হয়, সূক্ষ্মতম তন্মাত্র ও ভূত তেমনই ক্রমশঃ স্থূলতর হইয়া স্থূলতম তন্মাত্রে ও ভূতে পরিণত হয়। তন্মাত্র ও ভূতের

এই ক্রমিক পরিণতি বা বিকাশের ব্যাপার এখনও বৈজ্ঞানিকগণের গোচরীভূত হয় নাই, তাঁহারা কেবল তাহাদের ক্ষিতি-অবস্থা অর্থাৎ পূর্ণ বিকশিত বা স্থূলতম অবস্থার কথাই জানেন। ইহার অধিক জ্ঞান লাভ করিতে হইলে বিজ্ঞানের আরও উন্নতি আবশ্যক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু।

যমুনা।

কাল জলরাশি, কালতটে আসি,
খুঁজিছে কি সেই কাল রূপ রাশি ?
আকুলি' ব্যাকুলি' উঠিছে উথুলি
শুনিতে কি তা'র সুমোহন বাঁশী ?
যার সুমোহন ধ্বনি অনুক্ষণ
অণু পরমাণু নাচায়ে তোমার,
ভুলায়ে তোমার প্রবাহের ধার
ফিরায়ে আনিত সুখে বারবার ;
যার পীতধড়া, যেন গীতে গড়া,
যেন গীতে ভরা কা'রত অখিল,
পুলিন, কানন, চল সমীরণ,
অচল, অমল গগন সুনীল ;
শিরচূড়া যার ঘুচাত আঁধার
তিমির-বহুল তমালের তলে ;
আঁধারে গোপনে মৃদু পরশনে
ফুটাত আলোক হৃদি দলে দলে :
যাহার নূপুর ভরি ব্রজপুর
প্রান্তরে প্রান্তরে হইত ধ্বনিত ;
যাহার নূপুর করি ভরপুর
অন্তরে অন্তরে হ'ত মুখরিত ;
যার বনমালা স্মরি ব্রজবালা
বনে বনে তা'রে হেরিতে ধাইত ;
যার বনমালা মনে মনে ঢালা
মনে মনোলোভা সৌরভ ঢালিত।
তোমারি মতন যমুনা ! এ মন
সতত অধীর পাইতে তাহায়,
চির অভিলাষে আকাশে আভাসে
কোন্ শুভক্ষণে হেরিল যাহায়।
সংসার-ধারায় যত ছুটে যায়,
তত ফিরে আসে সেই বৃন্দাবনে ;
ততই কাতর শুনিতে সে স্বর,
হেরিতে সাধের সেই শ্যামধনে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র।

দুঃখবাদের তারতম্যে হেতু।

"প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দুঃখবাদের" আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, দুঃখবাদ প্রাচ্য জীবনের মর্ম্মকথা, প্রাচ্য-দর্শনের মূল ভিত্তি; কিন্তু ইহা পাশ্চাত্য জীবনের অবান্তর ঘটনা, পাশ্চাত্য-দর্শনের আনুষঙ্গিক মত। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, কি দর্শনে, কি জীবনে, কি ইতিহাসে, কি কাব্যে, এই একই দুঃখবাদ, প্রাচ্যে অমৃতময় ও পাশ্চাত্যে বিষময় ফল প্রসব করিয়াছে। পাশ্চাত্যে ও প্রাচ্যে দুঃখবাদের ফলাফল সম্বন্ধে এই তারতম্যের কারণ কি? অতঃপর আমরা এই সমস্যার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিব।

আমরা দেখিতে পাই যে, পাশ্চাত্য দেশের দুঃখবাদ অনেক সময় জড়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য দুঃখবাদী দার্শনিকের ধারণা এই যে, জড় পরমাণুপুঞ্জের সংঘাত-সংহনন হইতে এই বৈচিত্র্যময় বিশাল বিশ্ব; ইহার অভ্যন্তরে অন্ধ জড়শক্তির যদৃচ্ছাজনিত ক্রীড়া। মানুষও জড়ের সাময়িক বিবর্ত্তন জড় শক্তির অন্ধ আঘাত-প্রঘাতে জর্জ্জরিত। প্রাচ্য দুঃখবাদ এ মতের সমর্থন করে না। প্রাচ্য দুঃখবাদী বলেন যে, জড় জগৎ চিন্ময় আনন্দময়ের বিলাস। জগতের অভ্যন্তরে আনন্দঘন পরমাত্মা বিরাজিত।

কোহন্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আত্মা আনন্দময়ো ন স্যাৎ।

'সেই আনন্দময় পরমাত্মা যদি না থাকিতেন, তবে কি কেহ নিশ্বাস প্রশ্বাস করিতে পারিত?' সেই জন্য দেখা যায় যে, যে উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন "অতোঽন্যৎ আর্ত্তম্"— "পরমাত্মা ভিন্ন সমস্তই দুঃখময়," তিনিই আবার বলিয়াছেন, "আনন্দাৎ খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন হি ইমানি ভূতানি জীবন্তি, আনন্দং হি প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তি" "আনন্দ হইতেই এই সমস্ত জীব জন্মিয়াছে, আনন্দের দ্বারাই জীবিত আছে এবং পরিশেষে আনন্দেরই অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইবে।" তাহা যদি হয়, আনন্দময় আত্মাই যদি জগতের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত থাকেন, তবে আর জগতে দুঃখের স্থান কোথায়? *

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুঃখবাদের "দর্শনে" view point এ) এইরূপ তারতম্য হওয়াতে দুঃখবাদের ফলাফলে যে তারতম্য হইবে তাহা বিচিত্র নহে।

আরও দেখা যায় যে, পাশ্চাত্য জাতিরা সাধারণতঃ ইহলোক-সর্ব্বস্ব, কিন্তু প্রাচ্য জাতিরা পরলোকে দৃঢ়-বিশ্বাসবান্ এবং অনেকে জন্মান্তরবাদী। যাহার ইহলোকই সর্ব্বস্ব, তাহার এরূপ ভাবা অসঙ্গত নহে যে, "এ জগতে আজ যদি সুখ না হইল,

---

* "The self who is bliss being the all permeating life of the Universe, pain has no permanent place in it"—Annie Besant's Introduction to Yoga, p. 92.

সার এডউইন আরনল্ড (Sir Edwin Arnold) এই প্রাচ্য মতের প্রতিধ্বনি করিয়া একস্থলে বলিয়াছেন: "The soul of things is eternal bliss"

তবে আর কবে কোথায় হইবে? এইত সুখের, ভোগের স্থান। এখানে না হইলে, আর হইল না। কিন্তু কৈ জন্মাবধি ত সুখের মুখ দেখি নাই; দুঃখ আমার চির-সহচর আমাকে ঘেরিয়া রাখিয়াছে। তবে আমার সুখ হইল না!" এইরূপ ভাবিয়া পাশ্চাত্য দুঃখবাদী অধীর, ব্যাকুল, নিরাশ হয়। কিন্তু প্রাচ্য দুঃখবাদী, যাহার পরলোকে বিশ্বাস দৃঢ় আছে এবং যে জন্মান্তরবাদ ধ্রুব সত্য বলিয়া জানে, এরূপ অবস্থায় সে অনেক অংশে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারে। সে ভাবে,—"জীবন অনন্তকাল স্থায়ী, অতীত যুগান্তরে ছিল, ভবিষ্যৎ যুগান্তরেও থাকিবে। এ পৃথিবীতে এই আমি প্রথম আসি নাই। আরও কতবার আসিয়াছিলাম, আরও কতবার আসিব। আর এ জগতে আমি কয়দিনের জন্য আসিয়াছি,—এখানে আজ সুখ হইল না, পরলোকে কাল সুখ হইবে। সময় ত আর ফুরাইয়া যাইতেছে না—কেবল দু'দিনের অগ্রপশ্চাৎ মাত্র। ইহার জন্য এত কি?" অতএব ইহলোককে সার ভাবিয়া পার্থিবতাময়-জীবন সমালোচনাও পাশ্চাত্যে দুঃখবাদের প্রবলতার অন্যতম কারণ। ইয়ুরোপ সুখ পাইবার আশা করে; সুখ পাইবার নহে, না পাইয়া করুণ বিলাপ বা তীব্র আর্ত্তনাদ করে।

আবার পাশ্চাত্য জাতির অদৃষ্টবাদও দুঃখবাদের কঠোরতার প্রতিকূল। "যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল"—ইহাই যাহার জীবনের মূল-মন্ত্র, তাহার বিলাপ আর্ত্তনাদের সুবিধা কৈ? প্রাকৃত জগতে যেমন কার্য্য-কারণ ভাব—যেমন কারণ, তাহার অনুযায়ী কার্য্য,—নৈতিক জগতে সেইরূপ এই অদৃষ্টবাদ। যাহার যেমন কার্য্য, তাহার তদনুরূপ ফল। কেহ এরণ্ড বীজ বপন করিয়া যদি সুপক আম্র ফল না পায়, তবে তাহার বিরক্তির অবসর কোথায়? সেইরূপ কেহ দুষ্কৃত করিয়া যদি সুকৃতের ফল সুখভোগ করিতে না পায়, তবে তাহার বিরক্ত হইলে চলিবে কেন? প্রাচ্য জাতিরা অদৃষ্টবাদী। তাহারা দুঃখে কষ্টে অদৃষ্টকে, আপনার কর্ম্মফলকে ধিক্কার দেয়; বিধাতাকে নহে। "যদি ইহ জন্মে বা জন্মান্তরে শুভ কর্ম্ম করিতাম, তাহা হইলে এই অশুভ দুঃখ সহিতে হইত না। অপরে শুভকর্ম্ম করিয়াছে, তাহারা সুখী, আমি করি নাই আমার ভাগ্যে সুখ ঘটিবে কেন? সুখে কাহারই স্বভাবসিদ্ধ অধিকার নাই; আমার ত নাই-ই। তবে বৃথা বিলাপ-বিতণ্ডা করি কেন? এ ক্রন্দন-আর্ত্তনাদে ফল কি? অদৃষ্ট আমার সাধ্যায়ত্ত নহে; কিন্তু পুরুষকার ত বটে। এ জন্মে শুভ কর্ম্ম করি, জন্মান্তরে সুখী হইব।"

হিন্দু এই কথা ভাবে। কিন্তু পাশ্চাত্যেরা ত এ কথা ভাবিতে পারে না; তাই তাহারা বিলাপ, আর্ত্তনাদ, চীৎকার করে। বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাই যে, পিতার প্রত্যাখ্যানে ও বিমাতার বাক্যবাণে জর্জ্জরিত বালক ধ্রুব মাতা সুনীতির সমীপে আসিয়া এইরূপ বিলাপ, আর্ত্তনাদ করিলে, জননী তাহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, "বৎস, ইহাতে অধীর হইও না। যে অতীত জন্মে যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, ইহজন্মে তাহার সেইরূপই ভোগ হয়। তুমি সুকৃতির দ্বারা পুণ্য উপার্জ্জন কর নাই, দুষ্কৃতির দ্বারা পাপ অর্জ্জন করিয়াছ,

তাই আজ তোমাকে পিতার লাঞ্ছনা, বিমাতার গঞ্জনা ভোগ করিতে হইতেছে। রাজ্য ঐশ্বর্য্য বরভোগ—

রাজাসনং তথা ছত্রং বরাশ্বা বরবাহনা।
পুণ্যাং যস্তৈব তস্তৈ তে তস্মাৎ সাম্যস্থ বালক॥

এ সমস্ত সুকৃতকারীর প্রাপ্য। তোমার সুকৃত নাই, তুমি এ সকল পাইলে না, বলিয়া ক্ষোভ করিও না। কিন্তু তুমি নিরুপায় নহ। যদি তোমার সুখভোগে ইচ্ছা থাকে, তবে শুভ কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর। রাজভোগ তোমারও করায়ত্ত হইবে।

সুশীলো ভব ধর্ম্মাত্মা মৈত্রঃ প্রাণিহিতে রতঃ।
নিম্নং যথাপঃ প্রবণাঃ পাত্রমায়ান্তি সম্পদঃ॥

"হে পুত্র, তোমার অদৃষ্ট তোমারই হস্তে। সুশীল হও, ধর্ম্মাত্মা হও, জীবে মৈত্রী কর, সর্ব্বভূতের হিত কর; তাহা হইলে জল যেমন নিম্ন ভূমিতে আপনিই প্রবাহিত হয়, সেইরূপ তোমাতে সমস্ত সম্পদ প্রবাহিত হইবে।" এ শিক্ষা এখনও এদেশে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে জার্ম্মান দার্শনিক অধ্যাপক ডয়েসন্ ভারত-ভ্রমণে আসিয়া এক অন্ধ ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ জন্মান্ধ, অথচ সদাই প্রফুল্ল চিত্ত। ডয়েসন্ এ বিষয়ে ব্রাহ্মণকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, "পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম-ঋণ শোধ করিতেছি। ইহাতে বিষণ্ণ হইলে চলিবে কেন?" জীবন-যাপনের ইহাই সার কথা। দুঃখের দ্বারা, কষ্টের দ্বারা, দারিদ্র্যের দ্বারা, বিপত্তির দ্বারা, পূর্ব্বজন্মকৃত দুষ্কৃতের ক্ষয় হয়। জন্মজন্মান্তরে জীব যে সকল ঋণ-জালে আবদ্ধ হইয়াছে, তাহার কতক অংশ শোধ হইয়া তাহার ভারের লাঘব হয়। বুঝিয়া দেখিলে ইহাতে বিষণ্ণ না হইয়া প্রসন্ন হওয়াই উচিত। যাঁহারা এই ভাবে অদৃষ্টবাদী, তাঁহারা দুঃখে পড়িলে বিধাতাকে ধিক্কার দিতে পারেন না; কারণ তাঁহারা বাদরায়ণের ভাষায় বলিতে বাধ্য—

বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ।——ব্রহ্মসূত্র।

"জগতে সুখদুঃখের তারতম্য দেখিয়া বিধাতাকে পক্ষপাতী বা নিষ্করুণ বলা সঙ্গত নহে; কারণ তিনি সাপেক্ষ অর্থাৎ জীবের শুভাশুভ কর্ম্ম অপেক্ষা করিয়া তাহার ভোগ-বিধান করেন। যে সুকৃত-কারী, তাহাকে সুখী করেন, যে দুষ্কৃতকারী, তাহাকে দুঃখী করেন।"

আর এক কথা। দুঃখবাদ তলাইয়া বুঝিলে ইহার মধ্যেই জীবের সান্ত্বনার যথেষ্ট হেতু আছে। প্রাচ্য দুঃখবাদী এইরূপ তলাইয়া বুঝেন। সেইজন্য তিনি ব্যাকুল হন না; পাশ্চাত্য দুঃখবাদী এরূপে বুঝেন না, সেইজন্য তাঁহার দুঃখবাদ নৈরাশ্যপূর্ণ। দুঃখ-বাদের মর্ম্মকথা এই যে, সংসার দুঃখময়। জগৎ সুখের স্থান নহে, ইহা দুঃখের স্বাধিকৃত আবাসভূমি। তাহাই যদি হয়, তবে শোক-দুঃখ-বিপাক-বিপদে প্রপীড়িত হইলে আমাদের আর্ত্তনাদ করিবার অধিকার কি? দুঃখ যখন স্বাভাবিক, দুঃখ যখন জগতের

সনাতন ধারা, তখন আমাদের ইহাই ভাবা সঙ্গত যে, "যাহা হওয়া উচিত, জগতে যাহা হইয়া থাকে—চিরদিন হইয়াছে—চিরদিন হইবে;—আমার নহে, তোমার নহে, সকল মানব জাতির, জীব সাধারণের যাহা হয়, তাহাই হইয়াছে। অতএব ক্রন্দন-আর্ত্তনাদের —উচ্ছ্বাসের অবকাশ কই? মন বুঝে না কাঁদি; মানুষ অজ্ঞান, তাই মায়ার মোহে চীৎকার করে; কিন্তু আমার কাঁদিবার, চীৎকার করিবার অধিকার কি?" প্রাচ্য-জাতির জীবন-সমালোচনা এই ভাবের। সেই জন্য তাহাদিগের জীবনে অগণ্য অসংখ্য শোকদুঃখ ক্লেশযন্ত্রণা আসিলেও তাহারা একেবারে ব্যাকুল হয় না। পাশ্চাত্য জাতির জীবন-সমালোচনা ইহার ঠিক বিপরীত। তাহারা সঠিক দুঃখবাদী নহে। তাহারা ভাবে,—"জগতে অবশ্য দুঃখ আছে। কিন্তু সুখও ত আছে। আমি দুঃখী। কেন সুখী নহি? অন্যের যেরূপ সুখে অধিকার, আমারও ঠিক তাহাই; তথাপি অন্যে সুখী, আমিই দুঃখী। আমি জগতের অত্যাচারে অধিকারচ্যুত হইয়াছি; আমার প্রতি দারুণ অবিচার হইয়াছে। কেন আমি এই অবিচার সহিব? আমার বিলাপ করিবার, আর্ত্তনাদ করিবার অধিকার জন্মিয়াছে; অতএব আমি কাঁদিব, বিলাপ করিব, আর্ত্তনাদ করিব।" ইহাই ইয়োরোপের চিন্তা-প্রণালী। অতএব পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য জাতির জীবন-সমালোচনার এই তারতম্য, উভয় দেশের দুঃখবাদের ফলাফলের তারতম্যের অন্যতম কারণ।

কিন্তু ইহার অপেক্ষাও নিগূঢ়তর কারণ আছে। পাশ্চাত্য দুঃখবাদী বলে যে, জীব নিরুপায়। তাহাকে দুঃখের অভিঘাত সহিতেই হইবে, ইহার কোন প্রতিবিধান নাই। প্রাচ্য দুঃখবাদী কিন্তু এ কথা বলেন না। তিনি বলেন, যেমন দুঃখ আছে, তেমনই দুঃখ-হানি আছে। যেমন রোগ আছে, তেমনি ঔষধ আছে। অতএব জীব নিরুপায় নহে। আমাদের জাতীয় কবি হেমচন্দ্র তাঁহার "দশমহাবিদ্যায়" এই তত্ত্ব রূপকের ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। তিনি মানবের প্রতিনিধিরূপে নারদকে নক্রকুম্ভীর-ভীষণ সংসার-সমুদ্রে দুঃখের দুর্ব্বিপাকের চিত্র দেখাইয়াছেন। নারদ সেই চিত্রের ভীষণতা সহিতে না পারিয়া—

সদানন্দ ঋষি নিরানন্দ মন
কহেন তখন শঙ্করে।
দেব আশুতোষ, নিবার এ লীলা,
ব্যথা বড় বাজে অন্তরে॥
এ ঘোর রহস্য পারি না সহিতে,
দেখাও আমারে জননী।
যিনি সতীরূপে সংসার-পালিকা
সর্ব্বজীব-দুঃখ হারিণী॥

কবি সর্ব্বশুভকর শঙ্করের মুখে বলিতেছেন,—

"না হও নিরাশ, অরে ভক্তিমান্"
ভূতেশ কহেন নারদে।
"দুঃখেরি কারণ নহে জীবলীলা,
মোচন্ আছে রে আপদে॥
কলামাত্র তার হেরিলে নয়নে,
আদ্যার আদি জগতে।
পূর্ণ সুখ ইহ জগত-ভাণ্ডারে,
দেখিতে পারিবে পশ্চাতে॥"

ইহাই সার কথা—'মোচন আছে রে আপদে'। জগতে দুঃখ আছে, নিশ্চয়; কিন্তু প্রাচ্য দুঃখবাদী বলিতেছেন যে,যেমন দুঃখ আছে,তেমনি দুঃখ-হানি আছে। বাস্তবিক সমস্ত প্রাচ্য শাস্ত্রের প্রয়োজন—সেই দুঃখহানির প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন। প্রাচ্য দর্শনের আরম্ভ দুঃখবাদে বটে; কিন্তু পরিসমাপ্তি দুঃখনাশে। অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন দর্শনকার দুঃখহানির ভিন্ন ভিন্ন উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন; কিন্তু তাহা হইলেও সকল দর্শনই দুঃখবারণের উপায়-নির্দ্ধারণে নিয়োজিত। ন্যায় দর্শনের দ্বিতীয় সূত্র এই,—

দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানাম্ উত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ।

সূত্রকার ঋষি বলিতেছেন, সংসার দুঃখময় বটে। এই দুঃখের নাশ করিতে হইলে জন্মের বারণ করিতে হইবে। জন্মের হেতু প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তির হেতু দোষ—রাগ, দ্বেষ ও মোহ। এই দোষের নিদান মিথ্যাজ্ঞান। অতএব এই মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদসাধন করিতে পারিলেই দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় হইবে। সেই জন্য ন্যায়দর্শন এই মিথ্যাজ্ঞান-উচ্ছেদের উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইয়াছেন।

তত্ত্বজ্ঞানাৎ মিথ্যাজ্ঞানং অপৈতি। —বাৎস্যায়ন ভাষ্য।

"তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে মিথ্যাজ্ঞানের বারণ হইয়া জীব অপবর্গ লাভ করে।" সেইজন্য ন্যায়দর্শন এই তত্ত্বজ্ঞানরূপ দুঃখহানির উপায় নির্দ্ধারণে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছেন। বৈশেষিকদর্শন-প্রণেতা কণাদ ঋষিরও প্রায় ঐ মত

পদার্থানাম্ সাধর্ম্মবৈধর্ম্মাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানাদ্ নিঃশ্রেয়সম্।—বৈশেষিক-দর্শন, ১।১।৩

'নিঃশ্রেয়স' অর্থে আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি। জীব নিরুপায় নহে, দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় আছে; সে উপায় পদার্থ সমূহের তত্ত্বজ্ঞান। সেই জন্য কণাদ পদার্থসমূহের তত্ত্ব-নির্দ্ধারণে বৈশেষিক-দর্শন নিয়োজিত করিয়াছেন। মীমাংসা-দর্শনকার জৈমিনি ঋষিরও ঐ উদ্দেশ্য। জীব দুঃখময় সংসার ছাড়িয়া সুখময় স্থান লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত। লৌকিক উপায়ে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না দেখিয়া বেদ কৃপা করিয়া জীবকে উপদেশ দিয়াছেন,—

"স্বর্গকামো যজেত"—'স্বর্গ প্রাপ্তির সাধন যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর'; তাহা হইলে নিশ্চয়ই স্বর্গ লাভ হইবে। স্বর্গ সুখধাম; সেখানে দুঃখের লেশমাত্র নাই; সেখানে যাইলেই সুখ মিলে।

যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্।
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎসুখং স্বঃপদাস্পদম্॥

'যে সুখে দুঃখের মিশ্রণ নাই, যে সুখ পরে দুঃখে পরিণত হয় না, যে সুখ ইচ্ছামাত্রে উপস্থিত হয়, স্বর্গ সেই সুখের আস্পদ।' যজ্ঞের দ্বারা এই স্বর্গ লাভ হয়। সেই-জন্য জৈমিনি ঋষি মীমাংসা-দর্শনে এই যজ্ঞের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; কারণ তাঁহার মতে যজ্ঞই দুঃখ-হানির প্রকৃষ্ট উপায়।

সাংখ্য-দর্শনকার কপিল ঋষি বলেন যে, দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি জীবের পুরুষার্থ বটে; ইহাও ঠিক যে, লৌকিক উপায়ে ঐরূপ নিবৃত্তি সম্ভবপর নহে; কিন্তু সেই দুঃখ-নিবৃত্তির যজ্ঞরূপ বৈদিক উপায়ও সমীচীন উপায় নহে। কারণ যজ্ঞের ফলে যে স্বর্গাদি লাভ হয়, তাহার ভোগ স্থায়ী নহে। পুণ্য কর্ম্মের ফল-ভোগান্তে কর্ম্মীর পতন অবশ্যম্ভাবী। অতএব দুঃখ-নিবৃত্তির অন্য প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। সেই উপায়-নির্দ্ধারণের জন্যই সাংখ্য-দর্শনের প্রবৃত্তি।

সাংখ্যমতে দুঃখ-নিবৃত্তির সেই উপায়—জ্ঞান।

জ্ঞানান্মুক্তি।—সাংখ্যসূত্র, ৩।২৩

কিসের জ্ঞান? প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক বা পার্থক্য জ্ঞান।

তচ্চ (কৈবল্যং) সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিনিবন্ধনম্। – তত্ত্বকৌমুদী, ২১

সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বরকৃষ্ণও বলিয়াছেন,

তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ বিজ্ঞানাৎ। ২

অর্থাৎ, "প্রকৃতি পুরুষের ভেদ-সাক্ষাৎকারই শ্রেষ্ঠতর উপায়। উহা ব্যক্ত (বিকৃত), অব্যক্ত (প্রকৃতি) ও জ্ঞ (পুরুষ), এই তিনের বিশেষ জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়।" অতএব, সাংখ্যমতে এই বিবেকজ্ঞানই দুঃখনিবৃত্তির প্রকৃষ্ট উপায়। এই বিবেক জ্ঞান লাভ করিবার জন্য সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক। মূল প্রকৃতি, মহত্তত্ব, অহংকার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ স্থূলভূত এবং পুরুষ, এই পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের বিবেক জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। সেই জন্য সাংখ্যেরা বলেন,—

পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমেবসেৎ।
জটী মুণ্ডী শিখী বাপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥

"যাঁহার পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের জ্ঞানলাভ হইয়াছে, তিনি যে আশ্রমেই বাস করুন না কেন, তিনি ব্রহ্মচারীই হউন, বা গৃহস্থই হউন, বা আরণ্যকই হউন, তাঁহার মুক্তি সুনিশ্চিত।"

যোগদর্শনে পতঞ্জলি ঋষি এই কথার অনুমোদন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, সংসার দুঃখময় বটে অতএব হেয়। (দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ। হেয়ং দুঃখম্ অনাগতম্। ২।১৫—১৬)। এই হেয় সংসারের নিদান বা হেতু কি? প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ; (দৃগ্ দৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয় হেতুঃ)। কিন্তু প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ জন্য এই সংসারের অত্যন্ত উচ্ছেদ সম্ভবপর, এই হেয়ের নিবৃত্তি সাধিত হইতে পারে; ইহারই নাম 'হান'। (তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্। ২।২৫)। এই হানের উপায় কি? প্রকৃতি-পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান (বিবেকখ্যাতিঃ অবিপ্লবা হানোপায়ঃ - ২২৬)।

এই যে প্রকৃতি-পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান, যাহা পাতঞ্জল মতে মোক্ষলাভের অদ্বিতীয় পন্থা, সে জ্ঞান অর্জ্জন করিবার উপায় কি? সাংখ্যেরা বলেন যে, তাঁহাদের আবিষ্কৃত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সহিত পরিচিত হইতে পারিলেই সেই সম্যগ্ জ্ঞান লাভ করা যায়। পতঞ্জলির মতে কিন্তু সে পরিচয় যথেষ্ট নহে। সেই জন্যই যোগশাস্ত্রের অবতারণা। কারণ, পতঞ্জলির মতে প্রকৃতি-পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়—যোগ। দুঃখনিবৃত্তির অদ্বিতীয় উপায় এই যোগ জীবের আয়ত্ত করিবার জন্যই, যোগ-দর্শনের প্রবৃত্তি। এই যোগ কি? "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"। চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে কি হয়?

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং।

'তখন পুরুষ নিজের স্বরূপে অবস্থান করেন।' পুরুষ চিন্মাত্র—সুখ দুঃখের অতীত—'দ্রষ্টা—দৃশিমাত্রঃ।" পরিপক যোগের অবস্থায় (যাহাকে নির্ব্বীজ সমাধি বলে, সেই অবস্থায়) চিতি-শক্তির স্বরূপে প্রতিষ্ঠা হয়।

স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেঃ।

তখন পুরুষ নিজের শুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপে অবস্থান করেন। ইহারই নাম কৈবল্য-সিদ্ধি। ইহাই পাতঞ্জল-দর্শনের চরম লক্ষ্য এবং জীবকে ত্রিবিধ দুঃখমুক্ত, এই চরম লক্ষ্যে উপনীত করিবার জন্যই যোগদর্শনের প্রবৃত্তি।

সর্ব্বদর্শনশিরোমণি বেদান্ত-দর্শনেরও উদ্দেশ্য, জীবকে দুঃখের পারে লইয়া গিয়া ভূমানন্দের অধিকারী করা। বেদান্ত-দর্শনের মতে জীব প্রকৃতপক্ষে নিত্যবুদ্ধমুক্ত-স্বভাব।

নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-সত্য-স্বভাবং প্রত্যকচৈতন্যমেব আত্মতত্ত্বম্।

' কিন্তু জীব আত্মবিস্মৃত। সে নিজেকে নিজে জানে না, সে অবিদ্যার আবরণে আবৃত হইয়া আপনাকে কর্ত্তা, ভোক্তা, সুখী, দুঃখী ইত্যাদি সংসার-জড়িত মনে করে। সে উপাধি-সংযোগে মোহগ্রস্ত হইয়া নিজের শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বরূপ বিস্মৃত হয় এবং "অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ"—ঈশ্বরভাব হারাইয়া শোকমোহের অধীন হয়। কিন্তু যদি কোন উপায়ে তাহার এই মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ করিতে পারা যায়, যদি অনাদি মায়াবশে সুপ্ত জীব

কখনও জাগরিত হয়, তখনই সে বুঝিতে পারে যে, সে স্বয়ংই জন্মহীন, নিদ্রাহীন, স্বপ্নহীন, অদ্বৈত ব্রহ্মবস্তু।

অনাদি মায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নম্ অদ্বৈতং বুধ্যতে তদা॥

তখন জীব "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"—'যিনি ব্রহ্ম জানেন, তিনি ব্রহ্ম হন।' ব্রহ্ম সুখস্বরূপ আনন্দঘন।

বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম। উপনিষদ্।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। নবিভেতি কুতশ্চনঃ।—তৈত্তি, ২।৯

অতএব জীব ব্রহ্ম হইলে ভূমানন্দের অধিকারী হন।

সেই ব্রহ্মানন্দ জানিলে কোথাও কিছুতে ভয় থাকে না। সেই জন্য যাজ্ঞবল্ক্য রাজর্ষি জনককে এই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যান করিয়া অবসানে বলিয়াছিলেন,—

স বা এব মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ। বৃহ,—৪।৪।২৫

'সেই এই মহান্ অজ আত্মা অজর অমর অমৃত অভয় ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অ-ভয়। যে জীব এরূপ জানে, সে অভয় ব্রহ্ম হয়।'

এই পরমানন্দের পরিমাণ বুঝাইবার জন্য শ্রুতি উপমার সাহায্য লইয়াছেন,—

স যো মনুষ্যাণাং রাদ্ধঃ সমৃদ্ধো ভবত্যন্যেষামধিপতিঃ সর্ব্বৈর্মানুষ্যকৈর্ভোগৈঃ সম্পন্নতমঃ স মনুষ্যাণাং পরম আনন্দোঽথ যে শতংমনুষ্যাণামানন্দাঃ স একঃ পিতৄণাং জিতলোকানামানন্দোঽথ যে শতং পিতৄণাং জিতলোকানামানন্দাঃ স একো গন্ধর্ব্বলোক আনন্দোঽথ যে শতং গন্ধর্ব্বলোক আনন্দাঃ স একঃ কর্ম্মদেবানামানন্দো যে কর্ম্মণা দেবত্বমভিসম্পদ্যন্তেঽথ যে শতং কর্ম্মদেবানামানন্দাঃ স এক আজান দেবানামানন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতোঽথ যে শতমাজানদেবানামানন্দাঃ স একঃ প্রজাপতিলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতোঽথ যে শতং প্রজাপতিলোক আনন্দাঃ স একো ব্রহ্মলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতোঽথৈব এব পরম আনন্দ এষ ব্রহ্মলোকঃ।—বৃহ ৪।৩।৩৩

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি মনুষ্যের মধ্যে ঋদ্ধিশালী সমৃদ্ধ, সকলের অধিপতি, সমস্ত মানুষিক ভোগে সম্পন্নতম, তাহার যে আনন্দ, তাহাই মনুষ্যের পরম আনন্দ। এই মনুষ্য আনন্দের শতগুণ জিতলোক পিতৃগণের আনন্দ। পিতৃগণের আনন্দের শতগুণ গন্ধর্ব্ব-লোকের আনন্দ। গন্ধর্ব্বলোকের আনন্দের শতগুণ কর্ম্মদেবগণের আনন্দ। (কর্ম্মদেব তাঁহারা, যাঁহারা কর্ম্মদ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন)। কর্ম্মদেবগণের আনন্দের শতগুণ আজানদেবগণের আনন্দ। নিষ্পাপ নিষ্কাম শ্রোত্রিয়ের এইরূপ আনন্দ। আজান দেবগণের আনন্দের শতগুণ প্রজাপতি লোকের আনন্দ। নিষ্পাপ নিষ্কাম শ্রোত্রিয়ের এইরূপ আনন্দ। প্রজাপতি লোকের আনন্দের শতগুণ ব্রহ্মলোকের আনন্দ। নিষ্পাপ নিষ্কাম শ্রোত্রিয়ের এইরূপ আনন্দ—ইহাই পরম আনন্দ—ইহাই ব্রহ্মানন্দ।' বেদান্ত-দর্শনের উদ্দেশ্য জীবকে এই ব্রহ্মানন্দের অধিকারী করা। বেদান্ত-দর্শন বলেন, জীব সাধনা করিয়া ঐ পরমানন্দের ভাগী হইতে পারে—যে আনন্দে বিষাদের লেশমাত্র নাই, যাহা

রোগ, শোক, মায়া, মলিনতা, কষ্ট, দুঃখের অতীত, যাহা সীমাহীন, অন্তহীন, ক্ষয়হীন,—সেই আনন্দের সাগরে ভাসমান হইতে পারে। অতএব জীব কেন দুঃখ-বাদী হইবে? সে অমৃতের পুত্র, সুখের উৎস, আনন্দের কেন্দ্র—সে কেন বিষণ্ণ, বিমলিন, অবসাদগ্রস্ত হইবে? যে দুঃখ-হানির পরম উপায়ের সন্ধান পাইয়াছে—জগতে দুঃখ আছে, সংসার দুঃখময়, এ সকল বিভীষিকায় সে কেন ভয় পাইবে? সংসার-পর্ব্বতের মেখলাদেশ কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইতে পারে, পাদদেশ গুল্ম-কণ্টকাকীর্ণ হইতে পারে, সানুদেশে বিকট বজ্রনির্ঘোষ হইতে পারে; কিন্তু সে জানে যে, পর্ব্বতের চূড়া চিরদিন বিমল তুষারে মণ্ডিত, দীপ্ত সূর্য্য-কিরণে উদ্ভাসিত, বিচিত্র ইন্দ্রধনুতে সুসজ্জিত।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুঃখবাদের ইহাই নিগূঢ় প্রভেদ এবং এই জন্যই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দুঃখভেদের ফলাফলে এত তারতম্য।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

ভগ্ন-পিঞ্জর।

[পুরবী—আড়াঠেকা]

মন পাখী কি ভাবছো সদা,
বসি আত্মারামের পিঞ্জরে।
কি মজা যে পেয়েছ তায়,
ফাঁক্ পেয়ে ত যাওনা উড়ে॥

একটী তারে পাঁচটী ফেরা,
তায় তৈয়ারি এই পিঞ্জরা,
নয় দরজা ঐ ভাঙ্গা চোরা,
আছে রে সদাই খোলা পড়ে'॥

খাচ্ছ সুখেতে আছ মজায়,
হচ্ছ রাজা স্বপন-ছায়ায়,
ভাবছো নাক শেষ উপায়,
যবে বিষধরে খাবে ধরে'॥

জ্ঞান-বৈরাগ্য প্রহরী রেখে,
নাম জপনারে জপ মুখে,
করাল কাল ঐ এঁকে বেঁকে,
বেড়াচ্চে তোর ঘরের ধারে॥

পরিত্রাণ চাও যদি মন,
কালী মন্ত্র কররে স্মরণ,
মহা মন্ত্র করিয়ে শ্রবণ,
কালের সাপ পালাবে দূরে॥

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

ঋষি-সঙ্ঘ।

আমরা জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকৃত মোক্ষ-পথ বা বুদ্ধ-পথের আভাস দিয়া আসিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি, সাধক কিরূপে সাধন-চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া দীক্ষা লাভ করে; তাহার পর পরিব্রাজক (বহূদক), কুটীচক, হংস ও পরম-হংস এই চারি দীক্ষা লাভ করিয়া পরে জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হয়। আমরা দীক্ষা-চতুষ্টয়ের কিছু কিছু পরিচয়ও দিয়াছি। সাধারণতঃ তাহাদিগের যে বিবরণ প্রচারিত আছে, তাহা বাহ্য। তীর্থ পর্য্যটন করিতে পারিলেই পরিব্রাজক বা বহূদক হওয়া যায় না বা তীর্থস্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া প্রণবজপ ও ভিক্ষাটন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিলেই প্রকৃত কুটীচক হয় না। সেইরূপ হংস ও পরম হংসের কথা। আমরা আরও দেখিয়া আসিয়াছি, সাধক জীবন্মুক্ত হইয়া, মনুষ্য জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া, মানুষের চরম পরিণাম দেখেন যে, তাঁহার সম্মুখে তাঁহার অবলম্বনীয় সাতটি পথ বিরাজিত রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে পথ একটিই,—জীব-করুণামার্গ; তবে তাহা সপ্তধা বিভক্ত। এই সপ্ত-শাখা-সমন্বিত পথ, সপ্তমুখে সপ্তদিক দিয়া, সাগররূপ মহালয়ে আসিয়া মিলিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সপ্তমুখী পথের একটি, আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া, পৃথিবীর মধ্য দিয়া, ভাগীরথীর মত পাতকী ত্রাণ করিতে করিতে, সাগররূপ তৎশব্দবাচ্য ব্রহ্মধামে বা তথা-গত গর্ভে, * অনাদি, অনন্ত, অনির্ব্বচনীয়, অব্যক্ত, একাধারস্বরূপ, গীতার "পরম-ধামে" † আসিয়া মিলিয়াছে। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদিগের মধ্যে পরম কারুণিক কেহ কেহ স্বেচ্ছায় এই মার্গ গ্রহণ করেন। এই সমস্ত মহাপুরুষদিগকেই থিওসফিকেল সোসাইটির (Theosophical Society) পুস্তকাদিতে মাষ্টার (Master) বলিয়া উক্ত করা হইয়াছে। আমরা বারান্তরে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আলোচনা করিব। তাঁহারা মানব-হিতার্থে নানারূপ কার্য্যের ভার লইয়া অবস্থিত আছেন। তাঁহারাই জগতের প্রকৃত শিক্ষক ও গুরুস্থানীয়। আর যাঁহারা পার্থিব মার্গ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারাও করুণাব্রত গ্রহণ করিয়া আছেন। তাঁহাদিগের সহিত পৃথিবীর সম্পর্ক গৌণ এবং তাঁহারা অপার্থিব লোকে, মানব-নয়নের অগোচরে, নানারূপ অধিকার লইয়া ব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণ সাধন করিতেছেন।

অনেকে বলেন এই যে, ব্রহ্মাণ্ড-হিতব্রত গ্রহণ করিয়া মহাপুরুষদিগের নানা অধিকার লইয়া অবস্থানের কথা বলা হইতেছে, ইহা একটা নব্য মত; ইহা আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত নহে। প্রথমে আমরা এই সমস্যাটির মীমাংসা করিতে, তাঁহাদিগের এই সন্দেহ ভঞ্জন করিতে চেষ্টা করিব।

বৌদ্ধশাস্ত্রবিৎ জানেন যে, ঐ প্রাচীনধর্ম্মের ভিত্তি সেবাব্রতের উপর সংস্থাপিত।

---

* ব্রহ্মোৎপত্তিশাস্ত্র।

† যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম। গীতা, ১৫-৬।

বৌদ্ধের সাধনার মূলে এই জীব-সেবা, তাঁহার সাধনার অন্তেও সেই মহত্তর জীব-সেবা। তাই তাঁহার প্রত্যেক গ্রন্থে, দর্শনে, ইতিহাসে এবং আখ্যায়িকায় এই জীব-সেবার কথা উল্লিখিত আছে। এক এক জনের মহান্ চরিত্রকথা, তাঁহার বিপুল উৎসর্গ-কাহিনী পাঠ করিলে প্রেমে, ভক্তিতে ও কৃতজ্ঞতায় উৎফুল্ল ও কণ্টকিত হইতে হয়। বৌদ্ধের অতি-প্রিয়, ভক্তির পাত্র, "সঙ্ঘ-রত্ন", বোধিসত্ত্ব আর্য্য অবলোকিতেশ্বরের কথা কে না জানে?* তিনি ইচ্ছা করিয়াই বুদ্ধত্ব পদ গ্রহণ করেন নাই, কারণ তাহা হইলে তাঁহাকে পার্থিব সংসর্গ ত্যাগ করিতে হইত। তিনি চারিজন মহাপুরুষকে একে একে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়াছেন। তিনি বিপশ্বী, শিখি, জিন ও শাক্যমুনির সহচর ছিলেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে ভক্তিসহকারে সম্বর্দ্ধনা করিতেন। তিনি পাপী পুণ্যবান, জ্ঞানী অজ্ঞানী, সকলেরই কল্যাণ সাধন করিতেন। নিরয়বাসী পাতকী-ত্রাণ তাঁহার একটী কার্য্য ছিল।

বৌদ্ধশাস্ত্রে এইরূপ পরহিত-সাধন-পরায়ণ, পরহিতে আত্ম-বিসর্জ্জন-নিরত মহাপুরুষের ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে। একদিকে যেমন পার্থিব দেহরূপ মলিনতর পরিচ্ছদধারী বুদ্ধ বোধিসত্ত্বের কথা দেখা যায়, অপরদিকে তদ্রূপ অপার্থিব সূক্ষ্মলোকে কার্য্যপরায়ণ প্রত্যেক-বুদ্ধাদিরও উল্লেখ আছে। যাঁহার যেরূপ অধিকার, তাঁহার তদনুরূপ কায়-ধারণ। সাধারণতঃ তিন প্রকার কায়ের উল্লেখ দেখা যায়; যথা—নির্ম্মাণ-কায়, সম্ভোগ-কায় ও ধর্ম্ম-কায়।

প্রথমতঃ নির্ম্মাণ-কায়। নির্ব্বাণ-জ্ঞান লাভ করিয়া বা বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণব্রত, পার্থিব দেহ ত্যাগের পর পূর্ণজ্ঞান লইয়া যে সূক্ষ্ম দেহ আশ্রয় করেন, তাহাই নির্ম্মাণকায়। যখন তিনি বোধিসত্ত্ব ছিলেন, তখন এই দেহ সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছেন। তাহার পর বুদ্ধত্ব ব্রত গ্রহণ করিয়া জগতের মঙ্গলার্থে এই দেহ আশ্রয় করিয়া থাকেন। 'এখনও যাঁহার উপর পৃথিবীর আধিপত্য আছে, যিনি এখনও যুক্তসঙ্গ, যিনি এখনও প্রজ্ঞা-প্রতিষ্ঠিত হন নাই, তাদৃশ ব্যক্তি নির্ম্মাণ কায়ধারী বুদ্ধকে দেখিতে পান না। নির্ম্মাণকায়ের রহস্য অতি গুহ্য। সাধারণ বৌদ্ধগ্রন্থে নির্ম্মাণকায়ার গুহ্য রহস্য উদ্‌ঘাটিত নাই বলিয়াই, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ একটা মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—যে স্থূল বা পার্থিব দেহ লইয়া বুদ্ধেরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, তাহারই নাম নির্ম্মাণ-কায়।*

দ্বিতীয়তঃ সম্ভোগ-কায়। ইহা নির্ম্মাণ কায়, অথচ তাহা হইতে অধিকতর উদ্ভাসিত, অধিকতর উজ্জ্বল। তাহা তিনপ্রকার পূর্ণতার দ্বারা বিশুদ্ধ। সেই তিন প্রকার পূর্ণতার

---

* তাঁহার চরিত্র ও লীলা-কাহিনী গুণকারণ্ডব্যূহ ও কায়ণ্ডব্যূহে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

* Nirmán-Káyá means the physical form assumed by the Buddhas when they incarnate on earth—the least sublime of their earthly encumbrances.

—Schlagintweit's "Buddhism in Tibet."

মধ্যে, পার্থিব-সম্বন্ধ-শূন্যতা একটি। সম্ভোগ-কায়-ধারী যখন পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন তিনি ক্রিয়াশক্তি-প্রভাবে একটি দেহ সৃষ্টি করিয়া তাহাকে আশ্রয় করেন। আমরা যাঁহাকে "প্রত্যেক-বুদ্ধ" নামে অভিহিত করিয়া আসিয়াছি, তিনি এই কায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। অতএব প্রত্যেক বুদ্ধের সহিত পার্থিব জগতের গৌণ সম্বন্ধ। তাই সাধারণে ভাবে যে, প্রত্যেক-বুদ্ধ জীব দুঃখে উদাসীন থাকিয়া আপন নির্ব্বাণ-সুখে নিমগ্ন থাকেন। তাই তাহারা তাঁহাকে করুণাহীন, নির্ম্মম, স্বার্থপর ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকে। থিওসফিকেল সোসাইটির আদি শিক্ষয়িত্রী যোগশক্তি-সম্পন্না. গুপ্তবিদ্যায় জ্ঞানবতী ম্যাডাম্ ব্ল্যাভাস্কিও প্রথমে এই ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন এবং প্রত্যেক-বুদ্ধকে স্বার্থপর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।* কিন্তু পরে গুরুকৃপায় এই ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং জগৎ-প্রসিদ্ধ তাঁহার অমূল্য গ্রন্থে (The Secret Doctrine) লিখিয়াছেন,—"বৌদ্ধধর্ম্মের মহাযান-পন্থার প্রচারক ভগবান্ নাগার্জ্জুনের গুপ্তগ্রন্থের মধ্যে প্রত্যেক-বুদ্ধের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা বুদ্ধের বোধিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, অথচ প্রকৃত বুদ্ধের ন্যায় লোক-শিক্ষার ভার লইয়া পার্থিব সংস্রব রক্ষা করেন নাই। (জন বা তপ-লোকে) তাঁহাদিগেরও ব্রত - লোক-কল্যাণ-সাধন, তবে তাহা অন্যলোকে—অপার্থিব লোকে"।†

তাহার পর ধর্ম্ম-কায়। যিনি "পূর্ণ বুদ্ধ" বা সম্যক্ সম্বুদ্ধ, তিনি যে কায় আশ্রয় করেন, তাহার নাম ধর্ম্ম-কায়। প্রকৃতপক্ষে ইহা কোনও কায় নয়; অগ্নিশিখার অন্তর্গত স্ফুলিঙ্গের মত ধর্ম্মকায়-ধারী ব্রহ্মে সংস্থিত, পরম ধামে অবস্থিত। তাঁহারাও জীব-কল্যাণে, সময় সময় পৃথিবীতে অবতরণ করেন। যখন পাপের এত বৃদ্ধি হয়, আসুরিক শক্তি এত প্রবল হয় যে, লোকরক্ষক "সাধুগণের" সমগ্র শক্তি পরাভূত হয়, তখন তিনি অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীকে ধন্য করেন।

---

* তিনি সাধক-আদৃত প্রসিদ্ধ "অনাহত নাদ" গ্রন্থে (The Voice of the Silence) লিখিয়াছেন, "Pratyeka Buddhas are those Bodhi-sattvas who strive after and often reach the Dharma Káya robe after a seris of lives. Caring nothing for the woes of mankind or to help it, but only for their own bliss, they enter Nirvána and disappear from the sight and the hearts of men. In Northern Buddhism a Pratyeka Buddha is a synonym of spiritual selfishness."

† The first (Pratyeka Buddhas) are those who have attained the Bodhi (wisdom) of the Buddhas, but do not become Teachers.—The Secret Doctrine, Vol. 3—page 416- Edn. London-1897.

এই পুস্তকের পাদ-টিপ্পনীতে আছে, "The Pratyeka Buddha stands on the level of the Buddha, but His work for the world has nothing to do with its teaching, and His office has always been surrounded with mystery. The preposterous view that he at such superhuman height of power, wisdom and love could be selfish, is found in the exoteric books, though it is hard to see how it can have arisen."

বৌদ্ধের মত হিন্দুরও বিশ্বাস যে, জগতে একজনও বদ্ধ থাকিলে মুক্তি অসম্ভব। দেহের অংশ-বিশেষে পীড়াদায়ক ক্ষত থাকিলে সে দেহের কি সুস্থতা থাকিতে পারে? সেইরূপ এক ব্যক্তিও বদ্ধ থাকিলে মুক্তির সম্ভাবনা কোথায়? তাই কর্ম্মাতীত হইয়াও মহাপুরুষেরা নানা অধিকার লইয়া নানা লোকে অবস্থিত আছেন, এবং যতদিন অধিকার সমাপ্তি না হয়, ততদিন সেই সেই লোকে অবস্থান করেন।

যাবদধিকারং অবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।৩।৩২

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রের ভাষ্যে বলিতেছেন,—"ইতিহাস-পুরাণাদিতে কথিত আছে যে, ব্রহ্মবিদ্‌গণ দেহান্তর স্বীকার করেন। উদাহরণস্বরূপ অপান্তর-তমা নামক ঋষির কথা লওয়া যাইতে পারে। জীবন্মুক্ত পুরাণ বেদাচার্য্য ঋষি, ভগবান্ বিষ্ণুর আদেশে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নাম ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"

"ব্রহ্মবিদামপি কেষাঞ্চিৎ ইতিহাসপুরাণয়োঃ দেহান্তরোৎপত্তিদর্শনাৎ। তথাহি অপান্তরতমা নাম বেদাচার্য্যঃ পুরাণর্ষিঃ বিষ্ণুনিযোগাৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ সংবভূব।

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মত এইরূপে কেহ স্বয়ং সিদ্ধ হইয়াও জগৎ-শিক্ষক ব্যাস রূপে, কেহ বা মানব-অভিব্যক্তি-পরিচালক মনুরূপে কেহ বা পৃথিবীর সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ-বিরহিত ইন্দ্রাদি দেবতারূপ ভগবৎ-কার্য্য গ্রহণ করিয়া, অধিকার-সমাপ্তি যতদিন না হয়, ততদিন ঐ ঐ কার্য্য সম্পাদন করেন। এই সত্যের উপরই সাংখ্যসূত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন,—

উপাস্যা বা মুক্তস্ত।

"যাঁহাদিগকে দেবতারূপে উপাসনা করা যায়, তাঁহারা ঈশ্বর নহেন, তাঁহারা মুক্ত পুরুষ।"

তাই মৃত্যুরাজ যম সাবিত্রীকে বলিয়াছিলেন,—"জীব কর্ম্মদ্বারা ইন্দ্র হয়, কর্ম্মদ্বারা সনৎকুমারাদি ব্রহ্মপুত্র হয়। কর্ম্মদ্বারাই মানব শিবত্ব বা গণেশত্ব লাভ করে।"

কর্ম্মণেন্দ্রো ভবেজ্জীবো ব্রহ্মপুত্রঃ স্বকর্ম্মণা।

* * *

কর্ম্মণাচ শিবত্বঞ্চ গণেশত্বং তথৈব চ॥—দেবীভাগবতম্, ৯।২৭।১৮, ২০।

অতএব আমরা দেখিলাম, মুক্ত হইয়া যদিও তাঁহাদিগের এখন আর কোনও কর্ত্তব্য থাকেনা, যদিও এখন আর কিছু অবাপ্তব্য নাই, তথাপি মহাপুরুষগণ লোক-রক্ষার জন্য নানা অধিকার লইয়া অবস্থিত থাকেন। জীব মানবের অভিব্যক্তি যে ঋষি সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত, শাস্ত্র তাহাকে ঋষি-সঙ্ঘ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই ঋষি-সঙ্ঘই আবার ব্রহ্মবিদ্যার রক্ষক। তাই শ্রুতি ব্রহ্মবিদ্যাকে এইরূপে বিশেষিত করিয়াছেন,—

প্রোবাচ সম্যক ঋষি-সঙ্ঘজুষ্টম্।—শ্বেত, ৬।২২।

এই ঋষি-সঙ্ঘই জীব-অভিব্যক্তির পরিচালক ও ব্রহ্মবিদ্যার ধাবক, ব্রহ্মবিদ্যার পালক, ব্রহ্মবিদ্যার রক্ষক। বৌদ্ধও এই কথা স্বীকার করেন। তিনিও অভিবাদন করেন,—

ওঁ নমঃ সর্ব্ববুদ্ধায় বোধিসত্ত্বসঙ্ঘেভ্যঃ।

সপ্তমার্গের যেটিকে আমরা পার্থিব নামে অভিহিত করিয়া আসিয়াছি, তাহার শীর্ষে এখনও বুদ্ধ দণ্ডায়মান। তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন সত্য, মহত্তর লোকে যাইয়া মহত্তর কার্য্যের ভার লইয়াছেন সত্য, কিন্তু এখনও পৃথিবীর সম্পূর্ণ সম্বন্ধ ত্যাগ করেন নাই। যিনি এখন দেবমানব-শিক্ষক, সেই জগদ্গুরু বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়কে অবলম্বন করিয়া তিনি জগতের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়াছেন এবং বৎসরান্তে একদিন,—বৈশাখী-পূর্ণিমায়, তিনি মহাজ্যোতিঃরূপে আবির্ভূত হন এবং জগদ্বাসী সকলকে আশির্ব্বাদ করেন।

এখনও পার্থিব-মার্গে যাঁহারা লোক-রক্ষার ভার লইয়া অবস্থিত, তাঁহাদিগের মধ্যে যে দুই জন সর্ব্ব প্রধান, তাঁহাদিগের একজন মনুরূপে ও একজন জগদ্গুরুরূপে বিরাজ করিতেছেন। আমরা তাঁহাদিগের সম্বন্ধে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। তাঁহাদিগের নিম্নে তদধীনস্থ অপর জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ নানা অধিকার লইয়া আছেন। ব্রহ্মবিদ্যা-সমিতির শিক্ষয়িত্রী ম্যাডাম্ ব্ল্যাভাস্কি তাঁহাদিগকে Chohan (শিক্ষক) এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। থিওসফিকেল সোসাইটীর যাঁহারা প্রতিষ্ঠাতা, সেই মহা-পুরুষদ্বয়—দেবাপি ও মরু এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। ইঁহাদিগের একজন ভবিষ্যৎ মনু, অন্যজন জগদ্গুরু হইয়া জগৎ পালন করিবেন। তাঁহাদিগের কথা হিন্দু-শাস্ত্র এইরূপে বলিতেছেন ;—

দেবাপিঃ শান্তনোর্ভ্রাতা মরুশ্চেক্ষ্বাকুবংশজঃ।
কলাপ গ্রাম আসাতে মহাযোগবলান্বিতৌ॥
তাবিহেত্য কলেরন্তে বাসুদেবানুশিক্ষিতৌ।
বর্ণাশ্রমযুতং ধর্ম্মং পূর্ব্ববৎ প্রথয়িষ্যতঃ॥—ভা—পু, ১২।২।৩৮

"শান্তনুর ভ্রাতা দেবাপি এবং ইক্ষ্বাকু বংশজ মরু মহাযোগবলান্বিত হইয়া কলাপ গ্রামে বাস করিতেছেন। স্বয়ং বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের শিক্ষক। কলির অন্তে তাঁহারা আমাদের মধ্যে প্রকট হইয়া আবার বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম স্থাপিত করিবেন।" এই ভবিষ্যৎ মহৎ কার্য্যের উদ্দেশ্যে লোক সংগ্রহ করিবার জন্য, তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যা-সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই মহাপুরুষদ্বয়ের নিম্নে আবার অপর জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ (Masters) এবং তাঁহাদিগের দীক্ষিত বহুশিষ্য বর্ত্তমান আছেন। তাঁহারাও নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট অধিকারে মানব-কল্যান-সাধন করিতেছেন।

এইরূপে জগৎ-পালনের আর আর যে বিভাগ আছে, তাহাদিগেরও প্রত্যেকটীতে এক একজন প্রধান এবং তন্নিম্নে তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ বর্ত্তমান আছেন। তাঁহাদিগের

সকলের উপর বর্ত্তমান সেই,—বৈষ্ণবানামগ্রণীশো জ্ঞানিনাঞ্চগুরোর্গুরুঃ" * চির-কুমার † সনৎকুমার এবং তাঁহার ভ্রাতৃত্রয়,—সনক, সনন্দ ও সনাতন। বৌদ্ধেরা যাঁহাদিগকে প্রত্যেক-বুদ্ধ বলেন, এই তিনজন সেই প্রত্যেক-বুদ্ধ। যেমন জগদ্‌গুরুর পরিণাম বুদ্ধত্ব, সেইরূপ মনু, তাঁহার অধিকার শেষ হইলে প্রত্যেক-বুদ্ধ হ'ন। এই চির-কুমার সনৎ-কুমার ও তাঁহার সহচারী সম্ভোগ-কায়ধারী প্রত্যেক-বুদ্ধ-ত্রয় আমাদিগের জগৎ-পরিচালকদিগের প্রভু। আমরা তাঁহাদিগকে উদ্দেশে প্রণাম করি, তাঁহারা জগতের মঙ্গলবিধান করুন। তোমার তত্ত্ব সর্ব্বশাস্ত্র হইতে হিন্দুশাস্ত্রে বিশেষভাবে পরিস্ফুট থাকিলেও, আমরা, হে চিরকুমার, জ্যেষ্ঠ, ঋষিসত্তম সনৎ-কুমার! তোমাকে ভুলিয়াছি! যাঁহার সম্মতি না হইলে কেহই বৌদ্ধ-মার্গে দীক্ষা লাভ করিতে পারে না, আমরা তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়াছি! বারান্তরে তাঁহার বিষয়ে আলোচনা করিবার সাধ রহিল। শক্তি দাও, হে সর্ব্বশক্তিমান্! জ্ঞান দাও, হে জ্ঞানিগণের ঈশ্বর! হে গুরুর গুরু! যেন তোমার পরিচয় দিতে পারি!

শান্তিঃ। শান্তিঃ। শান্তিঃ।

শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

চিত্র-প্রসঙ্গ। আমাদের দেব-মন্দিরে রক্ষিত নানা দেবদেবীর মূর্ত্তির ন্যায় ইয়োরোপে নানাদেশে প্রধান-গির্জ্জা-মন্দিরের অভ্যন্তরে খৃষ্টমূর্ত্তি সকল রক্ষিত আছে। ঐ সকল প্রতিকৃতি নানাস্থানে নানাপ্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্য হইতে আমরা একখানি চিত্রের প্রতিকৃতি বর্ত্তমান-সংখ্যা "ব্রহ্মবিদ্যার" প্রথমেই মুদ্রিত করিলাম। এই চিত্রে যীশুখৃষ্টের গৌরবান্বিত কোমল পবিত্র সৌন্দর্য্যময় মুখশ্রী প্রকটিত হইয়াছে। চক্ষু গম্ভীর অথচ করুণাব্যঞ্জক, মুখ চিত্তাকর্ষক কিন্তু ক্ষীণ ও দৃঢ়, দক্ষিণ হস্ত আশীর্ব্বাদ-প্রদানার্থ উদ্যত, বাম হস্তে একখানি গ্রীক অক্ষরে লিখিত পুস্তক খুলিয়া ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। এ মূর্ত্তি ক্রুশ-বদ্ধ, যন্ত্রণাভোগী, মুমূর্ষু বলির প্রতিকৃতি নহে। ইহা মনুষ্য-সমাজে বিচরণশীল মনুষ্যমূর্ত্তি—জগদ্‌গুরু—মানব ও দেবতার উপদেষ্টা-মূর্ত্তি!

---

* ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড, ১২৯ অঃ

† সন্ নিত্যকুমারস্তেন সনৎকুমারঃ
যথোৎপন্নস্তথৈবাহং কুমার ইতি বিদ্ধি মাম্।
তস্মাৎ সনৎকুমারেতি নামৈতন্মে প্রতিষ্ঠিতম্॥—হরিবংশ।

বিদ্যালয়ে অধ্যাত্মবিদ্যা। গত ২৬শে জানুয়ারি তারিখের বোষ্টন সাটারডে পোষ্ট পত্রে শিক্ষাসম্বন্ধীয় সম্পূর্ণ নূতন উদ্যমের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আত্মতত্ত্বানুসন্ধান সম্বন্ধে রীতিমত শিক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে। "রিচার্ড হজসন স্মৃতি" নামে একটী ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে এবং সেই ভাণ্ডারে ১০০০০ ষ্টার্লিং মুদ্রা সংগৃহীত হইয়া আত্মতত্ত্বানুসন্ধান উদ্দেশ্যে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে। ডাক্তার হজ্‌সন সাহেব জীবদ্দশায় এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করিয়াছিলেন যে, মৃত্যুর পরেও লোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ কথাবার্ত্তা হইতে পারে এবং সর্ব্বদাই বলিতেন যে, এই মর্ত্ত্যের সীমা পার হইয়া গেলে তিনি তাঁহার কোন বন্ধুর নিকট উপস্থিত হইয়া দর্শন দিবেন। কিরূপ রীতি অনুসারে উক্ত অনুসন্ধান কার্য্য সম্পন্ন হইবে তাহা তখন নিরূপিত হয় নাই; তবে সম্ভবতঃ লণ্ডন সোসাইটী কর্ত্তৃক পরিগৃহীত রীতি সম্পূর্ণ বা কিঁয়ৎ-পরিমাণে অনুসৃত হইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এইরূপ শিক্ষার অনুষ্ঠান হইবে, ইহা যথার্থই উন্নতির লক্ষণ। ডাক্তার হজ্‌সন সাহেবের বন্ধুগণ তাঁহাদের বন্ধুর নাম এইরূপ শিক্ষাব্যাপারে উন্নতিকর অনুষ্ঠানে সংযোগ করিয়া দিয়া বন্ধুর উপযুক্ত সম্মান রক্ষা করিয়াছেন।" থিওজফিষ্ট, জুন, ১৯১৩।

স্বাস্থ্যোন্নতির উপায় অনুষ্ঠান। গত চৈত্র মাসে চট্টগ্রাম সহরে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের অধিবেশনে একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তাহার নিম্নলিখিত অনুলিপিটী বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সম্পাদক "ব্রহ্মবিদ্যায়" প্রকাশার্থ পাঠাইয়াছেন এবং তদ্বিষয়ে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

"যাহাতে স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ে প্রবন্ধ এবং পুস্তকাদি লিখিত হয়, এবং সাধারণমধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হয়, তদ্বিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য ষষ্ঠীবঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে ও সংবাদপত্রের সম্পাদকগণকে অনুরোধ করিতেছেন।"

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং।"

স্বাস্থ্যহানি হইলে আধ্যাত্মিক ধর্ম্মানুশীলনই বলুন, সামাজিক ধর্ম্মাচরণই বলুন, আর শিল্প-ব্যণিজ্য-সাহিত্যের উন্নতি-চেষ্টাই বলুন, কিছুই কার্য্যকর হইতে পারে না। সুতরাং স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে প্রত্যেকেরই যত্নশীল হওয়ার প্রয়োজন। বিশেষতঃ এক্ষণে যে দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া প্রভৃতি বিবিধ দেহভঙ্গকারী রোগসমূহ বঙ্গদেশের সমস্ত স্থানে অধিকার-বিস্তৃতি করিয়াছে, তাহাতে অনতিবিলম্বে স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধে মনোযোগী না হইলে, এক্ষণে লোকক্ষয়রূপ রাক্ষস শনৈঃ শনৈঃ যেরূপ অগ্রসর হইয়া বহু পল্লী জনশূন্য ও জঙ্গলময় করিয়া তুলিতেছে, তাহার প্রভাবে কিছুদিন পরে হয়ত বা সমস্ত দেশ ও জাতি কালের করাল-

গ্রাস হইতে কোনরূপে নিজেকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে না, অথবা মুষ্টিমেয় রোগগ্রস্ত জীবিত ব্যক্তি দেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র পলায়নপর হইবে এবং হয়ত বা বাঙ্গালীর বুদ্ধিমত্তার গৌরবনিশান চিরকালের জন্য বিস্মৃতি-গহ্বরে প্রোথিত হইয়া যাইবে। অতএব সাহিত্য সম্মিলন এ বিষয়ে স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া আমাদিগের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। দেশের সমস্ত উপযুক্ত ব্যক্তিরই এ বিষয়ে বিদ্যা বুদ্ধি ও সামর্থ্য নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ আমরা সমস্ত ডাক্তার, কবিরাজ, চিকিৎসক মহাশয়কেই এ বিষয়ে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ও মতামত প্রকাশ জন্য বিশেষরূপ অনুরোধ করিতেছি ; এক্ষণে স্বাস্থ্যসম্বন্ধে যে সকল মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে অথবা পুস্তিকাকারে সেই সকল মতামত আমরা দেখিতে চাই। আমাদের আশা আছে যে, "স্বাস্থ্যসমাচারে" ও "শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে" এ বিষয়ে বহু আন্দোলন ও উপায় অনুষ্ঠানের উপদেশ প্রচারিত হইবে। বাস্তবিক অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই ইহাতে মনোযোগ দান একান্ত আবশ্যক।

আমাদের বিশ্বাস আছে যে, যে কোন বিহিত উপায় উদ্ভাবিত হইবে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যদি গবর্ণমেণ্টের কোন সাহায্যের আবশ্যক হয়, তবে সে সাহায্য প্রদান করিতে আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্ট কোনমতেই উদাসীন থাকিবেন না। বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্ট আমাদের নিকট হইতে উক্তরূপ সহকারিতা, সাহচর্য্য ও সহানুভূতি পাইতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। আমাদের নিজের অভাবসম্বন্ধে আমাদের যতদূর অনুভূতি হইবে এবং তন্নিরাকরণ-বিধান সম্বন্ধে আমরা যত অভিজ্ঞ অভিমত প্রদান করিতে সমর্থ হইব, অপরে সেরূপ কখনই করিতে পারিবে না।

এ বিষয়ে আমাদের আর একটী বক্তব্য আছে। বঙ্গের নানাস্থানের স্থানীয় জমীদারগণেরও সহানুভূতি, সাহায্য ও কার্য্যকারিতা এ বিষয়ে বিশেষরূপে প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। প্রজাগণ যেরূপ জমীদারগণের খ্যাতি-প্রতিপত্তির একমাত্র অবলম্বন, প্রজারক্ষণও সেইরূপ জমীদারগণের একান্ত কর্ত্তব্য ; প্রজার স্বাস্থ্যহানির সহিত জমীদারের নানারূপ ক্ষতির সম্ভাবনা নিশ্চিত। অতএব এ বিষয়ে জমীদারগণের অগ্রগামী হওয়া উচিত, ইহাতে তাঁহাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল ও পুণ্য সঞ্চয় হইবে।



"তুমি হৃদয় মাঝে বিরাজ কর তবুও তোমায় নাহি পাই।"

৺ব্রহ্মবিদ্যা

২য় বর্ষ।] ভাদ্র, ১৩২০। [৫ম সংখ্যা।

বরাহ মূর্ত্তি।

ব্রহ্মনিশা-অবসানে সরোজসম্ভব
প্রবুদ্ধ হইলে পদ্ম'পরে,
ধরেন বরাহ মূর্ত্তি বিষ্ণু নারায়ণ
সর্ব্বভূত পালনের তরে।
শুচি-জলক্রীড়া-রুচি-শুভদেহ ধরি'
আদি দেব স্বেচ্ছায় অমনি
বিশাল-দশন-অগ্রে উদ্ধারিলা আশু
জলমগ্ন বিপুল ধরণী।
বেদ,—পাদ ; যূপ,—দংষ্ট্রা ; ক্রতু,—দন্তাবলী ;
চিতি,—মুখ জ্যোতির কন্দর ;
অগ্নি,—জিহ্বা ; দর্ভ,—রোম ; বেদার্থ,—মস্তক,—
জ্ঞানে যাহা গরিম-সুন্দর ;
যুগনেত্র,—অহোরাত্র ; ঘৃতধারা,—নাসা ;
বেদ-কর্ণে বেদাঙ্গ ভূষণ ;
শ্রুবা,—তুণ্ড,—রত যাহা যজ্ঞহবিঃভোগে ;
সামগান ঘর্ঘর-নিঃস্বন ;—
অন্তরাত্মা,—প্রাগ্‌বংশ-অন্তর্গত বেদি ;
সোমরস—শোণিত-নিচয় ;
বেদি,—স্কন্ধ ; গন্ধ, হবিঃ ; হব্য কব্য,—বেগ ;
স্ফিক্‌,—মন্ত্র ; দক্ষিণা,—হৃদয় ;
উপাকর্ম্ম,—ওষ্ঠাধর ; প্রাগ্‌বংশ,—দেহ ;
ধর্ম্মজল-প্রবাহ, ভূষণ ;
ললিত-বিবিধচ্ছন্দঃ গতিপথ—আর
গুহ্য উপনিষদ আসন ;

এ যজ্ঞ-বরাহরূপী প্রভু নারায়ণ
অবনীরে স্থাপিলে আবাসে,—
সাগরাম্বুরাশি পুনঃ পশিল সাগরে,
নদী-নীর তটিনীর পাশে।
পল্বলে পল্বলজল, সরোবারি পুনঃ
সরোবরে করিল প্রবেশ ;
এরূপে পৃথিবীপ্লাবি-সলিল-সম্ভার
যথাস্থানে হ'ল সমাবেশ।
সপ্তদ্বীপ, সপ্তসিন্ধু, লোক, লোকপাল,
স্থানপাল, সর্প, সুরাসুর,
পশু, পক্ষী, গিরি, নদী, সপ্তর্ষি সকল,
সাঙ্গ বেদ, গন্ধর্ব্ব কর্ব্বুর,
ইন্দ্রধনু, ষড় ঋতু, জীমূত-পটল,
সুদিদ্যুৎ বিদ্যুৎবিকাশ,
পুষ্পে পুষ্পে সুহসিত সুরভিত দ্রুম,
অরণ্যানী নন্দন-নিবাস,
রচন-কুশল করে রচিয়া অমনি
দেব দেব বরাহ-মূরতি
অতর্কিতে, অলক্ষিতে অবিদিত ধামে
রমা সনে করিলা বসতি।
মুক্ত রূপে দীপ্ত দেহে উদধি-উদ্ধৃত
সশৈল-কানন-সিন্ধু ধরা
বরাহ-চরণ স্মরি' স্তুতি আরম্ভিলা,—
কণ্ঠ তার হ'ল ভাবে ভরা,
"প্রত্যক্ষ ধরম সত্য তুমি নিত্যদেব!
নানাশিক্ষা-দীক্ষা-সমন্বিত!
মণিময় নগশ্রেষ্ঠ-শৃঙ্গ-সম কায়!
সুষ্ঠ-চারুচন্দন-চর্চ্চিত!
আদি প্রভু! অবতরি অবতার-পথে
রঙ্গে পত্নীছায়া সঙ্গে করি'
একি, আস্বাদিলা তুমি লীলামৃত রস
বার বার নবরূপ ধরি'!

বাঁধিলে দাসীরে দেব ! অটুট অক্ষয়
আজি কিবা কৃতজ্ঞতা ডোরে !—
তুমি না রক্ষিলে হরি ! কে রক্ষিত মোরে
পাতালের অন্ধতম ঘোরে ?"
নূতন সঙ্গীত ধরি' নূতন প্রভাতে
নূতন-পবন পরশনে
বিমোহিয়া লোকপাল স্থানপাল গণে
প্রণমিল প্রভুর চরণে।

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

শ্রীকৃষ্ণ।

কোথা হে রাসবিহারী, বংশীধারী, কোথায় বল লুকিয়ে রবে ?
তোমার ভুবনভরা চরণ দু'টী, কি হবে হে লুকিয়ে তবে ?
আমি তোমার দেয়া আমি ল'য়ে, তোমার পানেই চেয়ে রই ;
তুমি নিজের পূজা নিজেই কর, আমি ত নই তুমি বই !
আমি তোমার গঠা হৃদয় ল'য়ে, করি তোমার আবাহন ;
তুলি তোমার সৃষ্ট কুসুমগুলি, সাজাই তব শ্রীচরণ।
তোমার মধুর হাসি কালশশী যেদিকে চাই দেখ্‌তে পাই ;
সদা বাঁশীর রবে আকুল হ'য়ে তোমার কাছে ছুটে যাই।
তুমি বাজাও বাঁশী "রাধে" বলে তবুও আমার মনে হয়,
শেষে বাঁশীর রবে মোহিত করে পালাও পাছে দয়াময়।
তোমার চরণ জ্যোতি ল'য়ে চোখে খুঁজি তোমায় সকল ঠাই ;
তুমি হৃদয় মাঝে কর বিরাজ তবুও তোমায় নাহি পাই।

শ্রীরাধা—

চৈতন্য কথা।

রাধাকৃষ্ণতত্ত্বের সমাধান।

পদ্মপুরাণে সহজ কথায় বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিলে ব্রজবাসী-গণ বিমানারূঢ় হইয়া বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে দেহ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা অভিনব দেহে অপ্রকট লীলায় সঙ্গত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা "বাসাংসি জীর্ণানি" ত্যাগ করিয়া নিত্যলীলার উপযোগী দেহ ধারণ করিয়াছিলেন।

জীব গোস্বামী বলেন, এমন ত ব্রহ্মলোক-গমন ব্রজবাসীদিগের পক্ষে নূতন নয়। দশম স্কন্ধের অষ্টাবিংশতি অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে নন্দ অরুণোদয়ের পূর্ব্বে স্নানার্থে কালিন্দীর জলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই জন্য বরুণদেবের অনুচরগণ তাঁহাকে বরুণালয়ে লইয়া গিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ বরুণের নিকট হইতে পিতাকে আনয়ন করিলেন। নন্দ বিস্মিত হইয়া সেই কথা জ্ঞাতিবর্গকে বলিলেন। গোপ-সকল মনে মনে ভাবিলেন, কৃষ্ণ কি আমাদিগকে সূক্ষ্ম গতি দেখাইবেন না? ভগবান্ তাঁহাদের হৃদয়ের কল্পনা জানিতে পারিলেন। তখন তিনি তমসের অপর পারে অবস্থিত নিজলোক তাঁহাদিগকে দেখাইলেন।

দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরম্।
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্‌ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনম্।
যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ॥
তে তু ব্রহ্মহ্রদং নীতা মগ্নাঃ কৃষ্ণেণ চোদ্ধৃতাঃ।
দদৃশুর্ব্রহ্মণোলোকং যত্রাক্রূরোহধ্যগাৎপুরা॥

এই ত ব্রজ-গোপেরা ব্রহ্মহ্রদে স্নান করিয়াই ব্রহ্মলোক দর্শন করিল। আবার শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে ব্রহ্মহ্রদ হইতে উদ্ধৃত করিয়া প্রকট বৃন্দাবনে পুনঃ স্থাপিত করিলেন।

অবশ্য পূর্ণশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণে সকলই সম্ভব। হয়ত এই ব্রহ্মলোক-দর্শন ক্ষণেকের জন্য। কিন্তু এই ব্রহ্মলোক দর্শনে হয়ত এক গভীর রহস্য নিহিত আছে। গোবর্দ্ধন-ধারণ ও রাসলীলার মধ্যভাগে নন্দের বরুণালয় হইতে প্রত্যানয়ন বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীধর স্বামী বলেন—

গোবর্দ্ধনং সমুদ্ধৃত্য বশেকৃত্বামরেশ্বরম্।
নন্দানয়নতঃ কৃষ্ণো বরুণঞ্চ বশেহনয়ৎ॥

'গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া কৃষ্ণ সুরপতি ইন্দ্রকে বশে আনিয়াছিলেন। নন্দকে আনয়ন করিয়া তিনি বরুণকেও বশবর্ত্তী করিয়াছিলেন।' বৈদিকধর্ম্ম-অনুযায়ী শাসন ইন্দ্র ও বরুণদেবের হস্তে ন্যস্ত। শ্রীকৃষ্ণ বিধির অতীত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এই জন্য বৈধকর্ম্মের নিয়োজক ইন্দ্র ও বরুণকে প্রথমে বশমধ্যে আনিয়াছিলেন।

হইতে পারে, অন্য রহস্যও ইহার মধ্যে আছে। হইতে পারে, গোপগণ দেহান্তরিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করিয়াছিলেন। সেই জন্যই হয়ত মহাভারতে রাসলীলার ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ নাই।

সে যাহাই হউক, প্রকট লীলা ও অপ্রকট লীলার মধ্যে যে দেহের ব্যবধান আছে, সে পক্ষে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যই ইহাতে প্রমাণ।

উদ্ধবের মুখে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীদিগকে বলিলেন—

মধ্যাবেশ্য মনঃ কৃৎস্নং বিমুক্তাশেষবৃত্তিযৎ।
অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যমচিরান্মামুপৈষ্যথ॥ ১০-৪৭-৩৬

এই কথা বলিয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে বলিলেন -

যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেঽস্মিন্ ব্রজ আস্থিতাঃ॥
অলব্ধরাসাঃ কল্যাণ্যো মাপুর্মদ্বীর্যচিন্তয়া॥

শ্রীকৃষ্ণ পাগল নহেন। তিনি প্রলাপ বাক্য বলেন না। তাঁহার বাক্যে অসংলগ্নতা থাকিতে পারে না। তাঁহার প্রতিকথাই তত্ত্বপূর্ণ।

'হে ব্রজসুন্দরীগণ! তোমরা, অশেষ মনোবৃত্তি ত্যাগ করিয়া, একমাত্র আমাতে চিত্ত সমাহিত কর! আমার ধ্যান করিতে করিতে অচিরাৎ আমাকে তোমরা প্রাপ্ত হইবে।' ব্রজসুন্দরীরা মনে মনে করিলেন, প্রভো! কেবল ধ্যান দ্বারা তোমাকে কেমন করিয়া পাইব? মানসিক ধ্যান ও তোমাকে সাক্ষাৎ দর্শন, এ দু'য়ে কি ভেদ নাই?

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের শঙ্কা সমাধান করিয়া তৎক্ষণাৎ বলিলেন "কেন, আপনারা কি জানেন না? যে সকল গোপনারী পতি, পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধু কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া, রাসলীলার জন্য গৃহ হইতে নির্গত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা কি করিয়াছিলেন?

অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্ গোপ্যাঽলব্ধবিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিত লোচনাঃ॥

তাঁহারা কৃষ্ণ-ভাবনা-যুক্ত হইয়া নিমীলিত লোচনে কৃষ্ণের ধ্যান করিয়াছিলেন।

এই ধ্যানের ফল কি হইয়াছিল?

দুঃসহপ্রেষ্ঠ বিরহতীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষ নির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ॥
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপিসঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ॥

'সেই গোপনারীগণের শুভ ও অশুভ কর্ম্মবীজ নষ্ট হইয়া গেল! তাঁহাদের প্রারব্ধের নাশ হইল। তাঁহারা গুণময় দেহ ত্যাগ করিলেন এবং নিত্য দেহে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিত্য সঙ্গত হইলেন।'

কথাটা বলিতে কি বাকি থাকিল? অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ গুণময় দেহ-ত্যাগের কথা স্পষ্টাক্ষরে বলেন নাই। তিনি কেবল মাত্র বলিলেন—

যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেঽস্মিন্ ব্রজ আস্থিতাঃ।
অলব্ধরাসাঃ কল্যাণ্যো মাপুর্মদ্বীর্য্যচিন্তয়া॥

হে কল্যাণীগণ, সেই গোপীগণ ধ্যান দ্বারা আমাকে যেরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তোমরাও সেইরূপে আমার ধ্যান দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

ভাগবতের পাঠক মাত্র জানেন, ব্রজগোপীরা জানিতেন, গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়া সেই গোপীগণ কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

প্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রত্যাগত হইয়া ব্রজগোপীদিগের সহিত নিত্য বাস করেন নাই। অপ্রকট লীলার জন্য অন্য গোপীদিগকে যেরূপ দেহত্যাগ করিতে হইয়াছিল, অবশিষ্ট গোপীদিগেরও সেইরূপ দেহত্যাগ সম্পূর্ণ সম্ভব। টীকাকারেরা বলেন, যে তাঁহারা অলব্ধরাস ছিলেন না, সেই জন্য তাঁহাদিগকে দেহত্যাগ করিতে হয় নাই। এ কথায় কোন যুক্তি দেখা যায় না। এ কথা শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদিত কথা নহে।

একথা কিন্তু সর্ব্ববাদিসম্মত যে, অপ্রকট নিত্য লীলায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীদিগের সহিত পুনরায় সঙ্গত হইয়াছিলেন। সেই অপ্রকট লীলা কি এবং অপ্রকট বৃন্দাবনই বা কি?

দশমস্কন্ধ সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের ঊনত্রিংশ শ্লোকের বৈষ্ণব-তোষিণী টীকায় জীব গোস্বামী বলেন

স চ প্রকাশো দ্বিবিধোজ্ঞেয়ঃ। প্রকটোঽপ্রকটশ্চ।

'সেই প্রকাশ দুই প্রকার। প্রকট ও অপ্রকট।'

তত্র প্রকটঃ প্রাপঞ্চিকেষু অভিব্যক্তিঃ। অপ্রকটস্তেষু অনভিব্যক্তিঃ।

• 'প্রাপঞ্চিক সাধারণ লোকে যাহা দেখিতে পায়, তাহাই 'প্রকট'। তাহারা যাহা দেখিতে পায় না, তাহাই 'অপ্রকট'।'

তত্র পূর্ব্বমষ্টাবিংশেঽধ্যায়ে যো গোলোকতয়া দর্শিতঃ শ্রীবৃন্দাবনস্যৈব প্রাপঞ্চিকেষু অপ্রকটঃ প্রকাশ বিশেষস্তত্র তদানীমপিস্থিতেন শ্রীকৃষ্ণস্য অপ্রকটাংশেন প্রকাশবিশেষেণ তাসামপি অপ্রকট প্রকাশৈঃ সংযোগঃ শ্রীবৃন্দাবন প্রকটপ্রকাশে প্রাক্স্থিতেন সম্প্রতি মথুরাপ্রকট প্রকাশং গতেন শ্রীকৃষ্ণস্য প্রকট প্রকাশেন তু তাসাং প্রকট প্রকাশৈঃ বিয়োগ ইতি।

'অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে ব্রহ্মহ্রদে স্নান করাইয়া কৃষ্ণ গোপদিগকে নিজলোক বা গোলক যাহা দেখাইয়াছিলেন, সে কেবল বৃন্দাবনেরই প্রকাশ বিশেষ। সাধারণ লোকে চর্ম্মচক্ষুতে সেই বৃন্দাবন দেখিতে পায় না। শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট অবস্থায় সেই বৃন্দাবনে তখনও ছিলেন। গোপগণ ব্রহ্মহ্রদে নিমগ্ন হইলে, তাঁহাদের সূক্ষ্ম দেহ স্থুল দেহ হইতে বিনির্গত হইয়া অপ্রকট রূপ ধারণ করিল এবং তখন তাঁহারা অপ্রকট বৃন্দাবনে অপ্রকট কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। আবার বৃন্দাবনে যতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের প্রকট প্রকাশ ছিল, ততক্ষণই ব্রজবাসীরা তাঁহার সহিত প্রকট রূপে সঙ্গত হইয়াছিলেন। আবার যখন সেই প্রকটমূর্ত্তি কৃষ্ণ মথুরায় গেলেন, তখন প্রকট কৃষ্ণের সহিত ব্রজবাসীদিগের বিরহ হইল।'

আমরা বলি, এই প্রকট লীলার কৃষ্ণ অন্য এবং অপ্রকট লীলার কৃষ্ণ অন্য।

কৃষ্ণোঽন্যো যদু সম্ভূতো যস্তু গোপাল নন্দনঃ।

বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য সক্কচিন্নৈব গচ্ছতি॥ —লঘু ভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ৫।৪৬১ শ্লোক।

'যদুকুলোদ্ভব কৃষ্ণ একজন এবং অপ্রকটলীলার গোপাল-নন্দন অন্যজন। ইনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র কোথাও গমন করেন না।'

এই অপ্রকট লীলার গোপগোপীগণ পূর্ব্বদেহ ত্যাগী। তাঁহাদের নব জন্ম, নবদেহ, নিত্য দেহ।

অপ্রকট লীলায় বংশীধারী নারায়ণ ঋষির দেহরূপ পূর্ব্ব-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া নবীন দেহ ধারণ করিয়াছেন। নারায়ণ ঋষির স্থলাভিষিক্ত মৈত্রেয় ঋষি।

নন্বতে তত্ত্বসংরাধ্য ঋষিঃ কৌশারবোঽন্তিকে।

সাক্ষাদ্ভগবতাদিষ্টো মর্ত্ত্যলোকং জিহাসতা॥ ভাঃ পুঃ ৩—৪—২৬

অপ্রকট বৃন্দাবনে অপ্রকট লীলা নিত্য সংঘটিত হইতেছে।

সে বৃন্দাবন প্রাকৃত লোক দেখিতে পায় না। সে বৃন্দাবন ভক্তের চক্ষুতে নিত্য বিরাজমান। সেই বৃন্দাবনে প্রবেশ-অধিকারের জন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা "ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে।"

পুরাণে ও তন্ত্রে সেই বৃন্দাবনের বিচিত্র বর্ণনা আছে ঃ—

তত্রাপি মহদাশ্চর্য্যং পশ্যন্তে পণ্ডিতানরাঃ।

কালিয়হ্রদপূর্ব্বেণ কদম্বো মহিতো দ্রুমঃ।

শতশাখং বিশালাক্ষি পুণ্যং সুরভিগন্ধিচ।

সচ দ্বাদশ মাসানি মনোজ্ঞঃ শুভশীতলঃ।

পুষ্পায়তি বিশালাক্ষি প্রভাসান্তো দিশোদশ।—বরাহ পুরাণ।

তস্য তত্রোত্তরে পার্শ্বেঽশোক বৃক্ষঃ সিতপ্রভঃ।

বৈশাখস্য তু মাসস্য শুক্লপক্ষস্য দ্বাদশী।

স পুষ্পাতি চ মধ্যাহ্নে মম ভক্তসুখাবহঃ।

ন কশ্চিদপি জানাতি বিনাভাগবতং শুচিম্।—বরাহ পুরাণ।

পবিত্র ভাগবত ভিন্ন সে বৃন্দাবনের কথা কেহ জানেনা। হাবড়া ষ্টেসনে টিকিট লইয়াই কেবল সে বৃন্দাবনে যাওয়া যায় না।

বৃহদ্ গৌতমীয় তন্ত্রে ভগবান্ এই বৃন্দাবনের কথা বলিয়াছেন ঃ—

ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলম্।

তত্র যে পশবঃ পক্ষিমৃগাঃ কীটানরামরাঃ।

যে বসন্তি মমাধিষ্ণ্যা মৃতা যান্তি মমালয়ম্।

তত্র যা গোপকন্যাশ্চ নিবসন্তি মমালয়ে।

যোগিন্যস্তা ময়ানিত্যং মম সেবাপরায়ণাঃ।

পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকম্।
কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী।
অত্রদেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ।
সর্ব্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং কচিৎ।
আবির্ভাব স্তিরোভাবো ভবেন্মেঽত্র যুগে যুগে।
তেজোময় মিদং রম্যং অদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষা।

'এই বৃন্দাবনে দেবগণ ও প্রাণীগণ সূক্ষ্মরূপে থাকেন। সর্ব্বদেবময় আমি কখনও এ বন ত্যাগ করি না। আমার যুগে যুগে এই বনে আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়। এই তেজোময় রমণীয় বৃন্দাবন চর্ম্মচক্ষু দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না।'

সেই অপ্রকট বৃন্দাবনে, অপ্রকট গোপ গোপীগণ অপ্রকট কৃষ্ণের সহিত নিত্যলীলা করিতেছেন। মহাপ্রভু সেই লীলার অবগুণ্ঠন কিঞ্চিন্মাত্র উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। আবার যদি তাঁহার অবির্ভাব হয়, তবে সেই বৃন্দাবনের কথা আমরা আরও জানিতে পারিব। সেই বৃন্দাবনের অধীশ্বর যদুসম্ভূত কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন অন্য কৃষ্ণ। সেই বৃন্দাবনের অধীশ্বরী শ্রীরাধা। সেই বৃন্দাবনে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ অনুসারে স্বয়ং হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা আসিয়া রাধা ও কৃষ্ণের বিবাহে পৌরহিত্য করেন। সেই বৃন্দাবনে অসংখ্য গোপ ও অসংখ্য গোপী। তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে নন্দব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কোন কোন গোপী পূর্ব্বজন্মে যদুসম্ভূত কৃষ্ণের সহিত রাস-সঙ্গমে মিলিত হইয়াছিলেন কিন্তু এই অপ্রকট বৃন্দাবনে সকল গোপীই পূর্ব্ব জন্ম হইতে রূপান্তরিত। এই রূপান্তর গ্রহণ করিতে তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার জন্ম লইতে হইয়াছিল, কিম্বা পূর্ব্ব দেহ ত্যাগ করিয়াই তাহারা নিত্য সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিয়াছেন, পুরাণে তাহার কোন বিচার দেখিতে পাওয়া যায় না। এবং আমরাও সে বিষয়ে ধৃষ্টতা প্রকাশ করিব না।

চৈতন্য-চরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন ঃ—

"লোকভিড়ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধে যাইয়া।
রূপগোসাঞিকে শিক্ষা করেন শক্তি সঞ্চারিয়া॥
কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব-প্রান্ত।
সব শিক্ষাইল প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত॥
রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল।
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল॥
শ্রীরূপ-হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্ব্বতত্ত্ব নিরূপিয়া প্রবীণ করিলা॥"—মধ্যলীলা, ১৯।

প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে
প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।

নিজাত্মরূপে প্রভুরেকরূপে
ততান রূপে স্ববিলাসরূপে ॥—চৈতন্য চন্দ্রোদয়, ৯—১৫

'যিনি প্রিয়স্বরূপ, দয়িতস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, সহজাতিরূপ, নিজাত্মরূপ, ও একরূপ, তাদৃশ রূপ-গোস্বামীতে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যপ্রভু নিজশক্তি বিস্তার করিয়াছিলেন।' মহাপ্রভুর শক্তিসঞ্চারে প্রেমিক রূপগোস্বামী সকল তত্ত্বই অবগত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে সকল তত্ত্বই বলিয়াছিলেন। কিন্তু একটি গূঢ়রহস্য, মহাপ্রভু, বলি, বলি করিয়াও তাঁহাকে বলিতে পারেন নাই। যাঁহার আদেশে স্বয়ং শুকদেব, সে রহস্য ভাগবতে প্রকাশ করেন নাই, তিনিই মহাপ্রভুর মুখে রূপগোস্বামীকে শিক্ষা দিতেছেন। যাহা এতদিন প্রকাশিত হয় নাই, আজ সহসা সে কথা কিরূপে প্রকাশিত করেন। শত সহস্র বৎসর, সমগ্র বৈষ্ণব-মণ্ডলী যে কথা জানিয়া আসিয়াছে, যে কথার উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের ভক্তির ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে, যে কথার সহিত তাহাদের ভগবৎ-প্রেম জড়িত রহিয়াছে—আজ সহসা সে কথায় কিরূপে তিনি দ্বিধা ভাব উৎপাদন করেন? কি করিয়া তিনি বলেন, যদুনন্দন অন্য এবং গোপীবল্লভ অন্য?

চৈতন্য মহাপ্রভু প্রয়াগ হইতে বারাণসী চলিলেন। রূপগোস্বামীও তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিলেন।

প্রভু কহে তোমার কর্ত্তব্য আমার বচন।
নিকট আসিয়াছি তুমি যাহ বৃন্দাবন॥
বৃন্দাবন হৈতে তুমি গৌড়দেশ দিয়া।
আমারে মিলিবে নীলাচলেতে আসিয়া॥"

রূপ তাহাই করিলেন। তিনি মহাপ্রভু কর্ত্তৃক হৃদয়ে সঞ্চারিত তত্ত্বসকল আলোচনা করিতে করিতে একটি কৃষ্ণনাটক লিখিতে ইচ্ছা করিলেন এবং কিছু কিছু লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সে নাটকে দ্বারকালীলা ও বৃন্দাবনলীলার অধিনায়ক একজন। যিনি রুক্মিনী ও সত্যভামার বল্লভ, তিনিই গোপীবল্লভ। তাঁহার কৃষ্ণনাটকে একজনই দ্বারকায় ও বৃন্দাবনে লীলা করিতে লাগিলেন।

এথা প্রভু আজ্ঞায় রূপ আইলা বৃন্দাবন।
কৃষ্ণলীলা নাটক করিতে হৈল মন॥
বৃন্দাবনে নাটকের আরম্ভ করিল।
মঙ্গলাচরণ নান্দী-শ্লোক তথাই লিখিল॥
পথে চলি আইসে নাটকের ঘটনা ভাবিতে।
কড়চা করিয়া কিছু লাগিলা লিখিতে॥
এই মতে দুই ভাই গৌড়দেশে আইলা।
গৌড়ে আসি অনুপমের গঙ্গা প্রাপ্তি হৈলা॥

রূপ গোসাঞি প্রভুপাশ করিল গমন।
প্রভুকে দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন॥
অনুপমের লাগি তাঁর বিলম্ব হইল।
ভক্তগণ পাশ আইল লাগি না পাইল॥
উড়িয়া দেশে সত্যভামাপুর নামে গ্রাম।
এক রাত্রি সেই গ্রামে করিল বিশ্রাম॥
রাত্রে স্বপ্ন দেখে এক দিব্যরূপা নারী।
সম্মুখে আসিয়া আজ্ঞাদিল কৃপা করি॥
'আমার নাটক পৃথক্ করহ রচন।
আমার কৃপাতে নাটক হবে বিলক্ষণ॥'
স্বপ্ন দেখি রূপ গোসাঞি করিল বিচার।
সত্যভামার আজ্ঞা পৃথক্ নাটক করিবার॥
ব্রজ পুর লীলা একত্র করিয়াছি ঘটনা।
দুই ভাগ করি এবে করিব রচনা॥

চৈতন্য-চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা ১

যাহা মহাপ্রভু নিজমুখে বলিতে পারেন নাই, সত্যভামার মুখ দিয়া সে কথার সূত্রপাত করিলেন। রূপের মন দোলায়মান হইতে লাগিল। সত্যভামার আদেশ অবশ্য তিনি পালন করিবেন। কিন্তু ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

রূপ ভাবিতে ভাবিতে নীলাচলে পঁহুছিলেন। মহাপ্রভু হরিদাসের কুটীরে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিলেন। একদিন—

আরদিন প্রভু রূপে মিলিয়া বসিলা।
সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি প্রভু কহিতে লাগিলা॥
'কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাঁহাতে॥'
কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্র নন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিন্নৈব গচ্ছতি॥
এত কহি মহাপ্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা।
রূপ গোসাঞি মনে কিছু বিস্ময় হইলা॥
'পৃথক্ নাটক করিতে সত্যভামা আজ্ঞা দিল
জানি পৃথক্ নাটক করিতে প্রভু আজ্ঞা হৈল॥
পূর্ব্বে দুই নাটক ছিল একত্র রচনা।
দুই ভাগ করি এবে করিব ঘটনা॥

দুই নান্দী প্রস্তাবনা দুই সংঘটনা ॥
পৃথক্ করিয়া লিখি করিয়া ভাবনা ॥'—চৈতন্য-চরিতামৃত অন্ত্য ১।

মহাপ্রভু যেন হেঁয়ালিতে কথাগুলি বলিয়া তৎক্ষণাৎ সরিয়া পড়িলেন।

এইবার ভক্তের হৃদয়ে তত্ত্ববীজের অঙ্কুরোদ্গম হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন—ব্রজলীলা স্বতন্ত্র, পুরলীলা স্বতন্ত্র।

মহাপ্রভু সেই অঙ্কুরে জল দিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রেরণায় ভক্তহৃদয়ে তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল।

রথযাত্রার দিন নৃত্য করিতে করিতে মহাপ্রভু একটি শ্লোক পড়িলেন :—

যঃ কৌমারহরঃ স এবহি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সাচৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপার লীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসী-তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥—কাব্য প্রকাশ ১·৪।

'যিনি আমার কৌমারকাল হরণ করিয়াছেন, ইনি সেই আমার অভিমত পতি। সেই চৈত্র মাসের রজনী, সেই বিকসিত মালতীর সৌরভযুক্ত কদম্বকাননের মন্দ মন্দ সমীরণ। আর আমিও সেই রহিয়াছি। তথাপি সেই রেবানদীর তীরবর্ত্তী বেতসী তরুর তলে সুরত বিধানার্থ আমার চিত্ত নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।'

এই শ্লোকের অর্থ জানে একলে স্বরূপ।
দৈবে সে বৎসর তাঁহা গিয়াছেন রূপ।
প্রভু মুখে শ্লোক শুনি শ্রীরূপ গোসাঞি।
সেই শ্লোকের অর্থে শ্লোক করিল তথাই ॥

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিতস্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুর মুরলী পঞ্চম জুষে মনো মে কালিন্দী পুলিন বিপিনায় স্পৃহয়তি ॥

'শ্রীরাধিকা কহিতেছেন, সহচরি! আমার সেই প্রণয়াস্পদ শ্রীকৃষ্ণ এই কুরুক্ষেত্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। আমিও সেই রাধিকা। উভয়ের মিলন-জনিত সুখও সেই। তথাপি আমার মন সেই যমুনাপুলিনবর্ত্তী বিপিন, যাহার অভ্যন্তরে মুরলীর পঞ্চমতান খেলিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে, সেই বিপিনের জন্য ব্যাকুল হইতেছে।'

শ্লোক করি এক তালপত্রেতে লিখিয়া।
আপন বাসার চালে রাখিল গুঁজিয়া ॥
শ্লোক রাখি গেলা সমুদ্র স্নান করিতে।
হেন কালে আইলা প্রভু তাঁহারে মিলিতে ॥
দৈবে আসি প্রভু যবে উর্দ্ধেতে চাহিলা।
চালে গোঁজা তালপত্রে সেই শ্লোক পাইলা ॥

শ্লোক পড়ি প্রভু আছেন আবিষ্ট হইয়া।
রূপ গোসাঞি আসি পড়ে দণ্ডবৎ হইয়া॥
উঠি মহাপ্রভু তাঁরে চাপড় মারিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু কোলেতে করিয়া॥
মোর শ্লোকের অভিপ্রায় কেহো নাহি জানে।
মোর মনের কথা তুমি জানিলে কেমনে॥
এত বলি তাঁরে বহু প্রসাদ করিয়া।
স্বরূপ গোসাঞিরে শ্লোক দেখাইল লইয়া॥
স্বরূপে পুছেন প্রভু হইয়া বিস্মিতে।
মোর মনের কথা রূপ জানিলা কেমতে॥
স্বরূপ কহেন যাতে জানিল তোমার মন।
তাতে জানি হয় তোমার কৃপার ভাজন॥
প্রভু কহে তারে আমি সন্তুষ্ট হইয়া।
আলিঙ্গন কৈল সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিয়া॥
যোগ্যপাত্র হয় গূঢ় রস বিবেচনে।
তুমি কহিও তারে গূঢ় রসাখ্যানে॥

রূপ গোস্বামী যে গূঢ় তত্ত্ব জানিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে তত্ত্ব ভাগবতে ও অন্যান্য পুরাণে জানিতে পারা যায় না, রূপ গোস্বামীর গ্রন্থে তাহা জানিতে পারা যায়। অবতার-তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিলেও পাওয়া যায় না। ভক্তিরসের অমৃত সিন্ধু এক অপূর্ব্ব শাস্ত্র। ইহার নূতনত্ব, ইহার গাম্ভীর্য্য, ইহার গূঢ় ভাব আলোচনা করিলে বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইতে হয়। চৈতন্যের শিক্ষায় ও লীলায় যাহা অভিনব ও অপরূপ, রূপগোস্বামী তাহার প্রদর্শক। ভারত-সাহিত্যে তিনি যে কবিত্বের স্থান অধিকার করেন, তাহা অত্যুচ্চ হইলেও সাধারণ লোকের অজ্ঞাত। তাঁহার প্রদত্ত অমৃত রস আস্বাদন করে, এমন লোকও বিরল।

যে তত্ত্বের সূচনা করা গেল, লঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে রূপগোস্বামী সেই তত্ত্ব বিশদ করিয়াছেন।

ক্রমশঃ

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

মৃত্যুর পরপারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রকৃত অবস্থা।

মনুষ্য-সমাজে পরলোকসম্বন্ধে নানা মতবাদ প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন, মৃত্যুর পর মানবের একটা অভাবনীয় আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘটে সে যাহা ছিল, তাহা আর থাকে না, অন্যরূপ হইয়া যায়। তাহার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচারশক্তি, কল্পনা এবং প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, দয়াদি, হঠাৎ এরূপ অস্বাভাবিকরূপে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে যে, সে এক উন্নত পুরুষ হইয়া গিয়া চিরকাল স্বর্গরাজ্যে অভূতপূর্ব্ব সুখ ভোগ করে। অথবা তাহার হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, অজ্ঞান মোহাদি অকস্মাৎ প্রবল হইয়া তাহাকে চির-নরকে পাতিত করে এবং তথায় অনন্তকাল নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ ভোগ করায়। কেহ বা বলেন, মানব পৃথিবী হইতে দূরে,—অতিদূরে, পরিদৃশ্যমান নক্ষত্রপুঞ্জের পরপারে, একটি অজ্ঞাত রাজ্যে চলিয়া যায় এবং অতঃপর তাহার আত্মীয় বন্ধুর বা পৃথিবীস্থ কোন জীবের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ থাকেনা। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা কি, আমরা তাহাই এখন বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।

বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হইতেছে, ততই আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করিতেছি। ততই বুঝিতেছি যে, ভগবানের রাজ্যে আকস্মিক, অস্বাভাবিক বা যুক্তি-বিগর্হিত কিছুই নাই। সমস্ত ঘটনা অচ্ছেদ্য নিয়ম-পরম্পরায় শৃঙ্খলাবদ্ধ। কারণ ব্যতীত কার্য্য হয়না। যেরূপ কারণ হইবে, কার্য্যটী সেইরূপই হইবে; যেরূপ কর্ম্ম করিবে, ফলও সেইরূপ পাইবে। অঙ্গাদি চালনা না করিয়া অলসভাবে বসিয়া থাক, শরীর রোগগ্রস্ত হইবে; ব্যায়ামাদি কর, শরীর সুস্থ থাকিবে। মনে দীর্ঘকাল কুভাব ও কুচিন্তা পোষণ কর, চিত্ত কলুষিত হইয়া যাইবে; সুভাব ও সুচিন্তা পোষণ কর, চিত্ত নির্ম্মল ও পবিত্র হইতে থাকিবে, ক্রমে সাধু হইয়া যাইবে। ইহজীবনে এইরূপ, পরজীবনেও এইরূপ।

পরজীবন একটা নূতন ব্যাপার নহে, উহা ইহজীবনেরই শেষ-অংশ বা পরিশিষ্ট মাত্র। প্রভেদ এই যে, ইহজীবনে স্থূলদেহ সূক্ষ্মদেহ ও কারণদেহ—তিনটি দেহ লইয়াই জীবাত্মা কর্ম্ম করেন; পরজীবনে তিনি স্থূলদেহটি ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম ও কারণদেহ মাত্র লইয়া থাকেন। সুতরাং মৃত্যুর পর মানুষের মনোভাব, চিন্তা, জ্ঞান বা শক্তির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে না। সে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, পরে ঠিক সেইরূপই থাকে মনে করুন, আপনার একটি over-coat বা চোগা আছে। বাহিরে যাইবার সময় ইহা পরিধান করেন, ঘরে আসিলে ত্যাগ করেন। কিন্তু ইহা দ্বারা আপনার চিত্তের বা

চরিত্রের কোন পরিবর্ত্তন হয় কি? ইহা খুলিলেই আপনি কি একটা প্রকাণ্ড জ্ঞানী বা ভক্ত অথবা নাস্তিক ও পাষণ্ড হইয়া পড়েন? মানুষের সহিত তাহার স্থূলদেহের ঠিক এইরূপ সম্বন্ধ। সে স্থূলদেহটি ধারণ করুক বা ত্যাগ করুক, যেমন মানুষ তেমনই থাকে। তবে, একটা বিষম বোঝা ত্যাগ করাতে সে অনেকটা আরাম ও স্বচ্ছন্দতা বোধ করে।

অতএব, ইহজীবনে আমরা যেরূপ চিন্তা ও ভাবনা করি, পরজীবনেও মনের অবস্থা ঠিক সেইরূপ হয়। যে ব্যক্তি এখানে কাম ক্রোধ লোভ হিংসাদি দ্বারা চালিত হন, তিনি সেখানে গিয়াও এই সকল রিপুর হাত এড়াইতে পারেন না। ইহজীবনে যাঁহার দয়া ভক্তি প্রেমাদি প্রবল, পরজীবনেও তিনি এই সকল ভাবে বিভোর থাকেন। ফল কথা এই যে, আমরা নিজেই আমাদের ভবিষ্যৎ রচনা করি, ঐহিক কর্ম্ম দ্বারাই পরলোক সুখময় বা দুঃখময় হয়। এই জন্যই একজন তত্ত্বদর্শী বলিয়া গিয়াছেন—

নমস্তৎকর্ম্মভ্যঃ বিধিরপি ন যেভ্যো প্রভবতি।

'কর্ম্মকেই নমস্কার করি, কারণ যেরূপ কর্ম্ম করিব, বিধাতা সেইরূপই ফল দিবেন'।

এখন দেখা যা'ক, পরলোক কোথায় ও কিরূপ, এবং মৃত ব্যক্তিগণের সহিত আমাদিগের সাক্ষাদাদি হওয়া সম্ভব কি না। অনেকের ধারণা, পরলোক পৃথিবী হইতে বহুদূরে এবং মৃত ব্যক্তির সহিত মর্ত্ত্যবাসীর কোন সম্বন্ধ থাকে না। ইহা নিতান্ত ভ্রম। পরলোক পৃথিবী হইতে দূরে নহে, পৃথিবীর মধ্যেই ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত। পৃথিবী বা ভূলোক কঠিন, তরল, বাষ্প ও ইথার—এই চারি প্রকার পদার্থে নির্ম্মিত। কিন্তু ইথার হইতে লক্ষ লক্ষ গুণ সূক্ষ্ম ও লঘু পদার্থ আছে। আধুনিক বিজ্ঞান ইহার অস্তিত্ব অবগত নহেন। এই সকল সূক্ষ্ম পদার্থের নাম অপ্‌তত্ত্ব (astral matter), তেজস্তত্ত্ব (mental matter) ইত্যাদি। এই সকল সূক্ষ্ম পদার্থ দ্বারাই পরলোক নির্ম্মিত। ইথার যেরূপ জল বায়ু মৃত্তিকাদি অপেক্ষা সূক্ষ্ম বলিয়া এই সকল পদার্থের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, পরলোকও সেইরূপ ইথার অপেক্ষা সূক্ষ্ম বলিয়া পৃথিবী ও বায়ুস্তরের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, পৃথিবীর ভিতরে ও (কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত) বাহিরে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থান করিতেছে। সুতরাং পরলোক একটা দূরবর্ত্তী নক্ষত্রপুঞ্জে অবস্থিত নহে, আমাদেরই ঘর বাড়ী, গ্রাম নগর, রাস্তা ঘাট, বাজার হাটের মধ্যেই অবস্থিত। হয়ত পরলোকগত কত ব্যক্তি, হয়ত আমার কত মৃত আত্মীয়, আমার ঘরের প্রাচীর ভেদ করিয়া নিয়ত যাতায়াত করিতেছেন, বা আমার সম্মুখে দাঁড়াইতেছেন, অথচ আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। দেখিতে না পাইবার কারণ কি? কারণ এই যে, আমার ইন্দ্রিয়গুলি (চক্ষু কর্ণাদি) বড়ই সীমাবদ্ধ, একটি নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। ঐ গণ্ডীর বাহিরে যাহা কিছু আছে, তাহা দেখিবার বা জানিবার শক্তি ইন্দ্রিয়ের নাই। আমরা বায়ুও দেখিতে পাই না, স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করি মাত্র। ইথার কোন ইন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য নহে। সুতরাং অপ্‌তত্ত্ব (যাহা ইথার অপেক্ষা অনেক গুণে সূক্ষ্ম এবং যদ্দ্বারা মানবের সূক্ষ্মদেহ নির্ম্মিত)

কিরূপে চর্ম্মচক্ষুর গোচর হইবে? কিন্তু চর্ম্মচক্ষুর গোচর না হইলেও উহা দিব্যচক্ষুর গোচর বটে। মানব মাত্রেরই এই দিব্যচক্ষু আছে। উহা ভ্রূযুগলের মধ্যে অবস্থিত। অনেকের এই চক্ষু খুলিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ মানবেই উহা নিমীলিত। উহা খুলিতে হইলে সাধনা চাই। এক সময়ে না এক সময়ে সকল মানবেরই উহা খুলিবে। যাঁহাদের দিব্যদৃষ্টি খুলিয়াছে, তাঁহাদের নিকট ইহলোক ও পরলোক নাই,—সবই ইহলোক। সুতরাং "জীবিত" ও "মৃত"—এই দুইটি শব্দ অর্থশূন্য। তাহারা "জীবিত" ব্যক্তিগণের সহিত যেরূপ আলাপাদি করেন, "মৃত" ব্যক্তির সহিতও সর্ব্বদা সেইরূপ কথাবার্ত্তা ও সাক্ষাদাদি করিতে পারেন।

তবে কি দিব্যদৃষ্টি না খুলিলে মৃত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাদাদি হয় না? হয় বৈ কি। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিদ্রাকালে মৃতের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করেন। নিদ্রিত হইবা-মাত্র তাঁহার জীবাত্মা সূক্ষ্মদেহটি লইয়া স্থুলদেহ ত্যাগ করে এবং পরলোকে বিচরণ করে। স্থুলদেহ ত্যাগ করে বটে, কিন্তু একটি সংযোগ-তন্তু থাকে। মৃত্যুকালে এই সংযোগটি একবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। নিদ্রা ও মৃত্যুতে ইহাই প্রভেদ। সে যাহা হউক, নিদ্রাকালে পরলোক ভ্রমণ করিবার সময় আমরা যে কত মৃত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করি, তাহার ইয়ত্তা নাই। কখনও কখনও নিদ্রাভঙ্গের পর ইহার একটু আধটু স্মৃতি থাকে। তখন আমরা বলি, "কল্য রাত্রিতে এইরূপ একটা স্বপ্ন দেখিয়াছি।" কিন্তু বেশীর ভাগই আমরা ভুলিয়া যাই। স্মরণ থাক্ আর নাই থাক্, প্রকৃত ঘটনাই এই। সূক্ষ্মদেহে ভ্রমণ করিবার সময় আমরা পরলোক দেখিতে পাই, সুতরাং তত্রত্য অধিবাসীদিগের সহিত স্বচ্ছন্দে আলাপাদি করি। কিন্তু জাগ্রদাবস্থায় আমরা স্থুলজগতে নিমগ্ন হইয়া থাকি, স্থুলপদার্থের প্রতিই আমাদের সমগ্র মনোযোগ প্রদত্ত হয়; সুতরাং সূক্ষ্মলোক ও "মৃত" ব্যক্তিগণ আমাদের চারিদিকে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিলেও আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু আমরা দেখিতে না পাইলেও, তাঁহারা আমাদিগকে দেখিতে পান।

সূক্ষ্মজগৎ, সূক্ষ্মদেহ প্রভৃতির ধারণা করা অনেকের দুরূহ বোধ হইতে পারে। যাহা চর্ম্মচক্ষুতে দেখা যায়, তাহাই তাঁহারা বুঝিতে পারেন, ধারণা করিতে পারেন। যাহা চর্ম্মচক্ষুর অগোচর, তাহার অস্তিত্বে তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। ইঁহাদিগকে আমরা দু'একটি কথা বলিতে চাই। স্থুলদৃষ্টিতে দেখা না গেলেই তাহা নাই—এরূপ সিদ্ধান্ত কদাপি করা যায় না। অণুবীক্ষণ ও দুরবীক্ষণের আবিষ্কারের পূর্ব্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য কীট ও শত শত গ্রহ নক্ষত্র আমরা দেখিতে পাইতাম না। কিন্তু তাহারা কি তৎকালে ছিল না? বিজ্ঞানবিদ্ ইথার দেখিতে না পাইলেও উহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন কি না? বায়ুর কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট স্পন্দন আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রহণ করিতে সক্ষম, ঐ গণ্ডীর বাহিরে সে যাইতে পারে না। তাই বলিয়া কি বলিব, "আমরা যে সকল শব্দ শুনিতে পাই, তাহাই কেবল আছে, তদ্ভিন্ন আর শব্দ নাই"? লাল ও ভাওলেট (violet) বর্ণের

অন্তর্গত কয়েকটি মাত্র ইথার-স্পন্দন আমাদের চক্ষু গ্রহণ করিতে পারে, উহার বাহিরের বৃত্তান্ত সে অবগত নহে। তবে কি উহার বাহিরে কিছু নাই ? আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত এক্স রেজ্ ও এন্ রেজ্ (X rays and N rays) গুলি তবে কি ? অতএব, দেখা যাইতেছে যে, আমরা দেখিতে পাই না, এরূপ বস্তু থাকা অসম্ভব নহে।

বাস্তবিক আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি এরূপ সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ যে, তৎসাহায্যে আমরা জগতের অতি অল্প বস্তুই জানিতে পারি ; অধিকাংশ বস্তুই আমাদের জ্ঞানের বাহিরে রহিয়াছে। আমরা যেন একটি প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ রহিয়াছি। ঐ প্রকোষ্ঠে পাঁচটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ আছে। ঐ জানালা দিয়া আমরা বাহিরের যতটুকু দেখিতে পাই, ততটুকুই আমাদের জ্ঞানের সীমা। যাঁহাদের দিব্যদৃষ্টি খুলে, তাঁহাদের ঘরে দুই চারিটী জানালা বাড়ে, সুতরাং তাঁহারা আরও অধিক বস্তু দেখিতে পান।

পরলোক বলিলে সাধারণ লোকে একটি লোক বা জগৎ বুঝেন,—মৃত্যুর পর মানব যেখানে গমন করে। কিন্তু বাস্তবিক পরলোক একটি নহে, অনেকগুলি আছে, যথা—ভুবর্লোক, স্বর্গলোক, মহর্লোক, জনলোক ইত্যাদি। এই লোকগুলি ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর উপাদানে নির্ম্মিত। মৃত্যুর পরেই মানুষ যেখানে গমন করে, তাহার নাম ভুবর্লোক (astral world)। ভুবর্লোকের আবার দুইটি বিভাগ আছে—প্রেতলোক ও পিতৃলোক। প্রেতলোক অপেক্ষা পিতৃলোক উচ্চ বা সূক্ষ্ম। ভুবর্লোকে ভোগ শেষ হইলে, মানব স্বর্গলোকে গমন করে। স্বর্গলোক শেষ হইলে সে পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। সাধারণ মানব, ভূলোক ভুবর্লোক ও স্বর্লোক—এই তিন লোকেই গতায়াত করে, মহঃ জনঃ প্রভৃতি উর্দ্ধলোকে যাইতে পারে না। সুতরাং "পরলোক" শব্দে আমরা সাধারণতঃ ভুবর্লোক ও স্বর্লোকই বুঝিব।

এই ভূলোক বা পৃথিবী যে পদার্থে নির্ম্মিত, তাহার নাম ক্ষিতিতত্ত্ব। ক্ষিতিতত্ত্বের সাতটি স্তর বা বিভাগ আছে,—কঠিন, তরল, বাষ্প, ইথার ১ম, ইথার ২য়, ইথার ৩য় এবং ইথার ৪র্থ। এগুলি ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, যথা কঠিন হইতে তরল, তরল হইতে বাষ্প, বাষ্প হইতে প্রথম ইথার,প্রথম ইথার হইতে দ্বিতীয় ইথার ইত্যাদি সূক্ষ্মতর ও লঘুতর। এই সাত শ্রেণীর পদার্থের সংমিশ্রণে যে জগৎ নির্ম্মিত,তাহাকেই আমরা ভূলোক (physical world) বলি। আবার সূক্ষ্মতম ইথার অপেক্ষা অনেক গুণে সূক্ষ্ম একপ্রকার পদার্থ আছে। তাহার নাম অপ্‌তত্ত্ব। ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অপ্‌তত্ত্বেরও সাতটি বিভাগ বা স্তর আছে,—কঠিন, তরল ইত্যাদি। ক্ষিতিতত্ত্বের ন্যায় ইহারাও ক্রমশঃ একটি হইতে অপরটি সূক্ষ্মতর। এই সাতটি পদার্থের দ্বারা যে জগৎ নির্ম্মিত, তাহারই নাম ভুবর্লোক। ইথার যেমন ইট, কাঠ, সকল পদার্থের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, ভুবর্লোকও সেইরূপ ভূলোকের ভিতরে ও কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত বাহিরে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। আবার, অপ্‌তত্ত্ব অপেক্ষা অনেক গুণ সূক্ষ্ম ও লঘু এক প্রকার পদার্থ আছে। ইহাই তেজস্তত্ত্ব। ইহারও সাতটি স্তর

আছে এবং ইহা দ্বারা যে জগৎ নির্ম্মিত, তাহাই স্বর্গলোক। স্বর্গলোক ভুবর্লোকের অন্তঃপ্রবিষ্ট আছে, অর্থাৎ ভিতরে ও বাহিরে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ঠিক এইরূপে মহঃ-জনাদি লোক সূক্ষ্মতর উপাদানে নির্ম্মিত এবং একটির মধ্যে অপরটি অবস্থান করিতেছে। বোধ হয় একটা উপমা দ্বারা ইহা আরও স্পষ্ট হইবে। মনে করুন, একটা রসগোল্লা রসে ডুবানো রহিয়াছে। রসগোল্লাটি যেন ভূলোক (বা পৃথিবী), রসটি যেন ভুবর্লোক, রসের ভিতরে ও বাহিরে যে বায়ু রহিয়াছে, তাহাই যেন স্বর্লোক এবং বায়ুর মধ্যে যে ইথার পরিব্যাপ্ত আছে, তাহাই যেন উচ্চতর লোক।

এখন সূক্ষ্মদেহ সম্বন্ধে দুই-একটী কথা বলা আবশ্যক। প্রত্যেক মানবের সূক্ষ্মদেহ আছে। এই সূক্ষ্মদেহ স্থূলদেহের মধ্যে পরিব্যাপ্ত এবং বাহিরেও কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত (প্রায় ৮।১০ ইঞ্চি) অবস্থিত রহিয়াছে। ইহার নানা স্তর বা শ্রেণী আছে। নিম্নস্তরের সূক্ষ্ম দেহটি অপতত্ত্বে নির্ম্মিত এবং ইহাই আশ্রয় করিয়া জীব নিদ্রাকালে ও মৃত্যুর পর ভুবর্লোকে ভ্রমণ করে। ইহার নাম কাম-দেহ (astral body)। এই দেহের মধ্যে আর একটি সূক্ষ্মতর দেহ আছে। উহা তেজস্তত্ত্বে নির্ম্মিত। ইহার নাম মানস-দেহ (mental body)। ভুবর্লোকে ভোগ শেষ হইলে জীবের কাম-দেহটি খসিয়া যায় এবং তখন তিনি মানস দেহ আশ্রয় করিয়া স্বর্গলোকে বাস করেন।

সূক্ষ্মদেহ যে কেবল মানব মাত্রে আছে, তাহা নহে; প্রত্যেক পদার্থেরই এক একটি astral counterpart বা অপ্‌তত্ত্ব নির্ম্মিত সূক্ষ্মদেহ আছে। ইট কাঠ পাথর, গাছ পালা, জল বায়ু, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ,—সকল পদার্থেরই সূক্ষ্মদেহ আছে। কিন্তু প্রভেদ এই যে, এই সূক্ষ্মদেহগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্তরের বা শ্রেণীর অপ্‌তত্ত্বে নির্ম্মিত। লৌহাদি কঠিন পদার্থের সূক্ষ্মদেহ কঠিন অপ্‌তত্ত্বে, মদ্যাদি তরল পদার্থের সূক্ষ্মদেহ তরল অপ্‌তত্ত্বে এবং অক্সিজেন প্রভৃতি গ্যাসের সূক্ষ্মদেহ বায়বীয় অপ্‌তত্ত্বে নির্ম্মিত। কিন্তু মানবাদির সূক্ষ্মদেহে সকল স্তরেরই অপ্‌তত্ত্ব বিদ্যমান; কেন না তাঁহাদের স্থূলদেহে কঠিন তরলাদি সর্ব্ববিধ স্থূল পদার্থই আছে।

সে যাহা হউক, সকল পদার্থের সূক্ষ্মদেহ তাহাদের স্থূলদেহের অবিকল অনুরূপ। মনে করুন, এক ব্যক্তি গৃহে বসিয়া আছেন। হঠাৎ তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি খুলিয়া গেল। তিনি কি দেখিবেন? তাঁহার ঘরের বিছানা মাদুর, খাট পালং চেয়ার টেবিল, দরজা জানালা, কড়ি বরগা, স্ত্রী পুত্র, চাকর দাসী—সব জিনিষই ঠিক পূর্ব্ববৎ দেখিতে থাকিবেন, কোনও পরিবর্ত্তন বোধ করিবেন না; অথচ এখন তিনি উহাদের স্থূলদেহ না দেখিয়া সূক্ষ্মদেহ দেখিতেছেন। অবশ্য খুব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইবে বটে, কিন্তু সেরূপ তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করেন কয়জন? সাধারণ মানব এরূপ অবস্থায় আদৌ বুঝিতে পারিবেন না যে, তিনি স্থূলজগৎ না দেখিয়া সূক্ষ্মজগৎ দেখিতেছেন।

মৃত্যুর পরে প্রথমতঃ ঠিক এইরূপই ঘটে। মৃত ব্যক্তি ভুবর্লোকে গিয়া কিছুকাল বুঝিতেই পারেন না, যে তিনি মরিয়াছেন অথবা তিনি সূক্ষ্ম জগতে বাস করিতেছেন।

তিনি পূর্ব্বের ঘর বাড়ী, রাস্তা ঘাট, বন্ধু বান্ধব, গাছ পালা অবিকল দেখিতে পান (অবশ্য সকল বস্তুর সূক্ষ্ম দেহই দেখেন); সুতরাং কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এ চিন্তা তাঁহার মনে আদৌ উদিত হয় না। ক্রমে ক্রমে তিনি একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করেন। তিনি একটা অসাধারণ আরাম ও স্বচ্ছন্দতা অনুভব করেন; তাঁহার মনে হয়, তিনি জীবনে কখনও এরূপ সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ ছিলেন না। হাজার পরিশ্রম করিলেও কিছুমাত্র ক্লান্তি বা কষ্ট বোধ হয় না, শরীর যেন সম্পূর্ণ নীরোগ, কোন জ্বালা যন্ত্রণা বা দুর্ব্বলতা নাই। কিন্তু ইহাতেও বুঝিতে পারেন না যে, তিনি পরলোকে আসিয়াছেন। ক্রমশঃ আর একটি পরিবর্ত্তন তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। তিনি লক্ষ্য করেন যে, পরিচিত বন্ধু বান্ধবগণের সহিত তিনি পূর্ব্ববৎ সাক্ষাৎ আলাপাদি করিলেও তাঁহারা সকল সময়ে যেন তাঁহার কথার উত্তর দেন না, যেন তাঁহাকে দেখিতে পান না। তিনি হয়ত তাঁহাদিগকে কোন কথা বলিলেন, তাঁহারা শুনিতে পাইলেন না; হয়ত তাঁহাদের অঙ্গস্পর্শ করিলেন, তাঁহারা অনুভব করিলেন না। ইহা সর্ব্বদা ঘটে না। কোন কোন সময়ে তাঁহারা সকল কথাই শুনিতে পান এবং যথাযথ উত্তর দেন; আবার কোন কোন সময়ে তাঁহারা তাঁহাকে আদৌ দেখিতে বা শুনিতে পান না। (অবশ্য, নিদ্রাকালে যতক্ষণ তাঁহারা সূক্ষ্মদেহে ভ্রমণ করেন, ততক্ষণই তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা হয়, কিন্তু জাগরিত হইলে তাঁহারা তাঁহাকে দেখিতে পান না)। ক্রমশঃ তিনি আরও লক্ষ্য করেন যে, তিনি অনায়াসে কোনও কঠিন প্রাচীর ভেদ করিয়া অথবা কোন মানবের দেহের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতে পারেন, ইহাতে উক্ত প্রাচীর বা মানব যেমন তেমনই থাকে, কোনও বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। তখন তাঁহার মনে হয়, "তবে কি আমার স্থূল দেহ নাই? আমি কি সূক্ষ্মদেহে বাস করিতেছি? হায়! আমি কি তবে পৃথিবী ত্যাগ করিয়া পরলোকে আসিয়াছি!" যেমন পরলোকের চিন্তা মনে উদিত হয়, অমনি সহস্র দুর্ভাবনা ও আশঙ্কা বৃশ্চিকবৎ তাঁহাকে দংশন করিতে থাকে। তিনি নিজ-কৃত সমস্ত পাপের কথা চিন্তা করেন এবং অনন্ত নরকের ভীষণ ছবি তাঁহার মনে উদিত হয়। অচিরে তাঁহাকে ঐ নরকে পড়িতে হইবে, এই আশঙ্কায় তিনি ছট্‌ফট্ করিতে থাকেন। তখন কোন জ্ঞানী ও পরোপকারী ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া বলেন, "ভাই, শান্ত হও। অমূলক আশঙ্কায় কেন কষ্ট পাইতেছ? তুমি যেরূপ নরকের কথা ভাবিতেছ, ঐরূপ নরক প্রকৃতপক্ষে নাই। ভগবান্ পরম করুণাময়। তিনি জীবের জন্য অনন্ত নরক সৃষ্টি করেন নাই। তুমি সংসারে যেরূপ চিন্তা করিয়া আসিয়াছ, এখানে ঠিক তাহার অনুরূপ ফল পাইবে, তিলার্দ্ধও অধিক নহে। কিছু দিনের জন্য করুণাময় তোমাকে একটু দগ্ধ করিয়া নির্ম্মল করিয়া লইবেন। অচিরে তুমি জ্যোতির্ম্ময় দেহে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিবে। অতএব, ভাই, ভয় করিও না। তুমি পৃথিবী অপেক্ষা এখানে আরাম পাইবে।"

পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা ভুবর্লোকের ভোগের কথা বলিব।

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী।

জগদ্গুরু।

নানা কালে, নানা দেশে, জগতে যে বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহের প্রচার হইয়াছে, তৎসমস্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহাদিগের মধ্যে প্রভূত সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য বিদ্যমান রহিয়াছে। ধর্ম্মে ধর্ম্মে কেবলই যে দার্শনিক তত্ত্বে এই সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা নহে; তাহাদিগের সাধন-তত্ত্বের মধ্যেও অদ্ভুত ঐকমত্য দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ কি? ধর্ম্মশাস্ত্র বলিতেছেন,—"ইহাত হইবারই কথা। যে গুলিকে বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া উক্ত হইতেছে, প্রকৃত পক্ষে সে সমস্ত বিভিন্ন নহে। তাহারা একই ব্রহ্মবিদ্যা; তবে দেশ-ভেদে, লোক-ভেদে, কাল-ভেদে, এই এক সনাতনী বিদ্যার অবিচ্ছিন্ন ধারা ভিন্ন ভিন্ন নাম, ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জগতে আবির্ভূত হইয়াছে।" বস্তুতঃ জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমত ব্রহ্ম-বিদ্যা-রূপিণী সেই স্বতঃ প্রবাহিনী সনাতনী দেবগঙ্গার ভিন্ন ভিন্ন নাম ও ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি মাত্র। আমরা যে ব্রহ্মবিদ্যাকে স্বতঃপ্রবাহিনী বলিলাম, তাহা সার্থক। শ্রুতি বলিতেছেন,—

"* * * অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতম্ এতদ্ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি নিশ্বসিতানি।"—বৃহদারণ্যক, ২।৪।১০

[কোনও প্রকার চেষ্টা ব্যতিরেকে, যেমন জীববর্গের নিশ্বাস প্রবাহিত হয়, সেইরূপ সমস্ত বিদ্যা, যথা,- ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, যজ্ঞবিদ্যা, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র, ব্যাখ্যান, অনুব্যাখ্যান,—সেই মহান্ভূত (ব্রহ্ম) হইতে নিঃসৃত হইয়াছে।]

এই যে স্বতঃপ্রবাহিনী ব্রহ্মবিদ্যার নানা মূর্ত্তিধারণ করিয়া জগতে বিশেষ বিশেষ ভাবে আবির্ভাব, তাহারও একটা সার্থকতা আছে। সাধারণ মানবের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে জগতে এত প্রকার ধর্ম্মের অভ্যুথান, ব্রহ্মবিদ্যার এতরূপে প্রচার হইয়াছে। এক এক প্রকৃতি লইয়া, যেমন এক একটি জাতি উঠিয়াছে, তত্তৎ জাতির মঙ্গলার্থে, সেই একই সত্য, সেই একই বিদ্যা, সেই একই প্রজ্ঞা বা সোফিয়া (Sophia), নানা মূর্ত্তিতে, নানা ভাবে আবির্ভূতা হইয়াছেন। প্রত্যেক জাতিরই কিছু বিশেষত্ব আছে, কিছু গুণগত সামান্য পার্থক্য আছে। অতএব প্রত্যেকের কল্যাণার্থে বিদ্যার এই বিভিন্ন ধারা প্রবাহমানা। ভগবান্ বুদ্ধদেব প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রে এই কথাই অতি সুন্দর ভাবে বলিয়াছেন;—

বিনেয়ং জনমাসাদ্য তত্র তত্র তথাগতৈঃ।
বহুরূপা ত্বমেবৈকা নানা নামভিরীড্যসে॥

[যেমন যেমন শিক্ষণীয় মানব আবির্ভূত হয়, তথাগত (মুক্ত পুরুষ) সেই সেই জনসাধারণের উপযোগী ভাবে ব্রহ্মবিদ্যা নানা রূপে প্রচার করেন।]

যিনি তথাগত, যিনি প্রজ্ঞা-দ্রষ্টা, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই কালে কালে সাধন ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। যে দেশে, যেরূপ ভাবে বলিলে সাধারণের হৃদয় অধিকার করিতে পারিবে, তিনি তাহা বুঝিয়া সেইরূপ ভাবে এক সনাতন সত্যকে প্রচার করেন। সেই ধর্ম্মদ্রষ্টা, সেই ব্রহ্মে সংস্থিত মহাপুরুষকে কেহ জগদ্-গুরু, কেহ বোধিসত্ত্ব, কেহ প্রফেট্ (Prophet), কেহ বা ভগবানের অবতার বলিয়া বর্ণনা করেন। আমরা গত মাসে বলিয়াছি, তিনি স্বেচ্ছায় ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ না লইয়া এই জগদ্-গুরুর অধিকার লইয়া অবস্থিত আছেন। তাঁহার এই নির্ব্বাণানন্দ-ত্যাগের জন্য, এই মহান্ উৎসর্গের জন্য, কোটি কোটি লোক সংসার-কর্দ্দম হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছেন। শক্তিশালী নরপতি বা দিগ্বিজয়ী বীরের স্মৃতিও কাল অতি প্রাচীন ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া দিতে পারিয়াছে; কিন্তু জগদ্-গুরুর স্মৃতি ভাস্বর নক্ষত্র-মণ্ডলের মত এখনও দ্যুতিমান্, এখনও সমভাবে জগতে আলোক বিতরণ করিতেছে।

আমরা গতবারে "ঋষি সংঘ"-প্রবন্ধে বলিয়া আসিয়াছি যে, যাঁহারা জগদ্-গুরু বা মনু বা দেবতার অধিকার লইয়া অবস্থিত থাকেন, তাঁহারা মুক্ত পুরুষ। কিন্তু হিন্দু তাঁহাদিগের জীব বা মানব ভাবের উপর আদৌ লক্ষ্য রাখেন না। হিন্দু তাঁহাদিগের ঈশ্বরভাবেই সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখেন। বস্তুতঃ জীবভাব তাঁহাদিগের প্রকৃতভাব নহে; তাঁহাদিগের প্রকৃত ভাব ঈশ্বর-ভাব এবং জীব ঐশভাবের আধারমাত্র। জীবরূপ তাঁহাদিগের বাহ্যরূপ; প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা ব্রহ্মে সংস্থিত; তাঁহারা অচ্যুত, অত্যন্ত অসঙ্খত, "একন্ত-সুখে" বা "বিমুক্তি-সুখে" অবস্থিত।

পদমচ্চুতমচ্চন্তম সঙ্খতমনুত্তরম্।
নিব্বানমিতি ভাসন্তি বানমুত্তা মহেসয়ো॥

অভিধম্মথসঙ্গহ।

তাঁহাদিগের জীব-ভাব-রক্ষা, তাঁহাদিগের বিশিষ্টতা ধারণ, তাঁহাদিগের এই যে অপূর্ণতা-রূপ-কালিমা গ্রহণ, তাহা কাল-কর্ম্ম-গুণানুযায়ী নহে; তাহা স্বেচ্ছাকৃত, তাহা জীব-হিতার্থে করুণা প্রণোদিত;—

" * * * যন্তি বিষ্ণোর্ভক্তাঃ স্বভৃত্যার্থকৃতশ্চরন্তি।"—ভাগবত -৩।৪।২৫

[বিষ্ণুভক্তগণ অপরের প্রয়োজন সাধন করিবার জন্যই বিচরণ করেন; তাঁহাদিগের আপন তরে কোনও কর্ত্তব্য নাই।]

আবার অন্য দিক দিয়া দেখিলেও উপলব্ধ হইবে যে তাঁহাদিগকে ঈশ্বর ভাবে গ্রহণ করিবার প্রয়োজন আছে। মানবের যাহা কিছু সাধনা, তাহা তাহাকে জীবভাব হইতে

মুক্ত করিবার জন্য। এই যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রচার, তাহাদিগের উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে,—কেবল মানব চিত্তকে ঈশ্বরাভিমুখ করিবার জন্য। তাই, শাস্ত্র মানব-আদর্শ স্বরূপ এই সমস্ত মহাপুরুষদিগের জীবভাবের দিকে ইঙ্গিত করেন না; কারণ, তাহা হইলে আবার বৈশিষ্টতাভাব বর্দ্ধিত হইবে, মানবত্বের উপর উপাসকদিগের লক্ষ্য পড়িলে, সেই জীবভাবেরই পুষ্টি হইবে। বিশেষতঃ যে হিন্দু অনলে অনিলে, জলে স্থলে, বালুকা-কণায়, ভাস্বর প্রচণ্ড গ্রহ উপগ্রহে, ব্রহ্মেরই প্রকাশ দেখেন; যিনি ভাবনা করেন,—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"; যাঁহার দর্শনের ভিত্তি উপনিষদ্ গম্ভীর স্বরে বলিতেছেন,—

ত্রিম্বেক পাচ্চরেদ্ ব্রহ্ম ত্রিপাচ্চরতি চোত্তরে।
সত্যানৃতোপভোগার্থো দ্বৈতীভাবো মহাত্মনঃ॥ মৈত্রায়ণ্যুপনিষৎ, ৭।১১

[ব্রহ্মের একপাদে সৃষ্টি, আর তিন পাদ সৃষ্টির অতীত। তিনি সত্য ও অনৃত যুগপৎ উপভোগ করিবার জন্য এইরূপ দ্বৈত হইয়াছেন];—

যাঁহার বরেণ্য শ্রীভগবান্ কপিলাচার্য্য ললিতকণ্ঠে শিক্ষা দিতেছেন,—

"মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহুমানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি॥" ভাগবত ৩। ২৯।৩৪।

[এই সকল ভূতকে বহু মান সহকারে প্রণাম করিবে; ভগবান্ ঈশ্বরই অংশের দ্বারা জীবরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন];—

এতাদৃশ হিন্দু কি কখনও ব্রহ্মে সংস্থিত সেই মুক্তপুরুষদিগের পর বা ঐশভাব না লইয়া তাঁহাদিগের প্রাকৃত অপর বা অবর ভাব লইতে পারেন? তাই ঋগ্বেদ জলদ-গম্ভীর-নাদে বলিয়া উঠিয়াছেন,—

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহু রথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥

[তাঁহাকেই ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, সুবর্ণ পক্ষযুক্ত গরুত্মান্ নামে অভিহিত করা হয়। যিনি এক, তাঁহাকেই জ্ঞানী বহু নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহাকেই অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা নামে সম্বোধন করা হয়।]

হিন্দুধর্ম্মের নিয়ামক ভগবান্ মনু তাই বলিয়াছেন,—

এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিম্।
ইন্দ্রমেকেঽপরে প্রাণমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্॥ মনুসংহিতা। ১২।১২৩

[সেই পরমপুরুষকে কেহ অগ্নি বলেন, কেহবা প্রজাপতি মনু বলিয়া উপাসনা করেন, কেহ বা ইন্দ্ররূপে, কেহবা প্রাণরূপে এবং অন্যে সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মভাবে উপাসনা করেন।]

পুরাণে ও ইতিহাসে তাই কপিল-দত্তাত্রেয়কে, তাই নরনারায়ণ-পৃথুকে, তাই সনকাদি কুমারগণ ও জগদ্‌গুরু ব্যাসদেবকে ভগবানের অবতার বলিয়া বর্ণিত আছে। আমাদিগের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয় জগদ্‌গুরু। পূর্ব্বে ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব জগদ্‌গুরু

ছিলেন। অপান্তরতমা ঋষি সত্যবতী-সুত ব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ করিলেও হিন্দু জগদ্-গুরুকে ভগবানের অবতার ভাবে না দেখিয়া সাধারণ মানব ভাবে দেখিতে জানেন না। তিনি তাঁহাকে বিশ্ব-ধারক বিষ্ণুরূপে অবলোকন করেন। ধর্ম্মপ্রচার ও ধর্ম্মরক্ষণ এই অধিকার লইয়া যিনি অবস্থিত, তিনি যে ব্রহ্মাণ্ড-জীব-অশুভভয়বারী ভগবানের পালন-রক্ষণ-রূপী বিষ্ণুর অবতার বলিয়া উক্ত হইবেন, তাহাতে বিচিত্রতা কি। দেবী ভাগবত তাঁহার বিষয় এইরূপ কহিয়াছেন,—

দ্বাপরে দ্বাপরে বিষ্ণুর্ব্যাসরূপেণ সর্ব্বদা।
বেদমেকং স বহুধা কুরুতে হিতকাম্যয়া ॥ ১।৩।১৯

[প্রতি দ্বাপর যুগের শেষভাগে স্বয়ং বিষ্ণু ধর্ম্মরক্ষার জন্য ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া জীবগণের মঙ্গলার্থে এক বেদকে বহুধা বিভাগ করেন।]

প্রকৃতপক্ষে জগদ্‌গুরুকে বিষ্ণুর অবতার না ভাবিয়া, আর কি ভাবে লওয়া যাইতে পারে? তাঁহার যে ভাবে ধর্ম্ম-সংস্থাপন হয়, যে ভাবে সাধুর পরিত্রাণ হইয়া থাকে, তাহাই জগদ্‌গুরু ভাব।

আমরা এইবার দেখিব, তিনি পাত্রতা বিচার করিয়া কিরূপে কালে কালে মানবের সাধন-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন। অনেকেই অবগত আছেন যে, এক আর্য্য জাতি হইতে ক্রমান্বয়ে পাঁচটি শাখা জাতি উদ্গত হইয়া জগতের নানা স্থানে বিস্তৃতি-লাভ করিয়াছে। ভবিষ্যদ্দর্শী বলেন, সময়ে ইহা হইতে এখনও আরও দুইটি শাখা-জাতির উদ্ভব হইবে। প্রত্যেক শাখা জাতি, ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে নিবদ্ধ থাকিয়া মনু কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন আদর্শে গঠিত হইয়া থাকে। জগদ্‌গুরুও প্রত্যেক শাখা জাতির মধ্যে আবির্ভূত হইয়া প্রত্যেকের উপযোগী ধর্ম্ম, সনাতনী ব্রহ্মবিদ্যার এক একটি ভাব, প্রচার করেন। আর্য্যজাতির প্রথম শাখা,—হিন্দু জাতির কথা পরে উল্লেখ করিব। তাহার দ্বিতীয় শাখা মধ্য আসিয়াখণ্ড হইতে নির্গত হইয়া পশ্চিম-বাহিনী হইল এবং আরব প্রদেশ ও উত্তর আফ্রিকার আদি নিবাসীগণকে আর্য্য-সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া তথায় বসতি করিল। আর্য্যদিগের এই নব সম্প্রদায় বা আর্য্যের এই দ্বিতীয় শাখাকে শিক্ষা দিবার জন্য জগদ্‌গুরু হার্মিশ (Hermes) নামে আবির্ভূত হইলেন। যাঁহারা মিশরবাসীর অতীত ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই এই মহাপুরুষের বিষয় অবগত আছেন। তাহার বহু সহস্র বৎসর পরে আর্য্যজাতির তৃতীয় শাখা পারস্য দেশে অভিযান করিল এবং জগদ্‌গুরুও জোরাষ্টার বা জারাথুস্ত্র নামে আবির্ভূত হইয়া তাহাদিগের উপযোগী ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। তাহারও বহুকাল পরে আর্য্যজাতির চতুর্থ শাখার আবির্ভাব হইল। ইহাই কেল্‌টিক জাতি নামে অভিহিত এবং প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমান জাতির আদিপুরুষ। জগদ্‌গুরু অর্ফিয়াস (Orpheus) নাম ধারণ করিয়া জগৎ-সমীপে ব্রহ্মবিদ্যার আর এক মূর্ত্তি দেখাইলেন। যাঁহারাই প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস পাঠ

করিয়াছেন, তাঁহারাই তাহার পৌরাণিককালে আবির্ভূত এই সুন্দর বালকের রহস্য-কথার পরিচয় পাইয়াছেন। এইরূপে ভগবান জগদ্‌গুরু, কখন হার্মিশরূপে, কখনও জারাথুস্ত্ররূপে, কখনও বা অর্ফিয়াস্-রূপে এক সনাতনী ব্রহ্মবিদ্যাকে নানা মূর্ত্তিতে প্রচার করিয়াছেন। যেইরূপ ভাবেই হউক, তিনি সর্ব্বত্র সেই এক শিক্ষাই দিয়াছেন, সেই এক সত্যই প্রচার করিয়াছেন,—"একমেবাদ্বিতীয়ং"—(ছান্দোগ্য ।১।১) এবং

"ঈশাবাস্তমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।"—ঈশ, ১

[জগতে যাহা কিছু পদার্থ আছে, তৎসমস্ত আত্মরূপী পরমেশ্বর দ্বারা ব্যাপ্ত আছে, এই-রূপ চিন্তা করিবে।]

হার্মিশ সেই সৎপদার্থের নাম দিয়াছেন "জ্যোতিঃ,"—যাহা স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে সমভাবে দ্যুতিমান্; জারাথুস্ত্র তাঁহাকেই "অগ্নি" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন,—যিনি সকলের অভ্যন্তরে নিহিত, যাঁহার সংস্পর্শে সকল দ্রব্য পবিত্র হয়; অর্ফিয়স্ তাঁহাকেই "নাদ" "নাম" বা "সুর-লয়" নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই স্বরে সর্ব্বলোকের উদ্ভব; সর্ব্ব-লোকের স্থিতি এই এক সঙ্গীত-ধারায় গ্রথিত; আবার শেষে সর্ব্বলোক এই আলয়ে লয় প্রাপ্ত হইবে।

এইবার আমরা আর্য্যজাতির প্রথম শাখা বা হিন্দুজাতির পরিচয় দিব। প্রকৃতপক্ষে আর্য্যজাতির প্রথম শাখা "আর্য্য-জাতি"-নামেই অভিহিত হইত। তাই, তাহার পূর্ব্ব বাসভূমি,—ভারতবর্ষের উত্তর বিভাগ—এখনও আর্য্যাবর্ত্ত নামে আখ্যাত আছে। আর্য্য-মহাজাতির চরিত্রের আদর্শ, তাহার এই প্রথম শাখার সুস্পষ্ট ব্যক্ত ছিল। ফলতঃ শাখা-প্রশাখা ক্রমে আর্য্য মহাজাতির মধ্যে আজ পর্য্যন্ত নীতি, দর্শন, বিজ্ঞান বা লৌকিক ধর্ম্মে যাহা কিছু অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহার প্রথম শাখায় বা হিন্দুজাতির মধ্যে তৎসমস্তেরই মূল প্রাপ্ত হওয়া যায় তাই বৈদিক ব্রাহ্মণ সেই এক সত্যকে সূর্য্য ভাবে দেখিলেও, তিনি যে কেবল তাঁহার সেই ভাবেই নিবদ্ধ, তাহা নহে। হার্মিশ যাঁহাকে "জ্যোতিঃ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তিনিই ব্রাহ্মণের গায়ত্রী—সবিতার বরেণ্য ভর্গ। জারাথুস্ত্রার যাহা অগ্নি, হিন্দুরও তাহাই "ব্রহ্মাগ্নি।" আবার যিনি হিন্দুর স্বর-সাধন-রহস্য উদ্ঘাটন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনি জানেন, কিরূপে সঙ্গীতের দ্বারা হিন্দু-গুরু শিষ্যের সূক্ষ্ম-দেহকে পবিত্র করেন;—কিরূপে সঙ্গীতদ্বারা শিষ্য স্থুল-দেহ হইতে বিমুক্ত হইয়া সূক্ষ্ম-দেহ-সাহায্যে উচ্চলোকে বিহার করিতে সক্ষম হয়; কিরূপে সুর-সাহায্যে সূক্ষ্ম-চক্রের বিকাশ করা যায়। হিন্দু বলেন, নাম-সংকীর্ত্তন সাধনের প্রকৃষ্ট উপায়,—

"কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"

তাই এখানে জগদ্‌গুরুর কার্য্য ব্রহ্মবিদ্যার কোনও একটি বিশেষভাব প্রচার করা নহে, কারণ বিদ্যার সর্ব্বভাব এবং সর্ব্বাতিরিক্তভাব এখানে বর্ত্তমান। কালে কালে নানাস্থানে আর্য্য জাতি মধ্যে যেমন যেমন মহাবিদ্যার এক এক ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, এই

আর্য্যজাতির প্রথম শাখায় বা আর্য্যজাতির আদর্শ শাখায় সেই সেই ভাব-তরঙ্গ আসিয়া তাহাকে প্রবুদ্ধ, তাহাকে উদ্দীপিত করিয়াছে। সেই একই বিদ্যা এখানে সিদ্ধগণ সাহায্যে জ্ঞানধর্ম্মরূপে, দত্তাত্রেয়াদি মহাযোগিগণ সাহায্যে যোগধর্ম্মরূপে, যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষিগণ সাহায্যে কর্ম্মধর্ম্মরূপে প্রচারিত আছে। তাই এখানে জগদ্‌গুরুর কার্য্য অন্যরূপ। যখন তিনি দেখিলেন যে, হিন্দু মন্দবুদ্ধি হইতেছে, যখন দেখিলেন যে অপর জাতি ও ধর্ম্মের সহিত হিন্দুজাতির ও ধর্ম্মের সংঘর্ষণ ও সংমিলন হইবার উপক্রম হইতেছে, তিনি তখন সত্যবতীসুত ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া হিন্দুর বিক্ষিপ্ত শিক্ষাকে শ্রেণীবিভাগ ও তাহাদিগের সমন্বয়-সাধন ও প্রকৃত ভাগবত-ধর্ম্ম প্রচার করিলেন।

ইহার পর আর একবার তিনি আসিলেন; কেবল একবারের জন্য সাধারণ মানবের প্রকাশ্য গুরুরূপে, ধর্ম্মের শিক্ষকরূপে আবির্ভূত হইলেন; এবার ভারতে কপিলাবস্তুর রাজভবনে, শাক্যবংশে, অবতীর্ণ হইলেন। মানব যখন বেদার্থ ভুলিয়া, প্রকৃত বেদবিহিত কর্ম্ম কিরূপ তাহাতে লক্ষ্য না রাখিয়া, শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম না লইয়া, কেবল তাহার বহিরঙ্গ-সাধনাতেই মনোনিবেশ করিয়াছিল; প্রকৃত যজ্ঞ কি তাহা বিস্মৃত হইয়া, যখন মাতৃরূপিনী গায়ত্রীর, বা ভুক্তিমুক্তির অধিষ্ঠাত্রী ভগবতী প্রজ্ঞারূপিনী দুর্গাদেবীর সাধক হিন্দু, সেই করুণাময়ী মার নামে, তাঁহারই প্রিয় জীববৃন্দের বলির রুধির-স্রোতে ভারতকে ভাসাইতে বসিয়াছিল, সেই সময় আবার জগদ্‌গুরু আসিলেন *। কিন্তু, এই শেষ আসা। কেবল শব্দজালময় আন্বীক্ষিকীদ্বারা (metaphysics) বিশেষ কিছু হয় না, স্বস্তরের অবস্থান্তরাপত্তি করিতে হইবে, ইহাই দেখাইবার জন্য, জ্ঞানীর যিনি সম্রাট্, তিনি আন্বীক্ষিকীর তর্কজালের সাহায্য না লইয়া, গম্ভীরস্বরে সকলের সমক্ষে ঘোষণা করিলেন, —"এই সমস্ত উপদেশ শাস্ত্র বলিতেছেন বলিয়াই, আমি যে প্রচার করিতেছি, তাহা নহে। শাস্ত্র যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি, উপলব্ধি করিয়াছি; তোমরাও সাধন দ্বারা স্বয়ং তাহা সাক্ষাৎকার কর ও জগৎ-হিতার্থে প্রচার কর।"

"যে তথাগতো স্বয়ং অভিঞ্ঞায় সচ্ছিকত্বা পবেদেতি।"

[তথাগত নিজে সাক্ষাৎ করিয়া বলিতেছেন, মুখে শ্রবণ করিয়া, নিজে অনুভব না করিয়া, কেবল শাস্ত্রপাঠ করিয়া বলেন নাই।]

এইরূপ উপদেশ দিয়া, ত্রিলোকবাসী দেবমানবকে দেব-গঙ্গার পবিত্র ধারায় ক্ষীণ-সর্ব্ব-পাপ করিয়া সিদ্ধার্থ বৌদ্ধত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মহা প্রস্থানের পর, তাঁহার জন্ম জন্মের সহচর, সাধনায় তৎসমকক্ষ মৈত্রের ঋষি এই জগদ্‌গুরুর অধিকার গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা জন্ম জন্ম একত্র পৃথিবীতে আসিয়াছেন, একত্র জীব-হিত-ব্রত পালন

* নিন্দসি যজ্ঞ-বিধেরহহ শ্রুতিজাতং সদয়-হৃদয়-দর্শিত-পশুঘাতম্।
কেশব ধৃত-বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥—শ্রীগীতগোবিন্দ ১।৯

করিয়াছেন। তাই শ্রীউদ্ধব তাঁহাকে "দ্বৈপায়ন-সুহৃৎ-সখা" * নামে অভিহিত করিয়াছেন। একজন মহর্ষি-পরাশর-শিষ্য, অপর তাঁহার আত্মজ। দুই জনের নিকট সম্বন্ধ। তাই পরে আবার বিদুর ব্যাসদেবকে "মৈত্রেয়-সখা" † নামে সম্বোধন করিয়াছেন।

এক্ষণ হইতে জগদ্‌গুরুর অধিকার পরম কারুণিক মৈত্রেয় ঋষির। তাঁহাকে "পরম কারুণিক" বলিবারও সার্থকতা আছে। তাঁহার পূর্ব্বতন যিনি, তিনি যেমন জ্ঞানের সম্রাট্ ছিলেন, ইনি সেইরূপ পরম করুণাময়। ইহাতে এমন বুঝায় না যে, যিনি বুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার করুণা ছিল না, বা মৈত্রেয় ঋষি জ্ঞানী নহেন। উভয়ই সমান জ্ঞানী, উভয়ই তুল্য করুণাময়। ইহাতে ইহাই বুঝাইতেছে যে, মৈত্রেয় ঋষির সহজভাব হইতেছে করুণাভাব। একটী ছন্দে শ্রীশুকদেব সুন্দর ভাবে তাঁহার পরিচয় দিয়াছেন;—

দ্বারি দ্যুনদ্যা ঋষভঃ কুরূণাং মৈত্রেয়মাসীনমগাধবোধম্।
ক্ষত্তোপসৃত্যাচ্যুতভাবসিদ্ধঃ প্রপচ্ছ সৌশীল্যগুণাভিতৃপ্তঃ ॥—ভাগবত, ৩।৫।১

[ভগবদ্ভাবসিদ্ধ কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর হরিদ্বারে অগাধজ্ঞান-সম্পন্ন মুনিবর মৈত্রেয়ের নিকট সবিনয়ে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সৌশীল্যকারুণ্যাদিগুণে পরিতৃপ্ত হইলেন।]

সত্য তিনি অগাধ-বোধ-সম্পন্ন, কিন্তু কোন্ ভাব তাঁহা হইতে চতুর্দ্দিকে স্বতঃই বিস্ফুরিত হইয়া পড়িতেছিল? তাহা তাঁহার সৌশীল্য, তাঁহার কারুণ্যাদিভাব। তাই বিদুরের লক্ষ্য এই গুলিতেই আকৃষ্ট হইয়াছিল। নিদাঘ-মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড আতপজালের অজ্ঞানান্ধকার নিরাসকারী তত্ত্বজ্ঞানের কঠোরতা তাঁহাতে নাই। নবনীত-কোমল ভাব তাঁহার স্বভাব বলিয়াই, ভগবানের যে ভাব ঈশ্বরভাবের অতীত, যে ভাব নিজভাব, যে ভাব নিত্য ভাব, সেই ভাব তাঁহার ভিতর দিয়াই বেশ ফুটিয়া বাহির হইতে পারে। সে ভাবে বিভোর বলিয়া শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষসকল সকল-ফলপ্রদ কল্পবৃক্ষ, ভূমি চিন্তামণিগণময়ী, ভবন সকল চিন্তামণিময়, বারি অমৃতময়, কথা দিব্যগীতময়ী, গতি বিচিত্র নৃত্যময়ী, জ্যোতিষ্ক সকল চিদানন্দময়। সেই কমনীয়ভাবের চরমোৎকর্ষ ভক্তের হৃদয়ের সেই "গোপবেশমবভ্রাভং তরুণং কল্পদ্রুমমাশ্রিতম্" ব্রজ-শিশু গোপালের ভাব।

তাই যখন পঞ্চম শাখা জাতি বা টিউটন জাতির উপদেষ্টারূপে, পরিত্রাতারূপে, হৃদয়ের উপাস্যরূপে, সাধনার আদর্শরূপে তিনি আবির্ভূত হইলেন; তাই যখন তিনি তাঁহার প্রিয় শিষ্য ও তদ্গত প্রাণ যিশুর শরীরে আবিষ্ট হইলেন, তখন তাঁহার সেই প্রেমের লীলা, সেই আনন্দের লীলা আরম্ভ হইল। প্রায় দুই সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, তথাপি তাঁহার অনন্ত করুণা, তাঁহার প্রেমধারা, জগতের মঙ্গলে তাঁহার উৎসর্গ, এখনও পৃথিবীতে স্বর্গীয় সুধাবর্ষণ করিতেছে। কোটী কোটী মহাপাতকী তাঁহার মাহাত্ম্যে সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়াছে। তাঁহার বহুনাম থাকিলেও "পাতকী সখা"ই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা

* ভাগবত, ৩।৪।৯ † ভাগবত, ৩।৫।১১

পবিত্র নাম। ব্রহ্মে সংস্থিত থাকিলেও (eternally in the bosom of the Father) "ব্রহ্মাস্মি" একথা তিনি কখনও বলেন নাই। ভগবান্ চৈতন্য-দেবকে ঈশ্বর-বুদ্ধিতে স্তবস্তুতি করিলে তিনি যেমন বলিতেন,—"আমি জীবাধম, আমাতে কখনও ঈশ্বর বুদ্ধি করিবে না," তিনিও সেইরূপ আপনাকে ঈশ্বরের দাস বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি তিন বর্ষমাত্র সাধারণ মানব সমাজে অবস্থিত থাকিয়া, জাতীয় চরিত্রগঠনের বীজ নিহিত করিয়া দিয়া, আসুরিক মানব কর্ত্তৃক নৃশংসভাবে নিহত হইলেন। তিনি নিহত হইলেন সত্য কিন্তু তাহাতে জগতে আত্মবিসর্জ্জনের একটী মহান্ আদর্শ চিরতরে প্রতিষ্ঠিত হইল।

এখন ষষ্ঠ শাখা-জাতির উদ্ভবের সময় আসিয়াছে। তাই জগতের সর্ব্বস্থানে ভক্ত-মানব জগদ্‌গুরুর নব অভ্যুদয়ের প্রতীক্ষা করিতেছে। ইহারই মধ্যে জগতের সর্বত্র মহাপুরুষদিগের, তাঁহার পারিষদবৃন্দের আবির্ভাবের কথা শুনা যাইতেছে। ভারতের সংসারত্যাগী কোন কোন সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় সেই কথাই বলিতেছেন; আচার্য্য লজ্ (Sir Oliver Lodge)-প্রমুখ বিজ্ঞানবিদ্‌গণ জগতের এবং মানব ভাবরাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিয়া সেই এক সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন; কোন কোন খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ধর্ম্মযাজক প্রকাশ্য সভায় নিজ নিজ ভাবে সেই কথাই প্রচার করিতেছেন। থিওসফিকেল সোসাইটীর কর্ণধার শ্রীমতী এনিবেসেণ্ট এই শুভ সংবাদ প্রচার করায় তাঁহাকে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইতেছে; এমন কি তাঁহার কোন কোন ভক্ত শিষ্য তাঁহার প্রকাশ্য শত্রু হইয়া তাঁহাকে লাঞ্ছিত করিতে বদ্ধপরিকার হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে ভগবান্ যখন খ্রীষ্টরূপে আসিয়াছিলেন, পঞ্চম শাখা জাতির গুরুরূপে আসিয়া জগৎ ধন্য করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার ভাবী আগমন বার্ত্তা যাঁহারা প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে অনেক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল। এবারেও কি তাহাই হইতেছে?

সত্যসেবিকা বীর্য্যবতী শ্রীমতী এনিবেসেণ্ট চতুর্দ্দিক হইতে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়াও অদমিত উৎসাহে আপনার অন্তরের বিশ্বাস প্রচার করিতেছেন। তিনি কি করিবেন? যাহা তিনি সত্য বলিয়া জানিয়াছেন, যেটি তাঁহার অন্তরের ধ্রুব বিশ্বাস, যাহা প্রচার করিবার জন্য তিনি আদিষ্ট, লোক নিন্দা ভয়ে তিনি কি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবেন? মনের ভাব গোপন করিবেন? তিনি তাহা কিছুতেই পারিবেন না।

"Nevertheless we who know are bound to speak; none the less we who know are bound to pass on the message we have received. We are not the King, but we are His heralds; and no earthly voice shall silence the mouths which have been told to proclaim His coming"—Theosophy and Theosophical Society, pages 111-112

জানিনা, কবে এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হইবে! কবে করুণাময়ের চরণ-সংস্পর্শে বসুন্ধরা আবার পাপভার হইতে মুক্ত হইবে! মর্ত্ত্য কবে আবার স্বর্গের মূর্ত্তি ধারণ করিবে!

শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

মলিনার আত্ম-কাহিনী।

৩।

কেলি-কদম্ব।

(১)

হারায়ে রতন, শিথিল-চেতন,
কাতর-চরণ-গতি
কালিন্দীর কূলে এক তরুমূলে
আসিয়া বসিনু পথি।
বসিতে বসিতে ভাবাবেশ চিতে,
মরম ভরিয়া মোর
অপূর্ব্ব সৌরভ পশি' আচম্বিতে
হৃদয় করিল ভোর!
বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিনু সম্মুখে
দাঁড়ায়ে নয়নারাম
কেলি-কদম্বের তরু ডালে ডালে,
কচি কিশলয়-দাম।
তাহে থোপা থোপা প্রাণ-মন-লোভা
ফুটেছে কত না ফুল,--
প্রতি অঙ্গ যেন রোমাঞ্চ সঞ্চারে
হয়েছে কণ্টকাকুল!

(২)

চেয়ে দেখি মরি! তরু সে ত নয়,
কদম্ব-বিটপি-রূপে
ব্রজ-কিশোরীর কৃষ্ণ-অনুরাগ
ফুটিয়াছে চুপে চুপে!
নহে ফুলদল,-- পুলক সকল
ভেদি' প্রতি লোম-কূপ;
নেহারি' মলিনা কাঁদিছে গুমরি
সোঙরি' বঁধুর রূপ!

৪।

রাখাল-রাজা।

(১)

একদিন শুয়েছিনু ভাণ্ডীরের বনে
দুপুরে তমাল-তলে মজ্জিত স্বপনে।
শুয়ে শুয়ে ভাবিতেছি বঁধুয়ার মুখ,—
অকস্মাৎ দুরু দুরু কেঁপে ওঠে বুক!
পশিল শ্রবণে মম সুদূর কল্লোল,
রুণু রুণু রুণু রুণু নূপুরের রোল।
নেচে নেচে এল কাছে রাখালের দল
শ্রীদাম সুবল দাম শ্রীমধুমঙ্গল।
সকলের ধটি পরা, শিখি-চূড়া শিরে,
ফোটাফুল-সম মুখ ধোয়া প্রেম-নীরে!

(২)

রাখালের চক্রমাঝে নাচে একজনা,
অঙ্গের লাবণি ঝরে বিজলীর কণা।
পুলকে মলিনা কাঁপে সখাদের মাঝে
নেহারি' সে নবঘন রাখালের রাজে!

৫।

দূতী।

বৃন্দাবন-দ্যুতি একি বৃন্দা-দূতী,— বৃন্দাবনে দিলা নাম,
কৃষ্ণ-অনুরাগ লুকায়ে মরমে পুরাল' সখীর কাম?
ওই না বিশাখা— কৃষ্ণ প্রেম যার সখী প্রেম-সিন্ধু মুখে
নদীর মতন নীরবে আসিয়া মিশিল অ-ভোগ সুখে?
সখী-সরবসা ওই না ললিতা,— ডুবি যে ত্যাগের নীরে
সখীর লাগিয়া কলঙ্ক পশরা ধরিতে চাহিল শিরে?
সাধে কি গোপীর প্রেমে বাঁধা রয় মলিনার প্রাণ-বঁধু?
আমিত্ব-বিহীন সখিত্বের সুধা মধুর অধিক মধু!

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

সরল যোগ-সাধন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বে চিত্তশুদ্ধির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে পুরাকালের একটী ইতিহাস এই স্থলে প্রদত্ত হইল। একদা দুইজন চিত্রকর দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় আগমন করিয়া প্রার্থনা করিল, "হে রাজন্! আমরা উভয়েই চিত্রকর, এবং সর্ব্বদা চিত্রের উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতা সম্বন্ধে আমাদের পরস্পর বিবাদ হয়। অতএব আমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি উৎকৃষ্ট চিত্রকর, আপনি তাহার বিচার করিয়া দিউন।" দেবরাজ এইবাক্য শ্রবণ করিয়া উভয়কে রাজপ্রাসাদের দুইটী প্রাচীরে চিত্র অঙ্কিত করিবার জন্য আদেশ দিলেন। চিত্রকরদ্বয় যাহাতে পরস্পরের চিত্র না দেখিতে পায়, এই অভিপ্রায়ে যবনিকার অন্তরালে নির্দ্দিষ্ট প্রাচীরে আপন আপন চিত্র অঙ্কিত করিল। কিছুদিন পরে দেবরাজ ইন্দ্র তাহাদিগকে চিত্রপ্রদর্শনের জন্য আদেশ করিলেন। চিত্রকরদ্বয় আপন আপন চিত্র প্রকাশিত করিল। একটী চিত্রে যযাতিরাজার রাজসূয় যজ্ঞ ও অপর চিত্রে তদানীন্তন দেবসভা অঙ্কিত ছিল। ইন্দ্র ব্যতীত দেবসভায় যত দেবতা ছিলেন, সকলেই প্রথম ব্যক্তির চিত্রে যযাতি রাজার রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান দর্শন করিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ দেবতাগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রথম ব্যক্তির চিত্র অবশ্য প্রশংসার যোগ্য, যযাতি রাজার যজ্ঞানুষ্ঠান, যাহা পূর্ব্বে সমাধা হইয়া গিয়াছে, যাহা একবার অতীতকালে সংঘটিত হইয়াছে, যে ঘটনা-রূপ চিত্র প্রকৃতিদেবীর অঙ্কে পূর্ব্বেই অঙ্কিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার প্রতিচ্ছায়া-স্বরূপ এ বর্ত্তমান চিত্র অঙ্কিত করা বিশেষ কিছু প্রশংসার কার্য্য নহে; কিন্তু এই দ্বিতীয় ব্যক্তি বর্ত্তমান এই দেব-সভার ভবিষ্যৎ চিত্র জ্ঞাত হইয়া চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে, এই ভাবে দেবসভা অদ্য গঠিত হইবে তাহা পূর্ব্বে জ্ঞাত হইয়া এ ব্যক্তি তাহার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে; অতএব এই ব্যক্তির চিত্রই বাস্তবিক প্রশংসনীয়।" ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রার্থনা করিলেন, "রাজন্! চিত্র স্বভাবতঃ নানা বর্ণে সুসজ্জিত রেখার সমষ্টি-বিশেষ এবং চিত্র পট ও চিত্রের পরস্পর সম্বন্ধ থাকে, কিন্তু বর্ত্তমান চিত্রে কোন বর্ণের একটিমাত্রও রেখা নাই এবং প্রাচীরসহ চিত্রের কোনও সংযোগ সম্বন্ধ নাই। আর এক কথা, ইহাতে কেবলমাত্র বর্ত্তমান দেবসভার চিত্র যে অঙ্কিত হইয়াছে, এরূপ নহে, আপনার সভা যত প্রকার রূপ ধারণ করিবে, তৎসমুদায়ই ইহার মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই অঙ্কিত আছে।" দেবরাজ চিত্রকরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "হে চিত্রকর! কি উপায়ে এ অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা প্রকাশ কর।" চিত্রকর ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল, "মহারাজ! আমার নিকট এক খণ্ড প্রস্তর আছে, যবনিকার মধ্যে অবস্থান করতঃ সেই প্রস্তর জল সেচন দ্বারা প্রাচীরের গাত্রে

সতত ঘর্ষণ করিয়াছি এবং যাবৎ প্রাচীরে প্রত্যক্ষভাবে আমার নিজ শরীর প্রতিবিম্বিত না হইয়াছে, তাবৎ ঘর্ষণ কার্য্যে বিরত হই নাই। এক্ষণে এ প্রাচীর সম্পূর্ণভাবে শুদ্ধ ও স্বচ্ছ হইয়াছে এবং ইহার সম্মুখে এ দেবসভা উপস্থিত থাকাতে, বর্ত্তমান দেবসভা তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। প্রাচীর যদিও নানা বর্ণের চিত্র নিজ বক্ষে ধারণ করিয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ শুদ্ধতা-হেতু সে নির্লিপ্ত।"

সাধকগণ এইরূপে গুরুদত্ত বীজমন্ত্র গ্রহণ করিয়া যবনিকার মধ্যে অর্থাৎ অতি গোপনে শ্রদ্ধাভক্তিরূপ বারি সেচন করিয়া নিজ হৃদয়পট শুদ্ধ করিবেন। উক্ত মন্ত্র শ্রদ্ধাভক্তি-সহকারে নিত্য জপ, পূজা-ব্রতাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, সাধকের চিত্ত ক্রমে শুদ্ধ হইয়া থাকে। যাবৎ নিজের স্বরূপ চিত্তপটে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি না হয়, তাবৎ অতি যত্ন-সহকারে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সেবা করা উচিত। পরে চিত্ত পূর্ণ ভাবে শুদ্ধ হইলে, চিত্ত সংসারের সকল প্রকার কর্ম্মের ফল ও তৎতৎ কর্ম্মের জ্ঞানে রঞ্জিত হইলেও শুদ্ধতা নিবন্ধন তাহাতে লিপ্ত হইবে না। এই রূপে চিত্তের শুদ্ধতাবস্থা প্রাপ্ত হইলে কর্ম্মফল ত্যাগের অধিকারী হইতে পারা যায়।

"মুক্তি মিচ্ছসি চেত্তাত বিষয়ান্ বিষবত্ত্যজ।
ক্ষমার্জব দয়া তোষ সত্যং পীযূষবদ্ ভজ ॥"—অষ্টাবক্র সংহিতা ।১।২ ॥

'হে তাত, যদি মুক্তিলাভের ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে অনিত্য বিষয়-বাসনা বিষবৎ ত্যাগ করতঃ ক্ষমা, সরলতা, দয়া, সন্তোষ ও সত্য প্রভৃতি গুণ গুলিকে অমৃতের ন্যায় ভজনা কর।'

"ন বিষং বিষমিত্যাহু বিষং বিষয়-বৈষমং।
জন্মান্তরঘ্না বিষয়াঃ একজন্ম হরেদ্বিষং ॥"

'বিষকে বিষ বলা যায় না, বিষয় বাসনাই বিষম বিষ। বিষ একমাত্র এই দেহকে নষ্ট করে বটে, কিন্তু বিষয় বাসনারূপ বিষ জীবের জন্মজন্মান্তর হনন করিয়া থাকে, অর্থাৎ জন্মান্তরে অধোগতি প্রাপ্ত করাইয়া দেয়।' সেই জন্য বিষয়বাসনা ত্যাগ করতঃ ক্ষমার্জব-দয়াদিকে হৃদয়ে অমৃতের ন্যায় ভজনা করিতে হয়। বস্তুতঃ বিষয়বাসনা ত্যাগ করিব মনে করিয়া সংসারে পিতা-মাতা স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদি ও ইন্দ্রিয়-ভোগ্য নানাবিধ ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া বিজন অরণ্যে যাইতে হইবে এরূপ নহে, অরণ্যে যাইয়াও যদি মনে বিষয়বাসনা থাকে, তবে তাহার অরণ্যে বসিয়াও বিষয়ের জন্য কাঁদিতে হয়। মন হইতে বিষয়বাসনা ত্যাগ করাই ত্যাগ, তাহার জন্য অরণ্যে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই।

"বাসনা এব সংসার ইতি সর্ব্বা বিমুক্তা।
তত্ত্যাগো বাসনা ত্যাগাৎ স্থিতিরস্তু যথা তথা ॥"—অষ্টাবক্র।

'বাসনাই সংসার অর্থাৎ কামনাই সংসার-বন্ধনের কারণ; সুতরাং সেই অনিত্য বাসনাকে সর্ব্বতোভাবে বিসর্জ্জন কর। বাসনা বর্জ্জিত হইলেই সংসার ত্যাগ হইবে, বাসনা

বর্জ্জিত হইয়া যে স্থানেই অবস্থান কর না কেন, তাহাতে কোন প্রকার বন্ধন নাই।' জীব বাসনা ত্যাগ করিতে পারিলে এ দুস্তর ভবসাগর হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারে; কিন্তু কর্ম্মফল বিসর্জ্জন দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ না হইলে বাসনাত্যাগ কখনও সম্ভবপর হয় না। সে কারণ যাহাতে চিত্ত শুদ্ধ হয়, তাহা সাধকগণের প্রথম কর্ত্তব্য। সংসারের প্রতি মমতা থাকিলে কর্ম্মফল ঈশ্বরার্পণ করিতে পারা যায় না। সংসারের প্রতি যে আসক্তি, আমার আমার বলিয়া যে মমতা আছে, সে মমতা যাবৎ নিজ ইষ্টদেবে বা নিজ আত্মায় স্থাপিত না হয়, তাবৎ নির্ম্মম হইয়া সংসার-বাসনা ত্যাগ হয় না।

"দ্বে পদে বন্ধমোক্ষায় মমেতি নির্ম্মমেতি চ।
মমেতি বধ্যতে জন্তুঃ নির্ম্মমেতি বিমুচ্যতে"॥ উত্তর গীতা।

'মমতা এবং নির্ম্মমতা এই দুইটি জীবের বন্ধ এবং মোক্ষের হেতু।' একদা রাজর্ষি জনক তাঁহার গুরুর আসন আপন রাজাসন হইতে উচ্চে স্থাপন করতঃ সমগ্র ঋষিদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "মহর্ষিগণ! আমার শীর্ষদেশে গুরুদেবের আসন শূন্য রহিয়াছে; আপনাদের মধ্যে যে মহাত্মা একটিমাত্র উপদেশ দ্বারা আমার হৃদয়ের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিয়া প্রকাশময় আত্মজ্ঞান প্রদান করিতে ও গুরুদক্ষিণা লইতে সমর্থ তিনি আমার গুরুর আসন অদ্য অধিকার করুন।" জনকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কোন মহাত্মা জনকের গুরু-আসন অধিকার করিতে সাহসী হইলেন না; কারণ ঋষিগণ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, রাজা জনককে এরূপ একটিমাত্র কি উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে, যাহাতে কোন সংশয় উপস্থিত হইবে না। এমত সময় অষ্টাবক্র ঋষি অকস্মাৎ জনকের গুরু-আসনে যাইয়া উপবেশন করিয়া বলিলেন, অদ্য হইতে আমি তোমার গুরুরূপে পূজার্হ বরণীয় হইলাম; যাহা তোমার নিজের বস্তু, তাহাই আমায় গুরুদক্ষিণা প্রদান কর।" রাজর্ষি জনক অষ্টাবক্র ঋষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—এই সমগ্র ঋষিমণ্ডলীর মধ্যে এতাবৎকাল কেহ আমার গুরুর আসন অধিকার করিতে সাহসী হন নাই, কিন্তু অষ্টাবক্র আমার গুরুর আসন অধিকার করিয়া আমার নিজের বস্তু গুরুদক্ষিণা চাহিয়াছেন। বস্তুতঃ আমার নিজের বস্তু কি? রাজ-সিংহাসন, রাজ-প্রাসাদ, রাজ্য, রাজকোষ প্রকৃতপক্ষে আমার নিজস্ব কিছুই নহে। আমার পূর্ব্বে এই সমস্ত আমার পূর্ব্বপুরুষগণ ভোগ করিয়াছিলেন এবং আমার অভাবে আমার বংশধরগণ ইহা ভোগ করিবে। অনন্ত সংসার মার্গে ভ্রমণ করিতে করিতে এই সকল ঐশ্বর্য্যের সহিত ক্ষণেকের জন্য আমার সম্বন্ধ হইয়াছে মাত্র। এ সম্বন্ধ যখন আমার সহিত চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে না, তখন ইহাদিগকে কিরূপে আমার নিজস্ব ঐশ্বর্য্য বলিতে পারি। পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদি, যাহাদিগকে আত্মীয় বলা যায়, বস্তুতঃ তাহারা কি আমার কর্ম্মফলের অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে? আমার কর্ম্মফল যখন আমিই গ্রহণ থাকি, কেহই তাহার অংশ [illegible] না, তবে এই নশ্বর সংসারে আমার

বলিয়া কাহার প্রতি মমতা করিব? একাকী সংসারে নিজকৃত কর্ম্মফলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এবং বর্ত্তমান প্রারব্ধ ভোগের অবসানে একাকী সংসার ত্যাগ করিব, যে আমার নিজ আত্মীয় হইবে, সে অবশ্যই আমার সহিত সহগমন করিবে। প্রিয় বস্তুতেই মমতা হইয়া থাকে। যাহা পরম প্রিয়, তাহাই বস্তুতঃ নিজ বস্তু।

"প্রিয়োহ্যাত্মৈব সর্ব্বেষাং নাত্মনো হ্যপরং প্রিয়ম্।
লোকেঽস্মিন আত্মসম্বন্ধাত্তুবস্তন্যে সদা প্রিয়াঃ॥"—আত্মজ্ঞান উপনিষদ্

আত্মাই সর্ব্ব জীবের পরম প্রিয়। আত্মা তুল্য অন্য কোন প্রিয় বস্তু নাই। আত্ম সম্বন্ধ জন্যই পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্রাদি ও ধন ঐশ্বর্য্য সতত প্রিয় হইয়া থাকে। অতএব আমিই আমার নিজস্ব পরম প্রিয়বস্তু। এই নিজ আত্মাই পরম প্রিয়, রাজর্ষি জনক ইহা জ্ঞাত হইয়া, রাজ্য-স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি মমতা ত্যাগ করিলেন এবং নিজ আত্মাভিমান গুরুপদে দক্ষিণা প্রদান করিলেন।

"রাজ্যং সুতাঃ কলত্রাণি শরীরাণি ধনানিচ।
সংসক্তস্যাপি নষ্টানি তব জন্মনি জন্মনি॥"—অষ্টাবক্র সংহিতা। ৬॥

হে শিষ্য! তুমি যতবার এ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, প্রতিজন্মেই রাজ্য, অপত্য, কলত্র, শরীর ও ধনৈশ্বর্য্যে আসক্ত হইয়াছ, কিন্তু এ সমস্তই ক্ষণস্থায়ী ও নশ্বর।

"বিজ্ঞায় নিরহঙ্কারঃ নির্ম্মমস্ত্বং সুখীভব।"

অতএব এই সকল নশ্বর অলীক জানিয়া তাহাতে আত্মাভিমান ও মমতা-শূন্য হইয়া তাপত্রয়ে তাপিত সংসারে সুখী হও। ক্রমশঃ

শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

কাল-জল।

সিন্ধু ভৈরবী—যৎ।

কালিন্দীর কাল জল, কে বলে শীতল। (উত্তপ্ত অনল)!
যে ঝাঁপ দিয়েছে, সে জেনেছে, উষ্ণ কি শীতল॥
বড় সাধ ছিল মনে, ডুবিয়ে কাল জীবনে,
জুড়াব বিরহাগুনে, (তা) বুঝি হ'লরে বিফল॥
কালিন্দীর কাল জলে, যখন উজান চলে,
দহি সই বিরহানলে, না হেরে কৃষ্ণকমল॥
দ্বিজ বলে গোপনারি! তোদের দুঃখেতে মরি,
(তাঁরে) দেখিলে আনিয়া ধরি, করিব জন্ম সফল॥

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

গুরুশিষ্য সংবাদ।

সে একদিন ছিল, যখন ব্রহ্মচারী ঋষিকুমারগণ নীরব শান্তিময় তপোবন মুখরিত করিয়া সমস্বরে ভগবানের গুণগান করিতেন, তরুশাখায় বসিয়া শুক ও শারিকা পূর্ব্বশ্রুত কোন দুরূহ তর্কের পূর্ব্বপক্ষ করিয়া তাঁহাদের শাস্ত্রবিচারের সহায়তা করিত, কখনও বা পত্রের অন্তরালে আপনাদিগকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কোন একটি ছাত্রকণ্ঠের অনুকরণে প্রশ্ন করিয়া বসিত, এবং তাহার উত্তর দিবার জন্য সর্ব্বজ্ঞ ঋষিবরকে কম্পিতাধর দেখিয়া দুষ্ট শুক আপনার প্রিয়তমা শারিকার সহিত একযোগে উচ্চ হাসি হাসিয়া তপোবন মাতাইয়া তুলিত। ওঙ্কারোচ্চারণে পবিত্র, বেদগানে মুখরিত, যজ্ঞধূমে ধূম্রশ্যামল, তথাকার বৃক্ষরাজি অপর্য্যাপ্ত ফলভারে নত হইয়া তাপসোচিত স্বভাবের পরিচয় দান করিত। সে বৃক্ষের একটি শাখাও ভগ্ন হয় নাই, একটি পত্রও অনাবশ্যক ছিন্ন হয় নাই। দেখিলে মনে হয়, কি এ পবিত্র সংযত স্থান! যেখানে ব্যাঘ্র ও হরিণ একত্র নির্ভয়ে জলপান করে, অহি ও নকুল একস্থানে বাস করে; যথাকার বায়ু স্নিগ্ধ ও ধূমগন্ধি, সলিল স্বচ্ছ ও কমল-কহ্লার-শোভিত; যে তপোবনের রেণু প্রার্থীর পক্ষে সুবর্ণকণিকা, হতাশের পক্ষে আশা, চির-দুঃখীর নিকট মৃদু সান্ত্বনা; যে স্থানের বন্য জন্তু পরস্পর হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া নিরীহ গ্রাম্য পশুর ন্যায় পরস্পর গাত্র লেহন করিয়া থাকে; যে স্থানের মাহাত্ম্যে, সামগান শুনিবার আশায়, প্রকৃতিও নীরব নিস্পন্দভাব ধারণ করে, অরণ্যচারী পশুগণ ও গগনবিহারী পক্ষিকুল বিমুগ্ধপ্রাণে, নিশ্চল শ্রবণে, সে গান শুনিবার আশায় ঝাঁকে ঝাঁকে তপোবনে চিত্রার্পিতবৎ স্থির থাকে। সে একদিন ছিল। এখন আর অষ্টমবর্ষীয় উপনীত ব্রাহ্মণ বালকের সে প্রথম পবিত্র বেদ সঙ্গীতে, তপোবনের প্রত্যেক তরুশাখা, নির্ঝরের প্রত্যেক বারিবিন্দু কাঁপিয়া উঠে না, পর্দ্দায় পর্দ্দায় সে ওঙ্কারধ্বনি প্রকৃতির নিস্তব্ধতা দূর করিয়া দূর আকাশের গায় মিশিয়া গিয়া অনন্তের অভিমুখে ছুটিয়া যায় না। দলে দলে ব্রহ্মচারী শিষ্যগণ জ্ঞান-লাভের আশায় গুরুদেবের চরণপ্রান্তে বসিয়া আর জিজ্ঞাসা করে না—"কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ"! ব্রহ্মচর্য্যে সুগঠিত কার্য্য-ক্ষম সে শরীর আর নাই, বিলাসশূন্য অকলুষ স্বভাবের নিষ্কলঙ্ক মূর্ত্তি সে ছাত্র বা সে শিষ্য আর নাই। একদিন সেই স্মৃতি-পর্য্যবসিত পূর্ব্বকালীন মহত্ত্ব অনুভব করিবার জন্য, অতীতের জলদজাল সরাইয়া সে পবিত্র ব্রাহ্মণ্য জ্যোতিঃ দেখিবার জন্য, জগজ্জননী মহা-শক্তি মায়ের নিকট প্রার্থনা করিলাম। করুণাময়ী মা আমার তখনকার একটি দৃশ্য দেখাইলেন। দেখিলাম, স্বভাবের শ্যামল তৃণাসনে তেজঃপুঞ্জাকৃতি গুরুদেব উপবিষ্ট এবং গুরুদেবের উপদেশ শুনিবার জন্য তাঁহার চতুর্দ্দিকে শিষ্যগণ উৎকর্ণ ও ব্যগ্রমানস। আশ্রম নীরব, আশ্রমস্থ পশু পক্ষী নীরব; বৃক্ষশাখার আন্দোলন-জনিত শব্দ নাই,

বায়ুবশে কম্পমান পর্ণের মর্ম্মর শব্দ নাই, বাতাসের সবেগ চলনও নাই। সে নীরবতার মধ্যে অকস্মাৎ গুরুদেবের গম্ভীর স্বর, সে নীরবতা ভেদ করিয়া দৈববাণীর মত, প্রথম সৃষ্টিকালীন ওঙ্কার শব্দের মত উচ্চারিত হইল, "বৎসগণ! প্রণাম কর। যিনি নিরাকার হইয়া সাকার, স্রষ্টা, অস্রষ্টা; শ্রোতা, অশ্রোতা; তাঁহাকে প্রণাম কর! যিনি মন্তা হইয়াও মন্তা নহেন, জগদ্রূপী হইয়াও রূপহীন, চক্ষু শ্রোত্র-কর-চরণ-বিহীন হইয়াও দিব্যচক্ষু, দিব্যকর্ণ, সহস্রকর ও সহস্রপাদ, তাঁহাকে প্রণাম কর!" প্রণাম সমাপ্ত হইলে একজন শিষ্য গুরুচরণে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদেব! যিনি শ্রোতা তিনি অশ্রোতা, যিনি দ্রষ্টা তিনি অদ্রষ্টা, যিনি রূপবান্ তিনিই আবার অরূপ, ইহা যে পরস্পর বিরোধী হইয়া পড়িল, আর এই বিরোধ মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে, বিরোধটি সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিন্।"

গুরু। আমি তোমাকে প্রথমে ন্যায়-বৈশেষিকাচার্য্যগণের মতের ভিতর দিয়া অদ্বৈত-ভাবে আনিবার চেষ্টা পাইব, এ কথা মনে রাখিও। আলোক থাকিলে যেমন অন্ধকার থাকে না, আবার অন্ধকার থাকিলে আলোক থাকে না, একের অপগমেই অপরের সত্তা, সেইরূপ বিরোধীধর্ম্ম এক সময়ে একজনের উপর থাকিতে পারে না। যে সময়ে তুমি গমন কর, সে সময়ে কখনও অবস্থান করিতে পার না। কারণ গমন ও অবস্থান পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাবাপন্ন।

শিষ্য। এক সময়েই না হইতে পারে; কিন্তু আমি যখন গমন করি, তাহার অব্যব হিত পরক্ষণেই ত অবস্থান করিতে পারি।

গুরু। অবশ্য তাহা পার বটে। বিরোধী ও অবিরোধী ধর্ম্ম এক সময়ে একজনের উপরে ত থাকিতে পারিল না। মন যখন অণু, * তখন এক সময়ে সকল ইন্দ্রিয়ের উপর থাকিতে পারে না বলিয়াই দর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন প্রভৃতি এক সময়ে ঘটে না। যে সময়ে দেখিতেছ, ঠিক সেই সময়ে দেখিতেছ না, ইহা যেরূপ সম্ভব নহে, সেইরূপ যে সময়ে শুনিতেছ, সেই সময়েই স্বাদ গ্রহণ বা স্পর্শানুভব করিতেছ, ইহাও সম্ভব নহে।

শিষ্য। কেন? যে সময়ে আমি আপনার স্নিগ্ধ আকৃতি দেখিতেছি, ঠিক সেই সময়েই ত আপনার মুখনিঃসৃত বাক্যও শুনিতে পাইতেছি।

গুরু। এক সময়ে পারিতেছ না, দর্শন ও শ্রবণ এক সময়ে দুইটি সম্ভব হয় না; দুইটি ইন্দ্রিয়-জ্ঞান যুগপৎ হইতে পারে না। চক্ষুর নিমেষ ফেলিতে যে সময়টুকু লাগে, তাহা অপেক্ষা মন এরূপ অভাবনীয় দ্রুতগতিতে এক ইন্দ্রিয় হইতে অপর ইন্দ্রিয়ে সম্বন্ধ স্থাপন করে, যে তাহা আমাদের বুঝিতে দেয় না। কোমল পত্রাবলীর এক কোণে সূচি বিদ্ধ কর,

* বেদান্তমতে মন অণু নহে, ব্যাপক।

দেখিবে যেন এক সময়েই বিদ্ধ হইতেছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয় না, এক একটি করিয়াই বিদ্ধ হইয়া থাকে।

এক্ষণে বিরোধ এই যে, গমন ও অবস্থান যেমন পরস্পর বিরোধী, তদ্রূপ দ্রষ্টৃত্ব ও অদ্রষ্টৃত্ব ধর্ম্মও (দর্শন দর্শনাভাব) পরস্পর বিরুদ্ধ। পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, মায়াময়, তাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি স্থিতি লয়; তাঁহার নিকট বিরুদ্ধ অবিরুদ্ধ কি? ইন্দ্রিয়ের পরিচ্ছিন্নতা, মনের অণুত্ব, দেহীর অনিয়তজ্ঞান, কি পরমেশ্বরে আরোপ করিতে চাও? তাঁহার নিত্যদৃষ্টি, অপরিযুক্ত চৈতন্যস্বভাব, তাঁহার সর্ব্বব্যাপিতা বা সর্ব্বশক্তিমত্তা বিলোপ করিতে চাও! তিনি যখন সৃষ্টি করেন, তখন পালন করিতে পারেন না, যখন দর্শন করেন, তখন শ্রবণ করিতে পারেন না, তাহা হইলে ক্ষণে ক্ষণে বিনাশশীল, পরিবর্ত্তনীয়, অনিত্য ধর্ম্ম ঈশ্বরে আরোপ করিতে হয়। তিনি সত্য-সংকল্প নিত্যবুদ্ধ, নিত্যপবিত্র ও পূর্ণ; তাঁহার জ্ঞান কখনও আবরিত থাকে না, ইচ্ছা বিঘ্নপ্রাপ্ত হয় না, শক্তি অপূর্ণ নহে। আমরা বিচ্ছিন্ন, অবিদ্যা-মুগ্ধ ও সঙ্কীর্ণ, তাহা বলিয়া আমাদের পরিবর্ত্তনীয় ধর্ম্ম, মিথ্যা সংকল্প তাঁহার উপর অর্পণ করা কখনই সঙ্গত নহে। আমাদের বিচ্ছিন্নতা লইয়া তাঁহার সে চির-পবিত্র পরিপূর্ণতার ইয়ত্তা করিতে যাওয়া, পঙ্গুর গিরি-লঙ্ঘন অপেক্ষাও হাস্যজনক ব্যাপার। আমরা মনুষ্য সৃষ্টি করিতে পারি না বলিয়া, এই প্রত্যক্ষ দৃষ্ট মনুষ্য-সত্তা অস্বীকার করা চলে না।

শিষ্য। বুঝিলাম। তবে আমরা যে দর্শন করি, শ্রবণ করি, তাহা কে করে? এই "আমরা"-পদে কাহাকে লক্ষ্য করা হয়। আত্মা যদি "আমরা"-পদবাচ্য, তবে আত্মার পূর্ণতাকে কেন বিচ্ছিন্নতার মধ্যে টানিয়া আনি, নিত্যসিদ্ধ জ্ঞানকে কেন অজ্ঞানতায় পরিণত করিতে প্রয়াস পাই, কেন তাঁহার স্বরূপ অন্যথা করি? মন যদি "আমরা" পদবাচ্য হয়, তবে আমাদের মন একথা বলিতে পারিতাম না; "আমরা" মন, একথা কেহই ত বলে না। দেহ যে "আমরা"-পদবাচ্য নহে, ইহা ত নিশ্চিত; কারণ আমরা দেহত্যাগ করি, দেহত্যাগ করিয়া "আমরা" চলিয়া যাই। তবে এ "আমরা" কে?

গুরু। বাস্তবিক দেহ, ইন্দ্রিয় বা মন "আমরা" নহে। আত্মাই "আমরা"-পদবাচ্য। আত্মা নিষ্ক্রিয়, স্বয়ংপ্রকাশ, স্বয়ংবুদ্ধ হইলেও অবিদ্যা-আবরণবশে অন্তঃকরণে আত্মভ্রম করি; আত্মচৈতন্যে চেতন অহঙ্কারতত্ত্বকে "আমরা" বলিয়া অভিমান করি। প্রকৃত স্বয়ংপ্রকাশ আত্মাকে বুঝিতে পারি না। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও অজ্ঞান, এই সকলের সমষ্টিভূত একটি অপূর্ব্ব পদার্থের সহিত আত্মার সংযোগ করিয়া, বলিয়া থাকি যে, "আমরা" বদ্ধ, পণ্ডিত, মূর্খ, সুখী, দুঃখী ইত্যাদি। কাচের পাত্রে লোহিত তরল পদার্থ রাখিয়া দিলে কাচ-পাত্রটি লোহিত বর্ণ বলিয়া বোধ হয়। ইহাকেই বেদান্তে উপাধি বলে। এই প্রকারেই এই অন্তঃকরণ-উপাধি ভেদে, এই মায়ার ঐন্দ্রজালিকতায়

আত্মাকে বদ্ধ, ভোক্তা, সুখী, দুঃখী ইত্যাদি মনে করিয়া প্রতারিত হই। অন্তঃকরণ ও আত্মা এমনভাবে পরস্পর ব্যাপ্য ব্যাপকভাবে থাকেন যে, পরস্পরের যে ভেদ আছে, তাহা বুঝিতেই পারি না। আর ব্যাবহারিক অবস্থায় সে ভেদ অনুভব না করিতে দেওয়াই অবিদ্যার কার্য্য। এই আবরণই আমাদের স্বরূপজ্ঞানের প্রতিবন্ধক,—ইহাই অজ্ঞান, অবিদ্যা বা মায়া। আমরা সেই "সদানন্দরূপঃ শিবোহহং"। যে কোন পাত্রের মধ্যে বাতাস পুরিয়া দিলে যেমন সেই বাতাসও সেই পাত্রের আকার ধারণ করে, অন্তঃকরণ যেমন চক্ষু প্রণালী সাহায্যে বহির্গত হইয়া তত্তৎ বিষয়ের আকার গ্রহণ করে, তদ্রূপ আত্মাও অন্তঃকরণ ও তাহার ধর্ম্মের সহিত মিশ্রিতভাবে থাকায় তদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট, তদ্ভাবে যেন অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে। প্রকৃত তিনি নির্ব্বিকার, উপাধিশূন্য, নিষ্ক্রিয় ও নীরূপ।

শিষ্য। প্রকৃত আত্মা দ্রষ্টা বা কিছুই নহেন, তিনি সকল উপাধিহীন। তাঁহার স্বরূপ তিনিই, "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং", দ্রষ্ট্রাদি ধর্ম্ম উপাধি মাত্র, লৌহে অগ্নিবুদ্ধির মত আরোপিত মাত্র। তবে এইরূপ অলীক উপাধি স্বীকার না করিয়া—মনকে শ্রোতা, মন্তা ইত্যাদি ধর্ম্ম-বিশিষ্ট বলিলেই ত হয়।

গুরু। মন ত করণ মাত্র। অনুভবও এই হয় যে, মনের দ্বারা আমি জানিলাম, "মনসা জানামি।" জগতে চৈতন্য এক, দ্বিতীয় নাই। মন জড়, তাহার স্বতন্ত্র চৈতন্য নাই। অগ্নি বিনা বালুকার স্বতন্ত্র শক্তি নাই। সেই চৈতন্যে মন চেতন, সেই মহাশক্তিতে শক্তিমান্ বলিয়াই মনে দ্রষ্টৃত্ব-শক্তি দেখা যায়, তাই মনও কখন কখন কর্ত্তৃরূপে ব্যবহৃত হয়। করণে কর্ত্তৃত্বের উপচার।

শিষ্য। মনের দর্শনাদি শক্তি কি প্রকারে জন্মিয়া থাকে?

গুরু। মন ইন্দ্রিয়কে দ্বার করিয়া দর্শনাদি সাধন করে। রাত্রিতে স্বপ্ন দেখ; কে দেখে?—না—মন। পূর্ব্বজন্মে কাহাকেও ভালবাসিয়াছিলে, ইহজন্মে তাঁহাকে দেখিয়াই কি যেন একটা স্বপ্নের মত অতীত স্মৃতি জাগিয়া উঠিল; এ স্মৃতি কে জাগাইল? না—মন। যে জন্মান্ধ, সেও কদাচিৎ স্বপ্নে দিব্যমূর্ত্তি দেখিয়া থাকে, চিরবধিরও স্বপ্নে অস্ফুট সঙ্গীতালাপ শুনিতে পায়। তবেই দেখ, ইন্দ্রিয়কে দ্বারস্বরূপ করিয়া মন দর্শনাদি ব্যাপার সমাধা করে। আবার সেইরূপই পূর্ব্বজন্মে স্থূলেন্দ্রিয়-সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল বলিয়াই, ইহজন্মে স্থূলেন্দ্রিয় না থাকিলেও সূক্ষ্মেন্দ্রিয় সাহায্যে মনই ইহজন্মে দর্শন বা শ্রবণ করিতে সক্ষম হয়। তাই অন্ধ স্বপ্ন দেখে, বধির সঙ্গীত শুনিতে পায়।

শিষ্য। মানিলাম। কিন্তু এই দেহত্যাগের পর জীব যখন সূক্ষ্মদেহে বাস করে, এবং কর্ম্মফল ভোগের জন্য স্বর্গ বা নরকে গমন করিতে বাধ্য হয়, তখন সে গমন কে করে? সে ফল, কে ভোগ করে? আর স্বর্গ নরক বলিয়া যে প্রসিদ্ধ কোন স্থান আছে, সে বিষয়েও সন্দেহ বিদ্যমান। ইহা রূপক বা পাপ-নিবৃত্তির জন্য বুদ্ধিমান্ কর্ত্তৃক উচিত উপায় আবিষ্কার মাত্র।

গুরু। এ অনাস্থা সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশেই আছে বা ছিল। সকলেই যে বুঝিতে না পারিয়াই স্বর্গ নরকে অনাস্থাবান্, তাহা নহে। যাঁহারা বহু চেষ্টা করিয়া, বুদ্ধি খাটাইয়া বুঝিতে পারিলেন না বলিয়া সন্দিগ্ধ, তাঁহারা বরং প্রশংসার পাত্র। কিন্তু অনেকে না ভাবিয়া, বুঝিবার চেষ্টা না করিয়াই বীতশ্রদ্ধ। নরকে অবিশ্বাস - পাপীর পক্ষে সান্ত্বনাস্থল। পাপ করিবার পথ বিঘ্নশূন্য মনে করাই, সংসারজড়িত মানবের একটি চাতুরী মাত্র। স্বর্গে অশ্রদ্ধা—যথেচ্ছাচারিতার উত্তম সহায়, ধর্ম্মকার্য্য না করিবার পক্ষে সুন্দর কৈফিয়ৎ।

বাস্তবিক স্বর্গ বা নরক অতীন্দ্রিয়। ইহা প্রত্যক্ষ হয় না; অনুমান ইহার ব্যাপ্তি খুঁজিয়া পায় না, যুক্তি বা বিজ্ঞান সুস্পষ্ট বুঝিতে বা বুঝাইয়া দিতেও অপারগ। বাহ্যমুগ্ধ শিক্ষিতগণের মস্তিষ্ক উর্ব্বর, তাহাতে শস্য জন্মিতে পারে, কিন্তু স্বর্ণ ফলে না। অতীন্দ্রিয় বস্তুর ধারণা করিতে হইলে যে অধ্যাত্মপূত বলের আবশ্যক, যে সাধনা-সম্ভূত শক্তির প্রয়োজন, তাহা আমাদের নাই। ব্রহ্মবিৎ আর্য্যঋষিগণের অধ্যাত্মশক্তি, মহামনীষী আচার্য্যবৃন্দের অমানুষী প্রতিভা ছিল বলিয়াই, এ বিষয়ে তাঁহারা স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারিয়াছেন। আমি তাহাই তোমাকে বারান্তরে বুঝাইব।

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ।

হারান-রতন।

জাগো আজি, প্রেমময়ি! কুসুম-সুষমা ল'য়ে অন্তরে আমার;
নয়ন মুদিয়া আমি, পরাণ ভরিয়া দেখি মূরতি তোমার!
নিভে যা'ক চন্দ্র তারা, রূপের গরব নি'য়ে নলিন-নয়নে
দেখিতে দেখিতে আমি, আপনা মিলা'য়ে দিব নীরব-সাধনে!
হেলায় খেলায় মজি, আছিনু ঘুমা'য়ে দেবী হায়, এত দিন!
আজি যে ভেঙ্গেছে ঘুম – হৃদয় উ'ঠেছে জাগি বিক্রমে নবীন!
সুখ ব'লে দুঃখ যত কু'ড়ায়ে নিয়েছি আমি দেখিনি চাহিয়ে
দিকে দিকে পদধ্বনি—দিকে দিকে নিশ্বাস তোমার—আজি, উ'ঠেছে জাগিয়ে!
হে আমার শান্তোজ্জ্বল চির-মধুরিমা-ময়ি! দেবী নিরাকারা
ব্যর্থ-সংগ্রামের শেষে জীবন-সায়াহ্নে আজি পড়িয়াছ ধরা!
আর কি ভুলিয়া পথ, জীবনে মেলিব মোর মুদিত নয়ন?
হৃদে যে প'ড়েছে ধরা, চির-সাধনার-নিধি—"হারান-রতন!"

শ্রীমতিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম।

সুবিখ্যাত দার্শনিক, জ্ঞানী, পণ্ডিত, পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয় গত জ্যৈষ্ঠের "ব্রহ্মবিদ্যা" পত্রিকায় "গীতার ঈশ্বরতত্ত্ব ও ভক্তিযোগ" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন, কিন্তু কোথাও আপনাকে পরব্রহ্ম বলেন নাই।" যাঁহার গীতার ব্যাখ্যা পুস্তক হিন্দুমাত্রেরই নিকট পরম আদরের বস্তু হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস, যাঁহার গীতার পদ্যানুবাদ ও সর্ব্বশাস্ত্রের সহিত গীতার সমন্বয় বাঙ্গালা ভাষায় অপূর্ব্ব সামগ্রী হইবে, তিনি হঠাৎ একথা লেখাতে আমরা বিস্মিত হইয়াছি। ইহাকেই বলে "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।" গীতার ১১শ অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইবার কথা পরে বলিব, ১০ম অধ্যায়ের শেষে যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন ;—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ। ১০।৪২

শাঙ্করভাষ্যং—অথবা বহুনা এতেনৈবমাদিনা কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন! স্যাৎ, সাবশেষেণ অশেষতস্ত্বমিমমুচ্যমানমর্থং শৃণু বিষ্টভ্য বিশেষতঃ স্তম্ভনং দৃঢ়ং কৃত্বা ইদং কৃৎস্নং জগৎ একাংশেন একাবয়বেনৈকপাদেন সর্ব্বভূতস্বরূপেণেত্যেতত্তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ,—"পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানী"তি স্থিতোঽহং ইতি ॥ ৪০ ॥

স্বামিকৃত টীকা। অথবা কিমেতেন পরিচ্ছিন্নবিভূতিদর্শনেন সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিমেব কুর্ব্বিত্যাহ অথবেতি। বহুনা পৃথগ্ জ্ঞাতেন কিং তব কার্য্যং, যস্মাদিদং সর্ব্বং জগদেকাংশেনৈকদেশমাত্রেণ বিষ্টভ্য ধৃত্বা ব্যাপ্যেতি বা অহমেবাবস্থিতঃ ন মদ্ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিদস্তি "পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানী"তি শ্রুতেঃ। ইন্দ্রিয়দ্বারতশ্চিত্তে বহির্ধাবতি সত্যপি। ঈশদৃষ্টি বিধানায় বিভূতির্দশমেঽব্রবীৎ ॥ ৪২ ॥

"অথবা হে অর্জ্জুন! অধিক জানিবার আর তোমার প্রয়োজন কি? ইহাই জানিয়া রাখ যে, এই সমস্ত জগৎ আমি আমার একাংশ মাত্রে ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছি।"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে পরব্রহ্ম, তাহা উক্ত শ্লোকে কি বুঝাইতেছে না? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, কোটি কোটি জগৎ তাঁহার একাংশে অবস্থিত; বাকি সমস্ত চির-অব্যক্ত, তাহাই ব্রহ্মের তুরীয়ভাব।

"সৃষ্টি," "পরলোকতত্ত্ব," "প্রলয়তত্ত্ব" "বেদান্তদর্শন" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক মনীষী চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় তাঁহার "সৃষ্টি" নামক পুস্তকে এ সম্বন্ধে যাহা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

"নকৃৎস্নব্রহ্মবৃত্তিঃ সা শক্তিঃ কিন্ত্বেকদেশভাক্।
ঘট শক্তির্যথা ভূমৌ স্নিগ্ধ মৃদ্যেব বর্ত্ততে ॥
পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্য স্বয়ম্প্রভঃ।
ইত্যেক দেশবৃত্তিত্বং মায়ায়া বদতি শ্রুতিঃ ॥

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগৎ।
ইতি•কৃষ্ণোঽর্জ্জুনায়াহজগতস্ত্বেকদেশতাং॥
স ভূমিং সর্ব্বতোবৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং।
বিকারা বর্ত্তিচাত্রাস্তি শ্রুতি সূত্র কৃতোর্ব্বচঃ॥
নিরংশেপ্যংশমারোপ্য কৃৎস্নেংশেবেতি পৃচ্ছতঃ।
তত্তাসয়োত্তরং ব্রূতে শ্রুতিঃ শ্রোতৃহিতৈষিণী॥ –(ভূত বিঃ ৪৮ অবধি ৫২ শ্লোক।)

অর্থ।—

পরমেশ্বরের সৃষ্টিশক্তি, যাহার নাম মায়া, তাহা তাঁহার পূর্ণ শক্তি নহে। কিন্তু তাঁহার পূর্ণ শক্তির একদেশ মাত্র। যেমন পৃথিবীর সমস্ত শক্তি হইতেই ঘটশরাবাদি উৎপন্ন হয়না, কেবল আর্দ্র মৃত্তিকাতেই ঘট-শরাবের জনন-শক্তি অবস্থিতি করে। পরমাত্মার একপাদ সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত এবং তিন পাদ নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, স্বয়ম্প্রকাশ-স্বরূপ। এই প্রকারে পরব্রহ্মেতে মায়ার অর্থাৎ সৃষ্টিশক্তির একদেশবৃত্তিত্ব শ্রুতিতে উপদেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ ব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তি তাঁহার পূর্ণভাবের একাংশমাত্র। ভগবদ্-গীতার দশম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে অর্জ্জুনকে ভগবান্ এই বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন, যথা,—আমি স্বীয় শক্তির একাংশদ্বারা এই জগতে স্থিতি করিতেছি। সেই পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বর-শক্তি মায়া ব্রহ্মের পূর্ণস্বরূপব্যাপী নহে, এতদ্বিষয়ে অন্য শ্রুতি এবং শারীরক সূত্র প্রমাণ দিতেছেন। যথা, পরমেশ্বর স্বীয় স্বরূপের কিয়দংশদ্বারা এই সমুদায় জগৎকে ব্যাপিয়া আছেন—অতিরিক্ত অংশ নিত্য শুদ্ধ, মুক্তভাবে অবস্থিত আছে। এতদ্বিষয়ে শারীরক সূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদের ১৯শ সূত্র প্রমাণ, যথা ;—পরমেশ্বরের স্বরূপ কেবল সৃষ্টিরূপ বিকারের মধ্যে ব্যাপ্ত নহে, তিনি অনাবৃত স্বভাবেও স্থিতি করেন। ফলতঃ পরমেশ্বর প্রকৃতপ্রস্তাবে নিরবয়ব, তাঁহার স্বরূপের অংশ সম্ভব হয়না। কেবল শিষ্য-দিগকে তত্ত্বজ্ঞান দান জন্য উক্ত প্রকার অংশ ব্যবহার করিয়াছেন ইতি।

(সৃষ্টি, ৭১ হইতে ৭৫ পৃঃ)

* * * *

"ব্রহ্ম স্বকীয় স্বরূপের এক-দেশ-ব্যাপী সেই মায়া নামক সৃষ্টিশক্তি অবলম্বন করিয়া জগতের সৃজন-পালনে নিযুক্ত আছেন। সুতরাং ইহা বলা অযুক্ত নহে যে, ব্রহ্মই স্বয়ং সেই একদেশব্যাপী শক্তির সঙ্গে-সঙ্গে এই জগতে স্বীয় স্বরূপের একাংশে স্থিতি করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার অবশিষ্ট স্বরূপ ও শক্তি বাক্য মনের অগোচর, নিরুপাধি ও নিষ্ক্রিয়।"

(সৃষ্টি-৭৫ পৃঃ ১০৮।)

* * * *

"উপরি উক্ত তিন পাদ এক স্বতন্ত্র ব্রহ্ম এবং এক পাদ আর এক ব্রহ্ম, এমত নহে।

তথাপি অনেকে উপাসনার সুবিধার জন্য ঐ এক পাদকেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর জ্ঞান করেন। ফলে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে ঐ তিন পাদ ও এক পাদকে একমাত্র অভেদরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়।"

(সৃষ্টি-৭৬ পৃঃ ১১১।

"বুঝিবার সুবিধার জন্য প্রথমোক্ত তিন পাদ অনাবৃত ব্রহ্ম, অসঙ্গ ব্রহ্ম চৈতন্য, তুরীয় ব্রহ্ম চৈতন্য, আধার চৈতন্য, নিরুপাধি, নিষ্ক্রিয় 'ইত্যাদি এবং শেষোক্ত একপাদ ঈশ্বর, সর্ব্বেশ্বর, বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, বৈশ্বানর ইত্যাদি এবং সমুদায় চারিপাদ পূর্ণব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর ইত্যাদি নাম ও বিশেষণ দ্বারা কথিত হইয়াছেন।"

(সৃষ্টি-৭৬ পৃঃ ১১২)

এসব প্রমাণের পর এই বলিতে ইচ্ছা হয়, দেবেন্দ্রবাবুর মত জ্ঞানী ও শাস্ত্রজ্ঞেরও দৃষ্টিভ্রম (oversight) হইয়াছে।

গীতার ৮ম অধ্যায়ের ২১শ শ্লোক এই ;—

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্। যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।

শ্রদ্ধাস্পদ দেবেন্দ্র বাবু উক্ত শ্লোকের "পরমাংগতিম্" ও "তদ্ধামং পরমং মম" এই কয়টী কথার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—"ভগবান্ এই অব্যক্ত অক্ষর পরমব্রহ্মকে পরম গতি ও আপনার পরম ধাম বলিয়াছেন ; কিন্তু শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন এইরূপ ;—

"পরমাং প্রকৃষ্টাং গতিং, যং ভাবং প্রাপ্য গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে সংসারায়, তদ্ধাম স্থানং পরমং প্রকৃষ্টং মম বিষ্ণোঃ পরমং পদমিত্যর্থঃ।"

শ্রীধরস্বামীও তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন ;—

"তচ্চ মমৈব ধামস্বরূপং মমেত্যুপচারে মষ্ঠীরাহোঃ শির ইতিবৎ। অতোঽহমেব পরমা গতিরিত্যর্থঃ।"

'সেই অক্ষর অব্যক্ত সত্তা স্বরূপকে শ্রুতি স্মৃতি জীবের পরম গতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই সর্ব্বরূপ ভাব প্রাপ্ত হইলে জীবের পুনর্জ্জন্ম হয় না। উহাই আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধাম' ॥২১॥

মুমুক্ষুগণ আত্মজ্ঞান দ্বারা যে পুরুষার্থস্বরূপ পরমানন্দধাম প্রাপ্ত হয়েন, তাহারই নাম "পরম গতি।" শ্রুতি বলিয়াছেন ;—

"এষাস্য পরমা গতিঃ পুরুষান্ন পরঃ কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ।'

"সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মাই বিদ্যাবান্‌দিগের পরমগতি, উহা কোন বস্তুবিশেষ নহে। সমস্ত আবেগ, সম্বেগ, মতি, রতি, গতি যেখানে গিয়া পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহাই পরম গতি, তাহাই পরমাত্মা। সেই পরম গতি স্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ করিলে জীবের গতায়াতের শেষ হইয়া যায়। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ইহাই বিষ্ণুর পরম পদ অর্থাৎ উহাই বিষ্ণুর স্বরূপাবস্থা।" শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর গীতা।

গীতার ১৫শ অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকস্থ "তদ্ধাম পরমং মম"—এই বাক্যের শ্রীমৎ শঙ্করা-

চার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "তদ্ধামেতি ব্যবহিতেন ধাম্না সম্বন্ধঃ। ধাম তেজোরূপং পদং ন ভাসয়তে সূর্য্য আদিত্যঃ সর্ব্বাবভাসনশক্তিমত্ত্বেঽপি সতি, তথা ন শশাঙ্কশ্চন্দ্রো ন চ পাবকো নাগ্নিরপি। যদ্ধাম বৈষ্ণবং পদং গত্বা প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে, যচ্চ সূর্য্যাদিভির্ন ভাসয়তে, তদ্ধাম পদং পরমং বিষ্ণোর্ম্মম পদং যৎ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে ইত্যুক্তং ॥১৫।৬॥

দেবেন্দ্রবাবু কেন যে বলিলেন, "অতএব গীতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ঈশ্বরতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব ঠিক এক নহে," তাহা আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিনা। জ্ঞানীজনেরও এক এক সময়, কাহারও ব বরাবর এক একটী মতবাদ-মেঘ জ্ঞান-সূর্য্যকে আবৃত রাখে। ইহা কি তাহারই একটী দৃষ্টান্ত ?

গীতার ৮ম অধ্যায়ের ১৩ শ্লোক এই ;—

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, "ব্রহ্মণোঽভিধানভূতমোঙ্কারং ব্যাহরন্নুচ্চরং তদর্থভূতং মামীশ্বরমনুস্মরন্নুচিন্তয়ন্ যঃ প্রয়াতি" ইত্যাদি।

শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা ; –

"ওমিত্যেকং যদক্ষরং তদেব ব্রহ্মবাচকত্বাৎ ব্রহ্ম প্রতিমাদিবদ্ব্রহ্ম প্রতীকত্বাদ্বা ব্রহ্ম, তদ্ব্যাহরন্নুচ্চরন্ তদ্বাচ্যঞ্চ মামনুস্মরন্নেবং দেহং ত্যজন্" ইত্যাদি।

যে উপাসক এই ব্রহ্মরূপ একাক্ষর উচ্চারণ করিতে করিতে আমাকে পরমেশ্বরকে) চিন্তা করেন, সেই উপাসক দেহান্তকালে পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

(শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর অনুবাদ)

এখানেও ব্রহ্মতত্ত্বে ও ঈশ্বরতত্ত্বে কোন প্রভেদ নাই। ব্রহ্মতত্ত্বে ও ঈশ্বরতত্ত্বে যে কোন পার্থক্য নাই; শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া তাহার প্রচুর প্রমাণ দিতে পারিতাম, কিন্তু সে পরিশ্রম আমাদিগকে করিতে হইল না। যিনি নিয়ত শাস্ত্রসাগরে নিমজ্জিত হইয়া তাহার অসংখ্যরত্ন সংগ্রহ করিতেছেন, সেই শাস্ত্রবিৎ দার্শনিক, জ্ঞানী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের "গীতায় ঈশ্বরবাদ" গ্রন্থ হইতে কয়েক স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব, ঈশ্বরতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব ঠিক এক, কোন পার্থক্য নাই।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্। [কঠ, ৩। ১৫]

—ইহা নির্গুণের নির্দ্দেশ ; আবার—

সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ। [ছান্দোগ্য ৩। ১৪। ২]

—ইহা সগুণের নির্দ্দেশ। কোথাও কোথাও কিন্তু শ্রুতি এই দুই বিভাবের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন ;—

দ্বেবাব ব্রহ্মণোরূপে।—বৃহদারণ্যক ২। ৩। ১।

'ব্রহ্মের হয় দুইরূপ।'

এতদ্বৈ সত্যকাম পরম্ অপরঞ্চ ব্রহ্ম।—প্রশ্ন, ৫। ২।

'হে সত্যকাম এই পর ও অপর ব্রহ্ম।'

উপনিষদের আলোচনা করিলে আরও দেখা যায় যে, এই সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম একই বস্তু। সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষে কেবল ভাবের প্রভেদ মাত্র; বস্তুগত কোন ভেদ নাই। কারণ, নির্বিশেষ পর-ব্রহ্ম যখন মায়া-উপাধি অঙ্গীকার করিয়া নিজেকে যেন সঙ্কুচিত করেন, তখন তাঁহার যে বিভাব হয়, তাহাই সবিশেষ বা সগুণ ভাব।

* * *

মায়াকে ব্রহ্মের যবনিকা বা তিরস্করণী বলা হইয়াছে। এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়া ভাগবত বলিয়াছেন,—

নারায়ণে ভগবতি তদিদং বিশ্বমাহিতম্।
গৃহীতমায়োরুগুণঃ সর্গাদাবগুণঃ স্বতঃ॥—২।৬।২৯

'এই জগৎ ভগবান্ নারায়ণে নিহিত আছে। তিনি স্বভাবতঃ নির্গুণ কিন্তু সৃষ্টির প্রারম্ভে মায়া-উপাধি অঙ্গীকার করিয়া সগুণ হয়েন।' পর-ব্রহ্ম যখন মায়ায় উপহিত হন, তখন তাঁহাকে মহেশ্বর বলা হয়।

(গীতায় ঈশ্বরবাদ— ২৭৪ ও ২৭৫ পৃঃ)।

অনন্ত সাগরের যে নিবাত, নিষ্কম্প, প্রশান্ত, নিথর অবস্থা- ইহাই ব্রহ্মের নির্গুণ ভাব। আর সমুদ্রের যে লহরী-সঙ্কুল, বীচি-বিক্ষুব্ধ, স-ফেন, তরঙ্গিত অবস্থা,— ইহাই ব্রহ্মের সগুণভাব। একই সমুদ্র কখন প্রশান্ত, কখন বিক্ষুব্ধ; একই ব্রহ্ম কখন নির্গুণ কখন সগুণ। প্রশান্ত সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হইতেছে, আবার বিক্ষুব্ধ সমুদ্র প্রশান্ত ভাব ধারণ করিতেছে; পর-ব্রহ্ম মায়া-যবনিকার আবরণে সগুণ সঙ্কুচিত হইতেছেন, আবার মায়ার আবরণ তিরোহিত করিয়া নির্গুণ নিস্তরঙ্গ হইতেছেন। পর্য্যায়ক্রমে মহাসমুদ্রের ঐ দুই অবস্থা; পর্য্যায়ক্রমে ব্রহ্মের ঐ দুই বিভাব। তিরস্করণীর আবরণে ব্রহ্ম-জ্যোতি কখন সঙ্কীর্ণ সসীম হইতেছেন, আবার তিরস্করণীর তিরোধানে ব্রহ্মজ্যোতি পুনরায় অসীম অনন্ত অনাবৃত হইতেছেন।

* * * *

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ ঈশ ৮।

এখানে প্রথম অংশ নির্গুণ ব্রহ্মের নির্দ্দেশক, সেইজন্য ক্লীবলিঙ্গের প্রয়োগ; আর শেষাংশ সগুণ ব্রহ্মের নির্দ্দেশক, সেইজন্য পুংলিঙ্গের প্রয়োগ। একই মন্ত্রে সগুণ ও নির্গুণ এই উভয় ভাবেরই নির্দ্দেশ করিয়া শ্রুতি এই উপদেশ দিলেন যে, সবিশেষে ও নির্ব্বিশেষে কেবলমাত্র ভাবের প্রভেদ; সগুণ ও নির্গুণ বস্তুতঃ একই বস্তু। সেই জন্যই শ্রুতি ব্রহ্মের একটী নাম দিয়াছেন—পরাবর।

"তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।"—মুণ্ডক, ২।২।৮। পর ও অবর = নির্গুণ ও সগুণ। উভয়ের সমাস করিয়া শ্রুতি বুঝাইলেন যে, পর ও অবর একই বস্তু।

(গীতায় ঈশ্বরবাদ ২৭৬ ও ২৭৭ পৃঃ।

ইহার পর গীতার ১১শ অধ্যায়ের নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলি পাঠক পাঠিকাগণ প্রণিধান করিয়া মীমাংসা করুন, গীতার ঈশ্বরতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব এক কিংবা পৃথক।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন ;—

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥ ১১ ॥ ৬ ॥

হে ভারত, এই দেখ আমার দেহের মধ্যে আদিত্যমণ্ডল, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনী-কুমারদ্বয় এবং মরুৎগণ রহিয়াছেন এবং যাহা পূর্ব্বে কখনও দেখ নাই, এরূপ অনেক অদ্ভুত রূপ দেখিয়া লও ॥ ৬ ॥

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ১১।৭।

হে গুড়াকেশ! আমার দেহের একাংশ মাত্রে স্থাবর জঙ্গম সহিত সমস্ত জগৎ দেখিয়া লও, অথবা আরও যদি কিছু দেখিবার থাকে, তাহাও দেখিয়া লও ॥ ৭।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুন ;—

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে। ১১। ১৮।

তুমি পরম অক্ষর ও তুমিই জ্ঞাতব্য ; তুমি এই জগতের পরম আশ্রয় ও তুমি অব্যয়, তুমিই নিত্যধর্ম্ম প্রতিপালক এবং তুমিই সনাতন পরমাত্মা পুরুষ, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই ॥ ১৮ ॥

হে ভগবন্! বেদান্তপ্রতিপাদ্য অক্ষর নির্গুণ ব্রহ্ম তুমিই এবং সেই জন্যই মুমুক্ষু গণের জ্ঞাতব্যও তুমি। তুমি প্রপঞ্চ জগতের অধিষ্ঠান স্বরূপ ও নিত্য পুরুষ। তুমিই বেদ-প্রতিপাদিত আশ্রমধর্ম্মাদির ব্যবস্থাপক ও পালনকর্ত্তা এবং তুমি নিত্য বিদ্যমান পরমাত্মা। ১৮॥ (শ্রীকৃষ্ণানন্দের অনুবাদ)

গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে অনন্ত! দেবেশ! জগন্নিবাস! ১১। ৩৭

হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি ব্রহ্মারও গুরু ও জনক।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ —

তুমিই আদিদেব, তুমিই পরম পুরুষ ১১। ৩৮

আমাদের প্রবন্ধ ক্রমে দীর্ঘ হইয়া পড়িল ; আর উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন। আমরা দেখিয়াছি, কেবল গীতার নহে, উপনিষদাদি সর্ব্বশাস্ত্রের উপদেশ, ঈশ্বরে ও ব্রহ্মে কোন প্রভেদ নাই। শ্রীকৃষ্ণও যিনি, পরব্রহ্মও তিনি।

পরিশেষে বক্তব্য পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয়ের আমি শিষ্যেরই যোগ্য ; সারাজীবন তাঁহার নিকট আমি শিক্ষালাভ করিতে পারি ; তাঁহার শাস্ত্রীয় প্রবন্ধের প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে দুঃসাহস। কিন্তু সদ্‌যুক্তির অনুরোধে আমি এই প্রতিবাদ প্রবন্ধ লিখিতে বাধ্য হইয়াছি ; জগতের সকলের অপেক্ষা তাহা গরীয়ান্।

শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত বর্ম্মা।

বুদ্ধ-প্রেরণা।*

(১)
মম ধর্ম্ম-বার্ত্তা
চৌদিকে ঘোষিয়া,
মম ধর্ম্ম-ভেরী
চৌদিকে নাদিয়া,
মম ধর্ম্ম-সঙ্খ
পুলকে ধ্বনিয়া,
নর-দেবলোক মাঝ
বিচর তোমরা আজ!

(২)
মম জয়-ধ্বজা
জগতে তুলিয়া,
মম ধর্ম্ম-কেতু
হর্ষে উড়াইয়া,
মম ধর্ম্ম কুম্ভ
উরধে ক্ষেপিয়া,
নর-দেবলোক মাঝ
বিচর তোমরা আজ!

(৩)
নির্ব্বাণ-মার্গ
অমৃত শোভিত,
নিরয়-পন্থা
কণ্টক পূরিত,
মারের আনন
মসী-বিলেপিত,
নর-দেবলোক মাঝ
প্রচার তোমরা আজ!

(৪)
বুদ্ধ যাতায়াত
সময় মাঝার,
ছিল অবরুদ্ধ
মোক্ষ-দুয়ার,
আমাদের তরে
করিলা আবার
মুক্ত আজি ভগবন্,
কর সবে নিবেদন!

(৫)
ভুবনে আমার
হইল জনম,
পূরিল আমার
পবিত্র ধরম,
জাগে ভিক্ষুসঙ্ঘে
সাম্য-করম,
প্রচারি জগতী তলে
ভ্রম সবে কুতূহলে!

(৬)
বন, পথ, গিরি-
গুহা, তরুমূলে,
শূন্যাগারে রহি'
প্রমত্ততা ভুলে,
মম ধর্ম্ম-মার্গ
মন-প্রাণ খুলে,
নর-দেবলোক মাঝ
করগো প্রচার আজ!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

---

* "সমন্তকূটবন্ননা" নামক পালি গ্রন্থ হইতে এই শ্লোকটী সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা-কবিতায় অনুবাদিত হইল। ভগবান্ গৌতম-বুদ্ধ তাঁহার সাধনা-লব্ধ সত্যকে জগতে প্রচার করিবার জন্য ষাটজন শিষ্যকে এই কথাগুলিদ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া মৃগদাব (সারনাথ) হইতে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেন।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের সার তত্ত্ব।

সকল মানুষের মন সমান উপাদানে গঠিত নহে। মনোবৃত্তিতে মানবে মানবে প্রভেদ অনেক। সদ্ভাব ও অসদ্ভাব সকলের মনেই আছে। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে উহাদের পরিমাণ বিভিন্ন। কাহারও মনে হিংসা, দ্বেষ, কাম, ক্রোধাদি নিকৃষ্ট ভাব অতিমাত্র প্রবল, তাহাকে আমরা পশু ভাবাপন্ন বলিয়া থাকি। কেহ বা দয়া, দাক্ষিণ্য, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, সত্যনিষ্ঠাদি উন্নত গুণে বিভূষিত। এই সকল গুণরাশি অনন্য-সাধারণ ভাবে পরিস্ফুট হইয়া যে মহাত্মাকে মানব-কুলে মহামহিমান্বিত আসন প্রদান করিয়াছে, তাঁহাকে আমরা দেব-ভাবাপন্ন বলিয়া পূজা করি। মনোভাবের নিকৃষ্ট অবস্থা পশুভাব; সাধারণ অবস্থা নরভাব; আর সমুন্নত অবস্থা দেবভাব বলিয়া কথিত হয়। এই তিনটি স্তর-বিকাশের ইতিহাস জীব-বিবর্ত্তনের ইতিহাসের সহিত বিজড়িত। ভাবের প্রভেদ অনুসারে বিভিন্ন মানব বিভিন্ন প্রকৃতির হইয়া থাকে। এ প্রভেদ মূলে জন্মগত। তথাপি পারিপার্শ্বিক অবস্থাও অল্লাধিক পরিমাণে ইহার বিকাশক বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে। এইরূপে কাহারও হৃদয়ে পশুভাবের, কাহারও হৃদয়ে নরভাবের, কাহারও হৃদয়ে বা দেবভাবের আধিক্য দেখা যায়। জন্মগত পার্থক্য কেন হয়, কিরূপে হয়, তাহা ঠিক বলা যায় না। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, সকল মানবের মন এক প্রকারের নহে।

এমন এক সময় ছিল, যখন সুপ্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত লকের মতে মনীষিগণ বিশ্বাস করিতেন যে, শিক্ষাই সব। সকল মানবের মনই একভাবে এক উপাদানে গঠিত। মানবে মানবে যাহা কিছু মনোগত পার্থক্য, তাহার কারণ কেবলমাত্র শিক্ষা। লক বলিতেন, মানবের মন যেন পরিষ্কার সেলেট খানি; তাহাতে যাহা লিখ, তাহাই লেখা যায়; কিন্তু সে কথা এখন আর সুধীসমাজে গৃহীত হয় না। এক্ষণে নিশ্চিতরূপেই স্থির হইয়াছে যে, সকল মানবের মন এক উপাদানে গঠিত নহে এবং সমান শিক্ষাদ্বারা সকলের মন সমানভাবে নিয়মিত করাও যায় না। জন্মগত প্রভেদ আসিয়া ফলের পার্থক্য উৎপাদন করিবেই। কোন শিক্ষাই তাহা নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। এতদ্দেশে নীতিশাস্ত্রকারগণ অতি প্রাচীনকাল হইতেই "বিতরতি গুরুঃ প্রাজ্ঞে শিষ্যে যথা তথৈব জড়ে" ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, নির্ব্বোধ ও বুদ্ধিমানকে সমান শিক্ষাদ্বারা সমানভাবে উন্নত করা যায় না। *

সকল মানুষের মনকে গড়িয়া পিটিয়া ঠিক যে এক ছাঁচে ঢালা যায় না, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বহু ঘুরিয়া, বহু গবেষণা করিয়া, হিন্দুর এই আদিম সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন।

* রাজসাহী বৈষ্ণব-সমিতিতে পঠিত।

জন্মজাত মনোগত পার্থক্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন মানবের মনের ছাঁচ ভিন্ন প্রকারের হইবেই। প্রতিনিয়ত নীতিশিক্ষা দ্বারা, ধর্ম্মশিক্ষা দ্বারা মন্দকে কতক ভাল করা যায়, ভালকে আরও ভাল করা যায়; কিন্তু গাধাকে পিটিয়া ঘোঁড়া করা যায় না। এই জন্যই শিক্ষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, যাহার মন যে উপাদানে গঠিত, সেই উপাদানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এই তত্ত্ব মধ্যেই ধর্ম্মের মূল সূত্র নিহিত আছে। যাহার মন যে উপাদানে গঠিত, সেই উপাদানের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। এই জন্যই সকল মানবের পক্ষে ধর্ম্মের আদর্শ ও আচরণ ঠিক একরূপের হইতে পারে না। এই জন্যই ভগবানের নানা মূর্ত্তি হইয়াছে, উপাসনাও নানা আকার ধারণ করিয়াছে। এই জন্যই উপনিষৎ একবার বলিয়াছেন, "ভগবান্ শান্তং শিবং সুন্দরং", আর একস্থানে বলিয়াছেন, তিনি "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং"। তন্ত্র এক স্থানে বলিয়াছেন, মহামায়া "স্মিতাননাং", আবার আর এক স্থানে বলিয়াছেন, তিনি "করাল বদনা"। এই জন্যই কেহ বলেন, ধর্ম্মের মূল ভয়, কেহ বলেন, ধর্ম্মের মূল ভক্তি; কেহ বলেন, ভগবান্ দয়ার সাগর, কেহ বলেন, তিনি "কঠোর ন্যায়পর"। ধর্ম্মের আদর্শ বহু। যাহার মনটী যে ভাবে গঠিত, তিনি সেই ভাবের আদর্শটী গ্রহণ করেন এবং তাহাতেই তাঁহার ক্রমোন্নতি হয়। এই জন্যই শ্রুতিতে দেখিতে পাই, "স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত" ইত্যাদি সকাম ধর্ম্ম। গীতায় দেখি, "অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ" ইত্যাদি নিষ্কাম ধর্ম্ম। এই জন্যই কর্ম্ম করিয়া কেহ চাহেন "ধনং দেহি মানং দেহি দেহি মে সুন্দরাননাং"; কেহ কর্ম্ম করিয়া ফল চাহেন শুধু বিষ্ণু-প্রীতি। ঈশ্বরের আদর্শ যেমন ভিন্ন ভিন্ন রূপে গঠিত মনের নিকট ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, ঈশ্বরলাভের উপায়ও তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন সাধকের নিকট বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়। মানব-মনের গঠন যখন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের, তখন সাধনোপায়ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের না হইয়াই পারে না। বিভিন্ন-বৃত্তি-সংযুক্ত মানবগণের পক্ষে বিভিন্ন ধর্ম্মাচরণ অবশ্যম্ভাবী। এই জন্যই হিন্দুধর্ম্মে শাক্ত ও বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায় ভেদ অবশ্যম্ভাবী। এইজন্যই সকল ধর্ম্মে প্রবৃত্তি-মার্গ ও নিবৃত্তি-মার্গ অবশ্যম্ভাবী। একটী দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটি আরও একটু পরিস্ফুট করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিব। মনে করুন, ঘোর-ঘন-ঘটাচ্ছন্ন অমানিশায় উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল পদ্মার প্রবল প্রবাহে একটী গলিতকুষ্ঠ স্খলিতপদ পঙ্গু বৃদ্ধা নারী ও আর একটী প্রবল প্রতাপান্বিত, অসংখ্য নরনারীর আশ্রয়দাতা, ধনে মানে বিদ্যায় ও বুদ্ধি-গৌরবে সংসারের আদর্শস্থানীয়, বলবান্ যুবক ভাসিয়া চলিয়াছে; অন্যে উদ্ধার না করিলে উহাদের উদ্ধারের আর উপায় নাই। অবস্থা এরূপ যে, আর মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষাও সহে না। প্রতিপলে উভয়ে মৃত্যুর আশঙ্কা করিতেছে। তীরে একটী মাত্র লোক দণ্ডায়মান, একটী ব্যতীত দুইটীকে উদ্ধার করা তাহার সাধ্যাতীত। সে কোন্‌টীকে উদ্ধার করিবে? কোন্‌টীকে রক্ষা করা ন্যায় ও ধর্ম্মের অনুমোদিত। ইহার উত্তর প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয় মধ্যে। যাহার

হৃদয় যেরূপ উপাদানে গঠিত, তাহার উত্তর তদ্রূপ। যাহার হৃদয় বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষিত, যিনি পরম কারুণিক, পরম দয়া-প্রবণ, সংসার যাঁহার লক্ষ্য নহে, যিনি সংসারে থাকিয়াও পদ্মপত্রে জলবিন্দুবৎ বিরাজ করেন, তিনি হয়ত গলিতকুষ্ঠ স্খলিত-পদ পঙ্গু বৃদ্ধা নারীকে উদ্ধার করিয়াই কর্ত্তব্য পালন করিবেন, অথবা তাঁহার নিকট উভয়ের উদ্ধারই সমান। আর যাঁহার হৃদয় কঠোর-ন্যায়পর, যিনি জগতের হিতসাধনই জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য মনে করেন, যিনি ভাব-প্রবণতা বা Sentiment দ্বারা পরিচালিত না হইয়া জগদ্ধিত বা utility দ্বারা পরিচালিত হন, তিনি হয়ত অসংখ্য লোকের আশ্রয় দাতাকেই রক্ষা করিবেন। কারণ পঙ্গু বৃদ্ধার জীবন বাঁচাইয়া জগতের লাভ কি? তাহাকে বাঁচান ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্ব্বল্য ব্যতীত তাঁহার নিকট আর কিছুই বোধ হইবেনা।

আমার নিজ জীবনের একটা ঘটনা এ স্থলে উল্লেখ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। যখন আমি কলিকাতায় থাকি, সেই সময় প্রাতঃস্মরণীয় পরমহংস শিব-নারায়ণ স্বামীর সহিত আমার আলাপ হয়। শাস্ত্রালাপে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, একটী ব্যাঘ্র একটী গাভী ধরিয়াছে, সে গাভীটি উদ্ধার উচিত কি না? তিনি কঠোরস্বরে অম্লান বদনে বলিলেন "না। ঈশ্বর যাহাকে যাহা খাদ্য দিয়াছেন, তাহা লওয়া উচিত নহে, তাহাতে পাপ হয়।" উত্তরে আমি ব্যথা পাইলাম, তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধার একটু হ্রাস হইল। এখন বোধ হইতেছে, আমার মনে বৈষ্ণব মন্ত্রের অব্যক্ত সুর বাজিতেছিল, তাঁহার মনে শাক্ত মন্ত্রের দীক্ষা ছিল; এই জন্যই বোধ হয় দুই হৃদয়ের তন্ত্রী এক সুরে বাজে নাই। তাহাতে শ্রদ্ধার লাঘব হইবার কোনই হেতু ছিল না। প্রত্যেক মানবের ধর্ম্মশিক্ষা একরূপ হইতেই পারেনা, এই কথাটী বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের উপর বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভাব, চক্ষুর্ঘূর্ণন ও নাসিকা-কুঞ্চনের ভাব অনেক কমিয়া যায়। মানুষ অবস্থার অধীনতা অস্বীকার করিতে পারে না। ভগবদ্দত্ত প্রকৃতিকে বিভিন্ন অবস্থার অধীনে আনিয়া অনেকাংশে সংস্কৃত করা যায় সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করা যায় না। ইচ্ছামত পরিবর্ত্তিত করিয়া সকলকে এক ছাঁচে ঢালাও যায় না। প্রকৃতি-ভেদে প্রবৃত্তির তারতম্য হইবেই। ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের সহস্র চেষ্টাতেও তাহা নিবৃত্ত হইবার নহে। দেহ যেমন ইচ্ছানুসারে নিয়মিত করা যায় না, মনোবৃত্তি সুতরাং ধর্ম্মভাবও সেইরূপ ইচ্ছানুসারে নিয়মিত করা যায় না। এই জন্যই ধর্ম্মের মূলনীতি, ধর্ম্মের সারতত্ত্ব স্থির রাখিয়া যে যে পথ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মাচরণ করে, তাহাতে অপর-পন্থাবলম্বীর কোনরূপ ঘৃণা বা বিদ্বেষ করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ যে যে ভাবেই ধর্ম্মাচরণ করুন, সকলই সেই একের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

এক্ষণে বুঝিতে হইতেছে, ধর্ম্মের সেই সারনীতি সেই মূলতত্ত্ব কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানবের প্রকৃতি-ভেদে ধর্ম্মাচরণ স্বভাবতঃ বিভিন্ন হইয়া উঠে; কিন্তু বহুত্বের মধ্যেও একত্ব আছে। যাহা নিত্য সত্য, যাহা কোন প্রকার ভেদগত হয় না, যাহা সংসারের সমস্ত

পরিবর্ত্তন মধ্যেই বিরাজমান, সমস্ত পরিবর্ত্তনের প্রবর্ত্তক ও ধারক, তাহাই ধর্ম্ম। এই অর্থে ধর্ম্মো ধরাধারকঃ ; কিন্তু ধর্ম্মের চলিত অর্থে, ধর্ম্ম বলিতেই কর্ম্ম বুঝিতে হয়। ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা ও ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা এতদ্দেশে বহুকাল হইতেই পৃথক দুইটী মীমাংসা-শাস্ত্রের অন্তর্গত হইয়া রহিয়াছে। একের লক্ষ্য কর্ম্ম, অপরের লক্ষ্য জ্ঞান ; কিন্তু উভয়েরই লক্ষ্য মুক্তি। কর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি হয়, এজন্য কর্ম্মকেও প্রধান স্থান প্রদত্ত হইয়াছে।

জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারাই বিশ্বের উন্নতি করিতে হইবে। উন্নতিই বিশ্বের ধর্ম্ম। বিশ্বের উন্নতি বলিতে আত্মোন্নতি ও পরকীয় উন্নতি—উভয়ই বুঝা যায়। এই দুইটীর অভাবে প্রকৃত ধর্ম্মাচরণ হয় না। আত্মোন্নতি কতকটা সহজ সাধ্য ; কারণ স্বতঃই উহাতে মানবের প্রবৃত্তি হয়। আত্মোন্নতির মার্গ—অর্জ্জন। গুরুর নিকট জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতি অর্জ্জন করিব, তাহাতেই আত্মোন্নতি সিদ্ধ হইবে। ইহা কালসাপেক্ষ হইলেও কতকটা সহজ-সাধ্য। পরকীয় উন্নতি অর্থাৎ সমাজের ও জগতের উন্নতি কষ্টসাধ্য। পরকীয় উন্নতির পন্থা—বর্জ্জন। যাহা অর্জ্জন করিয়া আত্মোন্নতি, তাহাই বর্জ্জন করিয়া পরকীয় উন্নতি। পরকীয় উন্নতির মূল ত্যাগ ও সংযম। ত্যাগই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। আত্মোন্নতি ও পরকীয় উন্নতি উভয়ই ধর্ম্ম, কিন্তু পরকীয় উন্নতিই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এই কথাই অন্য ভাষায় এইরূপে বলা যাইতে পারে যে, আত্মোন্নতি এবং সমাজের ও জগতের উন্নতি-মূলক কর্ম্মই ধর্ম্ম-পদ-বাচ্য। যিনি যে পরিমাণে পরার্থে স্বার্থ ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তিনি সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আচরণ করিয়াছেন। ধর্ম্মের এই মূল নীতি অনুসরণ করিলে বুঝা যায় যে, ধর্ম্মের যাহা সার, বৈষ্ণব ধর্ম্মে তাহা পাই। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ত্যাগের ধর্ম্ম, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সংযমের ধর্ম্ম। ত্যাগই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং ত্যাগই বৈষ্ণব ধর্ম্ম। বৈষ্ণব ধর্ম্ম নানা ভক্তের হাতে পড়িয়া নানারূপ উলট্ পালট্ হইয়া নানা ভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছে, তাহা সত্য ; কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল নীতি সকল-ধর্ম্মের সার। জীবে দয়া, এই ধর্ম্মের মূল নীতি, "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" ইহার মূল সূত্র ; এই নীতিই মানবীয় ধর্ম্ম-জীবনের চরম উন্নতির লক্ষ্য ; কারণ ইহাই পরনিষ্ঠ। ইহাই ধর্ম্ম-তরীর ধ্রুব তারা। পারুন বা না পারুন, ঐ ধ্রুব-তারা লক্ষ্য করিয়াই জীবন-সমুদ্রে ধর্ম্ম তরী চালাইতে হইবে। শৈশব-খেলার মধুরতা, কৈশোর-লীলার সরলতা, যৌবন প্রেমের গম্ভীরতা, মাতৃস্নেহের শীতলতা, বাল-বন্ধুত্বের পবিত্রতা, ইহা লইয়াই বৈষ্ণব ধর্ম্ম। এক কথায় জগতে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মধুর, যাহা কিছু প্রেমময়, যাহাতে শান্তি ও সুস্থতা বিরাজ করে, তাহাই বৈষ্ণব ধর্ম্ম। যিনি ভগবানের শান্ত, শিব ও সুন্দর মূর্ত্তি জগতের সমক্ষে ধরিয়াছেন, তিনিই বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপাসক। সুদূর পাশ্চাত্য জগতে যাঁহারা জগতের হিতচেষ্টায় ধর্ম্মের মধুর ভাব দ্বারা জগৎকে চালাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতেছেন, যাঁহারা ন্যায় ও সত্যের বিচার দ্বারা যুদ্ধ ও বিগ্রহ ধরাতল হইতে উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন, যাঁহারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে শান্তির সুধা বরিষণের জন্য প্রাণ-মনে খাটিতেছেন, সেই সমস্ত ব্যক্তিগণও বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল নীতি অনুসরণ করিয়াই ভিন্ন

পন্থায় কার্য্য করিতেছেন মাত্র। বিশ্বপ্রেমিক 'টেনিশন' যখন কাব্যের সুমধুর নিক্কণে গাহিয়াছিলেন,—

"হোরা বাজে ঘন, ধনাঢ্য নির্ধন, কলহ করহ দূর।
ধরণীর শেল, দৌরাত্ম্য আচার, ভাঙ্গিয়া করহ চুর।
ধরণীর বিষ, পরহিংসা দ্বেষ, পর দুঃখে কর খেদ।
ধরণীর বিষ, পরনিন্দা ত্যজি, ঘুচাও অবনী ক্লেদ।
সহস্র বৎসর, উৎকট বিগ্রহ-উত্তাপে ধরণী জরা।
সহস্র বৎসর, শান্তির সলিলে, শীতল হউক ধরা।"

তখন তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মেরই মূল নীতি ভাষান্তরে উচ্চারণ করিয়াছিলেন মাত্র। জগতের হিতকল্পে যিনি যে স্থানে যে ভাষায় যে আকারেই কেন হউক না, "জোর যার, মুলুক তার" এই পশু-ভাবের মস্তকে সদর্পে পদাঘাত করিয়া ন্যায় ও দয়ার প্রতিষ্ঠা করিবার যত্ন করিয়াছেন, তিনিই বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল সূত্রের অনুসরণ করিয়াছেন। যিনি কঠোর কিন্তু মধুর সুরে প্রচার করিয়াছেন, স্বর্গও যদি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, তথাপি ন্যায়কে রাজত্ব করিতে দাও, তিনিও বৈষ্ণব-ধর্ম্মই প্রচার করিয়াছেন। বৈষ্ণব ধর্ম্ম ন্যায়ের ধর্ম্ম, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম শান্তির ধর্ম্ম। মানুষ মাত্রেই ভাই ভাই, সকলেই এক পরম পিতার সন্তান। নারী জাতি পুরুষের দাসী নহে, পুরুষ-জাতিও নারীর দাস নহে; নরনারী উভয়েই উভয়ের সহায়কমাত্র। জীবমাত্রেই দয়ার পাত্র। নিজের স্বার্থের জন্য অন্য জীব-হিংসা করিবার অধিকার জগতে কাহারও নাই। এ ধর্ম্ম মহাবীর ও সামান্য মশককে এক চক্ষে দেখেন; এ ধর্ম্মে বিলাস বিভব নাই, বড় ছোট নাই; অহঙ্কার অভিমান নাই। এ ধর্ম্মে প্রভুত্ব নাই, অনধিকার-চর্চ্চা নাই। এ ধর্ম্ম দাসভাবের ধর্ম্ম। যেমন মধুর ধর্ম্ম, প্রসারের ক্ষেত্রেও পাইয়াছিল তেমনই। সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা ভারতভূমিই ধর্ম্ম-জীবনের উন্নতির প্রধান ও প্রকৃষ্ট স্থান। এই স্থানে বৈষ্ণবধর্ম্মের এরূপ সুন্দর পুষ্টিসাধন হইয়াছিল যে, এখনও দেখা যায় যে, অনেকে সর্প, মশক, ছারপোকা প্রভৃতিও হত্যা করেন না। অধ্যাপক টমসন্ যে দিন বলিয়াছিলেন,— "Every thing counts or may count. A so-called unimportant animal is destroyed and no immediate ill effects are seen. But who can tell?" অর্থাৎ, একটী সামান্য কীটবোধে যাহা বিনষ্ট হয়, যদিও তাহার কোন কুফল প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় না; কিন্তু কুফল হয় কিনা তাহা কে বলিতে পারে?—তখন তিনি সুদূর ইউরোপ-খণ্ড হইতে বৈষ্ণবধর্ম্মের মহিমাই প্রচার করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের এই শিথিল সময়ে, ইংরাজী শিক্ষার এই প্রবল বন্যার মধ্যে, এই কোপ্তা কোর্ম্মা কারী কাট্‌লেট্ প্রভৃতির দিনে, এই মদ-মাংস-মুরগীর ত্রিবেণী-সঙ্গমের মধ্যে এখনও এমন বহুলোক ভারতে দেখা যায়; যাঁহারা মৎস্য মাংস স্পর্শও করেন না। এমন লোকও দেখা যাইতেছে, যাঁহারা শান্তির

আশায় বিভব-বিলাসিতা তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছেন; যাঁহারা আজীবন বিলাসিতার ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াও, আজীবন মদ্য মাংসে আসক্ত থাকিয়াও, বৈষ্ণব মন্ত্রের গুণে সর্ব্বত্যাগী হইয়া মধুর কীর্ত্তনের শান্ত নিক্কণে প্রাণ মন সমর্পণ করতঃ প্রবৃত্তি সংকোচ করিয়া নিবৃত্তি অভ্যাস করিতেছেন। যে ধর্ম্ম মানুষকে পশুভাব হইতে নরভাবে, নরভাব হইতে দেবভাবে উন্নীত করিতে পারে, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম। বৈষ্ণব ধর্ম্ম মানুষকে দেব-ভাবাপন্ন করিতে পারে, এই জন্য বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকৃত ধর্ম্ম। এ লক্ষণ অন্য ধর্ম্মে নাই, এরূপ বলি না; এ লক্ষণ বৈষ্ণব ধর্ম্মে আছে, ইহাই বলিতেছি।

বৈষ্ণবধর্ম্মের যাহা মূল নীতি, তাহার আলোচনা করিলাম। বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল নীতি যাঁহারা না বুঝেন, যে সকল আচরণকে বৈষ্ণবধর্ম্মের গোঁড়ামি বলা যায়, তাহাই মাত্র অনুসরণ করিয়া যাঁহারা তৃপ্ত থাকেন, তাঁহারা বৈষ্ণব নামের যোগ্য নহেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম না হইলে প্রকৃত বৈষ্ণব হইতেই পারা যায় না। ধর্ম্মের মূল বাহিরে নহে, ভিতরে। মনের ভিতরটা ঠিক না হইলে, বাহিরের চিহ্নমাত্র মানুষের উপকার করিতে পারে না। যাহার হৃদয় দ্বেষ, হিংসা, দাম্ভিকতা, ইন্দ্রিয়-লালসা, ভোগ-বিলাস প্রভৃতি অশান্ত বৃত্তির আধার, সে বৈষ্ণব নহে। ধর্ম্মমাত্রেরই ভিতরে পদার্থ না থাকিলে বাহিরটা কিছুই নহে। কেবল ভিতরের পদার্থ সঞ্চয় জন্য বাহিরের আচরণের আবশ্যক। যিনি প্রেমময় হ্লাদিনী-শক্তি প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করিয়া পশুত্ব হইতে দেবত্বে উপনীত হইয়াছেন বা হইবার চেষ্টা করিতেছেন, তিনিই বৈষ্ণব নামের যোগ্য।

কোন ধর্ম্মগুরু প্রচার করিয়াছিলেন বটে, শূন্যের পাখী ও জলের মৎস্য ইত্যাদি সমস্তই মানুষের খাদ্যের জন্য প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু সে উপদেশ নিকৃষ্টভাবাপন্ন ব্যক্তির প্রতি। ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারগণ জানেন ও বুঝেন, যাহার হৃদয়ে নিকৃষ্টভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতেছে, তাহাকে স্পষ্ট কথায় 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ' শিক্ষা দিলে সে শুনিবে না; সেই জন্য মনুও মৎস্য-মাংসাহারসম্বন্ধে ব্যবস্থা দিলেন, "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"। বাইবেলে অন্য এক স্থলে খৃষ্ট আদেশ করিলেন, 'অন্যের নিকট তুমি যে আচরণ চাও, তুমিও অন্যের প্রতি সেইরূপ আচরণ কর'। এ উপদেশ নরভাবাপন্ন লোকের প্রতি; ইহাও জীবহিংসার বিরোধী। খ্রীষ্ট আর এক স্থানে বলিলেন, 'এক গালে চড় মারিলে আর এক গাল পাতিয়া দাও'; এইটীই দেবভাবাপন্ন ব্যক্তির প্রতি উপদেশ। শেষোক্ত উপদেশটী বৈষ্ণবধর্ম্মেও দেখিতে পাই। বৈষ্ণব ধর্ম্মেরও শিক্ষা—তৃণাদপি সুনীচ হইয়া, তরোরপি সহিষ্ণু হইয়া আত্মার স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া, পরার্থে জীবন উৎসর্গ করা। বৈষ্ণব ধর্ম্ম দেবপ্রকৃতি-সম্পন্ন লোকের ধর্ম্ম। বৈষ্ণব ধর্ম্ম বড় কঠিন ধর্ম্ম। ওকব্রতী বকব্রতীগণের জন্য এ ধর্ম্ম নহে। যিনি মনকে ঠিক করিতে না পারিয়াছেন, বাহ্য আচরণ দ্বারা তিনি বৈষ্ণব হইতে পারেন না। কোন ধর্ম্মই এক দিনে পাওয়া যায় না। মনও এক দিনে ঠিক করা যায় না। সাধনা চাই, অভ্যাস চাই, সংযম চাই। এই জন্যই হিন্দুশাস্ত্রে মাংসাদি আহারের ব্যবস্থা

আছে বটে, কিন্তু অমুক দিনে মাংসাহার নিষিদ্ধ, বৃথা মাংসাহার নিষিদ্ধ ইত্যাদি যে সংযমের ব্যবস্থা আছে, তাহাও শিক্ষার ক্রমমাত্র। প্রহ্লাদ বা শুকদেবের ন্যায় এক দিনেই কেহ বৈষ্ণব হইতে পারে না। যত দিন যাহার মনের ভাব পরিবর্ত্তন না হয়, দ্বন্দের যাহা ভাল, তাহার চেষ্টাই কর্ত্তব্য। এই জন্য যিনি যে ভাবেই ধর্ম্মাচরণ করুন না, তাহার মধ্যে যতটা সম্ভব বৈষ্ণব ভাব আনয়নের চেষ্টা করাই সাধু বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। হিন্দুধর্ম্ম মধ্যে,—বুঝি বা ধরাতলে সকল ধর্ম্ম মধ্যেই,—বাহ্য আচরণ ধর্ম্মের খোলস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কি শাক্ত কি বৈষ্ণবগণ, অনেকে কেবলমাত্র বাহ্য আচরণ করিয়া, কেবলমাত্র নারিকেলের ছোবড়া চিবাইয়াই মনে করেন, ধর্ম্ম করিতেছেন; কিন্তু ধর্ম তাহা নহে। ধর্ম্মের মূলনীতি কে কি পরিমাণে নিজ জীবনে আচরণ করিতেছে, তাহাই ধার্ম্মিক জানিবার নিদর্শন। বাহিরে পরিষ্কার দেখাইলে হইবে না, মনে পরিষ্কার হওয়া চাই। মনের ধূলা ঢাকিলে হইবে না, মন হইতে ধূলা অপসারিত করা চাই। The great thing is not to look clean, but to be clean, not to hide dirt, but to hate dirt.

শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যে বহু দ্বন্দের কথা শুনা যায়; বাস্তবপক্ষে এরূপ দ্বন্দের কোন কারণ দেখিনা। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রকৃতিভেদে ধর্ম্মের আচরণ-ভেদ অবশ্যম্ভাবী। বিশেষ এই সৃষ্ট জগতে চিরদিন দেবাসুরে এক মহা সংগ্রাম চলিতেছে, বর্ত্তমান অবস্থায় এ সংগ্রাম অল্লাধিক পরিমাণে থাকিবেই। ব্রাহ্মণ রক্ষার্থে যেমন ক্ষত্রিয়ের প্রয়োজন ছিল, বৈষ্ণব রক্ষার্থেও বুঝিবা সময়ে সময়ে সেইরূপ শাক্তের প্রয়োজন হইতে পারে। এ সব গুরুতর কথা, সে সব কথার আলোচনা এক্ষণে অনাবশ্যক। এক্ষণে এই মাত্র বলা যাইতে পারে, যে মহাশক্তি দ্বারা এই বিশ্ব-চরাচর চালিত হইতেছে, তাঁহাকে মানবীয় প্রকৃতি-ভেদে বিভিন্ন মানব বিভিন্নরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কেহ বা এই শক্তিকে সৃষ্টিকর্ত্তা রূপে, কেহবা ধারক-পালকরূপে, কেহবা প্রলয়-সংহারকরূপে এ শক্তিকে চিন্তা করিয়াছেন। সৃষ্টিকর্ত্তারূপে এ শক্তি দ্বিবিধ ভাবে কল্পিত হইয়াছে। মানব চিরদিন জানিয়া আসিতেছে, সৃষ্টিকার্য্যে দুইয়ের প্রয়োজন। প্রকৃতি ও পুরুষ মিলিত হইয়া জীব সৃষ্টি হয়, তাই স্রষ্টাকে মানব মন উভয়ভাবে গ্রহণ করিয়াছে। রক্ষক অথবা পালকভাবে অনাদি পুরুষকে বিষ্ণুনামে অভিহিত করা হয়। মানব দেখিয়া আসিতেছে, জীব প্রথমে মাতৃক্রোড়ে পালিত হয়, পরে পিতৃপ্রযত্নে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাই মানবের মনোগত প্রভেদ অনুসারে কেহ বা পালককে পুংভাবে, কেহ বা স্ত্রী-ভাবে দর্শন করিয়াছেন। যে খ্রীষ্টানগণ মধ্যে খৃষ্ট পুংভাবে পূজিত, তাহাদিগেরই অন্যশাখায় মেরিমূর্ত্তি স্ত্রীভাবে পূজিত হন। বিষ্ণুর এই ভাব-দ্বৈধ প্রকৃতি-ভেদে কেহ বা শ্রীশ্রীকৃষ্ণরূপে পুরুষ-সংজ্ঞায়, কেহ বা শ্রীশ্রীমতী রাধারূপে প্রকৃতি-সংজ্ঞায় সাধনা করে। কিন্তু যিনি যে ভাবেই করুন, ইহা পালকভাবেরই পরিণাম। কিন্তু

ভাব-সংমিশ্রণ মানব-মনের একটী প্রবল বৃত্তি। তাই এই ভাবের সহিত স্রষ্টাভাবের যুগলমূর্ত্তি—পুরুষ প্রকৃতি দ্বৈত সাধনা, স্বভাবতঃই জড়িত হইয়াছে। প্রকৃতির এই মহাশক্তি যিনি যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি তদ্রূপ অধিকারী। যিনি ভীম ভয়াল ভাবে লইয়াছেন, তিনি একভাবে, যিনি শান্ত মধুময় প্রেমময় ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন; তিনি অন্যরূপে, সেই একেরই সাধনা করিতেছেন। আমরা গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকিয়া একজনকে শাক্ত, অপরকে বৈষ্ণব নামে অভিহিত করি। প্রকৃতপ্রস্তাবে এতদুভয় মধ্যে বিদ্বেষভাব কিছুতেই নাই।

বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলতত্ত্বের বিষয় মাত্র আমি আলোচনা করিলাম। বৈষ্ণবধর্ম্মের ভক্তগণ বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল নীতিগুলি সমাজে কি ভাবে চালাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ও সমাজে তাহার ফলাফল কিরূপ হইয়াছে, তাহা এ প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। যদি ভক্তগণের মধ্যে কাহারও কাহারও দোষে বৈষ্ণবসমাজে কোন দোষ প্রশ্রয় পাইয়া থাকে, তাহা ধর্ম্মের দোষ নহে। আমি এই প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, মানব-মনে পশুভাব, নরভাব ও দেবভাব আছে। দেবভাবের পূর্ণ বিকাশ-চেষ্টাই ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য। বৈষ্ণব ধর্ম্মেরও লক্ষ্য তাহাই। জানি না—কবে মানব জাতি, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মূলনীতি হৃদয়ঙ্গম করিবে, কবে প্রত্যেকে অপরের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিবে, কবে স্বার্থ ও পরার্থের মহা-মিলনে উভয়ের পার্থক্য ঘুচিয়া জীবন কৃতার্থ হইবে! সাধক কবির কথায় বলিতে হইলে,—

আমার দীর্ঘ কালের আশাকরা, সেই শুভদিন কবে আসিবে।
যে দিন নিখিল মানব-প্রাণ-প্রসূন পরম প্রেমে হাসিবে।
বিধাতার নামে, এই মরধামে, উড়াইবে প্রীতি, বিজয় নিশানে;
ভাই ভাই মেলি, ভেদাভেদ ভুলি, সুখে কোলাকুলি করিবে।
অপরের হিতে, প্রাণ ঢেলে দিতে, ব্যাকুলতা হবে সবাকার চিতে;
সকলে সবার, পরাণ মাঝার, অমর সুষমা হেরিবে।
শাসক নৃপতি ঈশ্বর কেবল, শাসনের দণ্ড প্রেম নিরমল,
সবাকার লক্ষ্য জ্ঞান সমুজ্জ্বল ভক্তিপরিমল ছুটিবে।

যখন এই সময় আসিবে, তখন বৈষ্ণবধর্ম্মের সাধনার পূর্ণ সিদ্ধি হইবে। যখন এ অবস্থা আসিবে, তখন বৈষ্ণবধর্ম্মও পূর্ণ সফলতা লাভ করিবে।

"ভদ্রং নো অপিবাতয় মনঃ।—ঋগ্বেদ।
'আমাদের মনকে সৎপথে প্রবাহিত কর।'

শ্রীভবানীগোবিন্দ চৌধুরী।

জন্মাষ্টমী।

তুমি নাকি এসেছিলে মানব-জীবন নিয়ে
এ ধরার 'পরে?
ধরণীর সুখ দুঃখ তুমি নাকি নিয়েছিলে
নিজে ভাগ ক'রে?
তুমি নাকি চেয়েছিলে দীন অসহায় ভাবে
মার মুখপানে,
ধরণীর ছবি খানি যখন ফুটিয়াছিল
তোমার নয়ানে?

সে দিন এ ধরণীর বিপুল বক্ষের মাঝে
ওগো বিশ্বনাথ!
সাগরে উর্ম্মির মত কি ঝটিকা উঠেছিল
পুলকের সাথ!
ভেবেছিল মনে মনে করিবে তোমার লাগি
কত আয়োজন,
রাখি দিবে জোৎস্না হাসি গন্ধপুষ্প রাশি রাশি
ভরিয়া কানন!

পূজারিণী শোনে যদি মন্দিরের মাঝে আজি
এসেছে দেবতা,
কি তীব্র আনন্দ তার চিত্ত মাঝে আনি দেয়
সে শুভ বারতা!
বহি পুষ্প-অর্ঘ্য-ভার অসহ্য পুলকে ত্রাসে
ছুটে অনিবার,
হয় ত কাঁপিয়া কর ভূমিতলে লুটে যায়
পূজা উপচার।

শেষে সুধু সকাতরে ম্লানবেশে রিক্ত করে
আসিয়া দাঁড়ায়;
নয়ন ভরিয়া জলে দেবতার পানে সুধু
ম্লান মুখে চায়!

তাই বুঝি সেই দিন ধরণীর ছবি খানি
আছিল মলিন ;
বিহগে গাহেনি গান, আকাশে ছিল না হাসি
প্রসন্ন নবীন।
বক্ষে ভরি দীর্ঘশ্বাস কম্পিত কাতর কণ্ঠে
দাঁড়ায়ে ধরণী,
মুছিয়া নয়ন বারি চেয়েছিল তোমা পানে
তিমির-বরণী !

শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

কার্ত্তিকের "ব্রহ্মবিদ্যা"।—আগামী কার্ত্তিক মাসের "ব্রহ্মবিদ্যা"-প্রকাশের সময় ৺শারদীয়া পূজার উৎসব উপস্থিত হইবে। সে সময় আমাদের গ্রাহকগণ সম্ভবতঃ অনেকেই স্থানান্তরে গমন করিবেন ; সুতরাং তাঁহাদের পত্রিকা পাইবার গোলযোগ-সম্ভাবনা হইবে মনে করিয়া, আমরা আগামী আশ্বিন-সংখ্যার সহিত একত্র কার্ত্তিক-সংখ্যা পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতেছি। আগামী আশ্বিন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই উক্ত দুই সংখ্যা পাঠাইব। ইহার পরে অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে অগ্রহায়ণ সংখ্যা যথারীতি প্রেরিত হইবে।

সুবৃহৎ পুস্তকালয়।—মান্দ্রাজের আডিয়ার নামক স্থানে ভারতবর্ষীয় তত্ত্ববিদ্যা-সভার উদ্যোগে একটি বৃহৎ পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি চীনভাষায় ভুবনবিখ্যাত বৃহৎ সম্পূর্ণ বিশ্বকোষ-গ্রন্থ একখণ্ড এই পুস্তকালয়ে স্থানলাভ করিয়া ইহার সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছে। এই গ্রন্থের নাম "চিনটিউক্ন্ চিন টু সু বেলি"। ইহা সর্ব্বপ্রথম ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে খণ্ডাকারে প্রকাশিত হয় এবং দশ হাজার খণ্ডে ইহার অঙ্গ পরিপূর্ণ হয়। দশ-হাজার খণ্ডে যে গ্রন্থের কলেবর সমাপ্ত, তাহা কি বিরাটকায় সামগ্রী, ভাবিবার বিষয় বটে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ পুনর্ব্বার ক্ষুদ্রতর অক্ষরে মুদ্রিত হয়, এইবার ১৬০০ খণ্ডে গ্রন্থ পূর্ণ হয়। আডিয়ারের পুস্তকালয়ে যে গ্রন্থখানি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা এই সংস্করণের। এই পুস্তকের মাত্র অল্প কয়েকখানি ইয়োরোপ ও আমেরিকাতে আছে। আডিয়ারের পুস্তকালয় দিন দিন যেরূপ উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতেছে, তাহাতে আশা করা যায়, ইহা অচিরে পৃথিবীর প্রথম-শ্রেণীর পুস্তকালয় মধ্যে পরিগণিত হইবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব।—আগামী ৯ই ভাদ্র, ইংরাজী ২৫শে আগষ্ট, সোমবার জন্মাষ্টমীর দিন কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে অষ্টাবিংশ বার্ষিক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব হইবে। এতদুপলক্ষে ৩১শে শ্রাবণ শনিবার হইতে ৮ই ভাদ্র রবিবার পর্য্যন্ত রামকৃষ্ণ-দেবের বিশেষ পূজা ও উপাসনা হইবে এবং ৯ই ভাদ্র সোমবার জন্মাষ্টমীর দিন সিমুলিয়া ১১নং মধুরায়ের গলি হইতে দলে দলে সংকীর্ত্তন সম্প্রদায় যোগোদ্যানে যাইবে ও ঐ দিবস তথায় মহোৎসব হইবে। আশা করি, এই উৎসবে সাধারণে যোগদান করিবেন।

ভাগীরথী ব্রহ্মবিদ্যা-সমিতির শাখা-সঙ্ঘ।—গত ২০শে জুলাই রবিবার রিষড়া শাখা সমিতিতে ভাগীরথী তত্ত্ববিদ্যা-সমিতি সঙ্ঘের একবিংশতিতম অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। হুগলী, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর ও রিষড়া শাখার প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মিলনে শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক বি,এ, ভাগবতরত্ন, প্রস্তাব করেন যে, কাটোয়া, নবদ্বীপ ও কৃষ্ণনগর শাখা এই সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত করা হউক। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে ভাগীরথী তত্ত্ববিদ্যা সমিতির শাখা-সঙ্ঘের যে শ্রীবৃদ্ধি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তৎপরে রিষড়া শাখার অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক রাসলীলাসম্বন্ধে একটি সুন্দর সারগর্ভ বক্তৃতা করেন।

তত্ত্ববিদ্যা (THEOSOPHICAL)-সমিতির ভারতবর্ষীয় সভ্য বৃদ্ধি।

	মার্চ্চ	এপ্রেল	মে	মোট
নূতন সভ্য	১২৩	১৬৪	৫২	৩৩৯
পদত্যাগ	১	৫	১	৭
মৃত্যু	৭	৮	৩	১৮
		মোট সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি		৩১৪
		পূর্ব্ব তিন মাসের ঐ		২৭১
		ছয় মাসের মোট বৃদ্ধি		৫৮৫

ইংরাজীতে তন্ত্র প্রচার।—আরথার্ অ্যাভালন ('Arthur Avalon) এই ছদ্ম নামে একজন পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত ভারতপ্রবাসী ইংরাজ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের টিপ্‌পনীসহ ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের প্রায় শতপত্রব্যাপী ভূমিকায় তন্ত্র সম্বন্ধে তিনি বহু গবেষণার পরিচায়ক তথ্য সকল সংগ্রহ করিয়াছেন। দেবীস্তোত্র

(Hymns to the Goddess) এই নাম দিয়া তিনি চণ্ডী, মহাভারত এবং তন্ত্রগ্রন্থ হইতে কয়েকটী দেবীস্তোত্রের অনুবাদও প্রকাশ করিয়াছেন। ষট্ চক্রনিরূপণ, প্রপঞ্চসার, কুলার্ণব, তন্ত্রতত্ব প্রভৃতি আরও কয়েকখানি তন্ত্রগ্রন্থের প্রচারের জন্য তিনি সংকল্প ও উদ্যোগ করিতেছেন। এইবার আশা করা যায় যে, ইয়োরোপে তন্ত্রশাস্ত্রের বহুল প্রচার হইবে এবং ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থের এই বিভাগ ইয়োরোপবাসীর অপরিজ্ঞাত থাকিবে না।

শিক্ষা-বিস্তার।—সম্প্রতি থিওসফিক্যাল সভা হইতে ভারতে শিক্ষাবিস্তারের সবিশেষ উদ্যোগ আয়োজন হইতেছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। অনেকদিন পর্য্যন্ত কাশীস্থ হিন্দু কলেজের মধ্যেই থিওসফিক্যাল সভার শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা নিবদ্ধ ছিল। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সম্ভাবনায় হিন্দু কলেজ সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির করতলগত হইতে চলিল। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের নানা কেন্দ্রে থিওসফিক্যাল সভার শিক্ষাবিস্তার চেষ্টা নবোৎসাহে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। বিগত ৭ই জুলাই হইতে উক্ত হিন্দুকলেজের সন্নিকটে একটী স্বতন্ত্র বালক বিদ্যালয় ও একটী স্বতন্ত্র বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বোম্বাই হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্গর সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত তেলাঙ্গ, এম, এ, বি, এল, মহাশয় বালক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা করিতেছেন। ঐ বিদ্যালয়ে ইতিমধ্যেই দুই শতের অধিক ছাত্র হইয়াছে। বালিকা বিদ্যালয়ের ভার এক বিদুষী ইংরাজ রমণী গ্রহণ করিয়াছেন। উভয়েই অবৈতনিক ভাবে কার্য্য করিতেছেন। যুক্তপ্রদেশের গোরক্‌পুর নগরে আর একটী কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অযোধ্যাদাস ব্যারিষ্টার মহাশয় ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। বাঁকীপুরের সরকারী উকীল ব্রহ্মবিদ্যার অন্যতর সম্পাদক রায় পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ বাহাদুর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বিদ্যালয় থিওসফিক্যাল সভার ভার এই শিক্ষাবিভাগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। মাদ্রাজের মদনপল্লী সহরের আর একটী বিদ্যালয়েরও ভার ঐ শিক্ষাবিভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। আশা করা যায়, অল্পদিনের মধ্যে থিওসফিক্যাল সভার শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা আরও সফলতা লাভ করিবে এবং নবপ্রতিষ্ঠিত কাশীস্থ বালক বিদ্যালয় প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত হইবে। আমরা এই শুভ অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি।

ব্রহ্মবিদ্যা

২য় বর্ষ।] আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১৩২০। [৬ষ্ঠ, ৭ম সংখ্যা।

শারদীয়া।

কেঁদে কেঁদে বসুন্ধরা হ'য়েছে কালিমাহারা,
হেসে হেসে তাই আজি ঝরে স্নিগ্ধ সুধাধারা;
পবিত্র নয়নাসারে ধরিত্রী বরষা ধরি
ভাসায়েছে বক্ষঃস্থল এ অলক্ষে লক্ষ্য করি;
অম্বরে ছড়াযে তাই অনন্ত আনন্দ রাশি
বিশ্বপ্রাণ হ'তে ফুটে বিশ্ববিমোহন হাস;
এ অনন্ত আনন্দ যে অনন্ত করুণাভরা,
অম্বর-সংবৃত-কারী-অম্বুদ-সম্ভার-হরা;
আশাহীন বিষাদের ঘনীভূত আবরণ
ছিন্ন ভিন্ন করে, এই প্রসাদের প্রস্রবণ;
নিরাশার অশ্রুস্রোতে না জানি কি শক্তি আছে,
আশাহীনে নিয়ে যায় অনন্ত আশার কাছে;
ঘন পরে ঘন এসে আঁধারে আঁধার করে,
ঘনভারে ঘন হ'য়ে আপনি গলিয়া ঝরে;
বরষা হরষভরা শরতে এনেছে কাছে,
প্রসাদ লুকায়ে থাকে বিষাদের পাছে পাছে।
এস মা প্রসাদময়ী প্রসাদ লইয়া ভবে,
অবসন্ন এ অবনী আজি সুপ্রসন্ন হবে;
পুণ্যস্নাতা বসুমতী স্নিগ্ধশ্যাম নববাসে
ভকতি-উদ্বেল চিতে চাহিছে প্রসাদ-আশে;
অমল-অম্বর-যুতা, উজ্জল-বরণ-দ্যুতি,
এস মা প্রত্যক্ষীভূতা আনন্দের অনুভূতি!
দিবারূপ করে দিব্য দিবাকর শোভা করে,
যামিরূপ করান্তর ধরে কান্ত শশধরে,

পর্য্যাপ্ত-চন্দ্রিকালিপ্তা সুখসুপ্তা নিশীথিনী,
শরদভ্র-শুভ্রালকা, তারারত্ন-সীমন্তিনী ;
অর্দ্ধস্বচ্ছ ছায়াপথে মায়া কুহেলিকা ফেলে,
অম্লান স্বরূপ তব রূপে রূপে দাও ঢেলে ;
এস দীপ্ত নীলাম্বরে, বিম্বিত নীলাম্বু-জলে,
ভাস্বর সরিৎ-স্রোতে হরিৎ প্রান্তরতলে ;
এস শুভ্র সৈকতের সৌম্য রম্য সুষমায়,
অভ্রভেদী ভূধরের জ্যোতির্ম্ময় মহিমায় ;
এস ফুল্ল কুসুমের সুললিত বিলাসেতে,
পন্থাহীন কান্তারের ভীমকান্ত গৌরবেতে ;
এস জ্যোৎস্না-পরিপ্লুত ওতপ্রোত পত্রদলে,
এস একচ্ছত্র জ্যোতি অনিলে সলিলে স্থলে ;
দ্বিধা ভ্রান্তি অপসারি' হৃদয় একাগ্র কর,
ক্লান্তি শ্রান্তি অপহরি' শান্তিরূপে অবতর,
দৃপ্ত ক্ষিপ্ত চিত্ত মাঝে এস চিরতৃপ্তি ল'য়ে,
লুব্ধ ক্ষুব্ধ হিয়া থাক্ তোমাতে বিমুগ্ধ হ'য়ে ;
হিংসা- রাগ-দ্বেষ-ভেদ আসুর প্রবৃত্তিচয়
ছেড়ে যাক্ তোমার এ কমনীয় দেবালয়,
দেবাদৃত চরিত্রের পবিত্র প্রভাব যত
রাখুক পবিত্র করি' ধরিত্রীরে অবিরত ;
বিশ্ব-আস্য-পরিব্যাপ্ত এই দিব্য হাস্য প্রায়
মানস হউক ব্যাপ্ত চরাচর এ ভূমায়,
এ অনন্ত ছন্দোবন্ধে উঠুক একই গীত,
অনন্ত তরঙ্গভঙ্গে উচ্ছ্বসিত বিশ্বপ্রীতি,
এ দীপ্তিতে ব্যাপ্ত হ'ক সে অব্যক্ত মহাবিধি—
মহারত্নাকর-সুপ্ত-শুক্তি-গুপ্ত মহানিধি ;
এস মুক্তা শিবশক্তি জীবে দিয়া বরাভীতি,
প্রাণে প্রাণে প্রকটিয়া ত্রাণ-পরা পরানীতি ;
অন্তরে বাহিরে দেবী আলোকে আলোক কর,
অমৃত ভাণ্ডার হ'তে অমৃতে ব্রহ্মাণ্ড ভর,
অমঙ্গল দূর করি' সর্ব্বাঙ্গ-মঙ্গল আন,
চরমে শরণ দিয়ে চরণে দিও মা স্থান। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র।

চৈতন্য কথা।

লঘুভাগবতামৃত এবং কৃষ্ণ-তত্ত্ব।

চৈতন্যদেবের প্রিয় শিষ্য রূপগোস্বামী যে সকল রহস্যের উদ্ভেদ করিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে বোধগম্য করিতে হইলে, কতকগুলি কথা জানা আবশ্যক।

প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত কতকগুলি ত্রিলোকী বা গ্রহ আছে। এমন অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের শীর্ষস্থানীয় সেই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মলোক। এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের বীজরূপী এক অবিনাশী নিত্যলোক আছে। সেই নিত্যলোকের নাম বৈকুণ্ঠ বা পরব্যোম। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে অবতার সকল ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীব-সমূহের উদ্ধারের জন্য বিরাজ করিতেছেন। তাঁহারা নিজ নিজ লীলার উপযোগী কোন না কোন লোকে অবস্থান করেন। রূপগোস্বামী তাহার কতকগুলি শাস্ত্রসম্মত উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

কেষাঞ্চিদেষাং স্থানানি লিখ্যন্তে শাস্ত্রদৃষ্টিতঃ।
যত্র যত্র বিরাজন্তে যানি ব্রহ্মাণ্ডমধ্যতঃ॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদীনাং বাক্যং তত্র প্রমাণ্যতে॥ লঘুভাগবতামৃত, পূর্ব্ব-খণ্ড, ৩০।

অবতার সকল লীলা বা কার্য্য উপলক্ষে ব্রহ্মাণ্ডের কোন না কোন স্থানে বিরাজ করিলেও, পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠে তাঁহাদের সকলের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। যেমন বুদ্ধদেব পূর্ব্বে জীবন্মুক্ত ঋষি ছিলেন। তখন তাঁহার কেবল ত্রৈলোক্য মধ্যেই অধিকার ছিল। যখন ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে তাঁহার অধিকার হইল, তখন বৈকুণ্ঠ মধ্যে তাঁহার স্থান নির্দ্দেশ হইল, এবং তখনই পুরাণে তাঁহার অবতার সংজ্ঞা প্রদত্ত হইল। এই অবতার সকল বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের কলা বা অংশরূপে কথিত হন। তাঁহারা কোন না কোন কল্পে, কোন না কোন ব্রহ্মাণ্ডে এই অংশ বা কলার অধিকার প্রাপ্ত হন। যখনই তাঁহারা সেই অধিকার প্রাপ্ত হন, তখনই তাঁহাদের পরব্যোমে স্থান নির্দ্দেশ হয়।

সর্ব্বেষামবতারাণাং পরব্যোম্নি চকাসতি।
নিবাসাঃ পরমাশ্চর্য্যা ইতি শাস্ত্রে নিরূপ্যতে॥

তথাহি পাদ্মে—

বৈকুণ্ঠভুবনে নিত্যে নিবসন্তি মহোজ্জ্বলাঃ।
অবতারাঃ সদা তত্র মৎস্য কূর্ম্মাদয়োঽখিলাঃ॥ লঃ ভাঃ পূর্ব্ব, ৪২-৪৩

যেমন অবতারগণের বৈকুণ্ঠে স্থান আছে, সেইরূপ বৈকুণ্ঠনাথের পারিসদগণেরও সেখানে স্থান আছে। তাঁহারা সেই পরব্যোমনাথের এত অনুগত, যে তাঁহাদের ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কোন স্বতন্ত্র লীলা নাই। তাঁহাদের সকল কার্য্যই নারায়ণের লীলার অনুগত ও আনুসঙ্গিক।

ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে নবম অধ্যায়ে হরির অনুব্রত এই সকল নিত্য ভক্তগণের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

> তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎপরম্।
> ব্যপেতসংক্লেশবিমোহসাধ্বসং স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ পুরুষৈরভিষ্টুতম্॥
> প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কাল বিক্রমঃ।
> ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ॥ ৯-১০

অবতার ও নিজজন ব্যতীত পরব্যোমনাথ নারায়ণের 'মহাবস্থ' নামে বিখ্যাত ব্যূহ-চতুষ্টয় আছে। প্রথম ব্যূহ বাসুদেব, দ্বিতীয় ব্যূহ সঙ্কর্ষণ, তৃতীয় ব্যূহ প্রদ্যুম্ন ও চতুর্থ ব্যূহ অনিরুদ্ধ। এই ব্যূহরূপে নারায়ণেরই চারি প্রকার প্রকাশ হয় ও বস্তুতঃ এই চতুর্ব্যূহ নারায়ণ হইতে পৃথক্ নহে। ইঁহাদিগের মধ্যে বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ঈশ্বরের কার্য্য করেন। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে একজন বাসুদেব ও একজন সঙ্কর্ষণ আছেন। তাঁহারা এই মূল বাসুদেব ও মূল সঙ্কর্ষণের আভাস বা অংশ। সেইরূপ প্রত্যেক পৃথিবীতে একজন প্রদ্যুম্ন ও একজন অনিরুদ্ধ আছেন, তাঁহারা পৃথিবীর ঈশ্বর। এই প্রদ্যুম্ন ও এই অনিরুদ্ধ মূল প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের আভাস বা অংশ। আমাদের ত্রিলোকময় পৃথিবীর ঈশ্বর বা প্রদ্যুম্ন সনৎকুমার ঋষি ব্যাসদেব মহাভারতে এই রহস্য বলিয়া গিয়াছেন।

> সনৎকুমারং প্রদ্যুম্নং বিদ্ধি রাজন্ মহৌজসম্॥ মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৬৭-১৫২
> সনৎকুমারং প্রদ্যুম্নঃ প্রবিবেশ যথাগতম্॥ মহাভারত, স্বর্গারোহণ পর্ব্ব, ৫-১৩

যদিও বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণ দুইজনেই ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, তথাপি বাসুদেব অন্তর্জগতের ঈশ্বর সঙ্কর্ষণ বহির্জগতের ঈশ্বর। বাসুদেব রাজা, সঙ্কর্ষণ রাজপ্রতিনিধি। বাসুদেব সমষ্টির আশ্রয়। সঙ্কর্ষণ ব্যষ্টির আশ্রয়। সেইরূপ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ দুইজনেই পৃথিবীর ঈশ্বর।

পরব্যোমপতি মূল নারায়ণের মূল চতুর্ব্যূহকে অধিকার উপার্জ্জন করিতে হয় নাই। তাঁহারা অনন্তকাল হইতেই বৈকুণ্ঠ মধ্যে বিরাজিত আছেন। অবশ্য তাঁহাদের অংশ সকল অধিকারী পুরুষ।

রূপগোস্বামী বলেন, এই বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণও কৃষ্ণের বিলাস। কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

> তস্মাৎ পরম বৈকুণ্ঠনাথোঽপ্যস্য বিলাসকঃ॥ লঃ ভাঃ, পূর্ব্ব, ১০০

তাহার পর ভাগবতের শ্লোক অবলম্বন করিয়া, রূপগোস্বামী সিদ্ধান্ত করেন যে, বৈকুণ্ঠনাথ ও ব্যূহ-চতুষ্টয় প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন্।

ভাগবতের শ্লোকটি এই—

> স্বশান্তরূপেষ্বিতরৈঃ স্বরূপৈরভ্যর্দ্দ্যমানেষ্বনুকম্পিতাত্মা।
> পরাবরেশো মহদংশযুক্তো হ্যজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ॥ ভাঃ পুঃ, ৩-২-১৫

এক কাষ্ঠখণ্ড অন্য কাষ্ঠখণ্ড কর্তৃক অর্দ্দিত হইলে অগ্নির প্রকাশ হয়। পূর্ব্ব হইতেই

দুই কাষ্ঠ খণ্ড মধ্যে অগ্নি ছিল। দুই বিরুদ্ধ-ধর্ম্মী পদার্থের সংঘাত দ্বারা কেবলমাত্র অপ্রকট অগ্নি প্রকট হয়। সেইরূপ কৃষ্ণ সর্ব্বদা অপ্রকটভাবে বিরাজিত আছেন। তিনি অজ, তাঁহার জন্ম নাই। তথাপি তাঁহার শান্তরূপী ভক্তগণ ঘোররূপী অসুরগণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে, সেই গোলোক-মুখ্য 'পর' ও ব্রহ্মাণ্ড-মুখ্য 'অপরের' অধীশ্বর কৃষ্ণ মহদংশযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করেন—এইরূপ প্রতীতি হয়। মহৎ ও অংশের সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহার প্রকট আবির্ভাব হয়। রূপগোস্বামী বলেন, এখানে 'মহৎ' শব্দে পরম মহত্তম—পরব্যোম-নাথ ও অষ্টসংখ্যক ব্যূহ।

স্যূর্মহান্তোঽতিপরম-মহত্তমতয়া স্মৃতাঃ।
তে পরব্যোমনাথশ্চ ব্যূহাশ্চ সুসংখ্যকাঃ॥ লঃ ভাঃ, পূর্ব্ব, ১৩১

চতুর্ব্যূহ ত জানি। অষ্টসংখ্যক ব্যূহ আবার কি? রূপগোস্বামী বলেন, যেমন বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের চতুর্ব্যূহ আছে, সেইরূপ কৃষ্ণেরও চতুর্ব্যূহ আছে। বৈকুণ্ঠনাথের ব্যূহ অপেক্ষাও কৃষ্ণের ব্যূহ উৎকৃষ্ট।

বাসুদেবাদয়ো ব্যূহাঃ পরব্যোমেশ্বরস্য যে।
তেভ্যোঽপ্যুৎকর্ষভাজোঽমী কৃষ্ণব্যূহাঃসতাং মতাঃ॥ লঃ ভাঃ, পূর্ব্ব, ১৩৭

স্বতন্ত্র কৃষ্ণতত্ত্ব ও স্বতন্ত্র কৃষ্ণব্যূহের কল্পনা, রামানুজ স্বামী করেন না। তাঁহার মতে কৃষ্ণচন্দ্র বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণেরই বিলাস। চৈতন্য মহাপ্রভু তবে এ কল্পনা-গৌরব কেন করেন? রূপগোস্বামীর মুখে ত তাঁহারই শিক্ষা। এ কল্পনা-গৌরবের কারণ আছে। মধুর কৃষ্ণকে মধুররূপে জানিবার অন্য উপায় নাই। যেমন রাজা যখন দরবার করেন, তখন তাঁহার মাথায় মুকুট থাকে, হাতে দণ্ড থাকে, পাশে পাশে প্রহরী থাকে, তাহাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্রাদি থাকে। রাজা সিংহাসনে বসেন। প্রজারা তাঁহাকে দূর হইতে ভয়ের সহিত দর্শন করে এবং তাঁহার শাসন অতিক্রম করিলে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়। রাজা যখন রাজত্ব করেন, তখন তিনি একজন অধিকারী মাত্র। মুকুট ও দণ্ডাদি তাঁহাতে আরোপিত হয়। তিনি নিজ স্বরূপে রাজসভায় বিরাজ করেন না।

যখন রাজ-পরিচ্ছদ ও রাজদণ্ড ত্যাগ করিয়া রাজা অন্তঃপুরে নিজ জনের সহিত ক্রীড়া করেন, তখন তাঁহাকে কেহ রাজা বলিয়া জানে না, কেহ তাঁহাকে ভয় করে না। তখন তাঁহাকে তাঁহার নিজজনে প্রেমপূর্ব্বক আলিঙ্গন করে। সে প্রেমের ইয়ত্তা নাই, সে প্রেমে কপটতা নাই। এতদিন লোকে ঈশ্বরকে জানিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরকে ভয় করিয়াছে, ভক্তিও করিয়াছে; কিন্তু প্রেম করিতে পারে নাই। নির্গুণ ভক্তির আশ্রয় প্রেমরূপী ভগবানকে জানিতে পারে নাই।

মদ্গুণ শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্ব গুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥ ভাঃ, পুঃ, ৩-২৯

প্রেম না হইলে এই নিগুর্ণ ভক্তি হইতে পারে না। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ ঈশ্বরকে কেহ প্রেমভাবে ভজনা করিতে পারে না। এই কথাটি ভক্তকে হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্যই মহাপ্রভুর আবির্ভাব।

প্রেমরস-নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম॥
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥
আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥
মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে করে যেই মোবে শুদ্ধভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে আমারে সম হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড়লোক তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥
এই শুদ্ধ ভক্তি লঞা করিমু অবতার।
করিব বিবিধ বিধ অদ্ভুত বিহার॥
বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার॥

* * *

ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ॥
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্মকর্ম্ম।

* * *

এই মত চৈতন্য কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্।
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম॥

* * *

এইমত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার।
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার॥

* * *

প্রেম ভক্তি শিখাইতে আপনি অবতরি।
রাধাভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি॥
শ্রীকৃষ্ণে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার।
এই ত পঞ্চম-শ্লোকের অর্থ পরচার॥ চৈ, চ, ৪, আদিলীলা।

এই জন্যই চৈতন্য মহাপ্রভু দ্বিভুজ, মধুর, নিজজন কৃষ্ণকে সর্ব্বোচ্চ আসনে বসাইয়াছেন, এবং তাঁহাকে চতুর্ভুর্জ বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ হইতে পৃথক করিয়াছেন। ঐশ্বর্য্যের লেশ থাকিলেও ভক্তের মন যে কুণ্ঠিত হইবে।

তাই মধুর কৃষ্ণের মধুর চতুর্ব্যূহ মাধুর্য্যবিস্তারে তাঁহার দ্বারস্বরূপ। আর বৈকুণ্ঠাধিপতির চতুর্ব্যূহ ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিতেছেন।

তাই রূপগোস্বামী বলেন—

বাসুদেবাদয়ো ব্যূহাঃ পরব্যোমেশ্বরস্তুযে।
তেভ্যোঽপ্যুৎকর্ষ ভাজোঽমী কৃষ্ণব্যূহাঃ সতাং মতাঃ॥

'পরব্যোমাধিপতির বাসুদেবাদি যে চতুর্ব্যূহ আছে, তাঁহাদের অপেক্ষাও উৎকর্ষ-ভাগী শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যূহ আছে। সাধুদিগের এইরূপ অভিপ্রেত।

এ উৎকর্ষ কেবল মাধুর্য্যের উৎকর্ষ।

ইতোতে পরমব্যোমনাথ ব্যূহৈঃ সহৈকতাম্।
স্ববিলাসৈরিহাভোতা প্রাদুর্ভাবমুপাগতাঃ॥ ল ভা, পূর্ব্ব, ১৩৭

বৈকুণ্ঠাধিপতির চতুর্ব্যূহ শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যূহের বিলাসমাত্র। আপন আপন বিলাসের সহিত শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যূহ একত্ব প্রাপ্ত হইয়া এই পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

—এই ত গেল, ভাগবতের শ্লোকের 'মহৎ' শব্দ। রূপগোস্বামীর মতে এই মহৎ শব্দে চতুর্ব্যূহকে বুঝায়।

বাকি থাকিল 'অংশ'।

অংশাস্তস্যাবতারা যে প্রসিদ্ধাঃ পুরুষাদয়ঃ।
তথা শ্রীজানকীনাথ-নৃসিংহ-ক্রোড়-বামনাঃ।
নারায়ণো নরসখো হয়শীর্ষাজিতাদয়ঃ॥
এভির্যুক্তঃ সদা যোগমবাপ্যায়মবস্থিতঃ॥ ল ভা, পূর্ব্ব, ১৩৭

'পুরুষাদি যে সকল প্রসিদ্ধ অবতার, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অংশ। রাম, নৃসিংহ, বরাহ, বামন, নরসখা নারায়ণ, হয়শীর্ষ, অজিত প্রভৃতিও শ্রীকৃষ্ণের অংশ। এই সকল 'মহৎ' ও 'অংশের' সহিত সর্ব্বদা যুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন।'

পূর্ব্বে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ অবলম্বন করিয়া যে তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছি, লঘুভাগবতামৃত অনুশীলন করিয়াও সেই তত্ত্ব জানিলাম। সমগ্র কৃষ্ণতত্ত্ব এক অপূর্ব্ব সমন্বয়তত্ত্ব। এই সমন্বয়ের এক প্রান্তে মধুর নিজ স্বরূপাবলম্বী মধুর কৃষ্ণ ও অপর প্রান্তে নরসখা নারায়ণ ঋষি কিম্বা তাঁহার প্রতিনিধি মৈত্রেয় ঋষি। এই দুই প্রান্তের মধ্যভাগে নারায়ণ, চতুর্ব্যূহ ও পুরুষাদি অবতার। 'প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়' কথার এই গূঢ় তাৎপর্য্য। এই অপূর্ব্ব সম্মিলনীর সমগ্র অংশ কেবল বৃন্দাবন-লীলায় প্রত্যক্ষ।

কুত্রাপ্যশ্রুতপূর্ব্বেণ মধুরৈশ্বর্য্যরাশিনা।
দেবামান্যো হরিস্তত্র বিহারং কুরুতে ব্রজে॥ ল ভা, পূর্ব্ব, ১৮২,

যদিও বৃন্দাবনে পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণ; তথাপি সকল লীলার জন্য তাঁহাকে পূর্ণতমর ভাব দেখাইতে হয় না। যেমন ব্রহ্মাকে ঐশ্বর্য্য দেখাইবার জন্য তিনি কেবল বৈকুণ্ঠনাথের ভাব ধারণ করিয়াছিলেন।

বৈকুণ্ঠেশ্বরলীলাপ্রদর্শিতা যা বিধাতৃকয়ে।
সেশ্বরাণামজাণ্ডানাং কোটী বৃন্দাবনেঽদ্ভুতা।
সৈব জ্ঞেয়া যতঃ স্বাংশদ্বারৈবাসৌ প্রকাশিতা॥ ল ভা, পূর্ব্ব, ১৩৮

'এই বৃন্দাবনে, ব্রহ্মাকে যে ব্রহ্মাণ্ডনাথের সহিত অদ্ভুত ব্রহ্মাণ্ডকোটি প্রদর্শন করাইয়াছিলেন, তাহা বৈকুণ্ঠনাথের লীলা। স্বয়ংরূপা শ্রীকৃষ্ণ নিজের অংশ বৈকুণ্ঠনাথের দ্বারা এই লীলা প্রকাশিত করিয়াছিলেন।'

বাসুদেবাদিলীলাস্তু মথুরা-দ্বারকাদিষু।
তত্তদ্রূপৈর্ব্রজাস্তন্তু বাল্যেহাভিশ্চ দর্শিতাঃ॥

'বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি চতুর্ব্যূহের লীলা এবং পুরুষাদি অবতারের লীলা মথুরা ও দ্বারকাদিতে প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন ব্রজমধ্যেও বাল্যলীলা দ্বারাও সে সকল 'মহৎ' ও 'অংশের' লীলা প্রদর্শিত হইয়াছিল।'

বাস্তবিক, শ্রীকৃষ্ণ 'মহৎ' ও 'অংশ' কর্ত্তৃক যুক্ত হইলেও এবং কখনও কখনও সেই মহৎ ও অংশের দ্বারা লীলা প্রকটিত করিলেও তিনি মহৎ ও অংশ নহেন।

যো বৈকুণ্ঠে চতুর্ব্বাহু র্ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
য এব শ্বেতদ্বীপেশো নরোনারায়ণশ্চ যঃ।
স এব বৃন্দাবন ভূবিহারী নন্দনন্দনঃ॥
এত স্তৈবাপরেঽহ নস্তা অবতারা মনোহরাঃ।
মহাগ্নেরিহ যদ্বৎ স্যুরুল্কাঃ শতসহস্রশঃ।
তত্রৈব লীলা একত্বং ব্রজেযুক্তে হরৌতথা॥ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

যেমন শত-সহস্র অগ্নিশিখা অগ্নিতে লীন হইয়া একত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ বৈকুণ্ঠাধিপতি, শ্বেতদ্বীপাধিপতি, অপর অনন্ত অবতারসমূহ সকলই বৃন্দাবন-বিহারী নন্দ-নন্দনে আসিয়া মিলিত হন।

এই জন্যই রূপগোস্বামীর মতে কেহ কৃষ্ণকে নরসখা নারায়ণ, কেহ ইন্দ্রানুজ বামন, কেহ ক্ষীরাব্ধি শায়ী, কেহ সহস্রশীর্ষ পুরুষ, কেহ বৈকুণ্ঠনাথ বলে। যে মুনি কৃষ্ণের যে বৃত্ত অনুশীলন করেন, তিনি সেই বৃত্ত লইয়া তাঁহাকে সেইরূপ বলিয়া থাকেন। বাস্তবিক মহৎ ও অংশ কর্তৃক যুক্ত শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

ইতি দিক্ষা প্রভোরস্ত মহদংশৈশ্চযুক্ততা।
অতএব পুরাণাদৌ কেচিন্নর সখাত্মতাম্।
মহেন্দ্রানুজতাং কেচিৎ কেচিৎ ক্ষীরাব্ধিশায়িতাম্।
সহস্রশীর্ষতাং কেচিৎ কেচিদ্ বৈকুণ্ঠনাথতাম্।
ব্রূয়ুঃ কৃষ্ণস্য মুনয়স্তত্তদ্‌বৃত্তানুগামিনঃ॥ লঃ ভাঃ পূর্ব্ব, ১৩৯

এই ত লঘুভাগবতামৃতে, শ্রীরূপের অমৃতময় লেখনীতে, চৈতন্যের প্রেরণাময় রূপের তত্ত্ব-বিচারে রূপের হৃদয়ে আবিষ্কৃত চৈতন্যের মধুর বাণীতে, কৃষ্ণতত্ত্ব জানিতে পারিলাম। কিন্তু এখনও জানিলাম না, গোপীবল্লভ কৃষ্ণ ও রুক্মিণী-বল্লভ কৃষ্ণ এক কি দুই, এবিষয়ে রূপের মীমাংসা আর একটু বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

প্রকটা প্রকটা চেতি লীলাচেয়ং দ্বিধোচ্যতে। লঘু ভাগবতামৃত, পূর্ব্বখণ্ড, ১৫৮,

প্রকট্ ও অপ্রকট্ ভেদে লীলা দ্বিবিধ।

সদানন্তৈঃ প্রকাশৈঃ স্বৈর্লীলাভিশ্চ স দীব্যতি।
তত্রৈকেন প্রকাশেন কদাচিৎ জগদন্তরে।
সহৈব স্বপরীবারৈর্জন্মাদি কুরুতে হরিঃ॥ ১৫৬

কৃষ্ণের অনন্ত প্রকাশ ও অনন্তলীলা। তিনি নিত্য নিজলীলা দ্বারা ক্রীড়া করিতেছেন; কিন্তু কদাচিৎ কোন জগতের মধ্যে তিনি কোনও এক প্রকাশ অবলম্বন করিয়া নিজ পরিবারবর্গের সহিত জন্মাদি প্রকট্ লীলা করিয়া থাকেন। অপ্রকট্ লীলা নিত্যই হইতেছে, কিন্তু কোন কোন জগতে কোন কোন সময়ে তিনি প্রকট্ লীলা করিয়া থাকেন। প্রপঞ্চের অগোচর ধামে নিত্য লীলা হইয়া থাকে।

কৃষ্ণভাবানুসারেণ লীলাখ্যা শক্তিরেব সা।
তেষাং পরিকরাণাঞ্চ তং তং ভাবং বিভাবয়েৎ॥ ১৫৭

কৃষ্ণের যেরূপ লীলা করিবার ইচ্ছা হয়, তাঁহার পরিবারবর্গের তদনুগামী ভাব হয়। এটি শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তির প্রভাব।

প্রপঞ্চ গোচরত্বেন সা লীলা প্রকটা স্মৃতা।
অন্যাস্ত্বপ্রকটা ভাতি তাদৃশ্যস্তদগোচরাঃ॥

প্রপঞ্চগোচর হইলেই সেই লীলাকে প্রকট্ বলা যায়। সেই লীলাই আবার প্রপঞ্চের অগোচর হইলেই, তাহাকে অপ্রকট্ বলা যায়।

চক্ষু-কর্ণাদির বিষয়ীভূত রূপরসাদি প্রপঞ্চ। আমরা স্থূল চক্ষু দ্বারা দেখিতে না পাইলেই, তাহা অপ্রপঞ্চ গোচর হইল। ভূর্লোকের সহিত অন্যান্য লোক অনুস্যূত। এই ভূর্লোকেই বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যাহা অনুভব করি, তাহাই প্রকট্, এবং এই ভূর্লোকেই আমরা অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা যাহা অনুভব করিতে পারি, তাহা অপ্রকট্। অন্তরিন্দ্রিয়ের মধ্যে তারতম্য আছে। যাহা অন্তরীক্ষ বা ভুবর্লোকের নিম্নভাগে সংঘটিত হইতেছে, তাহা স্বপ্নেন্দ্রিয় বা psychic sense দ্বারা অনুভব করা যায়। ভুবর্লোকের পদার্থকে অল্প আয়াস দ্বারা প্রকট্ করা যায়। হয়ত তীব্র ভক্তি বা তীব্র আগ্রহ দ্বারা জাগ্রত অবস্থাতেই স্বপ্ন ইন্দ্রিয় লাভ করা যায়। পবিত্র জীবনীতে অল্প আয়াসেই সেই ইন্দ্রিয়ের বিকাশ হয়। তাই অন্যত্র রূপগোস্বামী বলিয়াছেন,—

চেদদ্যাপিদিদৃক্ষেরন্ উৎকণ্ঠার্ত্তা নিজপ্রিয়াঃ।
তাং তাং লীলাং ততঃ কৃষ্ণো দর্শয়েৎ তান্ কৃপানিধিঃ॥
কৈরপিপ্রেমবৈবশ্যভাগ্ভি র্ভাগবতোত্তমৈঃ।
অদ্যাপি দৃশ্যতে কৃষ্ণঃ ক্রীড়ন্ বৃন্দাবনান্তরে॥ লঃ ভাঃ পূর্ব্ব. ১৪২

অদ্যাপি যদি কৃষ্ণের প্রিয় ভক্তগণ উৎকণ্ঠায় কাতর হইয়া কৃষ্ণলীলা দেখিবার ইচ্ছা করেন, কৃপানিধি কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে অভিপ্রেত সেই সেই লীলা দেখাইয়া থাকেন।

প্রেমে বিবশ কোন কোন ভাগবতোত্তম, আজও শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন মধ্যে লীলায় দেখিতে পান।

তত্র প্রকটলীলায়ামেবস্যাতাং গমাগমৌ।
গোকুলে মথুরায়াঞ্চ দ্বারবত্যাঞ্চ শার্ঙ্গিণঃ॥

প্রকট্ লীলাতেই বলা যায়, যে কৃষ্ণ গোকুল, মথুরা, কিম্বা দ্বারকা হইতে গমন করিলেন কিম্বা সেখানে আগমন করিলেন।

যাস্তত্র তত্রাপ্রকটা স্তত্র তত্রৈব সন্তি তাঃ।
ইত্যাহ জয়তীত্যাদি পদ্যাদিকমভীক্ষ্ণশঃ॥ ১৫৮

যে সকল লীলা গোকুলাদিতে অপ্রকট্ বলিয়া কথিত হয়, সে সকল লীলা প্রপঞ্চাগোচর না হইলেও গোকুলাদিতেই নিত্য বিরাজ করিতেছে।

এই অপ্রকট্ লীলাতে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছাড়িয়া কুত্রাপি গমন করেন না।" প্রকট্ লীলাতেই গমনাগমনের কথা উঠে। 'কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছাড়িয়া মথুরা গমন করিলেন,' অপ্রকট্ লীলায়, একথা বলা চলে না।

'জয়তি জন নিবাসো দেবকী জন্মবাদো' ইত্যাদি শ্লোকে 'জয়তি' ইত্যাদি শব্দে যে

বর্ত্তমান কাল ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা নিত্য অপ্রকট্ লীলারই সূচক। এইবার প্রকট্ লীলার বর্ণনা করা যাইতেছে।

দেবাদ্যংশাবতরণে প্রবৃত্তে পদ্মজাজ্ঞয়া।
বসুদেবাদিকানাং যে স্বর্গেহংশাঃ কশ্যপাদয়ঃ॥
নিত্যলীলান্তরৈস্তে বসুদেবাদিভির্গতাঃ।
সাযুজ্যমংশিভিস্তত্র জায়ন্তে শূরমুখ্যতঃ॥ ১৫৯

'ভবদ্ভিরংশৈর্যদুষূপজন্যতাম্'—পদ্মজ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া দেবগণ অংশ-রূপে অবতীর্ণ হইতে প্রবৃত্ত হইলে, নিত্যলীলার পরিবারবর্গ বসুদেবাদি, স্বর্গে অবস্থিত তাঁহাদের অংশ কশ্যপাদির সহিত মিলিত হইয়া, শূরসেন প্রভৃতি হইতে জন্মলাভ করেন।

যদ্বিলাসো মহাশ্রীশঃ স লীলাপুরুষোত্তমঃ।
আবির্ভূষুরত্রাবিষ্কৃত্য সঙ্কর্ষণং পুরঃ।
অন্তঃস্থিতাবিষ্কর্ত্তব্য তদন্যবূ্যহ ঈশ্বরঃ।
হৃদয়ে প্রকটস্তস্য ভবতানকদুন্দুভেঃ॥
ভূমিভারনিরাসায় দেবানামভিযাচ ঞয়া।
দ্বাপরস্যাবসানেঽস্মিন্ অষ্টাবিংশে চতুর্যুগে।
ক্ষীরাব্ধিশায়ি যদ্রূপ মনিরুদ্ধতয়া স্মৃতম্।
তদিদং হৃদয়স্থেন রূপেণানকদুন্দুভেঃ।
ঐক্যং প্রাপ্য ততো গচ্ছেৎ প্রাকট্যং দেবকীহৃদি।
প্রেমানন্দামৃতৈস্তস্যা বাৎসল্যৈক স্বরূপিভিঃ।
লাল্যমানো হরিস্তত্রবর্দ্ধতে চন্দ্রমা ইব॥ ১৬০

যে লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের বৈকুণ্ঠাধিপতি মহাবিষ্ণু বিলাস, সেই কৃষ্ণ অত্রধামে আবির্ভাব করিতে ইচ্ছা করিয়া, প্রথমে দ্বিতীয় ব্যূহ সঙ্কর্ষণকে আবিষ্কৃত করিলেন। পরে অন্তঃস্থিত তৃতীয় ও চতুর্থ ব্যূহরূপ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত করিব, এই ইচ্ছা করিয়া, ঈশ্বর আনক-দুন্দুভির হৃদয়ে প্রকটিত হইলেন।

পৃথিবীর ভার হরণের জন্য এবং দেবতাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য, দ্বাপরের অবসানে এই অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে, ক্ষীরাব্ধিশায়ী পুরুষ (যাঁহাকে 'অনিরুদ্ধ' বলে) আনকদুন্দুভির হৃদয়স্থ রূপের সহিত একতা প্রাপ্ত হন্। তখন সেই সম্মিলিত মূর্ত্তি দেবকীর হৃদয়ে প্রকটতা লাভ করে।

দেবকীর বাৎসল্যরূপ প্রেমানন্দামৃত দ্বারা লাল্যমান হইয়া হরি দেবকীহৃদয়ে চন্দ্রমার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন্।

যদিও রূপগোস্বামী স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের বসুদেব হৃদয়ে আবির্ভাবের কথা বলিতেছেন, তথাপি প্রকারান্তরে সে আবির্ভাব যেন প্রথম ব্যূহ বাসুদেবেরই বলা হইল। পরিষ্কার ভাবে, এই কথা বলিলে, শুকদেবের উক্তির সহিত কথাটি সঙ্গত হয়

আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ॥" ভা-পু-১০-২-১৬

বলদেব বিদ্যাভূষণ বলেন, দেবকী হৃদয় বলিলে, এখানে দেবকীর গর্ভ বুঝিতে হইবে। কারণ ভাগবতে আছে,—

দিষ্ট্যাম্ব! তে কুক্ষিগতঃ পরঃপুমান্।

কিন্তু পরবর্ত্তী শ্লোক বিচার করিলে, রূপগোস্বামীর ঐরূপ তাৎপর্য্য বোধ হয় না।

অথ ভাদ্রপদাষ্টম্যাং মসিতায়াং মহানিশি।
তস্যা হৃদন্তিরোভূয় কারাগারে স্মৃতিসদ্মনি।
দেবকীশয়নে তত্র কৃষ্ণঃ প্রাদুর্ভবতাসৌ॥
জনয়িত্রী প্রভৃতিভিস্তাভিরিতাবগম্যতে।
লৌকিকেন প্রকারেণ সুপং শিশুরজায়ত॥ ১৬১

অনন্তর ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে, দেবকীর হৃদয় হইতে আপনাকে তিরোহিত করিয়া, কৃষ্ণ দেবকীর শয়নে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। জননী প্রভৃতি মনে করিলেন, লৌকিক প্রকারেই শিশু জন্মগ্রহণ করিলেন।

ইহাতে বুঝা যায়, রূপগোস্বামী বলিতে চাহেন, অলৌকিক প্রকারে কৃষ্ণতত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছিল।

অথ ব্রজেশ্বরীগেহে বিশন্নানকদুন্দুভিঃ।
তত্রাস্য সুতং তস্যাঃ সুতামাদায় নিঃসরৎ॥ ১৬২

অনন্তর আনক-দুন্দুভি ব্রজেশ্বরীরগৃহে প্রবেশ করিয়া, সেখানে নিজের পুত্রকে রাখিয়া ব্রজেশ্বরীর কন্যাকে গ্রহণ করিয়া বহির্গমন করেন।

সোঽয়ং নিত্যসুতত্বেন তস্যা রাজতানাদিতঃ।
কৃষ্ণঃ প্রকটলীলায়াং তদ্দ্বারেণাপ্যভূৎ তথা॥ ১৬৩

সেই কৃষ্ণ নিত্যলীলায় নিত্য যশোদার পুত্র হইয়া অনাদিকাল হইতেই বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু প্রকট্ লীলাতেও কৃষ্ণ যেমন দেবকীর দ্বারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ যশোদার দ্বারেও জন্মলাভ করিয়াছিলেন।

একি কথা, গোসাঁই ঠাকুর! এ আবার, কি বল! কৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আবার তিনি যশোদার গর্ভেও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রকট-লীলা, অপ্রকটলীলার গূঢ় রহস্য এখন রেখে দাও। প্রকটলীলায় কৃষ্ণ দুইবার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রূপ! তোমাকে চৈতন্যদেব কতক আভাসে, কতক স্বপ্নে, কি তত্ত্ব শিখাইয়াছিলেন। তুমি ত ইঙ্গিতে বলিয়া গেলে, কৃষ্ণ দুইবার প্রকটভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,—গোল লাগিল, ভক্তসমাজে। এককালে, দুইজনের গর্ভ হইতে উৎপন্ন হইবার তাৎপর্য্য কি? ভাগবতেও ত একথা বলে না। এককালে দুইজনের গর্ভে জন্মগ্রহণ ত ভয়ানক কল্পনা-গৌরব। এ ত ভগবানের বৃথা চেষ্টা। তবে কি কৃষ্ণ

প্রকটভাবে দুইকালে, দুইবার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যা'ক্, আমার কল্পনা আমি রাখি। বলদেব বিদ্যাভূষণ আগে কি বলেন, শুনি।

"প্রকট লীলাতে কৃষ্ণ দেবকী ও যশোদার ঔরসপুত্র, এরূপ পাঠ দেখা যায়। অপ্রকট লীলাতেও কি পুত্র ভাব আছে ? এই সন্দেহ নিরাকরণের জন্য, রূপগোস্বামী এই শ্লোকটি লিখিয়াছেন। যিনি অনাদি কাল হইতে তাঁহার, অর্থাৎ দেবকী ও যশোদার নিত্য পুত্র হইয়া, বিরাজ করিতেছেন, সেই কৃষ্ণ প্রকট লীলাতে (তদ্দ্বারেণ) দেবকী মাতা হইতে, (অপি) এবং 'অপি' শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, যশোদা-মাতা হইতেও, (তথা) লোকরীতি অনুসারে, প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। প্রকট প্রকাশে, দেবকী ও যশোদা দুইজনের গর্ভ হইতেই শ্রীকৃষ্ণ জন্মলাভ করিয়াছিলেন, একথা শুকদেবও বলিয়াছেন। দেবকীর গর্ভের কথা ত স্পষ্টই আছে। যশোদার গর্ভ হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, অস্ফুটভাবে শুকদেব বলিয়াছেন। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-প্রকরণে আছে,—

নিশীথে তম-উদ্ভূতে জায়মানে জনার্দ্দনে।
দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ ১০।৩।৮

আবার

যশোদা নন্দপত্নীচ জাতং পরমবুধ্যত।
ন তদ্বেদ পরিশ্রান্তা নিদ্রয়াপগতস্মৃতিঃ ॥১০-৩-৫৩।

পূর্ব্বশ্লোকে, 'দেবক্যাং' এই শব্দে 'দেবকীতে ও যশোদাতে' বুঝিতে হইবে। এককালেই শ্রীকৃষ্ণ দেবকী ও যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হরিবংশেও এই কথা আছে,—

গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তেস্ত্রিয়ৌ।
দেবকীচ যশোদাচ সুষুবাতে সমং তদা ॥

গর্ভকাল পূর্ণ না হইতেই, অষ্টম মাসে দেবকী ও যশোদা এককালেই প্রসব করিয়াছিলেন। 'সমং' শব্দের অর্থ যুগপৎ। এই শ্লোকে বুঝায় যে, এককালে দেবকী ও যশোদার পুত্র জন্মিয়াছিল। ভগবতীর জন্ম কিঞ্চিৎ পরে হইয়াছিল। ভাগবতেও একথা আছে,—

ততশ্চ শৌরির্ভগবৎ প্রচোদিতঃ সুতং সমাদায় স সূতিকাগৃহাৎ।
যদা বহির্গন্তুমিয়েষ তর্হ্যজা যা যোগমায়াজনি নন্দজায়য়া ॥ ১০-৩-৪৮

'এইজন্যই ভগবতীকে 'কৃষ্ণানুজা' বলে। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বোত্তরভাবে, যশোদার গর্ভে অপত্যদ্বয়ের জন্মগ্রহণ হইয়াছিল। কিন্তু বসুদেব ও যশোদা তাহা দেখিতে পান নাই।

যশোদা নন্দপত্নীচ জাতং পরমবুধ্যত।
ন তদ্বেদ পরিশ্রান্তা নিদ্রয়াপগতস্মৃতিঃ ॥"

বসুদেব পত্নীর ন্যায় নন্দপত্নী ভগবৎ লক্ষণ অবলোকন করিয়া, স্বগর্ভজাত শিশুকে পরমেশ্বর বলিয়া জানিয়াছিলেন। যশোদার ত কন্যাও হইয়াছিল এবং তত্রাগত বসুদেব সেই কন্যাকে লইয়া গেলেন এবং নিজের পুত্রকে রাখিয়া গেলেন; এ সকল কথা, যশোদা দেবী জানিলেন না কেন? তাহার উত্তরে, শুকদেব বলিতেছেন যে, তিনি পরিশ্রান্ত ছিলেন এবং নিদ্রাভিভূত হওয়াতে তাঁহার স্মৃতি অপগত হইয়াছিল। উল্লিখিত শ্লোকের এইরূপ অর্থ।

আদিপুরাণে স্পষ্টই নারদ বলিয়াছেন,—

নন্দগোপগৃহে পুত্রো যশোদা গর্ভসম্ভবঃ।

এইরূপ অর্থ স্বীকার করিলে, 'নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে,' 'ভগবান্ গোপিকাসুতঃ', এই সকল ভাগবতপুরাণের বাক্য মুখ্য অর্থেই গৃহীত হইতে পারে।

যদি বল, 'উপগুহ্যাত্মজামেবং রুদত্যা দীনদীনবৎ' (১০-৪-৭), এই শ্লোকে দেবকী ভগবতীকে আত্মজা বলিলেন, এত মুখ্য অর্থ হইতে পারে না। অবশ্য এখানে মুখ্য অর্থ নহে, আক্ষেপক অর্থও নহে। দেবকী কংসকে জানাইতে চাহেন যে, তাঁহার পুত্র হয় নাই, অষ্টম গর্ভে কন্যা জন্মিয়াছে। সেই জন্য স্বপুত্র গোপনের জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক তিনি ভগবতীকে আত্মজা বলিয়াছেন।

একথা মানিলাম, কিন্তু শুকদেব যশোদার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম গুপ্তভাবে কেন বলিয়াছেন? ইহা স্বামীর ইচ্ছা বলিয়া জানিতে হইবে।

নন্দগেহে বসুদেবগেহেচ মে প্রাকট্যং ভবিষ্যতি, স্থিতিস্ত্বেকরূপেণ নন্দগেহে, দ্বৈরূপেণ স্থিতৌ কংসো মাং বিজ্ঞায় পিত্রোঃ ক্লেশং নিক্ষিপেৎ ত্বমপি মচ্চরিতগায়কেন এবৈব গাতব্যং যথা রহস্যং ন ভিদ্যেত—ইতি স্বামিন ইষ্টিঃ।

"নন্দের গৃহে এবং বসুদেবের গৃহে আমার প্রকটভাবে জন্ম হইবে। কিন্তু আমি একই রূপে নন্দের গৃহে অবস্থিতি করিব। যদি দুইরূপে, দুই কৃষ্ণ হইয়া, আমি অবস্থিতি করি, তাহা হইলে কংস আমাকে জানিতে পারিবে এবং আমার পিতা মাতাকে কষ্ট দিবে। তুমি আমার চরিত্রগায়ক, তুমিও এইরূপে গান করিবে, যেন আমার রহস্য ভেদ না হয়। এই স্বামীর ইচ্ছা।"

এই ত গেল বলদেব বিদ্যাভূষণের কল্পনা। রূপগোস্বামী কেবলমাত্র আভাস দিলেন, দুই কৃষ্ণ দুই গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিলেন না যে, সেই দুই কৃষ্ণ এক কালেই প্রকটভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বলদেবও বলিয়াছেন, রূপগোস্বামীও বলিয়াছেন যে, এই কথার মধ্যে একটা রহস্য আছে, যাহা শুকদেব প্রচার করেন নাই। কি জন্য শ্রীকৃষ্ণ শুকদেবকে সে কথা প্রচার করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে বলদেবের মত আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। স্বয়ং কৃষ্ণই কৃষ্ণরহস্যের উদ্ভেদ করিতে পারেন। যদি চৈতন্যদেব রূপগোস্বামীকে সে কথা সমগ্রভাবে না বলিয়া গিয়া

থাকেন, তাহা হইলে আমরা আবার তাঁহার অপেক্ষা করিব। কৃষ্ণমুখেই কৃষ্ণকথা শুনিব।

কথার এখনও শেষ হইল না। প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইল। বলদেব বিদ্যাভূষণের সহিত বিবাদ করা চলে, জীব গোস্বামীর সহিতও ভয়ে ভয়ে দুকথা বলা চলে, কিন্তু ভক্তের প্রাণ-স্বরূপ চৈতন্য দেবের দয়িতরূপ রূপের নিকট জিহ্বা স্তব্ধ হয়, তর্ক লুকায়িত হয়।

রূপের মুখে চৈতন্যের মধুর বাণী শুনিয়া আত্মবিহ্বল হইতে হয়, অমৃত-সিঞ্চিত কলেবরে জড়তা আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই অমৃতময় বাণীর অমৃত প্রবাহে আর একটি বার মাত্র গা ঢালিয়া দিব। দেখিব, এই গূঢ়তম রহস্যের দ্বার আরও কিঞ্চিৎ উদ্ঘাটিত করিতে পারি কি না।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

বৈচিত্র্য।

সিন্ধু—কাওয়ালী।

বিশ্ব-ভবনে গগণে পবনে তোমারিত মহিমায় -
ঝঙ্কার উঠে শশি-তারা ফুটে ঐ দূর নীলিমায়॥
মহান জলধি তরুণ-তপন'
গিরি নদ-নদী বন-উপবন
মহা আকর্ষণে ছুটে তব পানে চরণে লুটাতে চায়॥
তোমারি যে সুর তোমারি যে গান—
কোটি প্রাণে বাজে নিশিদিন-মান,—
হইলে নীরব, ভেসে যায় সব গ্রহ তারা কে কোথায়—
অসীমের বুকে জাগে শত প্রাণ,
ঘুমাইয়া পড়ে পুনঃ সেই তান,—
একি অভিনব! ওহে লীলাময়! অন্ত কেহ না পায়॥

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

মৃত্যুর পরপারে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভুবর্লোক।

ভুবর্লোকের আর এক নাম কাম-লোক এবং তত্রত্য সূক্ষ্মদেহের নাম কাম-দেহ। ইহার কারণ কি? ইহা একটু মনোযোগের সহিত বুঝিতে হইবে। পদার্থমাত্রের স্বভাব এই যে, ইহা নিয়ত স্পন্দনশীল (vibrating)। কি ক্ষিতিতত্ব, কি অপ্‌তত্ব, কি তেজস্তত্ব,—সকল পদার্থই অনুক্ষণ স্পন্দিত হইতেছে। এই সকল বিভিন্ন স্পন্দন মানবে বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান বা অনুভূতি উৎপাদন করে,যেমন ইথারের স্পন্দনে আলোক বা বর্ণের অনুভূতি হয়, বায়ুর স্পন্দনে শব্দের অনুভূতি হয় ইত্যাদি। কিন্তু অপ্‌তত্বের স্পন্দনে এক একটি কাম বা বাসনার অনুভূতি হয়। যেমন ইথারের একটি স্পন্দনে আমাদের মস্তিষ্ক স্পন্দিত হইলে আমরা লালবর্ণ দেখি, আর একটি স্পন্দনে পীতবর্ণ অনুভব করি, সেইরূপ অপ্‌তত্বের একটি স্পন্দনে আমাদের সূক্ষ্মদেহ স্পন্দিত হইলে আমরা ক্রোধ অনুভব করি, আর একটী স্পন্দনে লোভ, তৃতীয় প্রকার স্পন্দনে দয়া ইত্যাদি অনুভূত হয়। অপ্‌তত্বের বিভিন্ন শ্রেণী বা স্তর আছে পূর্ব্বেই বলিয়াছি; যথা কঠিন (বা স্থূলতম) অপ্‌তত্ব, তরল অপতত্ব ইত্যাদি। বিশেষ বিশেষ অপ্‌তত্বের স্পন্দনে বিশেষ বিশেষ বাসনার উদ্রেক হয়। নিম্নতম বা স্থূলতম অপ্‌তত্বের স্পন্দনে নীচ বাসনাগুলি (যথা জিঘাংসা, ক্রোধ, লোভ, ঘৃণা, পরপীড়নেচ্ছা ইত্যাদি) এবং উচ্চতর বা সূক্ষ্মতর অপ্‌তত্বের স্পন্দনে সদ্বাসনা (যথা স্নেহ, দয়া, পরোপচিকীর্ষা, জ্ঞানপিপাসা ইত্যাদি) উদ্রিক্ত হয়।

পৃথিবীর যেমন একটা বায়ুমণ্ডল (atmosphere) আছে, ভুবর্লোকেরও সেইরূপ atmosphere আছে। উহাতে সকল স্তরেরই অপ্‌তত্ব বিদ্যমান। এই অপ্‌তত্বগুলি নিয়ত স্পন্দিত হইতেছে। এই স্পন্দনগুলি আমাদের কাম-দেহে আঘাত করিলে, কাম-দেহও ঠিক অনুরূপ স্পন্দিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ আমরা বিশেষ বিশেষ বাসনার অনুভব করি। আমাদের কাম-দেহের এক একটি স্পন্দনই এক একটি বাসনা। আমার মনে ক্রোধ বা লোভের উদ্রেক হইয়াছে, ইহার অর্থই এই যে, আমরা কাম-দেহের স্থূল পরমাণুগুলি স্পন্দিত হইতেছে। সেইরূপে, আমি যখন দয়া বা ভক্তি অনুভব করি, আমার কাম দেহস্থ সূক্ষ্ম পরমাণুগুলি কম্পিত বা স্পন্দিত হইতে থাকে। কাম দেহের এই স্পন্দন কেবল যে দেহ-মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহা নহে; উহা চতুর্দ্দিকের অপ্‌তত্বে প্রসারিত হইয়া পড়ে। যেমন জল-বক্ষে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে, সেই স্থান হইতে তরঙ্গ উঠিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, সেইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির কাম-দেহ হইতে ক্রোধ, লোভ বা দয়া, ভক্তি প্রভৃতির তরঙ্গ উঠিয়া ভুবর্লোকময় ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং এই তরঙ্গ

অপরের কাম-দেহে আঘাত করিয়া তাহাদের মনেও অনুরূপ বাসনা জাগাইয়া দিতেছে। মানব! এইবার তোমার কঠিন দায়িত্বটা একবার ভাবিয়া দেখ। তুমি হয়'ত ভাব যে, মনে মনে একটি কুভাব পোষণ করিয়া রাখিলে কাহারও অনিষ্ট করা হয় না। কিন্তু এই দেখ, তোমার অন্তরের গুহ্যতম প্রদেশে,যে প্রতিহিংসা সঞ্চিত রহিয়াছে, উহা হইতে কি ভীষণ তরঙ্গ উত্থিত হইয়া চারিদিকে প্রধাবিত হইতেছে! ঐ দেখ, উহা তোমার সন্নিহিত ব্যক্তি-গণের কাম-দেহে তরঙ্গ তুলিয়া তাঁহাদের চিত্তেও অল্পে অল্পে হিংসা জাগাইতেছে!

প্রত্যেক মানবের কামদেহে সকল স্তরেরই অপ্‌তত্ত্ব আছে, পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু সকল মানবে ইহা তুল্য ভাবে নাই। কাহারও কামদেহে স্থূল পরমাণু বেশী, কাঁহারও বা সূক্ষ্ম পরমাণু বেশী। যাঁহাতে স্থূল পরমাণু বেশী, তাঁহার স্থূল বাসনাগুলি (কাম ক্রোধাদি) শীঘ্র ও সহজে উদ্রিক্ত হয় এবং যে কামদেহে সূক্ষ্ম পরমাণুই অধিক, তাহাতে উচ্চ বাসনা-গুলি সহজে ও অধিক পরিমাণে উদিত হয়। প্রত্যেক মানবের উচ্চ বা নীচ বাসনাকে মনে স্থান দিবার বা মন হইতে দূর করিবার শক্তি আছে। মানব ইচ্ছা করিলেই যে কোন বাসনা বা ভাবকে মনে ধরিয়া রাখিতে পারেন, কিম্বা মন হইতে তাড়াইয়া দিতে সমর্থ। তিনি যে বাসনাটিকে মনে দীর্ঘকাল পোষণ করেন, তাঁহার কামদেহে তজ্জাতীয় পরমাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং অপরজাতীয় পরমাণু কমিয়া যায়। আমি যদি দীর্ঘকাল ক্রোধ বা লোভকে মনে স্থান দিই, আমার কামদেহে স্থূল পরমাণু খুব বাড়িয়া যাইবে এবং সূক্ষ্ম পরমাণু কমিয়া যাইবে; সুতরাং ক্রোধাদি আমার একরূপ সহজ ও অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে এবং দয়া ত্যাগাদি বড়ই দুর্লভ হইয়া পড়িবে। এই অবস্থায় যদি আমি খুব দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের সহিত ক্রোধাদি উদিত হইবামাত্র তাহাদিগকে দূর করিয়া দিই এবং দয়াদির স্পন্দনে কামদেহকে স্পন্দিত করিতে চেষ্টা করি, তবে দীর্ঘ চেষ্টার পর কামদেহে সূক্ষ্মপরমাণু বাড়িবে এবং স্থূলপরমাণু কমিবে। অতএব, আমরা নিজেই আমাদের কাম-দেহ স্থূল বা সূক্ষ্ম পরমাণুতে নিয়ত গঠিত করিতেছি। এই স্থূল বা সূক্ষ্ম পরমাণুর উপরেই পরলোকে আমাদের দুঃখ বা সুখ নির্ভর করে। কিরূপে? দেখা যাক্।

ভুবর্লোকে (এবং স্বর্গাদি সকল লোকেই) সাতটি স্তর বা ভূমি আছে। নিম্নতম স্তরটি স্থূলতম পরমাণু (বা কঠিন অপ্‌তত্ত্ব) দ্বারা, তদূর্দ্ধ স্তর তরল অপ্‌তত্ত্ব দ্বারা, তদূর্দ্ধ দেশ বায়বীয় অপ্‌তত্ত্ব দ্বারা, (এইরূপে সাতটি স্তর ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর পরমাণু দ্বারা) নির্ম্মিত। ইহাদিগকে আমরা নিম্ন হইতে যথাক্রমে ৭ম স্তর, ৬ষ্ঠ স্তর, ৫ম স্তর ইত্যাদি বলিব। সুতরাং সর্ব্বোচ্চ স্তরটি ১ম স্তর। এই সপ্তম স্তরটি বড়ই ভীষণ স্থান। ইহাতে স্থূলতম স্পন্দন ব্যতীত আর কিছুই নাই, সুতরাং ক্রোধ, জিঘাংসা, নিষ্ঠুরতা, পরপীড়ন, নরহত্যা, হিংসা, দ্বেষ, চৌর্য্য, দস্যুতা, পরদার-বাসনা ইত্যাদি অতি নিকৃষ্ট স্পন্দন দ্বারা ইহা অনুক্ষণ স্পন্দিত হইতেছে। এখানে কোনও উচ্চ বা পবিত্র স্পন্দন আদৌ নাই, থাকিতে পারে

না। কেন না, ইহা স্থূলতম পরমাণুর দ্বারা গঠিত। ৬ষ্ঠ ও ৫ম স্তর ইহাপেক্ষা কতক পরিমাণে শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম অপেক্ষা স্থূল পরমাণুর সংখ্যা অধিক থাকায়, এগুলিতেও নিকৃষ্ট বাসনাই প্রবল। এই তিনটি স্তরের নাম প্রেতলোক। আর ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ স্তরের নাম পিতৃলোক। এই পিতৃলোক অপেক্ষাকৃত সুখের স্থান, কারণ এখানে উচ্চ ভাব ও বাসনাই প্রবল। কিন্তু ভুবর্লোকের সর্ব্বত্রই,—সকল স্তরেই, পূর্ণ নিঃস্বার্থতা নাই, সকল কার্য্যেই একটু না একটু স্বার্থ জড়িত আছে। স্বার্থশূন্য ভাব আমরা স্বর্গলোকে পাই, এখানে নহে।

মানব যত কাল জীবিত (অর্থাৎ স্থূলদেহ সংযুক্ত) থাকে, তত কাল তাহার কামদেহে সকল স্তরের পরমাণুগুলি মিশ্রিত হইয়া থাকে। কিন্তু যেমন তাহার মৃত্যু হয়, অমনই কামদেহের পরমাণুগুলি গুরুত্ব বা স্থূলত্ব অনুসারে পৃথক্ ভাবে সন্নিবেশিত হয়। স্থূলতম পরমাণুগুলি সকলের উপরে বা বাহিরে আইসে, তাহার নিম্নে তদপেক্ষা সূক্ষ্মগুলি, তাহার নিম্নে আরও সূক্ষ্মগুলি, এইরূপে কামদেহটি সাতটি স্তরে সজ্জিত হয়। ইহার নাম কামদেহের পুনর্গঠন। এ সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, বহিরাবরণটি যে জাতীয় পরমাণু দ্বারা নির্ম্মিত হয়, কাম-লোকের ঠিক সেই স্তরে দেহটি আকৃষ্ট হয়। সুতরাং যে ব্যক্তির বহিরাবরণটি স্থূলতম পরমাণু দ্বারা গঠিত হয়, তিনি সপ্তম স্তরে গমন করেন ; যাঁহার বহিরাবরণ তদপেক্ষা সূক্ষ্ম, তিনি ষষ্ঠ স্তরে ইত্যাদি। বহিরাবরণের সূক্ষ্মতানুসারে বিভিন্ন স্তরে মানবের গতি হয়। অতএব, বুঝা যাইতেছে আমাদের কামদেহে স্থূলপরমাণু যতই কম থাকে, ততই মঙ্গল। পৃথিবীতে বাস কালে নিকৃষ্ট বাসনা ও চিন্তা দ্বারা যিনি স্থূল পরমাণুর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়াইতেছেন, পরলোকের অতি নিম্ন স্তরে তাঁহাকে যাইতে হইবে, সুতরাং তাঁহাকে বড়ই দুঃখ পাইতে হইবে। অবশ্য, এই দুঃখ যে চিরকাল থাকিবে, তাহা নহে। তিনি যত জোরে স্থূল পরমাণুগুলিকে স্পন্দিত করিয়াছিলেন শক্তি নিঃশেষ হইতে ততই সময় লাগিবে, সুতরাং তত কাল তাঁহাকে যন্ত্রণা পাইতে হইবে। যেমন একটি চাকা যত জোরে ঘুরাইয়া ছাড়িয়া দিবেন, উহা থামিতে ততই সময় লাগে ; সেইরূপ মানব জীবিত কালে যতই অধিক কুভাব পোষণ করে, স্থূলপরমাণুগুলি ততই জোরে স্পন্দিত হয়, সুতরাং মৃত্যুর পর ঐ স্পন্দন থামিতে ততই অধিক সময় লাগে। সে যাহা হউক, যেমন ঐ স্পন্দন থামিয়া যায়, অমনই ঐ পরমাণুগুলি কামদেহ হইতে ঝরিয়া পড়ে অর্থাৎ বহিরাবরণটা খসিয়া যায় এবং তাহার নিম্নের আবরণটি বাহির হইয়া পড়ে। তখন, স্বাভাবিক আকর্ষণবশতঃ এই আবরণটির তজ্জাতীয় স্তরে গতি হয়, অর্থাৎ মানব কামলোকের উচ্চতর স্তরে আরোহণ করেন। পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অনুসারে এখানেও তাঁহার ভোগ শেষ হইলে তিনি আরও উচ্চ স্তরে গমন করেন। এইরূপে উঠিতে উঠিতে শেষে তিনি প্রথম স্তরে উপস্থিত হন। কিন্তু যে ব্যক্তির কাম-দেহে সূক্ষ্ম পরমাণুই অধিক এবং স্থূল পরমাণুগুলি নিষ্ক্রিয় ও শক্তিহীন, তিনি অতি অল্পকাল মধ্যে নিম্নস্তরগুলি অতিক্রম

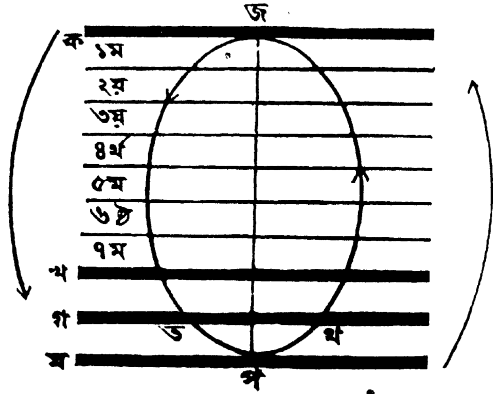
করিয়া উচ্চস্তরে চলিয়া যান। যে সময়টুকু তাঁহাকে নিম্নস্তরে (প্রেতলোকে) থাকিতে হয়, তাহাও সুখময় নিদ্রায় অতিবাহিত হয়, সুতরাং ইহার জঘন্য ও কুৎসিত দৃশ্যগুলি তাঁহাকে দেখিতে হয় না।

এই যে কামদেহের পুনর্গঠনের কথা উল্লেখ করিলাম, ইহাই সাধারণ নিয়ম, অর্থাৎ সাধারণ মানবের ঐরূপই ঘটে। কিন্তু কোন কোন জ্ঞানী ও দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি ইচ্ছাশক্তি দ্বারা এই পুনর্গঠন নিবারণ করিয়া থাকেন। মৃত্যুর পর স্থূল পরমাণুগুলি যেমন সূক্ষ্ম হইতে পৃথক হইবার চেষ্টা করে, অমনই তাঁহারা তাহা নিবারণ করেন। ইহাতে বিশেষ লাভ আছে। পুনর্গঠন হইয়া গেলে মানব ভুবর্লোকের যে স্তরে ইচ্ছা, সেই স্তরে গমন করিতে পারেন না, তাঁহাকে একটি নির্দ্দিষ্ট স্তরে সীমাবদ্ধ থাকিতে হয় (যদবধি না তাঁহার বহিরাবরণটি খসিয়া গিয়া উচ্চতর বহিরাবরণ প্রকাশ পায়)। কিন্তু যিনি পুনর্গঠন নিবারণ করেন, তিনি ইচ্ছামত ও অবাধে সকল স্তরেই গমনাগমন করিতে সমর্থ। ইহা একটি কম লাভ নহে। যাঁহার পুনর্গঠন হইয়াছে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে নিম্নস্তরের কদর্য্য দৃশ্যের মধ্যে বাস করিতে হয় এবং তিনি ক্রমে ক্রমে স্তর হইতে স্তরান্তরে উঠিতে পারেন। কিন্তু পুনর্গঠন নিবারণ করিতে পারিলে, ঐরূপ করিতে হয় না।

পুনর্গঠন হউক আর নাই হউক, সকল মানবকেই স্বাভাবিক নিয়মানুসারে স্তর হইতে স্তরান্তরে উঠিতেই হইবে। ইহাই বিধাতার বিধি, প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম। সকল জীবই, সকল পদার্থই সূক্ষ্ম হইতে ক্রমশঃ স্থূলে আবির্ভূত হয়, আবার স্থূল হইতে সূক্ষ্মে প্রবেশ করে। পুনরায় (একটু উন্নত ভূমিকা) সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে আগমন ও স্থূল হইতে সূক্ষ্মে প্রতিগমন হয়। এইরূপ গতাগতি চিরকাল চলিতেছে। ইহারই নাম সৃষ্টি ও লয়। পরমাণু হইতে সৌরজগৎ পর্য্যন্ত, সকলেই এই নিয়মাধীন,—"আব্রহ্ম-ভুবনাৎ লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন"। এই নিয়মানুসারে মানব আবরণ ত্যাগ করিতে করিতে (খোলস ছাড়িতে ছাড়িতে) ভুবর্লোকের স্তর হইতে স্তরান্তরে উঠিতে থাকেন। শেষে, প্রথম স্তরে আসিয়া তিনি কামদেহটি একবারে ত্যাগ করেন। ইহাই তাঁহার দ্বিতীয় "মৃত্যু"। অতঃপর, মানস-দেহ আশ্রয় করিয়া তিনি স্বর্গলোকে গমন করেন। সেখানেও স্তর হইতে স্তরান্তরে উঠিয়া, পরিশেষে প্রথম স্তরে নিজস্বরূপে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করেন। আবার তাঁহার অবরোহণ আরম্ভ হয়, তিনি সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে নামিতে থাকেন। প্রথমতঃ তেজস্তত্ত্বের আবরণটি পরিধান করেন, পরে অপ্‌তত্ত্বের অপেক্ষাকৃত স্থূল পরিচ্ছদে ভূষিত হন। তার উপর ইথারের পোষাকটি পরিয়া পিতামাতার শুক্রশোণিতের সাহায্যে স্থূলতম শরীরটি প্রাপ্ত হন। তারপর ভূমিষ্ঠ হইয়া পৃথিবীর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। এই কর্ম্ম শেষ হইলে আবার সেই ভুবর্লোক, স্বর্গলোক, স্বরূপে কিঞ্চিৎ অবস্থান, সংসারে অবরোহণ ব্যাপার চলিতে থাকে। এইরূপ অবরোহণ কোটি কোটি বৎসর চলিতেছে এবং আরও কতকাল চলিবে, বলা যায় না। প্রত্যেক আরোহণে তিনি কিছু কিছু উন্নত হইতেছেন

এবং প্রত্যেক অবরোহণে এই উন্নতিটুকু লইয়া আসিতেছেন। সংসারটি স্কুল, মানব ছাত্র, এবং তাঁহার এক একটী জীবন স্কুলের এক একটি দিন। স্বর্গলোকের প্রথম স্তরই এখন তাঁহার গৃহ। তিনি প্রত্যহ বিদ্যালয়ে আসিয়া কিছু কিছু নূতন শিখিয়া যাইতেছেন। যখন এই শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে, যখন জ্ঞানে, শক্তিতে ও প্রেমে তিনি পূর্ণতা পাইবেন, তখন আর তাঁহাকে স্কুলে আসিতে হইবে না। সকল ছাত্রই যে স্কুলের একই শ্রেণীতে পড়ে, তাহা নহে; কেহ উচ্চ শ্রেণীতে, কেহ বা নিম্নশ্রেণীতে পড়িতেছে। যাহারা উচ্চশ্রেণীতে পড়ে, তাহারা দীর্ঘকাল এবং যাহারা নিম্নশ্রেণীতে পড়ে, তাহারা অল্পকাল পাঠ আরম্ভ করিয়াছে। মানবের মধ্যে ইহাই প্রভেদ।

অতএব, মানব সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে নামিতেছেন, স্থূল হইতে সূক্ষ্মে উঠিতেছেন। ইহা ক্রমাগত চলিতেছে। নিম্নলিখিত চিত্রদ্বারা ইহা আরও পরিস্ফুট হইবে।



ক হইতে খ পর্য্যন্ত স্বর্গলোক। [ইহার সাতটি স্তর ১ম ২য়, ইত্যাদি দেখান হইয়াছে।] খ হইতে গ পর্য্যন্ত ভুবর্লোক এবং গ হইতে ঘ পর্য্যন্ত ভূলোক। ডিম্বাকৃতি রেখাটি মানবের অবরোহণ ও আরোহণ মার্গ, জতপ অবরোহণ-মার্গ এবং পথজ আরোহণ-মার্গ। মানব জ বিন্দু (অর্থাৎ ১ম স্তরের শীর্ষ বিন্দু) হইতে নামিয়া পৃথিবীতে আসিতেছেন এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জ বিন্দুতে যাইতেছেন। ত বিন্দু তাঁহার জন্মকাল, প বিন্দু জীবনের ঠিক মধ্যস্থল এবং থ বিন্দু মৃত্যুকাল।

এই চিত্রে পাঠক দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিবেন। প্রথমতঃ, মানব নামিবার সময় অল্পে অল্পে সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে প্রবেশ করিয়া প বিন্দুতে (অর্থাৎ পূর্ণযৌবনে) স্থূলতম অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছেন। অতঃপর সূক্ষ্মের দিকে তাঁহার গতি হইতেছে এবং ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতরে প্রবিষ্ট হইয়া জ বিন্দুতে তিনি সূক্ষ্মতম অবস্থা লাভ করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার পৃথিবীতে অবস্থান-কাল ত প থ রেখা দ্বারা এবং পর-লোকে অবস্থান-কাল থ জ ত রেখা দ্বারা সূচিত হইয়াছে। এই শেষোক্ত রেখাটি প্রথমোক্ত রেখার প্রায় ৭।৮ গুণ। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, মানব পৃথিবীতে যতকাল বাস করেন, পরলোকে (ভুবর্লোকে ও স্বর্গে) তাহার ৭।৮ গুণ অধিক কাল বসবাস করেন। অতএব, পরলোকই আমাদের প্রকৃত বাসস্থান, পৃথিবী একটি ক্ষুদ্র প্রবাসের স্থল মাত্র।

এখন, মানব ভুবর্লোকে গিয়া কি অবস্থায় থাকেন, তাঁহার কিরূপ দুঃখ বা সুখ ভোগ হয়, তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিব। মানব-জাতিকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—অধম, মধ্যম, উত্তম। যাঁহাদের নীচ কামনা গুলি (কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসাদি) অতিশয় প্রবল তাঁহারা ৩য় শ্রেণীস্থ, সাধারণ মানব (যাঁহাদের কোন বাসনাই বিশেষ প্রবল নহে) ২য় শ্রেণীস্থ এবং যাঁহাদের উচ্চ বাসনা (জ্ঞানপিপাসা, স্বর্গকামনা, পরহিতেচ্ছাদি) প্রবল, তাঁহারাই ১ম শ্রেণীস্থ জীব। এই তিন শ্রেণীর অবস্থা আমরা পৃথক্ পৃথক্ বর্ণনা করিব। কিন্তু অগ্রে একটি কথা বুঝিয়া রাখা প্রয়োজন। মানব যতকাল জীবিত (বা স্থূলদেহবিশিষ্ট) থাকেন, ততকাল তাঁহার কোন বাসনাই (প্রবল হইলেও), খুব ভীষণাকারে প্রকাশ পাইতে পারেনা; কেন না উহাকে স্থূল ক্ষিতিতত্ত্বের মধ্যদিয়া প্রকাশ পাইতে হয়, সুতরাং উহার বেগ কতকটা মন্দীভূত হয়, কতকটা শক্তি ব্যয়িত হইয়া যায়। কিন্তু যখন স্থূলদেহ না থাকে, তখন ঐ বাসনা (বা স্পন্দন) পূর্ণ তেজে, পূর্ণশক্তিতে প্রকাশ পায়। কারণ, উহাকে বাধা দিবার তখন আর কিছুই থাকে না। এইজন্য, মানব ভুবর্লোকে গমন করিলেই তাঁহার বাসনাগুলি শতগুণ বর্দ্ধিত আকারে প্রকাশ পায়।

পৃথিবীতে বাসকালে যে ব্যক্তির নীচবাসনা-গুলি খুব প্রবল, যিনি অতিশয় কামুক, লোভী, প্রতিহিংসা-পরায়ণ, সুরাসক্ত, ঈর্ষ্যাযুক্ত, অর্থলোলুপ বা কৃপণস্বভাব, পরলোকে তাঁহার অবস্থা কিরূপ হয়? প্রথমতঃ তাঁহার কাম-দেহে স্থূল পরমাণু অধিক থাকায় এবং তদ্দ্বারা তাঁহার বহিরাবরণটি গঠিত হওয়ায় তিনি অতিনিম্ন স্তরে গমন করেন। এখন আর তাঁহার স্থূলদেহ নাই, সুতরাং কামদেহের স্পন্দন অতি প্রচণ্ড ও দুর্দ্দমনীয় ভাব ধারণ করে। কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসাদি এরূপ প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে যে, তিনি কিছুতেই উহাদিগকে দমন করিতে পারেন না, উহাদের তীব্রতাড়নায় উন্মত্তের ন্যায় ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়ান। যিনি সুরাপায়ী ছিলেন, তাঁহার মদ্যপানেচ্ছা,—যিনি লম্পট ছিলেন, তাঁহার স্ত্রীসম্ভোগ-বাসনা,—যিনি কৃপণ ছিলেন, তাঁহার অর্থসঞ্চয়েচ্ছা,—যিনি প্রতিহিংসা পোষণ করিতেন, তাঁহার জিঘাংসা প্রবৃত্তি,—শতগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠে। বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠেন, উন্মত্তপ্রায় হন। কিন্তু চরিতার্থ করিবার উপায় নাই, কারণ স্থূল দেহ নাই। সুরাসক্ত প্রবল আবেগে ও ঔৎসুক্যে শুঁড়ির দোকানে প্রবেশ করিলেন, দেখিতেছেন—তাঁহার প্রিয়তমা হুইস্কি বা চিরপরিচিতা ব্রাণ্ডী মনোহর সাজে সজ্জিতা হইয়া তাঁহার সম্মুখেই বিরাজমানা, অথচ উহাদিগকে স্পর্শ করিবার উপায় নাই। যে কৃপণ সমগ্র জীবন অর্দ্ধাহারে ও ছিন্ন বস্ত্রে কাটাইয়া প্রাণপাত পূর্ব্বক অতি যত্নে তাঁহার প্রিয়তম স্বর্ণমুদ্রাগুলিকে সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, আজ তিনি স্বচক্ষে দেখিতেছেন—তাঁহার হৃদয়-শোণিত অপেক্ষা প্রিয়তর, পিঞ্জরাস্থি অপেক্ষা মূল্যবান্ সেই স্বর্ণমুদ্রাগুলি

অপরে যথেচ্ছ ব্যয় করিতেছে, তাঁহার নিষেধ করিবার, বা নিবারণ করিবার কোন শক্তি নাই! যিনি ঈর্ষ্যাপরায়ণ ও সংশয়চিত্ত ছিলেন, যিনি তাঁহার প্রিয়তম বা প্রিয়তমার প্রতি সন্দেহযুক্ত হইয়া তাহাকে গৃহের বাহিরে যাইতে বা কাহারও সহিত কথা কহিতে দিতেন না, আজ তিনি সেই প্রিয়তম বা প্রিয়তমাকে অপরের সহিত হাস্যামোদ ও অযথা ব্যবহার করিতে দেখিয়াও কিছুই করিতে পারিতেছেন না, নিজে ঈর্ষ্যা ও প্রতিহিংসার তুষানলে পুড়িতেছেন মাত্র। যিনি ভয়ানক ক্রোধপরায়ণ ছিলেন, অপরে কিছু বলিলে বা প্রতিবাদ করিলে যিনি আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না, ভীষণ তর্জ্জনগর্জ্জন, এমন কি প্রহার করিয়া ক্রোধের কথঞ্চিৎ শান্তি বিধান করিতেন, আজ তাঁহাকে কত শত লোক নিন্দা করিতেছে, গালি দিতেছে, ইহা তিনি স্বকর্ণে শুনিতেছেন, স্বচক্ষে দেখিতেছেন, অথচ নিন্দুকদিগকে শাস্তি দিতে পারিতেছেন না, দারুণ প্রতিহিংসা ও জিঘাংসায় দগ্ধ হইতেছেন! পাঠক! পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় পতিত হইলে কিরূপ অসহ্য যন্ত্রণা হয়, কল্পনা করুন। অন্তরে দুর্দ্দমনীয় বাসনা, অথচ উহা পূর্ণ করিবার উপায় নাই! প্রাচীন গ্রীসের সূক্ষ্মদর্শিগণ টেণ্টালস্ (Tantalus) ও সিসীফস্ (Sisyphus) প্রভৃতির উপাখ্যান দ্বারা পরলোকের এই যন্ত্রণা অতিসুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। টেণ্টালস্ প্রবল-তৃষ্ণায় কাতর, সম্মুখে সুশীতল জল বিদ্যমান; কিন্তু যেমন তিনি উহার নিকটস্থ হইতেছেন, অমনই উহা সরিয়া যাইতেছে। তৃষ্ণা শতগুণ বাড়িয়া উঠিতেছে, আবার তিনি উহা ধরিতে যাইতেছেন; কিন্তু কোন মতেই স্পর্শ করিতে পারিতেছেন না! এইরূপ অনন্তকাল চলিতেছে!! সিসীফস্ পাহাড়ের নিম্নদেশ হইতে একখানি সুবৃহৎ প্রস্তর গড়াইয়া গড়াইয়া শীর্ষদেশে তুলিতে নিযুক্ত আছেন। তিনি অনেক কষ্টে, অনেক যত্নে যেমন উহা তুলিতেছেন, অমনি উহা পুনরায় নীচে গড়াইয়া পড়িতেছে। চিরকাল এইরূপ চলিতেছে! আকাঙ্ক্ষা ও বিফলতার অবসান নাই! যাঁহারা পৃথিবীতে স্বার্থসাধনের জন্য ক্রমাগত মতলব আঁটেন,—এইরূপ করিব, ঐরূপ করিব, পরে ধনী হইব, ধনী হইয়া গাড়ী, ঘোড়া, বাড়ী, বাগান প্রভৃতি করিব এবং সারা জীবন ঐ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে নিযুক্ত থাকেন, মৃত্যুর পর তাঁহাদের এই দশা!

কতকাল এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়? পাঠক এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। ইহার উত্তরে বলি, মাস ও বৎসরের দ্বারা কালের প্রকৃত পরিমাণ হয় না, মানসিক অবস্থার দ্বারাই কালের ঠিক পরিমাণ হয়। যদি খুব সুখে সময় কাটে, এক বৎসরকে মুহূর্ত্তমাত্র মনে হয় এবং কষ্টের সময় এক নিমেষকে যুগ বলিয়া জ্ঞান হয়। সুতরাং মাস বৎসরের পরিমাণ ধরিলে যদিও মানবকে ভুবর্লোকে অল্পকাল (বোধ হয় সাধারণতঃ ২০।২৫ বৎসরের ঊর্দ্ধ নহে) বাস করিতে হয়, তথাপি যন্ত্রণার পরিমাণ অনুসারে কালের পরিমাণ অধিক বলিয়া মনে হয়। যাঁহার কষ্ট যত অধিক, তাঁহার এই কাল ততই দীর্ঘ মনে হয়; সুতরাং "অনন্ত নরক" কথাটি যে কোন কোন ধর্ম্মে স্থান পাইয়াছে, তাহার ভিত্তিই এই।

বাস্তবিক, যাঁহারা ঐরূপ যাতনা ভোগ করেন, তাঁহাদের নিকট ঐ কালটিই (২০।২৫ বৎসর হইলেও) "অনন্ত" বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

এই কালটি সাধারণতঃ বা গড়ে ২০।২৫ বৎসর বলিয়া পাঠক ভাবিবেন না যে, সকলের পক্ষেই এইরূপ। কেহ হয়ত ২।১ বৎসরের মধ্যেই শান্তিময়ী নিদ্রায় ভুবর্লোক অতিক্রম করিয়া স্বর্গে চলিয়া যান, আবার কাহাকেও হয়ত শতাধিক বৎসর এখানে কাটাইতে হয়। আমাদিগকে দুইটি বিষয় সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রথম, মানবের নিজ কর্ম্মদ্বারাই এই স্থানে ভোগ ও স্থিতিকাল পরিমাপিত হয়। যিনি পৃথিবীতে বাস কালে বাসনা-গুলিকে সর্ব্বদা দমন করিয়াছেন, তাঁহার ভোগ ও স্থিতি কাল অল্প হয় এবং যিনি দমন করেন নাই, তাঁহাকে দীর্ঘকাল বাস করিতে হয়। দ্বিতীয়, অগ্নিদগ্ধ না হইলে যেমন স্বর্ণ নির্ম্মল হয়না, সেইরূপ এই যাতনা-ভোগ ব্যতীত মানব পাপ-বাসনা হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। পরলোকে এই যাতনা পাইতে পাইতে তাঁহার একটি প্রবল অনুশোচনা ও দৃঢ় সঙ্কল্প আইসে এবং ইহার ফলে তিনি পরজন্মে উক্ত বাসনা ও কার্য্যগুলিকে পরিহার করেন। যদি যাতনা না হইত, অনুতাপ ও সংকল্প শীঘ্র আসিতনা; সুতরাং বহু জন্ম ধরিয়া তিনি দুর্দ্দমনীয় বাসনা-স্রোতে তৃণ-খণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া যাইতেন।

আমরা তৃতীয় শ্রেণীস্থ (বা নীচাসক্ত মানবের পরলোক-বৃত্তান্ত যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়াছি। এখন, দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ (বা সাধারণ) মানবের কিরূপ অবস্থা হয়, দেখিব। সাধারণ মানবের (উচ্চ বা নীচ) কোন বাসনাই বিশেষ প্রবল নহে। ইহাঁরা পৃথিবীতে কাজের সময় কাজ করেন; যখন কাজ না থাকে, সময় কাটাইবার জন্য সংবাদ পত্র বা পুস্তকাদি পড়েন, অথবা তাস, পাশা, ক্রিকেট, টেনিস খেলেন বা বন্ধুবান্ধবের সহিত বাজে গল্প করেন। যথাকালে গৃহে আসিয়া আহারাদি করেন ও নিদ্রা যান। পরদিন প্রত্যুষে আবার কর্ম্ম স্থানের জন্য প্রস্তুত হন। এইভাবেই ইহাঁদের জীবন এখানে অতিবাহিত হয়। কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষা বা আদর্শ নাই, জীবনের যেন কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য (aim) নাই। ভুবর্লোকে গিয়া ইহাঁদের বিশেষ সুখও হয় না, দুঃখও হয় না। কোন কার্য্য না থাকায় ইহাঁদের মনে হয়, যেন সময়টা কাটে না। তাঁহারা উদ্দেশ্য বিহীন জীবন লইয়া অলস-ভাবে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ান। পৃথিবীতে তাঁহারা পোষাক পরিচ্ছদ, গৃহ আসবাব, আহার বিহার প্রভৃতি লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। কিন্তু এখানে ত এগুলির আর প্রয়োজন হয় না, কাজেই জীবনটা নীরস বলিয়া বোধ হয় দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন লেড্‌বিটার বলেন, একদিন সূক্ষ্মদেহে ভুবর্লোকে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি দেখিলেন, একব্যক্তি অতি বিষণ্ণ ভাবে একাকী একস্থানে বসিয়া আছেন। পরিচয় লইয়া জানিলেন, ইনি একজন ডাক্তার (Surgeon) ছিলেন। কিন্তু এখানে চিকিৎসার কোন প্রয়োজন না থাকায়, তিনি কাজ খুঁজিয়া পাইতেছেন না; সুতরাং জীবনটা ভার-বহ বোধ হইতেছে। লেড্‌বিটার সাদরে ও সস্নেহে তাঁহাকে সঙ্গে লইলেন এবং দেখাইয়া দিলেন, এখানেও

করিবার বিস্তর কাজ আছে। এইরূপে কাজ পাইয়া ডাক্তারটির জীবন এখন বেশ সুখে কাটিতেছে।

এইবার আমরা প্রথম শ্রেণীর মানবের কথা বলিব। ইঁহারা পৃথিবীতে একটি বিশেষ বস্তু লইয়া নিমগ্ন ছিলেন। কেহ সঙ্গীত-চর্চ্চায়, কেহ চিত্র-বিদ্যায়, কেহ প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শনে, কেহবা ইতিহাস, গণিত বা বিজ্ঞান আলোচনায় সর্ব্বদা বিভোর থাকিতে ভালবাসিতেন। ভুবর্লোকে আসিয়া ইঁহারা কি অবস্থায় থাকেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখানে সকল বাসনাই বলবতী হয়, সুতরাং ইঁহাদের এই সদ্বাসনাগুলি শত গুণে বর্দ্ধিত হয়। কেবল তাহাই নহে। বাসনা চরিতার্থ করিবার সুযোগ, অবসর ও শক্তি শত গুণ অধিক হয়। পৃথিবীতে যে সকল বাধা বিঘ্ন আছে, এখানে তাহা আদৌ নাই। যিনি সঙ্গীত ভালবাসেন, পৃথিবীতে সাধ মিটাইয়া তিনি উহার চর্চ্চা করিতে পারেন না; কারণ নিজের ও পরিবারবর্গের ভরণ পোষণের জন্য তাঁহাকে অনেক সময় ব্যাপৃত থাকিতে হয়, দেহের রোগ পীড়াদি আছে, সামাজিক ও পারিবারিক দুর্ঘটনা আছে, উত্তম সঙ্গীতের সাক্ষাৎ লাভ সর্ব্বদা ঘটে না ইত্যাদি। কিন্তু এখানে ঐ সব কিছুই নাই। ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, সুতরাং অর্থের জন্য ছুটাছুটি করিতে হয় না; দেহ সুস্থ ও নীরোগ; কিছুতেই ক্লান্তি বা অবসাদ হয় না; এবং পৃথিবীর যেখানে যত সুসঙ্গীত হইতেছে, তিনি ইচ্ছামাত্র তথায় উপস্থিত হইয়া উহা উপভোগ করিতে সমর্থ। যিনি ইতিহাস, বিজ্ঞান ও শিল্পাদির চর্চ্চা করিতে ভালবাসিতেন, তাঁহার এখানে কত সুবিধা দেখুন। তিনি অবিশ্রান্ত (কারণ, এখানে নিদ্রা বা বিশ্রাম নাই) তাঁহার প্রিয়তম বিষয়টিতে নিমগ্ন থাকিতে পারেন; ইহাতে তাঁহার কিছুমাত্র ক্লান্তি বা মানসিক অবসন্নতা বোধ হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, পৃথিবীর মধ্যে সে সম্বন্ধে যেখানে যত উৎকৃষ্ট পুস্তকাদি আছে, তিনি ইচ্ছামাত্র সে সকল পাঠ করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ যে সকল তত্ত্ব স্থূলদৃষ্টির অগোচর, তাহাও তিনি অনায়াসে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন; যথা, তড়িৎ, আলোক, উত্তাপাদির মূল কি, পরমাণুর স্বরূপ কি ইত্যাদি। যিনি কবি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ভালবাসেন, তিনি যেখানে যত সুন্দর বস্তু আছে,—গিরি, নদী, প্রস্রবণ, বন, উপবন, সাগর, গগন—সর্ব্বত্র অনায়াসে গমনাগমন করিয়া দর্শন-পিপাসা মিটাইতে পারেন।

উল্লিখিত ব্যক্তিগণের বাসনা উচ্চ বটে; কিন্তু ইঁহারা একেবারে স্বার্থশূন্য নহেন। ইঁহারা শিল্প বিজ্ঞানাদির চর্চ্চা করেন, পরহিতের জন্য নহে, স্বয়ং আনন্দ পাইবার জন্য। কিন্তু ইঁহাদিগের অপেক্ষা যাঁহারা উচ্চ, যাঁহারা অপরের—মনুষ্যজাতির—সেবা করিতে সর্ব্বদা উৎসুক, তাঁহাদের এখানে এই পবিত্র সেবা-ব্রত পালন করিবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুযোগ। পরোপকার করিবার শক্তি তাঁহাদের যে কেবল বৃদ্ধি পায় তাহা নহে, তাঁহারা দেখিতে পান, এখানে সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহাদের নিত্য সাহায্য-প্রার্থী। সুতরাং তাঁহাদের আনন্দের সীমা থাকে না, তাঁহারা এই পবিত্র কার্য্যে জীবন মন সমর্পণ করিয়া

কৃতার্থ হন। কেহ কেহ আত্মীয়, স্বজন ও বন্ধুবান্ধবাদির হিতসাধনে নিযুক্ত হন, কেহ স্বজাতির ও স্বদেশের মঙ্গল বিধান করেন, এবং কেহ বা সমগ্র মানব-জাতির কল্যাণ-কার্য্যে ব্রতী হন। হায়! আমরা অজ্ঞতাবশতঃ মনে করি, "মৃত" ব্যক্তির সহিত মর্ত্ত্যবাসীর কোন সম্বন্ধ থাকে না, "জীবিত" ব্যক্তি দ্বারাই পৃথিবীর সকল মঙ্গল সাধিত হয়। কিন্তু কত স্নেহশীল "মৃত" জননী তাঁহার সন্তানগণের রক্ষয়িত্রী স্বরূপ হইয়া আছেন, কত "মৃত" পতি "জীবিতা" শোকসন্তপ্তা পত্নীকে অলক্ষ্যে সান্ত্বনা দিতেছেন, কত স্বদেশ-সেবক পরলোক হইতে তাঁহাদের মুহ্যমান দেশবাসীর অন্তরে আশা ও বলের সঞ্চার করিতেছেন এবং কত অদৃশ্য ভক্ত ও জ্ঞানী জগৎময় নিয়ত প্রেম ও বৈরাগ্যের সুধা বর্ষণ করিয়া আমাদের বিশুষ্ক হৃদয়কে সঞ্জীবিত রাখিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা কে করেন? কয়জনই বা ইহা অবগত আছেন? বাস্তবিক, যাঁহারা পরলোকগত মানবের বল, উৎসাহ ও কর্ম্মপটুতা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, "জীবিত" ও "মৃত" শব্দ দুইটি আমরা ঠিক বিপরীতভাবে প্রয়োগ করি; কারণ, পরলোকবাসীই প্রকৃত জীবিত এবং মর্ত্ত্যবাসীই মৃত।

ইহা শুনিয়া কেহ কেহ হয়ত বলিবেন "পরলোক, যদি এতই সুখের স্থান হয়, সেখানেই যদি আমরা প্রকৃত জীবন পাই, তবে পৃথিবীতে থাকিয়া বৃথা কষ্ট পাই কেন? আত্মহত্যা দ্বারা সকলেরই পরলোকে যাওয়া ত উচিত?" ইঁহারা মানব-জীবনের গভীর তথ্য অবগত নহেন। পরলোক ইহলোক অপেক্ষা সুখের স্থান বটে, কিন্তু এই সুখ ক্ষণস্থায়ী। রোগ-গ্রস্ত ব্যক্তি সুমিষ্ট আহার দ্বারা ক্ষণিক রসনার তৃপ্তি ইচ্ছা করেন; কিন্তু পরিণামদর্শী সুবিজ্ঞ চিকিৎসক তাঁহার জন্য কটুতিক্ত ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ঠিক সেই-রূপে করুণাময় ভগবান্ আমাদের চরম মঙ্গলের জন্যই আমাদিগকে এই ক্লেশময় পৃথিবীতে স্থাপন করিয়াছেন। সংসারই আমাদের শিক্ষার স্থল। যন্ত্রণা ও কষ্ট না পাইলে শিক্ষা হয় না। সুতরাং কটুতিক্ত ঔষধের ন্যায় পরম হিতকর এই সংসার ত্যাগ করিয়া যিনি আপাত-মধুর পরলোকের জন্য ব্যাকুল হন, তিনি নিতান্তই ভ্রান্ত ও অপরিণামদর্শী। আর এক কথা। আত্মহত্যা দ্বারা যাঁহারা ইহলোকের দুঃখ কষ্ট এড়াইতে চান, পরলোক তাঁহাদের পক্ষে আদৌ সুখের স্থান নহে, ভীষণ যন্ত্রণার কারাগার। তাঁহারা ভুবর্লোকে নিম্নতম স্তরে প্রবেশ করেন এবং তাঁহাদের যন্ত্রণার অবধি থাকে না। পৃথিবীতে যে কষ্ট পাইতেছিলেন, তদপেক্ষা সহস্রগুণ যাতনায় নিরন্তর ছট্‌ফট্ করিতে থাকেন।

এখন, দু'একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়া আমরা এই অধ্যায় সমাপ্ত করিব। অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, "পরলোকে গিয়া কি আমরা নিজের উন্নতি করিতে পারি?" নিশ্চয়ই। উন্নতিই বিধাতার নিয়ম, ক্রমোন্নতির জন্যই জগৎ-সৃষ্টি। তবে সকলে সমান উন্নতি করিতে পারেন না। পৃথিবীতে যিনি যত অধিক অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি তত অধিক উন্নতি করিতে পারেন। যাঁহার নীচ বাসনাগুলি খুব প্রবল, যন্ত্রণা পাইতে পাইতে তাঁহার

এগুলি ক্রমে দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হয়। ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট উন্নতি। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞান-পিপাসু ও পর-হিতৈষী, তাঁহারা এখানে অনেক নূতন জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করেন; সুতরাং পরজন্মে তাঁহারা অধিকতর শক্তিশালী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। আর একটি প্রশ্ন এই যে, "যে সকল আত্মীয় বন্ধু আমাদের পূর্ব্বে পরলোকে আসিয়াছেন, মৃত্যুর পর আমরা তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিব কি না ও তাঁহাদের সহিত মিলিত হইব কি না?" চিনিতে যে পারিবই, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; কেন না তাঁহাদের বা আমাদের চেহারার কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। তবে, সাক্ষাৎ হওয়া সম্বন্ধে একটু কথা আছে। আমাদের মৃত্যুর বহু পূর্ব্বে যদি তাঁহাদের মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা যখন ভুবর্লোকে প্রবেশ করিব, তাঁহারা হয়ত তখন স্বর্গলোকে চলিয়া গিয়াছেন। এরূপ স্থলে ভুবর্লোকে সাক্ষাৎ না হইয়া স্বর্লোকেই সাক্ষাৎ হইবে। কিন্তু তাঁহারা ভুবর্লোকে থাকিতে থাকিতে যদি আমাদের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ভুবর্লোকেই সাক্ষাৎ হইবে। ফলকথা এই যে, যে লোকেই হউক, সাক্ষাৎ হইবেই। ভালবাসার আকর্ষণী শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। ইহলোকে বা পরলোকে ইহা পরস্পরকে সংযুক্ত করিবেই করিবে।

ভুবর্লোক সম্বন্ধে বলিবার আরও অনেক কথা আছে, অনেক চিত্তাকর্ষক রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সকল কথা বলা অসম্ভব। যাঁহারা অধিক জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা শ্রীযুক্ত লেড্‌বিটার প্রণীত The Astral plane এবং The Other Side of Death এবং শ্রীমতী বেশান্ত প্রণীত Death and After পাঠ করিবেন। এ সম্বন্ধে যতই জানিবেন, ততই মৃত্যুভয় চলিয়া যাইবে; কেন না, বুঝিতে পারিবেন যে, মৃত্যু আমাদিগকে দুঃখের আগারে বা ভীষণ অন্ধকারে লইয়া যায় না; ইহা উচ্চতর জীবনের দ্বার স্বরূপ; ইহা পরম সুখময় স্থানে লইয়া যায়। সেই পরম সুখের স্থানটি কিরূপ, পর-পরিচ্ছেদে তাহার একটু আভাস দিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী।

সাংখ্য ও বেদান্ত।

শিষ্য। গুরুদেব! বেদান্ত-দর্শন হইল অধ্যাত্ম শাস্ত্র, ইহার মধ্যে আবার বিচার কেন? সাঙ্খ্য-মত নিরাস, ন্যায়-মত নিরাস, প্রভৃতি বেদান্ত-দর্শনের যে যে মত রহিয়াছে, তাহা কি জন্য লিখিত হইল? যে সকল লোক মুক্তি-কামনা করিয়া জ্ঞানের জন্য—কেবল জ্ঞানের জন্যই বেদান্ত-শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া থাকেন, আত্মজ্ঞানই যাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য, তাঁহাদিগের ত সাঙ্খ্য-দর্শনে দোষ আছে কি না, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। নিজের মত ঠিক কি না, বেদান্তদর্শনের মতবাদ নির্দ্দোষ কি না, তাহা বুঝিবার জন্য বরং কিছু বিচারেরআ বশ্যক হইতে পারে; সুতরাং সাঙ্খ্যাদি দর্শনের মত নিরাস বেদান্তদর্শনে আলোচনা করা হইল কেন? অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে এই বিষয়টী বুঝাইয়া দিন।

গুরু। বৎস! যদিও বেদান্তদর্শনে বেদান্ত বা উপনিষদের মীমাংসা করা হইয়াছে, উপনিষদের যে যে অংশ বিরুদ্ধ বলিয়া আপাতত মনে হইয়া থাকে, যুক্তিদ্বারা শাস্ত্র-বাক্যের একতা দেখাইয়া তাহারই সমন্বয় করা হইয়াছে, তর্কশাস্ত্র বা ন্যায়দর্শনের মত যুক্তি দ্বারা—কেবল যুক্তিদ্বারাই কোন একটী মতবাদ খণ্ডিত হয় নাই বা কোন সিদ্ধান্ত স্থির করা যায় নাই, তথাপি কোন কোন মহাত্মা সাঙ্খ্যাদি দর্শনের মতবাদ শ্রুতি বা শাস্ত্র সম্মত বিবেচনা করেন এবং যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সেই ভ্রম দূর করার জন্য অধ্যাত্ম শাস্ত্রেও বিচারের আবশ্যক হইয়াছে। যাঁহারা অল্পবুদ্ধি, বিচার করিয়া যাঁহারা কোন বিষয় বুঝিয়া থাকেন না, যাঁহারা মহাত্মাদিগের মতেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন তাঁহাদের সম্যক-জ্ঞানের জন্যই বিচাব লিখিত হইয়াছে। যদি তাঁহারা মনে করেন—মহাত্মারা সাঙ্খ্যাদি দর্শনের মতবাদ ও তত্ত্বজ্ঞানের উপায় বর্ণনা করিয়াছেন, তবে ঐ মতে সাধনা করিলেও ত মুক্তি হইতে পারে, সেইজন্য তাঁহাদের সেই ভ্রম দূর করার জন্যই অন্যান্য দর্শনের মতবাদ নিরাস করা হইয়াছে। সত্য এক বই দুই নহে, তত্ত্বজ্ঞানও এক ব্যতীত উভয় হইতে পারে না। মুক্তির উপায় যে জ্ঞান, সে জ্ঞান হইলে জীবের সকল দুঃখ দূর হইয়া থাকে, যে জ্ঞানদ্বারা জীব সচ্চিদানন্দ হইতে পারে, সেই জ্ঞান বিবিধ হইতে পারে কি? তাই অধ্যাত্ম শাস্ত্রেও সাঙ্খ্যাদি দর্শনের মতবাদ খণ্ডন জন্য বিচার লিখিত হইয়াছে।

শিষ্য। প্রথমত আমাকে 'সাঙ্খ্য-দর্শনের একএকটী বিষয় বা মতবাদ বুঝাইয়া দিন এবং তাহাতে কি কি দোষ আছে তাহা নির্দ্দেশ করুণ, যুক্তি দ্বারা আজ কেবল যুক্তি দ্বারাই আমাকে ঐ দোষগুলি বুঝাইতে হইবে, আজ আমি শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সাঙ্খ্যদর্শনের মত খণ্ডন শুনিব না; তাহা পরে আর একদিন শুনিব।

গুরু। বেশ, তোমার অভিপ্রায় অনুসারেই বলিতেছি, তুমি মনোযোগের সহিত

শ্রবণ কর। যে সকল স্থলে তোমার সন্দেহ উপস্থিত হইবে, আমাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিও, আমি সুন্দররূপে তোমাকে বুঝাইতেছি।

জগতের আদিকারণ বিষয়ে সাঙ্খ্যদর্শনের মত প্রথমতঃ তোমার নিকট বলিতেছি, এবং তাহাতে কি কি দোষ রহিয়াছে,তাহাও বলিব। কার্য্যকারণ বিষয়ে সাঙ্খ্যদর্শন বলেন, —কারণে যে যে গুণ রহিয়াছে, কারণের যতগুলি ধর্ম্ম আছে, কার্য্যেরও সেই সেই গুণ বা ধর্ম্ম থাকিবে ; কারণের স্বরূপও যাহা হইবে. কার্য্যের স্বরূপও তাহাই হইবে। এই নিয়মের ব্যভিচার বা বিপরীত ভাব কোন স্থলেই থাকিবে না। অতএব কারণের গুণ দেখিয়া কার্য্যের গুণ, কারণের স্বরূপ হইতে কার্য্যের স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়। ঘট ও সরা বাদি মৃণ্ময় বিবিধ পদার্থের কারণে মৃত্তিকার সম্বন্ধ রহিয়াছে, ঘট ও সরাব প্রভৃতি কার্য্যেও মৃত্তিকারই সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ঘট ও সরাবাদির কারণ মৃত্তিকারই অবস্থা-বিশেষ। আবার ঘট ও সরাবাদি কার্য্যও মৃত্তিকার অবস্থা বিশেষ; ঘটাদির কারণ স্থূল হইলে ঘটাদিও স্থূল হইয়া থাকে, এবং ঐ কারণ সূক্ষ্ম হইলে ঘটাদিও সূক্ষ্ম হইয়া থাকে। স্বর্ণ দ্বারা বলয়, কুণ্ডল প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে, ঐ বলয়-কুণ্ডলাদি স্বর্ণ হইতে ভিন্ন জিনিস কি ? স্বর্ণ উজ্জ্বল হইলে বলয়াদিও উজ্জ্বল হইয়া থাকে,আর স্বর্ণ ঔজ্জ্বল্যহীন হইলে বলয়াদিও অনুজ্জ্বল হইতে দেখা যায়। অতএব কারণের গুণ ও স্বরূপ যখন সকল স্থলেই কার্য্যে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তখন কার্য্যের গুণ ও স্বরূপ দেখিয়াও কারণের গুণ ও স্বরূপ অনুমান করিতে পারা যায়। এই যুক্তিমূলেই সাঙ্খ্যদর্শন বলিয়া থাকেন যে, জগতে যত কিছু বাহ্য বা আভ্যন্তরীণ পদার্থ রহিয়াছে, তাহার সকল গুলিই যখন সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক দেখিতেছি. তখন ঐ সকল পদার্থের কারণও সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মকই কোন এক জাতীয় পদার্থ হইবে। সুখাত্মক সত্ত্বগুণ, দুঃখাত্মক রজোগুণ, আর মোহাত্মক তমোগুণ হইয়া থাকে ; সুতরাং সকল পদার্থই সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ স্বরূপ প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, জগতের আদিকারণ প্রকৃতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরী প্রতিযোগিতায় লাভ করিতে পারিয়াছ বলিয়া, তোমার যে সুখ হইতেছে, তাহার কারণ অঙ্গুরীর সত্ত্বগুণ ; অঙ্গুরীতে সত্ত্বগুণ আছে বলিয়াই তোমার সুখ জন্মাইতে পারিতেছে। তুমি বহুমূল্য অঙ্গুরী লাভ করিয়াছ, তোমার প্রতিপক্ষ লাভ করিতে পারিল না, তাঁহার ঐ অঙ্গুরীই দুঃখের কারণ হইয়াছে, দুঃখ রজোগুণের কার্য্য, অঙ্গুরীতে রজোগুণ থাকাতেই তোমার প্রতিপক্ষের দুঃখ অঙ্গুরী জন্মাইতে পারিতেছে। হীরকাঙ্গুরী বহুমূল্য বলিয়া অতি সাবধানে রাখিয়াছ, চোর চুরি করিয়া লইতে পারিতেছে না, তাই আবার ঐ অঙ্গুরীই চোরের বিষাদ জন্মাইতেছে। বিষাদ তমোগুণের কার্য্য, অঙ্গুরীতে তমোগুণ আছে বলিয়াই বিষাদ জন্মাইতে পারে। প্রতি জিনিষই অবস্থা-ভেদে সুখ, দুঃখ ও বিষাদের কারণ হইয়া থাকে। পরিমিত বা ক্ষুদ্র যতগুলি জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা নিরাকার বা সর্ব্বব্যাপী নহে, তাহা বিবিধ বস্তুর সংযোগ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং জগতের প্রত্যেক পদার্থই সত্ত্ব, রজ

ও তমোগুণ দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি মৃত্তিকা ও স্বর্ণাদির মত অচেতন; কেননা যে প্রকৃতি অচেতন জগতের কারণ, তাহা অচেতনই হইবে, চেতন হইতে পারে না। সুতরাং চেতন ঈশ্বরকে যাঁহারা জগতের আদিম কারণ বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের কথা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। এই প্রকৃতিই পুরুষ বা আত্মার যাবদীয় প্রয়োজন সম্পাদন করেন। পুরুষ যখন সংসারী থাকেন তখন পুরুষের ভোগের কারণও প্রকৃতি; আবার পুরুষ মুমুক্ষু হইলে তাহার মুক্তির কারণও প্রকৃতি। অবিবেক জন্য প্রকৃতিই পুরুষকে বদ্ধ করেন, বিবেকজ্ঞান হইলে এই প্রকৃতিই পুরুষকে মুক্ত করিয়া থাকেন।

শিষ্য। বিবেকজ্ঞান কাহাকে বলে? বুঝিতে ত পারিলাম না।

গুরু। এ বিষয় সময়ান্তরে বিস্তার করিয়া বুঝাইব, সংক্ষেপে এইমাত্র মনে রাখিবে যে, প্রকৃতি আত্মা হইতে ভিন্ন; এবং আত্মা বা পুরুষ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র—এই ভাবটী প্রত্যক্ষ হইলেই তাহাকে বিবেকজ্ঞান বলিয়া থাকে।

এখন এই সাঙ্খ্য-দর্শনের কার্য্য-কারণের একজাতীয়তা বিষয়ে যে মতবাদ রহিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে বেদান্ত-দর্শনের যে সকল যুক্তি আছে, তাহাই তোমাকে বলিতেছি। যদি সাঙ্খ্য-দর্শন-প্রণেতা দৃষ্টান্ত দ্বারা—কেবল দৃষ্টান্তবলেই বলিতে পারেন যে, "অচেতন কার্য্যের কারণ অচেতনই হইয়া থাকে, চেতন হইতে পারে না; সুতরাং অচেতন প্রকৃতিই স্বাধীন-ভাবে এই জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন; পরমেশ্বর এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা নহে, কেন না তিনি চেতন, তাহা হইতে অচেতন জগতের উদ্ভব সম্ভব নহে", তাহা হইলে আমরাও দৃষ্টান্তবলেই বলিতে পারি যে, অচেতন পদার্থ চেতন পদার্থ দ্বারা প্রেরিত না হইয়া কোন স্থলেই কার্য্য করিতে পারে না; অচেতন পদার্থ স্বাধীনভাবে কোন একটী পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা ত দেখা যায় না। তৃণ-কাষ্ঠাদি অচেতন পদার্থ হইতে যে গৃহ নির্ম্মিত হইয়া থাকে, ঐ গৃহের নির্ম্মাতা চেতন মনুষ্যই দেখিতে পাওয়া যায়; ইষ্টক, চুন, সুরকি প্রভৃতি অচেতন পদার্থ দ্বারা যে দ্বিতল, ত্রিতল অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছে, তাহাও চেতন শিল্পিগণই নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন; শয্যা, আসন, বসন প্রভৃতি যত কিছু সৃষ্ট অচেতন পদার্থ দেখিতেছি, তাহাও চেতন মনুষ্যগণই প্রস্তুত করিয়া থাকেন; যেখানে বাষ্প বা বৈদ্যুতিক যন্ত্র নূতন নূতন শিল্প পদার্থ সমূহের সৃষ্টি করিয়া থাকে, সেখানেও যন্ত্রের পরি-চালক চেতন মনুষ্যই দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ স্বাধীনভাবে অচেতন পদার্থ কোন একটী পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা ত দেখিতে পাওয়া যায় না; বুদ্ধিমান শিল্পিগণই যে কালে যে জিনিষ সুখদায়ক হইবে এবং যে সময়ে যে পদার্থ ক্লেশ নাশ করিতে পারিবে, তাহা বিবেচনা করিয়া আবাস, আসন, বসন, শয্যা ও বিচরণ-স্থানাদি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এবংবিধ বিবিধ পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা যেমন চেতন পদার্থকেই দেখিতেছি, সেইরূপ পৃথিবী, জল প্রভৃতি নিখিল জগৎকেও অসীম জ্ঞানের আধার চেতন পরমেশ্বরই সৃষ্টি করিতেছেন, জ্ঞান-বিহীন অচেতন প্রকৃতি সৃষ্টি করিতে পারেন না। চরাচর নিখিল

প্রাণীর আবাসভূমি ভূমি, সুস্বচ্ছ রস-সম্পন্ন জীবনপ্রদ সুশীতল জল, বিবিধ জড়তা-বিনাশক নানাবিধ পুষ্টিজনক শস্যসকলের পরিপাক-সাধক শীত-নিবারক উত্তাপ, জগতের প্রাণ-স্বরূপ অনায়াসলভ্য সর্ব্বগত সমীরণ প্রভৃতি যে সকল পদার্থ বিবিধ জ্ঞান-সম্পন্ন কার্য্য-কুশল শিল্পিগণও সৃষ্টি করিতে পারেন না, অথবা কি অদ্ভুত কৌশলে এই সকল পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা কল্পনা করিয়াও বুঝিতে পারেন না, সেই সকল পদার্থ অচেতন প্রকৃতি সৃষ্টি করিতে পারেন, ইহা কে বিশ্বাস করিতে পারে ? পাখীর পালকের কোমলতা, বৃক্ষপত্রাদির নির্ম্মাণ-কৌশল, ময়ূর-পুচ্ছের বিচিত্র চিত্র, গর্ভস্থ শিশুর অদ্ভুত উপায়ে জীবন-রক্ষা, গ্রহ-উপগ্রহাদিসহ সৌর জগতাদির সুনিয়মে পরিচালন ও স্থিতি-কৌশল প্রভৃতি জগতের বিচিত্র বিচিত্র যে সকল কৌশলময় কার্য্য রহিয়াছে, তাহা অচেতন প্রকৃতি সম্পাদন করিতে পারেন, ইহা কে কল্পনা করিতে পারে ? জীবগণের নানাবিধ কর্ম্মফলানুসারে নানাবিধ জাতিরও নানাবিধ ফলভোগের উপযোগী পৃথিব্যাদি নানাবিধ ভোগভূমি যিনি রচনা করিয়াছেন, প্রাণিগণের শরীরের প্রত্যেক অবয়বের কৌশলময় বিন্যাস সুকৌশলে শরীরের সহিত যিনি সংস্থাপন করিয়াছেন, ইন্দ্রিয়গণ, মন ও বুদ্ধির কার্য্য-পরম্পরা যিনি অদ্ভুত কৌশলে নিয়মিত করিয়াছেন, তিনি অচেতন, ইহাও কি সম্ভব হইতে পারে ? সৃষ্টি ত দূরের কথা, যে সকলের রচনা-কৌশল বিজ্ঞান আলোচনার আরম্ভ-কাল হইতে আজ পর্য্যন্তও নানা দেশের বৈজ্ঞানিকগণ কল্পনা করিয়াও অভ্রান্তভাবে স্থির করিতে পারিলেন না, তাহা অচেতন প্রকৃতি কি প্রকারে সৃষ্টি করিতে পারেন ? সকল স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, চেতন কুম্ভকার অচেতন মৃত্তিকা দ্বারা বিবিধ মৃণ্ময় পাত্র প্রস্তুত করিতেছে, জ্ঞানবান্ তন্তুবায় জ্ঞান-বিহীন তন্তু দ্বারা বিবিধ বস্ত্র বয়ন করিতেছে, এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা অচেতন প্রকৃতির প্রেরক কোন একজন চেতন রহিয়াছেন, ইহাই ত বুঝিতে পারা যায়।

শিষ্য। মহাশয়! যে সকল দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, তাহার সকল স্থলেই ত উপাদান কারণ অচেতন দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং জগতেরও উপাদান কারণ অচেতন পদার্থই হইবে, ইহা বুঝিব না কেন ?

গুরু। বৎস! দৃষ্টান্ত এবং যাহাকে তুলনা করা হইবে, এই উভয় জিনিষ সকল বিষয়ে যে একরূপ হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই ; কোন অংশে সাদৃশ্য থাকিলেই দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ হইতে পারে। চন্দ্রের মত মুখ বলিলে, চন্দ্র যেরূপ গোলক, মুখখানিও সেইরূপ গোল হইবে, এমন ত বলা হয় না ; তবে কিনা পূর্ণচন্দ্র দেখিয়া যেরূপ আমোদ হইয়া থাকে, যে মুখ দেখিলে সেইরূপ আমোদ হইতে পারে, তাহাকেই চন্দ্রের মত মুখ বলিয়া থাকে। এস্থলে আনন্দ-দান-ব্যাপারেই মুখ ও চন্দ্রের সাদৃশ্য, অপর কিছু নহে। আমি যে সকল উদাহরণ দেখাইয়াছি, তাহাতেও বুঝিতে হইবে যে, চেতন কুম্ভকারাদি যেরূপ ঘট, পট প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে, সেইরূপ চেতন পরমেশ্বরই জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন ;

যে যে ব্যক্তি কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই চেতন, কেহ অচেতন নহেন, এই অংশে দৃষ্টান্ত অপর অংশে নহে। উপাদান কারণ ব্যাপারে সাদৃশ্য হইবে, নিমিত্ত কারণ বা সৃষ্টি করা অংশে সাদৃশ্য হইবে না, এরূপ কোন নিয়ম হইতে পারে না। চেতন পদার্থ জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এইরূপ বলিলে কোন বিরোধও ত দেখিতে পাওয়া যায় না; বরং শ্রুতি বা বেদ যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত মিলিয়া যায়। অতএব এই বিচিত্র জগৎ অচেতন প্রকৃতি রচনা বা সৃষ্টি করিতে পারেন না; সুতরাং জগতের কারণ অচেতন নহে চেতন, ইহাই অনুমান করিতে হইবে। আরও দেখ, সাঙ্খ্যদর্শনকার বলিতেছেন,— জগতের সকল পদার্থই সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক, ইহা ত সম্ভব হইতে পারে না; কেন না, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি অন্তরের ধর্ম্ম, ইহা বাহিরের কোন পদার্থ নহে। সুস্বর সুখ, কর্কশস্বর দুঃখ, কোমল স্পর্শ সুখ, কঠিন স্পর্শ দুঃখ, এইরূপ প্রতীত হয় কি? বরং সুস্বর ও কোমল স্পর্শাদি সুখের কারণ, এবং কর্কশস্বর ও কঠিন স্পর্শাদি ক্লেশের কারণ, এইরূপই অনুভব হইয়া থাকে, অন্যরূপে হয় না। সুতরাং সকল পদার্থই সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক হইয়া থাকে এবংবিধ সাঙ্খ্যদর্শনের যে মত, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে। সুখ ও দুঃখ হইতে সুখ ও দুঃখজনক পদার্থের ভেদ অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়; চন্দন ও গোলাপ জল প্রভৃতি যে সকল জিনিষ গ্রীষ্মকালে সুখকর হইয়া থাকে, তাহা যদি বস্তুত সুখজনক না হইয়া সুখস্বরূপই হইত, তবে শীতের সময়েও চন্দনাদি সুখস্বরূপই থাকিয়া যাইত; শীতার্ত্তের পক্ষে অগ্নি সুখদায়ক না হইয়া যদি সুখস্বরূপই হইত, তবে প্রবল গ্রীষ্মের সন্তাপেও ঐ অগ্নি সুখস্বরূপই থাকিতে পারিত; কেন না, স্বরূপের অন্যথা কোথায়ও ত দেখিতে পাওয়া যায় না। মধুর মিষ্টতা, চিরতার তিক্ততা, মরিচের কটুতা, বহ্নির উষ্ণতা ইত্যাদি যাহার যাহা স্বভাব, তাহার বিপরীত ভাব কখনও ত দেখা যায় না। অতএব সুখ, দুঃখ, বিষাদাদি বাহিরের কোন পদার্থ হইতে পারে না, বাহিরের জিনিষ সুখ, দুঃখ বা মোহ জন্মাইতে পারে, কিন্তু সুখ, দুঃখ বা মোহ মনেরই বৃত্তিবিশেষ। সুতরাং 'সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক প্রকৃতি হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে', 'জগতের প্রত্যেক জিনিষই সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক,' 'কারণের গুণ সকল স্থলেই কার্য্যে পরিদৃষ্ট হইবে,' সাঙ্খ্য-দর্শনকারের এইরূপ সিদ্ধান্ত বা অনুমান সমূহ যুক্তিযুক্ত নহে। সাঙ্খ্য দর্শনকার জগতের আদি কারণ বিষয়ে আর একটী যে অনুমান করিয়া থাকেন তাহারও অযৌক্তিকতা তোমাকে বুঝাইতেছি, তিনি বলেন—"পরিমিত বা ক্ষুদ্র যে সকল পদার্থ, যাহা নিরাকার বা সর্ব্ব-ব্যাপী নহে, তাহা বস্তু বিশেষের সংযোগ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, কোন একটী জিনিষ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না, সুতরাং এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর হইতে জগতের সৃষ্টি হইতে পারে না, পৃথিবী, জল, অগ্নি প্রভৃতি জগতের প্রত্যেক পদার্থই পরিমিত বা ক্ষুদ্র, অতএব সত্ব, রজ ও তমোরূপ তিনগুণ হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে বুঝিতে হইবে" এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এইমাত্র যে—সাঙ্খ্যকার বলিতেছেন, পরিমিত বা যাবদীয়

ক্ষুদ্র পদার্থ সংযোগ ব্যতীত হইতে পারে না, বিবিধ পদার্থের মিলন না হইলে পরিমিত পদার্থ জন্মে না। তাঁহার মতে সত্ব, রজঃ এবং তম এই যে ভিন্ন ভিন্ন তিনটী পদার্থ তিনি স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহার প্রত্যেকটী পরিমিত বা ক্ষুদ্র পদার্থ কি না? যদি সত্বাদি গুণ পরিমিত বলেন, তবে ইহার প্রত্যেকটী কোন্ কোন্ বস্তুর সংযোগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বলিতে হইবে, এবং উক্ত সত্বাদি গুণের কারণ যে যে বস্তু, তাহাও পরিমিত ভিন্ন অপরিমিত হইতে পারে না,তাহাও বস্তু-বিশেষের সংযোগ হইতে জন্মিয়াছে, এইরূপ অনুমান করিতে পারি। এবংবিধ অনুমান-পরম্পরা হইতেও একটী পদার্থ সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয় নাই, অথচ ক্ষুদ্র বা পরিমিত এইরূপ স্বীকার করিতেই হইবে। আর যদি সত্ব, রজ ও তমো গুণ প্রত্যেকে পরিমিত কিন্তু কোনরূপ বিবিধ বস্তুর সংযোগে জন্মে নাই, এইরূপ সাংখ্য-দর্শনকার বলিতে পারেন, তবে আমরাও—আকাশ, বায়ু প্রভৃতি অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত ক্ষুদ্র বা পরিমিত বটে অথচ কোনরূপ বিবিধ বস্তুর সংযোগ হইতে জন্ম গ্রহণ করে নাই, ঐ আকাশাদি ভূতসকল পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা বলিতে পারিব না কেন?

শিষ্য। অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত কাহাকে বলে? ইহা ত বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। বেদান্ত বা উপনিষদ বলিয়া থ কেন, পরমেশ্বর জগতের সৃষ্টি করিবেন, এইরূপ কল্পনা করিয়া প্রথমতঃ আকাশ বা ইথরের মূল কারণ সৃষ্টি করিয়াছেন, আকাশের পরে বায়ুর, বায়ুর পরে অগ্নির, অগ্নির পরে জলের, জলের পরে পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যেকটী মৌলিক পদার্থ। এই পঞ্চবিধ মৌলিক পদার্থের মিশ্রণে আমাদের পরিদৃশ্যমান পৃথিবী, জল প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন। মৌলিক পঞ্চভূতের মিশ্রণে উৎপন্ন পৃথিবী, জল, অগ্নি প্রভৃতি যে মহাভূত সকল আমরা দেখিতেছি ও অনুভব করিতেছি, তাহাকে তাঁহারা পঞ্চীকৃত মহাভূত বলিয়াছেন; এবং ঐ মৌলিক আকাশাদি পঞ্চবিধ পদার্থকে অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত বলিয়া থাকেন। এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক;—সত্বাদি প্রত্যেক গুণ পরিমিত নহে, এইরূপ সাংখ্য-দর্শনকার বলেন না, সুতরাং ঐ পক্ষের অযৌক্তিকতা দেখাইবার আবশ্যকতা নাই। অতএব যখন প্রত্যেক কার্য্যই কোন এক ব্যক্তি বিবেচনাপূর্ব্বক করিতেছেন, দেখিতে পাওয়া যায়, তখন কোন এক জন অপ্রতিম শক্তিশালী মহাত্মা বিবেচনাপূর্ব্বকই জগৎরূপ কার্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, এইরূপ অনুমান করিতে পারি। তিনি সাংখ্য-দর্শনকারের মতানুযায়ী প্রকৃতি বা প্রধান নহেন, এবং অচেতনও হইতে পারেন না। এ বিষয়ে আরও অনেক যুক্তি আছে, তাহা তোমাকে আর এক দিন বলিব। ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রসন্নকুমার বেদান্ততীর্থ, বিদ্যালঙ্কার, কাব্যতীর্থ,
বেদান্তভূষণ, বিদ্যাবিনোদ, সাংখ্যরত্ন।

মণিকর্ণিকা-স্তোত্রম্

(শঙ্করাচার্য্য-বিরচিতম্)

(১)

ত্বত্তীরে মণিকর্ণিকে হরিহরৌ সায়ুজ্যমুক্তিপ্রদৌ
বাদং তৌ কুরুতঃ পরস্পরমুভৌ জন্তোঃ প্রয়াণোৎসবে।
মদ্রূপো মনুজোঽয়মস্তু হরিণা প্রোক্তঃ শিবস্তৎক্ষণাৎ
তন্মধ্যাদ্ ভৃগুলাঞ্ছনো গরুড়গঃ পীতাম্বরো নির্গতঃ ॥

শুন গো জননি মণি-কর্ণিকে ! তোমার
তীরে যার মৃত্যু হয়, পুণ্য কত তার !
পাইবে কিরূপ মুক্তি সেই পুণ্য জন
হরি হর দুয়ে দ্বন্দ্ব করেন তখন।
উভয়ে সাযুজ্য-মুক্তি করেন প্রদান,
তাই এ বিবাদ আসি' হয় বিদ্যমান,—
"এ জন হউক হরি, শুন ওহে হর !"
এই কথা কন্ হরি হরে নিরন্তর।
কহিতে কহিতে ইহা তখনই হায়,
মৃত দেহ হ'তে এক মূর্ত্তি দেখা যায়,—
ভৃগু-পদ-চিহ্ন তাঁর বক্ষের উপরি,
গরুড়-বাহন তিনি পীতাম্বর-ধারী !

(২)

ইন্দ্রাদ্যাস্ত্রিদশাঃ পতন্তি নিয়তং ভোগক্ষয়ে তে পুন-
র্জায়ন্তে মনুজাস্ততোঽপি পশবঃ কীটাঃ পতঙ্গাদয়ঃ।
যে মাতর্মণিকর্ণিকে তব জলে মজ্জন্তি নিষ্কল্মষাঃ
সাযুজ্যেঽপি কিরীটকৌস্তুভধরা নারায়ণাঃ স্যুর্নরাঃ ॥

ইন্দ্রাদি দেবতাগণ ক্ষীণ-পুণ্য হ'লে
মনুষ্য-রূপেও পুনঃ পড়ে ভূমণ্ডলে।
মনুষ্যের রূপ পুনঃ বর্জ্জন করিয়া
জন্ম লয় পশু কীট পতঙ্গ হইয়া।

কিন্তু গো জননি ! মণি-কর্ণিকে ! তোমার
সলিলে যাহারা স্নান করে একবার,
তাহাদের পাপ তাপ কিছু নাহি রয়,
সাযুজ্য-লাভেও তারা উপযুক্ত হয়।
কি আশ্চর্য্য ! তাহাদের এক এক জন
কিরীট-কৌস্তুভ-ধারী হয় নারায়ণ !

(৩)

কাশী ধন্যতমা বিমুক্তিনগরী সালঙ্কৃতা গঙ্গয়া
তত্রেয়ং মণিকর্ণিকা সুখকরী মুক্তির্হি তৎকিঙ্করী।
স্বর্লোকস্তুলিতঃ সহৈব বিবুধৈঃ কাশ্যা সমং ব্রহ্মণা
কাশী ক্ষৌণিতলে স্থিতা গুরুতরা স্বর্গো লঘুঃ খে গতঃ ॥

কাশীধাম মুক্তিপুরী এই ভূমণ্ডলে,
গঙ্গাদেবী বিরাজিতা নিত্য যাঁর তলে।
হেন কাশীধামে মণি-কর্ণিকা সতত,
স্বয়ং মুক্তিও যাঁর কিঙ্করীর মত।
দেবতা-সহিত স্বর্গ একদিকে দিয়া,
অন্য দিকে এই কাশীধাম চাপাইয়া,
ওজন করিলা ব্রহ্মা কৌতুহল-বশে,
নিম্নে রন্ কাশী, স্বর্গ গেল উর্দ্ধদেশে !

(৪)

গঙ্গাতীরমনুত্তমং হি সকলং তত্রাপি কাশ্যুত্তমা
তস্যাং সা মণিকর্ণিকোত্তমতমা যত্রেশ্বরো মুক্তিদঃ।
দেবানামপি দুর্লভং স্থলমিদং পাপৌঘনাশক্ষমং
পূর্ব্বোপার্জ্জিতপুণ্যপুঞ্জগমকং পুণ্যৈর্জনৈঃ প্রাপ্যতে ॥

পুণ্যময় গঙ্গাতীর ভবে বিদ্যমান,
তা হ'তেও কাশীধাম পুণ্যময় স্থান।
কাশী হইতেও আছে স্থান পুণ্যময়,
শ্রীমণি-কর্ণিকা নামে যাঁর পরিচয়।
এই স্থানে বসি সেই পরম ঈশ্বর
বিতরণ করিছেন মোক্ষ নিরন্তর

মণি-কর্ণিকার গুণ বর্ণিতে না পারি,
দেবের দুর্লভ ধন, পাপ-নাশ-কারী।
পূর্ব্বজন্মে বহু পুণ্য যার বিদ্যমান,
তারি ভাগ্যে হয় মণি-কর্ণিকায় স্নান!

(৫)

দুঃখাম্ভোনিধিমগ্নজন্তুনিবহাস্তেষাং কথং নিষ্কৃতি-
র্জ্ঞাত্বৈতদ্ধি বিরিঞ্চিনা বিরচিতা বারাণসী শর্ম্মদা।
লোকাঃ স্বর্গমুখাস্ততোঽপি লঘবো ভোগান্তপাতপ্রদাঃ
কাশী মুক্তিপুরী সদা শিবকরী ধর্ম্মার্থকামোত্তরা॥

এই মহা দুঃখময় সংসার-সাগর,
কত শত জীব তাহে মগ্ন নিরন্তর।
কিরূপে এ সব জীব পাইবে নিস্তার,
ইহা ভাবিয়াই ব্রহ্মা ক্ষুব্ধ অনিবার।
বহু চিন্তা করি' তিনি বহু দিন ধরি'
রচিলেন সুখকরী বারাণসী পুরী।
স্বর্গ-আদি চতুর্দ্দশ লোকে স্থিতি যার,
ক্ষীণ-পুণ্য হ'লে হয় পতন তাহার।
কাশী-সম স্থান আর নাহি ভূমণ্ডলে,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ হাতে হাতে ফলে!

(৬

একো বেণুধরো ধরাধরধরঃ শ্রীবৎসভূষাধরঃ
সোঽপ্যেকঃ কিল শঙ্করো বিষধরো গঙ্গাধরোমাধরঃ।
যে মাতর্মণিকর্ণিকে তব জলে মজ্জন্তি তে মানবা
রুদ্রা বা হরয়ো ভবন্তি বহবস্তেষাং বহুত্বং কথম্॥

বংশী-ধারী রন্ সেই একমাত্র হরি,
শ্রীবৎস-লাঞ্ছন তিনি গোবর্দ্ধন-ধারী।
বিষধর রন্ সেই একমাত্র হর,
যিনি গঙ্গাধর পুনঃ যিনি গৌরীধর।
কিন্তু মাগো! জলে মণি-কর্ণিকে! তোমার
করুক যতই লোক স্নান একবার,

তাহাদের প্রত্যেকেই অমনি তখন
হরি কিংবা হর-রূপে দেয় দরশন।
কিসে এত হরি হর দাও জনমিয়া,
তাহার রহস্য মাগো! না পাই ভাবিয়া!

(৭)

ত্বত্তীরে মরণন্তু মঙ্গলকরং দেবৈরপি শ্লাঘ্যতে
শক্রস্তং মনুজং সহস্রনয়নৈর্দ্রষ্টুং সদা তৎপরঃ।
আয়ান্তং সবিতা সহস্রককরৈঃ প্রত্যুদ্গতঃ স্যাৎ সদা
পুণ্যোঽসৌ বৃষগোঽথবা গরুড়গঃ কিং মন্দিরং যাস্যতি॥

যদি মাগো! মৃত্যু হয় তব পুণ্য তীরে,
পরম মঙ্গলময় তাহা এ সংসারে।
স্বয়ং দেবতাগণ এরূপ মরণ
গৌরবের বস্তু বলি' করেন গণন।
হেন মৃত্যু হয় যার, সহস্র নয়নে
তাহাবে হেরিতে ইন্দ্র ব্যস্ত রন্ মনে।
সূর্য্যও তখনি হায় হ'য়ে অগ্রসর
করেন সহস্র করে তার সমাদর।
উৎসুক হইয়া তিনি অমনি তখন
এই চিন্তা লইয়াই ব্যস্ত সদা রন্; —
শিবধামে এই জন বৃষে আরোহিয়া
অথবা বৈকুণ্ঠে যাবে গরুড়ে চাপিয়া?

(৮)

মধ্যাহ্নে মণিকর্ণিকাস্নপনজং পুণ্যং ন বক্তুং ক্ষমঃ
স্বীয়ৈরব্দশতৈশ্চতুর্মুখধরো বেদার্থদীক্ষাগুরুঃ।
যোগাভ্যাসবলেন চন্দ্রশিখরস্তৎপুণ্যপারং গত-
স্ত্বত্তীরে প্রকরোতি সুপ্তপুরুষং নারায়ণং বা শিবম্॥

যে জন মধ্যাহ্নকালে বারেকের তরে
তোমার সলিলে স্নান করে ভক্তিভরে,
তাহার পুণ্যের কথা কে পারে কহিতে,
তার মত ভাগ্যবান্ কে আছে জগতে?

বেদকর্ত্তা বিধাতাও চারি মুখ দিয়া
নিরন্তর নিজ শত বৎসর ধরিয়া
বর্ণন করেন যদি তার পুণ্যচয়,
তথাপি সে পুণ্যকথা শেষ নাহি হয়!
নিজ যৌগাভ্যাস-বলে শঙ্কর তখন
তাহার পুণ্যের কথা করিয়া চিন্তন
তোর তীরে মাগো! সেই নিদ্রিত পুরুষে
হর কিংবা হরি-রূপ দেন অবশেষে!

(৯)

কৃচ্ছ্রৈঃ কোটিশতৈঃ স্বপাপনিধনং যচ্চাশ্বমেধৈঃ ফলং
তৎ সর্ব্বং মণিকর্ণিকাস্নপনজে পুণ্যে প্রবিষ্টং ভবেৎ।
স্নাত্বা স্তোত্রমিদং নরঃ পঠতি চেৎ সংসারপাথোনিধিং
তীর্ত্বা পল্বলবৎ প্রয়াতি সদনং তেজোময়ং ব্রহ্মণঃ॥

শত কোটি কষ্ট সহ্য করি' অবিরল,
বহু অশ্বমেধ যজ্ঞে হয় বা যে ফল,
মণি-কর্ণিকায় স্নানে ফল হয় যত,
তার তুলনায় তাহা নাহি হয় তত।
স্নান করি' মহা ভক্তি-ভরে যেই জন
মণি-কর্ণিকার স্তব করে উচ্চারণ,
এ ভব-সমুদ্র যাহা অপার সতত,
তাহাও সে পার হয় পল্বলের মত!
তাহার ভাগ্যের কথা কি কহিব হায়,
তেজোময় ব্রহ্মলোক সেই জন পায়!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর।

পুনর্জ্জন্ম।

গৌহাটী

৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫ সাল।

ভাই হরিচরণ,

কতকাল পরে তোমায় পত্র লিখ্‌ছি তা' স্মরণ হয় না—বোধ হয় এক যুগ। বিচ্ছেদ ধীরে ধীরে মানুষকে বুঝি এমনি দূরে ফেলিয়া দেয়। তুমি আমাকে নিশ্চয়ই ভুলিয়া গেছ; কেননা out of sight, out of mind হ'চ্ছে দুনিয়ার স্বাভাবিক গতি। তবে চিন্‌তে নিশ্চয়ই পারবে; কেননা এমন একদিন গেছে যে, দুদণ্ডের বিচ্ছেদে আমরা কতই কাতর হয়ে উঠ্‌তুম। সেই এক সঙ্গে খাওয়া দাওয়া, শোয়া বসা, একসঙ্গে কলেজের মাঠে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলা, প্রভৃতি, মনের কোণ থেকে একেবারে মুছিয়া যাবার নয়। আমার কিন্তু কখন কখন তোমার সঙ্গ, তোমার মুখ, তোমার কথা, মাঝে মাঝে নেশার ঘোরের মত জেগে উঠে; অবশ্য মধ্যে মধ্যে বেমালুম ভুলে যাই।

তা'র উপর তুমি এখন বড়লোক, সমাজে প্রতিষ্ঠাপন্ন; সুতরাং এই দরিদ্র স্কুল-মাষ্টারকে আগেকার মত মনে থাক্‌বে কি না, জানি না।

সে যাহা হউক, একটা আশ্চর্য্য রকমের ঘটনা হ'য়েছে এবং যা'র জন্য কতকটা ব্যাকুল হ'য়েই তোমাকে চিঠি লিখ্‌ছি।

মধ্যে কিছু দিন তোমার কথা মনেই ছিল না; কিন্তু দুই দিন পূর্ব্বে হঠাৎ রাত্রিতে তোমাকে স্বপ্ন দেখিলাম। সেই তুমি, পরিষ্কার সুস্পষ্ট ভাবে দেখিলাম, কিন্তু যেন কিছু গম্ভীর। পাঁচ বৎসরের পর হঠাৎ তোমাকে স্বপ্নে দেখিয়া যেমন আনন্দ হইল, তেমনি একটু চিন্তা হইল। মনে করিলাম, শীঘ্রই তোমার সন্ধান লইব বা চিঠি লিখিব। তা'র পর দিন অর্থাৎ পরশ্ব রাত্রিতে, পুনরায় তোমাকে স্বপ্নে দেখিলাম; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! একেবারে কঙ্কালসার, জীর্ণ শীর্ণ কলেবর; দেখিয়া ভয় ও ভাবনা হইল।

কাল রাত্রিতে আবার তোমায় সেইরূপ স্বপ্নে দেখিলাম। তোমার চেহারার আবার পরিবর্ত্তন হ'য়েছে, কিন্তু যেন কিছু শীর্ণ ও ফ্যাকাশে,—পূর্ব্বের সেই স্বচ্ছন্দ-জাত কমকান্তির অভাব।

এ রহস্য বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু মনে হ'চ্ছে যে, নিশ্চয়ই এর মধ্যে কিছু না কিছু রহস্য আছে। যেমনটি ঘটিয়াছে, তেমনটীই লিখিলাম। পত্র পাঠ উত্তর দিয়া নিশ্চিন্ত করিবে।

আশা করি, তুমি, তোমার মাতাঠাকুরাণী, গৃহলক্ষ্মী প্রভৃতি সকলে ভাল আছ। বিপিনও বোধ হয় বড় হ'য়েছে; কিন্তু আমার কথা বোধ হয় তা'র মনেই পড়িবে না।

আর ছেলে পিলে কি হইল ও অন্যান্য সংবাদ দিও।

তোমার কবিত্ব ও সাহিত্য চর্চ্চা কিরূপ চল্‌ছে? আশা করি, বেগগামী নদী-প্রায় দ্রুতগতি।

আমার খবর একইরূপ; কোন নূতনত্ব বা বিশেষত্ব নাই।

তোমার পত্রের প্রতীক্ষায় রহিলাম।' ইতি

তোমারি।

দেবেন।

কলিকাতা

২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫ সাল।

ভাই দেবেন,

আমি আজ সকালে হরিদ্বার হ'তে এখানে এসে পৌঁছিয়া আমার চিরবাঞ্ছিত তোমার মধুমাখা চিঠি পাইলাম। প্রবাস হ'তে গৃহে ফিরার যে আনন্দ, তোমার চিঠিতেও সেই আনন্দ।

তুমি দেখ্‌ছি, আমাকে একটু একটু ভুল বুঝ্‌চ। হিন্দুস্থানীরা যে বলে, মাষ্টার লোক্‌কা আক্কেল লেড়্‌কা লোক লে লেতা হায়, তা দেখ্‌ছি খুব ঠিক। নহিলে তুমি আমার উপর বিস্মৃতির অভিযোগ আরোপ কর্‌তে না।

তুমি আমাকে মধ্যে মধ্যেও ভুল্‌তে পার, কিন্তু আমি তোমাকে কখনই ভুলি নাই, ভুল্‌তে পার্‌ব কি না, তা'ও জানি না। কিন্তু তুমি যে হঠাৎ আমাকে বড়লোক ক'রে দিয়েছ, এতে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। তবে এইটুকু প্রার্থনা করি যে, যদি কখন বড় লোক হ'তে পারি, তবে যেন তোমার মত হৃদয়-বান্ প্রকৃত বড়লোক হ'তে পারি।

যা'ক্ সে সব কথা। আমার জীবন এখন আর কবির জীবন ও নিরবচ্ছিন্ন সুখের সময় নয়; আমার জীবন এখন যেন কতকটা ভাঙ্গাচোরা, আলো আঁধারে হরিষে-বিষাদের মত। বহু ঝড় ঝাপ্টা আমার উপর দিয়ে গিয়াছে, এমন অনেক দিন গেছে, যেদিন হতাশার কুয়াসায় চারিদিক অন্ধকার দেখেছি। চোখের ভিতর যেন বরষার প্লাবন ছুটে যেত। বুকের ভিতর কে যেন মুচড়ে দিয়াছে। বড় দুর্দ্দিন গিয়াছে, বোধ হয় সে সময়ে তোমার সঙ্গ পেলে অনেকটা নির্ভর ক'রে থাক্‌তে পার্‌তাম।

তোমার স্বপ্নের বোধ হয় খানিকটা সার্থকতা আছে; কেননা, এ যাত্রা আমার রক্ষা পাইবার কোন আশাই ছিল না। তবে যে বাঁচিয়াছি, সে বোধ হয়, গুরুকৃপা, পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্যফল বা তোমাদের পুনরায় দেখিতে পাইব বলিয়া।

দুই বৎসর পূর্ব্বে মাতাঠাকুরাণী স্বর্গে গিয়াছেন, স্নেহের পুতুলি বিপিনও কিছুদিন পরে তাঁহারই অনুগমন করিয়াছে!

তবে এ সকলের মধ্যেও কতকটা আনন্দের কারণ আছে ; কেননা, এ সকলের মধ্যেও অনেক দিন শান্তিতে ও আনন্দে কাটাইতে পারিয়াছি, আর বীরের মত যত দূর সম্ভব প্রফুল্ল ভাবে সহ্য করিয়াছি।

তোমার সহিত যে কত কথা আছে, কত কথা যে মনে জাগছে, তা' লিখে প্রকাশ করতে পার্‌ছি না? তুমি কি একবারও এদিকে আস্‌বে না? কেন, তোমার ত গ্রীষ্মের ছুটী পড়িয়াছে? যদি পার ত অন্ততঃ দিন সাতেকের জন্য এদিকে আসিও। কই তুমি ত তোমার নিজের বিষয় বিশেষ কিছু লিখ নাই, কেবল একটা হ য ব র ল করিয়া সারিয়া দিয়াছ। আশা করি, একটু বিস্তারিত খবর দিয়া সুখী করিবে। আজ বড় ক্লান্ত, সুতরাং বিদায় --পর পত্রে বিস্তারিত সংবাদ দিবার চেষ্টা করিব। ইতি—

তোমারি

হরিচরণ।

গৌহাটী,

২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫ সাল।

ভাই হরিচরণ,

তোমার হাতের লেখা চিঠি পেয়ে কতদূর পর্য্যন্ত সুস্থ বোধ করলাম, তা বলতে পারি না ; কিন্তু তোমার নানাবিধ বিপদের কথা শুনিয়া তেমনই কষ্ট বোধ করিতেছি। তোমার যে এমন কঠিন পীড়া, এত বিপদ, মাতাঠাকুরাণীর গঙ্গালাভ ও বিপিনের অকাল বিদায়--- এ সকল মর্ম্মভেদী ঘটনার কথা একবারও কি ঘুণাক্ষরে জানাতে পারতে না? এতে আমার দুঃখ ও কষ্টের সঙ্গে অভিমানও হ'চ্ছে।

যাক্ এ সব কথা, আমি শীঘ্রই কলিকাতায় যাইব ইচ্ছা করিয়াছি। সাক্ষাতে সব কথা হইবে ও শুনিব।

তবে ইতিমধ্যে তোমার বিস্তারিত বিবরণ পাইলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইব।

আমার নিজের বিশেষ কিছু খবর নাই, সুতরাং কি আর লিখিব? ইতি—

তোমারই

দেবেন।

কলিকাতা,

৭ই আষাঢ়, ১৩১৫ সাল।

ভাই দেবেন,

তোমার চিঠি যথা সময়ে পাইয়াছিলাম, কিন্তু তোমার কথা মত বিস্তারিত বিবরণ পাঠাইতে কিছু বিলম্ব হইয়া গেল ; আশা করি, ত্রুটী মার্জ্জনা করিবে। তোমার নিজের যৎসামান্য সংবাদে কিছুমাত্র তৃপ্তি লাভ করিলাম না। তোমার খবর একটু বিশদভাবে লিখিলে কি কিছু ক্ষতি ছিল?

তোমার দুঃখ ও অভিমানের কথা লিখিয়াছ, এবং তা, সম্ভব ও স্বাভাবিক; কিন্তু সেই সঙ্গে আমারও কি দুঃখ বা অভিমান হইতে নাই? আমি পীড়িত, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও মৃতপ্রায়; সুতরাং আমার পত্র না লিখিবার পক্ষে একটা যুক্তি-সঙ্গত কৈফিয়ৎ আছে, কিন্তু কই তুমি ত একবারও কোন খোঁজ লও নাই।

আমার বিষয় যা, জান্‌তে চেয়েছ, তা যতটা সম্ভব আনুপূর্ব্বিক লিখিলাম। আশা করি, এখনকার মত তোমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট হইবে। আর যদি কিছু জান্‌তে চাও, তাহা হইলে পর পত্রে সে সকল বিষয় লিখিব।

১—ভাগ্যচক্র।

বহু-সুকৃতি-বলে সদ্‌গুরু লাভ হইয়াছিল। এস্থলে গুরুদেবের নামোল্লেখ বা পরিচয়ের কোন প্রয়োজন নাই, তবে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তিনি হিন্দুস্থানের একজন প্রখ্যাতনামা সাধু; হিন্দুস্থানের অনেকেই তাঁহার নাম শুনিয়াছেন, অনেকেই তাঁহাকে দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব যে, এই সদ্‌গুরু লাভের জন্য আমার সুহৃদ্ সারদার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ; কেবল তাহারই চেষ্টায় এই পুণ্যবন্ধনের যোগাযোগ ঘটিয়াছিল। গুরুভাইগণের মধ্যে সারদাকে সকলেই শ্রদ্ধা করিতাম; কেন না সে সর্ব্ববিষয়েই আমাদের অপেক্ষা উন্নত, তাহার অন্তর্দৃষ্টি আমাদিগকে বিস্মিত করিত, বুদ্ধির প্রাখর্য্যে বিচার-শক্তি ও শাস্ত্রব্যাখ্যায় মোহিত করিয়া দিত। সে গুরুদেবের বড়ই প্রিয়পাত্র।

সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখ প্রায়ই দেখা যায় না। আনন্দের হিল্লোলের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অবসাদের বরষা নামিয়া প'ড়ল। বিপদ নানামুখী হইয়া, ধীরে ধীরে চারিদিক হইতে ঘেরিয়া তুলিল; হতাশ ভাবে বুঝিলাম,—শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি!

এক বৎসরের মধ্যে সর্ব্ব-সন্তাপহারিণী মাতাঠাকুরাণী ও স্নেহের বন্ধন, নয়নতারা জ্যেষ্ঠ পুত্রটীকে নয়ন-জলে অগ্নি-সৎকার করিয়া আসিতে হইল!

কিছু কাল পরেই, উপসর্গ-সমেত প্রবল বহুমূত্র রোগের সূত্রপাতে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। কর্ম্মস্থান হইতে দীর্ঘ অবকাশ লইলাম। এদিকে সংসার-যাত্রা দুর্ঘট হইয়া উঠিল। সাধ্য-মত চিকিৎসার ক্রটী করি নাই; কিন্তু প্রতিকূল দৈব দেখিয়া বেশ বুঝিতে লাগিলাম, যে, এ যাত্রা হয় অকাল মৃত্যু, কিম্বা যদি কোনরূপে বাঁচিয়া থাকি, ত সে জীবন্মৃতবৎ, অর্থশূন্য, স্বাস্থ্য-সুখ-শান্তি বিহীন, গুরুভারযুক্ত বিড়ম্বনাময় জীবন।

এমন সময় খবর পাইলাম, ৺ পূজার পরই কার্ত্তিক মাসে, গুরুদেব কলিকাতায় আসিবেন। আবার আশা জাগিল, নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

স্থির করিলাম, পায়ে হাতে ধরিয়া, যেরূপে হউক তাঁর করুণা সঞ্চার করাইয়া, একটা বিহিত করাইয়া লইব। তিনি মহাপুরুষ, তাঁ'র সম্বন্ধে কত কথা, কত ঘটনা লোকমুখে শুনিয়াছি, তিনি কৃপা করিলে, একবার আশীর্ব্বাদ করিলে, সকল বিপদ কাটিয়া যাইবে।

আবার আশায় বুক বাঁধিলাম,—বড় আনন্দে, ঔৎসুক্যে শুভ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় ব্যাকুলভাবে চাহিয়া রহিলাম। প্রাণের মায়া বড় মায়া!

২—আশা ভঙ্গ।

দিনান্তের ধূসরছায়ার মত, জরা ধীরে ধীরে, সমস্ত দেহ মনকে ঢাকিয়া ফেলিতে লাগিল। আঁধার ঘনাইয়া আসিলে, গৃহস্থবধূ শঙ্খধ্বনির সহিত দীপ জ্বালাইয়া দেয়, কিন্তু আমার এই জীবন-শেষের চিরঅন্ধকারের আগমনে, কে শঙ্খধ্বনি দিয়া দীপ জ্বালাইবে? যদি কিছু জ্বলে, ত সে অতৃপ্ত হৃদয়ের তীব্র জ্বালা, কিম্বা সচন্দন ঘৃতসমেত চিতাকাষ্ঠ।

গুরুদেবের আগমনসংবাদ পাইবা মাত্রই, একখানি ঠিকা গাড়ী করিয়া তাঁহার সমীপে উপনীত হইলাম। গাড়ীটীও আমার মত—তা'র মৃদুমন্থর গতি, প্রবল ঝাঁকনিতে বুঝিলাম যে, সেও হয়ত আমারই মত কোন দিন মধ্য পথে চাকা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া থাকিবে!

অনেকগুলি লোক গুরুদেবকে ঘেরিয়া বসিয়া আছেন। প্রাণ ভরিয়া, অতৃপ্ত হৃদয়ে, সেই প্রশান্ত সৌম্য মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলাম। রঙ্গমঞ্চে সুন্দর দৃশ্য দেখিলে, দ্রষ্টা যেমন কিয়ৎক্ষণ আপনাকে ভুলিয়া তন্ময় হইয়া যায়, তেমনই বিভোর হইয়া দেখিলাম। তা'র পর সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া, পাদু'টীকে মস্তকে ছোঁয়াইয়া রাখিলাম; মনে হইল, যেন সমস্ত শরীর জুড়াইয়া যাইতেছে।

তিনি মস্তকে হাত বুলাইয়া সস্নেহে কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগ্ন হৃদয়ের সমস্ত দুঃখ-কাহিনী, স্বাস্থ্যভঙ্গ, দুশ্চিন্তা, অর্থাভাব, সকল কথাই বলিলাম।

শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া উদাসভাবে বলিলেন, "সংসারের গতিই এই।"

কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা! বহুদিন হ'তে আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিব বলিয়া বড় আশায় রহিয়াছি; একটা কিছু বিহিত করুন।" শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, না রাম না গঙ্গা! আসামী যেমন হাকিমের রায়ের প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে তেমনই উৎকণ্ঠিত ভাবে আমি বসিয়া রহিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে পূর্ব্ববৎ নীরস ভাবে বলিলেন, "শরীরং ক্ষণবিধ্বংসি। শরীরের জন্য ব্যাকুল হইয়া কি করিবে? যাঁহার কৃপায় সর্ব্বসন্তাপ দূর হয়, তাঁহাকে ভুলিও না।" পুনরায় বলিলাম, "বাবা! আমি আপনাদের মত নির্ম্মলহৃদয় ভগবদ্‌বিশ্বাসী নই, তাই এত ব্যাকুল হ'য়েছি।"

কোন উত্তর দিলেন না, নিজমনে গুণ গুণ করিয়া ভজন গাহিতে লাগিলেন।

আমার হইয়া ভবানী বলিল, "ও বড় বিপদ্‌গ্রস্ত, আপনি দয়া করিলেই সব দুঃখ কাটিয়া যাইবে।"

বলিলেন, "তোমরা বড় ভুল কর,—ভগবান্‌কে মানুষ বানাও, আর মানুষকে ভগবান্ মনে কর, এ ভুল তোমাদের যাবে না দেখ্‌ছি।"

সকলে বলিল, "আপনিই আমাদের ভগবান্; আমরা আপনাকে ও ভগবান্‌কে পৃথক্ মনে করি না। আপনি মনে করিলে কি না হ'তে পারে?"

বলিলেন, "সে ত ভাল কথা,' গুরু ও ভগবান্‌কে সতা অভিন্ন ভাবা বড়ই পুণ্যের কথা; কিন্তু গুরু কখনই ভগবান্ নহেন, গুরু তাঁহার দ্বারের প্রতিহারী মাত্র।"

ভবানী পুনরায় বলিল, "কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, আপনার কৃপা হইলে, অসাধ্য সাধন হইতে পারে।"

এ সম্বন্ধে কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "সংসার ভোগভূমি। এখানে প্রত্যেকে তাহার কর্ম্মভোগ করিতে আসিয়াছে, আর ভোগ করিয়া চলিয়া যাইবে। তুমি, আমি কি করিতে পারি?"

ভবানী। তবে পরিণাম—

গুরু। অনিত্যই পরিণামী, নিত্যবস্তুর পরিণাম নাই।

বড় আশা করিয়া আসিয়াছিলাম, সে আশায় ছাই পড়িল। তিনি এ সমস্ত শারীরিক ও আর্থিক ব্যাপারে কোনই মনোযোগ করিলেন না, দেখিয়া, পুনরায় পাদু'টী জড়াইয়া ধরিলাম। রুদ্ধ হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আবেগে কথা কহিতে পারিলাম না, কেবল চক্ষুজলে তাঁহার চরণ ও বসিবার আসন ভিজাইয়া দিলাম।

এবার একটু নরম ভাবে বলিলেন, "নেশার ঘোর এখনও কাটিল না, এখনও মাণিক ফেলে কাঁচ ধর্‌ছ। এখনও এই অর্থ ও দেহের জন্য কাতর হ'চ্ছ; কিন্তু যে দিন চক্ষু ফুটবে, সে দিন দেখ্‌বে যে, এই কাতরতা ও ব্যাকুলতা, একটা নেশার ঘোর, রোগের প্রলাপ মাত্র। দেখ্‌বে, মাটীর ঢেলা ও সোণার তাল উভয়ের বিশেষ পার্থক্য নাই। যে দেহের জন্য এত কষ্ট হ'চ্ছে, তখন দেখ্‌বে, দিনান্তে বস্ত্রত্যাগের ন্যায় কতবার এইরূপ দেহবাস ছাড়িতে ও পরিতে হইবে।

"এই সংসার-সমুদ্র বড়ই কঠিন, কখন কুয়াসায় দিগ্‌ভ্রম করাইবে, কখনও ঝড়ে বা তুফানে হাবুডুবু খাওয়াইবে; চিরকাল ধরিয়া সকলের পক্ষে এই একই নিয়ম। সেই পাকা মাঝির উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিও, দেখিবে,—সব ঝড় ঝাপ্‌টা কাটিয়া যাইবে।

"চিন্তামণির শরণ লও, সব চিন্তা দূর হইবে; ভাবময়কে ধরিয়া থাকো, সমস্ত অভাব ঘুচিয়া যাইবে।"

বিশেষ আশা নাই দেখিয়া প্রণাম করিয়া হতাশ চিত্তে বাড়ী ফিরিলাম। তখনও এক আশা ছিল যে, দু'চারি দিনের মধ্যেই সারদা আসিয়া পৌঁছিবে। সারদা গুরুজীর বড়ই প্রিয়পাত্র। যদি তাহার সুপারিশে কিছু হয়?

সারদাও আসিল, কিন্তু অদৃষ্ট প্রতিকূল। দমকা ঝড়ে যেমন হঠাৎ নৌকা উল্টাইয়া দেয়, তেমনই অভাবনায় ঘটনাচক্রে সারদার সাহায্যও মিলিল না।

সারদা আসিয়া যেই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, অমনই গুরুদেব তাহাকে বিরাশী সিকা ওজনে দুই প্রকাণ্ড চাপড় কশাইয়া উত্তেজিত ভাবে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "নরাধম প্রবঞ্চক, তুই এতদিন আমার চোখে ধূলা দিয়ে সাধু সেজেছিলি? দূর হ' এখান হ'তে!"

আমরা স্তম্ভিত! সারদা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়!

পুনরায় গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "তুই এরূপ ভণ্ড, এরূপ নরাধম, আমি স্বপ্নেও ভাবি নি? তোর মুখদর্শনও কোরতে চাই না।" আমরা সভয়ে ও বিস্ময়ে অনুরোধ করিলাম, "যদি কোন অপরাধ ক'রে থাকে ত ক্ষমা করুন।"

"ক্ষমা আমি সেই দণ্ডেই ক'রেছি, তবে ওকে কেন তাড়িয়ে দিচ্ছি। এখানে আস্‌বার পূর্ব্বে হঠাৎ একদিন সারদার কথা মনে হ'ল, তা'র পরে দেখি যে, লম্পট বেশ্যালয়ে ব'সে নির্লজ্জ আমোদে লিপ্ত!"

অনুতপ্ত সারদা, অশ্রুজলে ভিজিয়া, পায়ে ধরিয়া, ক্ষমা চাহিয়া, বলিল, "ক্ষমা করুন গুরুদেব! পাপী আমি দুর্ব্বল চিত্ত, সামান্য মানুষ আমি, ক্ষণিক মোহের প্রলোভনে পথভ্রষ্ট হইয়াছিলাম!"

গুরু। তা'র জন্যে ত বিশেষ আশ্চর্য্য নই; কেন না সাধারণ মানুষ চঞ্চল চিত্ত, পদস্খলন হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কই তোর অনুতাপ হয় নি, ফিরিবার ত চেষ্টাও করিস নি! দিব্য ভাল মানুষ ও ভক্ত সেজে অম্লান বদনে হাসিমুখে এখানে এসেছিস্? মনে করেছিলি বুঝি, ডুবে জল খেলে শিবের বাবাও টের পাবে না! লাম্পট্য তত দোষের নয়, যত এই প্রতারণা ও ভণ্ডামি।"

সারদার দ্বারা সুপারিসের আশা ঘুচিয়া গেল, কেন না তা'র অবস্থা তখন "physician heal thyself."

আশার ক্ষীণ রশ্মিটুকু নিভিয়া যাওয়াতে বুঝিলাম যে, ক্রমাগত জ্ঞান চর্চ্চা করিয়া কিম্বা কঠোর বৈরাগ্যে সাধু-হৃদয় বুঝি বা এমনই শুষ্ক, নির্ম্মম হইয়া যায়।

তাঁহার প্রস্থানের দিন পুনরায় প্রণাম করিয়া পদধূলি লইতে যাইয়া দেখি,—যেন একটু কাতর; আমি যাইতেই হাত ধরিয়া বলিলেন, "বাবা! আমি কোন কথা বলাম না ব'লে, মনে একটু ক্লেশ হ'য়েছে বোধ হয়। কিন্তু কি করব বল? কুশিক্ষা ত দিতে পারি না। যাঁ'র আভাস তোমাকে জানাইয়াছি, যাঁ'র নিকট তুমি আমি, পাপী তাপী, সব সমান, কায়মনোবাক্যে তাঁ'র শরণ লও; দেখিবে, মঙ্গলময় ঠিক মঙ্গলময় পথে লইয়া যাইতেছেন তবে এইটুকু জানিও যে, একদিনের জন্যও তোমাকে ভুলি নাই, নিত্য তোমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া আশীর্ব্বাদ করি। এ দীনের আশীর্ব্বাদে যদি কোন ফল থাকে, ত অবশ্য ফলিবে।"

কৃতজ্ঞতায় মস্তক অবনত করিয়া, পদধূলি শিরে তুলিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলাম। ভাবিলাম — অভাগা যে দিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়।

৩ — বন্দী।

প্রতি বৎসরই গ্রীষ্মকালে, দাহ, তৃষ্ণা, অনিদ্রা, দেহের কৃশতা ও বিবর্ণতাসহ রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু এবার চৈত্রমাস যাইতে না যাইতেই, রোগ এরূপ প্রবলভাবে বৃদ্ধি পাইল যে, সকলেই আশঙ্কা করিলেন, "না জানে নাম না জানে ঠিকানা, ওহি দেশমে জানার" বিশেষ বিলম্ব নাই। তাহার উপর নানা দুশ্চিন্তা, পরিবারবর্গের ভবিষ্যৎ ও অর্থকষ্টে আরও বিব্রত করিয়া তুলিল। এমন সময়ে গুরুদেবের নিকট হইতে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রাপ্ত হইলাম।—

"বাবা চরণ দাস,

শুনিলাম, তুমি বড় পীড়িত। অবশ্য তাহার জন্য শোচনা করিয়া লাভ নাই ; কেননা নারায়ণের ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। আমি বৈশাখ যাবৎ হরিদ্বারে যাপন করিব, মনে করিয়াছি। স্থানটী পবিত্র, মনোরম ও নির্জ্জন ; তোমার পক্ষে স্বাস্থ্যকর ও শান্তিপ্রদ হইতে পারে। আর আমি নিকটে থাকিলে হয়ত তোমার কতকটা কষ্টের লাঘব ও রোগের উপশম হইতে পারে। তুমি যদি ভাল বুঝ এবং নারায়ণ যদি কৃপা করেন, তাহা হইলে যত শীঘ্র পার চলিয়া আসিবে। ছেলেদের, ও মা লক্ষ্মীকে ও অন্যান্য সকলকে আশীর্ব্বাদ জানাইবে। এখানে তোমার অসুবিধা ঘটিবার কোন কারণ নাই, কেন না স্থান যথেষ্ট। ইতি—

চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও আশীর্ব্বাদক, —শ্রী——"

যদিও আমার নাম হরিচরণ, কিন্তু কি জানি কেন তিনি আমাকে চরণ দাস বলিয়া ডাকিতেন। সূর্য্য-উপাসক যেমন দারুণ দুর্যোগের মধ্যে একবার চকোসা দেখিলে আনন্দে উৎফুল্ল হয়, তেমনই এই স্নেহময় পত্রখানি পাইয়া আরোগ্য বা উপশমের অথবা শান্তিময় অবসানের ক্ষীণরশ্মির সম্ভাবনা দেখিয়া আনন্দ আসিল।

একবার, দুইবার, তিনবার ধরিয়া চিঠিখানি ভাল করিয়া পড়িয়া মাথায় ধরিলাম—চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল। কিন্তু কি করিয়া তিনি আমার রোগ বৃদ্ধির কথা শুনিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

বাড়ীর ও অপর সকলে কিন্তু এরূপ অবস্থায় একা যাওয়া নিষেধ করিলেন ; কাজেই হরিদ্বারে টেলিগ্রাম করিলাম, সঙ্গে পরিবারবর্গ বা অপর কেহ যাইবে কিনা? টেলিগ্রামে উত্তর দিলেন, "একাই আসিও।"

যথা সময়ে শুভদিন দেখিয়া যাত্রা করিলাম। গাড়ী যখন জাহ্নবীবক্ষে পুলের উপর আসিল, মনে হইল—বুঝি বা এই শেষ যাত্রা — কলিকাতা হইতে জনমের মত বিদায়! উদ্দেশে গঙ্গাদেবীকে জানাইলাম যে, মা যদিও তোমার কূল ছাড়িয়া যাইতেছি, তবু

তোমারই কোলে পৌছিব! মা দেখিও, প্রবাসে দৈবের বশে জীবনতারা যদি খসে, তবে যেন তোমারই শান্তিময় ক্রোড়ে চিরবাঞ্ছিত শান্তি লাভ করিতে পারি।

গুরুদেব শারীরিক অবস্থা দেখিয়া দুঃখিত হইলেন এবং সযত্নে আশ্রমে লইয়া গিয়া থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

এবার তাঁহার আচরণ ও ব্যবহারের কেমলতা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। আমার থাকিবার সম্বন্ধে ব্যবস্থা যেমন কঠোর, সেবা শুশ্রূষা প্রভৃতি তেমনই কোমলতা, যত্ন ও ব্যগ্রতার সহিত পরিচালিত।

১। নিয়ম করিলেন, নির্দ্দিষ্ট ক্ষুদ্র কক্ষে বন্দী ভাবে থাকিতে হইবে, কেবল একবার মাত্র প্রাতঃকালে নদীতে স্নানের জন্য বাহির্গত হইতে পারা যাইবে। আর আবশ্যক হইলে ছাদে উঠিয়া পদচারণা করা চলিবে।

২। প্রাতে ও সায়াহ্নে চণ্ডীপাঠ করিতে হইবে এবং কেবল মাত্র গায়ত্রী জপ; —এতদ্ব্যতীত সমস্ত ক্রিয়া কর্ম্ম, জপ, তপঃ বন্ধ।

৩। গুরুদেব ব্যতীত কাহারও সহিত বাক্যালাপ নিষেধ; সম্পূর্ণরূপে মৌনী থাকিতে হইবে। বিশেষ কষ্ট হইলে মধ্যে মধ্যে তানপুরার সহযোগে স্তোত্র বা ভজন পাঠ করা যাইতে পারে।

৪ মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যার পর নারায়ণের ভোগ প্রসাদ হইবে।

দেখিলাম, ব্যবস্থামত আমি সম্পূর্ণ বন্দী। নিজের কোন স্বাধীনতা, স্বাধীন ইচ্ছা বা যথেচ্ছ গতিবিধি বা কথাবার্ত্তা চলিবে না। বড় আশা করিয়া আসিয়াছিলাম যে,মধ্যে মধ্যে হিমালয়ের অনন্ত শোভা, যাত্রীর যাতায়াত, নদীতটে পূজা-নিরত স্নানার্থীর স্তোত্র পাঠ প্রভৃতি দেখিয়া শুনিয়া, সাধুসঙ্গ করিয়া এদিক ওদিক আনন্দে বিচরণ করিয়া দিন কাটাইব। ভগবান্ যদি বল দেন, তবে কনখল, হৃষীকেশ ও লছমন ঝোলা প্রভৃতি বেড়াইয়া আসিব। কিন্তু ব্যবস্থা তা'র সম্পূর্ণ বিপরীত।

আশ্রম—রাজপথ, অন্যান্য মঠ ও স্নানের ঘাট হইতে দূরে এবং অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন।

কিন্তু গুরুদেবের আচরণ অত্যন্ত বিস্ময়কর; স্নেহময়ী জননী যেমন একমাত্র পুত্রের রোগাশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া দিবা রাত্রি পরিচর্য্যা করেন, তেমনই সযত্নে সমস্ত বন্দোবস্ত, শুশ্রূষা ও আনন্দ প্রসাদের ব্যবস্থা করিলেন। নির্ম্মম উদাসীনের এই রমণীসুলভ পরিবর্ত্তন সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের কারণ।

দিন আসিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। সেই এক ঘেয়ে-জীবন, ক্ষুদ্র কক্ষে বন্দী, স্তোত্র পাঠ ও প্রসাদ ভোজন। পার্শ্ববাহিনী পুরাতনী পুণ্যতোয়া সুরধুনির, দূরাগত মন্ত্রধ্বনিবৎ অবিরাম কুল কুল ধ্বনি। কখন শুভ্র সৌরকিরণ, তরঙ্গায়িত পর্ব্বতমালা, দূর-বনানীর শ্যামল শোভা, ধ্বজপতাকা সমন্বিত মন্দির চূড়া, পার্ব্বত্য গ্রাম ও হরিৎ ক্ষেত্র-রাজি, এবং বহু ঊর্দ্ধস্থিত শ্বেতশ্মশ্রু জটাজূটসমন্বিত সৌম্য ঋষির ন্যায়, তুষার-কিরীটী

সনাতন হিমগিরি যেন যতটা সম্ভব, ক্ষুদ্র বাতায়ন দ্বার দিয়া আমার দুই চক্ষুর উপর পড়িয়া দৃষ্টিশক্তিকে বিহ্বল করিয়া তুলিত; আবার কখন আমারই ক্ষুদ্র চক্ষুতারকা দু'টি ক্ষুদ্র কক্ষ, বাতায়ন, নগর, নদী ছাড়াইয়া উর্দ্ধে পর্ব্বত শৃঙ্গে, আকাশ নিম্নে, দূরে চক্রবাল-রেখায় যেখানে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, শ্বেত, পীত, নীল, হরিত, নানাবর্ণে ও বৈচিত্র্যে পরীরাজ্যের বর্ণিত উদ্যানের মত জীবন্ত প্রকৃতির খেলা চলিতেছে, সেখানে যাইয়া আত্মহারা হইয়া পড়িত।

ঊষার আলোকে যখন তুষাররাশি ও বনানীশীর্ষ অরুণ রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিত এবং তাহারই এক কণা বিশ্বজাগরণের বার্ত্তারূপে, বিশ্ব-আনন্দদায়ীভাবে, রন্ধ্রপথ দিয়া আমার ক্ষুদ্র কক্ষ পুলকিত ও অনুরাগ-সলজ্জবৎ রক্তিম আভা ফুটাইয়া দিত, সেই মুহূর্ত্তেই আমারও ক্ষুদ্র হৃদয়-কক্ষটি নবীন আলোকে আলোকিত, একটা অজানা আশায় পুলকিত হইত। তখন স্নানের জন্য ক্ষণিক মুক্তি; সে অবগাহন প্রাতস্নানে, কি আনন্দ, কি স্নিগ্ধতা মাখাইয়া দিত, তাহা ভাষায় বলিতে পারি না।

এই দেব-দানব-যক্ষ-কিন্নর-বাঞ্ছিত, প্রশান্ত ও বিরাট হিমগিরি-পাদমূল-উচ্ছ্বসিত, এ দারুণ গ্রীষ্মেও হিমকর-সিক্ত সুখশীতল পুণ্য সলিলে, পুরাণ-কথিত স্বর্গ-মর্ত্ত্যের সন্ধিস্থলে, নবীন প্রভাতের আলো আঁধারের জাগরণ বিদায়ের সঙ্গম মুহূর্ত্তে অবগাহন যে কি সুন্দর ও প্রীতিপ্রদ, তা' বলিতে পারি না।

দেবীর মর্ত্ত্যে আগমনের পর হইতে সেই সনাতন কাল হইতে, যুগযুগান্তর ধরিয়া কত সাধু অসাধুর যে এই ভাবে এই স্থানে এই "সুখদা মোক্ষদা" "গাঙ্গং বারি মনোহারির" কৃপায় পাতক ও দুঃখ সন্থ বিনিষ্ট হইতেছে তা কে বলিতে পারে?

তার পর মধ্যাহ্নে যখন জীব-কাকলী স্তব্ধ ও সারা প্রকৃতি অলস-বিবশ হইয়া পড়িত ও সঙ্গে সঙ্গে কি যেন একটা অজানা নির্জ্জনতায় বিষাদমুখর হইয়া উঠিত, তখন হয়ত কতকটা আচ্ছন্নের মত আত্মহারা হইতাম, কিম্বা ছাদে উঠিয়া কিয়ৎক্ষণ পদচারণা বা দূরদূরান্তের একঘেয়ে দৃশ্য দেখিয়া পুনরায় নামিয়া আসিতাম।

কিন্তু যখন অপরাহ্নে ধরণীবক্ষ হইতে সমস্ত তেজ ও আলোক রাশি মুছিয়া যাইবার উপক্রম হইত এবং ছায়ারাজি দীর্ঘ ও দীর্ঘতর হইতে থাকিত, তখন কিছুতেই গৃহমধ্যে স্থির থাকিতে পারিতাম না। তখন তানপুরাটী হাতে লইয়া, ছাদে উঠিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া ভজন গাহিতাম বা অনন্ত-নীল-ভূধর-অঙ্কশায়িত নক্ষত্র-খচিত অনন্ত নীল আকাশের পানে অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিতাম। সেই বিরাট প্রকৃতির পদতলে বসিয়া বসিয়া মনোমধ্যে কতই যে খেলা, কত যে তরঙ্গ, আনন্দ, উৎসাহ, অবসাদ ও ক্ষণিক ফুল্লতার ঢেউ বহিয়া যাইত, তাহার সংখ্যা বা ইয়ত্তা ছিল না।

কখন কখন এই সময় গুরুদেবও ছাদে আসিতেন, কত কথা, উপদেশ ও আনন্দ দিতেন; কিন্তু লক্ষ্য করিতাম যে, তাঁ'র প্রায়ই সমস্ত উপদেশ জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে

বা চিত্তস্থির ও নির্ভরতা সম্বন্ধে। শারীরিক অবসাদের সহিত তাঁর উপদেশ গুলি মিলাইয়া দেখিলে বেশ বোধ হইত, যেন আমাকে ধীরে ধীরে বীরের ন্যায় মৃত্যুর ক্রোড় আলিঙ্গন করাইবার জন্য প্রস্তুত করিতেছেন।

এক এক সময় মনে সাহস ও বল পাইতাম ও প্রকৃত বৈরাগ্য জাগিত। তখন ভাবিতাম, কিসের দেহ, কিসের দুঃখ ? বেশ আনন্দের সহিত মরণের জন্য প্রস্তুত হইতাম। কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভাবনা, অশান্তি এবং নিজের ও সংসারের ভবিষ্যৎচিন্তা আসিয়া সমস্ত মনটীকে জুড়িয়া বসিত। কখন কখন কে যেন অজ্ঞাতসারে বুকখানাকে নিঙড়াইয়া ও মোচড়াইয়া তার রসটুকুকে চক্ষু হইতে বাহির করিয়া আবার বুকের উপর ঢালিয়া দিত।

মোটের উপর দুইটী ভাবের খেলা চলিত ; একটি আলো, আনন্দ,উৎসাহ ও সঞ্জীবতার— আর একটী আঁধার, অবসাদ ও নির্জ্জনতার। ক্ষুদ্র আমি নির্জ্জীব, ক্ষীণদেহ, মরণোন্মুখ আমি কখনও এই অবসাদের ঘোরে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতাম। আবার যখন জাহ্নবীনীরে বিপুলস্নেহ, শুভ্র সৌরকরে ও ফুল্ল জোছনায় দীপক বা ললিত রাগিণী ঝঙ্কার দিয়া উঠিত, তখনই একটা সঞ্জীবতা, ভরসা বা আরোগ্যের ক্ষীণ সূত্র কল্পনা করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিতাম।

আশ্রমে, রাজপথে, মন্দিরে, প্রাঙ্গনে ও নদীতটে কত লোক আসিত যাইত, বসিত, গল্প করিত, আনন্দ ও সুখ-দুঃখের কথা কহিত ; আর আমি বন্দী মৌনী, ও মুমূর্ষু, চুপ করিয়া তাহাদের দেখিতাম বা দূর হইতে তাহাদের আলাপ শুনিতাম

কিন্তু শরীরের অবস্থা দিনে দিনে এরূপ ক্ষীণ হইতে লাগিল যে, বেশ বুঝিতে পারিতাম,—যে দিন এই ক্ষুদ্র গৃহ হইতে মুক্তি পাইব, সেদিন বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গেই চিরমুক্তিও ঘটিবে। তবে কবির মত মধ্যে মধ্যে নিজেরই মধ্যে প্রশ্ন উঠিত "তারা কোন্ অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে, রাখিলে গো মোরে ?"

৮— মুক্তি।

সেদিন বৈশাখী পূর্ণিমা। সেদিন কত দূর দূরান্তর হইতে স্নানার্থী আসিয়া এই ক্ষুদ্র নগরকে মহাকল্লোলময় করিয়া তুলিয়াছিল। সমস্ত দিন লোকের ভিড় ও গোল, সাধু ও গৃহীর স্নান, ভিক্ষা, দান, চীৎকার, জুয়াচুরী, বুজরুকী ও কত কি ঘটিয়া সন্ধ্যার পর আবার নির্জ্জন হইয়া পড়িতে লাগিল।

কত রাত্রি ঠিক স্মরণ হয় না, তবে বোধ হয় আন্দাজ ১১টা হইবে। বিছানায় শুইয়া কত কি আকাশ পাতাল ভাবিতেছি, নিদ্রা হয় নাই। হঠাৎ গুরুদেব বাহির হইতে ডাকিলেন "চরণদাস"।

একটু বিস্ময় বোধ হইল, কেননা এ সময়ে তিনি প্রায় ডাকিতেন না। আমার সাড়া পাইয়া বলিলেন "বুঝাওনি, বেশ হইয়াছে ; তোমাকে একটা কাজ করিতে হইবে, প্রস্তুত থাক। আমি শীঘ্রই স্নানের ঘাট হইতে আসিতেছি।"

একটা কৌতূহল জাগিল। ছাদ হইতে স্নানের ঘাট বেশ দেখা যায় বলিয়া, ধীরে ধীরে ছাদে উঠিলাম।

নদীর দিকে যতদূর দৃষ্টিপাত হয়, কোথাও জনমানব নাই; কেবল দুই ব্যক্তি জাহ্নবী-বারি উচ্ছ্বসিত করিয়া, মহা আনন্দে ও স্ফূর্ত্তিতে গল্প করিতে করিতে স্নান করিতেছে এবং ঘাটের উপর কে একজন দাঁড়াইয়া—অনুমানে বোধ হইল গুরুদেব।

বহুক্ষণ পরে স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক উপরে উঠিলে, গুরুদেব গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহাদের বন্দনা করিলেন, এবং তাঁহারা যেন স্নেহভরে গুরুদেবকে আলিঙ্গন করিয়া বক্ষমধ্যে ধরিলেন। দূর হইতে বোধ হইল, অপরিচিত দুইজন প্রৌঢ় ও তেজঃপুঞ্জ-কলেবর কৌপীন-ধারী।

গুরুদেবকে ইহার পূর্ব্বে কখনও কাহাকে এরূপ ভাবে গললগ্নীকৃতবাসে বন্দনা করিতে দেখি নাই। এত বড় ভারত-প্রসিদ্ধ সাধু, যাঁহার নিকট দেশ বিদেশ হইতে বহু গৈরিক ও দণ্ডকমণ্ডলুধারী আসিয়া কৃতার্থ বোধ করেন, তাঁহার এরূপ বালকের ন্যায় নতমস্তক দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম।

গুরুদেব তাঁহাদের সসম্ভ্রমে আশ্রমে আনয়ন করিয়া আমাকে ডাকিলেন।

নিকটে আসিয়া দেখিলাম কি সৌম্য প্রশান্ত মূর্ত্তি, কি তেজঃপুঞ্জ কলেবর! দেখিবা-মাত্রই কি যেন একটা অজানাভাবে ভয় ও ভক্তির সঞ্চার হয়—অথচ যেন কোমলতা-মাখা আগাগোড়া অনুকম্পায় পূর্ণ! সেই দীর্ঘ দেহ, দীর্ঘ কেশ ও প্রকাণ্ড দাড়ীর মধ্যে যে এতটা স্নেহ থাকিতে পারে, তা' পূর্ব্বে ধারণাই হইত না।

গুরু। চরণ দাস! ইঁহাদের ভক্তিভাবে প্রণাম কর।

আগন্তুক। এটি কে?

গুরু। এটী আমার ছেলে বা শিষ্য—অত্যন্ত পীড়িত বলিয়া আমার নিকটে আনিয়া রাখিয়াছি।

পূর্ব্ব হইতেই এই অদ্ভুত-চরিত্র আগন্তুকগণের সম্বন্ধে আমার অত্যন্ত ভক্তির উদয় হইয়াছিল; তা' ছাড়া আমার বরাবরই ধারণা যে, সাধু ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে বা ভক্তি-ভাবে তাঁহাদের পদধূলি লইলে শরীর ও মন কৃতার্থ ও পবিত্র হয়। তাই যখন তাঁহাদের সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলাম, তখন যেন সমস্ত শরীর কণ্টকিত ও মন পুলকিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

তা'র পর গুরুদেব করযোড়ে তাঁহাদের বলিলেন, "আজ আমার একটু প্রার্থনা আছে। বহুদিন হইতে আশা করিয়া আছি যে, একবার আশ্রমে আপনাদের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইব। আমার এই শিষ্য চরণদাস ব্রাহ্মণ ও নিষ্ঠাচার-সম্পন্ন, যদি অনুমতি করেন, ত' এই আজ আপনাদের সেবা করিয়া ধন্য হউক।"

তাঁহারা বলিলেন, "বেশ, তুমি যখন বল্‌ছ, তা'র আর কথা কি?" গুরুদেব উৎসাহিত

হইয়া আমাকে বলিলেন "চরণদাস! তোমার অদৃষ্ট ভাল; যাও, শীঘ্র বাজার হইতে ইঁহাদের সেবার জন্য জিনিষ পত্র সংগ্রহ করিয়া ফলাহার প্রস্তুত কর।"

কি জানি, আমিও যেন এই আদেশ অভাবনীয় সুযোগ মনে করিয়া নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিলাম। তখন কোথায় গেল সেই দৌর্ব্বল্য আর কঙ্কালসার দেহের ক্ষীণ অবসন্ন-ভাব! চকিতের মধ্যে যেন মত্ত হস্তীর বল পাইলাম ও তিন লম্ফে বাজারে যাইয়া, উৎকৃষ্ট চিঁড়া, দধি, গুড়, কলা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের সেবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। পার্শ্বের ঘরে গুরুদেব ও তাঁহারা অনুচ্চস্বরে কি কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, তাহা শুনিতে পাই নাই।

তাঁহারা আনন্দ সহকারে ও পরম পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিলেন, আমরাও যেন ততোধিক কৃতার্থ ও পরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম।

আহারান্তে তাঁহাদের পদ প্রক্ষালন হইবার পর, গুরুদেব বলিলেন, "এইবার মুখশুদ্ধি আনয়ন কর।" আমি মুখশুদ্ধির কোন সংগ্রহই করি নাই, কাজেই অপ্রস্তুত হইলাম।

গুরু: সাধু সেবা কর্‌ছ, আর মুখশুদ্ধি রাখ নাই?

তাঁহারা সকলে হাস্য করিয়া উঠিলেন; অপ্রতিভভাবে তাড়াতাড়ি মুখশুদ্ধি লইয়া আসিলাম।

প্রস্থানের সময় যখন সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া পুনরায় তাঁহাদের পদধূলি শিরে লইলাম, তখন গুরুদেব কাতরভাবে তাঁহাদের বলিলেন, "এটী বড়ই পীড়িত, চিকিৎসায় কোন ফল হইতেছে না; আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন নিরাময় হইয়া যায়।" তাঁহারা সানন্দে মস্তকে ও পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, আচ্ছা হো যাগা, আচ্ছা হো যাগা।"

তাঁহাদের প্রত্যেক করস্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে কি যেন একটা পুলক, শান্তি, বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ও তেজের উন্মাদনা খেলিয়া যাইতে লাগিল; তা'র শতাংশের এক অংশও বর্ণনা করিতে অক্ষম। আমি যেন নবজীবন লাভ করিলাম।

আমাকে প্রসাদ পাইবার অনুমতি দিয়া গুরুদেব তাঁহাদের অনুগমন করিলেন ও প্রায় এক ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিয়া আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, "উঁহারা কে?" কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বলিলেন, "উঁহারা জগদ্‌গুরু দেবাদিদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য। উঁহারাও এক হিসাবে জগদ্‌গুরু এবং আমার ও আমার ন্যায় অনেকেরই গুরু। সুকৃতি থাকে, ত তুমিও একদিন উঁহাদের শিষ্যত্ব লাভ করিবে ও মধ্যে মধ্যে দর্শন পাইবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "উঁহারা থাকেন কোথায়?"

গুরুদেব বলিলেন, "এই বিশাল ও বিচিত্র হিমালয়ে জনমানবের অগম্য বহু স্থান আছে; তাহারই কোনস্থানে অবস্থান করেন। আমি নিজে সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না; জাগ্রত অবস্থায় কখনও সেথায় যাই নাই। তবে মধ্যে মধ্যে স্নানের জন্য বা অপর কোন

কারণে নামিয়া আসেন। শুনিয়াছিলাম, এবার বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁহারা আসিবেন, তাই তাড়াতাড়ি হরিদ্বার চলিয়া আসি।"

সমস্ত রাত্রি গাঢ় সুনিদ্রা হইল। বহুমূত্রের সূত্রপাত হইতেই রাত্রিতে বহুবার শয্যা ত্যাগ করিতে হইত; কিন্তু এদিনের মত গাঢ় তৃপ্তিদায়ক সুনিদ্রা একদিনও হয় নাই।

প্রভাতে যখন অরুণকিরণ সর্ব্বত্র আলো ও আনন্দের ছটা বিলাইয়া, নবীন জাগরণ ও নবজীবনের বার্ত্তা জানাইল, তখন গাত্রোত্থান করিয়া দেখি, সমস্ত ক্লান্তি দৌর্ব্বল্য ও অবসাদ আবুহোসেনের স্বপ্নের মত কোথায় চলিয়া গিয়াছে! শরীর ও মন এখন সুস্থ, তৃপ্ত, তেজ ও আনন্দ ব্যঞ্জক।

ভক্তিভরে নারায়ণকে উদ্দেশ করিয়া বলিলাম,—

মূকং করোতি বাচালম্ পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥

* * * *

তার পর বাড়ী ফিরিয়াই তোমার চিঠি পাইয়া অত্যন্ত আনন্দ হইল।

আশা করি, ইহাতেই তোমার কৌতূহল নিবৃত্তি হইবে এবং আরও আশা করি যে, তুমি গ্রীষ্মের ছুটীর মধ্যেই শীঘ্র কলিকাতায় আসিবে। তোমাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছি। ইতি—

তোমারি
হরিচরণ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বন্দনা।

ইমনকল্যান—একতালা।

জয় কাল রূপিনী (মা!)
সত্ব-রজ-তম ত্রিগুণ ধারিণী কামরূপিণী।
ত্বংহি শিব, ত্বংহি শক্তি, ত্বংহি গো মা ভক্তি মুক্তি,
ত্বংহি পুরুষ প্রকৃতি, ত্বংহি জ্ঞানদায়িনী (মা!)
যে ভাবে যেই ভাবে ডাকে তোমায় সারাৎ সারা,
শমনের হাতে সেই যায় না গো পরাৎপরা;
করুণা কটাক্ষ যারে কর গো কাত্যায়নী (মা!)
ত্বংহি ক্ষিতি, ত্বংহি বায়ু, ত্বংহি সৃষ্টি স্থিতি পালনী;—
এস মা সম্মুখে আজি পূজিব রাঙা পদ দুখানি (মা!)

শ্রীজয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

গীতোপনিষদ্।

দাও হে ভুবন-সখা দেহ শক্তি সুমঙ্গল,
তোমারি মহিমা-গীতি রচিতে তোমারি বল।
রচি যেন হেন গীতি, সবে যাহে পায় প্রীতি,
বিকশিত তব ভাতি ফুটে উঠে সমুজ্জল,
সুছন্দ-মুকুর মাঝে, বিশ্ববিমোহন সাজে,
এসো, পুরাতন! প্রিয়! এসো চির নবোজ্জল।
সকল হৃদয় মাঝে, ও শিব-মূরতি রাজে,
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত নমো নমো নমঃ শিব,
সর্ব্বত্র তোমার পাণি, বিরচিত বিশ্ব খানি,
কোটী কোটী গ্রহমাঝে কোথায় না স্থিতি তব।
আলোকে কি তমোঘোরে, গোপন অন্তর-পুরে,
কাহার তীখন দিঠি নীরবে শাসন ক'রে?
সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া তুমি রয়েছ সবারি ঘরে।
স্থাবর জঙ্গম জীব, সবার নিয়ন্তা শিব,
তুমি মূল, তুমি অংশ, তুমি হংস, সৃষ্টিকারী,
প্রকাশক, আবরক, দেহী হ'য়ে দেহ ধারী;
তুমি হে অজরামর, তুমি সূক্ষ্ম মহত্তর,
জ্ঞানেশ, প্রাণেশ, জন্ম-নিবৃত্তি-কারণ-কারী।
যিনি এক অদ্বিতীয়, বর্ণহীন গুপ্ত প্রিয়,
প্রকাশিত যাহে বিশ্ব, লুকাইবে যাঁর মাঝে,
শুভ বুদ্ধি সেই দেব, দিন্ তিনি সর্ব্ব কাজে।
তুমিই বিচিত্র চিত্র নীলপাখা প্রজাপতি,
তুমি সে লোহিত আঁখি বিহঙ্গম শুকআদি,
উন্মত্ত বারিধি তুমি কলনাদী নির্ঝরিণী,
তোমাতেই সমুৎপন্ন সমুদয় বিশ্বখানি।
কুমার কুমারী তুমি, তুমি সে পুরুষ নারী,
জরাজীর্ণ লোলতনু কম্পহস্তে দণ্ডধারী।
তুমি ক্রীড়াপর শিশু মধুমাখা আধ বোলে

ছুলে ছুলে কর খেলা নির্ভয়ে জননী কোলে।
তোমারি রচিত মায়া আবরিয়া বিশ্বখানি।
তুমি অজ, তুমি মায়ী, তোমায় জেনে না জানি।
সর্ব্বজীবে গুপ্তভাবে আছ তুমি সর্ব্ব ঠাঁই,
আঁখির আস্থাধীনে তোমার প্রতিমা নাই!
তুমি হে হৃদয় সখা হৃদয়ে তোমার বাস,
ভব ভয়ে ভীত জনে রক্ষ দেব নাশি ত্রাস।
ওহে সৌম্য, ওহে রুদ্র, তোমার উদ্যত বাজ,
নিক্ষেপ করোনা মোর দুর্ব্বল জীবন মাঝ।
অহো কত তমোগুণী, বিপুল বিদ্যার বলে,
এক মাত্র প্রকৃতিরে জগৎ-কারণ বলে;
রক্ষদেব! রক্ষ তা'রে জ্ঞান-অন্ধকার হ'তে,
তোমার মহিমা খেলা জগতের পাতে পাতে।
জলচরে, স্থলচরে, কত সূক্ষ্ম ব্যবধান,
অণ্ডজ স্বেদজ ভেদে দেহ-যন্ত্র বিনির্ম্মাণ!
সামান্য ঘটিকাযন্ত্র নরবুদ্ধি-বলে চলে,
এত বড় বিশ্বখানা উৎপন্ন জড়ের কলে?
এ শুধু জড়ের যন্ত্র, নহে কোনও বুদ্ধিবল?
পদার্থ বিজ্ঞানে দিবে চিৎশক্তি নিরমল।
কে রোধিতে পারে নাশ, রচিতে জীবন নব,
মৃত্তিকা অনল জল অনিলেই যদি সব?
কে দিল পতঙ্গ-পাখে শত চারু বর্ণ ছিটা,
কুসুমে সুগন্ধ-মধু, বিচিত্র বরণ-ঘটা,
শ্বাপদে প্রবৃত্তি হিংসা, শশকে ভীরুতা ঘোর,
প্রণয় কপোতীবুকে, মাতৃহৃদি স্নেহে ভোর?
জাগ্রত, সুষুপ্তি, স্বপ্ন, মন, বুদ্ধি, চিন্তা-স্রোত,
জীবের প্রবাহ নিত্য সুখে দুঃখে ওতপ্রোত।
নহে কোন বুদ্ধি বল, সকলি জড়ের মেলা?
চলে কোথা বাষ্পরথ চালক করিলে হেলা?
নমো নমো নমঃ শিব অনন্ত শকতি-ময়।
তোমার প্রসাদে হোক্ শুভবুদ্ধি-সমুদয়।

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

সরল যোগসাধন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নমস্তে আদিনাথায় বিশ্বনাথায় তে নমঃ।
নমস্তে বিশ্বরূপায় বিশ্বাতীতায় তে নমঃ ॥১॥
উৎপত্তি-স্থিতি-সংহার-কারিণে ক্লেশ-হারিণে।
নমস্তে দেব-দেবেশ নমস্তে পরমাত্মনে ॥২॥
নমস্তে পরিপূর্ণায় জগদানন্দ-হেতবে।
সর্ব্বে জীবাঃ সুখৈর্দুঃখৈর্মায়াজালেন বেষ্টিতা ॥৩॥
তেষাং মুক্তিঃ কথং দেব কৃপয়া বদ শঙ্কর।
সর্ব্বসিদ্ধিকরো মার্গো মায়া-জালনিকৃন্তনঃ ॥৪॥ — যোগবীজম্।

'হে আদিনাথ, হে বিশ্বনাথ, হে বিশ্বরূপ অথচ বিশ্বাতীত, তুমি উৎপত্তি, স্থিতি, ও সংহার-কারী, তুমি সংসারের সকল প্রকার ক্লেশ হনন করিয়া থাক, তুমি পরমাত্মা, তোমাকে নমস্কার করি। হে দেব দেবেশ! তুমি পরিপূর্ণ এবং জগতে জীবের আনন্দপ্রাপ্তির হেতু, তোমাকে নমস্কার করি। সংসারে সকল জীব সুখ ও দুঃখ সহ মায়াজালে আবৃত রহিয়াছে; অতএব হে মঙ্গলময় শঙ্কর! তাহাদিগের কি উপায়ে মুক্তি হইবে, মায়াজাল-ভেদকারী সর্ব্বসিদ্ধিকর মার্গ কৃপা করিয়া আমার নিকট বলুন।

যত্না যেন বিমুচ্যন্তে লোকামার্গ মতঃ পরং।
তমহংকথয়িষ্যামি তব প্রীত্যা সুরেশ্বরি ॥
নানামার্গৈস্তু দুষ্প্রাপাং কৈবল্যং পরমং পদং।
সিদ্ধমার্গেন লভ্যেত নান্যথা শিব ভাষিতং ॥"—যোগবীজম্।

'হে সুরেশ্বরি! জীবগণ যেরূপে, যে পথে, প্রস্তুত হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে, আমি প্রীতিপূর্ব্বক তোমাকে তাহা জানাইব। বহুপ্রকার মার্গ আছে, তদ্দ্বারা কৈবল্য-পদ-প্রাপ্তি দুর্লভ জানিবে। ইহা নিশ্চিত যে, পরম দুর্লভ কৈবল্যপদ সিদ্ধমার্গের দ্বারাই লাভ হইয়া থাকে, অন্য প্রকারে হয়না; ইহা শঙ্কর বলিয়াছেন।'

অনেক শত সংখ্যাভিস্তর্ক ব্যাকরণাদিভিঃ।
পতিতা শাস্ত্রজালেষু প্রাজ্ঞয়া তে বিমোহিতা ॥

'যাঁহারা বহু প্রকার তর্কশাস্ত্র ও শব্দশাস্ত্র ব্যাকরণাদির চর্চ্চা করিয়া থাকেন, তাঁহারা বুদ্ধিহারা হইয়া মুগ্ধান্তঃকরণে কেবল শাস্ত্রজালে আবদ্ধ হয়েন।

ভ্রান্তিবদ্ধো ভবেজ্জীবো ভ্রান্তিমুক্তঃ সদাশিবঃ।

'ভ্রান্তিবদ্ধ জীব এবং ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই জীব শিব হইয়া থাকে।'

নিষ্কলং নির্ম্মলং শান্তং সর্ব্বাতীতং নিরাময়ং।
তদেতজ্জীবরূপেন পুণ্য পাপ ফলৈর্বৃতং ॥ – যোগবীজম্।

'যে বস্তু নির্ম্মল নিষ্কল শান্ত সর্ব্বাতীত নিরাময়, তাহাই পাপ-পুণ্যের ফলে আবৃত হইয়া জীবরূপে পরিণত হইয়াছে।'

পরমাত্মপদং নিত্যং তৎকথং জীবতাং গতং।
তত্ত্বাতীতং মহাদেব প্রসাদাৎ কথয়স্ব মে ॥-- ঐ

'পার্ব্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে মহাদেব! যে পরমাত্ম-পদ নিত্যকাল স্থায়ী ও তত্ত্বাতীত, তাহা কিরূপে জীবভাব ধারণ করিয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া তাহা আমার নিকট প্রকাশ করুন।'

সর্ব্বভাবং যদাতীতং জ্ঞানরূপং নিরঞ্জনং।
বারিবৎ স্ফুরিতং স্বস্মিংস্তত্রাহঙ্কার উত্থিতঃ ॥— ঐ

'সকল প্রকার ভাবাতীত শুদ্ধ জ্ঞানময় নিরঞ্জন, মহাসমুদ্রে তরঙ্গ স্ফুরণের ন্যায় আপনাতেই আপনি সংকল্পরূপে স্ফুরণ হয়, তখন অহংকার উদয় হয়।

পঞ্চাত্মকমভূৎ পিণ্ডং ধাতু বদ্ধং গুণাত্মকং।
সুখদুঃখৈঃ সদা যুক্তং জীবভাবনয়াকুলং ॥
তেন জীবাভিধা প্রোক্তা বিশুদ্ধে পরমাত্মনি।
কামঃ ক্রোধো ভয়ং চিন্তা লোভ মোহ মদারুজঃ ॥"
জরা মৃত্যুশ্চ কার্পণ্যং শোকোনিদ্রা ক্ষুধাতৃষ্ণা।
দ্বেষো লজ্জা সুখং দুঃখং বিষাদো হর্ষ এবচ ॥
জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিশ্চ শঙ্কা গর্ব্ব স্তথৈবচ।
এভির্দোষৈর্বিমুক্ত সন্ সজীবঃ শিব এব হি ॥
তস্মাদ্দোষবিনাশার্থ মুপায়ং কথয়ামি তে ॥-- যোগবীজম্।

'অহংকার হইতে পঞ্চাত্মক সপ্তধাতুময় ও ত্রিগুণ-বিশিষ্ট স্থূল শরীর উৎপন্ন হয়। ক্রমে অহংকার সুখদুঃখে জড়ীভূত হইয়া জীবদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে পরমাত্মা জীবরূপ ধারণ করেন। কাম, ক্রোধ, ভয়, চিন্তা, লোভ, মোহ, মদ, রোগ, জরা, মৃত্যু, কার্পণ্য, শোক, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দ্বেষ, লজ্জা, সুখ, দুঃখ, বিষাদ, হর্ষ, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, সংশয়, আত্মাভিমান ইত্যাদি দোষ তখন জীবকে আশ্রয় করে। যখন জীব এই সকল দোষ হইতে মুক্ত হয়, সেই অবস্থায় শিব হইয়া থাকে। অতএব আমি তোমার নিকট এই সকল দোষ নিবারণের উপায় বলিতেছি।'

পন্থানো বহবঃ প্রোক্তা মন্ত্র শাস্ত্র মনীষিভিঃ।
স্বগুরোর্মতমাশ্রিত্য শুভং কার্য্যং নচান্যথা ॥—শৈবাগম।
উপায়ং তত্ত্ব বিজ্ঞায় যোগমার্গে প্রবর্ত্ততে।
খণ্ড জ্ঞানেন তেনৈব জায়তে ক্লেশভাক্ নরঃ ॥

যোগাৎ পরতরং পুণ্যং যোগাৎ পরতরং সুখং।
যোগাৎ পরতরং সূক্ষ্মং যোগমার্গাৎ পরং নহি ॥ — যোগবীজম্।

'মুনিগণকর্ত্তৃক বহুবিধ শাস্ত্র, মন্ত্র ও পন্থা অর্থাৎ সাধন-প্রণালী উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে গুরুর উপদিষ্ট মতের আশ্রয় করিয়া কার্য্য করিলে শুভ হইয়া থাকে। অন্যথা সাধনমার্গের সুফল হয় না। পূর্ব্বোক্ত দোষগুলি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার যোগই একমাত্র উপায়, তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া যোগমার্গের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। যদি পূর্ণভাবে জ্ঞান না জন্মে, খণ্ডজ্ঞান হয়, অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয়ে যদি দৃঢ় ধারণা না হয়, তাহা হইলে সেই খণ্ডজ্ঞানে জীবকে ক্লেশভাগী হইতে হয়। যোগ হইতে পরম পুণ্য-জনক আর কিছুই নাই, যোগের অপেক্ষা পরম সুখের বস্তুও কিছুই নাই এবং যোগ হইতে সূক্ষ্ম বিষয়ও আর কিছুই নাই। ফলকথা, যোগমার্গ হইতে উৎকৃষ্ট মার্গ জগতে আর নাই।

তস্মাৎ যোগং তমেবাদৌ সাধকো নিত্যমভ্যসেৎ।

সেই জন্য সাধকের পক্ষে অগ্রে যোগাভ্যাস করা কর্ত্তব্য। সেই জন্য ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন ॥ — গীতা, ৬।৪৬।

'হে অর্জ্জুন, তপস্বী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী ও কর্ম্মী অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ ; অতএব তুমি যোগী হও।'

অভ্যাসাৎ কাদিবর্ণো হি যথা শাস্ত্রাণি বোধয়েৎ।
তথা যোগং সমাসাদ্য তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ লভ্যতে ॥ — যোগশাস্ত্র।

'ককারাদি বর্ণমালা অভ্যাস দ্বারা যেরূপ সমস্ত শাস্ত্রের বোধ হইয়া থাকে, সেইরূপ যোগাভ্যাস দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। যেরূপ ককারাদি পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ কোনরূপ পদ বিন্যাস করিতে পারেনা, কিন্তু বিভিন্ন বর্ণগুলিকে সংযোগ করিতে পারিলে সুন্দররূপ বাক্য-পদ-ছন্দাদি হইয়া থাকে ; সেইরূপ জগতের সমস্ত শক্তিগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া এককেন্দ্রস্থ করিলে যোগ হইয়া থাকে। ক্রমশঃ

শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

পার্ব্বতী।

১

প্রিয়তম! প্রাণতম! আরাধ্য দেবতা মম!
কত দীর্ঘকাল হায়! কেটে গেল স্বপ্নসম!
তোমারি আকাঙ্ক্ষা করি রহিয়াছি প্রতীক্ষায়,
পিপাসিত আত্মা মোর তোমাতে ডুবিতে চায়!

২

কখন্ শৈশবে চিত্তে জেগেছিলে অকস্মাৎ
তুমিই সর্ব্বস্ব মোর কৃপাময় বিশ্বনাথ!
সেই হ'তে অনুক্ষণ উৎসর্গিয়া প্রাণ মন
অন্তরে বাহিরে তোমা করিতেছি অন্বেষণ!

৩

করিতাম পান যবে মাতৃ-স্তন্য-সুধা-ধারা,
তখনো সহসা দেব! হইতাম আত্মহারা!
কাঁদিতাম উচ্চ-স্বরে তোমারি-তোমারি তরে,
বিফলে সান্ত্বিতে সবে চাহিত গো ব্যগ্রভরে!

৪

খেলিতাম যবে প্রিয় নর্ম্মসখীগণ সনে,
তখনো তোমার কথা চকিতে পড়িত মনে!
খেলিতে খেলিতে কভু হইতাম আন্-মন
কি যেন হারায়ে গেছে কিবা যেন প্রয়োজন!

৫

পাখীতে গাহিত গান, হাসিত কুসুমরাশি,
তোমারি আহ্বান-বাণী অন্তরে উঠিত ভাসি'!
মৃদুমন্দ সমীরের সুধা-স্নিগ্ধ পরশন
তব স্পর্শ, হর্ষ কিবা করিত গো বিতরণ!

৬

জলে স্থলে নভে আর রবি-চন্দ্র তারকায়
তোমারি প্রতিমা যেন দীপ্ত হ'ত সদা হায়!

জাহ্নবীর ধারা সম হৃদয়ের প্রীতি মম
অন্বেষিতে শুধু তোমা চাহিত গো প্রিয়তম!

৭

একদিন অকস্মাৎ মুক্ত রুদ্ধ-গুহা-দ্বারে,
তোমাতে নিমগ্ন হ'তে বাহিরিনু পারাবার!
অফুরন্ত স্নেহ-মায়া পিতা-মাতা-স্বজনের
নারিল সে আকর্ষণ নিবারিতে অন্তরের!

৮

তা'র পর পলে পলে কত দিন-বর্ষ-মাস
অলক্ষিতে আসি কবে, অলক্ষিতে অপ্রকাশ!
জান তুমি শুধু তব ধ্যান-মূর্ত্তি, ধ্যানময়!
চেয়েছি রচিতে প্রাণে আহরি' সৌন্দর্য্যচয়!

৯

তীব্র ব্যাকুলতা হৃদে জাগাইতে তব তরে
প্রচণ্ড রবির দাহ সহিয়াছি হর্ষ ভরে!
জ্বালিয়াছি নিশিদিন হুতাশন চারিধারে,
পার্থিব কামনারাশি ভস্মসাৎ করিবারে!

১০

ধুয়ে দিতে ধূলি-কাদা অন্তরের বাহিরের,
ধরিয়াছি শির পাতি' বারি-ধারা বাদলের!
আকণ্ঠ ডুবায়ে নীরে নিশিতে দারুণ শীতে,
জড়ত্বের শেষ-চিহ্ন চাহিয়াছি বিনাশিতে!

১১

ত্যজিয়াছি নিদ্রাহার, পাছে তোমা ভুলে যাই,
ক্ষণিকের মোহে শুধু মোহহরে নাহি পাই!
কি নামে ডাকিব তোমা, কি নাম জানি না অত
প্রভু, স্বামী, সখা ব'লে স্মরিয়াছি অবিরত!

১২

হে প্রভু, হে স্বামী মোর, সখা মোর প্রিয়তম,
কতকাল রবে আর দীনা প্রতি নিরমম!

মনে হয় কত কাছে,- তবু তুমি কত দূরে—
পরাণ আকুল কর কি যেন আকুল সুরে!

১৩

একদিন নাহি পারি গ্লানি তব সহিবারে
ত্যজেছিনু এ শরীর জন্মান্তরে যজ্ঞাগারে!
তখন তো ভাবি নাই তুমি মহাতপোধন,
তুচ্ছ যশঃ অপযশঃ স্পর্শেনা ও শ্রীচরণ!

১৪

উদাসী সন্ন্যাসী তুমি, হই নাই উদাসিনী,
পারে নাই পাশরিতে আত্ম-জ্ঞান কাঙ্গালিনী!
বুঝিনি মহিমা তব, চিনি নাই কি রতন,
হাতে পেয়ে হারাইনু তাই যে সাধন-ধন!

১৫

সে দিন সুলভ ছিলে, পেয়েছিনু অনায়াসে,
বুঝিবা মাহাত্ম্য তাই প্রকাশনি দাসী পাশে!
আজিকে দুর্লভ তুমি এ বিশাল বসুধায়,
উদ্ভাসিত সারা চিত্ত তব দীপ্ত মহিমায়!

১৬

এস আজ, এস তুমি, হে তাপস! হে সুন্দর!
নবীন বসন্ত এল হর্ষোৎফুল্ল চরাচর!
কুসুমিত তরু-লতা, বিহঙ্গের মুক্ত তান,
সুস্নিগ্ধ মলয় বহে তব বার্ত্তা সুমহান্!

১৭

উচ্ছ্বাসিতা মন্দাকিনী—বুঝি মোর অশ্রুজলে—
ও রাঙ্গা চরণ দু'টী ধৌত করি' দিবে ব'লে!
আমার প্রাণের কথা আকুল-আকাঙ্ক্ষা নিয়া
তরঙ্গে তরঙ্গে ওই উঠিতেছে তরঙ্গিয়া!

১৮

নির্ম্মল গগনে আজি ঢালে শশী সুধা-ধার,
আমারি বক্ষের প্রীতি দিতে তোমা উপহার!

উধাও চকোর সাথে উধাও জীবন-মন
মিটাতে মিলন-তৃষ্ণা চিরতরে নিরঞ্জন!

১৯

অন্তর্য্যামী তুমি দেব! অন্তরের স্বাধ মম
নহে ত অজ্ঞাত তব, কেন তবে নিরমম!
বিশ্বের উৎসব মাঝে আমি কি একেলা নাথ,
রব আজি অন্ধকারে,—কর কৃপা-আঁখিপাত!

২০

শৈশবে রোপিনু তরু, আজি তারা কি মোহন
ফলে ফুলে সুশোভিত পুলকের প্রস্রবণ!
আমার মর্ম্মের আশা—আজন্ম-তপস্যা মোর -
আজি কি অপূর্ণ রবে দয়াসিন্ধু চিত্ত-চোর!

২১

শুনেছি শ্মশান তব বড় প্রিয় বাস-ভূমি,
শ্মশান এ হৃদি হেন কোথা আর পাবে তুমি!
তোমার বাসনা বিনে সব পুড়ে হল ছাই,
বিচ্ছেদের দাবানল হের জ্বলে চারি ঠাঁই!

২২

শুনেছি ভিখারী তুমি ত্রিলোকের অধীশ্বর!
ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছ নিরন্তর!
আমি যে তোমারে ভিক্ষা মাগিতেছি সদা প্রভু,
বঞ্চিতা এ ভিখারিণী—মনে কি পড়ে না কভু!

২৩

এস তুমি এস আজ! প্রেমময় মৃত্যুঞ্জয়!
মানে না সান্ত্বনা আর শান্তিহীন এ হৃদয়!
ব্যাকুলতা বুঝি মোর বসুধার স্তরে স্তরে
উথলিছে ব্যাকুলিয়া তোমারে আহ্বান করে!

২৪

এস তুমি, এস আজ! অপ্রকাশে স্বপ্রকাশ!
প্রকাশিয়ে প্রেম-জ্যোতিঃ ছিন্ন কর দুখ-পাশ!

আশুতোষ! ভোলানাথ! আশু তুমি তুষ্ট স্তবে,
শ্রীপদ-আশ্রিতা-প্রতি শুধু কি বিমুখ র'বে!

২৫

এস তুমি, এস আজ! যোগেশ্বর! মহেশ্বর!
আছি তব প্রতীক্ষায় কত যুগ যুগান্তর!
আমারে নিস্তব্ধ কর এ গভীর স্তব্ধতায়,
শাশ্বত-শরণ দিয়ে রাতুল-চরণ-ছায়!

২৬

এস তুমি, এস আজ! হে শঙ্কর! ত্রিপুরারি!
ঘুচায়ে মুছায়ে মোর আজন্মের অশ্রুবারি!
সার্থক কৃতার্থ করি জীবন যৌবন মম,
লহ তব পূজা-অর্ঘ্য হৃদয়েশ প্রিয়তম!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

গুরু-শিষ্য সংবাদ।

(২)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গুরু বৎস! গতবারে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। তোমাকে বলিয়াছি, ইহ-জন্মে (স্থূলেন্দ্রিয় না থাকিলেও) সূক্ষ্মেন্দ্রিয় সাহায্যে মনকে কখন কখন দর্শন-শ্রবণাদি ব্যাপার সম্পন্ন করিতে দেখা যায়; এবং বাহ্য বিষয়ের অধুনাতন অস্তিত্ব না থাকিলেও স্বপ্নে জাগ্রদ্বাসনার স্মৃতি স্পষ্টভাবে অনুভবগম্য হইয়া থাকে। তদ্রূপ লিঙ্গ শরীরে স্থূলদেহ বা স্থূলেন্দ্রিয় না থাকিলেও তাহার কার্য্য সম্পন্ন হইবে বিচিত্র কি? মন না থাকিলে যেমন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ জন্মে না;—যেমন, অনেক সময় দেখা যায়—অন্যমনস্ক থাকিলে কোন শব্দ খুব কাছে হইলেও ভাল শুনা যায় না বা কোন বস্তু ভাল দেখা যায় না; অনেক সময় আবার এমন হয় যে, কিছুই শুনিতে বা দেখিতে পাওয়া যায় না—তদ্রূপ ইন্দ্রিয় না থাকিলে মনও স্বকার্য্য সাধন করিতে পারে না। এই কারণেই ইন্দ্রিয় ও মন পরস্পর বীজাঙ্কুরবৎ কার্য্য কারণ-ভাবাপন্ন। এস্থলে যে প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহার কারণ জীবদ্দশায়

একবার স্থূলেন্দ্রিয় সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। জীবদ্দশায় বা পূর্ব্বজন্মে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ঘটিলেই চক্ষু দর্শন করে, কর্ণ শ্রবণ করে। "চক্ষুঃ পশ্যতি কর্ণঃ শৃণোতি জিহ্বা রসং গৃহ্নাতি"—এই প্রকার যে বলা যায়, তাহার কারণ,—দর্শনাদি ব্যাপারের দ্বার বলিয়াই ইন্দ্রিয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব আরোপ করি। এই স্থূল দেহ ত্যাগের পর জীবাত্মা সূক্ষ্ম মন ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় লইয়া পাপ ও পুণ্যোপযোগী শরীর ধারণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পরাধীন থাকিয়া যন্ত্রি-চালিত যন্ত্রের মত পরিভ্রমণ করিতে থাকে। (ইহারই নাম ভৌতিক দেহ); তখন সূক্ষ্মভাবে মন থাকে বলিয়া, পূর্ব্বানুভূত-বাসনা সম্ভূত দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার-বশে মনোধর্ম্ম-সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয়। আত্মার সুখ-দুঃখ ভোগ এই প্রকারই জানিও আমরা এই স্বাধীন জীবনে মনকে মুহূর্ত্তকালের জন্য বিষয়াভিমুখ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না, আর লিঙ্গ শরীরে পরাধীন অবস্থায় মনের সে কার্য্যমন কেন না করিবে? কস্তুরি-বাসিত বস্ত্রে কস্তুরি-গন্ধের মত যে বাসনা—মনে আত্মায় জড়াইয়া আছে, সে বাসনা, সে সংস্কার কোন মতেই যাইবার নহে। সৎকার্য্যের শেষে একটি তৃপ্তি, শান্তি বিরাজ করে, অসৎ কার্য্যের পরিণামে দুঃখ অশান্তি ও অতৃপ্তি থাকিয়া যায়। তাহা হইতে ইহা বুঝা যায় যে, লিঙ্গ শরীরেও পূর্ব্বসংস্কার-বশে সুখ বা দুঃখ অনিবার্য্য। কার্য্যের ফল পাইতেই হইবে, কৃতকর্ম্মের বিনাশ নাই। এইরূপে সংস্কার-বশে যে সুখানুভব, ইহাই স্বর্গসুখ। ইহার বিপরীত—অর্থাৎ দুঃখভোগই নরক।

শিষ্য। আপনি যে প্রকার স্বর্গনরকের কথা বর্ণনা করিলেন, তাহা কি সেই স্বর্গ-নরক? যে স্বর্গে চিরযৌবনা অপ্সরা, অবসাদহীন ভোগ, সংকল্প মাত্র ইচ্ছার পূরণ; যে স্থানে নন্দন বন, যে বনে রাত্রিদিন ফুল ফুটে, মলয় বাতাস দিনরাতই বহে, জ্যোৎস্না নিরবচ্ছিন্ন রহে, সুখকর স্বর্গোদ্যান বিরাজ করে; যেথায় কল্পতরু দিনরাত অর্থীর বাসনা পূরণ করে,মন্দাকিনী একভাবে বহিয়া যায়; "যেথা শাখে শাখে পাখী, ফুলে ফুলে" অলি ইহা কি সেই স্বর্গ? যে ধামে আজান-সিদ্ধ দেবতা, কর্ম্মদেব পিতৃদেবতারা বাস করেন, অপ্সর-কিন্নর-মুনি-ঋষিচয় যেথানকার শোভা বর্দ্ধন করেন, সেইরূপ স্থানকেই ত স্বর্গ বলে। আর সেই নরক—যা'র একদেশ-মাত্র বর্ণনা পড়িলে শরীর কম্পমান হয়, ইন্দ্রিয় নিস্তেজ ও শিথিল হইয়া আইসে, মন আকুল ও ত্রস্ত হইয়া পড়ে; যে স্থানে দণ্ডধারী যমদূত পাপীকে অগ্নিময় কুণ্ডে ফেলিয়া, অস্ত্রাঘাতে ছিন্নবিছিন্ন করিয়া লবণ-প্রক্ষেপ করিতে থাকে; সেই ভয়াবহ যন্ত্রণার (যাহা মনুষ্যের কল্পনায় আইসে না) আবাসস্থান নরক,—আপনার এ নরক কি সেই নরক? আর পুরাণের এই কল্পনা-ময় স্বর্গ নরক কি সত্য?

গুরু। এই স্বর্গনরক বুঝিয়া পুরাণ-বর্ণিত স্বর্গনরক কল্পিত ভাবিলে কেন? দেখ, জলন্ত আগুনের উপর উপর হস্ত প্রদান করিলে যে জ্বালা—আর জলন্ত আগুনের উপর হস্ত দিয়া রাখিয়াছ, এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিলেও যে জ্বালা অনুভব হয়, এই উভয় জ্বালাই

একই প্রকার। বিষধরসর্পকে সম্মুখে ফণা বিস্তৃত করিতে দেখিলে যে ভয়, আর রজ্জু দেখিয়া সর্পভ্রম ঘটিলেও সেই একইপ্রকার ভয়। বস্তুগত্যা তারতম্য কিছুই নাই। জাগ্রতে রাজ-সিংহাসনে রাজছত্র মাথায় দিয়া বসিলে যে সুখ পাওয়া যায়, আর স্বপ্নেও রাজা হইলে যে সুখ উপলব্ধি হয়, উভয়ই একই প্রকার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয় সকলকে দ্বার স্বরূপ করিয়া বিষয় জ্ঞানে যেমন মনের কার্য্য, তদ্রূপ সুপ্ত বা সূক্ষ্মভূত ইন্দ্রিয় সকলকে দ্বার করিয়া ভোগ করাও সেই মনেরই কার্য্য। তবে পার্থক্য এই যে, নিদ্রাভঙ্গের পর স্বপ্ন ছুটিয়া যাইলে স্বপ্নের নশ্বরতা তৎক্ষণেই বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু জাগ্রদবস্থার ভোগ পরক্ষণে নশ্বর বলিয়া বুঝিতে পারা সম্ভব নহে বলিয়াই সত্য বলিয়া বোধ হয় মাত্র *। স্থায়ী ও অস্থায়ী বলিয়া জাগ্রদবস্থা ও স্বপ্নাবস্থার পার্থক্য। অবশ্য স্থূলদেহে ইন্দ্রিয় জ্ঞান যেমন সুস্পষ্ট অনুভূত হয়, স্বপ্নে তেমন ভাবে অনুভব হয় না।

যে স্থলে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে স্থূল ইন্দ্রিয়কে দ্বার স্বরূপ না পাইয়া, সূক্ষ্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে স্থূলেন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়, সে স্থলে দর্শনাদি ব্যাপার পূর্ব্বস্মৃতির মত পরিস্ফুট হয় না। রসানুভবের মত ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেও বুঝাইতে পারা যায় না, বাক্যে তাহার ভাষা নাই। কবি বলেন "ভাবস্থিরাণি জননান্তর সৌহৃদানি'।

শিষ্য। আপনার কথা অমৃতের মত তৃপ্তিপ্রদ, তথাপি ত সন্দেহ শূন্য হইতে পারিতেছি না। আর সূক্ষ্ম শরীরে ভোগ কেন করিতে হয়? সে ভোগই বা কিরূপ? তাহা আরও সরল ভাবে বুঝাইয়া দিন।

গুরু। কেন, অনেক সময়ে ত দেখা গিয়া থাকে, মহাপাপী স্বকৃত মহাপাপের ফলে মৃত্যুসময়ে নানা প্রকার বিভীষিকা দেখিয়া থাকে। "ঐ কে আসিতেছে, আমাকে মারিবার জন্য আসিতেছে, আমাকে রক্ষা কর, উঃ প্রাণ গেল, আমাকে মারিয়া ফেলিল!" এইরূপ মর্ম্মভেদী চীৎকারে আত্মীয়বর্গের, এমন কি দ্রষ্টৃবর্গের নয়ন অশ্রুসিক্ত করিয়া দেয়। তবে সেই ব্যক্তি দেহাবসানে ঐ সকল পাপস্মৃতি লইয়া ঐপ্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিবে, ইহাতে সন্দেহই বা কি আছে?

শিষ্য। ইহকালে সুখদুঃখ-ভোগ কয়েক দিনের জন্য ঘটিয়া থাকে, কিন্তু স্বর্গনরক-ভোগে বহুকাল জীবকে ব্যাপৃত দেখা যায়। সে ভোগের শেষ কতদিনে হয়? যন্ত্রণার পরিণাম মৃত্যু; সে মৃত্যু লিঙ্গদেহে সম্ভব নহে, অথচ যন্ত্রণার বিরাম হয় না। তবে কবে সে যন্ত্রণার শেষ হইবে?

গুরু। হাতের ঢেলা নিক্ষেপ করার পর, যতক্ষণ তাহার বেগ থাকে, ততক্ষণ ছুটে; বেগ নিবৃত্তি হইলে পরে আপনি পড়িয়া যায়। জীবও তদ্রূপ যাবৎকাল পরিমিত কর্ম্ম করে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত জীবকে তাহার ফলভোগ করিতে হয়। যতক্ষণ না শেষ হয়, ততক্ষণ হয় স্বর্গ, নয় নরক, নতুবা এই পৃথিবীতেই কিছুকাল বাস করিতে বাধ্য হয়।

* স্থায়ী ও অস্থায়ী ভিন্ন অন্যপ্রকারেও পার্থক্য আছে।

কর্ম্মানুযায়ী ফল শেষ হইলে স্বর্গগত ব্যক্তি আবার পূর্ব্ব কর্ম্ম ভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করে "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি"। এই স্বর্গবাস সুখকর হইলেও নির্দ্দিষ্ট দিবসের চুক্তি মাত্র। চুক্তির শেষ হইলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জীব স্বানুরূপ মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, "যথাপ্রজ্ঞংহি সম্ভবাঃ।" নরক-বাসাবসানে দেহীকে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, স্থাবর ইত্যাদি শরীর ধারণ করিতে হয়।

নরকভোগে সে স্থানে দেহীর মৃত্যু সম্ভাবনা নাই, কেন না স্থূলদেহের প্রাণাপগমেই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। বর্ত্তমান শরীরে যে জাতীয় যন্ত্রণার নিরবচ্ছিন্ন ভোগ হইয়া থাকে, নরক-ভোগ সময়ে দেহেন্দ্রিয় না থাকায় সহজে এই যন্ত্রণার বিরাম হয় না।

সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যায় যে, স্থূল দেহ বা ইন্দ্রিয় যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইবার সহায়ক; কারণ প্রাণবায়ু এ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রকৃতির নিয়ম বশে দেহ হইতে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইং। জীবিত ব্যক্তিকে অগ্নিকুণ্ডে ফেলিলে দেহ ভস্মীভূত হইয়া যায়, কিন্তু নরক-ভোগে সে অসহনীয় যন্ত্রণার সময়েও স্থূল দেহেন্দ্রিয় থাকে না বলিয়াই, তাহাদের ভস্মীভূত হইবার সম্ভাবনা থাকেনা, অথচ যন্ত্রণার লাঘবও হয় না।

স্বর্গ ভোগও ঐ প্রকার। যে সমস্ত সুখ জীবদ্দশায় ঘটিয়া উঠে নাই, যে সকল সাধ আহ্লাদ মিটে নাই, যাহা অতৃপ্ত রহিয়া গিয়াছে, যে গুলি অন্তর্নিরুদ্ধ ভাবে মনোমধ্যে সংস্কাররূপে বর্ত্তমান থাকে তাহা সে ব্যক্তি সূক্ষ্ম দেহেই ভোগ করিয়া লয়। জীব যে জাতীয় পুণ্যকর্ম্মে অভীপ্সিত পুণ্যলোকে গমন করিবে, তাহার অপূর্ণ বাসনাও সেই সঙ্গে তাহার সহিত থাকিবে; সেই বাসনার পূরণে ইচ্ছা হইলেই তাহা পূরণ হইতে থাকিবে। তবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া, অহঙ্কারে বশীভূত না হইয়া, যদি ফলাকাঙ্খা ত্যাগ পূর্ব্বক সৎকর্ম্ম করিতে পার, আর যদি স্বর্গাদি সুখভোগ করিবার বাসনা না কর, তবে তাহা চিত্ত-শুদ্ধিরূপ ফলের জনক হয়। এইরূপ ভাবে কর্ম্মের ফলে কর্ম্মের বন্ধকত্ব শক্তি থাকে না,—ইহাই কর্ম্মকৌশল।

পুরাণ ত পড়িয়াছ—পুরাণের বর্ণনার উজ্জ্বলতাই মাত্র দেখ, সূক্ষ্মতত্ত্বগুলি সেরূপ লক্ষ্য কর না। পুরাণেই আছে "ব্রহ্মলোকে মনোময়ানি শরীরাণি" ব্রহ্মলোকে মনোময়-শরীরে আনন্দভোগ হইয়া থাকে। স্বর্গধামে রামচন্দ্র যখন দশরথের পদধূলি লইবার জন্য হস্ত বাড়াইয়া দিলেন, তখন পদস্পর্শ তাঁহার ঘটে নাই।

শিষ্য। সেই তৃপ্তিকর স্থান হইতে কাহারও ফিরিবার ইচ্ছা হওয়া সম্ভব নহে, তবে ফিরিয়া আসে কেন?

গুরু। ধনু হইতে শরক্ষেপ করিলে তাহার যতদূর বেগ, ততদূরই যাইবে। বাষ্পীয় যানে যতখানি বাষ্প পুরিয়া দিবে, তদনুযায়ী চলিতে থাকিবে; সে বাষ্প ফুরাইয়া যাইলে তাহার গতি বন্ধ হইয়া যাইবে। তদ্রূপ যে পরিমাণে কর্ম্ম সঞ্চিত করিয়াছ, তদনুযায়ী ফলভোগ করিয়া পুনরায় এই কর্ম্মভূমি সংসারে ফিরিয়া আসিতে হইবে। অভিনয় যত-

ক্ষণ চলে, ততক্ষণ দর্শকগণ রঙ্গালয়ে থাকিতে পারে, অভিনয় বন্ধ হইলে আর সে স্থলে কোন দর্শকের থাকিবার অধিকার নাই

শিষ্য। সে স্থান যে কি প্রকার, তাহা ত বুঝিলাম না।

গুরু। "সংকল্পমূলা হি লোকাঃ"। দেহান্তে জীবাত্মার স্বর্গভোগ সময়ে বাহ্যবিষয়ক ভোগ-মালিন্য না থাকায়, মানসিক ক্লান্তি, ইন্দ্রিয়জ অবসাদ, গুরুভার-জনক দৈহিক আলস্য, এ সমস্ত থাকে না। এই যে স্বর্গভোগ, ইহা শুদ্ধসত্ত্ব সংকল্প হইতে জন্মে বলিয়া নিরতিশয় আনন্দজনক। এ আনন্দ সংসারীর বৈষয়িক সুখের মত ক্ষণিক নহে, আবার ব্রহ্মানন্দের মত চিরন্তন নিত্যও নহে। ইহা আপেক্ষিক নিত্য। এখন বুঝিতে পারিলে যে, ইহা রূপক নহে, মানব হিতার্থে নিবদ্ধ লোভজনক মিথ্যা অনুশাসন নহে, কিম্বা বুদ্ধিমদ্‌রচিত কোন ভীতিপ্রদ বাক্যও নহে।

শিষ্য। স্বর্গভোগান্তে কিরূপ ভাবে জীবগণ এই পৃথিবীতে নামিয়া আইসে, কিরূপ ভাবেই বা স্থূলদেহ ধারণ করিতে বাধ্য হয়?

গুরু। পুণ্যাত্মাদের কর্ম্মজনিত নির্দ্ধারিত ফলভোগের অবসান হইলে পৃথিবীতে আসিবার জন্য একটি আধিদৈবিক চলনশক্তির আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। যে শক্তি এই জীবগণকে পৃথিবীতে আসিবার জন্য বাধ্য করে, তাহার নাম† কি, বিজ্ঞান তাহা নির্দ্ধারিত করিবে। জীবগণ প্রথমে আকাশসাম্য প্রাপ্ত হইয়া বায়ুর সহিত তাদাত্ম্যভাবে মিশিয়া যায়, পরে ধূমের মধ্য দিয়া জলধারক অভ্ররূপে পরিণত হয়, তৎপরে সেচনোন্মুখ মেঘের মধ্য দিয়া বৃষ্টিরূপে সমুদ্র, নদী, অরণ্য, ক্ষেত্র, পর্ব্বত, মরুভূমি ইত্যাদি নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়ে। পর্ব্বত মরুভূমি স্থলে পড়িয়া হয়ত সে যাত্রায় বহু জীব স্থূলদেহ আশ্রয় করিতে পাইল না। যাহারা শস্যরূপে পরিণত হইল, তাহারা নিজ পূর্ব্বানুভূত সংস্কার ও পরিপাকোন্মুখ কর্ম্মের তারতম্যানুসারে জীবগণের দেহে প্রবেশ করত অদৃষ্টানুযায়ী সেই প্রকার জীব হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে পারিল। (অর্থাৎ ভুক্ত অন্ন—রক্ত রস শুক্র পিণ্ড ইত্যাদি রূপে জৈবিক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল)

শিষ্য। স্বর্গে ত সমস্ত পুণ্য কর্ম্ম নিঃশেষে ভোগ করিয়া এই পৃথিবীতে আসিতে হয়, তাহা হইলে ভোগান্তে কর্ম্ম না থাকায়, কেন তাহারা মুক্তি পায় না? কেনই বা আবার সংসারে আইসে? কর্ম্মই যদি না থাকিল, তবে কর্ম্মভূমে আসিবার ত কোন কারণই নাই?

গুরু। স্বর্গে কর্ম্ম নিঃশেষে ভোগ হয় না, তাহার কারণ বলিতেছি। কর্ম্ম দুই প্রকার; একটি ফলোন্মুখ, অপরটি অফলোন্মুখ। ফলদানে প্রবৃত্ত যে কর্ম্ম, তাহারই ফল স্বর্গে নিঃশেষে ভোগ করিতে হয়; আর যে কর্ম্ম ফলদানে প্রবৃত্ত নহে, অথচ চম্পক-সুরভি-

† আমার এক বন্ধু হাসিয়া বলেন, 'মাধ্যাকর্ষণ না কি?'

বস্ত্রের গন্ধের মত অবিচ্ছেদে থাকিয়া যায়, তাহাকে সঞ্চিত বলে। জ্ঞান দ্বারা এই সঞ্চিত কর্ম্মই নাশ পায়। "জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বকর্ম্মানি ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জ্জুন।" স্বর্গ হইতে পতনোন্মুখ ব্যক্তির প্রারব্ধ কর্ম্ম নাশ পাইলেও সঞ্চিত কর্ম্ম থাকায় মুক্তির সম্ভাবনা নাই। যিনি মোক্ষ-কাম, তাঁহাকে সঞ্চিতেরও ক্ষয় করিতে হয়। সে বিষয় বারান্তরে বলিব।

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ

আমি যে মা তোমারই।

কেঁদে কেঁদে আমি হইতেছি সারা,
বারেক দেখা দাও না;
আর কত কাল কাঁদিব বসিয়া,
দয়া কি তব হবে না?
তোমা বিনা মাগো কত দুঃখ পাই,
কি কহিব তাহা আমি,
আমার অপেক্ষা জান ভাল রূপ,
তুমি যে মা অন্তর্য্যামী।
কোন অপরাধে এ অধম জনে,
কাঁদাতেছ দিবানিশি;
কৃপা করি দেখা দেহ অভাগায়,
আমার নিকটে আসি!
শোকে দুঃখে সদা তপ্ত হৃদিতল,
অন্তর যেতেছে জ্বলি;
শীতল কর মা তাপিত পরাণ,
করুণা প্রবাহ ঢালি।
আর কত কাল রহিবে ভুলিয়া,
ওমা তারা শুভঙ্করী;
কোলে তুলি লও অধম তনয়ে,
আমি যে মা তোমারই॥

শ্রীতুলসীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ত্রি-পুরুষ ও সৃষ্টি।

আমাদের 'ব্রহ্মবিদ্যা'য় আমরা দেখিয়াছিলাম যে, সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কার্য্য দ্বিতীয় পুরুষ হইতেই হইয়া থাকে ;—ব্রহ্মারূপে রজোগুণ দ্বারা সৃষ্টি, বিষ্ণুরূপে সত্ত্বগুণদ্বারা স্থিতি (অর্থাৎ ধারণ ও পালন দ্বারা সৃষ্টির উৎকর্ষ সাধন) এবং শিবরূপে তমোগুণ দ্বারা লয় সাধিত হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুরাণে যে পুরুষের উল্লেখ আছে, তাহাতেও এই ভাগবতোক্ত দ্বিতীয় পুরুষকেই বুঝায়।

পুরুষাধিষ্ঠিতত্বাচ্চ প্রধানানুগ্রহেণ চ।
মহদাদ্যা বিশেষান্তা হ্যণ্ডমুৎপাদয়ন্তি তে ॥ ১।২।৫০ বিষ্ণুপুরাণ।

'পুরুষের অধিষ্ঠান এবং প্রধানের অনুগ্রহ বশতঃ মহত্তত্ত্ব হইতে মহাভূত পর্য্যন্ত মিলিত হইয়া অণ্ড উৎপাদন করে'। বৃহদারণ্যকোপনিষদে—

আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ।

প্রভৃতি দ্বারা ইঁহাকেই বুঝাইতেছে। তাঁহাকে 'আত্মা' বলি বা 'প্রজাপতি' বলি বা কেবলমাত্র পুরুষ বলি কিম্বা দ্বিতীয় পুরুষই বলি—যে রূপেই তিনি অভিহিত হউন না কেন, তাঁহাকে আদ্যাবতারই বুঝাইতেছে।

এষহ্যশেষ সত্ত্বানামাত্মাংশঃ পরমাত্মনঃ।
আদ্যাবতারো যত্রাসৌ ভূতগ্রামো বিভাব্যতে ॥ ২-৬-৮ ভাগবত।

'সমগ্র সৃষ্টি তাঁহারই অংশ হইতে, তিনিই অশেষ প্রাণীর আত্মা এবং পরমাত্মার অংশ অর্থাৎ জীব। তিনিই আদ্য অবতার এবং তাঁহাতেই সমুদায় ভূত প্রকাশ পায়।'

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোক সিসৃক্ষয়া ॥ ১।৩।১
যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ।
নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্ ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাং পতিঃ ॥ ১।৩।২
এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ং।
যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতির্য্যঙ্‌নরাদয়ঃ ॥ ১-৩-৫ ভাগবত।

(১) প্রথমে ভগবান্ লোকসৃষ্টি ইচ্ছা করিয়া মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র দ্বারা বিনির্ম্মিত ষোড়শ অংশবিশিষ্ট পুরুষের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

(২) সমাধিরূপ নিদ্রা অবলম্বন করিয়া প্রলয়-কালীন একার্ণবে শয়ন করিলে, তাঁহার নাভিহ্রদ হইতে যে পদ্ম উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতেই বিশ্বস্রষ্টৃগণের পতি ব্রহ্মার উদ্ভব হয়।

(৩) ঐ নারায়ণরূপ আদি অবতার অন্যান্য যাবতীয় অবতারের অক্ষয় বীজ স্বরূপ এবং তাহাদের সকলেরই নিধান অর্থাৎ চরমে সকলেই এই অবতারে বিলীন হইয়া থাকেন।

তিনি কেবল অবতারগণেরই উদ্ভবস্থান, এমত নহে—দেবতা, পশুপক্ষী ও মনুষ্যাদিরূপ প্রাণীগণও তাঁহারই অংশ-সম্ভূত। ব্রহ্মা তাঁহার অংশ, মরীচ্যাদি সপ্তঋষি বা প্রধান প্রজাপতিগণ আবার ব্রহ্মার অংশ, এবং মনুষ্যাদি জীবসমূহ আবার উক্ত ঋষিগণের অংশ-সম্ভূত। মনুষ্য এবং অপরাপর জীব ঋষিগণের অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলায় কোন দোষ হয় না। সকল জীবই ব্রহ্মের অংশ এবং তাঁহা হইতে বাহির হইয়া তাহারা ক্রমশঃ দ্বিতীয় পুরুষ, ব্রহ্মা ও প্রজাপতিগণের মধ্য দিয়া কিরূপে পাঞ্চভৌতিক জগতে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা পরে ভাগবতে বর্ণিত আছে।

মনু সংহিতার ১ অধ্যায় ৩ হইতে ৬ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে, ব্রহ্মা কিরূপে আপনাকে দ্বিধাবিভক্ত করেন—অর্দ্ধাংশ পুরুষ ও অর্দ্ধাংশ নারী—এবং সেই নারীর গর্ভে বিরাজকে উৎপাদন করেন। সেই বিরাট্ পুরুষের তপস্যা দ্বারা প্রথম মনু (স্বায়ম্ভুব) উৎপন্ন হন এবং সেই মনু প্রথমতঃ দশজন মহর্ষি প্রজাপতি সৃষ্টি করেন যথা, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ।* তাঁহারা আবার সাত জন মহাতেজস্বী মনুর সৃষ্টি করিলেন, এবং অনেকানেক দেবগণ ও তাহাদের বাসস্থান, অসীম-ক্ষমতা-সম্পন্ন বহু মহর্ষি, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, গন্ধর্ব, অপ্সর, অসুর, পশুপক্ষী, মনুষ্য, ভূমি ও অন্তরীক্ষগত বহু জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ প্রভৃতিও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই মনুশব্দ অধিকারবাচী বুঝিতে হইবে। Secret Doctrine Vol. II. (p. 322) পুস্তকে লিখিতেছে:—

"The first Manu produced Six other Manus (seven primary Manus in all), and these produced in their turn each seven other Manus."

• ঐ স্থলে মনু-সংহিতার ঐ শ্লোকগুলিরও ইংরাজি অনুবাদ দিয়া লেখিকা বলিয়াছেন যে, হিন্দুপুস্তকে গুহ্য বিষয় গোপন রাখিবার জন্য এরূপ দশজন ঋষি লিখিয়াছেন—কিন্তু বস্তুতঃ সকলই সপ্ত সপ্ত রূপে হইয়া আসিয়াছে।

উক্ত পুস্তকে অপর স্থানে বিরাজ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে:—

"Manu declares himself created by Viraj, the Spirit of Humanity, which means that his Monad emanates from the never-resting Principle in the beginning of every new Cosmic Activity—that Logos or Universal Monad (Collective Elohim) which radiates from within himself all those Cosmic Monads that become the centres of activity—Progenitors of the numberless Solar Systems as well as of the yet undifferentiated human Monads of Planetary chains as well as of every being thereon. Svayambhuva, or Self-born is the name of every Cosmic Monad which becomes the centre of Force, from within which emerges a Planetary Chain (of which Chains there are seven in our System). And the radiations of this Centre become again so many Manus Svayambhuva (a mysterious generic name, meaning far more than appears), each of them becoming, as a Host, the Creator of his own Humanity." S. D. Vol. II. P. 325.

* নারদ প্রজা সৃষ্টি করেন নাই। প্রচেতা, ভৃগু, দক্ষ ও কর্দ্দম ঋষিও প্রজাপতি মধ্যে গণ্য। মরীচ্যাদি সাতজনই প্রধান প্রজাপতি। তাঁহারা সপ্তদিক্‌মণ্ডলের অধিনায়ক।

এস্থলে বিরাট্ পুরুষ দ্বারা আদি অবতার দ্বিতীয় পুরুষকেই বুঝাইতেছে। পুরাণে এই দ্বিতীয় পুরুষকে বিরাট্ পুরুষ কহিয়া থাকে। কেবল তাহাই নহে, লেখিকারও অভিপ্রায় সেইরূপ; কারণ তাহার পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় তিনি লিখিতেছেন যে, পরব্রহ্ম হইতে (Logos) (শব্দব্রহ্ম) রূপে ঈশ্বর বাহির হয়েন এবং তাঁহা হইতে অপরাপর Logoi এবং আদিমনু নিষ্ক্রান্ত হন, আবার আদিমনু হইতে অপরাপর মনু প্রভৃতির উদ্ভব হয়।

* * * "During Cosmic Rest, Logos sleepeth in the bosom of That which 'sleepeth not,' nor is it ever awake, for it is Sat or "Be-ness," not a being It is from It that issues the great Unseen Logos, who evolves all other Logoi; the primeval Manu who gives being to other Manus, who emanate the universe and all in it collectively, and who represent in their aggregate the Manifested Logos."

অর্থাৎ মহাপ্রলয় সময়ে ঈশ্বর পরব্রহ্মের বক্ষস্থলে নিদ্রিত থাকেন; পরব্রহ্মের নিদ্রা নাই, জাগরণও নাই; কারণ তিনি "আছি মাত্র" রূপে সদাই বিদ্যমান। তাঁহা হইতে অব্যক্ত * ঈশ্বর (Unmanifested Logos) বাহির হয়েন এবং সেই Logos বা শব্দ ব্রহ্ম হইতে অপরাপর. নিম্নপদবীর ঈশ্বর, আদিম (স্বায়ম্ভুবমনু প্রকাশিত হয়েন। আদি মনু হইতে অপরাপর মনু উৎপন্ন হন, যাঁহাদের হইতে বিশ্ব ও বিশ্বে যাহা কিছু আছে সেই সমস্ত ব্যক্ত হয় এবং তাঁহারা সমষ্টিভাবে ব্যক্ত ঈশ্বর বা ব্রহ্মারূপে প্রসিদ্ধ। Logos শব্দ গ্রীক্ ভাষা হইতে লওয়া হইয়াছে। উহার অর্থ শব্দ; উহা দ্বারা ঈশ্বরই প্রতিপাদিত হইয়া থাকেন। আমাদের মধ্যেও 'প্রণব' দ্বারা উক্ত অর্থ বুঝায়—'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ'—(পাতঞ্জলদর্শন)। প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কারই ঈশ্বরের বোধক অর্থাৎ তৎপ্রতিপাদক।

পুনরায় ওঙ্কারকেই উপনিষদে ব্রহ্ম বলিয়াছেন—"ওমিত্যেতৎ" - (কঠ—২ বল্লী ২২ শ্লোক)। গীতাতেও "ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম" প্রণব একাক্ষর ব্রহ্ম—এইরূপ উক্ত হইয়াছে।. পরাবিদ্যা সংক্রান্ত পুস্তকে লিখিত আছে,—ব্রহ্ম Logos I, Logos II এবং Logos III এই ত্রিমূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়া থাকেন; ইঁহারাই আমাদের রুদ্র, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা;—ইঁহাদিগের মধ্যে প্রথমটী অব্যক্ত অবস্থায় অবস্থিত। ত্রিমূর্ত্তির তিনভাব বটে. কিন্তু পৃথক্ নহেন; তিনেই এক এবং একেই তিন সুতরাং আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত উক্ত পুস্তকসমূহে প্রকাশিত উপদেশ গুলির সম্পূর্ণ ঐক্য আছে।—অপর শাস্ত্রের সারাংশের সহিতও ঐরূপ ঐক্য দেখা যায়।

এক্ষণে আমাদের দেখা আবশ্যক, জীব অর্থে আমরা কি বুঝিব জীবাত্মা প্রকৃত পক্ষে

---

* এখানে Unmanifested এই অর্থে অব্যক্ত বুঝায়;—

"The primordial triangle, which, as soon as it has reflected in the "Heavenly Man," disappears, returning into "silence and darkness.."—তিনি অপরে সৃষ্টি কর্ম্মোপযোগী শক্তি সঞ্চালিত করিয়া, অন্তর্হিত হইয়া, অপরের নিকট অদৃষ্ট হইয়া অবস্থিত থাকেন।

কাহাকে কহে—তাহার বিবর্ত্তন কিরূপে সাধিত হয়। পূর্ব্বে সামান্যরূপে উল্লেখ করিয়াছি যে, ব্রহ্মা জীবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন এবং জীবের ভোগ্যস্থান, দেহাদির উপাদান তাঁহার দ্বারা নির্ম্মিত হইলে, জীব সর্ব্বোচ্চস্থান হইতে স্থূলতম স্তরে অবতরণ করত ক্রমশঃ উৎকর্ষলাভ করিয়া থাকে। এসম্বন্ধে আমাদের উক্তি অতি অস্পষ্ট হইয়াছে সুতরাং তাহারও বিশেষ আলোচনা আবশ্যক।

প্রথমে জীবভোগ্যস্থান অর্থাৎ ক্ষেত্র কিরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, দেখা যাউক। পূর্ব্ব প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা প্রলয়কালীন জলরাশি এবং বায়ু পান করিয়া সকলই আপনাতে সংস্থিত করিয়াছিলেন, এবং তাহা হইতে তিনি যথাপূর্ব্ব ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। এখানে একটু বিশেষ জানা আবশ্যক যে ব্রহ্মাণ্ড অনেক আছে।

সংখ্যাচেদ্ রজসামস্তি বিশ্বানাং ন কদাচন।
ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদিনাং তথা সংখ্যা ন বিদ্যতে।
প্রতি বিশ্বেষু সন্ত্যেব ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ॥ দেবীভাগবত -৯।৩।৭—৮

'বরং বালুকণার সংখ্যা করা যায়, কিন্তু বিশ্বের সংখ্যা গণনা করা যায় না। সেইরূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবও অসংখ্য আছেন, প্রতি বিশ্বেই তাহার ঈশ্বর এইরূপ ত্রিমূর্ত্তিতে বিরাজিত আছেন।' এখানে আমরা একটীমাত্র ব্রহ্মাণ্ড লইয়া দেখিব অর্থাৎ আমাদের যে ব্রহ্মাণ্ড তৎসম্বন্ধেই এই আলোচনা হইতেছে জানিবেন। ব্রহ্মার পরমায়ু ১০০ একশত বৎসর। সপ্তলোকসমন্বিত আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মার কাল পরিমাণে ১০০ একশত বৎসর বর্ত্তমান থাকিবে। ব্রহ্মার জীবনের ৫০ পঞ্চাশ বৎসর একপরার্দ্ধ কাল; সুতরাং দ্বিপরার্দ্ধে ব্রহ্মার পূর্ণ আয়ু। তাঁহার জীবনের প্রথম পরার্দ্ধ অতীত হইয়াছে। ব্রহ্মার এক দিনে এক কল্প এবং এক রাত্রিও এক কল্প পরিমাণ। প্রত্যেক কল্পে এক সহস্র মহাযুগ*। এক কল্পে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর। গত পরার্দ্ধের শেষ কল্পের নাম পাদ্ম-কল্প ছিল। আমাদের বর্ত্তমান কল্পের নাম বরাহ-কল্প, ইহা দ্বিতীয় পরার্দ্ধের প্রথম কল্প। বর্ত্তমান কল্পের ছয়টী মন্বন্তর হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে সপ্তম মন্বন্তর চলিতেছে। বর্ত্তমান মনুর নাম বৈবস্বত। প্রত্যেক মহাযুগে দেব পরিমাণ ১২০০০ বৎসর; তাহা হইলে মানব পরিমাণে ১২০০০ × ৩৬০ = ৪৩,২০,০০০ মানব বৎসর।

পরাবিদ্যাসমিতির পুস্তকসমূহে Chain, Round, Race, Sub-race, মন্বন্তর ও মহামন্বন্তর প্রভৃতি শব্দ সকল ব্যবহৃত হইয়াছে। আমি যতদূর সম্ভব, সেই সকল শব্দ পরিত্যাগ করিয়া পৌরাণিক শব্দই ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিব। তবে এস্থলে তাহাদের অর্থ দিতেছি,- তাহা হইলে সেই সকল শব্দ হঠাৎ কোন স্থলে ব্যবহৃত হইলে সকলে বুঝিতে পারিবেন।

---

* সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চারি যুগে এক মহাযুগ হয়।

৭টী প্রশাখায় (Branch races) ১টী শাখামানব জাতি (Sub race)

৭টী শাখামানব জাতিতে (Sub race) ১টী মৌলিক জাতি (Root race)

৭টী মৌলিক জাতিতে (Root race) ১টী গ্রহের আয়ুষ্কাল (World period)

৭টী গ্রহের আয়ুষ্কালে (World period) ১টী গ্রহচক্র (Round)

৭টী গ্রহচক্রে (Rounds) ১টী গ্রহমণ্ডল (Chain period)

৭টী গ্রহমণ্ডলে (Chain period) ১টী Planetary scheme।

১০টী Planetry schemes এ ১টী Solar system (ব্রহ্মাণ্ডের পরমায়ু)।

এক এক কল্পে—৭টী গ্রহচক্র (Rounds) অর্থাৎ ১৮ মন্বন্তর, কিম্বা ১টী chain এক গ্রহচক্র (Round) ২টী-মহামন্বন্তর।

এক এক কল্প বা সাতটী গ্রহচক্রের (Rounds) পর যে প্রলয় হয় তাহাকে দৈনন্দিন, নৈমিত্তিক বা কাল্পিক প্রলয় কহে ইহাতে কেবল ত্রিলোকীরই নাশ হয়। ব্রহ্মার ১০০ শত বৎসর পরমায়ু শেষ হইলে মহাপ্রলয় হইয়া থাকে।

ব্রহ্মা সৃষ্টিরচনায় উন্মুখ হইয়া প্রথমতঃ স্বীয়শক্তিপরিমিত তাঁহার ভাবী ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন নির্দ্দিষ্ট করিয়া সেই সীমার মধ্যে সপ্তলোক সংস্থাপন করেন। নারায়ণ বা দ্বিতীয় পুরুষ কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট তত্ত্বসমূহ পূর্ব্বে গর্ভোদকরূপে পরিণত হইয়াছিল। ব্রহ্মা সেই প্রলয়-কালীন জল অর্থাৎ তাঁহার সৃষ্টির উপাদানসমূহ পান করায় সেই বিবিধ তত্ত্ব তাঁহার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছিল। পরে তিনি নিজ তেজ দ্বারা স্বীয় শরীর হইতে বিবিধ তন্মাত্র সকল বাহির করিয়া সপ্ত স্তরে সপ্ততত্ত্ব সৃষ্টি করিলেন। মনুস্মৃতিতে উক্ত আছে যে, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব ও পঞ্চ-তন্মাত্র পুরুষতুল্য অনন্ত কার্য্যক্ষম, এবং এই সাতটী সূক্ষ্মমাত্রা হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যায় যে, তন্মাত্রগুলি ব্রহ্মার চিন্তাশক্তির (সম্বিদের) ভাবান্তর মাত্র (Modifications of His Consciousness)। সেই সেই শক্তির সহিত প্রাকৃতিক উপাদান মিশ্রিত হইয়া বিবিধ তত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে। সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাস যেমন বেগে তীরে উত্থিত হইয়া সৈকতভূমি সিক্ত করত তাহাতে একটী জলরেখা অঙ্কিত করিয়া ফিরিয়া যায়, আবার কোন বেগবত্তর তরঙ্গ আসিয়া পুনরায় আরও অধিক দূরে আর একটী চিহ্ন রাখিয়া যায়, সেইরূপে তন্মাত্র দ্বারা ব্রহ্মা প্রকৃতির উপাদানগুলিতে শক্তি সঞ্চালন দ্বারা বিবিধ তত্ত্ব নির্ম্মাণ করত সপ্ত স্তর সৃষ্টি করিয়া থাকেন। আদিতত্ত্ব (যাহাকে কেহ কেহ মহত্তত্ত্ব কহেন) এবং অনুপাদকতত্ত্ব (যাহাকে অনেকে অহঙ্কার তত্ত্ব কহিয়া থাকেন) কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার স্পষ্ট বর্ণনা পাই নাই, এবং যাহা পাওয়া যায়, তাহা হইতে কোন বিশেষ ধারণা হয় না ; সুতরাং সেই দুইটী সম্বন্ধে সাধারণ গ্রন্থে কোন বিশেষ উল্লেখ নাই। আমরা কেবল পঞ্চতত্ত্বের ও পঞ্চস্তরের আলোচনা এখানে করিব—সর্ব্বোচ্চ আর দুইটী তত্ত্ব আছে মাত্র এক্ষণে জানিয়া রাখিবেন। শব্দ-তন্মাত্র দ্বারা আকাশতত্ত্ব, স্পর্শ-তন্মাত্র দ্বারা বায়ুতত্ত্ব, রূপ-তন্মাত্র দ্বারা তেজস্তত্ত্ব,

রস-তন্মাত্র দ্বারা অপ্‌তত্ত্ব এবং গন্ধ-তন্মাত্র দ্বারা ক্ষিতিতত্ত্ব পূর্ব্ববৎ সৃষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মা উচ্চস্তরের অণুসমূহ গ্রহণ করত তৎক্ষণাৎ তদ্দ্বারা তন্নিম্ন স্তর প্রস্তুত করিয়াছেন, এমত নহে। প্রকৃতির স্তর সৃষ্টি এবং ভিন্ন ভিন্ন স্তরের অণুতে ভিন্ন ভিন্ন গুণসংযোগ করার পৃথক্ ধারা। কোন একটী স্তরের সৃষ্টিকার্য্য শেষ হইলে, সেই স্তরের কতকগুলি অণু স্বীয় শরীরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া সেইগুলিতে নূতন গুণ সংযোগ দ্বারা তাহাদিগকে পুনঃ ত্যাগ করত ব্রহ্মা তন্নিম্ন স্তর প্রস্তুত করিয়া থাকেন। অপর অপর দেবতাগণ, পিতৃগণ মনুষ্যাদির দেহ প্রস্তুত করণোপযোগী অণুসমূহে (Elemental Essence) গুণসংযোগ করিবার জন্য ঐ উপায়ই অবলম্বন করেন। ব্রহ্মা এইরূপে ক্ষেত্র বা জীবভোগ্যস্থান নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। সর্ব্বনিম্নস্তর—কঠিনতম স্থূল বিভাগ পঞ্চীকৃত উপাদানে নির্ম্মিত (সপ্তীকৃত বলিলেই ঠিক হয়, কারণ আদি ও অনুপাদক স্তরের অণুও সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে)।

আমাদের জানা উচিত যে, পরিদৃশ্যমান এই স্থূল জগৎ পঞ্চমহাভূতাত্মক; কিন্তু এক একটী মহাভূতরূপ উপকরণে এক এক শ্রেণীর বস্তু হইয়াছে, এরূপ নহে। প্রত্যেকেই মিশ্রিত বস্তু; কোন বস্তুতে কোন মহাভূতের অংশ অধিক এবং অপর মহাভূতের অংশ কম। যে বস্তুতে যে অংশ অধিক পরিমাণে অবস্থিত, তাহাকে সেই শ্রেণীর মহাভূত কহিয়া থাকে। স্থূল জগতের সকল বস্তুই পঞ্চীকৃত উপাদানে নির্ম্মিত। পঞ্চীকরণ এইরূপ:— আকাশাদি প্রত্যেক পঞ্চভূতকে প্রথমতঃ দুই দুই অংশে বিভক্ত করিয়া, পশ্চাৎ সেই দুই দুই অংশের এক এক অংশকে চারি চারি খণ্ড করত স্ব স্ব অর্দ্ধ অংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক অপর চারিভূতের প্রথম অর্দ্ধ অর্দ্ধ অংশে সেই চারিভাগের এক এক ভাগ যোগ করিলে, প্রত্যেক ভূতই পঞ্চ পঞ্চ হইয়া থাকে।

এই ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া জীবগণকে স্ব স্ব উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে; অস্ফুট সচ্চিদানন্দকে প্রস্ফুট সচ্চিদানন্দ হইতে হইবে।

বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মার সৃষ্টি দশ প্রকার; তন্মধ্যে ছয় প্রকার সৃষ্টিকে প্রাকৃত সৃষ্টি কহে, তিন প্রকার সৃষ্টিকে বৈকৃত সৃষ্টি কহে, এবং একপ্রকার উভয়াত্মক সৃষ্টি—প্রাকৃত সম্পূর্ণ নহে এবং সম্পূর্ণ বৈকৃতও নহে; উহা কুমার সৃষ্টি। যাহা নানা জীবে এককালে অবস্থান করিতে পারে এবং প্রাকৃতিক অংশ যদ্দ্বারা জীবে সংযুক্ত হয়, তাহাই প্রাকৃতিক সৃষ্টি:—

(১) মহত্তত্ত্ব, (২) অহঙ্কারতত্ত্ব, (৩) পঞ্চ-তন্মাত্র, (৪) জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়, (৫) বৈকারিক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবগণ এবং মন, (৬) পঞ্চপ্রকৃতিস্বরূপা অবিদ্যা যথা:—"অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ"।

বৈকৃতসৃষ্টি—প্রাকৃতিক পদার্থ সকল যাহাতে বিকার প্রাপ্ত হইয়া জীব-শরীর গঠন করে, এবং দেবগণ যাহাতে জীবের ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতা হয়েন, তাহাকে বৈকৃত সৃষ্টি কহে। উহা তিন প্রকার:— ঊর্দ্ধ স্রোতা, তির্য্যক্‌স্রোতা এবং অর্ব্বাক স্রোতা।

(১) ঊর্দ্ধস্রোতা— বৃক্ষলতাদি পৃথিবী হইতে রস আকর্ষণ করিয়া ঊর্দ্ধে লইয়া থাকে,

তজ্জন্য উহদিগকে ঊর্দ্ধস্রোতা কহে। উহাদের জ্ঞান তমসাচ্ছন্ন, বাহিরের কোন পদার্থ জানিতে পারে না।

(৮) তির্য্যক্‌স্রোতা—পশু পক্ষীরা উক্ত সৃষ্টিভুক্ত। ইহারা সকলেই অজ্ঞানী এবং অবেদী (অর্থাৎ অনুসন্ধান-শূন্য)। উহাদের আহার বক্রভাবে শরীর-মধ্যে প্রবেশ করে।

(৯) অর্ব্বাকস্রোতা—এই সৃষ্টিই মনুষ্য সৃষ্টি। এই জীবের আহার-সঞ্চার অধোভাগে হইয়া থাকে।

(১০) কুমার সৃষ্টি—ইহাকে সম্পূর্ণ প্রাকৃত কহা যায় না, অথচ বৈকৃতও বলা যায় না। এই সৃষ্টি উভয়াত্মক এবং ইহাতে দেবত্ব ও মনুষ্যত্ব দুইই আছে। কুমারগণ সত্ত্ববহুল—তাঁহাদের কৃপায় আমরা উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হই।

অবিদ্যা পঞ্চপর্ব্বা—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—অথবা তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র। ইহা দ্বারা বিপর্য্যয়, ভ্রম ও মিথ্যাজ্ঞান প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

প্রথম অবিদ্যা সৃষ্টির প্রয়োজন হইয়াছিল। কারণ জীবগণ প্রলয়কালে ব্রহ্মে লীন থাকায়, তখন তাহাদের উপাধিমাত্র ছিল না—তাহারা প্রলয়ান্তেও আপনাদের ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন জ্ঞান করে না। পূর্ণব্রহ্মজ্ঞানেই তাহারা তন্ময় থাকে। তাহাদের একাকার জ্ঞান তিরোহিত হইয়া ভেদ-জ্ঞান না জন্মিলে তাহাদের নিম্নাবতরণ অসম্ভব। সুতরাং অবিদ্যা-বৃত্তিদ্বারা তাহাদের অভেদবৃত্তি প্রথমে নষ্ট করা প্রয়োজন। সেই জন্য ব্রহ্মা ভেদমূলক অবিদ্যা সৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে করিয়াছিলেন।

এক্ষণে জীবের ক্রমাভিব্যক্তি কিরূপে সাধিত হইয়া থাকে, তাহা আমাদের কথঞ্চিৎ বিশদরূপে আলোচনা করা আবশ্যক। জীব ঈশ্বরাংশ, তাহা পূর্ব্বে আমরা বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছি; তথাপি এখানে শ্রুতিবাক্য দ্বারা ঐ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু প্রমাণ দেখাইয়া,জীবের বিবর্ত্তনের ক্রম পর পর দেখিতে হইবে। মুণ্ডক উপনিষদ্ কহিতেছেন:—

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি॥ ২।১।১

'সুদীপ্ত অগ্নি হইতে যেরূপে সরূপ (অগ্নিরূপ) বিস্ফুলিঙ্গসমূহ সহস্র সহস্র দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপে, হে সৌম্য! অক্ষর পুরুষ হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হয়, এবং (তাহাদের কার্য্য শেষ হইলে) সেই অক্ষর পুরুষেই লীন হইয়া থাকে।'

পুনশ্চ:—

তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ
সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি। ২।১।৭ মুণ্ডক।

'সেই দিব্য অমূর্ত্ত পুরুষ হইতে নানা প্রকার দেবতা, সাধ্যগণ, মনুষ্যগণ ও পশুপক্ষী-সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে।'

এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম, জীব সকল পরমাত্মা হইতেই তাঁহার অংশরূপে নির্গত হইয়াছে। ভগবান স্বয়ংও কহিয়াছেন,—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।

জীবের বিবর্ত্তনের সাতটী ক্রম বা ধাপ আছে*। প্রথম তিনটী অবতরণের। সেই কালে জীব তাহার কার্য্যক্ষেত্রে তাহার শক্তি সঞ্চার করে অর্থাৎ বিবর্ত্তনের অনুকূল নানারূপ গুণ সংযোগ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন স্তরের অণুসমূহকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে স্পন্দিত হইতে শিক্ষা দিয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে, বিষ্ণুশক্তি কর্ত্তৃকই বিভিন্ন স্তরের অণুসমূহে বিশেষ বিশেষ শক্তি প্রদান বা গুণসংযোগ হইয়া থাকে। অবতরণ শব্দের প্রযোগ এস্থলে বড় সমীচীন নহে †—কারণ জীব পরমাত্মা হইতে নিঃসৃত হইয়া তাঁহাতেই সংলগ্ন থাকে—পরমাত্মা হইতে জীব কখনও বিচ্ছিন্ন হয়না—আভাস-চৈতন্য দ্বারা বা প্রতিবিম্ব দ্বারা নিম্ন জগতে তাহার সমস্ত কার্য্য হইয়া থাকে। জীব সর্ব্বদা পরমাত্মার বক্ষেই বিরাজ করিতেছে, সুতরাং 'অবতরণের' পরিবর্ত্তে 'বিকাশ' শব্দ অধিকতর সংলগ্ন হইতে পারে। তবে আমাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য 'অবতরণ' শব্দই ব্যবহৃত হইবে।] চতুর্থ ক্রমটীতে জীব প্রকৃতির সহিত আপনার সম্বন্ধ স্থির করে। প্রথমে জীব প্রকৃতির সম্পূর্ণ বশীভূত থাকে, ক্রমে শেষের তিনটীর অবস্থায় প্রকৃতিকে নিজের বশে আনয়ন করত তদ্দ্বারা স্বীয় উৎকর্ষ সাধনের জন্য উপাধি প্রস্তুত করে। প্রথম তিন ধাপে বা অবস্থাতে জীবের নিম্ন গতি হইয়া থাকে, মধ্যে প্রকৃতির সহিত ঘোরতর বিবাদ হয় ও ক্রমে পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপন হয়। শেষের তিন ধাপে জীব প্রকৃতিকে বাহন করিয়া উন্নতিলাভ করিয়া থাকে।

পরমাত্মা বা প্রথম পুরুষ হইতে জীবগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ নিষ্ক্রান্ত হইয়া বহুকাল দ্বিতীয় পুরুষের ক্রোড়ে অবস্থিতি করে। আমরা দেখিয়াছি, হিরণ্ময় অণ্ডমধ্যে নারায়ণের অঙ্কে শায়িত হইয়া জীবগণ পরিপুষ্ট হয়। যখন নারায়ণ অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরুষ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে ত্রিমূর্ত্তিতে বিরাজিত হন, এবং ব্রহ্মা হইতে সপ্ত শক্তিরূপ সপ্তঋষি বা প্রধান প্রজাপতিগণ সৃষ্টি-রচনা জন্য উদ্ভূত হয়েন, তখন জীবপুঞ্জ ব্রহ্মা হইতে ভাবী স্বতন্ত্র-

---

* 7 Kingdoms :—
(1) Elemental I.
(2) সূক্ষ্ম ভৌতিক II
(3) Do III.
(4) Mineral স্থাবর।
(5) Vegetable উদ্ভিদ্।
(6) Animal জান্তব।
(7) Human মানব।

† Monads *go forth* is somewhat inaccurate; that they *shine forth*, send out their rays of life, would be truer. For they remain ever "in the bosom of the Father,' 'while their life-rays stream out into the ocean of matter.—*Study in Consciousness.*

তার বীজ বা আভাসমাত্র প্রাপ্ত হইয়া উক্ত সপ্ত শক্তিস্রোতে সপ্ত পুঞ্জে পতিত হইয়া থাকে। যে দল যে ঋষির শক্তির সীমার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়, সেই দল সেই ঋষির বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরে সপ্ত দলই পরস্পর মিলিত হইয়া যায়। তাহাতে প্রত্যেক দলের জীবপুঞ্জই অন্যান্য দলের রঙ্গে রঞ্জিত হয়;—কিন্তু যে দল প্রথমে যে ঋষির বর্ণ প্রাপ্ত হয়, সেই রঙটাই সেই দলের জীবে প্রবল ও সর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্ট থাকিয়া যায়। সেই জন্য প্রত্যেক গ্রহে, প্রত্যেক গ্রহমণ্ডলে সাতশ্রেণীর জীব বর্ত্তমান আছে। যে যে জীবপুঞ্জ যে যে ঋষির মধ্যে প্রথমে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, সেই সেই ঋষি সেই সেই জীবগণের আদি পুরুষ। এই কারণে মনুষ্যগণ সপ্তঋষির সন্তান বলিয়া এখনও অভিহিত হইয়া থাকে। দুর্ভাগ্য-বশতঃ কে কাহার সন্তান, অজ্ঞানতা-নিবন্ধন তাহা এক্ষণে কেহ অবগত নহেন। উপযুক্ত গুরু ব্যতিরেকে কেহই যথার্থরূপে তাহা দেখাইতে সক্ষম নহে। প্রত্যেক জীবই উক্ত সপ্তঋষির মধ্যে কোন এক ঋষির সন্তান, সে সম্বন্ধে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

উক্ত সপ্ত ঋষি বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রে নানা নামে খ্যাত; মুসলমান ও খৃষ্টধর্ম্মে তাঁহাদের সপ্ত (angels)—দেবতুল্য সুন্দর ও ক্ষমতাশালী পুরুষ কহে; বৌদ্ধধর্ম্মে উহাঁদের সপ্ত ধ্যানী-বুদ্ধ, এবং অন্যান্য ধর্ম্মে নানা নামে তাঁহারা অভিহিত হইয়া থাকেন। বিভিন্ন নামে কিছুই ক্ষতি নাই,—তবে তাঁহাদের বিদ্যমানতা সম্বন্ধে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র হইতেই প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের শাস্ত্রমধ্যেও সপ্ত ঋষি, সপ্ত প্রজাপতি, সপ্ত মনু প্রভৃতি আখ্যা দেখা যায়।

এখন পর্য্যন্ত জীবগণের স্বরূপ জ্ঞান বিশুদ্ধ ও অপ্রতিহত এবং তাহাদের ভাব অন্তর্মুখ থাকে; সুতরাং তাহাদের নিম্নাবতরণ কঠিন হয়। ঈশ্বরের—সগুণ ব্রহ্মের—বহু হইবার ইচ্ছা জীবে সংক্রামিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্যে ভেদজ্ঞান সঞ্চারিত হয় নাই। সপ্তঋষি বা প্রধান প্রজাপতিগণ জাত হইবার পর যে সকল প্রধান প্রধান দেবতা সৃষ্টিকার্য্যে সহকারিতার জন্য উৎপন্ন হইয়াছিলেন অর্থাৎ দ্বাদশাদিত্য, বসু, বিশ্ব, তুষিত, আভাস্বর, বায়ু, সাধ্য, রুদ্র প্রভৃতি গণদেবতাসকল এবং অগ্নিষ্বাত্ত ও বর্হিষদ্ পিতৃগণ জীবের অবতরণে বিশেষ সহয়তা করিয়াছিলেন। প্রথম শ্রেণীর মহা তেজঃপুঞ্জ দেবগণ দ্বারা জীবের ইচ্ছাশক্তি অর্থাৎ আত্মিকভাব, দ্বিতীয় শ্রেণীর দ্বারা জ্ঞানশক্তি অর্থাৎ বুদ্ধিকভাব এবং তৃতীয় শ্রেণীর দ্বারা ক্রিয়াশক্তি অর্থাৎ মানসিকভাব জাগরিত হওয়াতে তাহাদের অন্তর্মুখী বৃত্তি চঞ্চল হইয়া তাহাদিগকে অবতরণোন্মুখ করিয়াছিল। তখন তাহাদের বৃত্তি কথঞ্চিৎ বহির্মুখী হইল, এবং পাঞ্চভৌতিক জগতে প্রবেশ করিবার চেষ্টা তাহাদের মধ্যে আরম্ভ হইল।

এখন ত আয়োজন চলিতেছে। পরে যাহাদিগকে মনুষ্য হইতে হইবে, সেই মানব-জীবাত্মাসমূহ (Human Monads) অনুপাদক স্তরে উপনীত হইয়াছে। ইহা অহাদের নিত্যধাম অর্থাৎ মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত তাহারা সেই স্তরেই অবস্থিতি করে। তাহারা এতা-

সূশ অতীন্দ্রিয় ও মহানুভাব বিশিষ্ট যে, তাহাদের পক্ষে আর অধিক স্থূল স্তরে অবরোহণ অসম্ভব। অথচ তাহাদের নিম্নস্তরে, স্থূলজগতে নামিতেই হইবে,—সুতরাং তাহাদের কোন উপাধির প্রয়োজন, যাহা অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ যাহাতে তাহাদের প্রতিবিম্ব ক্ষেপণ করিয়া আভাস-চৈতন্য রূপে এ জগতে তাহারা তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সাধন করিতে পারে। সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ইথার (আকাশ) বর্ত্তমান থাকায়, সূর্য্যের তেজে সেই ইথার স্পন্দিত হইয়া সূর্য্যরশ্মি দৃষ্ট হয়। Monad, আমাদের প্রকৃত জীবাত্মা, আত্মিক, বুদ্ধিক ও মানসিক-স্তর দ্বারা অর্থাৎ আকাশ, বায়ু ও তেজস্তর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছে; ঐ (Monads) জীবাত্মাগণ মহাতেজঃপুঞ্জ,তাহারা ঈশ্বরাংশ। সূর্য্যের ন্যায় তাহারা ঐ সকল স্তরের অণুগণকে অনুকম্পিত করত আত্মিক, বুদ্ধিক ও মানসিক স্তর হইতে এক একটি অণু গ্রহণ করত ত্রি-অণু গঠিত আত্মা-বুদ্ধি-মানসরূপ একটী রশ্মি প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা আভাস-চৈতন্যরূপে এই স্থূল পাঞ্চভৌতিক জগতে প্রবেশ করিল। মহাতেজোময় অসুরগণ এবং অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃগণ এসম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা যাহাকে জীবাত্মা বলিয়া জানি, তাহা এই আভাসচৈতন্য—আত্মা-বুদ্ধি-মানসরূপ, উজ্জ্বল হিরণ্ময় সূত্রাত্মা-জড়িত অণুত্রয়। অনুপাদকস্তরে অবস্থিত প্রকৃত জীবাত্মার সহিত সূত্রাত্মা দ্বারাই আমাদের সম্বন্ধ। ঐ সূত্র ক্রমশঃ স্থূলতর, দৃঢ়তর ও উজ্জ্বলতর হইতে থাকে। The thread between the Silent Watcher and His shadow becomes more strong and radiant" S. D. I. P. 285। কঠোপনিষদে ঐ সম্বন্ধকে 'ছায়া' ও 'আতপ' বলা হইয়াছে; "ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি"। ১।৩।১ কঠ।

পাঞ্চভৌতিক জগতের অন্নপস্তরে জীবাত্মার অবতরণ হইল বটে, কিন্তু এক্ষণে তাহার গর্ভমধ্যে বাস— ভ্রূণাবস্থা বলিতে হইবে। এখনও তাহার শরীর নির্ম্মিত হয় নাই। যতদিন কারণ দেহ নির্ম্মিত না হইবে, ততদিন জীবাত্মা কার্য্যক্ষম হইতে পারিবে না। অন্তরস্থ চৈতন্য সম্বন্ধে, জীবাত্মা স্বীয় ধামে অর্থাৎ অনুপাদক স্তরে বলবান্ ও পূর্ণজ্ঞানী। ভৌতিকরাজ্যে আভাসচৈতন্যরূপে প্রবেশ করায়, তিনি সংজ্ঞাহীন, ক্ষমতাহীন এবং সম্পূর্ণ অবশ। কিন্তু তাঁহার মধ্যে সকল ঐশীশক্তিই সুপ্তভাবে অবস্থিত আছে, সেইগুলিকে জাগ্রত করিতে হইবে। ‡

জীবের বর্ত্তমান অবস্থায়, বিনা-সাহায্যে এরূপ গুরুতর কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। বিবিধ শরীর গ্রহণপূর্ব্বক উহার মধ্য দিয়া অভিজ্ঞতা সংগ্রহকরত সুপ্ত-শক্তি-সমূহ প্রবুদ্ধ করিতে হইবে, আপনাকে ক্রমশঃ সবল করিতে হইবে। সেই সকল দেহ নির্ম্মাণ একক এক্ষণে কিরূপে সাধিত হয়? এই জন্য পরম প্রেমের আস্পদ বিষ্ণু স্বয়ং স্বীয় শক্তি দ্বারা

‡ "From a Static Logos infolding all divine possibilities, he is to become a Dynamic Logos unfolding all divine powers."

জীবাত্মাগণকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত হইলেন, - তাঁহারই মধ্যে দেহ নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। মাতৃগর্ভে বীজ নিক্ষিপ্ত হইলে যেরূপ সেই বীজ ধীরে ধীরে পরিবর্দ্ধিত হয়, বিষ্ণুশক্তিমধ্যে অবস্থিত জীবাত্মা সেইরূপে অতি ধীরে পুষ্টি পাইতে লাগিল। বিষ্ণুর আবির্ভাবকালে পূর্ব্ব কল্পে তাঁহাতে লীন অনেকানেক দেবতা, পিতৃগণ প্রভৃতি তাঁহার সহিত সৃষ্টিকার্য্যে সহায়তার জন্য পাঞ্চভৌতিক জগতে আগমন করেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আকাশাদিতত্ত্বের অধিষ্ঠাতৃদেবতা। সেইজন্য পরাবিদ্যা সমিতির পুস্তক সমূহে তাঁহাদিগের একটি সাধারণ নাম দিয়াছেন। ঐসকল পুস্তকে তাঁহারা Elementals নামে অভিহিত। ইহাদের মধ্যে অবশ্য উচ্চ, নীচ, অনেক শ্রেণীর দেবতা আছেন। ঐ সকল দেবতা জীবদেহ গঠনের নিমিত্ত তাঁহাদের দেহমধ্যে উপযোগী উপাদান প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। যাঁহারা যে যে স্তরের অধিদেবতা, তাঁহারা সেই সেই স্তরের অণু-সকল স্ব স্ব দেহে আকর্ষণ করত গুণ-সংযুক্ত করিয়া পুনঃ পুনঃ সেই সকল অণু সেই সেই স্তরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সকল স্তরের অণু-সমূহ বিষ্ণু ও তাঁহার সহকারী দেবগণ দ্বারা গুণ-সংযুক্ত হইল। অরূপ মানসিক স্তরের অণুগুলি সূক্ষ্মচিন্তায় স্পন্দিত হইতে শিক্ষা করিল, রূপ-মনোময় স্তর স্থূলচিন্তায় স্পন্দিত হইতে শিক্ষিত হইল এবং কামময় (Astral) স্তরের অণুসমূহ ইচ্ছাদ্বারা স্পন্দিত হইবার উপযুক্ত গুণ প্রাপ্ত হইল। আয়োজন উপলক্ষে এইরূপে বহুকাল গত হইলে পর, অরূপস্তরে অবস্থিত জীবাত্মা বিষ্ণুশক্তি দ্বারা চালিত হইয়া নিম্নস্তরে অবরোহণোন্মুখ হইল। বিষ্ণু-শক্তির আশ্রয়ে বহুদিন ব্যপিয়া অবস্থিত থাকায়, সেই শক্তির তেজঃপ্রভাবে জীবাত্মার মধ্যে ক্রিয়াশীলতার পূর্ব্বলক্ষণ ঈষৎ স্ফুরিত হইল। জীবাত্মা হইতে ক্রমে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঝুরির ন্যায় বুদ্ধিক-অণুদ্বারা গঠিত সূত্রসমূহ বাহির হইয়া মনোময় (Mental) স্তরের উচ্চবিভাগের এক একটী অণুতে সংলগ্ন হইল। দেবগণ দ্বারাই এইরূপ সংঘটন হইয়া থাকে। পরে তাঁহারা মনোময় একটী চিরস্থায়ী অণুসংলগ্ন বুদ্ধিক-সূত্রটীকে কামময় (Astral) ও স্থূলস্তরের সর্ব্বোচ্চবিভাগের (Etheric) এক একটী পরমাণুর সহিত সংযুক্ত করিয়া দেন। এইরূপে নিম্ন রূপস্তরে জীবাত্মার একটী প্রতিবিম্ব বুদ্ধিকসূত্র-জড়িত মানসিক, কামিক ও স্থূল-আকাশিক অণুত্রয় সংযোগে প্রস্তুত হয়। উচ্চ অরূপস্তরে সূত্রাত্মা-জড়িত আত্মিক, বুদ্ধিক ও মানসিক অণুত্রয় যেরূপ স্থায়ী, নিম্নস্তরে বুদ্ধিক-সূত্র-জড়িত নিম্নমানসিক, কামিক ও স্থূল-আকাশিক অণুত্রয়ও সেইরূপ স্থায়ী; ঐ অণুগুলি জীবের দেহান্তেও বিনষ্ট হয় না। উক্ত বুদ্ধিক-সূত্রটীও সূত্রাত্মার একরূপ প্রসারণ বলিয়া জানিবেন। নিম্নস্তরে ঐরূপে প্রতিবিম্ব প্রস্তুত হইলে প্রত্যেক স্তরের স্থায়ী অণুগুলির চতুর্দ্দিকে দেবতাগণের অনুগ্রহে অপর অণুসকল আসিয়া পুনঃ পুনঃ তাহাদের সহিত একবার সংযুক্ত ও পরে আবার বিযুক্ত হইতে থাকে। এইরূপে মানসিক স্থায়ী-অণু চিন্তা দ্বারা এবং কামিক স্থায়ী-অণু ইচ্ছা ও সংজ্ঞা দ্বারা অনুকম্পিত হইতে আরম্ভ হয়। উক্ত

স্পন্দন অন্নপস্তরে জীবাত্মার নিকটে ক্রমে উপনীত হওয়ায়, তাহাদের চেতনারও ঈষৎ স্ফুরণ হইতে থাকে।

সকলে ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন যে, বিষ্ণুশক্তির আবির্ভাবকালে তিনি অন্নপস্তরের সকল অণুগুলিকেই প্লাবিত করিয়া তন্মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। সেই শক্তিদ্বারা অনুপ্রবিষ্ট অণুসমূহকে (Atomic Matter) Monadic Essence বলা হয়। ইহা বিষ্ণুশক্তির পরিচ্ছদসদৃশ এবং তদ্দ্বারা মূর্ত্তিসকল অনুপ্রাণিত করিয়া বিধৃত হয়। বিষ্ণুশক্তি অপরাপর সকল স্তরের অপরাপর যে সকল মিশ্র অণুকে (দ্ব্যণুক, ত্র্যসরেণু প্রভৃতিকে) ধারণ ও অনুপ্রাণিত করিতেছেন, সেই সকল মিশ্র অণুকে Elemental Essence কহে; তাহা অধিদেবতাগণেরই বিশেষ কার্য্যক্ষেত্র। (ঐশ্বরিক শক্তি অমিশ্র আণবিক-স্তর (Pure Atomic Plane) মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হয়)।

মনোময় (Mental), কামিক (Astral) এবং স্থূল স্তরের দেবতাসকল কর্ত্তৃক সেই সেই স্তরের অপরাপর অণুসমূহ বুদ্ধিকসূত্র-সংলগ্ন স্থায়ী অণুসমূহে সংযোজিত হইলে, সপ্ত শ্রেণীর অণুগণ সাতটি পৃথক্‌ভাগে অবস্থিত হয় এবং তাহাদের মধ্যে বিষ্ণুশক্তিদ্বারা অণুপ্রবিষ্ট অমিশ্র-পরমাণুগুলি (Monadic Essence) কর্ত্তৃক সাতটী পৃথক্ পৃথক্ ব্যবধান সৃষ্ট হয়।

জীব যত দিন মানব-রাজ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, ততদিন তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব (Individuality) বা ব্যক্তিত্ব থাকে না। খনিজ, উদ্ভিদ্ ও জান্তব রাজ্যে প্রস্তরসকল, বৃক্ষসকল এবং পশুপক্ষীসকল দল বাঁধিয়া প্রায়ই অবস্থান করে; প্রতি দলের আত্মাও পুঞ্জীভূত -অনেক সংখ্যক বৃক্ষের বা পশুর একটী পৃথক্ (Group soul) আত্মাপুঞ্জ। কোন একটী পশু বা পক্ষীর দল মধ্যে একটী পশু বা পক্ষী মরিয়া যাইলে, তাহার অভিজ্ঞতা তাহাদের পুঞ্জীভূত আত্মায় সংগৃহীত হয়; তথা হইতে সেই সেই দল মধ্যে প্রত্যেক পশু বা পক্ষী সেই অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়।

যত কাল খনিজ-রাজ্য যথাযথ নির্ম্মিত না হয় এবং সপ্ত শ্রেণীর আত্মাপুঞ্জ তন্মধ্যে প্রবেশ না করে, ততদিন সমুদ্রে ভাসমান বেলুনের ন্যায় সেই সকল পুঞ্জকে প্রকৃতি-সমুদ্রে ভাসিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। প্রত্যেক পুঞ্জেই তিনটী স্তবক লক্ষিত হয়—সর্ব্বোপরি মানসিক, তন্মধ্যে কামিক এবং সকলের ভিতরে স্থূলতরের সূক্ষ্মতম পরমাণু (atoms)-বেষ্টিত, বুদ্ধিকসূত্রে-জড়িত স্থায়ী অণু। বিষ্ণুশক্তি, অথবা বিষ্ণুশক্তি দ্বারা অণুপ্রাণিত উক্ত আচ্ছাদনত্রয়, তন্মধ্যে নিহিত ত্রি-অণুর রক্ষক এবং পালকসদৃশ তাহাদিগকে পুষ্ট করিতে থাকেন।

ক্রমশঃ সপ্ত আত্মা-পুঞ্জের মধ্যে পরস্পর সংযোগ দ্বারা সংখ্যা অধিক হইতে লাগিল, ভাগ-বিভাগ নানা প্রকার হইতে আরম্ভ হইল; ইহাই রসায়ন-শাস্ত্রোক্ত মৌলিক পদার্থ সকলের আবির্ভাবের পূর্ব্ব লক্ষণ! তৎপরেই মূলপদার্থ সকল বাহির হইল এবং খনিজ-রাজ্য

গঠিত হইতে আরম্ভ হইল। কোষাণুগুলির যে নিয়মে ভাগ বিভাগ হইয়া থাকে—অর্থাৎ এক হইতে দুই, দুই হইতে চারি হয় সেইরূপে ঐ আত্মাপুঞ্জ এবং তাহার ভিতরের ত্রি-অণু বিভক্ত হইতে থাকে। সকল ত্রি-অণুগুলিকেই এই খনিজ কঠিনতম স্তরের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। এই কঠিন খনিজ রাজ্যই জীবগণের অবতরণের চরম সীমা—এই স্থলেই স্থূলচৈতন্য জাগরিত হইবে।

শিশুর ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বাবস্থায় যেরূপ মাতার জীবনীশক্তি ও মাতার আহারের সারাংশ প্রাপ্ত হইয়া গর্ভস্থ শিশু দিন দিন পরিপুষ্ট হইতে থাকে, তদ্বৎ আত্মাপুঞ্জ (Group soul), তন্মধ্যে নিহিত ত্রি-অণুগুলিকে পরিপুষ্ট করিতে থাকে। স্বয়ং বিষ্ণুশক্তি তথায় বিদ্যমান, সুতরাং উক্ত ক্ষুদ্র জীবসমূহের পরিপুষ্টি ও ক্রমাভিব্যক্তির কোনই বাধা হইতে পারে না। ভগবান্ আপনার অংশ আপনিই পরিবর্দ্ধিত ও আত্মতুল্য করিতেছেন; সকলই তাঁহার লীলামাত্র।

যে কালে বিবর্ত্তন খনিজ-রাজ্যে আবদ্ধ থাকে, তখন জীবপুঞ্জ স্থূলস্তরের গাঢ়তম তমসাবৃত আচ্ছাদনে আবৃত। ক্রমে উদ্ভিদ্-রাজ্যে বিবর্ত্তন অগ্রসর হইলে, জীবপুঞ্জ ভুবর্লোকে (Astral Plane) তাহার কার্য্য সরাইয়া লয় অর্থাৎ ত্রি-অণুরূপ জীবগুলির সূক্ষ্ম শরীর পুষ্ট করিতে তখন ব্যস্ত হয়। তখন স্থূল আবরণটী তিরোহিত হইয়া যায়। জীব আরও উন্নত হইয়া জান্তব-রাজ্যে প্রবেশ করে। তখন কামিক আচ্ছাদনটী আর দৃষ্ট হয় না; জীব, তাহার পুষ্টির জন্য তাহাকে শোষণ করিয়া লয়। আত্মাপুঞ্জ (Group soul) তখন মনোময়স্তরে জীবের নবাঙ্কুরিত মনোময় শরীর পরিপুষ্ট করিবার জন্য মনোময়স্তরে তাহার কার্য্যকলাপ আরম্ভ করেন। যখন উক্ত জীবপুঞ্জে একটী মাত্র ত্রি-অণু (triad) অবশিষ্ট থাকে, এবং উহা তৃতীয় ঐশী-শক্তির প্রাণন প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন উক্ত Group soul-এর অবশিষ্ট যে একটী স্তবক থাকে, তাহাও ধ্বংস হইয়া অরূপ স্তরের অণুসকলের সহিত মিলিত হইয়া কারণ শরীর (Causal body) প্রস্তুত করে। ইহা প্রস্তুত হইবার সময় জলস্তম্ভের ন্যায় একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে,—মনোময় স্তরের অরূপ বিভাগে একটী এবং রূপস্তরের সর্ব্বোচ্চ বিভাগে আর একটী আবর্ত্তন উত্থাপিত হয়। তৃতীয় ঐশী-শক্তির প্রবাহে অরূপস্তরের তিন বিভাগে সকল-অণু কম্পিত হইয়া ঘোর এক আবর্ত্তন উত্থিত হইয়া থাকে—মানস তখন জাগ্রত হয়। নিম্নস্তরে আবর্ত্তন হইয়া Group soul-এর অবশিষ্ট স্তবকটী ছিন্ন হইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় এবং উপরের আবর্ত্তনে আকৃষ্ট হইয়া একত্র মিশ্রিত হইয়া কারণ শরীর নির্ম্মাণ করে। অরূপস্তরে অবস্থিত জীবাত্মার উপাধি একটী বহু দিন পরে প্রস্তুত হওয়ায়, তিনি এখন হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কার্য্যক্ষম হইতে লাগিলেন। জীবের গর্ভাবস্থা শেষ হইল বটে, কিন্তু এখনও তাঁহার শৈশবাবস্থা—তিনি কেবলমাত্র মানবরাজ্যে প্রবেশ করিলেন। কারণ-শরীর এখন

নিতান্ত অপরিপুষ্ট, এখনও মানবকে বহু জন্ম পরিভ্রমণ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করত ঐ কারণ-শরীর পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করিতে হইবে। প্রথমতঃ অন্নময় কোষ হইতেই Self-consciousness আরম্ভ হইবে—'আমি ও অপর' এই জ্ঞান প্রথমে হইবে—ক্রমে বিবর্ত্তনের পথে অগ্রসর হইতে থাকিলে, 'আমি জীব, ঈশ্বরাংশ, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন এবং ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন' এই জ্ঞান লাভ হইবে। খনিজ-রাজ্যে জীব নিদ্রিত ছিল, এবং উদ্ভিদ্ ও জান্তব-রাজ্যে স্বপ্নাবস্থায় জীব কালাতিপাত করিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে যাহারা মানব-রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছে, তাহাদের এই রাজ্যে চৈতন্যের পূর্ণ অভিব্যক্তি হইবে। তবে আত্মজ্ঞান লাভ করা কিছু কাল-সাপেক্ষ—সহজে ও অনায়াসে তাহা ঘটিয়া উঠে না; বহুজন্ম অতিবাহিত হইলে উপযুক্ত সাধনা দ্বারা ঐ জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। তবে এরূপ ভাগ্যবান্ কেহ থাকিতে পারেন, যাঁহাদের শীঘ্রই ঐ জ্ঞানের উদয় হয়; অবশ্য প্রচুর যত্ন ও প্রখর সাধনা দ্বারা তাঁহারা অন্যের অপেক্ষা অল্প সময় মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হয়েন। সাধনা ব্যতীত শীঘ্র শীঘ্র উন্নতির উপায় নাই।

ঘাত, প্রতিঘাত, ভূমিকম্প, বিপুল হিমশিলা পতন প্রভৃতি উৎপাত দ্বারা খনিজ-রাজ্য মধ্যে সুপ্তপ্রায় জীবচৈতন্যের ঈষৎ স্ফূরণ সময়ে সময়ে হইতে থাকে এবং উপর্য্যুপরি বহুকাল ঐরূপ ঘটনাবলির দ্বারা কঠিনতম পদার্থ মধ্যে সামান্য পরিমাণে কোমলতা উৎপন্ন হয়। ক্রমশঃ নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ্ দেখা দেয়। পরে উদ্ভিদ্ রাজ্যের প্রসার হইতে থাকে—বহুসংখ্যক জীবও তন্মধ্যে প্রবেশ করে। বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সমাকীর্ণ বিশাল বন চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। অতিবৃহৎ ও প্রাচীন বৃক্ষসমূহে ক্রমে একরূপ ব্যাপক সংজ্ঞা প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপরে জান্তব-রাজ্য দেখা দিতে থাকে—জীবগণও বহুসংখ্যায় সেই নূতন রাজ্যে নূতন দেহ ধারণ করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে তাহাদের সংখ্যা অধিক হইতে থাকে। পশু পক্ষীগণ দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে অরণ্য মধ্যে বিচরণ করিতে থাকে। চতুর্দ্দিকে বিবিধ চেষ্টায় ভিন্ন ভিন্ন দলে ধাবিত হইয়া, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন নূতন নূতন অভিজ্ঞতা ও প্রবৃত্তি লাভ করে। যাহাদের মধ্যে সমবৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহারা অপর সকল হইতে পৃথক্ হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দল বাঁধিতে আরম্ভ করে। বুদ্ধিক-সূত্রে জড়িত ত্রি-অণু এবং তাহার আচ্ছাদনস্বরূপ Monadic Essence অর্থাৎ বিষ্ণুশক্তি-অনুপ্রবিষ্ট পরমাণুর স্তবকও ক্রমশঃ সেই সঙ্গে বিভক্ত হইতে হইতে পরিশেষে একএকটী মাত্র স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত হয়। ক্রমে তাহারা মানব-রাজ্যে প্রবেশ করে। তখনই একটী স্বতন্ত্র-মানবে একটীমাত্র পৃথক জীবাত্মা লক্ষিত হয়। কারণ-শরীর-বিশিষ্ট জীবই মানব-শ্রেণীভুক্ত। কারণ-শরীর-গঠনের ধারা উপরে বর্ণিত হইয়াছে। জীবাত্মার ইহাই যথার্থ ক্ষেত্র।

অনেকেই জগতের চারিদিকে বিষম বিচ্ছিন্নভাব দেখিয়া সদাই অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকেন;—কি কারণে একজন বিদ্বান্ ও অপরে মূর্খ, একজন মহাজ্ঞানী এবং

অপরে অজ্ঞানী, কেহ সাধু কেহ অসাধু হইয়া থাকেন—এইরূপ প্রশ্ন সর্ব্বদা সকলের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার একটী সামান্য কারণ এই যে, তাঁহারা অবগত নহেন যে, আমরা সকলে একই সময়ে এই জগতে আসি নাই—কেহ বহু পূর্ব্বে বা কেহ বহু পরে আসিয়া থাকিতে পারি। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, মহাপ্রলয়ের পর সৃষ্টির প্রারম্ভে জীবগণ সপ্ত-পুঞ্জে সপ্ত মহর্ষি বা প্রধান প্রজাপতিগণের মধ্য দিয়া আসিয়াছেন। আবার মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে, যে জীব সকল অতীত-কল্পে বিবর্ত্তন সোপানের বিবিধ ধাপে, বিবিধ অবস্থায় অবস্থিত ছিলেন, এবং মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মে লীন ছিলেন, তাঁহারাও আসিয়া তাঁহাদের বিবর্ত্তনের অবশিষ্ট ভাগ শেষ করিতেছেন। তাঁহারা স্ব স্ব উন্নত অবস্থা অনুসারে অপরাপর নিম্নশ্রেণীভুক্ত নবীন জীব হইতে অপেক্ষাকৃত শীঘ্র উন্নতিলাভ করিয়া থাকেন এবং মুক্তিলাভ করেন,—তাহাতে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। আমাদের এই বর্ত্তমান বরাহ-কল্পেরও পূর্ব্ব কল্পে যাঁহারা মুক্ত হইয়াছেন,তাঁহাদের আমরা 'অসুর' বলিয়া জানিয়াছি। অসু অর্থে 'প্রাণঃ' 'র মত্বর্থে অসুমৎ'— সজীব। ঋগ্‌বেদ মধ্যে বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নিকে অসুর বলিয়াছে। এইস্থলে সেই অর্থ গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা তাহার পর কল্পের পরিণাম,সেই দেব ও মানব-পিতৃগণ অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃনামে খ্যাত। বর্হিষদ্-পিতৃগণ গত কল্পের ফলস্বরূপ। বর্ত্তমান কল্পের শেষে বর্হিষদ্-পিতৃগণ, অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃদের স্থান অধিকার করিবেন, অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃগণ আরও উন্নত হইবেন। গত কল্পে যে সকল জীব সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের মধ্যে দুই শ্রেণীর জীবকে নিম্নাবস্থার ধ্যানী (Lower Dhyanis) কহে ;—এক শ্রেণীর কারণ-শরীর হইয়াছিল,এবং অপর শ্রেণীটীর কারণ-শরীর প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল মাত্র। এই দুই শ্রেণী আমাদের বর্ত্তমান কল্পে দানব জাতি (Limurians) ও দৈত্যজাতি (Atlantians) দের মধ্যে আসিয়া বিবর্ত্তনে যোগ দিয়াছেন। ঐ গত কল্পের আরও অনেকগুলি জীব চারি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া এই বর্ত্তমান কল্পের সার্দ্ধ-ত্রিচক্র (three and a half Rounds) কাল অতীত হইলে,যে সময় এ পৃথিবী মনুষ্যের বাসের উপযুক্ত হইয়াছিল, সেই সময় এখানে আগমন করেন। যদিও তাহারা আমাদের পূর্ব্বপুরুষ নহে, তথাপি তাহাদিগকে সোমপিতৃ কহে ; কারণ গত মণ্ডলটী (Chain) সোম-মণ্ডল (Lunar Chain) নামে খ্যাত। চন্দ্র তখন আমাদের পৃথিবীর স্থানীয় ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান দল, বর্হিষদ্ পিতৃগণ কর্তৃক প্রস্তুত নিম্ন ছয়টী রাজ্যের মধ্য দিয়া অতি দ্রুত গমন করত মানবরাজ্যে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা মানব বিবর্ত্তনের সপ্তম অবস্থা অতিক্রম করিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর জীবগণ, প্রথম চক্রে (First Round) মানব রাজ্যের সীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন মাত্র, এবং ইহার পরিচক্রে অর্থাৎ বর্ত্তমান চতুর্থ চক্রের পর পঞ্চম চক্রে (Fifth Round) তাহাদের সপ্ত অবস্থা শেষ হইবে। তৃতীয় শ্রেণীর জীবগণ প্রথম চক্রে উদ্ভিদ্ হইতে জান্তব-রাজ্যে উপনীত হইয়াছিল, এবং চতুর্থ শ্রেণীর জীবগণ সম্প্রতি খনিজ রাজ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত

হইবার উপক্রম করিতেছে। পূর্ব্ব কল্পে অপর তিন শ্রেণীর জীব উন্নতি-পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাহারা আমাদের বরাহকল্পের শেষ চক্রে মানব-রাজ্য স্পর্শ করিবে মাত্র এবং ভাবি কল্পে মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। বর্ত্তমান কল্পের প্রথম চক্রে তাহারা যথাক্রমে দ্বিতীয় তৃতীয় ভৌতিক রাজ্যে এবং খনিজ রাজ্যের সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল মাত্র।

খনিজ-রাজ্যের উপর তিনটী (Elemental Kingdoms) সূক্ষ্ম ভৌতিক রাজ্য আছে। সৃষ্টির আরম্ভে জীবগণের পাঞ্চভৌতিক জগতে প্রবেশ করিবার উপক্রম-কালে, সমস্তই অতি উষ্ণ জলরাশিময় ছিল। বর্হিষদ্-পিতৃগণ সেই আগ্নেয় সাগরে প্রবেশ করত আদর্শ মূর্ত্তি (Archetypal Forms) প্রথম ভৌতিক রাজ্য প্রস্তুত করেন। তাহার পর জীবগণ তন্মধ্যে প্রবেশ করত ক্রমশঃ বিবর্ত্তিত হইতে থাকে। ক্রমশঃ মূর্ত্তিগুলি শীতল ও গাঢ়তর হইতে থাকে এবং তৃতীয় চক্র অতীত হইলে চতুর্থ চক্রের মধ্যাবস্থায় পৃথিবী কিয়ৎ পরিমাণে বাসের উপযুক্ত হইয়া আইসে। এ সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে অধিক বর্ণনার আবশ্যকতা নাই।

এখন আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, অসংখ্যরূপে বিবর্ত্তিত জীবসমূহ আমাদের জগতে বহু কালব্যবধানে আসিয়াছে। প্রতি কল্পের প্রথমেই বিষ্ণু শক্তির তরঙ্গ জীবগণকে বহন করিয়া পাঞ্চভৌতিক জগতে আসিতেছে। সুতরাং জীবের বয়সের তারতম্যে উন্নতির তারতম্য নির্ভর করিতেছে। জীব-কর্ম্ম সম্বন্ধে এখানে উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

এক্ষণে পঞ্চকোষ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা কহিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতে ইচ্ছা করি। প্রথম প্রবন্ধে কোষপঞ্চ সম্বন্ধে সমস্তই বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু উক্ত কোষগুলি নির্ম্মাণের উপায় ও তজ্জন্য কি কি বিশেষ প্রয়োজন, তাহার কোনই উল্লেখ করা হয় নাই। আমাদের সকলের স্মরণ থাকিতে পারে যে, জীবাত্মার অবতরণ কালে তিনি অরূপ স্তর হইতে তিনটী স্থায়ী অণু (permanent atoms) এবং রূপ-স্তর হইতে পুনরায় তিনটী স্থায়ী অণু লইয়া আসিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি, সেই সকল স্থায়ী অণুগুলি স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু এবং বিবিধ স্তরের দেবতাগণ কর্ত্তৃক অসংখ্য প্রকারে স্পন্দিত হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে। মৃত্যুকালে জীব স্থূল শরীর, কামশরীর (Desire Body) ও মনোময় শরীর ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করিলেও, উক্ত তিনটী স্থায়ী অণু হিরণ্ময় বুদ্ধিক-সূত্রে জড়িত হইয়া কারণ-শরীর মধ্যে উজ্জ্বল বিন্দু সদৃশ পড়িয়া থাকে। জীব পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবার সময় ঐ সকল স্থায়ী অণু পর পর গ্রহণ করিয়া জন্ম লইয়া থাকেন। সকল স্তরগুলি ওতপ্রোতভাবে সন্নিবিষ্ট, সুতরাং সর্ব্বত্রই পরস্পর সংলগ্ন; আর কারণ-শরীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ—সুতরাং কারণ-শরীর অনায়াসে নিম্নস্তরস্থ বহুসংখ্যক অণু ধারণ করিতে পারে। স্থায়ী অণুসমূহ উক্তপ্রকারে গুণ সংযুক্ত হওয়াতে উন্নয়ন প্রণালীতে বিবিধ কোষ বা শরীর গঠন জীবের পক্ষে সহজ হইয়া পড়ে। তাহা না হইলে এবং প্রতিজন্মে

নূতন করিয়া অভিজ্ঞতা (experience) লাভ করিয়া দেহের অণুসমূহকে পুনরায় পূর্ব্ববৎ শিক্ষিত করিয়া লইয়া, দেহ সকল প্রস্তুত করিতে হইলে, জীবের দেহ-নির্ম্মাণ হইয়া উঠিত না। কারণ-শরীর নির্ম্মাণ হইবার পর জীবাত্মা কার্য্যক্ষম হয় এবং অরূপ-স্তর হইতে বিবিধ শক্তি সঞ্চালন দ্বারা সকল দেহ যথাযথ নির্ম্মাণ করত তদ্বারা বহির্জগতের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া স্বীয় আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান্ হয়। উচ্চস্তর হইতে—অনুপাদক-স্তরে অবস্থিত প্রকৃত জীবাত্মা হইতে—ক্রমশঃ অধিকতর শক্তি সঞ্চালিত হইতে থাকে।

সকলের ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক উন্নতি লাভ করিতে হইলে, প্রভূত সাধনার প্রয়োজন—ইহাতে সদ্গুরুর উপদেশ একান্ত আবশ্যক।

জগৎ-বিকাশের প্রথমাবস্থায় জীবের নিম্নাবতরণ পক্ষে অবিদ্যার তামসী শক্তির বিশেষ প্রয়োজন। তাহার পরেই রজোগুণের বিকাশ আবশ্যক। পুরাণ রূপক অবলম্বনে দক্ষযজ্ঞের উল্লেখ করিয়া তাহা বুঝাইয়াছেন। জীব কঠিনতম স্তরে প্রবেশ করিলে অপর শক্তির প্রয়োজন; সেই জন্য পুরাণে হৈমবতী উমার আবির্ভাব দেখাইয়াছেন। হৈমবতীর আবির্ভাব হইলে জীব ক্রমশঃ খনিজ হইতে উদ্ভিদে, উদ্ভিদ্ হইতে জান্তব ও তৎপরে মানব-রাজ্যে প্রবেশ করে। সেখানে রজোগুণ জীবের ক্রমোন্নতির সহায়। জীবের শৈশবাবস্থায় প্রথমে রজোগুণের বিশেষ প্রয়োজন হয়। তখন রজোগুণের ক্রমশঃ অভ্যুদয়ে ধীরে ধীরে তমোনাশ হইতে থাকে, জড়তা দূর হইয়া কার্য্যশীলতা বৃদ্ধি পায়। রজোগুণের সমধিক বৃদ্ধি-প্রাপ্তি হইলে, ক্রমে তাহার সহিত সত্ত্বগুণ মিশ্রিত হইয়া পড়ে, এবং জীব ধর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতির অভিমুখ হইতে থাকে। তৎপরে জীব বিরক্ত হইয়া মুক্ত হইতে পারে।

আমরা দেখিয়াছি যে, জীবাত্মায় ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দ ত্রি ভাব অন্তর্নিহিত আছে। প্রথমে সেইগুলি সুপ্তাবস্থায় অবস্থিত থাকে; ক্রমে ক্রমে এক এক করিয়া তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিতে হইবে। প্রথমতঃ সৎ-ভাবটী জাগরিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি দ্বারা মনের উন্নতি প্রথমে আরম্ভ হয়। মনের উন্নতি, মনকে বলবান্ ও দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত করিতে হইলে, অগ্রে স্বার্থপরতার সহায়তা আবশ্যক। 'আমি' 'আমার' ভাবটী প্রথমে বিশেষ প্রবল হওয়া চাই;—সর্ব্বত্র সকল বিষয়ে, জীবকে ধাবমান হইয়া আত্মসাৎ করিতে হইবে। স্বার্থপরতার সোপানে, স্বার্থপরতার কঠিন আবরণে আবৃত হইয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে মন সবল ও সুদৃঢ় ভিত্তিতে অবস্থিত হইতে থাকে। মনকে প্রথমতঃ এইরূপে সবল ও দৃঢ় করিবার কারণ এই যে, পরে মনকে বুদ্ধির সহিত মিশিতে হইবে,—মন সবল ও সুদৃঢ় হইলে বুদ্ধিও সেইরূপ হইবে। সুতরাং প্রথমাবস্থায় স্বার্থপরতার আবরণ মধ্যে অবস্থিত হইয়া মনকে পরিপুষ্ট ও সবল হইতে হয়। মন সমধিক পরিপুষ্ট হইলে, বুদ্ধি-ভাবও সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হয়। তখন স্বার্থপরতার কঠিন আবরণ ভাঙ্গিয়া যায়। বুদ্ধি-ভাব জাগরিত হইতে আরম্ভ হইলে, স্বার্থান্বেষণ

স্বতঃ অন্তর্হিত হইতে থাকিবে। এই অবস্থায় জ্ঞান ও একতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। স্বার্থত্যাগের সময় এক্ষণে অনেকের উপস্থিত হইয়াছে; বুদ্ধি-ভাবের অঙ্কুর অনেক স্থানে অনেক জীবে দেখা দিয়াছে। এখন একটু মাত্র চেষ্টার আবশ্যক। সদ্‌গুরু মিলিলে এই জ্ঞান-লাভ সহজ হইয়া পড়িবে। তাঁহারা সদাই সর্ব্বত্র জীবের কল্যাণ হেতু উপস্থিত আছেন। একবার জীবের আগ্রহ দেখিতে পাইলেই, কোন জীবকে সামান্য রূপ অধিকারী বুঝিতে পারিলেই, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লইবেন। আমাদের এখন এ সম্বন্ধে চেষ্টা চাই, --অবিদ্যা, স্বার্থপরতা প্রভৃতির নাশ এক্ষণে প্রয়োজন। পূর্ব্বে যাহারা বিবর্ত্তনের সহায় ছিল, এখন তাহারা উন্নতির বিরোধী। সুতরাং এখন 'আমি' 'আমার' ভাব ত্যাগ করিতে হইবে। প্রাণী মাত্রই 'আমি', এই জ্ঞান পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। যাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধি-ভাবের অঙ্কুর সামান্য মাত্র দেখা দিয়াছে, তাহাদেরই বিশেষ যত্নবান্ হওয়া উচিত. যাঁহাদের তাহা হয় নাই, যাঁহারা এখনও বিষয়রূপ পঙ্কে পূর্ণ মগ্ন.তাঁহাদের কথা পৃথক্ তাঁহাদের কাল বিলম্ব আছে, বুঝিতে হইবে। তাঁহারা জগতে কিঞ্চিৎ পরে প্রবেশ করিয়াছেন, জানিতে হইবে। কিন্তু যাঁহাদের মধ্যে একতার ভাব কিঞ্চিন্মাত্র উদয় হইয়াছে, তাঁহাদের 'আমি' 'আমার' ভাব, আত্মগ্রাহী ভাব নষ্ট করিতে সম্যক প্রকারে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহাদের স্বার্থানুসন্ধান স্বতঃ বিনাশ পাইতে থাকে, তথাপি চেষ্টা করিলে আরও শীঘ্রতর সাধিত হইতে পারে। অবশ্য তাঁহাদের মধ্যে অনেকে পরিবারবর্গ-বেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছেন, অনেকের উপর স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণ-পোষণের ভার ন্যস্ত আছে সেই পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ করা তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন যে, উক্ত পরিবার-পালনের উপযোগী অর্থ সঞ্চয়ই তাঁহাদের আবশ্যক। সেই জন্য সদা সৎপথে থাকিয়া প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জ্জন করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহাতে তাঁহাদের উন্নতির কোন প্রতিবন্ধক হইতে পারে না; বরং উপযুক্ত চেষ্টা না হইলে প্রত্যবায় আছে। বলা বাহুল্য যে, সংসারের এই সকল বিবিধ কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যেও তাঁহারা পরমার্থ-চিন্তার জন্য, অপরাপর জীবের হিত-কামনায়, জগতের হিতার্থে, সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতে পারেন। আমাদের সময় যথেষ্ট আছে,—কেবল ইচ্ছার প্রায়ই অভাব। দৃঢ় ইচ্ছা হইলে, জগতের জন্য প্রাণ কাঁদিলে, সময়ের অভাব হয় না। স্বার্থত্যাগ নানারূপে হইতে পারে। যাঁহার যেরূপ ক্ষমতা, তিনি সেই ক্ষমতানুযায়ী বিবিধ প্রকারে জীবের মঙ্গলসাধনে রত হইতে পারেন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

ভারতীয় ভূমা-বাদ।

(১)

অদ্বৈত মত।

ইদানীং ইংরাজী ভাষায় 'প্যান্‌থিয়িজিম' (Pantheism) শব্দ প্রচলিত হইয়াছে। Pan ও Theos এই দুইটি গ্রীক শব্দের সংযোগে 'প্যান-থিয়িজিম' শব্দ উৎপন্ন। Pan অর্থে (all) সর্ব্ব এবং Theos অর্থে God (ব্রহ্ম)। অতএব 'প্যান-থিয়িজিম' শব্দের অর্থ সর্ব্ব-ব্রহ্ম-বাদ—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—'এ সমস্তই ব্রহ্ম' এই মতবাদ। এ মতবাদ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে সুপরিচিত,—উপনিষদের ভাষায় ইহাকে 'ভূমা-বাদ' বলা যাইতে পারে।

ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে এই ভূমা-বাদের বিস্তৃত উপদেশ আছে। সে উপদেশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই।—

একদিন নারদ মহামহর্ষি সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—

অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ সনৎকুমারং নারদঃ।

নারদ শিষ্যভাবে ভগবান্ সনৎকুমারের সমীপস্থ হইলে সনৎকুমার বলিলেন, "তুমি যতদূর বিদ্যালাভ করিয়াছ, তাহা আমাকে বল। তাহার উপর যাহা, তাহা আমি উপদেশ করিব।" নারদ বলিলেন,—"আমি ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, রাশি, দৈব, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, দেবজন-বিদ্যা ইত্যাদি সমস্ত বেদবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছি। আমি মন্ত্রবিৎমাত্র, আত্মবিৎ নহি।"

সোঽহং ভগবঃ শোচামি। তং মা ভগবান্ শোকস্য পারং তারয়তু।—ছা ৭।১।৩

"হে ভগবন্, তথাপি আমি শোকের অধীন। আমাকে শোকের পারে উত্তীর্ণ করুন।" তখন ভগবান্ সনৎকুমার সোপানে সোপানে উঠিয়া নারদকে ভূমা-তত্ত্বের উপদেশ করিলেন। সনৎকুমার বলিলেন, "ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি"—ভূমাই সুখ, অল্পে সুখ নাই। এই ভূমা কি? তাহার উত্তরে সনৎকুমার বলিতেছেন,—

যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা। অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি অন্যৎ শৃণোতি অন্যৎ বিজানাতি তদল্পং যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং। ছা ৭।২৪।১

'যেখানে অন্য বস্তুর দর্শন হয় না, অন্য বস্তুর শ্রবণ হয় না, অন্য বস্তুর মনন হয় না, তিনিই ভূমা; আর যেখানে অন্য বস্তুর দর্শন হয়, অন্য বস্তুর শ্রবণ হয়, অন্য বস্তুর মনন

হয়, তাহা অল্প। যিনি ভূমা, তিনি অমৃত। যাহা অল্প, তাহা মর্ত্ত্য।' এই একাকারভাব-সিদ্ধ দ্বৈতরহিত ভূমাই যে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ব্রহ্ম, এ বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না। কারণ, অদ্বৈত ব্রহ্ম-বস্তুই নিখিলভেদহীন, সমস্ত দ্বৈতবর্জ্জিত। তাঁহাতেই নানাত্বের, ভেদের, বৈশিষ্ট্যের একান্ত অভাব।

নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।

এই অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ প্রায় ছান্দোগ্যেরই ভাষায় মনোজ্ঞভাবে বিবৃত করিয়াছেন,—

যত্রহি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরং অভিবদতি তদিতর ইতরং মনুতে তদিতর ইতরং বিজানাতি।

যত্রবা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ তৎ কেন কং অভিবদেৎ তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ। বৃ ২।৪।১৪

অর্থাৎ "যেখানে দ্বৈতের ভান হয়, সেখানেই অপর অপরকে আঘ্রাণ করে, অপর অপরকে দর্শন করে, অপর অপরকে শ্রবণ করে, অপর অপরকে বচন করে, অপর অপরকে মনন করে, অপর অপরকে বিজ্ঞান করে; কিন্তু যখন সমস্তই আত্মা (ব্রহ্ম) হইয়া যায়, তখন কে কাহার দর্শন করিবে, কে কাহার শ্রবণ করিবে, কে কাহার বচন করিবে, কে কাহার মনন করিবে, কে কাহার বিজ্ঞান করিবে।"

এই ভূমাবস্তুর বিবরণ করিয়া সনৎকুমার আবার বলিতেছেন,—

স এব অধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্ব্বম্।—ছা ৭।২৫।১

এবং আত্মার সহিত ব্রহ্মের একত্ব খ্যাপন করিয়া কহিতেছেন:

আত্মৈবাধস্তাদ্ আত্মোপরিষ্টাৎ আত্মা পশ্চাদ্ আত্মা পুরস্তাদ্ আত্মা দক্ষিণত আত্মা উত্তরত আত্মৈবেদং সর্ব্বম্। ছা ৭।২৫।১

"তিনিই অধে, তিনিই ঊর্দ্ধে, তিনিই সম্মুখে, তিনিই পশ্চাতে; তিনিই উত্তরে, তিনিই দক্ষিণে; এ সমস্ত তিনিই। আত্মাই অধে, আত্মাই ঊর্দ্ধে; আত্মাই সম্মুখে, আত্মাই পশ্চাতে; আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই উত্তরে; যাহা কিছু, সমস্তই আত্মা" *।

---

* এই মর্ম্মে মৈত্রায়ণী উপনিষদ্ বলিতেছেন,—

ব্রহ্ম হ বা ইদমগ্র আসীদেকোঽনন্তঃ প্রাগনন্তো দক্ষিণতোঽনন্তঃ প্রতীচ্যনন্ত উদীচ্যনন্ত ঊর্দ্ধং চ অবাঙ চ সর্ব্বতোঽনন্তঃ।

ন হ্যস্য প্রাচ্যাদিদিশঃ কল্পন্তেঽথ তির্য্যগ্বাঽবাঙ বোর্দ্ধং বাঽনূহ্য এষ পরমাত্মাঽপরিমিতোঽজঃ—৬।১৭

'ব্রহ্মই অগ্রে এই (জগৎ) ছিলেন। এক ও অনন্ত,...পূর্ব্বে অনন্ত, পশ্চিমে অনন্ত, দক্ষিণে অনন্ত, উত্তরে অনন্ত, ঊর্দ্ধে অনন্ত, অধে অনন্ত, সর্ব্বতঃ অনন্ত। তাঁহার পক্ষে পূর্ব্ব পশ্চিম ভেদ নাই; উত্তর দক্ষিণ ভেদ নাই; ঊর্দ্ধ অধঃ ভেদ নাই। তিনি নিরাধার, অপরিমিত, অজ'।

এইরূপে ভূমাতত্ত্বের উপদেশ করিয়া ভগবান্ সনৎকুমার মহর্ষি নারদকে তমসের পরপারে উত্তীর্ণ করিয়াছিলেন।

তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ।—ছা ৭।২৬।২

অতএব ভূমাতত্ত্বের সারমর্ম্ম এই যে, "স এবেদং সর্ব্বং"—তিনিই এই সমস্ত—তিনিই আছেন—অখণ্ড অদ্বৈত ব্রহ্মবস্তু, * আর কোন কিছু নাই।

ঋগ্বেদের ঋষি বহুপূর্ব্বে বলিয়াছিলেন,—

পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং।

'অতীতে যাহা কিছু ছিল, ভবিষ্যতে যাহা কিছু হইবে এবং বর্ত্তমানে যাহা কিছু আছে, এ সমস্তই সেই পরম পুরুষ (ব্রহ্ম)।"

উপনিষদের নানাস্থানেও আমরা উপদেশ পাই,—

ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম।—নৃসিংহ-তাপনী, ৭।

'ব্রহ্মই সকল।'

আত্মৈবেদং সর্ব্বম্।—ছান্দোগ্য, ৭।২৫।২

'আত্মাই এই সমস্ত।'

'ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্' ব্রহ্মই এ সমস্ত! তিনিই এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব! তাহাই যদি হইল, যদি ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন কিছুই নাই, ইহাই স্থির হইল, তবে এই যে বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশাল জগৎ প্রতিক্ষণ আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর হইতেছে, ইহার গতি কি হইবে? আমরা দেখিতেছি, জগৎ রহিয়াছে। কি করিয়া আমরা বলি যে, জগৎ নাই, এক ব্রহ্মবস্তুই রহিয়াছেন এবং যদি একথা বলিতে না পারি, তবে ভূমাবাদের কিরূপে প্রতিষ্ঠা হইতে পারে?

অদ্বৈতবেদান্ত এ প্রশ্নের সহজে সমাধান করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদীরা বলেন যে, রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, শুক্তিতে যেমন রজতভ্রম হয়, মরীচীতে (সূর্য্যকিরণে) যেমন মরীচিকা ভ্রম হয়, সেইরূপ ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হইতেছে। ইহা ভ্রম মাত্র, ইহা দ্বারা জগতের বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। ভ্রান্ত দৃষ্টিতে রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলেও যেমন রজ্জু রজ্জুই থাকে, সর্পে পরিণত হয় না; যেমন শুক্তিতে রজত ভ্রম হইলেও শুক্তি শুক্তিই

---

* অন্যত্রও উপনিষদ্ এই বিরাট্ ভূমাবস্তুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন:—

নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।—শ্বেত ৪।১৯

"ঊর্দ্ধ মধ্য পার্শ্ব—কোন্ দিকে তাঁহাকে বেষ্টন করা যায় না।"

এই ভূমাতত্ত্বের অস্পষ্ট সাক্ষাৎ পাইয়া অর্জ্জুন গীতায় বলিয়াছিলেন,—হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বরূপ! তোমার আদি অন্ত মধ্য কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছি না।

নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং,
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ।

থাকে, রজতে পরিণত হয় না ; যেমন সূর্য্যকিরণে জলভ্রম হইলেও মরীচী মরীচীই থাকে, মরীচিকায় পরিণত হয় না ; সেইরূপ দৃষ্টি-বিভ্রম বশতঃ একমেবাদ্বিতীয় ব্রহ্মে জগতের অধ্যাস হইলেও ব্রহ্ম ব্রহ্মই থাকেন, জগৎরূপে পরিণত হন না। ইহারই নাম বিবর্ত্তবাদ।

অনিশ্চিতা যথা রজ্জু রন্ধকারে বিকল্পিতা।

সর্পধারাদিভির্ভাবৈ স্তদ্বদাত্মা বিকল্পিতঃ ॥—মাণ্ডূক্যকারিকা।

'যেমন অন্ধকারে অস্পষ্ট-দৃষ্ট রজ্জু সর্পরূপে কল্পিত হয়, সেইরূপ অজ্ঞানবশতঃ পরমাত্মায় এই প্রপঞ্চ কল্পিত হইয়াছে।'

মৃগতৃষ্ণা জলচয়ে কৈবাস্থা সর্গ ভস্মনি ॥

ভ্রান্তয়শ্চ ন তত্রাস্তাস্তা স্তদেবচ পরং পদম্।—যোগবাশিষ্ট, উৎপত্তি প্রকরণ ৪৪।৩১

'মরুস্থলে যেমন মৃগতৃষ্ণাতুরের জলভ্রম, সেইরূপ পরব্রহ্মে এই সৃষ্টিভ্রম। ইহা ভ্রান্তি মাত্র।' অতএব সৃষ্টি যখন অলীক, ভ্রান্তিমাত্র, তখন যে আধারে এই জগৎভ্রমের অধ্যাস, সেই আধারের জ্ঞান হইলেই জগতের ভ্রমও বাধিত হয়। তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, যেমন সর্প, রজত, মরীচিকা, ইহারা কল্পনামাত্র ; রজ্জু, শুক্তি, মরীচীই সত্য পদার্থ ; সেইরূপ কল্পিত জগতের আধার – একমেবাদ্বিতীয় ব্রহ্মের জ্ঞান যখনই জীবের আয়ত্ত হয়, তখনই ব্রহ্মে অধ্যস্ত জগৎভ্রম তিরোহিত হইয়া যায়, তখন একাকার ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন কিছুরই প্রতীতি থাকে না। সেই জন্য গৌড়পাদাচার্য্য মাণ্ডূক্য কারিকায় বলিয়াছেন,—

নিশ্চিতায়াং যথা রজ্জ্বাং বিকল্পো বিনিবর্ত্ততে।

রজ্জুরেবেতি চাদ্বৈতং তদ্বদাত্মবিনিশ্চয়ঃ ॥

'যেমন সর্পভ্রমের আধার রজ্জুকে, রজ্জু বলিয়া জানিতে পারিলে সর্পভ্রম নিবারিত হয়, সেইরূপ পরমাত্মাকে জানিতে পারিলে দ্বৈতভ্রম নিবারিত হইয়া অদ্বৈতেরই প্রতিষ্ঠা হয়।' এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া প্রবোধচন্দ্রোদয়-কার বলিয়াছেন,—

যৎ তত্ত্বং বিদুষাং নিমীলতি জগৎ স্রগ্‌ভোগি ভোগোপমম্।

'যেমন রজ্জু জ্ঞানের বলে সর্পভ্রম তিরোহিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জগদ্ভ্রম বাধিত হয়।' এই একাকার অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া ঈশ উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।

তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥—৭

'যখন জ্ঞানীর দৃষ্টিতে সমস্ত পদার্থ আত্মাই হইয়া যায়, তখন সেই একত্ব-দর্শীর পক্ষে শোক, মোহের অবসর থাকে না।' কারণ, তখন সমস্তই অদ্বৈত হইয়া যায়। এই একত্ব দর্শনসম্বন্ধে গীতা এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন,—

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।

তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥—১৩।৩০

'যখন জীব ভূতগণের পৃথক্ ভাবকে একমাত্র ব্রহ্মে স্থিত দেখেন, এবং ব্রহ্ম হইতে ভূতগণের বিস্তার লক্ষ্য করেন, তখন তিনি ব্রহ্ম হয়েন।'

এই তত্ত্ব বিশদ করিয়া বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলিয়াছেন,—

যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেত্তৎ কেন কং জিঘ্রেত্তৎ কেন কং রসয়েত্তৎ কেন কমভিবদেত্তৎ কেন কং শৃণুয়াত্তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং স্পৃশেত্তৎ কেন কং বিজানীয়াদ্।—৪।৫।১৫

'যখন সমস্তই আত্মা হইয়া যায় (আত্মা ভিন্ন আর কিছুই থাকেনা), তখন কে কাহাকে দর্শন করিবে, কে কাহাকে ঘ্রাণ করিবে, কে কাহাকে আস্বাদন করিবে, কে কাহাকে বলিবে, কে কাহাকে শ্রবণ করিবে, কে কাহাকে মনন করিবে, কে কাহাকে স্পর্শ করিবে, কে কাহাকে জানিবে ?' অর্থাৎ এই অবস্থায় ব্রহ্মে অধ্যস্ত জগৎ সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয় এবং কেবল মাত্র অদ্বৈত একমেবাদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুই প্রতিভাত হইতে থাকেন। সুতরাং ব্রহ্মরূপ আধারে বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশাল জগতের অধ্যাস হইলেও বিবর্ত্তবাদী অদ্বৈত বেদান্তের মতে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—'এক ব্রহ্মই আছেন, অন্য কোন কিছু নাই'—এই ভূমাবাদের কোন হানি হয় না।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, জগৎ না থাকিয়াই আছে—এইরূপ যে প্রতীতি হইতেছে—

প্রতীতিমাত্র মেবৈতদ্ ভাতি বিশ্বং চরাচরম্।

ইহার কারণ কি ? উত্তরে অদ্বৈতবেদান্ত বলেন যে, ইহা মায়া-শক্তির বিক্ষেপ-সামর্থ্যের ফল। মায়ার স্বভাবই এই যে, সে অঘটন ঘটন ঘটাইতে পারে, জগৎ নাই অথচ জগৎ আছে, এইরূপ প্রতীতি করাইতে পারে ; মায়ার এইরূপই সামর্থ্য। সেইজন্য তাঁহারা মায়াকে 'অঘটন-ঘটন-পটীয়সী' এই বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। মায়ার এই সামর্থ্যকে সঙ্কল্পশক্তি (power of suggestion) বলা যাইতে পারে। ইন্দ্রজাল ক্রীড়ায় যাদুকরে আমরা এই শক্তির পরিচয় পাই। ঐন্দ্রজালিক যখন দর্শকের সমক্ষে যাদুকরীর বিস্তার করে, তখন দর্শকের মনে দৃঢ় প্রতীতি হয় যে, সে কত কি দেখিতেছে, শুনিতেছে। রামায়ণে দেখিতে পাই, রাবণ সংকল্পশক্তির প্রভাবে রামের মায়ামুণ্ড ও ধনুকের ভ্রম উৎপাদন করিয়া সীতাকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বলা বাহুল্য, যাদুকরের মায়া-প্রসূত দর্শন শ্রবণ সমস্তটাই ভ্রম। বস্তুতঃ সেখানে দেখিবার বা শুনিবার কিছুই নাই।

অধুনা পাশ্চাত্যদেশে যে hypnotism বিদ্যার প্রবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা এই প্রাচীন যাদুবিদ্যারই রূপান্তর। যাঁহারা hypnotic পরীক্ষা সকল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সঙ্কল্পশক্তির দ্বারা যে অঘটন ঘটন ঘটাইতে পারা যায়, এ সম্বন্ধে তাঁহারা সন্দেহ করিবেন না। "কোন ব্যক্তিকে hypnotise করিয়া যদি যাদুকর সংকল্প দ্বারা তাহার ভ্রম উৎপাদনের ইচ্ছা করেন, তবে সহজেই তাহাকে সে ভ্রম সত্য বলিয়া প্রতীতি করান যায়। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, যাদুকর হিপ্‌নটিক নিদ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে বলিলেন, তোমার সম্মুখে সিংহ বা সর্প রহিয়াছে, সে অমনি ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া গেল। অতি গ্রীষ্মের সময় বলিলেন, আজ বড় শীত ; সংকল্পমাত্রে সে অমনি শীতে কম্পিত-কলেবর হইল। কোথাও কিছু নাই,

অথচ বলিলেন, মূষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে; সে অমনি ধারা পাতের অভিনয় করিতে লাগিল। এইরূপ নানা অঘটন-ঘটন হিপ্‌নটিজম্‌ দ্বারা ঘটিতে দেখা গিয়াছে।" *

অদ্বৈতবেদান্ত বলেন যে, এমনই সঙ্কল্পের বলে ব্রহ্ম 'অঘটন-ঘটন-পটীয়সী' মায়া-শক্তির দ্বারা জীবের জগদ্‌ভ্রম উৎপাদন করিয়াছেন। তিনি যাদুকর-শিরোমণি, যেন ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া জীবকে মোহিত করিয়াছেন।

য একো জালবান্ ঈশত ঈশনীভিঃ।
সর্ব্বান্ লোকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ ॥ - শ্বেতাশ্বতর, ৩।১

'যিনি এক মায়াবী সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর; সমস্ত লোক শক্তিদ্বারা শাসন করেন।'

ভারতীয় ভূমাবাদের এই এক দিক। এ মতে জগৎ নাই, সৃষ্টি অলীক—দ্বৈতমিব ভবতি, অন্যৎ ইব স্যাৎ,—জগৎ যেন আছে, সৃষ্টি যেন আছে—কিন্তু পরমার্থ-সত্য সেই একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। তিনিই আছেন, অন্য কোন কিছু নাই। তিনিই ভূমা—তিনিই ঊর্দ্ধে, তিনিই অধে, তিনিই সম্মুখে তিনিই পশ্চাতে, তিনিই উত্তরে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই এ সমস্ত—ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং।

বারান্তরে ভারতীয় ভূমাবাদের অন্যান্য দিক্ আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

কিসের ভয়?

শ্মশানে বসতি যাহার পতির,
তাহার শ্মশানে কিসের ভয়?
যাহার প্রাণেশ জড়াইয়া শেষ,
তাহার গরলে ভিতি কি রয়!
যার প্রাণধন বিভূতিভূষণ,
তাহার সকল হোক না ছাই?
যাহার হৃদয় সদা শিবময়,
শিব ছাড়া তার কিছুই নাই!

শ্রীরাধা—

---

* গীতায় ঈশ্বরবাদ—১০৭ পৃষ্ঠা।

প্রকৃতির শিক্ষা।

উদ্ভিদ্।

বৃক্ষের পত্র প্রতিবর্ষে নূতন গজায়, আর প্রতিবর্ষেই ঝরিয়া যায়; অশ্বত্থ, নিম্ব প্রভৃতি বৃক্ষের প্রতি একবার নিরীক্ষণ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। পত্রের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য—পত্রের মধ্যশিরা দ্বারা বৃক্ষের মূলে রস প্রদান করা। এক বৎসর পরে পত্রগুলির শিরা স্থূল ও অন্তঃসার-শূন্য হইয়া পড়ে। তাহার দ্বারা বাহিরের কার্বন (অঙ্গার) গ্রহণ করিয়া মূলদেশে রস প্রেরণ করিবার শক্তি থাকে না। সেগুলি তখন বৃক্ষের পক্ষে অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। এই জন্য প্রকৃতি সেগুলিকে ত্যাগ করিতে বাধ্য করান। তখন সেগুলি ঝরিয়া পড়ে। অন্যদিকে আবার নূতন পত্রের উদ্গম হয়। আবার তাহাদের কার্য্য সুন্দররূপে চলিতে থাকে। ক্রমে বর্ষান্তে সেগুলিও অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে এবং সেগুলিও তখন বৃক্ষ হইতে চ্যুত হয়।

প্রতিবর্ষে এই পত্র ধারণ ও ত্যাগ করিয়া মূলদেশ কি উপকার লাভ করে? অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রতি বর্ষে পত্রোদ্গমের পর, বৃক্ষের পরিসর পূর্ব্ব বর্ষাপেক্ষা কিয়দংশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। প্রতিবর্ষেই এইরূপে মূলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। প্রতিবর্ষে যতটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহার একটা সীমান্ত নির্দ্দিষ্ট থাকে. তাহার একটা স্বতন্ত্র চিহ্ন বিশেষ ভাবে প্রতিবর্ষে প্রতিবৃক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা দেখিয়াই উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব-বিদ্‌গণ বৃক্ষের বয়স নির্দ্ধারণ করেন।

কোন কোন বৃক্ষে এগুলি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, আবার কোন কোন বৃক্ষে এগুলি অতি অস্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হয়।

আমাদের জীবনের সঙ্গে বৃক্ষপত্রের এবং আত্মার সহিত মূলের বেশ তুলনা করা যাইতে পারে। আমাদের পরমায়ু পত্র-বিশেষ। তাহার কার্য্য, আমাদের প্রত্যেক জন্মের অভিজ্ঞতা আমাদের মূলে সঞ্চয় করা। কারণ-শরীরই আমাদের জীব-বৃক্ষের মূল! প্রত্যেক জন্ম বৃক্ষের নবোদ্গত পত্রের ন্যায়! ইহার একমাত্র কার্য্য,—প্রত্যেক জীবনে, আমরা সুখ, দুঃখ, জরা, শোক প্রভৃতি যাহা অনুভব করিয়াছি, সেগুলিকে আমাদের কারণ-শরীরের সংস্কার রূপে পরিণত করা।

বৃক্ষ মূলের পরিসর যেরূপ প্রতিবর্ষেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, আমাদের কারণ-শরীরও সেইরূপ প্রতিজন্মের অভিজ্ঞতা লইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। মনের উৎকর্ষ, অসাধারণ ধীশক্তি, ধৈর্য্য, বিনয়—প্রভৃতি গুণগ্রামে যে ব্যক্তি-বিশেষকে বিশেষ ভাবে বিভূষিত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের অভিজ্ঞতা কারণ-শরীরে সংস্কাররূপে বিদ্যমান থাকিয়া তাহাকে উক্ত গুণগ্রামের অধিকারী করি-

য়াছে। বৃক্ষের অপেক্ষাকৃত অধিককাল স্থায়ী অংশ মূল ও অল্পস্থায়ী অংশ পত্র। জীবেরও অপেক্ষাকৃত স্থায়ী অংশ কারণ-শরীর ও অল্প স্থায়ী অংশ স্থূল-দেহ-ধারণ বা জন্ম। সময়ে বৃক্ষের নাশ হয়, কিন্তু তাহার বীজ বর্ত্তমান থাকে; সেইরূপ প্রলয়ে কারণ-শরীর ধ্বংস পায়, কিন্তু তাহার বীজ থাকিয়া যায়। আবার পর-কল্পে সেই বীজ বা অতৃপ্ত বাসনা দ্বারা পুনরায় তাহার নূতন জন্মের সূচনা হইয়া থাকে। এই ধারাবাহিক নিয়মে এই বিশ্ব চলিতেছে। সামান্য তৃণ, লতা, বৃক্ষ যে নিয়মে জন্মিতেছে, বাড়িতেছে ও মরিতেছে, মনুষ্যও ঠিক সেই নিয়মে জন্মিতেছে, বাড়িতেছে ও মরিতেছে। জগতে স্বতন্ত্র নিয়ম নাই! পাষাণ, বৃক্ষ, পশু ও মনুষ্য সকলেই এক নিয়মের অধীন! কোনটির তত্ত্ব আমাদের সামান্য বুদ্ধির গম্য; আবার কোনটির তত্ত্ব আমাদের সাধারণ মানব-বুদ্ধির অগম্য ও অদৃশ্য। আমরা যাহা জানি না বা বুঝিতে পারি না, তাহা যে অসত্য, তাহা নহে। প্রকৃতি প্রত্যেক পদার্থের ভিতর দিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, অনেক সময়ে আমরা সেই শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিতেছি না।

শ্রীশ্যামাচরণ পাল।

ভিক্ষা।

রাগিণী-মূলতান। তাল—একতালা।

দেরে দে আমায় ভিক্ষা দে,
এ যাত্রা আমায় ছেড়ে দে।
বহুদিন হ'তে আমি মাতৃহারা,
মা বিহনে আমি হ'তেছি যে সারা,
মা আমার কোথা জানিস্ যদি তোরা—
দয়া ক'রে আমায় ব'লে দে।
মা আমার শ্যামা জগজ্জ্যোতি ভরা,
তিনিই ত বিশ্ব-তারিণী গো তারা,
তাঁরে চিনেছে যাহারা সাধক তাহারা,
তাঁদেরই সাথে আমায় যেতে দে।
শ্রীগুরুর আদেশ, আশা হৃদি ভরা—
মা আমার ঐ দিতেছে যে সাড়া,
অষ্ট পাশবদ্ধ জীব যে আমরা—
সচ্চিদানন্দের পাশ কেটে দে।

সচ্চিদানন্দ।

চিত্তোৎকর্ষ।

চিত্ত ও মন এক পর্য্যায়ের শব্দ। এই মনের তিনটী শক্তি লক্ষিত হয়, যথা—ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। এই শক্তিত্রয় লইয়া জীবের কর্ম্ম সাধিত হয়; যখন আমরা কোন কর্ম্ম করিবার জন্য উৎসাহী হই, তখন আমাদের মনের ইচ্ছাশক্তি প্রবল হইয়া, জ্ঞানশক্তির সাহায্য লাভ করিয়া, ক্রিয়াশক্তির সহযোগে কর্ম্মরূপে প্রকাশিত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মনের শক্তি হয় কৃতিরূপে বহির্জগতে, কিংবা অনুভূতিরূপে অন্তর্জগতে প্রকাশিত হয়। সামান্য ভাবে আমরা এইটুকু বুঝি যে, যে সকল বিষয় আমরা বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহাই বহির্জগৎ এবং যে সকল বিষয় আমরা সূক্ষ্মেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিতে সক্ষম হই, তাহাই অন্তর্জগৎ।

বেদান্তশাস্ত্রে এই সূক্ষ্মজগতের অন্তর্গত তিনটী কোষের উল্লেখ আছে. যথা—মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ। জীব বহির্জগৎ হইতে প্রত্যাহার করিয়া, এই মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষে স্থিতি করিতে সক্ষম হন। অর্থাৎ মানবের বহির্মুখ মন যখন সচ্চিন্তায় মগ্ন হইয়া বাহ্য-জ্ঞান তিরোহিত করিয়া অন্তর্মুখ হইয়া যায়, তখন চিত্ত এই সকল কোষে ক্রমশঃ স্থির হইতে সমর্থ হয়। এই সকল কোষে যিনি অবস্থান করেন, তিনি স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিয়া থাকেন, এইরূপ কথিত আছে। কারণ, তখন অন্তর্মুখ মন বহির্জগতের যাবতীয় দুঃখ হইতে নিবৃত্তি লাভ করিয়া থাকে। মানবকে এই অবস্থায় আসিতে হইলে. মনের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া যাহাতে মনের উন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মনের দৃঢ়তা সম্পাদন জন্য সৎপ্রবৃত্তি ও সৎচিন্তাগুলির অভ্যাস দ্বারা মনের উন্নতি-সাধন করিতে হইবে। উন্নতমনা মানব সৎশিক্ষা, সৎবাক্য, সৎচিন্তা প্রভৃতির দ্বারা তাঁহার মনের উন্নতি বিধান করিয়া মনকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করেন। তাঁহার প্রত্যেক কর্ম্মে সদাচার, ভালবাসা, দয়া, প্রীতি, সত্যপ্রিয়তা, মিষ্টভাষিতা. পরোপকার, এই সকল গুণাবলী প্রকাশিত হয়।

প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে মনঃসংযম অভ্যাস করিতে হইবে। এই মনঃসংযমের প্রতি যদি আমরা স্থির লক্ষ্য রাখি, তবে মনোমধ্যে ধর্ম্মভাব আসিবেই আসিবে। কথাই আছে, 'মন সাঁচ্চা ত' জগৎ আচ্ছা।' এই ধর্ম্মভাব না থাকিলে প্রকৃত জ্ঞান আয়ত্ত হয় না। বলা বাহুল্য, চিত্তোৎকর্ষ-শিক্ষা সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা নহে। স্মরণ, সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া দেখা যায়, কেহ কেহ রিপুগণের বশীভূত হইয়া পার্থিব উন্নতির জন্য অন্যায় কার্য্যও করেন। এরূপ ব্যক্তি যে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, এ কথা আমরা কিরূপে স্বীকার করিব? বরং বলিতে হইবে যে, ঐরূপ বিদ্যা লাভ করিয়াও তাঁহার কিছুমাত্র উন্নতশিক্ষা লাভ হয় নাই। কিন্তু যিনি বিদ্যাশিক্ষা করিয়া অবিদ্যা-

রূপ দুর্নীতি দূরীভূত করিতে সচেষ্ট হন, তিনিই প্রকৃত শিক্ষিত। ধর্ম্মপালন ও নীতি-পালন উভয়ের নিকট সম্বন্ধ; এই ধর্ম্ম ও নীতির পালন এবং সংরক্ষণের জন্য যিনি যত্নবান্ না হইবেন, তিনি কখনই চিত্তোৎকর্ষ লাভ করিতে সক্ষম হইবেন না। চিত্তোৎকর্ষই মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ। মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ বুঝিতে হইলে, মানুষ নিজের জ্ঞান ও বিচারশক্তি দ্বারা মনুষ্যত্বের যতদূর উন্নত অবস্থা কল্পনা করিতে পারে, যদি সেইরূপ উন্নত অবস্থায় উঠিতে সতত সচেষ্ট হয়, তবেই সে আদর্শ পুরুষ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে সক্ষম হইবে। আদর্শপুরুষের আন্তরিক ভাবসমূহ ক্রমাগত নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তাদ্বারা আপনাকে সেইরূপ অবস্থায় সংস্থাপন করিতে করিতে নিজের প্রকৃতি সেই আদর্শ পুরুষানুযায়ী হইয়া যাইবে। সেইরূপ আদর্শ পুরুষ যথার্থ যে উন্নত অবস্থায় বিরাজ করেন, শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে তাহার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন,—

সর্ব্ব-ভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥

'ঈশ্বরে যোগযুক্তাত্মা পুরুষ সর্ব্বত্রে সমদর্শী হইয়া আপনাকে সর্ব্বভূতস্থ এবং সর্ব্বভূতকে আপনাতে দেখেন।' এইরূপ পুরুষই যথার্থ উন্নত পুরুষ।

এইরূপ উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইলে, বাল্যকাল হইতে মনকে উন্নততর নীতি-পালন ও ধর্ম্মপালন শিক্ষা করান একান্ত আবশ্যক। এই নীতি-পালন ও ধর্ম্ম-পালন সুরক্ষিত হইলে সাধারণ বিদ্যাশিক্ষায় অশিক্ষিত ব্যক্তিকেও সুশিক্ষিত, মহাপণ্ডিত ও মহাত্মা জ্ঞান করা উচিত; কেননা, তাঁহার মন এতই উন্নত, তাঁহার বাক্যাদি এতই সরল ও মধুর এবং পূর্ণজ্ঞানে বিভূষিত এবং তাঁহার উপদেশ যাবতীয় শাস্ত্রাদির উপসংহার স্বরূপ বেদ, বেদান্ত, সাংখ্য, ন্যায়, পাতঞ্জল, গীতা, উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্রোপদেশের এরূপ সমতুল্য যে, এরূপ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞানী মহাপুরুষকে অশিক্ষিত বলিলে বাক্যের অন্যায় প্রয়োগ হয়। তিনিই জ্ঞানী, যাঁহার আশয় বা অভিপ্রায় সদাই সৎ এবং কার্য্যকলাপও তদনুরূপ। সাধারণে এইরূপ অভিপ্রায় ও কার্য্য দেখিয়াই মানবকে ভাল মন্দ বিচার করে; কিন্তু উন্নতমনা পুরুষ সমদর্শী বলিয়া, তন্নিকটস্থ সর্ব্ববিষয়েই তাঁহার সমভাব বিদ্যমান। তাঁহার নিকট সৎ-অসতের ভেদ নাই। তাঁহার নিকট সৎও সৎ এবং সাধারণ চক্ষে যাহা অসৎ তাহাও সৎ; অর্থাৎ তিনি নিজে এত উন্নত এবং এতই মহৎ যে, তিনি জগতে সৎ ভিন্ন কিছুই দেখেন না। কিন্তু সাধারণ মানবকে এইরূপ আদর্শের সমতুল্য হইতে হইলে তাহার অন্তরে সদ্‌গুণ ও সদিচ্ছা যাহাতে বদ্ধমূল হয়, সে বিষয়ে যত্নবান হইয়া অভ্যাস করিতে হইবে।

এই সদ্‌গুণ আমাদের মনে সঞ্চার করিতে হইলে, কেবলমাত্র পুস্তক পাঠ করিলে হয় না। যদি আমরা সেই বিষয়টির উত্তমরূপে চিন্তাভ্যাস করিতে চেষ্টা না করি, তাহা হইলে তাহা আমাদের কিছুতেই আয়ত্ত হইবে না। সেই সেই সৎচিন্তা মনোমধ্যে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত করিয়া যদি একাগ্রচিত্তে চিন্তামগ্ন থাকিতে পারি, তবেই সেই

সচ্চিন্তার ফলে আমাদের মনোমধ্যে এক একটি সদ্ভাবের সচ্চিত্র উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে এবং তখন আমরা তাহাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব। আরও ঐরূপ অভ্যাসগুণে চিত্রগুলির সাকার মূর্ত্তি বহির্জগতে প্রকাশ করত নিজে আদর্শ মনুষ্য মধ্যে পরিগণিত হইতে সমর্থ হইব। অসৎ চিন্তা মনোমধ্যে আনয়ন করিলে মহাদুঃখে জীবনযাপন করিতে হয়। অসদ্ভাব মনে স্থাপন করিলে মন ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া মনের উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। অতএব অসৎ-ভাব মনে স্থান পাইতে যাহাতে না পারে, তজ্জন্য সতর্কতার সহিত, মনকে অতি পবিত্র ও সৎ-ভাবাপন্ন রাখা উচিত এবং বিবেকাধীন যুক্তিদ্বারা কোন্‌টি সৎ ও কোন্‌টি অসৎ বিচার করিয়া সৎএর প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং অসৎ দূরীভূত করিয়া মনকে দৃঢ়ভাবে সৎকর্ম্ম অভ্যাসেই আকৃষ্ট করা আবশ্যক। জীবের পক্ষে সৎ ও অসৎ পৃথক্; এই পৃথক্ ভাবাপন্ন জীব সদিচ্ছা ও সচ্চিন্তাকে অভ্যাসে পরিণত করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিলে, তাহার মনের বৃত্তিগুলি সুপথগামী হয়। এই সুপথগামী চিত্তবৃত্তিগুলি যতই উন্নত হইতে থাকিবে, ততই তাহার চিত্তোৎকর্ষ জন্মিবে এবং ক্রমশঃ অভ্যাস গুণে চিত্তনিরোধ-অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। ঋষিবর পতঞ্জলি সেই চিত্তবৃত্তি-নিরোধ করিবার অভ্যাসের নাম যোগ বলিয়া গিয়াছেন। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে বলেন,—

যোগঃ চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।

'চিত্তবৃত্তি-নিরোধের নাম যোগ।' যোগ নানা প্রকারে নানা নামে কথিত আছে। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখে অনেক প্রকার যোগের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—সাংখ্যযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ, গুণত্রয়-বিভাগযোগ, রাজযোগ, পুরুষোত্তমযোগ ইত্যাদি। কিন্তু মনকে দৃঢ়ভাবে অন্তর্মুখ করিয়া একাগ্রচিত্ত থাকাই আমাদের লক্ষিত যোগ।

মনকে একাগ্র করিতে হইলে সৎকর্ম্ম অভ্যাস দ্বারা মন স্থির করিতে হয়; তখন মন পবিত্র হয় ও জ্ঞানের উপলব্ধি হইয়া থাকে। তখন এই পবিত্র জ্ঞানকে দৃঢ়ভাবে অন্তর্জগতে স্থাপন করিতে সমর্থ হইলে, জ্ঞানী মনকে যে দিকে চালিত করিবেন, সেই দিকে লইয়া যাইতে সক্ষম হইবেন; কারণ মন তখন জ্ঞানীর সম্পূর্ণ অধীন হয়, মন জ্ঞানীর বশীভূত হওয়াতে জড়ের ন্যায় পরিচালিত হইতে থাকে। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত মন উন্নত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীব বিষয়-বাসনায় জর্জ্জরিত হইয়া মনের বশীভূত হইয়া কুপথগামী হওয়াই সম্ভব। কারণ, মন জীবের বশীভূত নহে, জীব মনের সম্পূর্ণ বশীভূত; সুতরাং জীব যন্ত্রের ন্যায় মনের পশ্চাৎগামী হইয়া বিপথগামী হইয়া পড়ে। কিন্তু জীব বস্তুতঃ যখন মনের বশীভূত নহেন, তখন জীব স্বাধীনভাবে সৎপথ অবলম্বন করিয়া মনের কুবৃত্তিদিগকে দমন করিয়া দৃঢ়চিত্তে সংযম অভ্যাস করতঃ মনকে বশীভূত করিয়া লইবেন

এই সংযত চিত্ত সম্পূর্ণ সদিচ্ছা-শক্তি দ্বারা জীবের উন্নতির সুপন্থা-প্রদর্শক হয়; সে

মন আর বিপথগামী হয় না। এরূপ ভাবে সতর্কতার সহিত মনের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করিলে ক্রমশঃ উন্নতির পথ সুগম হয়। এইরূপ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সৎচিন্তা ও সৎবুদ্ধির দ্বার চিত্ত পরিমার্জ্জিত করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে পরম আনন্দ উপলব্ধি করিয়া থাকেন এই পরিমার্জ্জিত বুদ্ধিবৃত্তি পবিত্র আনন্দের দ্বার হয়। দুঃখ নিবৃত্তি করিয়া আনন্দ উপলব্ধি করাই চিত্তোৎকর্ষ। আর উক্ত পরিমার্জ্জিত বিশুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিই মনের উন্নত অবস্থার সোপানস্বরূপ।

মনুষ্য এইরূপে চিত্তোৎকর্ষ লাভ করিলে এই বহির্জগতের সর্ব্বজীবেই সমজ্ঞান করিয়া থাকেন তখন তিনি সমদর্শী হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত গীতায় কথিত এই মহাবাক্যটি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়েন।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ॥

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মলিনার আত্ম-কাহিনী।

৫ বিভোর।

রাজার ঝিয়ারী নওল কিশোরী,
রূপের তুলনা নাই,
কালীয় বরণ কামুক চরণ
ধেয়ানে ধরল রাই।
কুলের ধরম সরম ভরম
ডালি দিল বঁধু পায়,
আপনা বলিতে যা' কিছু আছিল,
সকলি সঁপিল তায়।
বঁধু বিনা আর কা'রে নাহি জানে,
আন নাম নাহি মুখে,
জগতের মরি! যতেক মূরতি
বঁধু হ'য়ে রহে বুকে!
নয়ানের তারা বঁধু-রূপে হারা,
ভুবনে না হেরে আন,
বঁধুনাম ছাড়া আন হি শবদ
শুনিতে বধির কান।

শ্রবণ মনন ধারণ চিন্তন
বচন স্মরণ তা'র,
নানা ফুলে গাঁথা মালার মতন
একহুঁ পিরীতি হার!
বঁধুর লাগিয়া কলঙ্ক-কাঁকন
করের বলয় করে,
বঁধুর যতেক আলাই বালাই
আপনার দেহে ধরে।
গুরু-গঞ্জনায় প্রাণ ভেঙ্গে যায়,
নয়ানে না আনে জল,—
পাছে দুখে তা'র প্রাণ-বধুয়ার
বিদরে মরম-তল।
এহেন গোপীর আপনা পাসবা
পিরীতি যাহার নাই,
কেন সে মলিনা মাগে বধুযাবে?
লাজে কি মরেনা ছাই?

পিরীতি-মূরতি।

পিরীতি মূরতি রাই,
বিরলে বসিয়া পিরীতি ছানিয়া
বিহি নিরমিল তাই।
নয়ন যুগল পিরীতি কমল
টলিছে মধুর রসে,
রস-কলেবর ভুরু-ভরমর
সোহাগে তা' 'পর বসে।
সুধার অধর পিরীতি নিঝর,
হাসির কিরণ ঝরে;
কনক উরস পিরীতি-কলস
[illegible] ঝাঁকি উঠে।

পিরীতি শয়ন, পিরীতি স্বপন
পিরীতি-মগন রাই,
উঠিল যুবতী পিরীতি মূরতি
রসের সাগরে নাই'!
রূপ-রস-সার পিরীতি-পাথার,
তাহার কিনারে যাই'
হেরি' সে মূরতি বাড়ল আরতি,
মলিনা মলিনা নাই!

বঁধুয়ার ছবি।

দূর হতে দেখিলাম বঁধুয়ার ছবি,
যুগে যুগে আঁকে যা'রে মধু-লোভী কবি।
শিরে তার বিজড়িত আনন্দের চূড়া,
অলকা তিলকা ভালে সোহাগের গুঁড়া।
ভুরু দুটি চিদাকাশে ভাসে প্রেম-পাখী,
অবিমিশ্র অনুরাগে গড়া দুটী আঁখি।
মদন-জনম-ভুমি অধর যুগল,
কামনা নিঙাড়ি' গড়া বাঁশরী দীঘল।
চরণ-কমল বেড়ি' মিলন-নুপুর;—
সহসা বাজিল যেন ঝুমুর ঝুমুর!
দেখিতে দেখিতে ছবি হ'য়ে গেল ভুল,
মলিনা ধরিল বুকে দুটি রাঙা ফুল!

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

সাধনা ও সিদ্ধিতত্ত্ব।

প্রাচীন ঋষি গাহিয়াছেন ;—

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

যাহার যেমন ভাবনা, সে তদনুরূপ সিদ্ধিই প্রাপ্ত হয়—কিম্বা যে যাহা ভাবনা করে, সে তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই চিরন্তন সত্য কথাটী ভারতবর্ষের নিজস্ব—প্রাচীন আর্য্যজাতির মস্তিষ্ক-প্রসূত। যে কোন ঘটনাবলীর সহিত মিলাইয়া দেখিলে, উক্ত কারিকার সত্যার্থ আমাদের বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। এই জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর লীলাক্ষেত্র মরজগতের মধ্যে যাহা কিছু আমাদের সুখকর, যাহা কিছু আমাদের একান্ত বাঞ্ছনীয়, তাহা সমস্তই সাধন-সাপেক্ষ। বিনা-সাধনায় কোন কিছুই লভ্য হইতে পারে না। এই সাধনা ও ভাবনার মূলকারণ হইল ইচ্ছা, ইচ্ছা না হইলে কিরূপে ভাবনা উৎপন্ন হইবে? সুতরাং ইচ্ছার যে কি মহীয়সী শক্তি,ভাবনার যে কি অসাধারণ মহিমা, মানুষের মনের যে কি প্রবল ক্ষমতা, সকল মানব তাহা জানে না, জানিতে চেষ্টা করে না। এই যে বৈচিত্র্যময়ী বাহ্যপ্রকৃতি, এই যে নয়ন-বিমোহন শিল্প-সৌন্দর্য্য, ইহা কি মনঃ-প্রসূত নহে? ইহাও পরমেশ্বরের ইচ্ছা হইতে তাঁহার মন হইতে প্রসূত হইয়াছে। মানস শিল্পের ন্যায় সুন্দর শিল্প আর নাই,—হইতে পারে না। পক্ষান্তরে আত্মজ্ঞান বা আত্মোন্নয়ন, যাহার প্রভাবে মর্ত্ত্য জীব অমরত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাও মানস-শিল্পের অধীন—তাহাও সাধনসাপেক্ষ। সাধনায় মানুষ কি না করিতে পারে? পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ সাধন-প্রভাবে জড়-জগতের মধ্য হইতে যে সমস্ত সাধারণ জ্ঞানের অতীত অলৌকিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার মূলেও চিন্তাশক্তি। চিন্তা করিতে না পারিলে, সাধন-প্রভাবে সূক্ষ্ম জ্ঞানের বিস্তার করিতে না পারিলে, সভ্যতার উচ্চ-সোপানে অধিরোহণ করিতে পারা যায় না এবং কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ সুদূর-পরাহত হইয়া উঠে। পাশ্চাত্যগণ আজ সাধন-প্রভাবে মানসিক বলে ভূতগ্রামকে পরাজয় করিয়া জলে জলচরসম, আকাশে ব্যোমচরসম বিচরণ করিতেছেন। দূরস্থ বা মৃত গায়কের শব্দ-সুর-তান গ্রামোফোনে বদ্ধ, ও বজ্রাগ্নি-নিহিত তাড়িতকে ক্রীতদাসীর ন্যায় বশীভূত করিয়া, ব্যজনাদি সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। পক্ষান্তরে শিল্পবাণিজ্যাদি হইতে সাম্রাজ্য, সমৃদ্ধি, বল প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই তাঁহারা আজ জগতের আদর্শ-স্থানীয়। অভ্রভেদী পর্ব্বতের কঠোর গাত্র বিদীর্ণ করিয়া সুগম পথ নির্ম্মাণপূর্ব্বক রেল পাতিয়াছেন এবং প্রাচ্য শাস্ত্রচর্চ্চা, বৈদান্তিক ভাষ্য ও ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভপূর্ব্বক স্বদেশে তাহার প্রচলন করিয়াছেন; যে যোগজ অলৌকিক শক্তি একমাত্র প্রাচীন আর্য্যজাতির নিজস্ব ছিল, যাহা সিদ্ধযোগীজনের ভোগ্য ছিল, সে শক্তির ফলও পাশ্চাত্যগণ জাতিনির্ব্বিশেষে ভোগ করি-

তেছেন। এ সমস্তই সাধন প্রসূত। বিনা-একাগ্রতা,বিনা-ইন্দ্রিয়-সংযম,বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইতে পারে না। সাধন-প্রভাবে মানুষ সকলই করায়ত্ত করিতে পারে; সাধনায় মানুষ গভীর অন্ধকারের মধ্য হইতে নির্ম্মল আলোকরশ্মি দর্শন করে। কল্পনাদেবী যাহাকে স্বীয় রাজ্যে আবদ্ধ করিয়া মানবের কৌতূহলের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়া দেন, সাধনা তাহাকেও ধরিয়া আনিয়া রহস্য-ভেদ করিতে পারে। যে সূক্ষ্মতম যোগমার্গ আমাদের অজ্ঞাত, যাহার কথা শুনিয়া আমরা বিস্ময়াভিভূত হই, সাধন-প্রভাবে মানুষ তাহাকেও আয়ত্ত করিয়া স্বাভাবিক ভাবে কার্য্য করিতে পারেন। যিনি সাধনার পথে ইচ্ছাশক্তিকে মন-প্রাণে নিয়োজিত করিতে পারেন, তাহাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, তাঁহারই সিদ্ধিলাভ অনিবার্য্য। মৎস্য যেমন সলিল মধ্যে অবস্থান করে, সাধক যদি তেমনি ভাবে ডুবিয়া যাইতে পারেন, তবে তিনি "সিদ্ধির" অমৃতফল ভক্ষণে চির-অমর ও নিত্য সুখের অধিকারী হইতে পারেন। যিনি ক্ষুদ্র, যিনি একান্ত মনে ডুব দিতে ভীত হইয়া পড়েন, তিনি ক্ষুদ্র মীনের ন্যায় সলিল উপরে ভাসিয়া বেড়ান; সিন্ধু-রহস্য তিনি বুঝিবেন কি করিয়া? কবিবর নবীনচন্দ্র ব্যাসমুখে বলিয়াছেন:—

আমি ক্ষুদ্র মীন ভাসি উপর-সলিলে,
কেমনে বুঝিব সিন্ধু-রহস্য অপার।

উপর-সলিলে ভাসিয়া বেড়াইলে সিন্ধু-তলের রহস্য বুঝা যায় না। স্রোতের অনুকূলে দেহ ভাসাইয়া দিলে, স্রোত একদিন না একদিন কূলে ফেলিয়া দিয়া গন্তব্যস্থানে প্রস্থান করিবে। সুতরাং স্রোত-প্রতিকূলে তরঙ্গের উপরে হংসের ন্যায় বিচরণ করিতে না পারিলে, পুরুষের পুরুষত্ব ও মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে কোন্ উপায়ে?

সিদ্ধিভেদে সাধন-পথ বিভিন্ন বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে; যোগী যে বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার সাধন-পন্থা তদনুযায়ী হওয়া আবশ্যক। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, যোগ আদি পথাবলম্বনে সাধকগণ স্বীয় স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী মার্গে নির্ভয়ে চলিয়া যাইতে পারেন। যিনি ভক্ত, তাঁহার সাধন একরূপ, যিনি কর্ম্মী তাঁহার সাধন অন্যরূপ। জ্ঞানী জ্ঞানবলে, কর্ম্মী কর্ম্মবলে, যোগী ভাবনার বলে, ভক্ত ভক্তির বলে, ঋজু-কুটিল নানা পথে, সেই বাক্য মনের অগোচর অনন্ত পরমেশ্বরের রাজ্যে অসঙ্কোচে যাত্রা করিয়া থাকেন। যাঁহার যেমন রুচি, যাঁহার যেমন প্রবৃত্তি, তিনি তদনুরূপ মার্গ অবলম্বন করিবেন বলিয়া, শাস্ত্র সকল পন্থাই নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। যিনি বীর সাধক, তিনি নরবলিরূপ জীবত্বের বলি দিয়া, অভীষ্ট দেবীকে দীপ্যমান করিয়া, সিদ্ধিফল লাভ করেন। এইরূপে কেহ ঢাক-ঢোল বাজাইয়া, কেহ পুষ্পচন্দনাদি নানা উপচার লইয়া, কেহ স্তব-স্তুতি রচনা করিয়া, কেহ বা কঠোর তপস্যায় মন-প্রাণ বিদলিত করিয়া, কেহ ব্রতপালনে কেহ অনাহারে অনিদ্রায় কেহ বাতাহারে কেহ বা জলমাত্র পান করিয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ জন্য ছুটিয়া যান। সমস্ত সাধনই সমান কার্য্যকরী না হইলেও ক্রমোন্নতি বিধানে অভীষ্ট ফল কালে

লাভ হইতে পারে। সাধন পন্থা যেমন বিভিন্ন, সাধকও তেমনি বিভিন্ন—বাসনা-কামনা-ভেদে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত; সুতরাং ফলও তদ্রূপ হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

ঋজুকুটিল নানাপথ যুষাং গম্যস্তমসি পয়সামর্ণব ইব॥

যাহা হউক, এক্ষণে সাধকের কথা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, সাধক যখন সাধন-মার্গে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহাকে তাঁহার স্বীয় উদ্দেশ্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হয়। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির না হইলে অনন্ত বিস্তৃত সাধনরাজ্যে কেবলই পরিব্রাজকের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। নিত্যানিত্য বস্তুর বিচারই হইল ইহার মূল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থ নিচয়ের স্বরূপ বিচার করিয়া, তাহার সহিত আমার সম্বন্ধ কি, তাহা জানিয়া লইয়া যিনি সাধন-মার্গে প্রবেশ করেন, তাঁহাকে আর অভিভূত হইতে হয় না। সংসারস্থ অনিত্য বস্তুকে নিত্যবস্তু জ্ঞানে অনেক সময় আমরা ভ্রম করিয়া বসি। একমাত্র বিচার দ্বারাই সেই ভ্রম অপনীত হইতে পারে। এইরূপে নিত্যজ্ঞানের আবির্ভাব হইলে বাসনা-ক্ষয় ও বাসনা-ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে পাপ ও পুণ্য বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। একমাত্র ঈশ্বরই সত্য, অপর সকলই মায়াপ্রপঞ্চ—এই জ্ঞান হইলেই কামনার বহ্নি আর তাপ প্রদান করিতে পারে না। যাহা খণ্ডজ্ঞানবিশিষ্ট বদ্ধ জীবের মন বুদ্ধির অগম্য, মানব-ভাষায় অব্যক্ত, যাহা কেবল শাস্ত্র ও আগমপরম্পরাসিদ্ধ, তাহা কল্পনা দ্বারা কিরূপে উপলব্ধি হইবে? সদ্‌গুরুর উপদেশ সেই জন্যই সাধনক্ষেত্রে প্রয়োজন হইয়া থাকে। অনুরক্ত সাধক বিচার-প্রভাবে মনোমত পন্থা স্থিরনিশ্চয় করিয়া লইয়া তদুপযোগী মন্ত্র-সাধনে যত্নবান্ হইবেন কোন সাধনাই অস্বাভাবিক বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে না। যাঁহার যেমন সংস্কার ও শক্তি, যাঁহার যেমন মানসিক রুচি প্রবৃত্তি, তিনি তদুপযোগী পথের অনুসরণ করিলে পরিণামে সিদ্ধিলাভ (সেই সেই মার্গে) অবশ্যম্ভাবী সুবিজ্ঞ মানুষ চিন্তা দ্বারা প্রশ্ন-উত্তরের পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তবে উপযোগী সাধন-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন; নতুবা হঠকারিতা সহকারে কৃত যে কোনও কার্য্যই হউক না কেন, পরিণামে কখনই সুফল প্রদান করিতে পারে না।

যাহা হউক, সাধক যখন স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী মন্ত্রে দীক্ষিত হইবেন, তখন আর তাঁহার অন্য চিন্তার প্রয়োজন করিবে না। তিনি তখন শয়নে, ভোজনে, উপবেশনে, নিদ্রায়, জাগরণে, সর্ব্বাবস্থায় স্বীয় মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন ইষ্টমন্ত্র জপ বা প্রণিধান করিতে করিতে মনের একাগ্রতা সম্পাদিত হয়, মন সাম্যক্ষেত্রে উপনীত হইবার শক্তি লাভ করে। মুহূর্ত্তকালের জন্যও যাঁহার চিত্ত বিলয়প্রাপ্ত হয়, তিনিই প্রকৃত যোগ-মার্গারূঢ়। সমত্ব-লাভই সিদ্ধিলাভের প্রথম সোপান। মনকে বশীভূত করিবার জন্য, অশুদ্ধ চিত্তকে শুদ্ধ করিবার জন্য, শাস্ত্রে নানা প্রকার উপায় কল্পিত হইয়াছে। সকল ব্যবস্থাই যে সমান কার্য্যকরী, তাহা না হইলেও, অবস্থা-বিশেষে তদ্দ্বারা সুফল-লাভের আশা অসম্ভব

নহে। সাধকের অবস্থা-ভেদেই ব্যবস্থাভেদ কল্পিত হইয়াছে। তাহাতে হতাশের কারণ নাই—বরং মার্গভেদে যাহা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, সুস্থিরচিত্তে তাহাতেই আস্থা স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। অন্ধকার রাত্রিতে নাবিকবৃন্দ যেমন ধ্রুব-তারার প্রতি ধ্রুবলক্ষ্য রাখিয়া নানা-হিংস্রজন্তু-সমাকুল অনন্তবিস্তার সমুদ্রের জলরাশি ভেদ করিয়া লক্ষ্যস্থানাভিমুখে অগ্রসর হয়; সাধকগণও তদ্রূপ স্বীয় সাধ্যের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া, কামক্রোধাদিকে ধীরে ধীরে পরাজয় পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে থাকেন। এইরূপে সাধক যখন যথার্থই সাধনমার্গে প্রবেশ করেন, যথার্থই সিদ্ধিলাভের জন্য সাধনায় মন-প্রাণ সমর্পণ করেন, তখন তাঁহার কোন কার্য্যই অর্থশূন্য করিয়া কৃত হয় না। তিনি সকল বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া তবে শক্তি-প্রয়োগ করেন; তাঁহার আহার-পান, তাঁহার নিদ্রা-জাগরণ, তাঁহার শয়ন-উপবেশন, তাঁহার কথাবার্ত্তা, সমস্তই অর্থপূর্ণ—তিনি তাঁহার প্রকৃতিগত বাসনাকে বিচার-যুক্ত ভোগের দ্বারা ও যে সমস্ত বাসনা অপরের অবস্থা দর্শনে সাময়িক মনোমধ্যে উদয় হয়, তাহাও উক্ত উপায়ে নিস্তেজ করিয়া ফেলেন। বিচার সহিত ভোগই ভোগ শব্দবাচ্য; অবিচারে যাহা ভোগ, তাহাকে পণ্ডিতগণ "উপভোগ" নামে বর্ণনা করিয়া থাকেন। সুতরাং ধর্ম্ম-জীবন-কামী সাধকগণ বাসনাকে সাধনপথের বিষম অন্তরায় ও পরম শত্রুজ্ঞানে তাহার ক্ষয়মানসে যে ভোগ্যবস্তু ভোগ করেন, সে ভোগে বাসনার বহ্নি পুনঃ প্রজ্বলিত হইবার অবসর পায় না—বরং অতিশীঘ্র নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।

যে সকল মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করিতে পারে না, যাহারা সকল ক্ষেত্রেই পরি-চালিত হইতে ইচ্ছা করে, তাহারা কোনও কালেই সাধক শ্রেণীভুক্ত নহে। যে মন্ত্র-গ্রহণ করে নাই, পক্ষান্তরে মন্ত্র গ্রহণ করিয়াও যিনি তদুপযোগী কার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই, তাঁহাদের জীবন বিড়ম্বনাময়—তাঁহাদের জীবন অর্থশূন্য। তাঁহারা বায়ু-তাড়িত শুষ্কপর্ণের ন্যায়—যে দিকে যখন বায়ুবেগ বর্দ্ধিত হয়, শুষ্কপর্ণ যেমন সেইদিকেই উড়িয়া যায়, তেমনই—অন্তঃসারশূন্য তরলমতি মানুষ লক্ষ্যশূন্য জীবন লইয়া বৃথাই ভবধামে বিচরণ করেন। সেই সকল মানুষের দ্বারা কোন যুগেই কোনও কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না বরং তাঁহাদের কর্ত্তৃক বৈষম্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—তাঁহারা "সাম্যের" অন্তরায়-স্বরূপ হন। দৈহিক সুখকর পান-ভোজনের, বিলাস বাসনার চরিতার্থতাকেই তাঁহারা পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন; তাঁহাদের অবৈধ চেষ্টায় সমাজে অশান্তি উপস্থিত হয়, পরিণামে তাঁহারাও বৃথা দুঃখ ভোগ করেন। আজ-কাল গুরুশিষ্য সম্বন্ধ অধিকাংশ স্থলে স্বার্থ-সাধন জন্য—ব্যবসায়রূপে পরিণত হইয়াছে। গুরুগণ গুরুর দায়িত্ব অনুভব করিতে পারে না। অজ্ঞান জীবকে সৎপথে পরিচালিত করিয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া মুক্তি-লাভের সাহায্য করাই গুরুর সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। "গুরু" শব্দের অর্থ গ্রহণ করিলেও তাহাই উপলব্ধি হইয়া থাকে। সকল ক্ষেত্রেই—কি রাজনীতি, কি সমরনীতি, কি ধর্ম্ম-

নীতি, কি আধ্যাত্মিক উন্নতি,—গুরুগণই একমাত্র পথ-প্রদর্শক। সকল বিষয়েই সুশিক্ষা লাভ করিতে হইলে "গুরুকরণের" প্রয়োজন হইয়া থাকে। এ হেন দায়িত্বপূর্ণ গুরুপদ সাধারণ মনুষ্য কথনই অধিকার করিতে পারে না। গুরুর প্রথম কর্ত্তব্য, শিষ্যের প্রকৃত ধর্ম্ম-পিপাসা জন্মিয়াছে কি না? দ্বিতীয়, তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শিষ্য চলিতে সক্ষম কি না?—তাহা নির্ণয় করা। এক অন্ধ যদি অপর অন্ধের পথ-প্রদর্শক হয়, তাহা হইলে পরিণাম যেমন সুখকর হয় না, উভয়েই গর্ত্তে বা কণ্টকে নিপতিত হইয়া যন্ত্রণা ভোগ করে, তেমনই গুরুশিষ্য-নির্ব্বাচন যথাযোগ্য না হইলে, পরিণামে অঘটনই আনয়ন করে। সদ্‌গুরুর উপদেশ ভক্তিভাবে হৃদয়ে ধারণ করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে যত্ন করাই শিষ্যের কর্ত্তব্য। কোন কোন অজ্ঞ ব্যক্তি গুরুকে তাঁহার উপযুক্ত শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে তাঁহার কৃপাকেই মুক্তিলাভের উপায় বলিয়া ভ্রম করিয়া বসেন কিন্তু ইহা সমীচীন ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। যে ছাত্র পাঠশালার গুরুমহাশয়ের মাত্র তামাক সাজে ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন করে, সে ছাত্র পরীক্ষকের হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে কি? প্রকৃত গুরুগণ গুরুর দায়িত্ব গ্রহণ করিতেই সম্মত হন না; জিজ্ঞাসু ভক্ত যে প্রশ্ন করেন, তাহার যথার্থ উত্তর প্রদান করাই তাঁহারা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন।

যে সাধকের মন্ত্র নাই, সে সাধকের সাধনও নাই। কামনা ও ইচ্ছাশক্তি এক ক্ষেত্রে ক্রীড়াকারিণী হইলেও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে যথেষ্ট ভেদ রহিয়াছে। কামনা ইচ্ছার দাসী মাত্র—প্রবৃত্তির বশে অশান্ত অন্তঃকরণে কামনার উদয়, ইচ্ছা তাহা পূরণ জন্য স্বীয় শক্তি নিযুক্ত করে; সুতরাং ইচ্ছাই হইল মহাশক্তির সহকারিণী ব্যষ্টিশক্তি। দীক্ষিত সাধকগণ কামনা শূন্য হইয়া ইচ্ছাশক্তিকে মঙ্গলময় ইষ্টের দিকে পরিচালিত করেন। তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি, তাঁহাদের ভাবনাবৃত্তি ইচ্ছার অনুকূলে ক্রীড়াকারিণী হইয়া ইষ্টদর্শন জন্য একভাবে ধাবিত হইয়া থাকে। সকল সত্তা এক ইচ্ছার সত্তায় মিলিত হইয়া মন মহাশক্তি ধারণ করে—তাহার সত্তাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলে। সাধনার দ্বিতীয় সোপানে অধিরোহণ করিতে হইলে ইচ্ছাশক্তিকে সঙ্গে লইয়া উঠিতে হয়। ইচ্ছা তীব্রতর না হইলে ইষ্টদর্শন সহজসাধ্য হইতে পারে না; সে অভীষ্ট-দেবতার রহস্য-দ্বার দশের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দেয় না, তাহাকে কেবলই গোপনে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। তরলমতি সাধকগণ কামনার বশে ইচ্ছাকে পরিচালিত করিয়া কল্পনার কাননে প্রবেশপূর্ব্বক মন্ত্র নষ্ট করিয়া ফেলেন। অজ্ঞের ন্যায় স্থূলনেত্রে স্থূল সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া যান—তাঁহারা "সিদ্ধিলাভ" জন্য কামনার দাস হইয়া পড়েন। মন্ত্রগুপ্তি যেমন যোদ্ধৃপুরুষগণের যুদ্ধ-জয়ের সর্ব্ব প্রধান অঙ্গস্বরূপ, মন্ত্রগুপ্তি তেমনই সাধকগণের সাধনরাজ্য-জয়ের অঙ্গস্বরূপ। লোকে কথায় বলে "ভোজন ভজন গোপনে—প্রকাশ্যে নহে।" যে মন্ত্র লোকারণ্য মধ্যে পরিভ্রমণ করে, যে মন্ত্র লোকের মুখে মুখে ধ্বনিত হয়, তাহা ভাষা মাত্র—তাহার মন্ত্রত্ব নষ্ট হইয়া যায়, তাহার কেন্দ্রবদ্ধ শক্তি বিচ্ছিন্ন

হইয়া পড়ে। সেই জন্যই মন্ত্র ও মন্ত্রণা গোপনে রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন, "মন্ত্র" গোপনে রাখিলে তাহার সত্যানৃত পরীক্ষার উপায় কি? এ প্রশ্ন সর্ব্বথা সঙ্গত। স্বর্ণের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করিতে হইলে যেমন অগ্নিতে দগ্ধ বা কষ্টিপাথরে কষিয়া লইতে হয়, তেমনই মন্ত্রকে জ্ঞানের অগ্নিতে বা ধ্যানের কষ্টিপাথরে কষিয়া লইলেই চলিতে পারে; তাহার জন্য সাধককে, বিব্রত হইবার প্রয়োজন নাই। মহাত্মা যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছেন, "তোমার দক্ষিণ হস্ত যে কার্য্য করিবে, বাম হস্ত যেন তাহা জানিতে না পারে।" রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে মন্ত্রগুপ্তি যেমন আশ্চর্য্য ফলপ্রসূ, সাধনক্ষেত্রেও তদ্রূপ। লঘুচিত্ত ব্যক্তিই স্বীয় মন্ত্র প্রকাশ করিয়া ফেলেন। যথেষ্ট সাবধানে ও সন্তর্পণে একাগ্রতাবলম্বন করিয়া ধ্যান করিতে পারিলেই, আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সত্যের সহিত মন্ত্রের সত্যতা একাকার অবস্থায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে; সুতরাং তজ্জন্য বিব্রত হইবার প্রয়োজন নাই। স্বীয় অনুভূতিই এ ক্ষেত্রে কার্য্যকরী। পণ্ডিতগণ সাধনের পাঁচটী অঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এই পঞ্চাঙ্গ সকল সাধনেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। প্রথম মন্ত্র বা দেবতা-নির্ব্বাচন, দ্বিতীয় মন্ত্রগুপ্তি, তৃতীয় উৎসাহসহকারে মন্ত্র-মার্গে প্রবেশ, চতুর্থ মন্ত্রশক্তির প্রয়োগ এবং পঞ্চম তাহাতে আত্ম-বিসর্জ্জন। তা'রপর যে ফল লাভ হইবে বা লাভ হইবার সম্ভাবনা, তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। 'অহং' বিসর্জ্জন দিয়া সাধো ডুবিয়া যাইতে পারিলে সিদ্ধিফললাভ অবশ্যম্ভাবী। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে মানুষ পশুত্ব হইতে দেবত্বে উন্নীত হইয়া চির-অমর এবং ইচ্ছা করিলে নিত্য-সুখের অধিকারী হইতে পারে। সে সুখ, সে আনন্দ, ভাষার সাধ্য নাই যে, ব্যক্ত করিতে পারে।

শাস্ত্র যে কর্ম্ম ও উপাসনা সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন, তাহা কেবল অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম ও উপাসনাদির নির্ণয় জন্য। জ্ঞানী আত্মবিকাশ-পরায়ণ ব্যক্তিগণ বিচার-ব্যতিরেকেও তাহা শীঘ্র নির্ণয় করিবেন বলিয়া। সুতরাং উহা লইয়া কালক্ষয় করা যুক্তিযুক্ত নহে। পঞ্চদশীকার বলেন,—শাস্ত্রে উপাসনার নানা অনুষ্ঠান বর্ণনা করা হইয়াছে। বিচারে অপারগ ব্যক্তি গুরুর মুখে শ্রবণ ও তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া উপাসনা করিবে; কিন্তু যাঁহারা উচ্চ-শ্রেণীর সাধক, যাঁহারা বাক্য-মনের অগোচর ব্রহ্মবস্তুকে পাইতে কামনা করেন, তাঁহাদের সাধন-পন্থা বিভিন্নরূপ। বিচার-ব্যতিরেকে উপদেশের দ্বারা উপাসনার অনুষ্ঠান (গুরূপদেশে) সম্পন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার-রূপ "অপরোক্ষ জ্ঞান" উদিত হইতে পারে কি না, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। পঞ্চদশীকারও তাহা স্বীকার করিয়াছেন; সুতরাং আমাদের বিবেচনায় অপরোক্ষ জ্ঞান অর্জ্জন জন্য বিচারের প্রয়োজন স্বতঃই উপলব্ধি হইয়া থাকে। উপনিষদ্ বলিয়াছেন;—

শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যন্ন বিদ্যুঃ ॥

"শ্রবণ করিয়াও বুদ্ধিহীনতা প্রযুক্ত তাঁহাদের বোধগম্য হয় না।" মহর্ষি বামদেব মাতৃগর্ভে শয়ান থাকিয়া পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার-প্রভাবে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন, শাস্ত্রে

এরূপ প্রমাণ রহিয়াছে। কিন্তু সকলের ভাগ্যে তাহা না হইলেও অভ্যাস-প্রভাবে সংস্কার দৃঢ় হওয়া স্বাভাবিক। এখানে অভ্যাসই হইল মূল; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জ্জুনকে তাহা বলিয়াছেন। সুতরাং অভ্যাস-প্রভাবে সাধকের অজ্ঞানতা যখন ধীরে ধীরে অপগত হইয়া একটু একটু জ্ঞানের বিকাশ হইতে থাকে, তখন ক্রমে এই বিশ্ব তাঁহার নিকট আত্মবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। পূর্ণজ্ঞানে সংস্থিত সাধকের নিকট জগৎ-সংসার নিতান্ত অসার বস্তুর ন্যায় প্রতীয়মান হয় প্রথমাবস্থায় ইহা হেয়, ইহা উপাদেয়, এইরূপ জ্ঞান থাকিলেও দ্বিতীয়াবস্থায় আর তাহার দৃঢ় সত্তা থাকে না। তখন ভাল-মন্দ সকলই আত্মময় বলিয়া জ্ঞান হইতে থাকে। জগৎ সেই সচ্চিদানন্দেরই স্থূল বিরাট দেহ বলিয়া সাধকের নিকট সতী-অসতী, স্বর্ণ-মৃত্তিকা, চোর-দস্যু, যতি-জিতেন্দ্রিয় সকলই আত্মার বিভিন্ন অবস্থা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তখন আর কোন বস্তু বা ব্যক্তিতে ভাল-মন্দ, ঘৃণা-দ্বেষের সম্ভাবনা থাকে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মা হইতে স্বতন্ত্র জড়-বস্তুর অস্তিত্ব-জ্ঞান, ততক্ষণই স্বার্থ জ্ঞান, স্ত্রী পুরুষ ভেদ জ্ঞান ও তাহার গুণাগুণ-ভেদ জ্ঞান। শাস্ত্রে ইহারই নাম সংস্কার। সংস্কার নষ্ট হইলেই ঈশ্বর-জ্ঞানের উদয় হেতু জগৎ-জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়। গৌরাঙ্গদেব জলে স্থলে, অনলে অনিলে শ্রীহরির সত্তা দর্শনে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন। তিনি জগৎ-সংসারকে "হরিময়" দর্শন করিয়া প্রেমের অমৃত-বন্যায় সমস্ত বঙ্গভূমি প্লাবিত করিয়া দিয়াছিলেন। সাধনার অতল তলে নিমগ্ন হইতে না পারিলে প্রকৃতি সাধককে পরিত্যাগ করেন না, তাঁহার ভেদাত্মক ভাবও দূর হয় না।

এইরূপ সাধনে যাঁহারা মানুষকে দুর্ব্বল ভাবিয়া অশক্ত মনে করেন, তাঁহারা মানব-শক্তির বিষয়ে সম্যক্ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন নাই, তাহা নিঃসন্দেহ। কে বলে মানুষ দুর্ব্বল? কে বলে প্রকৃতির শাসনে মানবাত্মা শাসিত? যে হৃদয়ে উৎসাহ নাই, যে হৃদয়ে উদ্যম নাই, যে প্রাণে মহাশক্তির মহানৃত্য নাই, সে হৃদয় জরাগ্রস্ত, ব্যাধিপীড়িত সুতরাং চির-অকর্ম্মণ্য। সাধকের হৃদয় কোনও কালেই অবসন্ন হয় না, সে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায় না—জীবনের শেষ-নিশ্বাসেও সাধক মন্ত্র ত্যাগ করেন না। তাঁহারা সে অবস্থাতেও অভূতপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় দিয়া থাকেন। সাধক জরা-ব্যাধি-মৃত্যুকে দেহধর্ম্ম জ্ঞানে "অভয়-স্বরূপে" প্রতিষ্ঠিত হইয়া নির্ভয় হইয়া যান। তাঁহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে দিব্যজ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠে—তাঁহার মানসশক্তি পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান থাকে; কিন্তু তাঁহার ক্রীড়াকারিণী শক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা দগ্ধসূত্রের ন্যায় নামমাত্রে থাকে মাত্র। আর যাঁহার তাহা হয় না, যাঁহার মন পৃথক্ অস্তিত্ব লইয়া পৃথক্ বস্তু-সত্তা অনুভব করে, তিনি কর্ম্মানুরূপ সংস্কার লইয়া পুনঃ অবনী-তলে নূতন দেহ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এখানে মনই বীজ-স্বরূপ—বীজ ভিন্ন বৃক্ষোৎপত্তি হইবে কি করিয়া? ভর্জ্জিত বীজে যেমন অঙ্কুরোদ্গম অসম্ভব, তেমনই ভক্তি বা জ্ঞানানলে ভর্জ্জিত মন-বীজে দেহোৎপত্তি অসম্ভব। এই মন

অন্ন-উপচিত সামান্য পদার্থ বলিয়া গ্রহণীয় হইতে পারে না। মনোবৃত্তি মনের প্রত্যঙ্গ-স্বরূপ,—অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সহ মন "কারণে" বিলয়-প্রাপ্ত হইলেই সাধক ব্রহ্মভূত হইয়া থাকেন। ব্যুত্থানে তাঁহারই নিকট সৃষ্টি মরীচিকা-সদৃশ—জীব, ঈশ, ব্রহ্ম তাঁহারই ত্রিকালের অবস্থাত্রয়।

বীরগণের মধ্যেও এইরূপ সাধন-শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহারাণা প্রতাপ-সিংহ মৃত্যুকালেও জননী জন্মভূমির চিন্তা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি স্বদেশের পরিণাম চিন্তায় অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহামতি ওয়াসিংটন বৃদ্ধ বয়সেও স্বজাতি ও স্বদেশের কথা চিন্তা করিতেন। ডেনিয়েল্ জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়াও প্রিয়তম আয়র্লণ্ডের মঙ্গল-কামনা করিতে পারিয়াছিলেন। এই সমস্ত মহাবীরগণও এক শ্রেণীর সাধক। পৃথিবীতে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। সাধকগণের যৌবনের উন্মত্ততা—লোচনযুগলের তীব্র প্রভা কোন কালেই স্তিমিতভাব ধারণ করে না।

ধর্ম্ম-পিপাসু ভগবৎ-পদকামী সাধকগণের সাধনা কি ভয়ঙ্কর! সে কথা স্মরণ করিতেও ভয় হয়। স্বামী বিবেকানন্দ অন্তরস্থ প্রবৃত্তির বিনাশ বাসনায় অগ্নিকুণ্ডে উপবেশন করিতেও কিছুমাত্র ভীত হন নাই। তাঁহারা বিসর্জ্জনকে আহরণের উপায়-জ্ঞানে আরাধনায় নিযুক্ত হইয়া "আপনাকে" বিসর্জ্জন দিয়া দেন। ভক্ত যেমন আপনার অভীষ্ট সাধ্যের চরণ-যুগলে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া কৃতার্থ হন, তাঁহাতে বিলীন হইবার জন্য সকাতর প্রার্থনা করেন, মনের পৃথক অস্তিত্ব রাখিতে পছন্দ করেন না, তেমন তাঁহারা নিন্দা ও যশ, ভাল ও মন্দ কিছুই গ্রাহ্য করেন না; তাঁহারা ক্ষুদ্র স্নেহমমতায় আবদ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়-সংযোগ হইতে উৎপন্ন ভাবের প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন না। তাঁহারা বিলাস-বাসনাকে সবলে দূরীকৃত করিয়া নিঃসঙ্গ হইয়া আত্মরতি হইয়া পড়েন। সে সময়ে তাঁহারা জীবিত কি মৃত, চেতন কি অচেতন, কিছুই নির্ণীত হয় না। সাধারণ মনুষ্য ইহা শ্রবণ করিতেও ভীত হইয়া পড়ে। মহামুনি বাল্মীকির সমস্ত অঙ্গ বল্মীকে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, তাঁহার দেহ জড়জ্ঞানে বল্মীককুল আবাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছে; তথাপি তিনি "রামনামের" অতলতলে নিমগ্ন—তাঁহার হৃদয়ের যে তন্ত্রীতে তুমি আঘাত কর না কেন, সেই তন্ত্রী হইতেই রামনাম ঝঙ্কার দিয়া উঠিবে! রামনামের সুধাপানে তিনি অমর হইয়া গিয়াছেন। আত্মোৎসর্গের অত্যাশ্চর্য্য ও অভাবনীয় শক্তিতে অসাধ্যও সুসাধ্য হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে প্রতীয়মান হইবে, ইচ্ছাশক্তিকে যথাযথ প্রয়োগ করিতে পারিলে মানুষ অসাধ্য সাধন করিতে পারে, সকল কার্য্যই স্বাভাবিক ভাবে নিষ্পন্ন হইতে পারে। ভারতীয় সাধকগণ হিমগিরির হিমরাশিতে ভীত হন না, গ্রীষ্মের প্রখর তাপ তাঁহাদিগকে কিছু মাত্র সন্তাপিত করিতে পারে না। এমন কি বাহ্যদৃশ্য হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য মানব-জীবনের সর্ব্ব প্রধান চক্ষুর্দ্বয়কেও তাঁহারা উৎপাটিত করিয়া ফেলেন! ইহাও এক শ্রেণীর সাহসিকতা। যুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জন ভিন্নও সাহস ও

বীরত্বের নানা প্রকার আছে। সাধকগণ মহাবীর অপেক্ষাও সহিষ্ণু—সাহসিকতায় অলৌকিক সাহসবান্। ভারতের দুর্ভাগ্য যে, এই শ্রেণীর সাধক-সংখ্যা খুবই অল্প হইয়া গিয়াছে; যাঁহারা আছেন, তাঁহারা কে কোথায় বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করিতেছেন, কে তাহার সংবাদ রাখিবে? আজকাল বিলাসের মধ্য হইতে সাধনের মন্ত্রধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে; তাঁহারা 'শ্যাম ও কুল' উভয় দিক্ই বজায় রাখিতে চান। ইহাতে বুদ্ধিবৃত্তির প্রখরতার পরিচয় পাওয়া গেলেও সিদ্ধিলাভ সুদূর-পরাহত। আত্মজ্ঞগণ ইহাকে কোন কালেই 'সাধন' নামে অভিহিত করিতে পারেন না। এ কথা সঙ্গত যে, প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ (চক্ষু-উৎপাটন, হেঁটমুণ্ডে অবস্থান প্রভৃতি কার্য্য) না করিয়া সাধন করাই শ্রেয়ঃ। যাহাতে যতটুকু মানব মঙ্গল সাধিত হয়, ঐ সকলে তাহা হয় না। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, সাধনে নিরত ব্যক্তির আত্ম-নিগ্রহই প্রধান অবলম্বন ও ত্যাগই যথা-সর্ব্বস্ব। আত্মবিসর্জ্জনে অপারগ ব্যক্তি কোন যুগেই যশোলাভ করিতে পারেন নাই—এ যুগেও পারিবেন না।

তুমি জ্ঞানী, তুমি প্রেমিক, তোমার আবার সুখ-লালসা কেন? তোমার আবার ভালমন্দ কেন? তোমার আবার সম্প্রদায় কেন? পূজনীয় সোহং স্বামী বলেন;—

বিশ্বাত্মক জ্ঞান যার সর্ব্বভূতে প্রেম হয়,
হেয় আত্মপর বোধ তাহার সম্ভব নয়।
বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা প্রেমিক রসিক জনে,
কঠোর নিঠুর শুষ্ক—অজ্ঞগণ ভাবে মনে।
সংসারীর প্রেমদীপ গৃহ-বিশেষের তরে,
আত্মজ্ঞের প্রেমরবি ব্রহ্মাণ্ড উজল করে।
আসক্তের প্রেম-কূপ জীব-বিশেষের তরে,
জ্ঞানীর প্রেম-সাগর বিশ্ব বিপ্লাবিত করে।
পিতৃমাতৃস্নেহ যত ক্ষীণ প্রস্রবণ-প্রায়,
নহে জগতের তরে' সুত সুতা তৃপ্ত তায়।
জগতের আধ্যাত্মিক পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত,
ন্যাসীর স্নেহ জলদ করে ধরা বিপ্লাবিত।
জ্ঞান ফল বিশ্বপ্রেম স্বস্তি সম-দরশন,
জীব সাধারণে তাহা সম্ভবে না কদাচন।

ইহা হইতে বোধগম্য হইবে, অপ্রশস্ত প্রস্রবণে স্রোতের বেগাধিক্য লক্ষিত হইলেও, যত পরিসর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা ততই মন্দগতি প্রাপ্ত হয় এবং পরিশেষে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে প্রবাহিত হইলে আর স্রোতের লক্ষণই তাহাতে দেখা যায় না। কিন্তু জ্ঞানীগণের হৃদয়-সাগরে যে উর্ম্মিপ্রায় বিশ্বপ্রেম, জগতের সমস্ত প্রাণী তাহাতে মৎস্যের ন্যায় ক্রীড়া করিতে পারে—সে প্রেমে আবেগের লক্ষণ নাই—সে প্রেম 'প্রশান্ত' মহাসাগরের ন্যায় প্রশান্ত,

স্থির। তাই বলি ভাই সাধক! তোমার মন্ত্র তোমাকে যে শক্তিসাধনায় নিযুক্ত করিয়াছে, তুমি তাহা হইতে কদাচ অপসৃত হইও না। তুমি প্রেমিক, তোমার দৃষ্টি যেন কখনও পার্থিব বৈভব-লাভে কলুষিত না হয়। তাহাকে লোকে ব্যবসায় বলে। সাধক! তুমি যদি সচ্চিদানন্দ-সমুদ্রে ডুব দিয়া থাক, তুমি যদি তৃষিতের ন্যায় ভগবৎ-প্রেমের উৎস পান করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার লাভ-ক্ষতি, মান-অপমান, ভাল-মন্দ, পসার-প্রতিপত্তি সকলই ভুলিয়া যাও। যিনি জগতের কিম্বা স্বদেশের হিতকামনায় আত্ম-বিসর্জ্জনে উদ্যত, তাঁহার আবার স্বীয় আত্মার পরিণাম চিন্তা কেন? দেশের, দশের বা জগতের হিত করিতে গিয়া যিনি আত্মচিন্তা করিতে বসিবেন, তিনি উন্মাদ—তিনি সাধক-কুলের কলঙ্ক। সেইরূপ সাধকগণ হইতে সমাজে অশান্তি উপস্থিত হয়, নন্দন নরকে পরিণত হইয়া পড়ে! তাঁহারা বিষাক্ত বীজাণু ছড়াইয়া দিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া দেন মাত্র।

ভাই সাধক! তুমি যদি জ্ঞানী হইতে বাসনা কর, তুমি যদি প্রেমিক হইতে চাও, তুমি যদি আত্মোন্নয়ন কামনা কর, তবে মহামতি যীশুখ্রীষ্টের ন্যায় ক্রুশকাষ্ঠে স্বীয় নশ্বর দেহ লম্বমান করিয়া দাও—দেহাভিমান পরিত্যাগ কর। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় সন্ন্যাস ও ইন্দ্রিয় সংযম অভ্যাস কর—"মহাপ্রভুর" ন্যায় প্রেমিক হও, রামচন্দ্রের ন্যায় অস্পৃশ্য চণ্ডালকেও "মানুষ" জ্ঞানে প্রেমালিঙ্গন কর। ভারতীতীর্থ বিদ্যারণ্য মুনি রাজ-সিংহাসন বিসর্জ্জন দিয়া তৃণাসনের সহিত তাহার একত্ব দেখাইয়া দিয়াছেন। সাধকের নিকট সিংহাসন ও তৃণাসন উভয়ই সমান। শাস্ত্রে আছে, এক জন রাজা যোগী হইতে পারেন নাই, কেননা তিনি কমণ্ডলুর মমতা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

সাধকের যখন স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, তখন উৎসাহই তাঁহার রসায়নের কার্য্য করিয়া থাকে; "ভেলা-যোগে সমুদ্র উত্তীর্ণ" কথার মধ্যে যদি কোন সত্য থাকে, এবং তাহা যদি সম্ভবপর হয়, তবে অধ্যবসায়ই তাহা সম্পন্ন করিতে পারে। সাধক-হৃদয় যখন প্রকৃতির শাসনে অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন গুরুদত্ত মন্ত্রই উদ্দীপনার প্রধান সহায়। সত্যপ্রতিজ্ঞ ভারত-গৌরব বীরপ্রবর ভীষ্মদেব স্বধর্ম্ম-পালনার্থ বয়সের বাধা গ্রাহ্য করেন নাই, স্নেহ-মমতা তাঁহাকে সত্য হইতে বিচ্যুত করিতে সমর্থ হয় নাই সাধনক্ষেত্রে প্রথমাবস্থায় পদে পদে পদস্খলন সম্ভবপর হইলেও, সে আঘাতে ভীত হইতে হয় না। শিশু যখন প্রথম হাঁটিতে শিখে, তখন তাহার সহস্রবার পদস্খলন হয়, বারম্বার পতন জনিত আঘাতে অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়, কিন্তু তথাপি সে পুনর্ব্বার চেষ্টা করিয়া থাকে; বারম্বার চেষ্টার ফলে সে হাঁটিতে শিখে। একদিন হয়ত তাহারই প্রতাপে, তাহারই বুদ্ধিতে, সহস্র সহস্র ব্যক্তি পরিচালিত হয়, সে অসাধ্য সাধন করে; তাহার পূর্ব্বের কোমল অঙ্গ শত অস্ত্রাঘাতেও ভাঙ্গিয়া পড়ে না। ইহা হইতে হৃদয়ঙ্গম হইবে, অধ্যবসায়ই মানুষকে উন্নত করিয়া দেয়, তাহার সমস্ত প্রকার সৌভাগ্য আহরণ করে। অধ্যবসায়ের সঙ্গে যখন শম, দম,

তিতিক্ষা আদি মিলিত হইয়া পড়ে, তখন সাধকের কোন ভয়ই থাকে না; তিনি তখন নির্ভয়ে বলিতে পারেন,--

অভয়-স্বরূপ আমি কোথায় আমায় ভয়
জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু ভূতজ দেহের হয়।

সে অবস্থায় পাপ-পুণ্য নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, সতী-অসতী নাই; তাঁহার দেহে পদাঘাত করিলেও তিনি পুষ্পবর্ষণের ন্যায় মনে করেন। সহিষ্ণুতার এমনই প্রভাব! শমদমের এমনই কার্য্যকারী শক্তি! সহিষ্ণু সাধক অবিচলিত হৃদয়ে মহাকালের মহানৃত্য সন্দর্শন করেন; "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" তাঁহার নিকট "শান্তং শিবমদ্বৈতং হইয়া দেখা দেয়।

"নীরব সাধনা" ভাষায় গ্রথিত হইয়া পাঠ্যপুস্তকে পরিণত হইলে চলিবে না। পাঠ-কালীন ক্ষণিক উত্তেজনা বা শ্মশান-বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে কোনই সুফলের আশা করা যায় না আমরা মন্ত্র-নির্ব্বাচনে উদাসীন, মন্ত্ররক্ষায় অসমর্থ। একজন মনীষী বলিয়াছেন;— 'যে দেশের লোক প্রাতঃকালে কার্য্য আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যায় ফলকামনা করে, সে দেশের ভরসা কোথায়?' এ কথা কঠোর হইলেও সত্য কথা। ঈশ্বর জানেন, পুণ্য-ভূমি ভারতক্ষেত্রে আর নবঋষির অভ্যুদয় হইবে কি না; ভারতবর্ষের পুণ্য মৃত্তিকায় আবার নূতন সাধক-বৃন্দের নব-অভ্যুদয় সম্ভবপর কি না!

শ্রীতারাদাস চট্টোপাধ্যায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব—প্রায় দশসহস্র শিষ্যের গুরু, অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন একজন ব্রহ্মদেশীয় প্রধান ধর্ম্মোপদেষ্টা প্রচার করিয়াছেন যে, গুরু মৈত্রেয় তুষিতস্বর্গ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি এখন বালক। সকলেরই ধ্যানযোগ অভ্যাস দ্বারা মনকে এবং নিরামিষ আহার দ্বারা শরীরকে পবিত্র করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য। ইতিমধ্যেই অনেকে এইরূপে সেই সময়ের প্রতীক্ষায় প্রস্তুত হইতেছেন; উপযুক্ত সময়ে গুরু ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য আরম্ভ করিবেন।

শ্রীযুক্ত এস, নিত্যানন্দম্ নামক আমাদের তত্ত্ব-বিদ্যা-সভার একজন সভ্য, বীরব্রাহ্মণ নামক এক সাধুর ভবিষ্যদ্বাণী পাঠাইয়াছেন। এই সাধু কান্দিমাল্লিয়া পল্লী নামক স্থানে দ্বিশত বৎসর পূর্ব্বে বাস করিতেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া-ছিলেন, তাহা সমস্ত বাস্তব সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া কথিত হইতেছে। সেই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে ইহাও বলিয়াছেন যে, উপরি-উক্ত স্থানের নিকটেই জগদ্‌গুরু জন্মগ্রহণ করিবেন, পূর্ব্বজন্মে যাঁহাদের সহিত আত্মীয়তাসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে

থাকিয়াই এবারও শিক্ষিত হইবেন এবং ইংরাজী ১৯১৮ কিম্বা ১৯২০ সালে এই জগতে রৌদ্রী বা পিঙ্গলা দেশে আবির্ভূত হইবেন।

ভাগীরথী তত্ত্ব-সমিতি-সঙ্ঘ :—বিগত ২৪শে আগষ্ট রবিবার হুগলী শাখা-সমিতিতে সঙ্ঘের দ্বাবিংশতিতম অধিবেশন হয়। উত্তর-পাড়া শাখার প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত ধরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, রিষড়া, হুগলী ও চুঁচুড়া শাখা হইতে প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

১। সঙ্ঘ হইতে যে প্রবন্ধের জন্য রৌপ্যপদক উপহার দিবার প্রস্তাব হইয়াছে, সেই প্রবন্ধ পাঠাইবার শেষ দিন ৩১শে অক্টোবর ধার্য্য হয়।

২। কাটোয়া শাখা সঙ্ঘের অন্তর্ভূত করিয়া লওয়া হয়।

৩। শ্রীযুক্ত হরিহর মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন যে, ব্রহ্মচারী অথবা যাঁহারা সমিতির কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগের জন্য একটী আশ্রম-প্রতিষ্ঠা ও তাহার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ অর্থসংগ্রহ হউক। শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক বলেন যে, চাতরা ভক্তাশ্রম ও নবদ্বীপ রাধারমণাশ্রম সমিতির সহিত যোগদান করিতে প্রস্তুত, সুতরাং আর নূতন আশ্রম-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন কি ?

৪। সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সেন মহাশয়ের প্রস্তাব মতে স্থির হয় যে, যদিও ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক সভ্যই বন্যাপীড়িত লোকদিগের সাহায্যের জন্য যথাসাধ্য অর্থদান করিয়াছেন, কিন্তু সমষ্টিভাবে সমিতি হইতে কোন প্রকার ব্যবস্থা হয় নাই; সুতরাং সঙ্ঘ হইতে অর্থসংগ্রহ হউক এবং তদ্দ্বারা কাটোয়া অঞ্চলের বন্যাপীড়িত লোক-দিগের সাহায্যে জন্য সংগৃহীত অর্থ কাটোয়া শাখার সম্পাদকের নিকট প্রেরিত হউক।

৫। শ্রীযুক্ত হরিহর মুখোপাধ্যায় "মৃত্যুর পরপারে" বিষয়ক একটী সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে সাধারণ সভায় শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক "রাসতত্ত্ব" সম্বন্ধে একটী হৃদয়-গ্রাহী বক্তৃতা করেন।

তন্ত্রের অভিধান।—তন্ত্রশাস্ত্রে অনেক পারিভাষিক শব্দ দৃষ্ট হয়। এমন কি, তন্ত্রমতে বর্ণমালার প্রতি-অক্ষরের স্বতন্ত্র একাধিক পারিভাষিক অর্থ আছে। তন্ত্রের অর্থ সম্যক্ বোধের জন্য তান্ত্রিক অভিধানের বিশেষ উপযোগিতা আছে। সম্প্রতি আর্থার অ্যাভেলন এই ছদ্মনাম ব্যবহার করিয়া একজন পদস্থ ইংরাজ মূলতন্ত্র-প্রকাশে নিযুক্ত হইয়াছেন। তন্ত্র-প্রকাশের প্রথম খণ্ডেই তিনি তন্ত্রাভিধান প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে মন্ত্রাভিধান, একাক্ষর কোষ, বীজনিঘণ্টু (glossary), মাতৃকানিঘণ্টু, মুদ্রানিঘণ্টু প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রকাশক মহাশয় আর একখানি তান্ত্রিক অভিধানের সন্ধান পাইয়াছেন এবং তাহা শীঘ্রই প্রকাশিত করিবেন, আশা দিয়াছেন। এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের নাম 'প্রাণকৃষ্ণশব্দাম্বুধি'। খড়দহের যে প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয় প্রাণতোষিণী নামক তান্ত্রিকসংগ্রহ সংকলন করিয়া স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, এই 'শব্দাম্বুধি'ও তাঁহারই যত্নে

সংকলিত হইয়াছিল। দক্ষিণামূর্ত্তি মুণিকৃত বীজোদ্ধার-কোষও আর্থার অ্যাভেলন মহোদয় প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

মিসেস বেসান্টের জন্মতিথি।—আগামী ১লা অক্টোবর শ্রীমতী অ্যানি বেসান্টের ৬৬তম জন্মতিথি। যে থিওজফিকেল সভার তিনি নেত্রী এবং পরিচালিকা, এবং পৃথিবীর সকল মহাদেশেই যাহার শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হইয়াছে, সেই সভার ভারতীয় শাখার অন্তর্গত শাখা-সমিতি-সমূহ হইতে ঐ জন্মতিথির দিবস মিসেস বেসাণ্টকে অভিনন্দিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। মিসেস বেসাণ্ট বিগত ২০ বৎসর নানাভাবে ভারতমাতার সেবা করিয়াছেন। এই পরিণত বয়সেও তিনি সেই সেবাকার্য্যে উদাসীন নহেন। ভগবান্ তাঁহাকে দীর্ঘজীবিনী করিয়া জগতের উন্নতিকল্পে কার্য্য করিবার আরও অবসর দিন, এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

পুস্তক প্রসঙ্গ। শিল্প বাদ দিলে সাহিত্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। একদিকে যেমন সাহিত্যের অঙ্গীভূত দর্শনশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্রাদির অনুশীলনে মানবের উৎকৃষ্ট-বৃত্তি সকলের উৎকর্ষ সাধিত হয়, সেইরূপ শিল্প ও সঙ্গীত চর্চ্চা দ্বারাও কতকগুলি সদ্‌বৃত্তির উন্মেষ ও উন্নতি হইয়া থাকে। সেইজন্য সভ্যজাতি-মাত্রের মধ্যেই সাধারণভাবে শিল্প ও সঙ্গীতের প্রচলন অধিকতর হইয়া পড়ে। ইহাতে উচ্চ নীচ জাতি, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত ভদ্র বা অভদ্র ইত্যাদির বিচার নাই। বিশেষতঃ চিত্রশিল্প প্রভৃতিকে সুকুমার কলা-বিদ্যার অন্তর্গত বলিয়া ধরা হয়। আর্য্যজাতির সভ্যতার অভ্যুদয়ের সহিত সেই সুকুমার বিদ্যার অনুশীলন হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। সে সময় চিত্রশিল্প ক্ষত্রিয়ের মধ্যেও বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল, পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে এখনও তাহার অস্পষ্ট নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কালসহকারে চিত্রশিল্পের উন্নতি হওয়া দূরে থাক্, অবনতির চরমসীমায় উপস্থিত হইতেছে। প্রকৃতির বাহ্যিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া কবি যেমন ক্রমে ভগবানের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন, চিত্রশিল্পীও সেইরূপ স্বভাবের সৌন্দর্য্যবোধ, মনোবৃত্তিস্ফুরণের বাহ্য অভিব্যক্তি উপলব্ধি, মানব-চরিত্রের বৈচিত্র্যজ্ঞান প্রভৃতি গুণ সকল লাভ করিয়া নিজের চিত্ত প্রশস্ত করিতে—সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধি-বৃত্তির উন্মেষসাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। কারণ সূক্ষ্মতত্ত্বের উন্মেষ ভিন্ন মানব পারলৌকিক উন্নতি সাধন করিয়া আত্মাকে স্থূলতর বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারেন না। এইজন্য কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, শিল্প কলাবিৎ, দর্শন-বিজ্ঞান বেত্তা, প্রভৃতি স্বর্গের লোক বলিয়া আখ্যাত হন।

এক সময়ে আমাদের দেশে চিত্র-শিল্পের যে উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, সময়ে সেই উন্নতির ছায়া ভিন্ন দেশে উপস্থিত হইয়া ক্রমে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সেই সূত্রে এক্ষণে পাশ্চাত্য দেশ সকল সেই বিস্তারের ফল লাভ করিয়াছে এবং শিল্পের উত্তরোত্তর উন্নতির চেষ্টা করিতেছে। এখন সুখের বিষয়, সেই শিল্পবিদ্যার চর্চ্চা চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত

হইয়া ইউরোপের অনুগ্রহে আমাদের দেশে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। এখন শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যেও এই কলা বিদ্যাশিক্ষার আকাঙ্খা পরিলক্ষিত হইতেছে। সুতরাং এমন সময়ে সেই বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিজ্ঞান-সম্মত উপদেশ ও পরিচালনার আবশ্যকতা উপস্থিত হইয়াছে। চিত্রশিল্প সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় কোন উল্লেখযোগ্য পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তৎসম্বন্ধে একখানি বাঙ্গালা পুস্তক প্রণয়ন করিয়া দেশের লোকের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। পুস্তক খানির নাম—"বর্ণ চিত্রণ" বা পেণ্টিং শিক্ষা। ইহা চিত্র-শিল্প-শিক্ষার্থীর পক্ষে অতীব উপযোগী ও সহায়ক। ইহার ভাষা সরস ও প্রাঞ্জল। ইহাতে গ্রন্থকার চিত্র শিল্প-বিদ্যাসম্বন্ধে বিস্তর বাঙ্গালা পারিভাষিক শব্দের সঙ্কলন করিয়াছেন। এই পুস্তকের প্রথম তিন অধ্যায়ে যথাক্রমে আলেখ্য বা বর্ণ চিত্রনের উপযোগিতা, ইয়োরোপস্থ বিভিন্ন নয়টী দেশে যে নয় প্রকার চিত্র-বিদ্যালয় (School of Painting) প্রতিষ্ঠিত ও ক্রমোন্নত হইয়া আসিয়াছে, তাহার ইতিহাস এবং আর্য্য চিত্রবিদ্যালয়ের পুরাতত্ব আলোচনা প্রভৃতি বর্ণন করিয়া আমাদের দেশে একটী নূতন আলোচনায় মনোনিবেশিত করিবার জন্য সাধারণকে উদ্বোধিত করিয়াছেন। অবশিষ্ট ছয়টী অধ্যায়ে এবং পরিশিষ্টে শিল্প-শিক্ষার্থীর জন্য বহুতর উপযুক্ত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

চিত্র-প্রসঙ্গ। - এবারকার "ব্রহ্মবিদ্যায়" একখানিও চিত্র দিতে পারিলাম না, তজ্জন্য আমরা দুঃখিত। চিত্র প্রস্তুত হইয়াও তাহা প্রকাশ-যোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় এবার দেওয়া হইল না। তজ্জন্য গ্রাহক মহোদয়গণ অনুগ্রহপূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন। সময়ে ইহার পূরণ করিয়া দিব।

"উত্তরা-খণ্ড-পরিক্রম * এই পুস্তকখানি অনেকদিন হইল, আমাদের হস্তগত হইয়াছে। নানাকারণে ইহার বিষয় এ পর্য্যন্ত কিছুই বলিতে পারি নাই। ইহা পাঠ করিয়া আমরা বিশেষরূপ আনন্দিত হইয়াছি। ইহার বিষয়ে আমাদের অনেক বক্তব্য ছিল, কিন্তু তাহা বলিতে না পারিয়া আমরা বিশেষ দুঃখিত। সময়ান্তরে তাহা বলিতে চেষ্টা করিব। এক্ষণে এইমাত্র বলি যে, এই পুস্তকখানি তীর্থযাত্রীগণের পক্ষে বড়ই উপকারী। ইহার ভাষাও সরল এবং বর্ণনা চিত্তাকর্ষক। ইহার লেখক একজন ভাবুক ও কবি। সকলকেই এই পুস্তকখানি পড়িতে আমরা অসঙ্কোচে অনুরোধ করিতে পারি।

* অর্থাৎ গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরী, কেদার ও বদরীনাথ এবং পশুপতি নাথ প্রভৃতি হিমালয়স্থ সমস্ত তীর্থের বহুচিত্র ও মানচিত্র যুক্ত সম্পূর্ণ ভ্রমণ বৃত্তান্ত। শ্রীশারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত। মূল্য ১৷৹ টাকা। ২নং কৈলাশদাসের লেন, বিডন স্কোয়ার পোষ্ট, কলিকাতা এই ঠিকানায় দি হোয়াইট লোটাস্ পাব্লিসিং কোম্পানিতে বিক্রয় প্রাপ্তব্য।



শিব-শক্তি।

ব্রহ্মবিদ্যা

২য় বর্ষ।] অগ্রহায়ণ, ১৩২০। [৮ম সংখ্যা।

মহাকালী।

কি ভাবে ভাবিব তোরে—ভাবিয়া কিছু না পাই ;
ভাবাভাব-বিধায়িনি ! ভাবাভাব তোর নাই।
মহাকাল-বক্ষ-'পরে নাচিছ উল্লাস-ভরে,
কি করাল লীলাবেশে, বিলোল রসনা মেলি',
সুকুমার সমুদার শিব-অঙ্গে পদ ফেলি'।
বামকরে সমুজ্জ্বল অসি করে ঝলমল,
অন্যতর সব্যকরে সদ্যছিন্ন মুণ্ড দোলে,
পুত্রের রুধির-ধারা ঢালিছ পতির কোলে।
একি বিপরীত রীতি, কি দুর্জ্জেয় ক্রূরনীতি,—
ব্রহ্মাণ্ড-জননী হ'য়ে নৃমুণ্ড কেটেছ কত,
স্তন্য দিয়ে পুষ্ট ক'রে নষ্ট কর অবিরত।
তবে ও দক্ষিণ করে কেন মা দাক্ষিণ্য ঝরে,
ভীত ত্রস্ত সুত তরে অভয় রয়েছে ধ'রে,
প্রনষ্টে প্রবেষ্টে বেষ্টি' হৃষ্ট কর শ্রেষ্ঠবরে ?
আরক্ত নয়নদ্বয় সন্তানে দেখায় ভয়,—
কেন, তা' তুমিই জান, আর কে বুঝিতে পারে ?
বিশ্ববিকাশিনী শক্তি—সম্বিৎ এখানে হারে।
তৃতীয় আঁখিতে তোর নাহিক সুধার ওর,
অমানিশি প্রস্ফুটিয়া পূর্ণশশি-শোভা করে,
আপনি বিহ্বল হৃদি আহ্লাদ-ক্ষীরোদে ভরে।
কে বুঝাবে এই মায়া, আলোকিবে এই ছায়া ?—
কি ভাবে ভাবিব তোমা' ভাবিয়া না পাই শ্যামা,
খর-করবাল-যোয়া, বরাভয়-করা বামা !

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র।

চৈতন্য কথা।

যদুপতি কৃষ্ণ ও গোপীবল্লভ কৃষ্ণ।

কেচিদ্ ভাগবতাঃ প্রাহুরেবমত্র পুরাতনাঃ।
ব্যূহঃ প্রাদুর্ভবেৎ আদ্যো গৃহেষানকদুন্দুভেঃ॥ লঘুভাগবতামৃত, পূর্ব্বখণ্ড ১৬৫।

কোন কোন প্রাচীন ভাগবত-গণ বলিয়া থাকেন, বসুদেবের গৃহে আদ্যব্যূহ বাসুদেব প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। আর ব্রজে ভগবতী যোগমায়ার সহিত শ্রীলীলা পুরুষোত্তম জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যদুনন্দন বৈকুণ্ঠাধিপতির প্রকাশ মাত্র। তিনি চতুর্ব্যূহের মধ্যে আদ্য ব্যূহ বাসুদেব। গোপীবল্লভ কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠের উপরে বিরাজমান মধুর কৃষ্ণের আবির্ভাব।

গত্বা যদুবরো গোষ্ঠং তত্র সূতাগৃহং বিশন্।
কন্যামেব পরং বীক্ষ্য তামাদায় ব্রজৎ পুরম্।
প্রাবিশদ্ বাসুদেবস্তু শ্রীলীলাপুরুষোত্তমম্॥

বসুদেব ব্রজে গমন করিয়া যশোদার সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি কেবল-মাত্র কন্যাকে দর্শন করিলেন। সেই কন্যাকে গ্রহণ করিয়া, বসুদেব মথুরায় প্রত্যাগমন করিলেন। এদিকে বাসুদেব কৃষ্ণ সেই শ্রীলীলাপুরুষোত্তম কৃষ্ণে প্রবেশ করিলেন।

এতচ্চাতি রহস্যত্বাৎ নোক্তং তত্র কথাক্রমে।
কিন্তু ক্বচিৎ প্রসঙ্গেন সূচ্যতে শ্রীশুকাদিভিঃ॥

কথাটি অত্যন্ত রহস্যকথা। এই জন্য কৃষ্ণের জন্ম প্রসঙ্গে, এই রহস্য বর্ণিত হয় নাই; কিন্তু কোন কোন স্থানে প্রসঙ্গ-ক্রমে শ্রীশুকদেবাদি ঋষিগণ ইহার সূচনা করিয়াছিলেন।

রূপ! যদি অতি রহস্য কথা হয়, তাহা হইলে, তুমিই যে সকল রহস্য প্রকাশ করিয়াছ, তাহার প্রমাণ কি? মহাপ্রভুও যে তোমাকে সমগ্র রহস্য বলিয়াছেন, তাহাই বা কে জানে! যখন সমগ্র রহস্য প্রকাশের সময় হইবে তখন মহাপ্রভু স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া দ্বারে দ্বারে সেই রহস্য ব্যক্ত করিবেন। দুই গর্ভে, দুই কৃষ্ণ। দুই বিভিন্ন প্রকাশ। একথা যে চৈতন্য-দেব রূপকে বলিয়াছিলেন, চৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্যলীলার প্রথম অধ্যায়ে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু চৈতন্যের উক্তিতে এক কালে দুই কৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল, এমন কথা পাওয়া যায় না।

প্রসঙ্গ-ক্রমে শুকদেবাদি যশোদার গর্ভসম্ভূত কৃষ্ণের যে সূচনা করিয়াছেন, রূপ তাহার প্রমাণ দেখাইতেছেন;—

নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ। ভা, পু, ১০-৫-১।

কৃষ্ণ নন্দের 'আত্মজ'।

নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রেত্যাগতমুদারধীঃ।

ভা, পু, ১০-৬-৪৩।

শ্রীকৃষ্ণ নন্দের স্বপুত্র।

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।

ভা, পু, ১০-৯-২১,

শুকদেব কৃষ্ণকে 'গোপিকাসুত' বলিলেন।

বন্যস্রজে কবল-বেত্র-বিষাণ-বেণু লক্ষশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়। ভা, পু, ১০-১৪-১।

ব্রহ্মা কৃষ্ণকে "পশুপাঙ্গজ" বলিলেন। পশুপালক নন্দের অঙ্গজাত, অবশ্য বসুদেবের অঙ্গজাত হইতে ভিন্ন।

এইবার রূপ যামল-বচনের প্রমাণ দিতেছেন।

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃপরঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিৎ নৈব গচ্ছতি॥
দ্বিভুজঃ সর্ব্বদা সোঽত্র ন কদাচিৎ চতুর্ভুজঃ।
গোপ্যৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি নিত্যদা॥

পূর্ব্বশ্লোকের পাঠ, চৈতন্য-চরিতামৃতের পাঠের সহিত ভিন্ন। যদুসম্ভূত কৃষ্ণ অন্য। যিনি পূর্ণ কৃষ্ণ, তিনি যদুসম্ভূত কৃষ্ণ হইতে অন্য। সেই পূর্ণ কৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন না। তিনি বৃন্দাবনে সর্ব্বদা দ্বিভুজ, কদাচিৎ চতুর্ভুজ হন্না। তিনি একমাত্র গোপীর সহিত মিলিত হইয়া, সেখানে নিত্য লীলা করিতেছেন।

অথ প্রকটরূপেণ কৃষ্ণো যদুপুরীং ব্রজেৎ।
ব্রজেশজত্বমাচ্ছাদ্য স্বাং ব্যঞ্জন্ বাসুদেবতাম্।
যো বাসুদেবো দ্বিভুজস্তথা ভাতি চতুর্ভুজঃ॥ ল, ভা, ১৬৬।

প্রকট রূপে যখন কৃষ্ণ যদুপুরী গমন করেন, তখন নন্দের ঔরসজাত রূপ আচ্ছাদন করেন। কেবল মাত্র বসুদেবের ঔরসজাত রূপ প্রকাশিত করেন। যিনি বাসুদেব, তিনি কখনও দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ, কখনও মনুষ্য, কখনও ঈশ্বর। নন্দনন্দন নিত্য মনুষ্য-রূপী মধুর ভগবান্।

তাস্তা মধুপুরে লীলা প্রকটষ্য যদূদ্বহঃ।
দ্বারবত্যাং তথা যাতি তাং তাং লীলাং প্রকাশকঃ॥

মধুপুরে মাথুর লীলা প্রকটিত করিয়া, তিনি দ্বারকায় গমন করেন এবং সেখানকার প্রসিদ্ধ লীলা সকল প্রকাশিত করেন।

তত্রাবিষ্কুরুতে ব্যূহং প্রদ্যুম্নাখ্যং তৃতীয়কম্।
যতো ব্যূহোঽনিরুদ্ধাখ্যো তুর্য্যঃ প্রকটতাং ব্রজেৎ॥

দ্বারকায় বাসুদেব কৃষ্ণ প্রদ্যুম্নাখ্য তৃতীয় ব্যূহ আবিষ্কৃত করেন। সেই প্রদ্যুম্ন হইতে আবার অনিরুদ্ধাখ্য চতুর্থ ব্যূহ প্রকটিত হয়।

ইতি ব্যূহচতুষ্কস্য লোকোত্তর চমৎক্রিয়াঃ।
বিবাহাদ্যাশ্চ বহুধা লীলা তত্রৈব বর্ণিতাঃ॥

চতুর্ব্যূহের বিবাহাদি চমৎকার লীলা সকল ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রজে প্রকটলীলায়াং ত্রীন্ মাসান্ বিরহোঽমুনা।
তত্রাপাজনি বিস্ফূর্ত্তিঃ প্রাদুর্ভাবোপমাহরে।
ত্রিমাস্যাঃ পরতস্তেষাং সাক্ষাৎ কৃষ্ণেন সঙ্গতিঃ॥ ল, ভা, ১৬৭.

বৃন্দাবনের প্রকট লীলায় কেবলমাত্র তিন মাস বিরহ হইয়াছিল। সেই তিনমাসে উদ্ধবের সংবাদ পাইয়া প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহারা কৃষ্ণের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেন। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ পরোক্ষভাবে থাকিলেও তাঁহার প্রাদুর্ভাব রূপ স্ফূর্ত্তি তাঁহাদের হৃদয়ে হইয়াছিল। তিন মাসের পর দন্তবক্র-বধানন্তর, তাঁহাদের সাক্ষাৎ কৃষ্ণের সহিত সঙ্গতি হইয়াছিল।

ব্রজাগমনকালেচ পাদ্মোক্তেঽহস্তচ বর্ত্ততে।

'অথ তত্রস্থা নন্দগোপাদয়ঃ সর্ব্বেজনাঃ পুত্রদারাদিসহিতাঃ পশু-পক্ষি-মৃগাদয়শ্চ বাসুদেব প্রসাদেন দিব্যরূপধরা বিমানমারূঢ়াঃ পরমং বৈকুণ্ঠলোকমবাপুঃ।' পদ্মপুরাণ, উঃ খ, ২৭৯-২৭।

অত্র কারিকে,—

ব্রজেশাদেরংশভূতা যে দ্রোণাদ্যা অবাতরন্।
কৃষ্ণস্তানেব বৈকুণ্ঠে প্রাহিণোদিতি সাম্প্রতম্॥
প্রেষ্ঠেভ্যোঽপি প্রিয়তমৈ র্জনৈ র্গোকুলবাসিভিঃ।
বৃন্দারণ্যে সদৈবাসৌ বিহারং কুরুতে হরিঃ॥ ল, ভা, ১৭২।

দন্তবক্রবধের পর যখন কৃষ্ণ ব্রজে প্রত্যাগমন করেন, তখন যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে অন্যরূপ বর্ণনা আছে।

পদ্ম পুরাণ মতে, সেই কালে বাসুদেবের অনুগ্রহে পুত্রদারাদি সহিত নন্দগোপাদি বিমানারূঢ় হইয়া বৈকুণ্ঠলোক গমন করিয়াছিলেন।

এখানে বুঝিতে হইবে, কৃষ্ণের নিত্য পরিবার নন্দাদির অংশভূত স্বর্গবাসী দ্রোণাদি যাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেই কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এবং প্রেষ্ঠ হইতেও প্রিয়তম গোকুল-নিবাসী নিজ জনের সহিত কৃষ্ণ সর্ব্বদা বৃন্দাবনে বিহার করিতেছেন।

জীব গোস্বামী, আমি ধৃষ্টতা করিয়া তোমার সহিত বিবাদ করিয়াছি। বলিয়াছি নন্দাদি সেই কালে মানব দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রূপ গোস্বামী ত সেই কথাই বলিলেন।

আমার ধৃষ্টতার কারণ এই যে, আমার ধারণা, এই কথাটির মধ্যে একটি গভীর

রহস্য নিহিত রহিয়াছে! সেই রহস্যের মুখ বন্ধ করিলে, ভবিষ্যতে তাহার উচ্ছেদ অসম্ভব হইবে!

যাহা হউক, বুঝিতে হইবে যে, এই সময়ে বৃন্দাবনের প্রকটলীলা অস্তমিত হইল। কিন্তু পুত্রের সহিত নন্দ বৈকুণ্ঠ গমন করিলেন, এ কথার রহস্য রহস্যই থাকিয়া গেল। নন্দের ত একটিই পুত্র। আবার কি কৃষ্ণ নিত্যলীলা করিবার জন্য যশোদার গর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? আমাদের নিত্যলীলার নিত্য অভিনায়ক কৃষ্ণ লইয়াই প্রয়োজন। সেই কৃষ্ণ রাধার কৃষ্ণ। সে কৃষ্ণ রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত চৈতন্য-দেবের কৃষ্ণ। সেই কৃষ্ণেরই চৈতন্য-দেহে আবির্ভাব। আবার চৈতন্যদেব কৃষ্ণেরই প্রেমভিখারী। রাধাভাব অবলম্বন করিয়া সেই কৃষ্ণের বিরহেই চৈতন্যের দশ দশা উপস্থিত হইয়াছিল। সেই কৃষ্ণের মাধুর্য্যে জগৎ আজ মধুরভাব ধারণ করিতেছে। সেই কৃষ্ণের ভাবে আজ ভক্তহৃদয় আপ্লুত হইতেছে। সেই কৃষ্ণেয় প্রেম চৈতন্যদেব ঘরে ঘরে বিলাইয়াছেন। সেই কৃষ্ণকে চৈতন্যদেব আমাদের নিকটস্থ করিয়াছেন।

'**সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ**'।—এই বীজমন্ত্রে গীতা যাঁহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, নির্গুণ ভক্তির শিক্ষায় কপিলদেব দেবহূতিকে প্রচ্ছন্নভাবে যাঁহার কথা বলিয়াছেন, যিনি গোপীদের সর্ব্বস্বধন, শ্রীরাধিকা যাঁহার পরাশক্তি, সেই মধুর কৃষ্ণের মানসিক সেবা চৈতন্যদেব আমাদিগকে শিখাইয়া গিয়াছেন এবং উচ্চৈঃস্বরে সেই কৃষ্ণের নাম তিনি প্রচার করিয়াছেন। সেই গোপীবল্লভ কৃষ্ণ যদুপতি কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

তুমি।

তুমি জগতপালক, সন্তাপহারক যত চরাচর সবার হে।
তুমি জগতের পিতা, জগতের মাতা, জগৎ নির্ম্মাতা তুমিই হে॥
তুমি আদি অন্তহীন, অপার, অসীম, অজর, অমর, অক্ষর হে।
তুমি মরুৎ, ব্যোম, অন্তরীক্ষ, সোম, জলস্থল আদি সবই হে॥
তুমি কভু নিরাকার, কভু বা সাকার, সকল মূরতি তোমারি হে।
তুমি ষড় গুণশালী, দেব বনমালী, আলোক, আঁধার সবি হে॥
তুমি শরীর আমার, হৃদয় আমার, জ্ঞান, বুদ্ধি মোর, তুমিই হে।
তুমি বাহিরে আমার, ভিতরে আমার, চতুর্ দিকেই তুমিই হে॥
তুমি মানবের প্রাণ, মানবের জ্ঞান, মানবের তুমিই গুরু হে।
মানব তোমার, তুমিও তাহার, সকলের ব্রহ্ম তুমিই হে॥

শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত।

সাংখ্য ও বেদান্ত।

(২)

শিষ্য। গুরুদেব! আপনি বলিয়াছিলেন, সাংখ্যদর্শনের মতবাদ খণ্ডন বিষয়ে আরও অনেক যুক্তি আছে, তাহা আর একদিন বলিবেন। আজ ত আপনার অবকাশ দেখিতেছি, তবে এখন সেই যুক্তিগুলি অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলুন না?

গুরু। তা বেশ। বল ত. তোমাকে পূর্ব্বে সাংখ্যদর্শনের মত খণ্ডিত হইতে পারে, এ বিষয়ে কোন্ কোন্ যুক্তি বলিয়াছি।

শিষ্য। আমাকে প্রধানতঃ তিন বিষয়ে যুক্তি বলিয়াছেন;— প্রথম, অচেতন প্রকৃতি বা প্রধান কোন একজন চেতন কর্ত্তৃক প্রেরিত না হইয়া স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করিতে পারেন না; দ্বিতীয়, কারণ ও কার্য্য সকল স্থলেই একজাতীয় হইবে, এরূপ অব্যভিচারী নিয়ম নাই; তৃতীয়, যে যে পদার্থ পরিমিত বা ক্ষুদ্র, তাহাই যে বিবিধ বস্তুর সংযোগ হইতে হইয়াছে, এরূপ অনুমান ঠিক নহে।

গুরু। শেষের দুইটী নিয়ম ভিন্ন ভিন্ন না বলিয়া, এক নিয়মের মধ্যেও লইতে পার। সে নিয়ম এই যে,—মূল কারণ ও কার্য্য এক জাতীয় হয় না, ভিন্ন জাতীয়। এখন তোমাকে নূতন বিষয়ে যুক্তি বলিতেছি, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। পূর্ব্বে বলিয়াছি, অচেতন প্রকৃতি কোনরূপ চেতন পদার্থদ্বারা প্রেরিত না হইলে কোন নূতন বস্তুর রচনা বা সৃষ্টি করিতে পারেন না; এখন বলিতেছি, রচনা ত দূরে থাকুক, সৃষ্টিকরণ বিষয়ে, অচেতন প্রকৃতির যে প্রবৃত্তি বা গতি, তাহাও চেতন কর্ত্তৃক প্রেরিত না হইয়া স্বাধীনভাবে হইতে পারে না। মৃত্তিকা অচেতন, তাহাকে স্বাধীনভাবে প্রবৃত্ত হইতে বা চলিতে দেখিতে পাই না, কোন চেতন মনুষ্য মৃত্তিকাখণ্ডকে চালাইলেই তাহা চলিয়া থাকে; গাড়ীর চৈতন্য নাই, সে নিজে স্বাধীনভাবে চলিতে পারে না, চেতন অশ্বগণের বলেই গাড়ী চলিয়া থাকে, দেখিতে পাওয়া যায়। ইটের মিস্ত্রী কোন কাজ করিতেছে না, তবু ইট হইতেছে, এরূপ দেখা যায় কি? ঘোড়া নাই, কোচম্যান নাই, গাড়ী চলিতেছে; স্বর্ণকার কর্ম্ম করে না, স্বর্ণ হইতে গহনা প্রস্তুত হইতেছে; অস্ত্র নিকটে রহিয়াছে, ছুতার কোন কার্য্য না করিয়া বসিয়া আছে, তবুও কাঠ হইতে চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে; এরূপ-ভাব কোনস্থলেই ত দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব যখন সকল স্থলেই চেতনের প্রবৃত্তি বা গতি হইতে অচেতনের প্রবৃত্তি বা গতি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তখন জগতের কোন কারণও যদি অচেতন হয়, তবে তাহারও প্রবৃত্তি বা গতি চেতন হইতেই হইতেছে, এরূপ অনুমান করিতে পারি; সুতরাং সাংখ্যদর্শনের মতানুযায়ী জগতের আদিকারণ যে প্রকৃতি বা প্রধান, তিনি অচেতন হইলে সৃষ্টি বিষয়ে তাহার প্রবৃত্তি

বা গতি সম্ভব হইতে পারে না, তাই জগতের আদিকারণ প্রকৃতি নহে, ঐ আদিকারণ পরমেশ্বর।

শিষ্য। আপনি বলিলেন—চেতন প্রেরক না হইলে অচেতনের প্রবৃত্তি বা গতি হয় না। কিন্তু সুধু চেতনেরও ত প্রবৃত্তি বা গতি দেখিতে পাওয়া যায় না; পুরুষের দেহ অচেতন, তাহারই গতি দেখিতে পাই; চেতন দেহ-বিহীন যে আত্মা, তাহার প্রবৃত্তি বা গতি দেখিতে পাই কি?

গুরু। তা ঠিক, শুধু চেতনের বা আত্মার গতি দেখিতে পাই না তবুও চেতন অশ্বগণ থাকিলে অচেতন গাড়ির গতি ত দেখিতেছি? আর চৈতন্য থাকিলেই অচেতন দেহের গতি দেখিতে পাওয়া যায় ত?

শিষ্য। সাংখ্য-দর্শনকার যদি বলেন, অচেতন সংযুক্ত হইলেও চেতনের গতি ত কোন স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় না, বরং চেতনের যোগে অচেতনের গতিই দেখিতে পাইতেছি। দেহ অচেতন, চৈতন্য যোগে দেহেরই গতি হয়; গাড়ী অচেতন, অশ্বের যোগে গাড়ীই ত চলিয়া থাকে? সুতরাং অচেতন গাড়ী ও তাহার গতি উভয়ই যখন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, আর স্থুল দেহের সহিত যোগদ্বারা অনুভব ব্যতীত চেতন আত্মা বা তাহার প্রবৃত্তি কোন স্থলেই যখন প্রত্যক্ষ দেখা যায় না, তখন ঐ গতি বা প্রবৃত্তি অচেতন দেহেরই ত হইয়া থাকে, চেতন যে আত্মা তাহার ত প্রবৃত্তি হয় না। অতএব দেহের প্রবৃত্তির প্রতি দেহই ত কারণ দেখিতেছি, চৈতন্য ত কারণ নহে। অপর পক্ষে শুধু চৈতন্যই যখন দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন প্রবৃত্তির প্রতি চৈতন্যই যে কারণ হইবে, ইহা দেখিতে পাওয়া ত সম্ভবও নহে। তবে দেহে একজন চেতন যে রহিয়াছেন, বরং এ রূপ অনুমান করা যাইতে পারে; কেননা মৃত্তিকা, প্রস্তর ও গাড়ী, ইহারা যে জাতীয় পদার্থ, সজীব মানব দেহ সে জাতীয় পদার্থ নহে; যে জিনিষ থাকায় মানবদেহের অন্যভাব হইয়াছে, তাহাই চেতন পদার্থ। আরও বলি চৈতন্য দেহে আছে, তাই বলিয়া চৈতন্যই যে দেহের প্রবৃত্তি বা গতির প্রতি কারণ হইবে, ইহারই বা প্রমাণ কি? আকাশ সর্ব্বগত; আকাশ নাই, এরূপ স্থান কোথাও দেখা যায় না; তাই বলিয়া আকাশ কি সকল কার্য্যেরই কারণ হইয়া থাকে? অতএব দেহ হইতে অতিরিক্ত কোন একটী চেতন আত্মা দেহে থাকিলেও দেহের প্রবৃত্তি বা গতির প্রতি সেই চেতন আত্মাই যে কারণ হইবে, এরূপ অনুমান করা ত যায় না; সুতরাং জগতের রচনা বা সৃষ্টি বিষয়ে, অথবা জগতের সৃষ্টি করণের প্রবৃত্তি বিষয়ে চেতন পরমেশ্বর কারণ নহেন; অচেতন যে প্রকৃতি, তিনিই সৃষ্টি বিষয়ে এবং সৃষ্টি করার প্রবৃত্তি বিষয়ে কারণ হইতে পারেন,—এইরূপ সিদ্ধান্তই ত হইতে পারে।

গুরু। বৎস! বেশ বলিয়াছ, তোমার আপত্তিগুলি স্থিরভাবে শুনিয়াছি। এখন আমাদের বক্তব্য স্থিরভাবে শুনিয়া যাও; তাহাতে যদি তোমার কোনরূপ আপত্তি চলিতে

পারে, পরে বলিও, আমি তাহার মীমাংসা করিয়া দিব। আমাদের কথা এই যে, দেহে যে প্রবৃত্তি বা গতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা যে দেহের নহে, ঐ গতি যে আত্মার, এরূপ কথা ত আমরা বলিতেছি না। ঐ প্রবৃত্তি বা গতি আত্মার না হইয়া দেহেরই হউক তাহাতে আমাদের ক্ষতি কি? আমরা এইটুকু মাত্র বিশেষ বলিতেছি যে, দেহে যে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহারও কারণ চেতন আত্মা; চেতন আত্মা হইতেই দেহে ঐরূপ গতি জন্মিতে পারে; কেননা, যে যে স্থলে দেহের প্রবৃত্তি বা গতি দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সেই স্থলেই দেহে চৈতন্য রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া থাকি; চৈতন্য না থাকিলে দেহের ত কোনরূপ সাড়া পাওয়া যায় না। মানবের মৃতদেহে প্রবৃত্তি বা গতি দেখিতে পাওয়া যায় কি? তৃণ বা কাষ্ঠ না থাকিলে, কেবল অগ্নি হইতে দাহ হইতে পারে না, অথবা আলোক হয় না, তবুও ঐ দাহ ও আলোকের প্রতি অগ্নি কারণ নয় কি? কেন না অগ্নি না থাকিলে, পুঞ্জ পুঞ্জ তৃণ, অথবা শত শত কাষ্ঠ, কেহই ত দাহ বা প্রকাশ করিতে পারে না; তাই দাহ ও আলোকের প্রতি অগ্নিরই কারণতা হইয়া থাকে। এইরূপ দেহের প্রবৃত্তির প্রতিও চৈতন্যই যে কারণ, তাহা অনুমান করিয়া থাকি। সুতরাং জগতের সৃষ্টি বিষয়ে অচেতন প্রকৃতির যে প্রবৃত্তি বা গতি, তাহাও স্বাধীনভাবে হইতে পারে না, প্রকৃতির ঐ প্রবৃত্তি বিষয়েও পরমেশ্বর কারণ।

শিষ্য গুরুদেব! বেদান্তদর্শনের মতে আত্মা হইলেন সর্ব্বব্যাপী, তিনি নিরাকার, নিরবয়ব; আত্মা সকল স্থানেই আছেন, কোন স্থলেই আত্মা নাই,—এরূপ বলা যায় না; তাই তিনি সর্ব্বব্যাপী। তাহার কোনরূপ আকার বা আকৃতি নাই; ঘট, কলস, আসন, বসন, গৃহ প্রভৃতি ছোট ছোট জিনিষের আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, যে আকৃতি দেখিয়া আমরা ঐ সকল চিনিয়া থাকি; যিনি সর্ব্বব্যাপী, সেই আত্মার সেরূপ কোন আকৃতি থাকিতে পারে না, তাই তিনি নিরাকার। হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ, মস্তক প্রভৃতি প্রাণীগণের নানাবিধ অবয়ব রহিয়াছে, যাহার কোন কোন সময়ে কোন কোঁন অংশের সহিত কোন কোন অংশের সংযোগ বা বিয়োগ হইতে পারে, তাহারই অবয়ব দেখিতে পাওয়া যায়; আত্মার কোনকালে কোন অংশেরই সংযোগ বা বিয়োগ হয় না, অথবা আত্মার কোন অংশ, বা তাঁহার কোনরূপ অংশী-ভাব নাই; তাই তাঁহাকে বেদান্তদর্শন নিরবয়ব বলিয়া থাকেন; এবংবিধ সর্ব্বব্যাপী, নিরাকার নিরবয়ব যে আত্মা বা পরমেশ্বর তাঁহার দেহাদির সহিত সংযোগ থাকিলেও তিনি দেহাদির প্রবৃত্তি বা গতি জন্মাইতে পারেন কি? যাঁহার হাত, পা প্রভৃতি কোনরূপ অবয়ব নাই, সুতরাং যাঁহার নিজের কোনরূপ প্রবৃত্তি বা গতি নাই বা তৎসমস্তের সম্ভবও নাই, তিনি অপরের প্রবর্ত্তক কিরূপে হইতে পারেন? অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে এই বিষয়টি বুঝাইয়া দিন।

গুরু। বৎস! তুমি যে বলিতেছ, "যাহার নিজের প্রবৃত্তি বা গতি নাই, সে অপরের প্রবর্ত্তক হইতে পারে না, আপনার গতি থাকিলেই অপরেরও গতি জন্মাইতে পারে;

হাত বা পায়ের গতি আছে বলিয়াই হস্ত বা পদ দ্বারা চালিত গোলকেও গতি হইয়া থাকে; যে প্রস্তরখণ্ড নিশ্চলভাবে রহিয়াছে সে অপর কোন সামগ্রীরও পরিচালক হয় না; সুতরাং যে পরমেশ্বর সর্ব্বগত, অতএব গতি রহিত, তিনি জগতের সৃষ্টি বিষয়ে প্রবর্ত্তক হইতে পারেন না",—তোমার এই আপত্তি যুক্তি যুক্ত নহে। কেন না এমন কোন নিয়ম নাই যে, নিজের গতি থাকিলেই অপরের গতি জন্মাইতে পারে, আর নিজের গতি না থাকিলে, অপরের গতি জন্মাইতে পারে না। জগতে উভয় বিধ দৃষ্টান্তই রহিয়াছে। কোন স্থলে, যে অপরের গতির প্রবর্ত্তক বা পরিচালক, তাহার গতি দেখিতে পাওয়া যায়; আবার কোন স্থলে অপরের যে প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে তাহার গতি দেখিতে পাওয়া যায় না। সাগরের ভিতর চুম্বকের পাহাড় থাকে, এত গভীর তলদেশে থাকে যে সুশিক্ষিত নাবিকগণও তাহা বুঝিতে পারে না; তাহার নড়া, চড়া প্রভৃতি কোনরূপ সাড়াশব্দ নাই; কিন্তু যে সময়ে ঐ স্থানে ভাসিয়া ভাসিয়া জলের উপর দিয়া জাহাজ চলিয়া যাইতে থাকে, তখনই জাহাজের লোহার পেরেক, লোহার পাত প্রভৃতি লোহার যতকিছু সামগ্রী থাকে, তাহার সকলগুলিই চুম্বকের আকর্ষণে খসিয়া খসিয়া, চুম্বকের দিকে যাইয়া, চুম্বকের সহিত মিলিয়া যাইতে থাকে; চুম্বকের পাহাড় পূর্ব্বেও যে ভাবে ছিল, এখনও সেই ভাবেই রহিয়াছে, অচল অটল ভাবেই দাঁড়াইয়া থাকে, তবুও চুম্বকের পাহাড়ই ঐ সকল লৌহের গতির কারণ নয় কি? অতি মনোরম ছবি দেয়ালের গায়ে স্থিরভাবে টাঙ্গান রহিয়াছে; নড়া চড়া, হেলন দোলন, কিছুমাত্র নাই; নিজের অলৌকিক সৌন্দর্য্যে সুসজ্জিত গৃহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে; যেই তুমি গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলে, অমনিই তাহার অসীম রূপরাশি তোমার চক্ষুকে টানিয়া লইল। এস্থলেও দেখ, ছবির রূপরাশির গতি নাই, তবুও তোমার চক্ষুকে আকর্ষণ করিতে পারে। সাংখ্যদর্শনের মতে, চক্ষু তাহার স্বকীয় বিষয়,—রক্ত, পীত, শ্বেত প্রভৃতি যে বিবিধরূপ তাহার নিকট চলিয়া যায়, ঐ সকল রূপের সহিত মিলিত হইয়াই রূপগ্রহণ করিয়া থাকে। তাই বলি, জগতে এইরূপ উদাহরণ আরও অনেক দেখান যাইতে পারে। সুতরাং নিজের গতি না থাকিলে, অপরের গতি জন্মাইতে পারে না এবংবিধ নিয়ম ঠিক নহে। তবেই উক্ত নিয়মের মূলে জগতের আদি কারণ বিষয়ে তোমার যে আপত্তি তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে। অতএব যিনি সকল স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছেন বলিয়া সর্ব্বব্যাপী, সকল জীবের হৃদয়ে সতত অধিষ্ঠিত আছেন, তাই মহর্ষিগণ যাঁহাকে আত্মা বলিয়া থাকেন, আর জগতের সকল বিষয় বিদিত রহিয়াছেন বলিয়া, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সেই সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের গতি থাকুক বা না থাকুক, তবুও যে তিনি জগৎ সৃষ্টির প্রবর্ত্তক হইতে পারেন, ইহাতে আর আপত্তি কি?

শিষ্য। আমার আর একটী সন্দেহ হইতেছে যে, অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণ এক পরমেশ্বরকেই নিত্য বলিয়া থাকেন, আর কোন বস্তুকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন না; কেন না অপর কোন বস্তুকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে তাহাদের মতে

অদ্বৈত বাদের হানি হইয়া থাকে। ঈশ্বর ব্যতীত অপর কোন পদার্থকে নিত্য বা স্থায়ী বলিয়া স্বীকার করিলে, সেই পদার্থটি দ্বিতীয় হইয়া পড়ে, সুতরাং অদ্বৈতবাদ কথার কথা মাত্র হয়; তাই পরমেশ্বর ব্যতীত আর কোন বস্তু সৃষ্টির পূর্ব্বকালে বর্ত্তমান থাকে, তাঁহারা এরূপ স্বীকার করেন না। তাই জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, পরমেশ্বরই যখন সৃষ্টির আদিতে একাকী বর্ত্তমান থাকেন, আর কোন বস্তু বর্ত্তমান থাকে না, তখন দ্বিতীয় বস্তুর অভাবে পরমেশ্বর কাহার প্রবর্ত্তক হইবেন? স্বীকার করিলাম, পরমেশ্বরের প্রবৃত্তি না থাকিলেও, তিনি অপরের প্রবর্ত্তক হইতে পারেন, কিন্তু যখন অপর কোন পদার্থই না থাকিল, তখন তাহার প্রবর্ত্তকতা অসম্ভব নয় কি?

গুরু। তোমার এই প্রশ্নের সম্যক মীমাংসা করিতে হইলে, অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণের মতে, মায়াবাদ যে কাহাকে বলে, তাহা বিস্তারিতরূপে বুঝাইতে হয়। এখন ঐ মায়াবাদ বিস্তারিতরূপে বুঝাইবার সময় নয়; তাহাতে অনেক কথা বলিতে হইবে, সুতরাং আর একদিন বিস্তারিতরূপে মায়াবাদ বলিব। সংক্ষেপে এই মাত্র বুঝিয়া লও যে, অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণ জগৎকে যে মায়াময় বলিয়া থাকেন, বাস্তবিক সে মায়া সৎ বা নিত্য পদার্থ নহে। বাস্তবিক নিত্য পদার্থ এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর। মায়া কাল্পনিক, সৃষ্টিও কাল্পনিক। কল্পনা-প্রসূত যে মায়া, তিনিই পরমেশ্বরের দ্বিতীয় সহায় হইয়া থাকেন; তাই পরমেশ্বর জগতের সৃষ্টি বিষয়ে সেই কাল্পনিক দ্বিতীয় সহায়স্বরূপ যে মায়া, তাহারই প্রবর্ত্তক হইয়া থাকেন; অতএব সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর এই জগতের সৃষ্টি বিষয়ে প্রবর্ত্তক হইতে পারেন, জ্ঞানবিহীন, অচেতন প্রকৃতি বা প্রধান; অপর কোন চেতন কর্ত্তৃক প্রেরিত না হইলে, জগতের সৃষ্টি বিষয়ে প্রবর্ত্তক হইতে পারেন না; সুতরাং জগতের আদি কারণ পরমেশ্বর; প্রকৃতি বা প্রধান জগতের আদি কারণ নহে

শিষ্য। আপনি বলিলেন কোন একজন চেতন প্রেরক না থাকিলে, অচেতন যে পদার্থ বা বস্তু, তাহার প্রবৃত্তি বা গতি হইতে পারে না। অচেতন পদার্থের গতি, চেতন পদার্থের প্রেরণা ব্যতীত হয় না, এইত আপনার কথা; আপনার এই নিয়মও যুক্তিযুক্ত নহে। কেন না, কোন কোন স্থলে চেতন পদার্থের পরিচালনাতে অচেতন পদার্থের গতি হয় বটে; আবার কোনস্থলে কোনরূপ চেতন পদার্থ প্রেরক নাই তবুও অচেতন পদার্থের গতি দেখিতে পাওয়া যায়। দুগ্ধ অচেতন, তাহার কোনরূপ চৈতন্য নাই, একথা আমরা যেমত স্বীকার করি, মহাশয়ও সেইরূপ স্বীকার করিবেন। বৎসের পোষণ হইবে, দুগ্ধ পান করিতে পারিলে বৎসের শরীর রক্ষা এবং বৃদ্ধি হইবে, এইজন্যই কি সেই অচেতন দুগ্ধ গাভীর স্তন হইতে স্বভাবতঃ স্বতঃই বৎসের মুখে যায় না? এস্থলে স্বভাবের প্রবর্ত্তনেই ত অচেতন যে দুগ্ধ তাহারও প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আর জল যে অচেতন তাহাও সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবগণের জীবন রক্ষা হইয়া থাকে; তাই কৃষির পরিপোষণ আবশ্যক এই জন্যই কি সেই অচেতন জল বৃষ্টিরূপে স্বভাবতঃ

আকাশ হইতে পড়ে না? স্নান, পান, আচমন প্রভৃতি বিবিধ ক্রিয়া জীবগণ সততঃ জল হইতে সম্পাদন করিয়া থাকে। এই কারণেই কি সর্ব্বদা, সকল স্থানে, প্রচুর পরিমাণে স্বভাবতঃই জলের প্রবৃত্তি, আমরা দেখিতে পাই না? তাই বলি, সকল স্থানে অচেতনের প্রবৃত্তির প্রতি, চেতনের পরিচালনা আবশ্যক করে না। কোন কোন স্থলে অচেতনের প্রবৃত্তি স্বভাবতঃই হইয়া থাকে; অতএব প্রকৃতি বা প্রধানের যে প্রবৃত্তি তাহাও স্বভাবতঃই হইয়া থাকে, প্রকৃতির প্রবৃত্তির প্রতি, কোনরূপ চেতনের পরিচালনা আবশ্যক হয় না। জীবগণের উপকারের জন্য জলের গতি, এবং বৎসগণের পরিপোষণের জন্য দুগ্ধের গতি স্বভাবতঃই যেরূপ হইয়া থাকে, সেইরূপ পুরুষ বা আত্মা যে সময়ে বদ্ধ থাকেন সেই সময়ে পুরুষ সমূহের সাংসারিক ভোগ, আর যে সময়ে পুরুষগণের মুক্তি বিষয়ে অভিলাস হইয়া পড়ে, তখন তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া, এই উভয়বিধ প্রয়োজন সম্পাদন জন্য, প্রকৃতির যে প্রবৃত্তি, তাহাও স্বভাবতঃই হইয়া থাকে, কোনরূপ চেতনের প্রেরণা তাহাতে প্রয়োজন হয় না।

গুরু। বৎস! তুমি যে দুইটি উদাহরণ দ্বারা দেখাইতে চাও যে, চেতনের পরিচালনা ব্যতীত অচেতনেরও গতি হইয়া থাকে, ঐ উভয়বিধ উদাহরণ স্থলেই পর্য্যালোচনা করিলে অপর কোন চেতনের যে পরিচালনা আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়; সুতরাং তুমি যাহা বলিতেছ সাংখ্যদর্শনকারের সেই সকল যুক্তি দোষ-পরিশূন্য নহে। তোমার প্রদর্শিত দ্বিবিধ উদাহরণেই চেতনের প্রেরণা রহিয়াছে, এরূপ অনুমান করিতে পারা যায়। প্রস্তর খণ্ড অচেতন, তাহা কোন একজন চেতন মনুষ্য না চালাইলে চালতে দেখা যায় না; মৃত্তিকা অচেতন, তাহা চেতন কর্ত্তৃক পরিচালিত না হইলে চলিত পারে না; এবংবিধ যে সকল উদাহরণ সাংখ্যদর্শনকারের মতে ও আমাদের মতে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে কোন পক্ষেই আপত্তি থাকে না। সেই সকল উদাহরণ দ্বারাই স্থির করিব যে,—যে যে স্থলে অচেতনের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, সেই সেই স্থানেই চেতনের পরিচালনা আবশ্যক হয়। এই যুক্তিদ্বারা অনুমান করিতে পারি যে—দুগ্ধ ও জল যখন অচেতন পদার্থ, এবং তাহাদের প্রবৃত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ঐ দুগ্ধ ও জল উভয়বিধ পদার্থের প্রবৃত্তির প্রতিও চেতনের পরিচালনা রহিয়াছে। আরও দেখ অনুমানে সংশয় উপস্থিত হইলে, শাস্ত্রের প্রমাণ আছে কি না, তাহা দেখা আবশ্যক হইয়া পড়ে। দুই পক্ষে দুই প্রকার অনুমান করিলে, শাস্ত্রবাক্য যে পক্ষের পরিপোষক হইবে, সেই পক্ষ প্রবল হইয়া থাকে। যে পক্ষে শাস্ত্রবাক্য প্রমাণ থাকে, সেই পক্ষের অনুমানই নির্ভুল হয়। জলের যে স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি হয় না, আর একজন প্রবর্ত্তক আছে, তাই জলের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, এবিষয়ে বেদে পরিষ্কার প্রমাণ রহিয়াছে।

যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোঽন্তরো যোঽপোঽন্তরো যময়তি, এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি। প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে।"

যিনি জলের ভিতর থাকিয়াও জল হইতে বিভিন্ন হন, যিনি জলের ভিতর রহিয়াই জলকে নিয়মিত করিতেছেন, হে গার্গি! এই অবিনাশী পরমেশ্বরের শাসনাধীনে থাকিয়াই পূর্ব্বদিকের এবং অপরাপর দিকের নদী সকল প্রবাহিত হইয়া থাকে।

এই শ্রুতিবাক্যদ্বারা এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই যে নদীগণের পরিচালনা করিতেছেন এবং বৃষ্টিতে যে জল হইয়া থাকে তাহারও নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, ইহাইত বুঝিতে পারি। অপর পক্ষে এই জল যে স্বাধীনভাবে চলিয়া থাকে এবং বৃষ্টি যে স্বভাবতঃ হইয়া থাকে, এবিষয়ে কোন প্রমাণ আছে কি? আরও দেখ কোনও কারণ নাই তবুও জল চলিতেছে এরূপ দেখা যায় কি? জলের গতি বিষয়েও ভূমির নিম্নতা প্রভৃতি কতকগুলি কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। দুগ্ধের প্রবৃত্তিও স্বভাবতঃ যে হয় না, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়; গাভী চেতন, বৎসের প্রতি তাহার স্নেহ রহিয়াছে, সে সেই স্নেহ বশতঃ বৎসকে যে সময়ে দুগ্ধ দিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে, তখনই দুগ্ধ পাওয়া যায়, তাহাতেও আবার চেতন যে বৎস, তাহার আকর্ষণ আবশ্যক হইয়া থাকে। সুতরাং দুগ্ধের প্রবৃত্তির প্রতি চেতন গাভী এবং চেতন বৎস এই উভয় পরিচালক নয় কি? অতএব দুগ্ধের প্রবৃত্তি এবং জলের যে গতি তাহাও স্বভাবতঃ হয় না। তাই বলি চেতন পরিচালক হইলেই অচেতনের প্রবৃত্তি, আর চেতন পরিচালক না হইলে, অচেতন নিষ্ক্রিয়, সকল স্থলেই যখন দেখিতে পাওয়া যায়, তখন সাংখ্য দর্শনের মতানুযায়ী জগতের আদি-কারণ যে প্রকৃতি, তাহার প্রবৃত্তিও যে স্বাধীনভাবে হইতে পারে না, ইহাইত অনুমান করিতে পারা যায়। সুতরাং প্রকৃতিরও পরিচালক কোন একজন চেতন যে রহিয়াছেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং প্রকৃতি জগতের আদি-কারণ নহে, পরমেশ্বরই জগতের আদি-কারণ। আজ অনেক কথা বলিলাম, আজ আর বলিব না; এ বিষয়ে আরও অনেক যুক্তিতর্ক যাহা আছে, তাহা আর একদিন বলিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রসন্নকুমার বেদান্ততীর্থ, বিদ্যালঙ্কার, কাব্যতীর্থ।

সরল যোগ সাধন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে,—চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। যোগ শব্দের বহু প্রকার অর্থ আছে; তন্মধ্যে চারি প্রকার যোগ আর্য্যশাস্ত্রে উল্লেখ আছে।

"মন্ত্রযোগো হঠশ্চৈব লয়যোগস্তৃতীয়কঃ।
চতুর্থো রাজযোগঃ স্যাৎ স দ্বিধাভাববর্জ্জিতঃ॥" (শিবসংহিতা)

অর্থাৎ যোগ চারি ভাগে বিভক্ত যথা, মন্ত্রযোগ, লয়যোগ হঠযোগ ও রাজযোগ; তন্মধ্যে মন্ত্র ও লয়যোগ শেষোক্ত রাজ ও হঠযোগের অন্তর্গত।

উক্ত হঠযোগ ও রাজযোগ অষ্ট অঙ্গে বিভক্ত,—

"যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি।"

অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি যোগের এই অষ্ট অঙ্গ পতঞ্জলী নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কোন উচ্চ প্রাসাদে আরোহণ করিতে হইলে যেরূপ এক একটি সোপান অতিক্রম করিয়া ক্রমে উর্দ্ধে উঠিতে হয়, সেইরূপ যোগের এই অষ্ট বিধ অঙ্গও এক একটি করিয়া অভ্যাস করিতে হয়। প্রথম সাধনটি উত্তমরূপে অভ্যস্থ হইলে, অপর একটি অঙ্গ অভ্যাসের অধিকার জন্মে। পর পর একটি করিয়া সোপানে উঠিলে অনায়াসে উচ্চস্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়; নচেৎ একটি সোপান লঙ্ঘন করিয়া অপর একটি সোপানে উঠিতে যাইলে, কিম্বা কখন নিম্ন সোপানে কখন উর্দ্ধ সোপানে গমনাগমন করিলে বৃথা পরিশ্রম বশতঃ গন্তব্য-স্থানে আরোহণ করা সুকঠিন হইয়া থাকে। সেই নিমিত্ত সাধকগণ যোগ সাধন প্রণালীর একটি অঙ্গ উত্তমরূপে অভ্যস্থ হইলে, পরে তাহার উচ্চতর অঙ্গের অভ্যাস করিবেন। নচেৎ বিশৃঙ্খলা প্রণালীতে অভ্যাস করিলে যোগাভ্যাস পূর্ণরূপে সাধন হয় না, এবং অবশেষে সাধকগণের ক্রমোন্নতি না হওয়া বশতঃ তাহাতে অশ্রদ্ধা জন্মায় ও আলস্য ইত্যাদি যোগমার্গের বিঘ্ন উপস্থিত হয়। এরূপ বিশৃঙ্খলাভাবে অভ্যাসের কারণ এই যে, আমাদের দেশে সেরূপ উপযুক্ত পথ-প্রদর্শক হিতোপদেষ্টা গুরুর অত্যন্ত অভাব। সাধকগণের ইচ্ছা আছে, ধৈর্য্য আছে ও উদ্যম আছে, কিন্তু উপযুক্ত পথ-প্রদর্শকের অভাবে অনেক সময় সুসাধকেরও বিশৃঙ্খলতা হয় এবং পরিশেষে উদ্যমহীনতা জন্মে। যদি যথার্থ পথ-প্রদর্শক পাওয়া যায়, তাহা হইলে, এমন কি যোগ সাধনের কেবল ইচ্ছা হইবা মাত্র, উদ্যম ও সাহসহীন সাধকগণেরও উদ্যম, সাহস, ধৈর্য্য ও বিশ্বাসাদি গুণ সকল উদ্দীপ্ত হয়; এবং শৃঙ্খলা সহ সাধন মার্গে উন্নত হইতে পারে। বশিষ্টদেব রামচন্দ্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন;—

"উদ্যমঃ সাহসং ধৈর্য্যং বলং বুদ্ধি পরাক্রমম্।
ষড়িমে যত্র তিষ্ঠন্তি স সর্ব্বং প্রাপ্নুয়াৎ পুমান্॥"

অর্থাৎ উদ্যম সাহস, ধৈর্য্য, বল, বুদ্ধি ও পরাক্রম এই ষড়বিধ গুণ যে পুরুষে বর্ত্তমান থাকে, তিনি সংসারে সকল কার্য্যই সিদ্ধ করিতে সমর্থ হন।

শাস্ত্রে উল্লেখ আছে ;—

গুরুং বিনা কোঽপি মুক্তিদাতা। গুরুং বিনা কোঽপি মার্গগন্তা ॥
গুরুং বিনা কোঽপি ন জাড্যহর্ত্তা। গুরুং বিনা কোঽপি ন সৌখ্যকর্ত্তা ॥

গুরু ভিন্ন মুক্তিদাতা আর কেহ নাই, গুরু ভিন্ন পথ প্রদর্শক আর কেহ নাই, গুরু ভিন্ন অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার শক্তি আর কাহারও নাই ; গুরু ভিন্ন পরম সুখদাতাও আর কেহ নাই। সেই জন্য গুরু ভিন্ন সাধন মার্গে উন্নতি লাভ হয় না। গুরু ব্যতীত উদ্যম, সাহস, ধৈর্য্য সমস্তই সময়ে বিলুপ্ত হয়।

পূর্ব্বে যে মন্ত্র, লয়, হঠ ও রাজযোগের কথা বলা হইয়াছে তন্মধ্যে মন্ত্রযোগের তাৎপর্য্য এই যে ;—

"আত্ম মন্ত্রস্য হংসস্য পরস্পর সমন্বয়াৎ।
যোগেন গত কামানাং ভাবনা ব্রহ্ম উচ্যতে ॥—উত্তরগীতা।
"গুরুবাক্যাৎ সুষুম্নায়াং বিপরীতো ভবেজ্জপঃ।
সোঽহং সোঽহমিতি প্রোক্ত মন্ত্র যোগ স উচ্যতে ॥"—যোগবীজ।

আত্মমন্ত্র অর্থাৎ ব্রহ্ম মন্ত্র ওঁকার এবং জীবরূপী হংসমন্ত্র পরস্পর সমন্বয় রহিয়াছে। এই মন্ত্র দ্বয়ের যোগে জীবের কামনা গত হইলে ব্রহ্মের ভাবনা করা হয়। *

গুরূপদিষ্ট হইয়া উক্ত জীবরূপী হংস মন্ত্র সুষুম্নাপথে বিপরীত ভাবে সোঽহং সোঽহং প্রণালীতে জপ করার নাম মন্ত্রযোগ। ইহা ব্যতীত শাস্ত্রে যে বহুবিধ মন্ত্র আছে সেই মন্ত্র সকলের ন্যাস জপাদি করাকেও মন্ত্র যোগ কহে।

"অঙ্গেষু মাতৃকান্যাস পূর্ব্বং মন্ত্রং জপন্ সুধীঃ।
এবং মন্ত্র সিদ্ধিঃ স্যান্মন্ত্রযোগঃ স উচ্যতে ॥—তন্ত্রসার।

নিজ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অকারাদি ক্ষকারান্ত যে মাতৃকা বর্ণের ন্যাস ও তৎবর্ণ জাত যে মন্ত্র, তাহার জপ করিয়া সুবুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ মন্ত্রসিদ্ধ হইয়া থাকেন, এবং তাহাও মন্ত্রযোগ নামে অভিহিত হয়।

হঠযোগ যথা ;—

"হকারঃ কীর্ত্তিতঃ সূর্য্যষ্ঠকারশ্চন্দ্র উচ্যতে।
সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্যোগাদ্ধঠ যোগো নিগদ্যতে ॥"—হঠযোগ প্রদীপিকা।

হ শব্দে সূর্য্য ও ঠ শব্দে চন্দ্র ; এতদুভয়ের অর্থাৎ সূর্য্য চন্দ্রের যে সংযোগ তাহা হঠযোগ নামে অভিহিত হয়।

"প্রাণাপান সমাযোগ হঠযোগ প্রকীর্ত্তিতঃ;

---

* এই বিষয়টী ধ্যান-বর্ণন কালে বিশদ রূপে ব্যাখ্যাত করা হইয়াছে।

অর্থাৎ প্রাণ বায়ু (যাহা নাসিকা হইতে হৃদয়ে প্রবাহিত হয়) এবং অপান বায়ু (যাহা নাভিস্থান হইতে গুহ্যদেশ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়। এতৎ উভয়ের সংযোগকেও হঠযোগ কহে। ইহা ব্যতীত সাধারণতঃ যোগ-শাস্ত্রোক্ত প্রণালীতে শরীর নিজ আয়ত্তাধীন করিবার জন্য, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও নাড়ী আদিকে পরিচালনা করার নামও হঠযোগ। ইহার বিশেষ বিবরণ অষ্টাঙ্গ যোগের তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্গে আসন প্রাণায়াম বর্ণন কালে বিশদরূপে বর্ণন করা হইবে।

লয় যোগ ;—

"সদাশিবোক্তানি সপাদ লক্ষ লযাবধানানি বসন্তি লোকে।

নাদানুসন্ধান সমাধিমেকং মন্যামহে অন্যতমং লয়ানাম্ ॥—যোগ তারাবলী।

সংসারে সদাশিবের উক্ত বহুসংখ্যক লয়াবধান বিদ্যমান আছে; কিন্তু তৎসমুদয়ের মধ্যে চিত্ত নাদানুসন্ধানে (নাদ ধ্বনিতে) যে লয় প্রাপ্ত হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ লয়-যোগ।

নাজপা সদৃশজপন নাদ সদৃশ লয়ঃ।

অর্থাৎ অজপা (হংস মন্ত্র) সম আর শ্রেষ্ঠ মন্ত্র নাই এবং নাদ ধ্বনিতে যে চিত্তের লয়াবস্থা তাহাপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ লয় যোগ নাই।

ওঁকার ধ্বনিনাদেন বায়োঃ সংহরণাত্মকঃ।

নিরালম্বং সমুদ্দিশ্য যত্র নাদো লয়ং গতঃ ॥—উদ্ধবগীতা।

অর্থাৎ ওঁকার ধ্বন্যাত্মক নাদ বায়ু সহ উর্দ্ধে গমন করিয়া যে স্থলে সেই নাদের লয়-প্রাপ্তি হয়, তাহাই নিরালম্ব অর্থাৎ পরম পদ।

"তন্মনো বিলয়ং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং।"

মন উক্ত নাদ সহ যে স্থানে লয় প্রাপ্ত হয়, তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ।

চতুর্থ রাজযোগ ;—

ন দৃষ্টি লক্ষ্যানি-ন চিত্ত বন্ধো ন দেশকালৌ ন চ বায়ুরোধ।

ন ধারণা ধ্যান পরিশ্রমঞ্চ স মেধ মানে সতি রাজযোগে ॥"

যাহার দৃষ্টিতে কোনরূপ বাহ্য বিষয়ে লক্ষ নাই, যাহার চিত্ত কোনরূপ দেশ, অর্থাৎ ধ্যেয় বিষয়ে ও কালে, অর্থাৎ কোন সময়ে কোন রূপে বদ্ধ নহে. যাহার বায়ু নিরোধের অর্থাৎ প্রাণায়াম করিবার আবশ্যকতা নাই, ধ্যান ধারণা করিবার জন্য যাহার বিশেষ কোন পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না; এইরূপ রাজযোগ সম্যক্ উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইতে থাকে। তখন রাজযোগ শব্দে অভিহিত হয়।

"অশেষ দৃশ্যোর্জ্জিত দৃগ্জয়ানামবস্থিতানামিহ রাজযোগে।

ন জাগরো নাস্তি সুষুপ্তিভাবো ন জীবিতং ন মরণং ন চিত্তম্ ॥

অহং মমত্বাদি বিহায় সর্ব্বং শ্রীরাজযোগে স্থির মানসানাম্।

ন দ্রষ্টৃতা নাস্তি চ দৃশ্যভাবঃ সা জৃম্ভতে কেবল সম্বিদেব ॥

* ধ্যান ও সমাধিযোগে দৃষ্ট হইবে।

যিনি নিজ সাধন-শক্তিবলে অশেষ দৃশ্য প্রপঞ্চকে জয় করিয়াছেন তিনি এই রাজযোগে অবস্থান করেন। যিনি সংসার বিষয়ে জাগ্রত নহেন এবং অজ্ঞান রূপ প্রসুপ্তও নহেন, যিনি জীবিত নহেন এবং মৃতও নহেন, যাঁহার চিত্ত নাই অর্থাৎ চিত্ত যাঁহার লীন হইয়াছে, চিত্তবৃত্তি শূন্যতা বশতঃ যাঁহার অহঙ্কার, অভিমান বা মমতা আদি কিছুই নাই, তিনিই রাজযোগে স্থির হইয়াছেন। যাঁহাতে প্রপঞ্চের দ্রষ্টতা ও দৃশ্যভাব নাই, সেই অবস্থায় কেবল একমাত্র নিরুপাধিক চৈতন্য স্বরূপ জ্ঞান প্রকাশমান রহিয়াছে।

"বিচ্ছিন্ন সংকল্প বিকল্প মূলে নিঃশেষ নির্ম্মূলিত কর্ম্মজালে।
নিরন্তরাভ্যাসিনি নিত্যভদ্রে বিরাজতে যোগিনি যোগনিদ্রা॥"

যে অবস্থায় মনের সংকল্প বিকল্প বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, যখন কর্ম্মজাল নির্মূল হইয়া থাকে, যখন বাসনাশূন্য হয়, তখনই মঙ্গলদায়ক যোগীজনের যোগনিদ্রা উদয় হয়।

রাজযোগের অন্য একটি নাম জ্ঞানযোগ; তাহাই আত্মজ্ঞান লাভের সোপান এবং ইহাই শ্রেষ্ঠ যোগ। কিন্তু তাহা হঠযোগাভ্যাস ভিন্ন সিদ্ধ হয় না।

"হঠং বিনা রাজযোগো রাজযোগং বিনা হঠঃ।
তস্মাৎ প্রবর্ত্ততে যোগী হঠে সদ্গুরুমার্গতঃ॥—শিবসংহিতা।

হঠযোগ বিনা রাজযোগ এবং রাজযোগ বিনা হঠযোগ অভ্যাসে ফললাভ হয় না, তজ্জন্য সৎ-গুরূপদিষ্ট মার্গে * হঠযোগ অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইবে। কোন কোন লোক এরূপ বলেন যে, জ্ঞানলাভের জন্য হঠযোগ অভ্যাসের কোন প্রয়োজন হয় না; হঠযোগ ও রাজযোগ সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। হঠযোগ না হইলে রাজযোগ (জ্ঞান) হয় না। ভগবান্ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন,—

"সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥"

অজ্ঞ জনই জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ পৃথক্ মনে করেন, কিন্তু পণ্ডিতগণ তাহা বলেন না। কারণ উভয়ই এক প্রকারে অবস্থিতি করে; কর্ম্ম-যোগীজন যে মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন, জ্ঞান-যোগীজনও তাহাই প্রাপ্ত হন।

পার্ব্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।—

জ্ঞানাদেবহি মোক্ষং বদন্তি জ্ঞানিনঃ সদা।
ন কথং সিদ্ধতিস্ততো যোগঃ সংমোক্ষদো ভবেৎ॥—যোগবীজ।

জ্ঞান হইতে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে, জ্ঞানীগণ সর্ব্বদা এই কথা বলিয়া থাকেন অতএব

* সাধকগণ হঠযোগ বলিয়া নিরুৎসাহ হইবেন না। উপযুক্ত সৎগুরুর নিকট হঠযোগের সুগম পথ আছে, যে যেরূপ অধিকারী তৎপ্রতি দেশ কাল বিবেচনা করিয়া তিনি সেইরূপ হঠযোগ অভ্যাসের উপদেশ দিয়া থাকেন।

তাহাতে সিদ্ধ হয় না কেন? এবং যোগই বা মোক্ষদায়ক না হইবার কারণ কি? তদুত্তরে মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছিলেন,—

"জ্ঞানেনৈবহি মোক্ষঞ্চ বাক্যং তেষাত্তুনান্যথা॥
সর্ব্বে বদন্তি খড়্গেন জয়ো ভবতি তর্হি কঃ।
বিনা যুদ্ধেন বীর্য্যেণ কথং জয়মবাপ্নুযাৎ॥
তথা যোগেন রহিতং জ্ঞানং মোক্ষায় নো ভবেৎ।
জ্ঞানেনৈব বিনা যোগো ন সিদ্ধ্যতি কদাচন॥

'জ্ঞান হইলে যে মোক্ষলাভ হয়, তাহা অন্যথা বাক্য নহে। খড়্গ ব্যতিরেকে প্রবল যুদ্ধে জয়লাভ হয় না একথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন; বাস্তবিক বিনা যুদ্ধে কেবল খড়্গ দ্বারাও যুদ্ধে শত্রুকে জয় করিতে পারা যায় না। সেইরূপ যোগ রহিত জ্ঞানে মোক্ষ প্রাপ্তি হয় না। এবং জ্ঞান ব্যতিরেকে যোগও কদাপি সিদ্ধ হইতে পারে না।' ইহার তাৎপর্য্য এই যে নানাবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যে জ্ঞান জন্মে তাহাকে পরোক্ষ জ্ঞান কহে। অর্থাৎ যে জ্ঞান স্থিরভাবে হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় নাই, তাহা কেবল মৌখিক জ্ঞান, মুক্তি লাভের কারণ নহে; কিন্তু ক্রিয়া বা হঠযোগ দ্বারা হৃদয় শুদ্ধতা নিবন্ধন যে জ্ঞান হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, তাহাই অপরোক্ষ জ্ঞান মুক্তিলাভের হেতু হইয়া থাকে।

পক্ষী যেমন দুই পক্ষ ব্যতীত আকাশমার্গে গমন করিতে সক্ষম হয় না, সেইরূপ হঠ ও রাজ এই উভয় পক্ষ না হইলে কেহ যোগমার্গে গমন করিয়া গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে না। পক্ষী যেরূপ দুই পক্ষ পরিচালনা করিয়া শূন্যপথে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, সেইরূপ হঠ ও রাজ এই উভয় পক্ষই পরিচালনা রূপ অভ্যাস করিলে সাধক যোগমার্গে বিচরণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিয়া থাকেন। এক্ষণে সেই দুইপক্ষ বিশিষ্ট অষ্টাঙ্গ-যোগ বর্ণনা করিতেছি। অষ্টাঙ্গ যোগের প্রথম অঙ্গ,—

যম :—

"অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং দয়ার্জ্জবং।
ক্ষমা ধৃতির্ম্মিতাহার শৌচঞ্চেতে যমাদশ॥

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, আর্জ্জব, ক্ষমা, ধৃতি, মিতাহার, ও শৌচ—এই দশ প্রকার আচরণ অভ্যাস করিতে পারিলে যম অভ্যাস হয়।

অহিংসা, অর্থাৎ,—

"কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বদা।
অক্লেশজননং প্রোক্তমহিংসাত্বেন যোগিভিঃ॥—যাজ্ঞবল্ক।

শরীর, মন ও বাক্য দ্বারা যাহাতে কোন প্রাণীর কোনরূপ ক্লেশ না হয়, যোগিজন তাহাকেই অহিংসা বলিয়া থাকেন।

নিজ হস্ত দ্বারা কোন প্রাণী বধ করিব না, কিম্বা কোন প্রাণীকে যন্ত্রণা দিবনা, কিন্তু কোন লোক প্রাণীবধ করিতেছে তাহা দেখিয়া তাহাতে অনুমোদন করা উচিত নহে।

নিজ শরীর দ্বারা কোন লোকের হিংসা আচরণ করিবার শক্তি নাই, এরূপ স্থলে তাহার যাহাতে মন্দ হয় এরূপ চেষ্টা করা, সে যাহাতে ক্ষুন্ন হয়, যে বাক্য বলিলে তাহার অনিষ্ট হয়, এরূপ করিলেও অহিংসা আচরণ হয়না, হিংসা করাই হইয়া থাকে। শরীর দ্বারাই হউক আর বাক্য দ্বারাই হউক, উভয়েরই কারণ মন। মনে হিংসা হইলে, শরীর কিম্বা বাক্য দ্বারা হিংসা করিতে ইচ্ছা হইবে। সেই জন্য মন হইতে হিংসাবৃত্তি ত্যাগ করিতে হইবে। বস্তুতঃ হিংসা সম আর পাপ নাই। হৃদয়ে অহিংসা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। হিংসা না থাকিলে, সংসারে তাহারও কেহ হিংসা করে না। মনে হিংসাবৃত্তি থাকিলে, তৎসঙ্গে শরীরিজন হিংস্রকাকারে পরিণত হয়, অতএব হিংসাবৃত্তি এককালীন ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

"অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ॥"- যোগসূত্র, সাধনপদ, ৩৫।

হৃদয়ে অহিংসাবৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে, অর্থাৎ হিংসা ভ্রমেও মনে উদয় না হইলে, তাহার নিকট কাহারও কোনরূপ শত্রুভাব থাকে না।—অর্থাৎ সকলেই তাহার মিত্র হইয়া থাকে। শাস্ত্রে উক্ত আছে,—

"অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ।"

অর্থাৎ অহিংসা পরমধর্ম্ম। কিন্তু দেবোদ্দেশে যে পশুবধ করিয়া বলি-প্রদান-ব্যবস্থা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, তাহা কি তবে হিংসা নহে? অবশ্য তাহাতে হিংসা করা হয়। সকামী ব্যক্তিগণ স্বর্গাদি প্রাপ্তি কামনায় দেবোদ্দেশে প্রাণীবধ করিয়া থাকেন, তাহা নিষ্কাম ধর্ম্ম নহে। নিজ আত্মার কল্যাণ হেতু, 'অর্থাৎ মোক্ষলাভের অভিলাষিগণকে নিষ্কামী কহে; তাঁহাদের পক্ষে অহিংসা পরমধর্ম্ম, তাঁহাদিগের ইহাই শ্রেয়ঃ।

তন্ত্রশাস্ত্রে পশু-বলিদানের কথা এবং পঞ্চ-মকার সাধন-প্রণালীতে (দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাত্রা) মৎস্যমাংস সেবনের কথার উল্লেখ আছে; কিন্তু ইহাও উল্লিখিত আছে,

"কামক্রোধৌ ছাগবাতৌ বলিং দত্ত্বা প্রপূজয়েৎ।" মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

কাম ক্রোধাদি মনোবৃত্তিগুলিকে ছাগ-জ্ঞানে বলি প্রদান করিয়া ইষ্ট দেবের পূজা করিবে।

"গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স ভবেৎ মৎস্যসাধকঃ।"

অর্থাৎ, বাম নাসিকা-স্থিত নাড়ী গঙ্গানামে অভিহিত হয়, এবং দক্ষিণ নাসাস্থিত নাড়ী যমুনানদী নামে কথিত হয়। এতদুভয় নাড়ীতে যে শ্বাস ও প্রশ্বাস প্রবাহিত হয়, তাহাই দুইটি মৎস্য বিশেষ। যিনি সেই শ্বাস ও প্রশ্বাসের ক্রিয়া প্রাণায়াম করেন, তিনিই মৎস্য-ভোজী সাধক।

"মা শব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশং রসনা প্রিয়ে।
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবী স এব মাংস-সাধকঃ॥"

মা শব্দে জিহ্বা, তাহার অংশভূত যিনি পান করেন, হে প্রিয়ে, তিনি মাংসভোজী সাধক।

ইহাতেই বিশেষরূপে অনুমিত হয় যে, নিষ্কাম পুরুষগণের অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। যমের দ্বিতীয় সাধন,—সত্য।

"সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তং ন যথার্থাভিভাষণং।"

কেবল যথার্থ বাক্য কহাকে সত্য বলে না; যে বাক্যে প্রাণিগণের অহিতাচরণ না হয়, তাহাই সত্য। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—

"সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়ান্নব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং।
প্রিয়ং চ নানৃতং ব্রূয়াদিতি ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥"

যাহা লোকের প্রিয় এবং সত্য, সেইরূপ ভাষণ করাই উচিত। সত্য বাক্যও যদি অপ্রিয় ও অহিতকর হয়, তবে সেরূপ বাক্য কাহারও প্রতি প্রয়োগ করা উচিত নহে,—সে অবস্থায় মৌন হওয়াই উচিত। যাহা প্রিয় এবং সত্য, তাহাই বলা সনাতন ধর্ম্ম। ব্যাসদেব যোগভাষ্যে বলিয়াছেন,—

"যদিচৈবমপ্যভিধীয়মানা ভূতোপঘাতপরৈব স্যান্ন সত্যং ভবেৎ।
পাপমেব ভবেৎ তস্মাৎ পরীক্ষ্য সর্ব্বভূতহিতং সত্যং ব্রূয়াৎ॥"

'যদি সত্যবাক্য কথিত হইলেও কোন প্রাণীর ক্লেশকর হয়, তাহা হইলে সে বাক্য সত্য নহে; পরন্তু তাহাতে পাপই হইয়া থাকে। সেইজন্য সত্যানুরক্ত পুরুষ বিশেষ বিচার করিয়া সর্ব্বপ্রাণীর হিত নিমিত্ত সত্য বাক্য বলিবেন।' সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ রাজা যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্য্যের অহিতকর কপটতা-যুক্ত সত্যবাক্য—"অশ্বত্থমা হত ইতি গজঃ" বলিয়া পাপভাগী হইয়াছিলেন। পরের হিত জন্য যেরূপ সত্যকথা বলিতে হয়, সেইরূপ সত্য-ভাষণ করিলে নিজেরও অশেষরূপ হিতসাধন হয়; কারণ কি, যদি সত্য ভাষণ করাই জীবনের মহৎ ব্রত হয়, তাহা হইলে অনেক সময় আমরা পাপাচরণ করিতে বিরত হইয়া থাকি কোন দুষ্কর্ম্ম করা হইলে, যদি তদ্বিষয় কেহ জানিতে পারে বা জিজ্ঞাসা করে, তবে সত্য কথা বলিতে হইবে;—দুষ্কর্ম্ম জন্য লোকে অপবাদ দিবে, দণ্ডনীয় হইতে হইবে, এরূপ মনে হইলে অনেক সময় নানারূপ পাপাচরণ হইতে নিজেকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারা যায়। কিন্তু বস্তুতঃ ইহাতে কি হইবে, লোকের নিকট অসত্যও সময়ে সত্য হইয়া থাকে। সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বরের নিকট অসত্য ত কখন সত্য হইবে না, সেইজন্য ঈশ্বরের নিকট সত্যভাবে থাকিতে হইবে।

"সত্য প্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্।—যোগসূত্র সাধনপাদ ৩৬

---

* ইহার বিশেষ বিবরণ খেচরী মুদ্রা বর্ণনকালে প্রদত্ত হইবে।

মিথ্যাকে যদি জন্মের মত ভুলিতে পারা যায়, সত্য ভাবই যদি হৃদয়ে সর্ব্বদা স্ফুরণ হয়, তাহা হইলে সত্যভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে জানিবেন, এবং তাহা প্রতিষ্ঠিত হইলে, তদ্বাক্যে সকল কার্য্যেরই ফললাভ হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাহার ইচ্ছামত ফল পাওয়া যায়। এবং বাক্যসিদ্ধ হইয়া থাকে। ভীষ্মদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে মহাভারতের মোক্ষ পর্ব্বে বলিয়াছিলেন,—

"নাস্তি বিদ্যা সমং চক্ষু নাস্তি সত্যসমং তপঃ।"

বিদ্যা অপেক্ষা আর চক্ষু নাই এবং সত্য অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ তপস্যা নাই।

"সত্যং স্বর্গস্য সোপানং পারাবারস্য নৌরিব।"

সত্যই স্বর্গপ্রাপ্তির সোপান এবং ভবপারাবার উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র নৌকা স্বরূপ। সেইজন্য বিবেকিজন সর্ব্বতোভাবে হৃদয়ে সত্য ধর্ম্মের সেবা করিবেন।

যমের তৃতীয় সাধন অস্তেয়।

"কর্ম্মণা মনসা বাচা পরদ্রব্যেষু নিস্পৃহা।
অস্তেয়মিতি সংপ্রোক্তমৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥"—যাজ্ঞবল্ক্য।

শরীর মন এবং বাক্য দ্বারা পরদ্রব্যে যে নিস্পৃহভাব, তত্ত্বদর্শী মুনিগণ তাহাকে অস্তেয় কহেন।

হৃদয়ে লোভবৃত্তির উদয় হইলে পরদ্রব্যে স্পৃহা হয় এবং লোভজনিত স্পৃহার বশতাপন্ন হইয়া অবিবেক বশতঃ মনে পরের দ্রব্য চুরি করিবার ইচ্ছা জন্মে, কিম্বা লোকে অভাবে পড়িয়া পরের দ্রব্য অপহরণ করিয়া থাকে। নিজে চৌর্য্যবৃত্তি না করিয়া, কেহ চুরি করিতেছে, তাহার সেই কার্য্য অনুমোদন করিলেও চৌর্য্য পাপে লিপ্ত হইতে হয়। সেই জন্য বিবেকী জন, মন হইতে পরদ্রব্যের প্রতি স্পৃহা ত্যাগ করিয়া অস্তেয়রূপ মহৎ গুণের সেবা করিবেন। পরের দ্রব্যে যদি স্বপ্নেও স্পৃহা না জন্মে, তাহা হইলে অস্তেয় গুণটি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়।

"অস্তেয় প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্ব রত্নোপস্থানম্॥"—যোগসূত্র, সাধনপাদ—৩৭।

অস্তেয় প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার নিকট সমস্ত রত্ন উপস্থিত হয়, অর্থাৎ তাহার কখনও কোনও দ্রব্যের অভাব হয় না।

ক্রমশঃ

শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

প্রজাপতির উপদেশ।

(বৃহদারণ্যকোপনিষৎ হইতে।)

৫ম অধ্যায়, ২য় ব্রাহ্মণ।

সুরাসুর নরগণ যবে
একদিন বহু তপস্যায়,
করিলেন সাক্ষাৎ দর্শন
প্রজাপতি স্বয়ম্ভু ব্রহ্মায়;

২

দেববৃন্দ অগ্রসরি আগে
কহিলেন, করি যুক্ত-কর,—
"আমাদেরে দাও উপদেশ,
পিতঃ, তুমি করুণা সাগর!"

৩

প্রজাপতি স্মিত-কণ্ঠে শুধু
কহিলা, "দ" একটি অক্ষর!—
সুরগণ ভাবে মনে মনে,
জুড়াইল সকল অন্তর!

৪

হাসিয়া শুধান প্রজাপতি,—
"কি বুঝিলে কহ বৎসগণ?"
"বুঝিলাম"-উত্তরিলা তাঁরা,—
"দান্ত সবে হও অনুক্ষণ!'

৫

মানব মাগিল উপদেশ,
নত-শিরে বন্দিয়া চরণ;—
প্রজাপতি তেমতি আবার
কহিলা, "দ" একটি বচন!

৬

কি আনন্দে নাচিল হৃদয়,
অলক্ষিতে সজল নয়ান;—
প্রজাপতি শুধান হাসিয়া,
"কি বুঝিলে মানব-সন্তান?"

৭

কর-যোড়ে কহে নরগণ,
"মূঢ় মোরা, লুব্ধ যে সতত,—
তাই তুমি দিলে উপদেশ
'দান কর সদা সাধ্য মত'!"

৮

অবশেষে প্রজাপতি-পাশে,
অসুর হইল আগুয়ান,
তীব্রনেত্রে চাহি তাঁর পানে
কহে,—"কর উপদেশ দান!"

৯

প্রজাপতি হাসিয়া মধুর
কহিলা, "দ" সেই এক কথা!—
নীরবিল অসুর নিকর,
তৃপ্ত যেন সব আকুলতা!

১০

"কি বুঝিলে ?"-স্বয়ম্ভূ শুধান,
কহে তারা—"বুঝিয়াছি সার,
'দয়া কর প্রাণীগণে সদা'
উপদেশ ইহাই তোমার !"

১১

স্বীকার করিলা প্রজাপতি,
উপদেশ বুঝেছে সকলে ;—
'দ দ দ' নির্ঘোষে আজিও
দৈববাণী জাগে মেঘদলে !

১২

সত্ত্ব-রজ-তমঃ-গুণধারী
মানব যে সুরাসুরনর ;
ব্রহ্মার এ মহা উপদেশ
পালিও জীবনে নিরন্তর !

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

ভারতীয় ভূমা-বাদ।

(২)

অনুপ্রবেশ।

আমরা দেখিয়াছি যে, অদ্বৈত মতে সৃষ্টি অলীক, জগৎ নাস্তি ; কেবল একাকার 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ব্রহ্মই আছেন, আর কোন কিছুই নাই। তিনি অদ্বৈত, নানাত্বহীন ভূমা ; কিন্তু ভারতীয় ভূমাবাদের ইহাই সকল কথা নহে। কারণ দেখা যায়, উপনিষদ্ স্থানে স্থানে জগতের ব্যাবহারিক সত্যতা (phenomenal reality) স্বীকার করিয়াছেন। জগৎকে এইভাবে দেখিলে জগতের সহিত ব্রহ্মের কি সম্বন্ধ স্থির হয় এবং ভারতীয় ভূমাবাদ কি আকার ধারণ করে ?

বলা বাহুল্য, অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি, অসৎ হইতে সৎএর সৃষ্টি, (যাহাকে creation ab nihilo, - out of nothing বলা যাইতে পারে)—ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে অনুমোদিত নহে। তাঁহারা বলেন,—

নাসৎ উৎপদ্যতে ন সৎ বিনশ্যতি।

'অসতের উৎপত্তি হয় না ; সতের বিনাশ হয় না।'

না ভাবাৎ ভাবোৎপত্তি।

'অভাব হইতে ভাব কখনও উৎপন্ন হইতে পারে না।'

সেই জন্য এই মতে সৃষ্টি অর্থে creation নহে,—emergence,—অব্যক্তের ব্যক্তাবস্থা, অব্যাকৃতের ব্যাকৃত অবস্থা,—যাহা বিলীন (latent) ছিল, তিরোহিত ছিল, তাহার আবির্ভাব, তাহার প্রকাশ হওয়া (patent)। এ মতে সৃষ্টি অনাদি, জগতের আদি অন্ত

নাই। প্রলয়ে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মে লীন হইতেছে, একীভূত হইতেছে; আবার সৃষ্টিতে বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে আবির্ভূত, ব্যাকৃত হইতেছে। পর্য্যায়ক্রমে সৃষ্টি হইতে প্রলয়, প্রলয় হইতে সৃষ্টি। সেইজন্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন —

অক্ষরং তমসি লীয়তে তমঃ পরে দেবে একী ভবতি।

'অক্ষর তমসে লীন হয়। তমঃ পরমাত্মায় একীভূত হয়।' *

এই মর্ম্মে ঈশ-উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

তস্মিন্ অপো মাতরিশ্বা দধাতি।—ঈশ, ৪।

'মাতরিশ্বা (প্রাণ) তাঁহাতে (ব্রহ্মে) অপ্ নিহিত করেন।'

অপ্ = কারণার্ণব = অব্যক্ত প্রকৃতি — "অপ এব সসর্জ্জাদৌ"—মনু)। মাতরিশ্বা = প্রাণ = পুরুষ।

এ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন,—

প্রকৃতির্যা ময়াখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিনী।
পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি ॥ বিষ্ণু, ৬।৪।৩৮

'ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপা প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়েই পরমাত্মাতে বিলীন হন।' প্রলয়ে প্রকৃতি পুরুষ ব্রহ্মে বিলীন হন বলিয়া ব্রহ্মের একটী স্বার্থক নাম নারায়ণ। নারের অয়ন (আশ্রয়) নারায়ণ। নার অর্থে কারণার্ণব (অব্যক্ত প্রকৃতি),—("আপো নারা ইতি প্রোক্তা"—মনু); এবং নার অর্থে নরের (পুরুষের) সমূহ। প্রলয়ে ব্রহ্ম, প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়েরই নিধান। প্রলয়ে পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়। সে অবস্থায় এক একাধার ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন,—

সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীদ্ একমেবাদ্বিতীয়ং।

'হে সোম্য, আদিতে এ সমস্তই সৎ, একমেবাদ্বিতীয় ব্রহ্ম ছিলেন।'

অন্যত্র শ্রুতি বলিয়াছেন,—"আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ"। ঐত-২।১

'অগ্রে এ সমস্ত পরমাত্মাই ছিলেন।'

পরে প্রলয়ের অবসানে ব্রহ্মের সৃষ্টির ইচ্ছা হয়।

স ঐক্ষত একোঽহং বহুস্যাম্ প্রজায়েয়।

'আমি একমেবাদ্বিতীয় আছি; আমি বহু হইব, আমি সৃষ্টি করিব।'

তখন তাঁহাতে লীন (latent) জগৎ আবার ব্যক্ত (patent) হয়, তাঁহাতে তিরোহিত জগৎ আবার আবির্ভূত হয়,—তিনি সৃষ্টি করেন

স তপঃ তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বম্ অসৃজত যদিদং কিঞ্চ—তৈত্তি, ২।৬

---

* তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে।—ঋগ্বেদ। আসীদিদং তমোভূতম্। মনু

তিনি তপঃ তপিয়া এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন—এ সমস্ত যাহা কিছু।

জগৎ সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্ম কি করিলেন?

তৎ সৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ—তৈত্তি, ২।৬

'ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে অনুপ্রবেশ করিলেন।' এই অনুপ্রবেশ-তত্ত্ব আমাদের আলোচনার বিষয়—কারণ, ভারতীয় ভূমাবাদের ইহা এক প্রধান অংশ

সোঽমন্যত এতাসাং প্রতিবোধনায় অভ্যন্তরং বিবিশামি। স বায়ুরিব আত্মানং কৃত্বাঽভ্যন্তরং প্রাবিশৎ।

—মৈত্রা, ২।৬

'তিনি মনে ভাবিলেন, ইহাদের বোধনের জন্য প্রবেশ করি। তিনি যেন নিজেকে বায়ু করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়া গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদ্ অব্যক্ত মূর্ত্তিনা।

'অব্যক্ত মূর্ত্তিতে আমি এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি।' সেই জন্য বিশ্বের মাঝে কোন কিছু জড় পদার্থ (dead matter) নাই। সমস্তই তাঁহার জীবনে উজ্জীবিত, তাঁহার প্রাণে অনুপ্রাণিত, তাঁহার দ্যুতিতে দ্যুতিময়, তাঁহার ভাতিতে চিন্ময়। বিশ্বের প্রত্যেক অনু পরমাণুতে তিনি অনুস্যূত। স্থাবর জঙ্গম, চর অচর, এজগতে এমন কিছুই নাই, যাহার মধ্যে তিনি অনুপ্রবিষ্ট নহেন।*

ন তদস্তি বিনা যৎ স্যাৎ ময়া ভূতং চরাচরম্—গীতা।

ব্রহ্ম জগতের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। জগৎ তাঁহাকে আবরণ করিল; তিনি যেন জগতের মধ্যে লুকাইয়া গেলেন।

দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্। শ্বেত, ১।৩

'মহেশ্বরের শক্তি স্বগুণে নিগূঢ় হইয়া গেল।

স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ। আনখাগ্রেভ্যো যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানে অবহিতঃ স্যাৎ বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভরকুলায়ে তং ন পশ্যন্তি।—বৃ, ১।৪।৭

'তিনি জগতের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নখাগ্র পর্যান্ত অনুপ্রবিষ্ট হইলেন—ক্ষুর যেমন ক্ষুরাধারে প্রবিষ্ট হয়, অগ্নি যেমন অরণির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়! তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইল না।'

তিনি যেন জগতের মধ্যে হারাইয়া গেলেন। সলিলের মধ্যে যেমন লবণ-খণ্ড গলিয়া হারাইয়া যায়, যেন সেইরূপই হারাইয়া গেলেন,—তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাস্ত উদকমেবানুবিলীয়েত ন হাস্যোদ্গ্রহণায়েব স্যাৎ।—বৃ, ২।৪।১২,

এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়া শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন,—

যস্তূর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ।—৬।১০

* অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু উদ্ভিদ ও ধাতব পদার্থের মধ্যে যে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিয়া জড়ের ও জীবের একত্ব সপ্রমাণ করিতেছেন, সে প্রাণ এই বিশ্বমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ব্রহ্মেরই প্রাণন।

'উর্ণনাভি যেমন জাল রচনা করিয়া নিজেকে আবৃত করে, তিনি সেইরূপ প্রাকৃতিক জগৎ-জালে নিজেকে আবৃত করিলেন।'

পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায় ইহাকে Emanence বলে। ব্রহ্ম কি শুধুই জগতের মধ্যে Emanent? অনুপ্রবিষ্ট? তিনি কি কেবল বিশ্বানুগ?

পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা যাহাকে Pantheism বলেন, তাহার শিক্ষা এইরূপই বটে। সে মতে ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়া জগতের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া যান। দুগ্ধ যেমন দধি-রূপে বিকৃত হয়, মেঘ যেমন বৃষ্টিতে পর্য্যবসিত হয়, ব্রহ্ম সেইরূপ জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন। দধি হইলে যেমন আর দুগ্ধ থাকে না, বৃষ্টি হইলে যেমন আর মেঘ থাকে না, সেইরূপ জগৎ হওয়াতে ব্রহ্ম আর থাকিলেন না। তিনি জগতে নিঃশেষিত হইয়া গেলেন।

ভারতীয় ভূমাবাদ এ মতের সমর্থন করেন না। ভারতীয় ভূমাবাদের শিক্ষা এই যে,—

বিষ্টভ্যাহম্ ইদং কৃৎস্নং একাংশেন স্থিতো জগৎ। গীতা, ১০।৪২

'ভগবান্ একাংশমাত্র দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন।'

এরূপ বলার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম জগতের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিলেও প্রপঞ্চের সসীমতায় তাঁহার অসীমতা নিমজ্জিত হয় না; কারণ ব্রহ্মজ্যোতিঃর ভগ্নাংশই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কার্য্যের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হয়। * অর্থাৎ ব্রহ্ম বিশ্বানুগ হইয়াও বিশ্বাতিগ নহেন। সেই জন্য ঋগ্বেদের ঋষি বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পুরুষ-সূক্তে বলিয়াছিলেন,—

স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্।

'ঈশ্বর সমস্ত ভূমি আবরণ করিয়াও দশ অঙ্গুলি অধিক হইলেন।'

এতাবান্ অস্য মহিমা অতো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥

'ইহার মহিত্ব এতদূর। কিন্তু পুরুষ (পরমেশ্বর) ইহা অপেক্ষাও বৃহৎ। তাঁহার এক চতুর্থাংশে সমস্ত বিশ্ব—আর তিন অংশ বিশ্বাতিগ, অমৃত।'

এই মর্ম্মে নারায়ণ উপনিষদ্ বলিয়াছেন,

যচ্চকিঞ্চিৎ জগৎসর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ॥ —১৩ অনুবাক্।

'জগতে যে কিছু দৃষ্ট বা শ্রুত হয়, সে সমস্তের অন্তরে নারায়ণ ব্যাপিয়া আছেন, এবং তিনি সে সমস্তের বাহিরেও আছেন।'

মৈত্রী উপনিষদেরও শিক্ষা ঐ,—

ইত্যসৌ আত্মা অন্তর্বহিশ্চ অন্তর্বহিশ্চ।—৫।২।

* But He will not be merged in His work. For vast as that work seems to us, to Him it is but a little thing. That marvellous individuality is not lost and only a portion thereof suffices for the life of a Kosmos—Annie Besant.

'সেই পরমাত্মা জগতের অন্তরে এবং বাহিরে।'

ঐ সুরে সুর মিলাইয়া ঈশ উপনিষদ্ বলিতেছেন,—

তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।

'তিনি জগতের অন্তরে আছেন, আবার জগতের বাহিরেও আছেন।'

গীতারও শিক্ষা ঐ,—

বহিরন্তশ্চ ভূতানাম্। ১৩।১৫।

'ব্রহ্ম ভূতসমূহের অন্তরে এবং বাহিরে।'

সেই জন্য তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ জগতে ব্রহ্মের অনুপ্রবেশ বর্ণনা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছেন,—

তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদ্ অনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চ অভবৎ। নিরুক্তঞ্চ অনিরুক্তঞ্চ। নিলয়নঞ্চ অনিলয়নঞ্চ বিজ্ঞানঞ্চ অবিজ্ঞানঞ্চ সত্যঞ্চ অনৃতঞ্চ। ২।৬।

"ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে অনুপ্রবেশ করিলেন। জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্ম সৎ ও ত্যৎ হইলেন—নিরুক্ত ও অনিরুক্ত হইলেন—নিলয়ন ও অনিলয়ন হইলেন—বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান হইলেন—সত্য ও অনৃত হইলেন "*

এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া মৈত্রী উপনিষদ্ বলিতেছেন,—

ত্রিষ্বেকপাৎ চরেদ্ ব্রহ্ম ত্রিপাৎ চরতি চোত্তরে।
সত্যানৃতোপভোগার্থো দ্বৈতীভাবো মহাত্মনঃ॥ ৭।১১

'ত্রিলোকীর মধ্যে ব্রহ্মের এক পাদ মাত্র; তাহার উত্তরে অমৃত ত্রিপাদ। সত্য ও অনৃতের আস্বাদন জন্যই সেই মহাত্মার দ্বৈতভাব হইয়াছে।'

এই সকল শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিশ্বানুগ হইলেও তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাতিগ রহেন। পাশ্চাত্য Pantheism হইতে ভারতীয় ভূমাবাদের এই একটী বিশেষত্ব। ভারতীয় ভূমাবাদ একদিকে যেমন ব্রহ্মকে বিশ্বাতিগ ভগবান্ (Extra-cosmic deity) মাত্র বলিতে অনিচ্ছুক, সেইরূপ ব্রহ্মকে কেবল বিশ্বানুগ বিশ্বের মধ্যে নিঃশেষিত (Immanent) বলিতেও অনিচ্ছুক। অতএব ভারতীয় ভূমাবাদ পাশ্চাত্য Deism এবং Pantheism এই উভয় মতবাদ হইতে স্বতন্ত্র। Deismএর যাহা সত্যাংশ এবং Pantheismএর যাহা সারাংশ, এই উভয়ের অপূর্ব্ব সমন্বয়ের উপরেই ভারতীয় ভূমাবাদ প্রতিষ্ঠিত।

বারান্তরে এই ভূমাবাদের অন্যান্য কথা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

---

* অধ্যাপক Deussen ঐ শ্রুতির এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন,—Brahman in creating the universe enters into it as being expressible, self-dependent, consciousness, reality, while it in harmony with its own nature persists as the Opposite—inexpressible, independent, unconsciousness, unreality. —P, 83.

কালী।

মরি! মরি! কি ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি! ভীষণ-মধুরের কি সুন্দর সমাবেশ! সগুণ-নির্গুণের কি অপূর্ব্ব সম্মিলন! পুরুষ-প্রকৃতির কি মধুর যুগল! ব্রহ্ম—নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, নিস্পন্দ, সুবিরাট, স্থির, গভীর, চৈতন্যময়, সমুদ্রতুল্য। আর, শক্তি—সগুণ, ক্রিয়াশীল, চঞ্চল।

মায়ের পদ-তলে মহাকাল স্থিরসমুদ্রের মত নিশ্চল, নিস্পন্দভাবে বিরাজমান। আর, মা আমার ঐ কাল-সমুদ্রে যেন হাস্যময়ী, লীলাময়ী, মহিমময়ী, তর-তর গামিনী তরঙ্গ ভঙ্গি! তুষার-ধবল, অমল-কমল-কান্তি সচ্চিদানন্দ আশুতোষ সাক্ষাৎ অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ব্রহ্মসমুদ্র। আর, মা আমার ঐ সমুদ্রের পরে প্রাণোন্মাদকারী লহরী-বিক্ষেপ! আশুতোষ চৈতন্যস্বরূপ—সেই জন্যই বুঝি অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষু; আনন্দময়—সেই জন্যই বুঝি, বিম্বোষ্ঠে মৃদু মৃদু হাসি প্রকাশমান; নিষ্ক্রিয়—সেই জন্যই বুঝি নিশ্চেষ্ট-ভাবে শয়িত। মা আমার, হ্লাদিনী শক্তি তাই আনন্দময়ী ও অট্টহাসিনী। মা আমার কার্য্যকারিণী সগুণা শক্তি—তাই, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী। মা আমার এক হস্তে বরাভয় দিচ্ছেন, অন্য হস্তে ভীষণ অসি ধারণ করিয়া প্রলয়সাধন কচ্ছেন! এক হস্তে সৃষ্টিস্থিতি, অন্য হস্তে প্রলয় এক হস্তে সাধুদিগের পরিত্রাণ, অন্য হস্তে দুষ্কৃতদিগের বিনাশ! একই মুখে একই সময়ে জ্যোৎস্না-মধুর প্রীতি-বিকাশ, আবার শ্রবণ-ভৈরব অশনি-নির্ঘোষ প্রতিম অট্ট অট্ট হাসির ঝঙ্কার! মায়ের আমার একই নয়নে প্রাণতোষিণী স্নেহধারা নিরন্তর ক্ষরিতেছে, আবার প্রলয়-ঘটন-পটীয়সী রোষাগ্নির বিদ্যুৎপ্রভা যেন ঝলকে ঝলকে বহির্গত হইতেছে। কি অদ্ভুত লীলা-বৈষম্য! কি মনোহর ভাব-বৈষম্য! কি চমৎকার প্রকৃতি-বৈষম্য!

মহাসমুদ্র ভিন্ন মহাতরঙ্গ কোথায় থাকে? তাই, কাল-সমুদ্র-বক্ষে, কালী-তরঙ্গ! ঠিক স্থানেই তরঙ্গের উৎক্ষেপ হইয়াছে! আবার ঐ সমুদ্রেই ঐ তরঙ্গ লীন হইবে!

মরি! মরি! সগুণে নির্গুণে কি মধুর দাম্পত্যভাব! কি সুন্দর মেশা-মেশি! মহাকালের সুবিরাট বক্ষঃস্থলে আমার শ্যামা মায়ের যদি তরল নৃত্যের তরল ভঙ্গিমা প্রকাশ না পাইল, তবে আর মহাকালের সৌন্দর্য্যগরিমা কোথায়, আর ভক্তেরই বা পিপাসা মিটাইবার চিরবাঞ্ছিত মাধুর্য্যরসের প্রস্রবণ কোথায় সম্ভবে!

মা আমার আদ্যাশক্তি—চিরনৃত্যময়ী, চিরলীলাময়ী! মাথার উপরে ঐ দেখ অনন্ত গগন নয়নাভিরাম, স্নিগ্ধ, শান্তোজ্জ্বল, শ্যামবর্ণে কেমন শোভা পাইতেছে। তুষার-ধবল হিমশীলাবৎ জলদপটল সুধীর সুমন্থর গতিতে একটী একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। আবার হয় তো নিমেষ মধ্যেই ঘনঘটারাশি বিকীর্ণ হইয়া শ্রুতিভয়ঙ্কর

বজ্রাগ্নি উদ্গীরণ করতঃ তড়িল্লতার প্রভায় দিগ্‌দিগন্ত আলোকিত করিয়া মুষলধারে বারিবর্ষণ করিবে। একি আমার পাগলিনী মায়ের নৃত্য নহে!

ঐ দেখ কেমন প্রশান্ত সমুদ্রে বীচিমালার কণ্ঠে হেমোজ্জ্বল তপন-রশ্মি মহামূল্য হীরক-হার-সদৃশ শোভা পাইতেছে! অনন্তপ্রসারী নীলকলেবরে বিরাট পুরুষের বিরাটভাব, দিব্য গাম্ভীর্য্য, ঐশী মাহাত্ম্য যেন সুন্দররূপে সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। দেখিলেই, যেন দর্শকের হৃদয়ে ভক্তিভাব উদ্বেলিত হইয়া উঠে। ঐ সমুদ্রের এখন এবম্বিধ স্নিগ্ধোজ্জ্বল মধুর প্রশান্তভাব, হয় তো মুহূর্ত্ত মধ্যেই ঐ স্থানে গগনস্পর্শী উত্তাল-তরঙ্গমালা সুভীষণ তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিবে। কোটী-শঙ্খ-নিনাদ ঐ সংক্ষুব্ধ সাগর-বক্ষ হইতে নিঃসৃত হইয়া জগতের ভয় উৎপাদন করিবে। এই নৃত্য কি আমাব নৃত্যময়ীর চিরপরিচিত নৃত্য নয়?

মা আমার আজ মোহিনী, কাল ভয়ঙ্করী! আজ এখানে সৌধকিরীটিনী, চিরহাস্যময়ী নগরীরূপে শোভমানা। কত বিটপীকুঞ্জ; ব্রততী-বিতান; বিহঙ্গ-কাকলী; ইন্দীবর-নিন্দী কামিনী-কান্তি; ত্রিদিব-সম্ভব যুঁই মল্লিকা বেলা-গোলাপ; সেতার-এস্রাজ-নিক্কণ-মুখরিতা নগরী। এখানে মা আমার কত মনোহারিণী, চমৎকারিণী, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণা ভুবনেশ্বরী। আজ মায়ের আমার এই মধুর লীলা। হয় তো অচিরাৎ এইখানে আবার ব্যাঘ্র-ভল্লুক-হিংস্র-জীব-সংকুল মহারণ্যের উদ্ভব হইবে। শ্বাপদের নৈশ চীৎকারে চতুর্দ্দিক ভীতিবিহ্বল হইবে ও মহাকালের মহাশক্তির বিভীষণ ভ্রূকুটী-বিক্ষেপ প্রকাশ পাইবে। তাই বলিতেছি, মা আমার চিরনৃত্যময়ী, চির-লীলাময়ী।

মায়ের নৃত্যের বিরাম নাই—ক্লান্তি নাই। এ ভাগবতী নৃত্যের তালভঙ্গ নাই! যে ভাবুক, সে দেখিতেছে যে, আমার দিগম্বরী পাগলিনী মা দিবস-রজনী তাথেই তাথেই করিয়া কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া এই উৎকট মধুর নৃত্য করিতেছেন। প্রত্যেক পত্র, পুষ্প ও তৃণশিরে, প্রত্যেক জলবিন্দুতে, জীবের শিরায় শিরায়, গ্রহ উপগ্রহে; বাসনা-কামনায় এই মহাকালীর উৎকট-মধুর লীলা ভাবুকের চক্ষে পড়িবে। অশনি-নির্ঘোষে, মেঘ-মন্দ্রে, কেশরী-গর্জ্জনে, জলধি-কল্লোলে আমার পাগলিনী মায়ের শ্রবণ-বিদারী, প্রলয়োদ্‌গারী, সমর-ভৈরব, প্রলয়-ভয়ঙ্কর অট্টহাসি শুনিতে পাই। আবার রমণী-হৃদয়ে জগৎ-বিশ্রুত বাৎসল্য-রসোদ্দীপনে মায়ের বরাভয় উপলব্ধি করি!

মরি! মরি! মায়ের আমার কি সুন্দর মূর্ত্তি! উৎকট-মধুরের অপূর্ব্ব সম্মিলন! সুধাংশুর কনকোজ্জ্বল কৌমুদী-রাশিতে মায়ের আদর-সোহাগ দেদীপ্যমান! প্রসন্নময়ীর প্রসন্ন-হৃদয়ের ছবি প্রকট। আবার তমিস্রা রজনীতে যেন লোলজিহ্বা, করাল-বদনা, ভয়ঙ্করী ভীমার প্রলয় কালীন খড়্গধারিণী, শোণিত-শোষিনী, দনুজ-দলনী মূর্ত্তি দেখিতে পাই। তাই বলিতেছি মা আমার উৎকট-মধুর রূপিনী!

মা আমার চিরানন্দময়ী। হবেনা কেন? যিনি আশুতোষের ঘরণী, সদানন্দ মহা-

দেবের জীবনানন্দ-বিধায়িনী, জীবন-সরোজিনী, প্রাণ-তোষিনী, তিনি আনন্দময়ী না হইবেন কেন? যিনি পূর্ণ ব্রহ্মের—সচ্চিদানন্দের—হ্লাদিনী শক্তি, তিনি কি নিরানন্দময়ী হইতে পারেন? যাঁর নামেই আনন্দের ফোয়ারা ছুটিতে থাকে—ত্রিতাপ-জ্বালা বিদূরিত হইয়া যায়—দুঃসহ নিদাঘে মলয়-মারুতের সঞ্জীবনী সুধা ক্ষরিতে থাকে, জীব প্রেমানন্দের অন্তর্দশায় বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া মহানন্দের মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত থাকিয়া অনুপম অনির্ব্বচনীয় সুখের আস্বাদ গ্রহণ করে, সেই কালভয়-হারিণী, ত্রিতাপ-তারিণী আনন্দময়ী না হইবেন কেন! তাই বলিতেছি, মা আমার জগদ্-আনন্দ-বিধায়িনী!

ঐ যে বিকচ কুসুমটি আনন্দভরে, দুলে দুলে, সমীরণের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছে; ঐ যে ভ্রমরটি আনন্দে আপনাহারা হইয়া, পরিমল-লোভে কুসুমাভিমুখে ছুটিতেছে; ঐ যে সোনার চাঁদ আনন্দের লহরী তুলিয়া, জগৎকে পুলকিত করিতেছে; ঐ যে শিশু ছোট বাহু দুটি তুলিয়া, জননীর কোলে হাসিয়া হাসিয়া, আধ আধ স্বরে চাঁদকে ডাকিতেছে; ঐ যে জননী আনন্দে আত্মহারা হইয়া ক্রোড়স্থ শিশুর অধরে চুম্বন করিতেছেন,—এ সকলই আমার আনন্দ-ময়ীর আনন্দ বিন্দু। আমার আনন্দময়ীর আনন্দ-সমুদ্রের কণা ক্ষরিয়া ক্ষরিয়া এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে পড়িয়াছে!—"এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি"—শ্রুতি। ঐ আনন্দ-কণা লাভ করিয়াই আজ শ্রীশ্রীচৈতন্য জয় রাধে বলিয়া বিহ্বল; বুদ্ধদেব সংসারত্যাগী; শ্রীকৃষ্ণ "দেহি পদ-পল্লব-মুদারম্" বলিয়া গদগদ। ঐ আনন্দকণা লাভ করিয়াই ভারতবর্ষীয় আর্য্যঋষিরা প্রণব-সাধন করতঃ সামগানে উন্মত্ত হইয়াছিলেন; সাধকগণ ভয়ঙ্কর তমোময় নির্জ্জন পর্ব্বত গুহায় ধ্যান নিরত থাকিয়া ঐ সুধাসিন্ধুর বিন্দু পানেই বিভোর, সমাহিত ছিলেন। মরি! মরি! কালবিজয়িনী কালী আমার সুধানন্দের অক্ষয় ভাণ্ডার!

মা আমার দনুজ-দলনী, নৃমুণ্ড-মালিনী, খণ্ডা-ধারিণী, লোলরসনা, করাল-বদনা! মা আমার অনন্তরূপিনী, অনন্ত ভাবের নির্ঝরিণী! মরি! মরি! কি প্রচণ্ড জ্ঞান-অসি! ঐ অসি-সঞ্চালনে মা নিরন্তর ভক্ত-হৃদয়ের সমরক্ষেত্রে নৃত্য করিতে করিতে অমিত-পরাক্রম, পাপ-অসুর-বংশকে নিধন করিতেছেন! নহিলে ভক্তের মোক্ষের উপায় কি হইত? জ্ঞান-খণ্ডা কি ভয়ানক শাণিত! উহাতে কলুষ-দানব খণ্ড খণ্ড হইয়া ধরাশায়ী হইতেছে! মা আমার নেচে নেচে রুধির পান করিতেছেন। রুধির—অসুরের শক্তি, পাপের আসক্তি। মা আমার ঐ শক্তি আকর্ষণ করিয়া শোষণ করিয়া লইতেছেন। অনন্ত-শক্তি-রূপিণী মা আমার, জীবের মঙ্গলের জন্য, ভক্তের মুক্তির জন্য, পাপের শক্তিটুকু আপন শক্তিতে লীন করিয়া লইতেছেন। ইহাই তো মায়ের রুধির-পান। বিশ্বজননীর কি অপার করুণা! উৎকট-মধুর ভাবের কি অপূর্ব্ব সম্মিলন!

কুপ্রবৃত্তির সঙ্গে, কলুষ-কলাপের সঙ্গে, ব্রহ্ম-সনাতনী, শিব-সীমন্তিনী ঐশী শক্তির এই ভীষণ সমর নিরন্তর প্রচণ্ডরূপে চলিতেছে। মা আমার চণ্ড-মুণ্ড বিঘাতিনী। মায়ের

অসিতে যদি সংসার-আসক্তি রূপ চণ্ডের মুণ্ড শতধা খণ্ড খণ্ড না হইত, তবে কি আর রক্ষা ছিল? শ্রীশ্রীচৈতন্য চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া যুবতীর আবেশ-মধুর আলিঙ্গন ছিন্ন করিয়া কেশব ভারতীর নিকট বৈরাগ্য গ্রহণ করিলেন। যুবতীর প্রেমালিঙ্গন-লোভ প্রচণ্ড চণ্ড দানব। যুবতীর হাস্য-লাস্য ভাব-ভঙ্গি-ঠাট-ঠমক-চাপল্য-কটাক্ষ প্রভৃতি ঐ চণ্ডের অনুচর। শ্রীশ্রীচৈতন্য কেমন করিয়া ঐ যুদ্ধে বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন? ঐ পাগলিনী মা আমার তাঁহার হৃদয়-সমরাঙ্গনে নাচিয়া নাচিয়া ঐ চণ্ডকে সদলবলে খণ্ড খণ্ড করিয়াছিলেন। মা আমার সমর-বিলাসিনী! বুদ্ধের হৃদয়েও ঐরূপ সমর করিয়াছিলেন। যে ভক্ত পাপ-অসুর বিনাশের জন্য একাগ্র মনে নিষ্ঠার সহিত মায়ের শরণাগত হয়, মা অমনই সমর-উল্লাসে নৃত্য করিতে করিতে ভক্ত হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া দনুজদল ছিন্ন ভিন্ন করেন। ভবভয়-হারিণী, ভুক্তিমুক্তি-দায়িনী, ত্রৈলোক্য-তারিণী—মা আমার, তাই কর প্রসারণ করিয়া অভয় দিয়া বলিতেছেন, "হে জীববৃন্দ, মা ভৈঃ, মা ভৈঃ; যখনই পাপের প্রলোভনে, মায়ার বন্ধনে, বৃত্তির তাড়নে, বিব্রত হইবে, তখনই আমার শরণ লইও, আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব"।

তাই বলিতেছি, আমরা শমন-বিজয়িনী মায়ের সন্তান। মায়ের স্নেহ-ধারা পীযূষ-ধারার মত প্রত্যেক জলবিন্দুতে ক্ষরিতেছে! মায়ের অভয় বাণী প্রত্যেক সমীর-উচ্ছ্বাসে শ্রুত হইতেছে! মায়ের সঞ্জীবনী সোহাগ-গাথা দিবাভাগে বিহঙ্গের ললিত কুহকে এবং নিশাকালে সপ্তস্বরার ঐকতানে পরিস্ফুটরূপে শুনা যায়! মায়ের সুধাসিঞ্চিত হাসিরাশি প্রফুল্ল-প্রসূন-রাশির লাবণ্য-তরঙ্গ ভঙ্গে দেদীপ্যমান!

মরি! মরি! মা আমার শুধু কৈলাস-বাসিনী নহেন! মা শুধু কৈলাসের অন্তঃপুরে অসূর্য্যম্পশ্যারূপ বিরাজ করেন না! পাগলিনী মা আমার ঘরে আবদ্ধ থাকিবার মেয়ে নন। মা আমার অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিনী, অনন্তব্রহ্মাণ্ড-বিহারিণী, অনন্তব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিনী, অনন্ত স্নেহে স্নেহবতী সন্তান-বৎসলা! মা আমার সাকারা ও মূর্ত্তিমতী হইয়া কৈবল্য দান করিয়া থাকেন। মায়ের কোলে আমরা সর্ব্বক্ষণই রহিয়াছি; মায়ের কোলেই নড়িতেছি চড়িতেছি, হাসিতেছি, খেলিতেছি। মায়ের সন্তান মায়ের কোলেই আছি। কিন্তু কি পরিতাপ, আমরা অজ্ঞান-তমসায় এমনই আচ্ছন্ন যে, মায়ের ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি একটীবারও নয়ন-গোচর করিতে পারিতেছি না! তাই বলি, মাগো একবার চোখের আঁধার ঘুচায়ে দেও, একবার তোমার রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি, হ্লাদিনী বিভূতির অপূর্ব্ব বিকাশ, মদন-মোহিনী হাসির অদ্ভুত লাবণ্য-বিন্যাস দেখিয়া জীবন সার্থক করি। মাগো আমরা কালভয়-হারিণীর সন্তান হইয়া তুচ্ছ কালভয়ে, ভয়ে ভয়ে কাল কাটাইতেছি। করুণাময়ি! করুণা করিয়া আমাদের কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া দাও। মা তুমি পাগলিনী! নিজেও নানা সাজে সাজিয়া খেলা করিতেছ, আমাদিগকেও নানা সাজে সঙ্ সাজাইয়া সংসারে পাঠাইতেছ। মাগো! আর সাজিতে পারি না। স্থাবর জঙ্গম, রাজা মজুর, কত সাজেই

সাজাইয়াছ। মাগো! এ খেলা আর ভাল লাগ্‌ছে না। অনন্তরূপিনী মাগো, অনন্তকাল ধরিয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত প্রকার অনন্তভাবোচ্ছ্বাসে খেলা করিতেছ। এ খেলার কি পরিসমাপ্তি হইবে না?

মা ব্রহ্মসনাতনী! এত খেলা খেলিতেছ, তবু তোমার খেলার সাধ মিটিতেছে না? সে দিন নবজলধর শ্যাম নটবর বেশে যমুনাপুলিনে ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিতে শ্রীদাম-সুদাম-দাম প্রভৃতি ব্রজরাখালদিগকে লইয়া কত খেলাই খেলিলে! কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে কত রঙ্গই করিলে! মাগো! তোমার ব্রজের খেলা আজও সকলের মনে জাগরূক রহিয়াছে মা! তুমি কখন বাঁশী ধর, কখন অসি ধর, কখন ধনু ধর, কখন কমণ্ডলু ধর তুমি নূতন নূতন সাজে বহুরূপ সাজ দাও আর মনে কর যে, কেহ তোমায় চিনিতে পারিবে না; কিন্তু মা সন্তানের কাছে কি লুকাইবার যো আছে? যে সাজেই সাজোনা কেন, ঐ মধুর হাসি আর ঐ ভুবনভুলান কটাক্ষ, এই দুইটীতেই তুমি ধরা পড়িয়া যাইতেছ! ঐ দুইটী যদি লুকাইতে না পারিলে তবে তুমি শ্যামই সাজো আর শ্যামাই সাজো, রামই সাজো আর গৌরই সাজো, যুদ্ধই কর আর বেণুই চরাও, আলুলায়িত কেশে কেশবতীই হও আর মস্তক মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুরই সাজো, আমরা মা বলিয়া তোমাকে চিনিতে পারিবই পারিব। মা গো! তুমি নিজে যত পার সাজো, কিন্তু আমাদিগকে আর সাজাইও না। সাজানো ত নয়, সাজা দেওয়া!

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যাবিনোদ।

শ্মশান।

১

জ্বালো! তুমি রুদ্রমূর্ত্তি! জ্বালো চিরদিন, মরণে অনল শিখা; বিশ্বের মন্দিরে
প্রতিদিন কত শত ধনী কিবা দীন দিতেছ আহুতি সদা প্রকৃতি দেবীরে।

২

তোমার উজ্জ্বল মূর্ত্তি গম্ভীর প্রশান্ত তপ্ত হৃদি সুধু ধূ ধূ জ্বলে নিশিদিন।
কিছুতেই তৃপ্তি নাই সতত অশান্ত—জীবনে সদাই তুমি মমতা-বিহীন।

৩

কোন্ প্রিয় এ তপস্যা উন্মাদের প্রায় অহোরাত্র যারে তারে বাঁধ দৃঢ়পাশে?
সোনার সংসার কত ছারখারে যায় বিরাট ব্যাপারে স্বপ্ন আন কোন্ আশে?

৪

মৃত্যু মর্ম্মভেদী কিন্তু তোমার মতন নহে সে প্রচণ্ড রুদ্র অগ্নির মূরতি!
বলি দাও—কি ভীষণ উগ্র আচরণ! শত মত্ত হস্তী সম তোমার শকতি।

৫

জীবনে কতই থাকে আশা আকিঞ্চন সব নিবে যায় তোমা স্মরণ করিতে।
তুমি আছ দাস যাঁর কোথায় সে জন বলে দাও তাঁরে যদি পারিগো ভজিতে।

শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

জীবন্মুক্তি-বিবেক।

[বিদ্যারণ্যমুনিকৃত জীবন্মুক্তি-বিবেক মুমুক্ষুর পক্ষে অতি উপাদেয় বেদান্তবিষয়ক প্রকরণ গ্রন্থ। বিজয়নগরের বীরবুক্ক নৃপতির প্রধান অমাত্য ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকর্ত্তা সায়নাচার্য্য সকলেরই সুপরিচিত। ইনি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া বিদ্যারণ্য নামে পরিচিত হন। বেদান্তের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "পঞ্চদশী" ইঁহারই রচিত। বিদ্যারণ্য পাঁচশত বৎসরের কিছু পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন। সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবার পর, ইনি শঙ্করাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন।

এই জীবন্মুক্তি-বিবেক গ্রন্থ পাঁচ প্রকরণে বিভক্ত:—জীবন্মুক্তি প্রমাণ, বাসনাক্ষয়, মনোনাশ, স্বরূপ সাধন প্রয়োজন এবং বিদ্বৎসংন্যাস।

এই গ্রন্থে ভগবদ্গীতা, যোগবাশিষ্ঠ, ভাগবত, বিশেষতঃ উপনিষদ্ হইতে নানা সমীচীন বচন উদ্ধার করিয়া গ্রন্থকর্ত্তা গ্রন্থের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন।

এই উপাদেয় গ্রন্থের মূল ও অনুবাদ আমরা 'ব্রহ্মবিদ্যায়' ক্রমশঃ প্রকাশিত করিব। অনুবাদক একজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী। ইনি বেদান্ত-শাস্ত্রে সুপ্রবিষ্ট; অনেকদিন যাবৎ ভরুকচ্ছ (Broach) প্রদেশে অবস্থান করিয়া লোকহিতকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। আমাদের আশা হয়, এই মূল ও অনুবাদ ব্রহ্মবিদ্যার পাঠকগণের প্রীতিকর হইবে।—সম্পাদক।]

জীবন্মুক্তি প্রমাণ প্রকরণ।

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরং ॥ ১ ॥

বেদ যাঁহার নিশ্বাসরূপ, এবং যিনি বৈদিক মর্য্যাদা অনুসারে সমস্ত সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন, সেই বিদ্যাতীর্থ (সকল বিদ্যার পবিত্র আশ্রয় গুরুদেব হইতে অভিন্ন) শ্রীমহেশ্বর শিব স্বরূপকে আমি নমস্কার করিতেছি।

অথ বক্ষ্যে বিবিদিষান্যাসং বিদ্বন্ন্যাসং চ ভেদতঃ।
হেতু বিদেহমুক্তেশ্চ জীবন্মুক্তেশ্চ তৌ ক্রমাৎ ॥ ২ ॥

বিবিদিষা-সংন্যাস তথা বিদ্বৎ-সংন্যাস ভিন্ন ভিন্ন কথন করিতেছি, তন্মধ্যে বিবিদিষা সংন্যাস বিদেহ-মুক্তির হেতু এবং বিদ্বৎ-সংন্যাস জীবন্মুক্তির হেতু।

সংন্যাসহেতুর্বৈরাগ্যং যদহর্বিরজেত্তদা।
প্রব্রজেদিতি বেদোক্তেস্তল্লক্ষণমুদাহৃতম্ পুরাণগঃ॥ ৩ ॥

বেদের অনুশাসন এই—"যে দিবস চিত্তে বৈরাগ্য উদয় হইবে, সেই দিবসই সংন্যাস গ্রহণ করিবে"—কারণ সংন্যাস-আশ্রমের প্রধান সাধন বৈরাগ্য। পুরাণে এই সংন্যাস-আশ্রমের নিয়ম অনেক স্থানে বর্ণিত আছে।

বিরক্তির্দ্বিবিধা প্রোক্তা তীব্রা তীব্রতরেতি চ।
সত্যামেব তু তীব্রায়াং ন্যসেদ্যোগী কুটীচকে ॥ ৪ ॥

বৈরাগ্য দুই প্রকার,—তীব্র এবং তীব্রতর। ইহার মধ্যে তীব্র বৈরাগ্য উদয় হইলে কুটীচক * সন্ন্যাস ধারণ করিবে।

শক্তোবহূদকে তীব্রতরায়াং হংসসংজ্ঞিতে।
মুমুক্ষুঃ পরমে হংসে সাক্ষাদ্‌বিজ্ঞান-সাধনে ॥ ৫ ॥

যিনি তীব্র বৈরাগ্যবান্ এবং যাঁহার শরীর সামর্থ্যবান্ তিনি বহূদক † সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন এবং তীব্রতর বৈরাগ্য হইলে হংস নামক সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। পরন্তু তীব্রতর বৈরাগ্যবান্ পুরুষ যদি মুমুক্ষু (মুক্তি-ইচ্ছুক) হন, তাহা হইলে অপরোক্ষ জ্ঞানের সাক্ষাৎসাধনরূপ পরমহংস আশ্রম গ্রহণ করিবেন।

পুত্রদারগৃহাদীনাং নাশে তাৎকালিকী মতিঃ।
ধিক্‌সংসার ইতীদৃকৃস্তাদ্বিরতের্মন্দতা হি সা ॥ ৬ ॥

স্ত্রী, পুত্র, গৃহ আদি নাশ হইলে সংসারের উপর যে বীতরাগ জন্মে, তাহাকে শাস্ত্রে মন্দ বৈরাগ্য বলিয়াছেন।

অস্মিন্‌জন্মনি মাভূবন্‌পুত্রদারাদয়ো মম।
ইতি যা সুস্থিরা বুদ্ধিঃ সা বৈরাগ্যস্য তীব্রতা ॥ ৭ ॥

স্ত্রী, পুত্র, আদি কোন পদার্থে আমার প্রয়োজন নাই, এই প্রকার যে সুস্থির বুদ্ধি, তাহাকে শাস্ত্রে তীব্র বৈরাগ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে।

পুনরাবৃত্তিসহিতো লোকো মে মাস্তু কশ্চন।
ইতি তীব্রতরত্বং স্যান্মন্দে ন্যাসো ন কোঽপি হি ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মলোক হইতে যত প্রকার লোক আছে, সে সমস্ত লোক পুনরাবৃত্তি-স্বভাবযুক্ত ; এই প্রকার অনিত্য লোকে আমার ইচ্ছা নাই, এবংবিধ বৈরাগ্যকে তীব্রতর বৈরাগ্য কহে। মন্দ বৈরাগ্যে কোন প্রকার সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার অধিকার নাই।

যাত্রাদ্যশক্তিশক্তিভ্যাং তীব্রে ন্যাসদ্বয়ং ভবেৎ।
কুটীচকো বহূদকশ্চেত্যুভাবেতৌ ত্রিদণ্ডিনৌ ॥ ৯ ॥

তীর্থ আদি ভ্রমণ করিবার সমর্থ এবং অসমর্থ, অথচ তীব্র-বৈরাগ্যবান্ পুরুষ, যথাক্রমে "বহূদক" ও "কুটীচক" নামক দুই প্রকার সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিবেন। এই প্রকার সন্ন্যাসীকে শাস্ত্রে ত্রিদণ্ডী কহে।

দ্বয়ং তীব্রতরে ব্রহ্মলোকমোক্ষবিভেদতঃ।
তল্লোকে তত্ত্ববিদ্‌হংসো লোকেঽস্মিন্ পরহংসকঃ ॥ ১০ ॥

---

* যে সন্ন্যাসী তীর্থপর্য্যটনে অসামর্থ্য জন্য এক তীর্থস্থানাদিতে কুটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন, প্রতিদিন বার হাজার প্রণব জপ করেন, এবং যথাসময়ে ভিক্ষাটন দ্বারা শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাকে কুটীচক সন্ন্যাসী কহে।—অনুবাদক।

† তীর্থপর্য্যটন করিবার সামর্থ্যবান্ সন্ন্যাসীকে বহূদক সন্ন্যাসী কহে।

তীব্রতর বৈরাগ্যবান্ যোগী যদি ব্রহ্মলোক লাভের ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি "হংস" নামক সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন; তাঁহার ব্রহ্মলোকে আত্মসাক্ষাৎকার হইয়া ব্রহ্মার সহিত মুক্তি হইবে। আর কেবলমাত্র যদি মোক্ষের ইচ্ছাযুক্ত হয়েন, তাহা হইলে 'পরহংস' আশ্রম গ্রহণ করিবেন; তাঁহার বর্ত্তমান শরীরেই আত্মসাক্ষাৎকার হইবে।

এতেষাং তু সমাচারাঃ প্রোক্তাঃ পারাশরস্মৃতৌ।
ব্যাখ্যানেঽস্মাভিরত্রায়ং পরহংসো বিবিচ্যতে॥ ১১॥

এই সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সন্ন্যাস আশ্রমের সদাচরণের নির্ণয় আমি (গ্রন্থকার) পরাশর স্মৃতিতে এবং তাহার ব্যাখ্যানে করিয়াছি; এই গ্রন্থে কেবল মাত্র পরমহংসের আচার নিরূপন করিতেছি।

জিজ্ঞাসুর্জ্ঞানবাংশ্চেতি পরহংসো দ্বিধা মতঃ।
প্রাহর্জ্ঞানায় জিজ্ঞাসোর্ন্যাসং বাজসনেয়িনঃ॥১২॥

প্রব্রাজিনো লোকমেত মিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি হি।
এতস্যার্থন্তু গদ্যেন বক্ষ্যাতে মন্দবুদ্ধয়ে॥ ১৩॥

জিজ্ঞাসু এবং তত্ত্বজ্ঞানী দুইপ্রকার পরহংস শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে; জিজ্ঞাসু (তত্ত্বজ্ঞানে তীব্র ইচ্ছাবান্) জ্ঞান প্রাপ্তি জন্য সন্ন্যাস আশ্রম ধারণ করিবেন,—বাজসনেয় শাখায় (শুক্ল যজুর্ব্বেদে) এইরূপ উপদেশ আছে; যথা—

"এতমেব প্রব্রজিনো লোক মিচ্ছন্ত প্রব্রজন্তি"—বৃহদারণ্যক।

উক্ত শ্রুতির অর্থ মন্দবুদ্ধি পুরুষের প্রতি অনুগ্রহ কারণ আমি গদ্যে বলিতেছি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ স্বামী।

মৃত্যুর পরপারে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

স্বর্গলোক।

আমরা ইতিপূর্ব্বে যে আনন্দধামের ইঙ্গিত করিয়াছি, স্বর্গই সেই পরমসুখের স্থান। বাস্তবিক, স্বর্গের অস্তিত্ব ও সুখময়ত্ব সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই। কি হিন্দু, কি খৃষ্টান, কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ,—সকলেই একবাক্যে ইহা স্বীকার করেন। অমরাবতী, সুখাবতী, ইলিজিয়ম্ প্রভৃতি শব্দ দ্বারাই বুঝা যায় প্রত্যেক জাতি স্বর্গকে কিরূপ সুখের স্থান মনে করেন। খৃষ্টান ও মুসলমানগণ বলেন, যাঁহাদের প্রতি ঈশ্বর প্রীত হন, তাঁহাদিগকে তিনি স্বর্গে পাঠাইয়া পুরস্কৃত করেন। অন্যান্য ধর্ম্ম কিন্তু ঠিক ঐরূপ বলেন না। তাঁহাদের মতে মানুষ নিজেই নিজের কর্ম্মফল ভোগ করে; সুতরাং স্বর্গভোগ ঐহিক পুণ্যকর্ম্মেরই স্বাভাবিক ফল মাত্র। আমরা (পরাবিদ্যা সমিতিতে) এই শেষোক্ত মতেরই পক্ষপাতী।

সকল ধর্ম্মই স্বর্গকে পরম সুখের স্থান বলিয়াছেন বটে, কিন্তু কেহই ঐ সুখের স্বরূপটি নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। নানাবিধ দৃষ্টান্ত, অলঙ্কার ও রূপকাদি দ্বারা তাঁহারা ইহা ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু সে প্রয়াস প্রায়ই ব্যর্থ হইয়াছে। হইবারই কথা। কারণ, যাহা মানুষী ভাষায় ব্যক্ত হইতে পারেনা, স্থূলমস্তিষ্কে যাহার ধারণা করা অসম্ভব, তাহাকেই বর্ণনা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহার অনিবার্য্য ফল এই যে, স্বর্গের বর্ণনায় পৃথিবীর ছবি প্রবেশ করিয়াছে। পৃথিবীতে যে জাতির নিকট যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, সেই জাতি তাহাই স্বর্গে আরোপ করিয়াছেন। কোনও হিন্দু-শাস্ত্রলেখক হয়ত ভারতীয় কোন রাজার বিচিত্রবৃক্ষ-শোভিত, মণিমুক্তাদিভূষিত, রাজহংস-সেবিত-স্বচ্ছ-তড়াগযুক্ত, বিহঙ্গম কূজিত, কুসুম-সুরভিত সুবৃহৎ উদ্যান দর্শন করিয়া মোহিত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার স্বর্গবর্ণনায় নন্দন-কানন, পারিজাত বৃক্ষ, পবিত্র-সলিলা মন্দাকিনী, অপ্সরা-সঙ্গীতাদ স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। বাইবেল লেখকের হয়ত পূর্ব্বপ্রকার সৌন্দর্য্য দেখিবার সুবিধা বা সুযোগ হয় নাই। তিনি হয়ত আলেক্-জান্দ্রিয়ার ন্যায় কোন একটি সুবৃহৎ ও সমৃদ্ধিপূর্ণ নগরের শোভায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কাজেই, তাঁহার স্বর্গ একটি উদ্যান বা কানন নহে, ধনরত্নশোভিত পরম-সমৃদ্ধিশালী একটি সুবৃহৎ নগর। ফল কথা এই যে. শাস্ত্রোক্ত এই সকল স্বর্গবর্ণনা পাঠ করিবার সময় আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে. বর্ণনাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য, ইহা লেখকদিগের উদ্দেশ্য নহে। পৃথিবীতে যত সুন্দরতম বস্তু আছে, স্বর্গের সৌন্দর্য্য তদপেক্ষাও অনেক অধিক, ইহা ব্যক্ত করাই লেখকগণের অভিপ্রায়।

আধুনিক যুগে আমাদের পরাবিদ্যা-সমিতির কেহ কেহ দিব্যদৃষ্টিদ্বারা স্বর্গ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ঋষিদিগের তুলনায় তাঁহাদের এই শক্তি যে অতীব সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর, ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। সে যাহাহউক, তাঁহাদের এই দর্শন ও অনুসন্ধানের ফল পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে *। স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক, রত্নাদি এখন আর আমাদের নিকট সৌন্দর্য্যের আদর্শ নহে; গিরি-নদী-প্রস্রবণ, অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যরঞ্জিত বিচিত্র আকাশ, বিশাল প্রশান্ত বারিধি প্রভৃতিই এখন আমাদের নিকট অধিকতর মনোরম ও স্বর্গীয়। সুতরাং তাঁহাদের বর্ণনাও তদনুরূপ হইয়াছে। তাঁহারা যে প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ অপেক্ষা বর্ণনা-ব্যাপারে সমধিক কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা মনে করি না। ইঁহাদের চেষ্টা তাঁহাদের ন্যায়ই বিফল ও ব্যর্থ হইয়াছে, ইহা দিব্যদর্শী মাত্রেই অনুভব করিবেন। তবে আধুনিক রুচি কতকটা যুক্তির দিকে, বিজ্ঞানের দিকে। সেইজন্য, আমরা আমাদের বর্ণনা যথাসম্ভব যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মত করিতে চেষ্টা করিতেছি।

স্বর্গ যে একটা প্রকৃত, বাস্তব পদার্থ, ইহা একটি স্বপ্ন বা কল্পনা নহে, ইহা সর্ব্বাগে বুঝিতে হইবে। ইহার ধারণা করিতে হইলে দু'একটি বিষয় আগে আমাদিগের বুঝা আবশ্যক। প্রথম এই,—কি ভূলোক, কি ভুবর্লোক, কি স্বর্লোক,—কোনটিই প্রকৃতপক্ষে এক একটি স্থান বা দেশ নহে, চৈতন্যের বিশেষ বিশেষ অবস্থা মাত্র। মানবের বিভিন্ন দেহ আছে, (যথা স্থূলদেহ বা physical body, কামদেহ বা astral body, মানস-দেহ বা Mental body ইত্যাদি) পূর্ব্বেই বলিয়াছি। স্থূলদেহের সাহায্যে যখন আমাদের জ্ঞান বা অনুভূতি হয়, তখন আমরা চতুঃপার্শ্বে যাহা দেখি, তাহাকেই বলি ভূলোক, অর্থাৎ তখন আমরা ভূলোকে থাকি। কিন্তু মনে করুন, আমি স্থূলদেহের সাহায্য না লইয়া, চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বাদির দ্বারা বাহিরের কোন স্পন্দন গ্রহণ না করিয়া, কেবল কামদেহের স্পন্দনই গ্রহণ করিতে থাকি। ইহার ফল কি হইবে? ফল এই হইবে যে, তখন আর আমার ভূলোকের জ্ঞান বা অনুভূতি থাকিবে না, আর একটি নূতন জগতের জ্ঞান ও অনুভূতি হইবে। অর্থাৎ আমি তখন ভূলোকে বাস না করিয়া, ভুবর্লোকে বাস করিব। সেইরূপে, আমি যদি কাম-দেহের ইন্দ্রিয়গুলিকে রুদ্ধ করতঃ, ভুবর্লোকের কোন স্পন্দন গ্রহণ না করিয়া, কেবল মানস-দেহের স্পন্দন-গুলি গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমার তখন আর এক প্রকার জ্ঞান বা অনুভূতি হইবে, অর্থাৎ (চলিত কথায়) আমি স্বর্গে বাস করিব। অতএব দেখা গেল, আমি একই স্থানে বসিয়া বিভিন্ন লোকে বাস করিতেছি, ভূলোক হইতে ভুবর্লোকে বা স্বর্লোকে যাইতে, আমাকে স্থান পরিবর্ত্তন (locomotion) করিতে হইতেছে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভুবঃ, স্বঃ প্রভৃতি উচ্চতর লোকগুলি পৃথিবীর মধ্যেই ওতপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান আছে; সুতরাং সর্ব্বলোকই

* C W. Leadbeater প্রণীত The devachanic Plane, The other side of death প্রভৃতি পুস্তক দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। কেবল আমাদের চৈতন্যকে সেই ভূমিতে তুলিতে পারিলেই, সেই লোকের জ্ঞান হয়। কিন্তু যতকাল স্থূলদেহ থাকে, ততদিন সাধারণ মানব চৈতন্যকে উচ্চতর ভূমিতে তুলিতে পারেন না ; সুতরাং মৃত্যুর পরে তাঁহারা স্বর্গের আস্বাদ পান, স্থূলদেহে পান না।

আমাদের চতুর্দ্দিকে সর্ব্বদা সর্ব্বলোকই বর্ত্তমান থাকিলেও আমরা কেবল ভূলোকটিই দেখিতে পাই কেন? অন্যান্য লোক দেখিতে পাই না কেন? প্রথমে দেখা যাক, আমাদের বাহ্যবস্তুর জ্ঞান কিরূপে হয়। আধুনিক বিজ্ঞানই বলিতেছেন যে বাহ্যবস্তু বলিয়া কিছু একটা আছে কি না, তাহা ঠিক বলা যায় না ; তবে অসংখ্য ও নানাবিধ স্পন্দন যে আমাদের চতুর্দ্দিকে নিয়ত বর্ত্তমান রহিয়াছে, এটা নিঃসংশয়ে বলা যায়। কতকগুলি ইথার-স্পন্দন আসিয়া আমার চক্ষুর পরদাকে কাঁপাইল, ঐ স্পন্দন অক্ষি স্নায়ুদ্বারা মস্তিকে নীত হইল, মস্তিষ্ক কাঁপিল তাহার ফলে আমার একটি বাহ্যবস্তুর জ্ঞান হইল,—একটি লাল ফুল, কাল জামা বা সাদা বিড়ালের অনুভূতি হইল। সেইরূপে বায়ুর স্পন্দন কর্ণ-পটহকে কাঁপাইয়া মস্তিষ্কে উপস্থিত হইলে আমরা কিছু শুনিতে পাই, একটা শব্দজ্ঞান হয়। নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের পক্ষেও এই নিয়ম। অতএব, আমাদের চারিদিকে অসংখ্য স্পন্দন রহিয়াছে এটা ঠিক ; কিন্তু কেবল স্পন্দন থাকিলেই কি জ্ঞান বা অনুভূতি হয়? এই বটবৃক্ষের নিকট একটি সুন্দর গান করিলাম। বৃক্ষ কি শুনিতে পাইল? একটি নৃশংস নরঘাতকের সম্মুখে আপনি বহুক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া এক শিশুকে বাঁচাইলেন। নরঘাতক কি আপনার হৃদয়ের ভাব উপলব্ধি করিতে পারিল? অতএব, দেখা যাইতেছে, কেবল স্পন্দনই যথেষ্ট নহে, স্পন্দন গ্রহণ করিবার যন্ত্র বা ইন্দ্রিয় থাকা চাই এবং প্রতি স্পন্দন দিবার শক্তি (power of responding to vibrations) থাকা চাই। বৃক্ষের যন্ত্র বা ইন্দ্রিয় নাই, নৃশংসের হৃদয় নাই ; তাই, স্পন্দন সত্ত্বেও তাহাদের অনুভূতি হইল না।

ভূলোকের অসংখ্য স্পন্দন যেমন আমাদের চতুর্দ্দিকে রহিযাছে, ভুবর্লোক ও স্বর্লোকেরও কোটি কোটি স্পন্দন ঠিক সেইরূপে নিয়তই চারিদিকে রহিয়াছে। কিন্তু তত্তৎ লোকের অনুভূতি হইতেছে না কেন? ইহার কারণ এই যে, আমাদের কাম-দেহে ও মানস-দেহে স্পন্দন গ্রহণোপযোগী যন্ত্র বা ইন্দ্রিয় এখনও নির্ম্মিত হয় নাই। যাঁহাদের এই সূক্ষ্মেন্দ্রিয়গুলি সুগঠিত ও কার্য্যক্ষম হইয়াছে, তাঁহাদিগকে দিব্যদর্শী বা clairvoyant বলে। তাঁহারা যুগপৎ ভূলোক, ভুবর্লোক, এবং এমন কি স্বর্লোকেরও স্পন্দন গ্রহণ করিতে সমর্থ ; অর্থাৎ তাঁহারা স্থূলদেহে থাকিয়াও তিনলোকই দেখিতে পান। অনেক ঋষি (নারদাদি) আছেন, যাঁহারা যুগপৎ সাত লোকই দেখিতে পান।

মানবের দেহ এরূপ উপাদানে (matter এ গঠিত যে, সকল প্রকার স্পন্দন গ্রহণ করিবার শক্তিই (potentiality) উহাতে আছে। কিন্তু এই উপাদানগুলি এখনও

সব সুগঠিত ও কর্ম্মক্ষম হয় নাই ; সেই জন্য আমরা বাহিরের কতকগুলি স্পন্দনমাত্র গ্রহণ করিতে পারি। উপাদানগুলিকে সুগঠিত করিয়া লইবার ক্ষমতা আমাদের আছে ; প্রত্যুত সর্ব্বদাই উহা আমরা করিতেছি। নানারূপ বাসনা, চিন্তা ও ভাবনা দ্বারা আমরা অনুক্ষণ দেহ-যন্ত্রকে গঠিত করিতেছি। এই দেহ যেন একটা বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। ইহাতে সরু মোটা অসংখ্য তার সংলগ্ন আছে। সব তারগুলি এখন উত্তমরূপে বাঁধা নাই, কর্ম্মক্ষম নাই। এক একটি চিন্তা বা ভাব দীর্ঘকাল মনে পোষণ করিয়া আমরা এক একটি তার কর্ম্মক্ষম করিতেছি। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসাদি নীচ বাসনা গুলিকে মনে ক্রমাগত স্থান দিয়াছেন, তাঁহার মোটা তার গুলি বেশ সুগঠিত ও কর্ম্মক্ষম হইয়াছে। যিনি দয়া, ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য, ক্ষমা, উদারতা, পরোপচিকীর্ষা, যুক্তি, বিচার এবং সৌন্দর্য্য গ্রহণী বৃত্তির (aesthetic faculty র) বহুল অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহার সূক্ষ্ম তারগুলি কার্য্যক্ষম হইয়াছে এবং চর্চ্চার অভাবে মোটা তারগুলি হয়ত অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। এখন বাহিরের অসংখ্য স্পন্দন উভয় ব্যক্তির উপর পতিত হইলে, প্রথমোক্ত ব্যক্তির কেবল মোটা তারগুলি এবং শেষোক্ত ব্যক্তির সরু তারগুলি কম্পিত হইবে। বাদ্যযন্ত্রে যতই তার বাড়িবে, ততই আমরা স্পন্দন গ্রহণ করিতে পারিব। যাঁহার বাদ্যযন্ত্রের সকল তারই কর্ম্মক্ষম হইয়াছে, তিনিই সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বজ্ঞ।

এই বিশ্ব ঈশ্বরের অসংখ্য স্পন্দনে পরিপূরিত রহিয়াছে। যে ব্যক্তি যত অধিক স্পন্দনে সাড়া দিতে (respond করিতে) সমর্থ, তাঁহার চৈতন্য (consciousness) ততই অধিক। একটি ছাগল বা পক্ষী কেবল আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনের স্পন্দনে সাড়া দিতে পারে। তাই, তাহার জ্ঞানও এই চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ। মানব যুক্তি, বিচার, সৌন্দর্য্য ও প্রেমাদির স্পন্দনে সাড়া দিতে সমর্থ, তাই তাঁহার জ্ঞানও সেই পরিমাণে অধিক। একটি সুন্দর বিচিত্র পুষ্প, একটি গরুর ও একটি শিক্ষিত মানুষের সম্মুখে পর্য্যায়ক্রমে ধরুন, প্রভেদ বুঝিতে পারিবেন। গরু কেবল উহার একবার ঘ্রাণ লইবে, দেখিবে উহা খাদ্য কিনা ; যদি খাদ্য হয়, জিহ্বাদ্বারা জড়াইয়া উদরস্থ করিবে ; যদি খাদ্য না হয়, ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে ; কারণ, সে কেবল আহারের স্পন্দন গ্রহণ করিতে পারে। সুতরাং ঐ পুষ্প হইতে যে আরও অসংখ্য স্পন্দন নির্গত হইতেছে, তাহা গ্রহণ করিবার শক্তি তাহার নাই। কিন্তু মানব কি করিবে? সে উহার বিচিত্র শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইবে, উহার সুগন্ধে আমোদিত হইবে, উহার কোমলতা ও রচনা নৈপুণ্য দেখিয়া কারিকরকে ধন্যবাদ দিবে ; উহা কোন্ জাতীয় উদ্ভিদের অন্তর্গত, দ্বি-দল কি বহু-দল, উহা পুংপুষ্প কি স্ত্রী-পুষ্প ইত্যাদি বিচার করিয়া আনন্দ পাইবে। অতএব, দেখা যাইতেছে যে, যতই অধিক স্পন্দনে আমরা সাড়া দিতে পারি, ততই আমাদের চৈতন্যের বিস্তার হয়, ততই আমাদের আনন্দ বৃদ্ধি হয়।

এই চৈতন্য ও আনন্দ লইয়াই আমাদের জীবন। যাঁহার যত অধিক চৈতন্য ও আনন্দ

আছে, তিনি ততই অধিক জীবিত ; এবং যাঁহার যত কম আছে, তিনি ততই মৃত। এই হিসাবে প্রস্তরাদি অপেক্ষা উদ্ভিদ্, উদ্ভিদ্ অপেক্ষা পশুপক্ষী এবং পশুপক্ষী অপেক্ষা মানব অধিক জীবিত। কিন্তু সকল মানবে চৈতন্য ও আনন্দ, বহিঃস্পন্দনে সাড়া দিবার শক্তি (power of responding to vibrations) সমান কি ? কখনই না। এমন কি একই মানুষে ভিন্ন সময়ে ভিন্ন শক্তি দেখা যায়। যখন শরীর নীরোগ ও সুস্থ থাকে, লঘু ও পাতলা থাকে, তখন চৈতন্য ও আনন্দ যতটা প্রকাশ পায়, অসুস্থ শরীরে বা গুরুপাক দ্রব্য আহারের পর ততটা প্রকাশ পায় না। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বেন্‌জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন্ তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে, যৎকালে তিনি মাছ, মাংস প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য আহার করিতেন, তৎকালে তাঁহার বুদ্ধি, মেধা প্রভৃতি জড়ভাবাপন্ন (dull) এবং চিত্ত অপ্রফুল্ল (cheerless) থাকিত। কিন্তু যখন তিনি খুব সাদাসিদে শাক-সবজি খাইতে আরম্ভ করিলেন, তখন হইতে তিনি যেন একটা আরাম ও স্বচ্ছন্দতা বোধ করিতে লাগিলেন, তাঁহার ধীশক্তি যেন বাড়িতে লাগিল। সকলেই জানেন, প্রাতঃকালে আমাদের সাড়া দিবার শক্তি কত বেশী থাকে ; কিন্তু গুরুভোজনের পর কেমন একটা আলস্য ও জড়তা আইসে, উচ্চভাব ও উচ্চ চিন্তা যেন তখন সহজে উদিত হয় না। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, স্থূল পদার্থই চৈতন্য ও আনন্দকে ঢাকিয়া রাখে, প্রকাশ পাইতে দেয়না ; এবং দেহে সূক্ষ্মাংশ যতই বাড়ে, চৈতন্য ও আনন্দ ততই প্রকাশ পায়, সুতরাং ততই আমরা জীবিত হই। বেশ। এখন, মৃত্যুর পর যখন আমরা স্থূল দেহটা একবারে ত্যাগ করি ও কাম দেহ লইয়া ভুবর্লোকে যাই, তখন চৈতন্য ও আনন্দের কিরূপ বিকাশ হওয়া সম্ভব, পাঠক একবার ভাবিয়া দেখুন। তখন প্রকৃতই আমাদের মনে হয় যে, এতদিন যেন আমরা মরিয়াছিলাম, এখন জীবিত হইলাম। চৈতন্য ও আনন্দ লইয়াই জীবন, স্থূল দেহ লইয়া জীবন নহে। সুতরাং যাঁহারা ভাবেন যে, স্থূলদেহের সহিত জীবনেরও নাশ হয়, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। সে যাহা হউক, ভুবর্লোকে গিয়াই যখন আমরা এত আরাম, এত স্বচ্ছন্দতা, এত আনন্দ বোধ করি, স্বর্গে গিয়া যে কিরূপ আনন্দ, কিরূপ নব জীবন লাভ করা যায়, তাহা কি কল্পনায় আইসে ? অতএব, দেখা গেল যে, ভূলোক অপেক্ষা ভুবর্লোকে এবং ভুবর্লোক অপেক্ষা স্বর্লোকে আমরা অধিকতর জীবিত।

ভুবর্লোকের ও স্বর্গলোকের আনন্দের মধ্যে একটা বিশেষ প্রভেদ আছে। তাহা এই যে, ভুবর্লোকের যাবতীয় আনন্দই কামগন্ধযুক্ত, স্বার্থবিজড়িত ; কিন্তু স্বর্গের আনন্দে কামগন্ধ আদৌ নাই, স্বার্থের লেশমাত্র নাই ; উহা পবিত্র-সলিলা জাহ্নবীর ন্যায় বিশুদ্ধ, জীবের শোকতাপ-নিবারণে কলকল নিনাদে প্রবাহিত। আমরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য যাহা কিছু চিন্তা করি, পাঠ করি বা দান করি, তাহাতে যে আনন্দ হয়, তাহা ভুবর্লোকের। আর সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে, কেবল পরোপকারের জন্য যাহা কিছু করি, তজ্জনিত যে আনন্দ, তাহাই স্বর্গের। মনে করুন, এক ব্যক্তি দেশের পুরাতত্ত্ব বা প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহকার্য্যে

আজীবন ব্যাপৃত আছেন। একখানি উত্তম পুস্তক লিখিয়া অর্থোপার্জ্জন বা খ্যাতিলাভ করিব, ইহাই যদি তাঁহার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার অনুসন্ধান-কার্য্য ও তজ্জনিত আনন্দ ভুবর্লোক পর্য্যন্ত পঁহুছিবে, তদূর্দ্ধে উঠিবে না। কিন্তু এতদ্দ্বারা স্বদেশবাসীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধন করিব, এই পবিত্র উদ্দেশ্য লইয়াই যদি তিনি বরাবর কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহা হইলে স্বর্গলোকে তাঁহার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে ও তজ্জনিত বিমল আনন্দ ভোগ হইবে। তিনি স্বর্গে গিয়া তাঁহার অনুসন্ধেয় বিষয়ের রাশি রাশি অমূল্য উপাদান প্রাপ্ত হইবেন, সহস্র সহস্র স্বদেশ-বাসীকে সমীপে দেখিতে পাইবেন এবং তাঁহার আবিষ্কৃত সত্য ঘোষণা করিয়া তাঁহাদের উন্নতি সাধন পূর্ব্বক অপার আনন্দে ভাসিতে থাকিবেন।

শরীরটা বাদ্যযন্ত্র স্বরূপ, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। স্বার্থচিন্তা ও স্বার্থচেষ্টা দ্বারা ইহাতে মোটা তারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং নিঃস্বার্থচিন্তা দ্বারা সরু তারের সংখ্যা বাড়ে আমরা নিজের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য পৃথিবীতে যাহা কিছু করিতেছি, - ব্যায়াম, দেশভ্রমণ, পুস্তকপাঠ, সাধুসঙ্গ, জপ, তপ, ব্রত, পূজা, দান, ধ্যান,—এ সকলের দ্বারা কেবল মোটা তারেরই সংখ্যা বাড়িতেছে। এই মোটা তার গুলি কেবল ভুবর্লোকের স্পন্দন গ্রহণ করিতে সমর্থ, ভুবর্লোক পর্য্যন্ত যাইবে, তদূর্দ্ধে যাইতে পারিবে না। কিন্তু প্রত্যেক নিঃস্বার্থ চিন্তা ও নিঃস্বার্থ চেষ্টা দ্বারা আমরা এক একটি সরু তার দেহ-বীণায় যোজনা করিতেছি। এই গুলিই আমাদের স্বর্গের সম্বল; এই গুলিই স্বর্গের সূক্ষ্ম স্পন্দন গ্রহণ করিবে এবং হৃদয়ে প্রাণ-মাতানো সঙ্গীতের ঝঙ্কার তুলিবে। আমাদের অধিকাংশ চিন্তাই স্বার্থবিজড়িত; খাঁটি নিঃস্বার্থভাবে আমরা কয়টি কার্য্য করি? এইজন্যই সাধারণ মানবের মোটা তারই বেশী,সরু তার কম। মৃত্যুর পর তিনি সরু মোটা দুই রকম তার লইয়াই ভুবর্লোকে যান। এখানে মোটা তারগুলিই বাজিতে থাকে, সরু তারগুলি নীরব, নিঃস্পন্দ থাকে। এইরূপে বাজিয়া বাজিয়া মোটা তার-গুলির বাদ্য যখন শেষ হয়, তখন তাহারা দেহযন্ত্র হইতে একবারে বিচ্যুত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, খসিয়া পড়ে; তখন সরু তার ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। এই কেবল সরু তারগুলি লইয়া মানব স্বর্গে গমন করেন। যিনি যত অধিক সরু তার লইয়া যান, তাঁহার বাদ্য তত অধিক কাল হয়। যিনি মোটেই সরু তার আনেন নাই, তাঁহার যন্ত্র আদৌ বাজে না, তিনি স্বর্গভোগ হইতে বঞ্চিত হন।

এই উপমা হইতে আমরা অনেকগুলি রহস্য বুঝিতে পারিলাম। প্রথম, অপ্‌তত্ত্বই মোটা তার এবং তেজস্তত্ত্বই সরু তার। অপ্‌তত্ত্বের এক একটি স্পন্দনই এক একটি সকাম চিন্তা, স্বার্থপর ভাব; এবং তেজস্তত্ত্বের এক একটি স্পন্দন এক একটি নিষ্কাম ভাব, নিঃস্বার্থ চিন্তা। দ্বিতীয়, মানব স্বর্গে কেবল সরু তারগুলিই লইয়া যান, অর্থাৎ সকাম ভাব ও স্বার্থপর চিন্তা স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারে না। মানব ভুবর্লোকে তাঁহার

সমস্ত নীচ বাসনা ও স্বার্থচিন্তা একবারে বিসর্জ্জন দিয়া খাঁটি পরার্থ-পরতার ভাবটুকু লইয়াই স্বর্গে আসেন। তৃতীয়, যিনি যত অধিক নিঃস্বার্থ চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহার তত অধিক কাল স্বর্গভোগ হয়। যিনি জীবনে একটিও নিঃস্বার্থ চিন্তা করেন নাই, তিনি স্বর্গ সুখে বঞ্চিত হন। চতুর্থ, সকলের স্বর্গসুখ এক প্রকার নহে। যিনি যে রকম তার আনেন, তিনি সেই রকম স্পন্দন গ্রহণ করেন। যিনি পৃথিবীতে নিঃস্বার্থভাবে বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়াছিলেন, তিনি স্বর্গে বিজ্ঞানেরই নূতন সত্য ও নূতন আলোক আবিষ্কার করিয়া বিমল আনন্দ পান। যিনি নিষ্কামভাবে সঙ্গীতের চর্চ্চা করিয়াছিলেন, তিনি স্বর্গে অভাবনীয় মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি অনুক্ষণ শ্রবণ করেন এবং সেই আনন্দে বিভোর হইয়া থাকেন। যিনি নিঃস্বার্থভাবে কোন ব্যক্তিকে ভালবাসিয়াছিলেন এবং তাঁহার মঙ্গলচিন্তা করিয়াছিলেন, তিনি সেই প্রিয়তমকে সর্ব্বদা নিকটে দেখিতে পান এবং প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়া ও সেবা করিয়া ধন্য হন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পৃথিবীতে যিনি যে বিষয়ে নিষ্কাম আনন্দ পাইয়াছেন, স্বর্গে তিনি সেই বিষয়েই সহস্র সহস্র গুণ অধিক আনন্দ প্রাপ্ত হন। যিনি যেরূপ তার আনিয়াছেন, তিনি সেইরূপই স্পন্দন গ্রহণ করেন। যিনি সাহিত্যের তার আনিবেন, তিনি সাহিত্যেই আনন্দ পাইবেন, বিজ্ঞান-শিল্পাদিতে নহে। যিনি স্বদেশপ্রীতির তার আনিবেন, তিনি স্বদেশের সেবা করিয়াই আনন্দ পাইবেন, অন্য কিছুতে নহে। কিন্তু যিনি অনেক গুলি তার আনেন, তাঁহার কি হয়? যিনি বিজ্ঞান, সঙ্গীত, ভগবদ্ভক্তি, স্বদেশপ্রীতি প্রভৃতি বহু তার সঙ্গে আনিয়াছেন, তাঁহার সমস্ত তার গুলি যুগপৎ বাজেনা, এক একটি করিয়া বাজে। প্রথমে (মনেকরুন) বিজ্ঞানের তারটি বাজিতে সুরু হইল। যখন এটি থামিবে অর্থাৎ বিজ্ঞান চর্চ্চা-জনিত অতুল আনন্দভোগ যখন শেষ হইবে, তখন আর একটি (সঙ্গীত বা স্বদেশপ্রেম) তার বাজিতে আরম্ভ করিবে এইরূপে, একটির পর একটি করিয়া সবগুলি বাজিবে। তিনি যতগুলি নিঃস্বার্থ চিন্তা করিয়াছিলেন, সবগুলির জন্য আনন্দ পাইবেন, তাঁহার পুণ্য কড়ায় গণ্ডায় পুরস্কৃত হইবে।

এখন, পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—"সাধারণ মানবের নিষ্কাম চিন্তা অপেক্ষা সকাম চিন্তাই যখন অধিক, তখন তাঁহার ভুবর্লোকেই তো দীর্ঘকাল বাস করিবার কথা। কিন্তু তাহা না হইয়া স্বর্গলোকেই তাঁহাকে অনেক অধিক কাল থাকিতে হয়। ইহার কারণ কি?" পৃথিবীতে বাস কালে আমরা যে সকাম চিন্তাগুলি যথা, ধনলোভ, যশোলিপ্সা ইত্যাদি, মনে উদ্রিক্ত করি, তদ্দ্বারা আমরা কামদেহকে (অপ্‌তত্ত্বকে) স্পন্দিত বা সঞ্চালিত করি। কিন্তু প্রত্যেক নিষ্কাম চিন্তা যথা, নিঃস্বার্থভক্তি, দয়াদি, দ্বারা, মানস-দেহ বা তেজস্তত্ত্বকে সঞ্চালিত করিয়া দিই। এখন, প্রকৃতির নিয়ম এই যে, পদার্থ যতই সূক্ষ্ম হয়, তাহার স্পন্দন ততই দীর্ঘকাল চলিতে থাকে। সুতরাং অপ্‌তত্ত্বের স্পন্দন শীঘ্র থামিয়া যায়, তেজস্তত্ত্বের স্পন্দন বহুকাল চলিতে থাকে। এই জন্যই স্বর্গকাল

সাধারণতঃ দীর্ঘ হয়। যে শক্তি অপ্‌তত্ত্বে প্রয়োগ করিয়াছি, তাহার শতাংশ, সহস্রাংশ শক্তি তেজস্তত্ত্বে প্রযুক্ত করিয়াই এই ফল! না জানি সমগ্র শক্তিটা প্রয়োগ করিলে স্বর্গকাল আরও কত দীর্ঘ হইত!! পবিত্র নিঃস্বার্থচিন্তার কি মহীয়সী শক্তি! এক মুহূর্ত্তের নিঃস্বার্থ ভালবাসায় হয়ত শত বৎসর স্বর্গভোগ হইতে পারে।

পৃথিবীতে এক মুহূর্ত্তও নিঃস্বার্থচিন্তা করেন নাই, এরূপ লোক অতিশয় বিরল, বোধ হয় নাই বলিলেই হয়। যিনি নিতান্ত স্বার্থপর, তিনিও জীবনে কখন না কখনও, কাহাকে না কাহাকেও, অন্ততঃ একবারও নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসিয়াছেন। যাঁহার সন্তানাদি নাই, তিনি হয়ত গরু বাছুর, কুকুর বিড়াল বা মৃগ পক্ষীকেও অন্ততঃ ভালবাসিয়াছেন। সুতরাং প্রায় সকল মানবেরই কিছু না কিছু কাল স্বর্গভোগ হইয়াই থাকে। তবে ভোগের তারতম্য ও পার্থক্য আছে। ইহার কিঞ্চিৎ আভাস আমরা দিয়াছি। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আরও একটু বলিব।

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী।

আমিত্বের লয়।

কবে,—তোমাতে মিশে যা'বে হে প্রেম-সিন্ধু!
জীবন-নদ হ'য়ে আপন হারা গো :—
তাহ'লে নিজধারা মুছিবে ধরা হ'তে,
আবার বহিবে না এমন ধারা গো।

মিশিতে ও সাগরে ছুটিতে নারে আর,
চরণে শত বাধা বাধে যে অনিবার ;
শোনে না, কত দূরে তোমার আহ্বান,—
এ চির-পথহারা পাগলপারা গো।

নদের যথা হয় সাগরে শেষ গতি,
আমার কবে হ'বে তোমাতে পরিণতি ?
সহে না শত যুগ জনম জ্বালা স্মৃতি,
হ'লেম শুধু সারা সাধ রহিল গো।

নদের কিবা সুখ ছুটিতে শিলাপথে ?
কি সুখ স্মৃতি সাধ বহিয়া মনোরথে ?
কাঁদায় মোহমদ কুহকে বাঁধি পদ—
ভবেরি শিলাভূমি, ভবেরি কারা গো।

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বেদান্ত-পরিভাষা।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

[৭]

মূল। নন্বু রজতোৎপাদকানাং রজতাবয়বাদীনামভাবে শুক্তৌ তাবপি কথং রজতমুৎপদ্যতে ইতি চেৎ, উচ্যতে। নহি লোকসিদ্ধসামগ্রী প্রাতিভাসিক-রজতোৎপাদিকা কিন্তু বিলক্ষণৈব, তথাহি কাচাদিদোষদূষিতলোচনস্য পুরোবর্ত্তিদ্রব্য-সংযোগাৎ ইদমাকারা চাক্‌চক্যাকারা চ কাচিদন্তঃকরণবৃত্তিরুদেতি। তস্যাঞ্চ বৃত্তৌ ইদমবচ্ছিন্নচৈতন্যং প্রতিবিম্বতে, তত্র পূর্ব্বোক্তরীত্যা বৃত্তের্নিগমনেন ইদমবচ্ছিন্নচৈতন্যং বৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যং প্রমাতৃচৈতন্যং চ অভিন্নং ভবতি। ততশ্চ প্রমাতৃচৈতন্যাভিন্নবিষয়চৈতন্যনিষ্ঠা শুক্তিত্বপ্রকারিকা অবিদ্যা চাক্‌চক্যাদিসাদৃশ্য-সন্দর্শনসমুদ্বোধিতরজতসংস্কারসমীচীনা কাচাদিদোষসমবহিতা রজতরূপার্থাকারেণ রজতজ্ঞানাভাসকারেণ চ পরিণমতে।

ব্যাখ্যা। শুক্তিতে যখন রজত ভ্রম হয়, তখন রজতজ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে এমন রজতের অবয়ব ত থাকেনা। রজতের অবয়ব না থাকিলে শুক্তিতে রজতজ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয়? বলিতেছি। সত্য রজতজ্ঞানে লোক-প্রসিদ্ধ যে সকল দ্রব্য রজতজ্ঞান উৎপাদন করে, রজতের ভ্রমজ্ঞানোৎপাদনে সেই সকল দ্রব্য সহায়তা করে না। লোক-প্রসিদ্ধ দ্রব্য ব্যতীত পৃথক্ বিশিষ্ট সামগ্রী ভ্রমজ্ঞান উৎপাদন করে। কোনও ব্যক্তির নেত্ররোগ † দূষিত চক্ষুর সহিত সম্মুখবর্ত্তী কোনও পদার্থের সন্নিকর্ষ হইলে সেই পদার্থের ন্যায় চাক্‌চক্যময় (উজ্জলাকার) কোনও অন্তঃকরণ-বৃত্তি উৎপন্ন হয়। সেই বৃত্তিতে ঐ পদার্থবিশিষ্ট চৈতন্যটি প্রতিবিম্বিত হয়। তাহারপর পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছি, সেইরূপে (তড়াগোদকের দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য) বৃত্তি বাহির হইলে পদার্থবিশিষ্টচৈতন্য, বৃত্তিবিশিষ্টচৈতন্য ও প্রমাতৃচৈতন্য এক হইয়া যায়। তাহার পর শুক্তিস্বরূপ অবিদ্যা উৎপন্ন হয়। এই অবিদ্যা প্রমাতৃচৈতন্যের সহিত অভিন্ন বিষয়-চৈতন্যে সংশ্লিষ্ট। চাক্‌চিক্য প্রভৃতি সাদৃশ্য দেখিয়া (শুক্তিতে) রজতজ্ঞান উৎপাদিত হয়। কাচ প্রভৃতি নেত্ররোগও তাহার সহায়তা করে। এইরূপে এই অবিদ্যা রজতরূপ দ্রব্য ও রজতজ্ঞানের আভাস রূপে পরিণত হয়।

"অস্মিন্নপি তমোভূতে পাতিরূঢ়ে মহাপদে।
চন্দ্রাদিত্যৌ সনক্ষত্রাবম্বরীক্ষে চ বিদ্রুতঃ॥
নির্জ্জলানি চ তেজাংসি ভ্রাজিষ্ণূনীব পশ্যতি।
স এব তিমিরনাশস্তু নীলিকাকাচ সংজ্ঞিতঃ॥ ইতি মাধবকরঃ।

---

† কাচ এক প্রকার নেত্ররোগ।

মূল। পরিণামো নাম উপাদানসমসত্তাককার্য্যাপত্তিঃ। বিবর্ত্তো নাম উপাদানবিষমসত্তাককার্য্যাপত্তিঃ। প্রতিভাসিকরজতঞ্চ অবিদ্যাপেক্ষয়া পরিণাম ইতি চৈতন্যাপেক্ষয়া বিবর্ত্ত ইতি চ, উচ্যতে। অবিদ্যাপরিণামরূপঞ্চ তদ্রজতম্ অবিদ্যাধিষ্ঠানে ইদমবচ্ছিন্নচৈতন্যে বর্ত্ততে, অস্মন্মতে সর্ব্বস্যাপি কার্য্যস্য স্বোপাদানাবিদ্যাধিষ্ঠানাশ্রিতত্বনিয়মাৎ।

ব্যাখ্যা। উপাদানের সমান অস্তিত্ববিশিষ্ট কার্য্যের উৎপত্তির নাম পরিণাম। [যেমন দুগ্ধ উপাদান হইতে দধি উৎপন্ন হইল, এস্থলে উপাদানের যে অস্তিত্ব, কার্য্যেরও তাহাই। কার্য্য এখানে নিজের উপাদানেরই পরিণাম। দধি দুগ্ধেরই পরিণাম।] কিন্তু উপাদানের সহিত অসমান অস্তিত্ববিশিষ্ট কার্য্যের উৎপত্তির নাম বিবর্ত্ত। [যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান]। প্রাতিভাসিক বা মিথ্যা। (শুক্তিতে) রজতজ্ঞান অবিদ্যার দিক দিয়া বিবেচনা করিলে, পরিণাম ও চৈতন্যের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে বিবর্ত্ত নামে কথিত হইয়া থাকে। [মিথ্যারজতজ্ঞান মায়া হইতে উৎপন্ন হইতেছে ধরিলে, তাহা অবিদ্যার পরিণাম, কেননা মায়ার অস্তিত্ব ও মিথ্যারজতজ্ঞানের অস্তিত্ব সমান। কিন্তু চৈতন্য বা ব্রহ্ম কারণ বলিয়া ধরিলে মিথ্যা-রজত-জ্ঞান বিবর্ত্ত, কেননা চৈতন্যের অস্তিত্ব ও মিথ্যা-রজত-জ্ঞানের অস্তিত্ব এক নহে।] অবিদ্যার পরিণামরূপ সেই রজতও অবস্থায় অধিষ্ঠিত "এই" (বস্তু) বিশিষ্ট চৈতন্যে বর্ত্তমান আমাদের মতে সমস্ত কার্য্যই নিজের উপাদান যে অবিদ্যা তাহাতেই অধিষ্ঠিত হইয়া থাকে

মূল। নমু চৈতন্যনিষ্ঠরজতস্য কথমিদং রজতমিতিপুরোবর্ত্তিনা তাদাত্ম্যম্? উচ্যতে। যথা ন্যায়মতে আত্মনিষ্ঠস্য সুখাদেঃ শরীরনিষ্ঠত্বেন উপলম্ভঃ শরীরস্য সুখাদ্যধিকরণতাবচ্ছেদকত্বাৎ, তথা চৈতন্যমাত্রস্য রজতং প্রত্যনধিষ্ঠানতয়া ইদমবচ্ছিন্নচৈতন্যস্য তদধিষ্ঠানত্বেন ইদমবচ্ছেদকতয়া রজতস্য পুরোবর্ত্তিনা সংসর্গপ্রত্যয় উপপদ্যতে। তস্য চ বিষয়চৈতন্যস্য তদন্তঃকরণোপহিতচৈতন্যাভিন্নতয়া বিষয়চৈতন্যেঽধ্যস্তমপি রজতং সাক্ষিণ্যধ্যস্তং কেবলসাক্ষিবেদ্যং সুখাদিবদনন্যবেদ্যম্ ইতি চ উচ্যতে।

ব্যাখ্যা। আচ্ছা চৈতন্যনিষ্ঠ রজতের সহিত "এই রজত" এই সম্মুখবর্ত্তী রজতের অভেদ কিরূপে হইতে পারে? [চৈতন্যে বর্ত্তমান রজত ও সম্মুখে দৃশ্যমান রজত অভিন্ন হইবে কিরূপে?] [নৈয়ায়িকের এই প্রশ্নের উত্তরে] বলিতেছি। ন্যায়মতে আত্মায় নিষ্ঠ সুখ (দুঃখ) প্রভৃতি শরীর-নিষ্ঠ বলিয়া ধরা হয়; কেননা শরীর সুখ (দুঃখ) প্রভৃতির অধিকরণ (আত্মাকে) বিশিষ্ট করিয়া দেয়। [ন্যায়মতে আত্মা মন হইতে বিভিন্ন * ও

* "সাক্ষাৎকারে সুখাদীনাং করণং মন উচ্যতে।
অযৌগপদ্যাৎ জ্ঞানানাস্তস্যাণুত্বমিহোচ্যতে॥" ভাষা-পরিচ্ছেদ।

মন দ্বারাই আত্মাকে বিশেষ কতকগুলি গুণের দ্বারা অবগত হইতে পারা যায়। † এই বিশেষ গুণগুলি আত্মার হইলেও, দেহের বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। সুখ, দুঃখ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম প্রভৃতি আত্মার গুণ।] এইরূপ চৈতন্যমাত্রঃ রজতের অধিষ্ঠান নয়, "এইরূপ" বিশিষ্ট চৈতন্যই রজতের অধিষ্ঠান। কাজেই "এইরূপ" এই বৈশিষ্ট্য হেতু রজতের সম্মুখবর্ত্তী রজতের সহিত সংসর্গবুদ্ধি উৎপন্ন হয়। [ন্যায়মতে শরীর অবচ্ছেদক হওয়াতে যেরূপ আত্মায় নিষ্ঠ সুখ, দুঃখ প্রভৃতি গুণ শরীর-নিষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ "এই এই প্রকার" ইহা অবচ্ছেদক হওয়াতে চৈতন্যনিষ্ঠ রজতের সহিত সম্মুখে দৃশ্যমান রজতের সংসর্গজ্ঞান হয় এবং সেই বিষয়-চৈতন্য ও এইরূপ দ্রব্যের আকারযুক্ত অন্তঃকরণ বিশিষ্ট চৈতন্য অভিন্ন হওয়াতে বিষয়-চৈতন্যে অধ্যস্ত রজত, সাক্ষিতেও অধ্যস্ত হয় এবং তাহা সুখ, দুঃখ প্রভৃতির ন্যায় কেবল সাক্ষিকর্ত্তৃকই অবগত হইতে পারে, অন্য কাহারও দ্বারা নয়, এই কথাও বলা হইয়া থাকে। (শুক্তিতে রজতজ্ঞান যখন হইতেছে, তখন সম্মুখবর্ত্তী শুক্তিপদার্থে রজতরূপ বিষয়জ্ঞান ভ্রমাত্মক। এই বিষয়-চৈতন্য ও অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্য এক এবং উভয়েই ভ্রমাত্মক। সাক্ষিতেও এই ভ্রমজ্ঞান পড়ে।)

মূল। নন্থ সাক্ষিণ্যধ্যস্তত্বে "অহং রজতম্" ইতি "তদ্বান্" ইতি বা প্রত্যয়ঃ স্যাৎ, "অহং সুখী" ইতিবৎ, ইতি চেৎ। উচ্যতে। নহি সুখাদীনামন্তঃকরণাবচ্ছিন্নচৈতন্যনিষ্ঠাবিদ্যাকার্য্যত্বপ্রযুক্তম্ "অহং সুখী" ইতি জ্ঞানং সুখাদীনাং ঘটাদিবৎ শুদ্ধচৈতন্য এব অধ্যাসাৎ। কিন্তু যস্য যদাকারানুভবাহিতসংস্কারসহকৃতাবিদ্যাকার্য্যত্বং তস্য তদাকারানুভববিষয়ত্বম্, ইত্যেবানুগতং নিয়ামকম্।

তথাচ ইদমাকারানুভবাহিতসংস্কারসহিতাবিদ্যাকার্য্যত্বাৎ ঘটাদেরিদমাকারানুভববিষয়ত্বং অহমাকারানুভবাহিতসংস্কারসহকৃতাবিদ্যাকার্য্যত্বাৎ অন্তঃকরণাদেরহমনুভববিষয়ত্বম্। শরীরেন্দ্রিয়াদেরুভয়বিধানুভবসংস্কারসহিতাবিদ্যাকার্য্যত্বাদুভয়বিধানুভববিষয়ত্বম্। তথাচ উভয়বিধানুভবঃ ইদং শরীরম্, অহং দেহঃ, অহং মনুষ্যঃ, অহং ব্রাহ্মণঃ, ইদং চক্ষুঃ, অহং কাণঃ, ইদং শ্রোত্রম্, অহং বধির ইতি। প্রকৃতে চ প্রাতিভাসিকরজতস্য প্রমাতৃ-চৈতন্যাভিন্নেদমবচ্ছিন্নচৈতন্যনিষ্ঠাবিদ্যাকার্য্যত্বেঽপি ইদং রজতমিতি প্রত্যস্থলীয়ে ইদমাকারানুভবাহিতসংস্কারজন্যত্বাৎ ইদমাকারানুভববিষয়তা, নতু "অহং রজতম্" ইত্যহমাকারানুভববিষয়তা ইত্যনুসন্ধেয়ম্।

† "যোগ্যবিশেষগুণস্য জ্ঞানসুখাদেঃ সম্বন্ধেন আত্মনঃ প্রত্যক্ষত্বং সম্ভবতি, ন তু অন্যথা, অহংজ্ঞানে 'অহং করোমি' ইত্যাদি-প্রতীতেঃ।"

তথাচ—

"মনোভিন্নেন্দ্রিয়জন্যপ্রত্যক্ষাবিষয়ঃ মানসপ্রত্যক্ষবিষয়শ্চ ইত্যর্থঃ।
রূপাদ্যভাবেন ইন্দ্রিয়ান্তরাযোগ্যত্বাৎ।"—সিদ্ধান্তমুক্তাবলী।

ব্যাখ্যা। আচ্ছা, না হয় ধরিয়া লইলাম যে, সাক্ষিতে রজত অধ্যস্ত হয়। কিন্তু তাহা হইলে "আমি সুখী" এই জ্ঞান যেরূপে হয়, সেইরূপ "আমি রজত" বা "আমি রজতবান্" এইরূপ জ্ঞানও হউক। (তাহার নিরাকরণার্থে) বলিতেছি,—"আমি সুখী" এই জ্ঞান "সুখ দুঃখাদি অন্তঃকরণবিশিষ্ট যে চৈতন্য তাহাতে নিষ্ঠ মায়ার কার্য্য" বলিয়া যে জন্মে, তাহা নয়। কিন্তু ঘটাদির ন্যায় সুখাদিও শুদ্ধচৈতন্যে (অর্থাৎ অন্তঃকরণ দ্বারা অবিশিষ্ট চৈতন্যে) অধ্যস্ত হয়। এস্থলে নিয়ম এই—যাহার যে আকারের অনুভব দ্বারা উৎপন্ন সংস্কার সহযোগে অবিদ্যার যে কার্য্য উৎপাদিত হয়, তাহাই তাহার সেই আকারের অনুভবের বিষয়। [যেমন ঘট অনুভব করিতে হইবে। পূর্ব্বে আমি ঘট দেখিয়াছি। ঘটাকার অনুভব আমার পূর্ব্বে হইয়াছে। সেই অনুভবের সংস্কার আমার মনে রহিয়াছে। এখন যে ঘট অনুভব হইবে, তাহা ঐ সংস্কার সহযোগে অবিদ্যার কার্য্যরূপে ঘটিবে। কাজেই কোনও বস্তুর নিজাকার অনুভববিষয় অর্থে, যে আকারে ঐ বস্তু পূর্ব্বে অনুভূত হইয়াছিল ও যে আকারের সংস্কার আছে, সেই সংস্কার-সহযোগে যে অবিদ্যার পরিণাম হয়, তাহাই বুঝিতে হইবে।] তাই, "এইরূপ" আকার অনুভব হওয়াতে যে সংস্কার জন্মিয়াছিল, সেই সংস্কার-সহযোগে অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া ঘটপ্রভৃতি "এইরূপ" আকার অনুভবের বিষয়। "আমি" এই আকার অনুভব হওয়ার পর সেই সংস্কার সহযোগে যে অবিদ্যার কার্য্য, তাহা হইতে অন্তঃকরণ প্রভৃতি "আমি" এই অনুভবের বিষয় হইয়াছে। 'শরীর', 'ইন্দ্রিয়' প্রভৃতি উভয়বিধ অনুভবের সংস্কারের সহিত অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া, অনুভবের বিষয় উভয়বিধ। তাই এইরূপ উভয়বিধ অনুভব হয় "ইহা শরীর", "আমি দেহ", "আমি মনুষ্য", "আমি ব্রাহ্মণ", "এই চক্ষু", "আমি অন্ধ", "এই কর্ণ", "আমি বধির"।

প্রাতিভাসিক রজত, প্রমাতৃচৈতন্যের সহিত অভিন্ন "এইপ্রকার" বিশিষ্ট চৈতন্যনিষ্ঠ অবিদ্যার কার্য্য হইলেও, ইহা "এই রজত" এই প্রকার সত্যস্থলে 'এইরূপ' আকারের অনুভবজনিত সংস্কারজাত বলিয়া "এইরূপ" আকারের অনুভবের বিষয় হয়; কিন্তু "আমি রজত" এইপ্রকার "আমি" আকারের অনুভবের বিষয় হয় না, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

সোজা কথায় বুঝাইতেছি। নৈয়ায়িক বলিতেছেন রজত, অবিদ্যার কার্য্য, তাহা তুমি (বৈদান্তিক) মানিয়াছ। এই অবিদ্যা অন্তঃকরণবিশিষ্টচৈতন্যনিষ্ঠ। অন্তঃকরণ আবার রজতাকার ধারণ করিয়াছে। কাজেই রজতবিষয়চৈতন্য ও প্রমাতৃচৈতন্য এক। ঠিক্ এইরূপে সুখাদির জ্ঞানও হয়। এখন সুখের জ্ঞান হইবার পর 'আমি সুখী' এই জ্ঞান যেরূপে হয়, সেইরূপ রজতের জ্ঞান হইবার পর "আমি রজত" এইরূপ জ্ঞানও হউক। তাহার উত্তরে বেদান্তবাদী বলিতেছেন, না, তাহা হইবে না। যে আকারের অনুভব হয়, তাহার সংস্কার থাকে। অবিদ্যা সেই সংস্কারসহিত বিভিন্ন পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। "আমি" এই আকারের অনুভবের সংস্কার সহিত অবিদ্যার পরিণাম "আমি" অনুভব হইতে পারে। বস্তুসকলের বিভিন্ন আকারের অনুভবের সংস্কার থাকিলে

অবিদ্যার পরিণাম "এই এই প্রকার" রূপ অনুভব হইতে পারে। শরীর ও ইন্দ্রিয় একত্র উভয়বিধ অনুভবের বিষয় হইতে পারে। কিন্তু "আমি" ও "রজত" ইহা একত্র অনুভবের বিষয় হইতে পারে না। কেননা, যখন সুখ অনুভব হইয়াছে, তখন আমি সুখ অনুভব করিতেছি, এইরূপ সংস্কার ছিল, তাহাতে "আমি সুখী" এই অনুভব হইয়াছিল। কিন্তু যে যে সময় রজত অনুভব হইয়াছে, তখন "ইহা রজত" এইপ্রকার অনুভবেরই সংস্কার হইয়াছে। "আমি রজত" এপ্রকার সংস্কার কখনও হয় নাই। সুতরাং "আমি রজত" ইহা অনুভবের বিষয়ই হইতে পারে না।]

মূল। নন্বেবমপি মিথ্যারজতস্য সাক্ষাৎসাক্ষিসম্বন্ধিতয়া ভানসম্ভবে রজতগোচরজ্ঞানাভাসরূপায়া অবিদ্যাবৃত্তেরভ্যুপগমঃ কিমর্থম্? ইতি চেৎ, উচ্যতে। স্বগোচরবৃত্ত্যুপহিতচৈতন্যভিন্নসত্তাকত্বাভাবস্য বিষয়াপরোক্ষত্বরূপতয়া রজতস্যাপরোক্ষত্বসিদ্ধয়ে তদভ্যুপগমাৎ। নন্বিদংবৃত্তে রজতাকারবৃত্তেশ্চ প্রত্যেকমেকৈক বিষয়ত্বে গুরুমতবদ্বিশিষ্ট জ্ঞানানভ্যুপগমে কুতো ভ্রমজ্ঞানসিদ্ধিরিতি চেন্ন বৃত্তিদ্বয় প্রতিবিম্বিত চৈতন্যস্যৈকস্য সত্যমিথ্যাবস্তুতাদাত্ম্যাবগাহিত্বেন ভ্রমত্বস্বীকারাৎ। অতএব সাক্ষিজ্ঞানস্য সত্যাসত্যবিষয়তয়াপ্রামাণ্যানিয়মাৎ অপ্রামাণ্যোক্তিঃ সাম্প্রদায়িকানাম্।

ব্যাখ্যা। [আচ্ছা, তাহা না হয় মানিলাম কিন্তু] সাক্ষীর সহিত সাক্ষাৎ যোগেই যখন মিথ্যা রজতজ্ঞান সম্ভব, তখন রজতসম্বন্ধীয় জ্ঞানের আভাসরূপ আবার অবিদ্যা-বৃত্তি স্বীকার করার প্রয়োজন কি? [অর্থাৎ সাক্ষী নিজেই মিথ্যা রজতজ্ঞান করেন, এই কথা বলিলেই ত হয়, আবার একটা অবিদ্যা ধরিবার প্রয়োজন কি?] [উত্তরে] বলিতেছি—কোনও বিষয়ের অপরোক্ষ জ্ঞান হইতে হইলে, সেই বস্তুটির বৃত্তিবিশিষ্ট চৈতন্যের সহিত বস্তুটির অভিন্ন অস্তিত্ব হওয়া উচিত। তা'ই রজতজ্ঞানের অপরোক্ষত্ব সিদ্ধি করিবার জন্য অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করিতে হইয়াছে। (নহিলে রজতজ্ঞান যে অপরোক্ষ তাহা দেখাইতে পারি না।)

[এখন একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। গুরুমত বা প্রাভাকরমত যাহারা অনুসরণ করেন, সেই মীমাংসকগণ বলেন, ভ্রমজ্ঞান বলিয়া কিছু নাই। সকল জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। তাঁহাদের মতে যখন শুক্তিতে রজতজ্ঞান হয়, তখন "এই এই প্রকার" এই সম্মুখবর্ত্তী দ্রব্যবিষয়ক জ্ঞান হয় ("ইদমিতি পুরোবর্ত্তিবিষয়মনুভবাত্মকং জ্ঞানম্") ও রজত অসন্নিকৃষ্ট বলিয়া স্মৃত হয় ("রজতমিত্যসন্নিকৃষ্টরজতবিষয়ং স্মরণাত্মকম্।") যদিও এই বৃত্তি দুইটি বিভিন্ন কিন্তু প্রাভাকরমতে জ্ঞান বিভিন্ন নয়, কেন না বৃত্তি দুইটি একদেশস্থিত বলিয়া তৎপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যও এক। ("বৃত্তিভেদেঽপি নাস্তি জ্ঞানভেদস্তয়োরেকদেশস্থত্বেন তৎপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যস্যৈক্যাৎ।") প্রাভাকরদের ন্যায় বেদান্তবাদীরাও

এইস্থলে জ্ঞান একটীই মানিয়া থাকেন। দুই বৃত্তির দুই জ্ঞান হয় তাঁহারা তাহা বলেন না। কাজেই এক জ্ঞানই যদি হয়, তাহা হইলে তাহা যথার্থ জ্ঞান। বেদান্তবাদী যে ভ্রমজ্ঞান বলিয়া আর একটি জ্ঞান স্বীকার করিতেছেন তাহার স্থান কোথায়? এই আপত্তির উত্থাপন ও মীমাংসা হইতেছে।]

আচ্ছা, "এইরূপ" এই বৃত্তি ও "রজতাকার" বৃত্তির প্রত্যেকের এক একটি বিষয় বলিয়া গুরুমতের ন্যায় (প্রাভাকরমতের ন্যায়) যদি তোমরা (অর্থাৎ বেদান্তবাদীগণ) বিশিষ্ট জ্ঞানকে স্বীকার না কর, তাহা হইলে তোমাদের ভ্রমজ্ঞান কিরূপে সিদ্ধ হয়? এই যদি বল, তাহার উত্তর এই,—দুই বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত একটি চৈতন্যই সত্য ও মিথ্যা এই দুই বস্তুর অভিন্নতা প্রতিপাদন করিতে চায় বলিয়া তাহার ভ্রমত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। এই হেতু সাম্প্রদায়িকগণ ভ্রমজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, কেননা সাক্ষীর জ্ঞান সত্য ও মিথ্যা উভয় বিষয়ক বলিয়া কেবল যথার্থ জ্ঞান মানিতে হইবে, এমন কোনও নিয়ম নাই।

মূল। নন্থ সিদ্ধান্তে দেশান্তরীয়রজতমপ্যাবিদ্যাকার্য্যমধ্যাস্তশ্চেতি কথং শুক্তি-রূপ্যস্য ততো বৈলক্ষণ্যম্? ইতি চেৎ, ন। ত্বন্মতে সত্যত্বাবিশেষেঽপি কেষাঞ্চিৎ ক্ষণিকত্বং কেষাঞ্চিৎ স্থায়িত্বম্, ইত্যত্র যদেব নিয়ামকং তদেব স্বভাববিশেষাদিকং মমাপি। যদ্বা ঘটাদ্যধ্যাসে অবিদ্যৈব দোষত্বেনাপি হেতুঃ। শুক্তিরূপ্যাধ্যাসে তু কাচাদয়ো দোষাঃ। তথাচ আগন্তুক-দোষজন্যত্বং প্রাতিভাসিকত্বে প্রযোজকম্, অতএব স্বপ্নোপলব্ধরথাদীনাম্ আগন্তুকনিদ্রাদোষজন্যত্বাৎ প্রাতিভাসিকত্বম্।

ব্যাখ্যা। (নৈয়ায়িক বলিতেছেন আচ্ছা তোমার মতে (জগতে যাহা দেখিতেছি তাহার সবই যখন মিথ্যা, তখন) অন্যদেশে বর্ত্তমান রজতজ্ঞানও ত মায়ার কার্য্য ও মিথ্যা। (অর্থাৎ শুক্তিতে রজতজ্ঞান ত মিথ্যাই, আবার যেখানে বাস্তবিক রজত আছে সেখানেও ত রজতজ্ঞান অবিদ্যা বা মায়াপ্রসূত।) তবে এই দুইটি মিথ্যাজ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ কি? (বেদান্তমতে এক ত জগৎই মিথ্যা, সমস্ত জগৎজ্ঞানই মায়াবশে হয়, এই ভ্রমজ্ঞান ও শুক্তিতে রজতজ্ঞান-রূপ ভ্রমজ্ঞান, এই দুই মিথ্যাজ্ঞানে প্রভেদ কি?) বেদান্তবাদী উত্তর দিতেছেন, ন্যায়মতে সমস্ত পদার্থের যথার্থ অস্তিত্ব থাকিলেও কতকগুলির ক্ষণিক কতক-গুলির বা স্থায়ী অস্তিত্ব ধরা হয়। [আকাশের গুণ শব্দের অস্তিত্ব ক্ষণিক বলিয়া নৈয়ায়িক ধরেন।] নৈয়ায়িক বলেন, দ্রব্যের বিশেষ বিশেষ স্বভাব (নিজের প্রকৃতি) দ্বারাই ক্ষণিক ও স্থায়ী অস্তিত্ব বুঝিতে হইবে। বেদান্তবাদী বলিতেছেন ঐরূপ নিয়ম আমার মতেও খাটিবে। [দ্রব্যের বিশেষ স্বভাবে ঘটপটাদির জ্ঞান মায়াবশে হইবে, আবার শুক্তিতে রজতজ্ঞানরূপ মিথ্যাজ্ঞানও মায়ায় হইবে বটে কিন্তু তাহা আর এক প্রকার। এই যুক্তি ব্যতীত বেদান্তবাদী আরও একটি যুক্তি দিতেছেন] কিংবা ঘট

প্রভৃতি মিথ্যাজ্ঞান যখন হয় তখন দোষ কেবল অবিদ্যা। (এই অবিদ্যা দোষ আছে বলিয়াই ঘট প্রভৃতি মিথ্যা জ্ঞান আমাদের হয়। বাস্তবিক কিন্তু কিছুই নাই) কিন্তু শুক্তিতে যখন রজতজ্ঞান হয়, তখন কাচ প্রভৃতি চক্ষুরোগ-রূপ দোষ বিদ্যমান থাকে। [সেখানে কেবল অবিদ্যাদোষে ভ্রমজ্ঞান হয় না, আরও একটি দোষ থাকে] এই আগন্তুক দোষ চক্ষুরোগপ্রভৃতি) দ্বারা জনিত হওয়াই (শুক্তিতে রজতজ্ঞানরূপ স্থলের) বিশেষক। (ইহা দ্বারাই সাধারণ মায়াপ্রসূত ঘটপটাদির মিথ্যাজ্ঞান হইতে ইহার প্রভেদ নির্দ্ধারিত হয়)। এইরূপ স্বপ্নে যে রথ প্রভৃতির জ্ঞান হয় তাহাতেও (অবিদ্যা ব্যতীত) আগন্তুক নিদ্রা প্রভৃতি দোষ বিদ্যমান, কাজেই সে সকল জ্ঞান প্রাতিভাসিক।

মূল। নমু স্বপ্নস্থলে পূর্ব্বানুভূতরথাদেঃ স্মরণমাত্রেণৈব ব্যবহারোপপত্তৌ ন রথাদিসৃষ্টিকল্পনং, গৌরবাৎ, ইতি চেৎ, ন রথাদেঃ স্মৃতিমাত্রাভ্যুপগমে "রথং পশ্যামি", "স্বপ্নে রথমদ্রাক্ষম্" ইত্যাদ্যনুভববিরোধাপত্তেঃ। "অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজত" ইতি রথাদিসৃষ্টিপ্রতিপাদক-শ্রুতিবিরোধাপত্তেশ্চ। তস্মাৎ শুক্তিরূপ্যবৎ স্বপ্নোপলব্ধরথাদয়োঽপি প্রাতিভাসিকা যাবৎ প্রতিভাসম্ অবতিষ্ঠন্তে।

ব্যাখ্যা। এখন কথা হইতেছে স্বপ্নে রথ প্রভৃতি যখন দেখি, তখন পূর্ব্বদৃষ্ট রথাদি স্মরণ করি এইরূপ ধরিলেই ত সহজ হয়, স্বপ্নে মিথ্যা রথের সৃষ্টি করি, এত আবার ধরিবার দরকার কি ? উত্তর হইতেছে স্বপ্নে যখন রথ দেখি তখন কেবল স্মরণ দ্বারা সেই রথজ্ঞান হয় না। কেননা, স্বপ্নাবস্থায় "রথ দেখিতেছি" এইরূপ অনুভব হয় ["রথ স্মরণ করিতেছি" এরূপ অনুভব ত হয় না।] আবার নিদ্রাভঙ্গে "স্বপ্নে রথ দেখিয়াছিলাম" এই অনুভব হয়। ["স্বপ্নে রথ স্মরণ করিয়াছিলাম" এ অনুভব ত হয় না] তা ছাড়া শ্রুতিতে (স্বপ্নাবস্থায়) এইরূপ রথাদিসৃষ্টির কথা আছে "তখন সে রথ, রথের উপকরণ (অশ্ব) ও পথ সৃষ্টি করে।" [বৃহদারণ্যক ৪।৩।১০] স্বপ্নে স্মরণমাত্র হয়, সৃষ্টি হয় না, এ কথা বলিলে পূর্ব্বোল্লিত শ্রুতির বিরুদ্ধ কথা বলা হইবে। অতএব স্থির হইল, শুক্তিতে মিথ্যা রৌপ্যজ্ঞানের ন্যায় স্বপ্নদৃষ্ট রথাদির জ্ঞানও প্রাতিভাসিক ও স্বপ্নপ্রতীতি কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে।*

মূল। নমু স্বপ্নে রথাদ্যধিষ্ঠানতয়োপলভ্যমানদেশবিশেষস্যাপি তদা অসন্নিকৃষ্টতয়া অনির্ব্বচনীয়প্রাতিভাসিকদেশোঽভ্যুপগন্তব্যঃ, তথাচ রথাদ্যধ্যাসঃ কুত্র ? ইতি চেৎ, ন। চৈতন্যস্য স্বয়ংপ্রকাশস্য রথাদ্যধিষ্ঠানত্বাৎ প্রতীয়মানরথাদিরস্তীত্যেব প্রতীয়তে ইতি সদ্রূপেন প্রকাশমানং চৈতন্যমেবাধিষ্ঠানং; দেশবিশেষোঽপি

* যাবৎপ্রতিভাসম্—যাবৎকালপর্য্যন্তমবিষ্ঠানজ্ঞানং ন স্যাৎ।

চিদধ্যস্তঃ প্রতিভাসিকো রথাদাবিন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বমপি প্রাতিভাসিকং তদা সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামুপরমাৎ।

"অহং রথ" ইত্যাদি প্রতীত্যাপাদনস্তুপূর্ব্ববন্নিরসনীয়ম্।

স্বপ্নে রথাদয়ঃ সাক্ষান্মায়াপরিণামা ইতি কেচিৎ। অন্তঃকরণদ্বারা তৎপরিণামা ইত্যন্যে।

ব্যাখ্যা। [স্বপ্নে যখন রথ দেখি তখন রথটি যে দেশে ও যে কালে অবস্থিত তাহা অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ তাহা সৎ কি অসৎ, ভাব কি অভাব, সাবয়ব কি নিরবয়ব, তাহা কিছুই বলা যায় না। এখন কাল ও দেশ যদি অনির্ব্বচনীয় ও মিথ্যা হয় তবে তদধিষ্ঠিত রথ প্রভৃতির জ্ঞান কোথায় হইবে? স্বপ্নাবস্থায় রথের সহিত কোনও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ ত থাকে না, কাজেই স্বপ্নে দৃষ্ট রথদ্বারা অধিষ্ঠিত যে দেশ, তাহা অনির্ব্বচনীয়। এই অনির্ব্বচনীয় দেশে রথের ভ্রমজ্ঞান কিরূপে থাকিতে পারে?]

উত্তরে বলিতেছি, চৈতন্য স্বয়ং প্রকাশ, নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে। এই চৈতন্য রথ প্রভৃতির অধিষ্ঠান বলিয়া প্রতীয়মান রথপ্রভৃতি "আছে" বলিয়া বোধ হয়। কাজেই এই অস্তিত্বরূপে প্রকাশশীল চৈতন্যই এরূপ ক্ষেত্রে অধিষ্ঠান। দেশবিশেষও চৈতন্যে অধ্যস্ত ও মিথ্যা। স্বপ্নে রথপ্রভৃতির ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হওয়া (স্বপ্নে রথ প্রভৃতি দেখিতেছি এই ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষের জ্ঞানও) মিথ্যা, কেননা তখন (নিদ্রাবস্থায়) সকল ইন্দ্রিয়ই নিশ্চেষ্ট থাকে।

"আমি রথ" এইরূপ প্রতীতি হওয়ার সম্ভাবনা পূর্ব্বের ন্যায় ("আমি রজত" এই জ্ঞান হইতে পারে না, পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, সেই সকল যুক্তির ন্যায় যুক্তি প্রয়োগ করিয়া) নিরাস করিবে।

কেহ কেহ বলেন, স্বপ্নে দৃষ্ট রথ প্রভৃতি মায়ার সাক্ষাৎ পরিণাম। অপরেরা বলেন এগুলি মায়ার সাক্ষাৎ পরিণাম নয়, অন্তঃকরণের দ্বারা মায়া এই পরিণাম প্রাপ্ত হয়। (কাহারও মতে একেবারে মায়া হইতেই রথাদির পরিণাম, অপরের মতে মায়া অন্তঃকরণের সাহায্যে রথাদি রূপ পরিণাম প্রাপ্ত হয়।)

ক্রমশঃ

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

উদ্‌ভ্রান্ত পথিক।

১

বেলা যে গো! যায় যায় কত দূর, কত দূর?
ওই বুঝি থেমে যায় জীবন-বীণার সুর!

২

অবশ অধীর পারা না সহে অভাব আর,
কোথা তুমি—কোথা তুমি এস প্রাণে একবার।

৩

যবে বাহিরিনু, জাগে সুখতারা নীলিমায়,
আকুল পিয়াসা ল'য়ে কা'র যেন প্রতীক্ষায়।

৪

আশে পাশে দূরে কাছে, আরো যত তারাদল,
হীরক কণিকা প্রায় করিতেছে ঝল মল!

৫

দোয়েল, পাপিয়া, শ্যামা তখনো ঘুমায় নীড়ে,
নিশাচর প্রাণী শুধু ফিরিতেছে ধীরে ধীরে!

৬

তখনো কুসুম রাণী ঘুম-ঘোরে জড়সর,
সমীর চুম্বনে কভু শিহরিছে কলেবর।

৭

আকুল হৃদয় মোর ছুটেছে পাগল হেন,
ধরিবারে শশধর বামন হইয়া যেন।

৮

যদি না তোমারে লভি ফিরিব না গৃহে আর,
তোমারি বিরহে মোর মরুময় এ সংসার।

৯

নবীন পথিক আমি পশি নব ভব-হাটে,
পদে পদে শত বাধা ফিরিতে আপন বাটে।

১০

ধরার প্রখর তাপে সন্তাপিত দেহ, মন,
কোথা স্নিগ্ধ স্পর্শ তব জুড়াইতে এ দহন?

১১

এস নাথ! এস নাথ! গোধূলি আসি'ছে হায়,
তা'রি সনে বুঝি কিবা আয়ু-সূর্য্য অস্ত যায়।

১২

সাধিয়া আপন কাজ সবাই ফিরিছে ঘরে,
কি সন্তোষ কি হরষ সকলের হিয়া ভরে।

১৩

সারা দিবসের পরে লভি নিজ প্রিয়জন,
অবসাদ রাশি সবে হবে এবে বিস্মরণ।

১৪

শ্রান্ত ক্লান্ত পান্থ আমি আশা-নিরাশার স্রোতে,
ভব-পারাবারে ভাসি দীরঘ বন্ধুর পথে।

১৫

হে দেব আমার সাধ তবে কি অপূর্ণ র'বে?
আ-জনম ঘুরে ঘুরে এ জীবন শেষ হবে?

১৬

"ওই তুমি, ওই তুমি সাধনা বিফল নয়"
গোপনে ইঙ্গিতে প্রাণে কেবা যে মধুরে কয়!

১৭

বিহগের সুধা তানে তোমারি বাঁশরী বাজে,
ফুটন্ত কুসুমে মরি, তোমারি মাধুরী রাজে।

১৮

অনন্ত অপার তুমি নভঃ দেয় পরিচয়,
রবি, শশী, গ্রহ, তারা তোমারি আদেশ বয়।

১৯

প্রকৃতির নানা থরে নয়ন হৃদয় লোভা,
মরি! মরি! রূপে কত তোমারি মোহিনী শোভা!

২০

জলে স্থলে নভে তুমি ওতপ্রোত আছ প্রভু,
তোমা ছাড়া এই বিশ্ব দূরে ত রহে না কভু।

২১

আরো কাছে আরো কাছে রচেছ তোমার ঠাঁই—
হৃদি রাজ্যে রাজা তুমি তুমি ছাড়া আমি নাই।

২২

উদ্ভ্রান্ত পথিকে আজি দিয়েছ যদিবা ধরা,
যেওনা করুণা ক'রে হে ভব-ভাবনা-হরা!

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।

"উত্তরা-খণ্ড-পরিক্রম"।

তীর্থ-ভ্রমণ, হিন্দুদিগের অতীব প্রাচীন প্রথা এবং অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম। স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দুগণ ধর্ম্মাচরণ উদ্দেশ্যেই তীর্থ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। আধুনিক সভ্যতার প্রথানুসারে দেশভ্রমণ জ্ঞানোপার্জ্জনের পন্থা বলিয়া কথিত হয় বটে, কিন্তু ঐহিক জ্ঞান ভিন্ন আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম-উপার্জ্জন তাহার লক্ষ্য নহে। হিন্দুগণ ধর্ম্ম-কর্ম্ম-সাধনকেই—পারলৌকিক মঙ্গল-সাধনোপযোগী ক্রিয়া-কলাপকেই, ইহ-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এবং তজ্জন্য তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যই সেই ধর্ম্মার্থেই সাধিত হয়। সুতরাং এতৎ সম্বন্ধে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, হিন্দুর আপামর সাধারণ—শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী নির্ধন, গৃহস্থ বানপ্রস্থী, সকলেই তীর্থ-ভ্রমণকে ধর্ম্মকর্ম্মের সহায়ক বলিয়া মনে করে এবং ইহার জন্য সময়, স্বাস্থ্য বা ধনাভাবকেও গ্রাহ্য করে না; তীর্থ-ভ্রমণে তাহাদের এইরূপ ঐকান্তিক আগ্রহ পরিদৃষ্ট হয়।

ইদানীন্তন কালে দেশভ্রমণের সাধারণতঃ দুইটী উদ্দেশ্য দেখা যায়; একটী নষ্ট-স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার-চেষ্টা, অপরটী বিভিন্ন দেশের মনুষ্যগণের জ্ঞান, শিক্ষা, অভিজ্ঞার সংকলন। এ উদ্দেশ্য নিন্দার্হ নহে; কিন্তু তীর্থ-ভ্রমণে উক্ত উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারিলেও, হিন্দুদের তীর্থ-ভ্রমণের উহাই মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। হিন্দুগণ স্থূল শরীরের প্রতি এবং লৌকিক জ্ঞানের প্রতি ততটা আস্থা প্রদর্শন করেন না, যতটা তাঁহারা উত্তরোত্তর সুক্ষ্মতর দেহের ও সৎ-মনোবৃত্তি সকলের উন্নতি-সাধন-কল্পে কার্য্য করিতে উদ্যোগী হন। তাঁহারা জানেন যে, ইহজগতেই আমাদের জীবনের পরিণাম হয় না, আমাদের মনোবৃত্তি-নিচয়ের উচ্ছৃঙ্খলতা বশতঃ পরলোকে কষ্টভোগ করিতে হয়। সেই জন্যই তাঁহারা ইহসংসারে নীচ প্রবৃত্তিগুলি দমন অথবা বিনাশ করিয়া উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলির অনুশীলনে ব্যগ্র হন, এবং তৎসাধনোপযোগী কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। তীর্থ-ভ্রমণ সেই সকল কার্য্যের মধ্যে একটী।

হিন্দুদের অধিকাংশ তীর্থই দুর্গম এবং সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক সুবিধা-বর্জ্জিত। এরূপ হইলেও আবহমান কাল তাঁহারা—দশ পঁচিশজন নহে, অসংখ্যলোক—তীর্থ ভ্রমণে বিরত হন না কেন? ইহার একমাত্র কারণ; তাঁহাদের লক্ষ্য—আধ্যাত্মিক-জীবনের উন্নতির দিকে—সত্য, শৌচ, সর্ব্বভূতে দয়া, সর্ব্বত্র সারল্য, সংযম, সন্তোষ, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতির জন্য উপযোগী বৃত্তি-নিচয়ের উন্মেষের দিকে। সুতরাং তাঁহারা অপেক্ষাকৃত নীচ শারীরিক ও অন্যান্য সাংসারিক সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য করেন না। সংযম শিক্ষা করিতে বা উপরিউক্ত গুণগুলি উপার্জ্জন করিতে হইলে স্থূল শরীরের

প্রতি একমাত্র আস্থা স্থাপন করিলে চলিবে কেন? তবে শরীরের প্রতি তাঁহারা একেবারেই উদাসীন, তাহাও নহে; কারণ "শরীরমাদ্যংখলু ধর্ম্মসাধনং"। তবে তাঁহারা যেরূপ মিতাচারী ও মিতাহারী, তাহাতে মূলতঃ শরীরের প্রতি যত্ন প্রদর্শন না করিলেও স্বাভাবিক রূপে স্বাস্থ্য সহজে নষ্ট হইতে পায় না।

যখন ভারতবর্ষে রেলপথের অভাবে বহুদূর-দূরান্তরে যাতায়াতের সুবিধা ছিল না, তখনও তীর্থযাত্রার বিরাম লক্ষিত হয় নাই। সে সময় লোকে জীবনের শেষভাগেই প্রায়শঃ তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, তীর্থ-ভ্রমণের আত্যন্তিক কষ্টে মৃত্যু হইলেও তখন দুঃখের বিষয় হইত না, বরঞ্চ তীর্থস্থানে মৃত্যুকে শ্লাঘার কথা বলিয়া মনে হইত। কিন্তু এক্ষণে ভারতবর্ষের চারিদিকে রেলপথের বিস্তার হওয়াতে তীর্থ-ভ্রমণ-কষ্টের অনেকটা লাঘব হইয়াছে। তাহার উপর আবার সদাশয় পরদুঃখ-কাতর ধনীজনও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে তীর্থস্থানের অধিকাংশ অসুবিধা কষ্ট দূরীভূত হইয়াছে। পূর্ব্বে তীর্থ-ভ্রমণের কষ্ট প্রভৃতির কথা শুনিয়া এবং বৃদ্ধ বয়সে যাঁহারা তীর্থযাত্রা করিতেন, তাঁহাদের অধিকাংশের তীর্থ-ভূমিতে মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া অনেকেই প্রথমে কিঞ্চিৎ ভীত হইতেন এবং নিজ বিষয়-সম্পত্তির উইল না করিয়া তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইতেন না। এক্ষণে অনেক অসুবিধা দূর হইলেও অনেকে মনে করেন, কোন্ তীর্থ কোন্ দিকে, কোন্ দিক্ দিয়া গেলে যাইবার সুবিধা হইবে, তাহা জানি না,—কোথায় কিরূপ অসুবিধা এখনও আছে, তাহাও অবগত নহি, অতএব বিশ্বাসী অথচ ভুক্তভোগী সুতরাং অভিজ্ঞ পথ-প্রদর্শক না পাইলে আমাদের যাইবার সাহস হয় না। এইরূপ ইতস্ততঃ করিবার ভাব তাঁহাদের মনে উদয় হয়। এই অসুবিধা দূর করিবার অভিপ্রায়ে অনেকে এক্ষণে নানাস্থানের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ও তীর্থস্থান গুলির ইতিহাসাদি সংকলন করিয়া প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতেছেন। অনেকগুলি সেইরূপ প্রবন্ধ এবং কয়েকখানি পুস্তক এ পর্য্যন্ত আমরা দেখিয়াছি। সম্প্রতি উত্তরাখণ্ডস্থিত তীর্থগুলির বিস্তৃত বিবরণ সম্বলিত একখানি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পুস্তক পড়িয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। এই মাত্র তীর্থ-ভ্রমণের যে অসুবিধার কথার উল্লেখ করিয়াছি, কথিত পুস্তকের দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ নিরাকৃত হইবে।

ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সংকলিত "ভারতভ্রমণ ও তীর্থদর্শন" নামক একখানি দশ আনা মূল্যের পুস্তক পড়িয়াছিলাম। ইহাতে সমস্ত ভারতের তীর্থ-স্থানগুলির নাম, পথ-নির্দ্দেশ, রেলভাড়া, স্থানগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রভৃতি আছে; সুতরাং মোটামুটি ইহাতে ভারতের নানা স্থানস্থ তীর্থ সকলের বিষয় জানিতে পারা যায়। তীর্থভ্রমণেরসময় এই ১৩৫ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকখানি সঙ্গে থাকিলে অনেক উপকারে আসিতে পারে।

পরিব্রাজক শুদ্ধানন্দ কৃত "হিমালয় ভ্রমণ" নামক আর একখানি উক্ত ধরণেরই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে সেখানিও উল্লেখ-যোগ্য। কিন্তু এই প্রবন্ধের শীর্ষোল্লিখিত

পুস্তকখানি আরও উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ভ্রমণকারী লেখক ইহাতে তাঁহার তীর্থভ্রমণের দৈনন্দিন ঘটনা লিপিকুশলতার সহিত সন্নিবেশিত করিয়াছেন; নীরস বিষয়কে বেশ সরসভাবে প্রকটিত করিয়াছেন। গল্পের ন্যায় এই পুস্তকখানি পড়িতে পড়িতে ছাড়া যায় না। লেখক বেশ সৌন্দর্য্যপ্রিয় বলিয়া প্রতীত হন। তিনি স্থান সকলের আধুনিক স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়া পুরাণোক্ত শ্লোকগুলি উদ্ধার পূর্ব্বক উভয়ের সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিয়াছেন। স্থানে স্থানে কালিদাস, ভবভূতি, কবি শিহ্লন প্রভৃতির কবিতাও উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাঁহাদের বর্ণনা ছত্রে ছত্রে মিলিয়া যায়।

এই পুস্তকে যেমন পুরাতত্ত্ব বর্ণিত আছে, সেইরূপ আধুনিক ইতিহাসেরও অনেকটা সংগ্রহ সংযোজিত হইয়াছে। নানাস্থানে প্রকাশিত প্রবন্ধ এবং "বিশ্বকোষ" লিখিত ইতিহাসাদিও পুস্তকের স্থানে স্থানে সঙ্কলিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন নানাস্থানের স্থানীয় কিম্বদন্তী তিনি যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাও মুদ্রিত হইয়াছে। কোন কোন স্থানের চটীওয়ালাদের অত্যাচার, যাত্রীগণের পরস্পরের সহানুভূতি, স্থানবিশেষে আহারাদির কষ্ট বা অভাব, পর্ব্বতে আরোহণের সময় কোন মূর্চ্ছারোগগ্রস্ত ব্যক্তির পার্শ্বস্থ খাদে পতন ও মৃত্যু, তদুপলক্ষে পুলিশের ব্যবহার এবং মৃতের বিধবা পত্নীর বিপদুদ্ধার ও তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে মনে হয় যেন গল্প পুস্তক পাঠ করিতেছি।

লেখক যে পথ অবলম্বন করিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা ব্যতীত যে সকল বিভিন্ন পথের অনুসরণেও গন্তব্যস্থানে যাওয়া যাইতে পারে, তাহাদেরও সংক্ষিপ্ত বিবরণ গ্রন্থকার সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন। তীর্থযাত্রীগণ কোন্‌স্থানে কিসের অভাব অনুভব করিবেন, তাহার জন্য পূর্ব্বে সতর্ক হইবারও উপদেশ ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। লেখকের ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল এবং পুস্তকখানি উপকারক ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। তীর্থযাত্রাভিলাষীগণের পক্ষে এই পুস্তক বিশেষ কাজে লাগিবে।

চারিশতাধিক পৃষ্ঠার পুস্তকের মূল্যও অতি সুলভ। ছাপা পরিষ্কার, কাগজ পরিপাটি, এবং ইহাতে একখানি ম্যাপ ও তিনখানি হাফ্‌টোন চিত্র আছে।

ইহার উপর লেখক যে একজন ভাবুক ও কবি, তাহার দৃষ্টান্ত তাঁহার রচিত কয়েকটী সঙ্গীত এই পুস্তকে উপযুক্তস্থানে মুদ্রিত আছে। তাহার মধ্যে দুইটী গীত বেশ মনোহর।

শ্রীবাণীনাথ নন্দী।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নোবেল প্রাইজ — কবিবর রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর এ বৎসরের সাহিত্যিক বিভাগের নোবেল প্রাইজ পাইয়া ভারতবাসীকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। এত দিনে বঙ্গ সাহিত্য বিশ্বসাহিত্য সভায় আসন লাভ করিল। শুনা যায় কবিবরের গীতাঞ্জলিতে যে বিশ্ব হিতৈষণা ও সার্ব্বভৌম ভাব আছে এবং যে ধ্যান রসের প্রবাহ আছে তজ্জন্যই গীতাঞ্জলি গ্রন্থ এই প্রাইজের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে য়ুরোপে যাহাকে 'মিসটিসিজম্' বলে, তাহার পুনরুজ্জীবন হইয়াছে। য়ুরোপের পক্ষে ইহা বিশেষ আশাপ্রদ।

মিসেস বেসেণ্টের আপিল — মান্দ্রাজ হাইকোর্টে মিসেস্ বেসেণ্ট যে আপিল রুজু করিয়াছিলেন আদালতের বিচারে তাহা নামঞ্জুর হইয়াছে। তিনি সবিশেষ দক্ষতা ও বাগ্মিতার সহিত ঐ আপিল স্বয়ং সমর্থন করিয়াছিলেন, কিন্তু জজদিগের রায় তাঁহার প্রতিকূলে হইয়াছে। শুনা যাইতেছে তিনি বিলাতের প্রিভি কাউনসিলে আবার আপিল করিবেন।

বিহার-তত্ত্ববিদ্যা-সংঘ — বিগত আশ্বিন মাসে গয়া সহরে এই সংঘের বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। ১১টি তত্ত্ববিদ্যা সমিতির প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। রায় পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ এই সংঘের সম্পাদক। তিনি 'থিয়সফি' সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। সমবেত সভ্যগণ শ্রীযুক্ত লেটবিটার সাহেবের দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া তাঁহার লোকহিতকর কার্য্যের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ভাগিরথী তত্ত্বসংঘ। — গত ২৮শে সেপ্টেম্বর রবিবার টিটাগড় বিশালাক্ষী শাখা সমিতিতে ভাগিরথী তত্ত্বসমিতি সংঘের ত্রয়োবিংশতিতম অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত চন্দ্র শেখর সেন সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এই অধিবেশনে কৃষ্ণনগর শাখা সংঘ ভুক্ত হন; সর্ব্বসমেত ৮টী শাখাসমিতি সংঘ ভুক্ত হইল। এইরূপ স্থির হয় যে, আগামী মাসে কলিকাতা বঙ্গীয় তত্ত্বসমিতি গৃহে সংঘের অধিবেশন হইবে। পরে শ্রীরামপুর শাখার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে একটী বাঙ্গালা প্রবন্ধ পঠিত হয় এবং শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন সুখ ও দুঃখ সম্বন্ধে একটী সুন্দর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন।

ভারতীয় তত্ত্বসমিতির সভ্য বৃদ্ধি।

	জুন ১৯১৩		জুলাই		আগষ্ট		মোট
নূতন সভ্য—	৭০	...	৯৯	...	৬৫	=	২৩৪
পদ ত্যাগ—	৭	...	৭	...	৫	=	১৯
মৃত্যু—	১	...	৪	...	৩	=	৮
			ত্রৈমাসিক বৃদ্ধি—				২০৭
			গত ষাণ্মাষিক বৃদ্ধি—				৫৮৫
			এ বৎসরে মোট সভ্য বৃদ্ধি—				৭৯২



কন্‌ফিউসিয়াস্‌।

পুরাকালের চীনদেশীয় জ্ঞানী।

THE INDIAN ART SCHOOL BOWBAZAR CALCUTTA.

ব্রহ্মবিদ্যা

২য় বর্ষ।] পৌষ, ১৩২০। [৯ম সংখ্যা।

শিব-তাণ্ডব-স্তোত্রম্।

(রাবণ-রচিতম্)

["শিব তাণ্ডব-স্তোত্র" "পঞ্চচামর"-চ্ছন্দে রচিত। কেবল শেষোক্ত শ্লোকটীতে "বসন্ততিলক"-চ্ছন্দঃ রহিয়াছে। "পঞ্চচামর"-চ্ছন্দের অপর নাম "নরাচ"। "প্রমাণিকাপদদ্বয়ং বদন্তি পঞ্চচামরম্" ইতি ছন্দোমঞ্জরী। "লঘৌ গুরৌ নিরন্তরে সতীহ ষোড়শাক্ষরে। প্রবৃত্তবৃত্তরাজকং নরাচমেব মন্মহে" ইতি বৃত্তরত্নাবলী। "লঘুগুর্ব্বর্নিরন্তরং ক্রমেণ দীয়তে যদা। তদা নরাচমুচ্যতে পরৈস্তু পঞ্চচামরঃ॥" ইতি বৃত্ত-চন্দ্রিকা।]

যিনি সমুদ্র-পরিখা-বেষ্টিত ও মণি-মাণিক্য-খচিত সুবর্ণময় লঙ্কাদ্বীপের একমাত্র অধীশ্বর ছিলেন; যাঁহার সাধের লঙ্কার অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়া, ইন্দ্রের অমরাবতীও পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল; যাঁহার শোক-তাপ-শূন্য অশোক-কাননের অপরূপ শোভা দেখিয়া, নন্দন-কাননও পরম লজ্জা প্রাপ্ত হইত; যিনি সেই সুদুর্গম ও সুদুর্ভেদ্য লঙ্কাধামে রাজধানী সন্নিবেশ করিয়া, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের উপরি একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়া-ছিলেন; যাঁহার দুর্জ্জয় প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া, তেত্রিশ কোটী দেবতাও শশব্যস্ত হইয়া পড়িয়া-ছিলেন; যাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া, চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের, যম ও হুতাশন প্রভৃতি যাবতীয় দেবতা ও দিক্‌পালবর্গ তাঁহার দ্বারে দ্বারী হইয়া দাস্যকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতেন; যাঁহার অত্যাচার হইতে এই ত্রিভুবনের পরিত্রাণ-নিমিত্ত স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণকেও মায়াময় মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া এই পৃথিবীতে অব-তীর্ণ হইতে হইয়াছিল; যিনি আপনাকে ত্রিভুবনের একেশ্বর জানিয়া, প্রত্যক্ষ লক্ষ্মী-স্বরূপিণী সতী সাধ্বী জনক-নন্দিনীকেও হরণ করিয়া আনিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই; যাঁহার প্রাসাদে আসিয়া স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মাকেও, চণ্ডীপাঠ শ্রবণ করাইয়া ও হোমকার্য্য সম্পাদন করিয়া যাইতে হইত; যাঁহার প্রতি পুত্রবৎ স্নেহ প্রকাশ করিয়া, তাঁহার প্রাণরক্ষার জন্য সেই স্বয়ং সনাতনী পূর্ণশক্তি পরমেশ্বরীও অষ্টপ্রহর তাঁহার বামদেশে বসিয়া থাকিতেন; যিনি সেই দেবদেব ত্রিলোক-তারণ অনাথ-শরণ ত্রিলোচন ভিন্ন আর কাহা-কেও উপাস্য বলিয়া মনে করিতেন না; যিনি দশমুখে সেই পরম পুণ্যময় "শিব, শিব"-ধ্বনি উচ্চারণ করিতে করিতে, প্রচণ্ড তাণ্ডব-নৃত্য ধারণ করিয়া, আহ্লাদে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিতেন; সেই শিবপ্রাণ সুপণ্ডিত দশানন রাবণ, এই স্বরচিত "শিব-তাণ্ডব-স্তোত্রটী" ভক্তিভরে পাঠ করিয়া, স্বীয় জীবন সার্থক করিয়াছিলেন। —অনুবাদক।]

(১)

জটাটবীগলজ্জলপ্রবাহপাবিতস্থলে
গলেঽবলম্ব্য লম্বিতাং ভুজঙ্গতুঙ্গমালিকাম্।
ডমড্ডমড্ডমড্ডমন্নিনাদবড্ডমর্বয়ং
চকার চণ্ডতাণ্ডবং তনোতু নঃ শিবঃ শিবম্॥

দুর্গম অরণ্য-সম জটার ভিতর,
কল্লোলিনী সুরধুনী থাকি' নিরন্তর,
বিস্তার করিয়া নিজ প্রবাহ অশেষ,
পবিত্র করেন সদা যাঁর গলদেশ;
সেই গলদেশে যিনি পরম ভীষণ
ভুজঙ্গের তুঙ্গমালা করিয়া ধারণ,
ডম্ ডম্ ডম্ ডম্ ডমরুর রবে
প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্য ধরেন এ ভবে,
পরম-মঙ্গলময় সেই ত্রিলোচন
করুন্ মোদের সদা মঙ্গল-বর্দ্ধন!

(২)

জটাকটাহসম্ভ্রমভ্রমন্নিলিম্পনির্ঝরী-
বিলোলবীচিবল্লরীবিরাজমানমূর্দ্ধনি।
ধগদ্ধগদ্ধগজ্জ্বলল্ললাটপট্টপাবকে
কিশোরচন্দ্রশেখরে রতিঃ প্রতিক্ষণং মম॥

পরম-প্রবল-বেগে জটার ভিতর
কল্লোলিনী সুরধুনী ছুটি নিরন্তর,
উত্তাল-তরঙ্গ-মালা করিয়া ধারণ
করিছে মস্তক যাঁর পরম শোভন;
প্রশস্ত ললাটে যাঁর প্রবল অনল
ধক্ ধক্ ধক্ ধক্ জ্বলে অবিরল;
বালচন্দ্র ভালে যাঁর শোভিছে সুন্দর,
তাঁহ'তেই প্রীতি মোর থাক নিরন্তর!

(৩)

ধরাধরেন্দ্রনন্দিনীবিলাসবন্ধুবন্ধুর-
স্ফুরদ্দিগন্তসন্ততিপ্রমোদমানমানসে।
কৃপাকটাক্ষধোরণীনিরুদ্ধদুর্দ্ধরাপদি
ক্বচিদ্দিগম্বরে মনো বিনোদমেতু বস্তুনি॥

প্রেমভরে শৈলসুতা শিবানী যখন
প্রেম কটাক্ষের শর করেন ক্ষেপণ,
তখনি হইয়া বিদ্ধ তাঁর সেই শরে
অবশ হয়েন যিনি আনন্দের ভরে;
বারেক লভিলে কৃপা-কটাক্ষ যাঁহার
কাহারো বিপৎ কভু নাহি থাকে আর;
আছে হেন বস্তু,—যাঁর নাম দিগম্বর,
তাঁহাতেই প্রীতি মোর থাক নিরন্তর।

(৪)

জটাভুজঙ্গপিঙ্গলস্ফুরৎফণামণিপ্রভা
কদম্বকুঙ্কুমদ্রবপ্রলিপ্তদিগ্বধূমুখে।
মদান্ধসিন্ধুরাস্ফুরত্ত্বগুত্তরীয়মেদুরে *
মনো বিনোদমদ্ভুতং বিভর্ত্তু ভূতভর্ত্তরি॥

যাঁহার জটায় রহে ভুজঙ্গ সকল,
তাদের পিঙ্গল-ফণা-মণি সুনির্ম্মল
মনোহর রক্তবর্ণ ধরি অবিরত
বোধ হয় ঠিক যেন কুঙ্কুমের মত;
কুঙ্কুম সমান সেই সুরম্য বরণে
শোভিত করেন যিনি দিগ্বধূগণে;
মদোন্মত্ত গজাসুরে করিয়া নিধন,
পুনশ্চ তাহার চর্ম্ম করিয়া গ্রহণ,
উত্তরীয় বস্ত্র-রূপে করি' পরিধান
শরীর শোভিত করা যাঁহার বিধান;
"ভূতনাথ"-বলি যাঁরে ডাকে ত্রিভুবন;
তাঁহাতেই মুগ্ধ হ'য়ে থাক্ মোর মন!

(৫)

ললাটচত্বরজ্বলদ্ধনঞ্জয়স্ফুলিঙ্গভা-
নিপীতপঞ্চসায়কং নমন্নিলিম্পনায়কম্।

* "মদান্ধসিন্ধুরস্ফুরত্ত্বগুত্তরীয়মেদুরে" ইতি পাঠান্তরম্।

সুধাময়ূখলেখয়া বিরাজমানশেখরং
মহঃ কপালি সম্পদে সরিজ্জটালমস্তু নঃ॥

যাঁর ভাল-নেত্রানল-স্ফুলিঙ্গ-কিরণ
ভস্মীভূত ক'রেছিল দুরন্ত মদন ;
স্বয়ং ইন্দ্রও আসি' মাথা নত করি'
প্রণাম করেন যাঁরে চিরদিন ধরি' ;
চন্দ্রকলা শিরে যাঁর শোভে অনিবার ;
সুরধুনী খেলা করে জটায় যাঁহার ;
নরের কপাল নিত্য করে যাঁর রয় ;
যাঁর মত নাহি কিছু মহাতেজোময় ;
সেই পরাৎপর, পূজ্য, দেব ত্রিলোচন
করুন্ মোদের সদা সম্পদ্ বর্দ্ধন !

(৬)

সহস্রলোচনপ্রভৃত্যশেষলেখশেখর-
প্রসূনধূলিধোরণীবিধূসরাঙ্ঘ্রিপীঠভূঃ।
ভুজঙ্গরাজমালয়া নিবদ্ধজাটজূটকঃ
শ্রিয়ে চিরায় জায়তাং চকোরবন্ধুশেখরঃ॥

কিবা ইন্দ্র, কিবা অন্য যত দেবগণ
মস্তকে পুষ্পের মালা করিয়া ধারণ,
যাঁর পাদপীঠে মাথা রাখি' নিরন্তর
পরাগে করিয়া দেয় পরম ধূসর ;
বাসুকি ভুজঙ্গ রাজে যাঁর জটারাশি
আবদ্ধ হইয়া রয়,—দেখি দিবানিশি ;
সেই দেব মহাদেব শশাঙ্ক-ভূষণ
করুন্ মোদের নিত্য মঙ্গল-সাধন !

(৭)

করালভালপট্টিকাধগদ্ধগদ্ধগজ্জ্বল-
দ্ধনঞ্জয়াহুতীকৃতপ্রচণ্ডপঞ্চসায়কে।
ধরাধরেন্দ্রনন্দিনীকুচাগ্রচিত্রপত্রক-
প্রকল্পনৈকশিল্পিনি ত্রিলোচনে মতির্মম॥

ভীম ভালপট্টে যাঁর ধক্ ধক্ করি'
জ্বলিতেছে হুতাশন চিরদিন ধরি' ;—
সেই হুতাশন-মধ্যে মদনে ধরিয়া
ফেলিয়া দিলেন যিনি আহুতি বলিয়া ;
শৈল-সুতা শিবানীর কুচাগ্র-কমলে
পরম-সুন্দর পত্র-রচনা-কৌশলে
যাঁর মত শিল্পী আর না দেখি কখন,
সেই ত্রিলোচনে মুগ্ধ থাক্ মোর মন !

(৮)

নবীনমেঘমণ্ডলীনিরুদ্ধদুর্দ্ধরস্ফুরৎ-
কুহূনিশীথিনীতমঃপ্রবন্ধবদ্ধকন্ধরঃ।
নিলিম্পনির্ঝরীধরস্তনোতু কৃত্তিসুন্দরঃ
কলানিধানবন্ধুরঃ শ্রিয়ং জগদ্ধুরন্ধরঃ॥

অমাবস্যা-রজনীর নিশীথ-সময়
নবীন-জলদ-জালে পূর্ণ যদি হয়,
তাহা হ'লে হয় যথা ঘোর অন্ধকার,
সেইরূপ কৃষ্ণবর্ণ কণ্ঠদেশ যাঁর ;
মস্তকে ধরিয়া রন্ যিনি সুরধুনী ;
করি-চর্ম্মে সুশোভিত যাঁর দেহখানি ;
চন্দ্রকলা-সুশোভিত শিরোদেশ যাঁর ;
ধরিয়া আছেন যিনি ত্রিলোকের ভার ;
সেই দেব দিগম্বর কৈবল্য-কুশল
করুন মোদের সদা পরম মঙ্গল !

(৯)

প্রফুল্লনীলপঙ্কজপ্রপঞ্চকালিমপ্রভা-
বলম্বিকণ্ঠকন্দলীরুচিপ্রবদ্ধকন্ধরম্।

"প্রফুল্লনীলপঙ্কজপ্রপঞ্চকালিমচ্ছটা-
বিড়ম্বিকণ্ঠকন্ধরারুচিপ্রবন্ধকন্ধরম্।" ইতি পাঠান্তরম্।

স্মরচ্ছিদং পুরচ্ছিদং ভবচ্ছিদং মখচ্ছিদং
গজচ্ছিদান্ধকচ্ছিদং তমন্তকচ্ছিদং ভজে ॥ *

প্রস্ফুটিত-নীল-পদ্ম-সমূহের মত
নীলবর্ণে কণ্ঠ যাঁর শোভে অবিরত ;
ভস্ম করিলেন যিনি দুরন্ত মদন ;
ত্রিপুর-নাশের যিনি বিশেষ কারণ ;
যাঁহার কৃপায় নাহি থাকে ভব ভয় ;
করিয়াছিলেন যিনি দক্ষযজ্ঞ লয় ;
দুষ্ট গজাসুরে যিনি মারিলেন প্রাণে ;
অন্ধক-রিপুরে যিনি বধিলেন রণে ;
যম-ভয়-বিনাশের যিনিই কারণ ;
ভক্তিভরে ভজি সেই শিবের চরণ !

(১০)

অখর্ব্বসর্ব্বমঙ্গলাকলাকদম্বমঞ্জরী-
রসপ্রবাহমাধুরীবিজৃম্ভণামধুব্রতম্।
স্মরান্তকং পুরান্তকং ভবান্তকং মখান্তকং
গজান্তকান্ধকান্তকং তমন্তকান্তকং ভজে ॥

যিনি সর্ব্ব মঙ্গলার চৌষট্টি কলার
মঞ্জরী-মধুর-রসে ভৃঙ্গ অনিবার ;
ভস্ম করিলেন যিনি দুরন্ত মদন ;
ত্রিপুর-নাশের যিনি পরম কারণ ;
বিনাশ করিয়া দেন যিনি ভব-ভয় ;
করিয়াছিলেন যিনি দক্ষযজ্ঞ লয় ;
দুষ্ট গজাসুরে যিনি বধিলেন প্রাণে ;
অন্ধক-রিপুরে যিনি মারিলেন রণে ;
যম-রাজাকেও যিনি করেন নিধন ;
ভক্তিভরে ভজি সেই শিবের চরণ !

(১১)

জয়ত্যদভ্রবিভ্রমভ্রমদ্ভুজঙ্গমশ্বসদ্-
বিনির্গমৎক্রমস্ফুরৎকরালভালহব্যবাট্। †
ধিমিদ্ধিমিদ্ধিমিদ্ধ্বনন্মৃদঙ্গতুঙ্গমঙ্গল- ‡
ধ্বনিক্রমপ্রবর্ত্তিতপ্রচণ্ডতাণ্ডবঃ শিবঃ ॥

পরম-প্রবল বেগে ভুজঙ্গ-নিকর
ভ্রমণ করিয়া সদা জটার ভিতর,
নিশ্বাস প্রশ্বাস দীর্ঘ ধরি’ অবিরল
ভীষণ করিছে যাঁর ললাট-অনল ;
লইয়া মৃদঙ্গ যিনি মঙ্গল-কারণ
ধিম্ ধিম্ ধিম্ ধ্বনি করি’ অনুক্ষণ,
ধরেন তাণ্ডব-নৃত্য হইয়া তন্ময় ;
জয় জয় জয় সেই শঙ্করের জয় !

(১২)

দৃষদ্বিচিত্রতল্পয়োর্ভুজঙ্গমৌক্তিকস্রজো-
র্গরিষ্ঠরত্নলোষ্টয়োঃ সুহৃদ্বিপক্ষপক্ষয়োঃ।
তৃণারবিন্দচক্ষুষোঃ প্রজামহীমহেন্দ্রয়োঃ
সমপ্রবৃত্তিকঃ কদা সদাশিবং ভজাম্যহম্ ॥ §

কিবা সে প্রস্তর, কিবা রম্য শয্যা আর,
কিবা সর্প, কিবা আর রম্য মুক্তাহার,
কিবা লোষ্ট্র, কিবা আর অমূল্য রতন,
কিবা শত্রু, কিবা আর মিত্র যেইজন,
কিবা তৃণ, কিবা আর সুন্দরী রমণী,
কিবা প্রজা, কিবা আর নৃপ-শিরোমণি,—
এই সবে সমভাবে হেরি’ সর্ব্বক্ষণ,
কবে সেই শঙ্করের পূজিব চরণ !

* “গজচ্ছিদান্ধকচ্ছিদং” ইত্যপি পাঠঃ।

† “জয়ত্বদভ্রবিভ্রমভ্রমদ্ভুজঙ্গমস্ফুরদ্-
ধগদ্ধগদ্বিনির্গমৎকরালভালহব্যবাট্।” ইতি বা পাঠঃ।

‡ “ধিমিদ্ধিমিদ্ধিমিধ্বনন্মৃদঙ্গতুঙ্গমঙ্গল” ইত্যপি পাঠঃ।

§ “সমং প্রবর্ত্তয়ন্ মনঃ কদা সদাশিবং ভজে” ইতি পাঠান্তরম্।

(১৩)

কদা নিলিম্পনির্ঝরীনিকুঞ্জকোটরে বসন্
বিমুক্তদুর্মতিঃ সদা শিরঃস্থমঞ্জলিং বহন্।
বিলোললোললোচনাললামভাললগ্নকং *
শিবেতি মন্ত্রমুচ্চরন্ সদা সুখী ভবাম্যহম্॥

সুরধুনী-তীরবর্ত্তি নিকুঞ্জ ভিতরে
বসতি করিয়া আমি মহা-ভক্তি-ভরে,
পরিহার করি' মোর দুর্ম্মতি প্রবল,
মস্তকে অঞ্জলি-পুট ধরি' অবিরল,
রমণীর শিরোমণি দেবী অম্বিকার
কপালে যে শিবমন্ত্র লেখা অনিবার;
কবে সেই শিবমন্ত্র করি' উচ্চারণ
পরম নির্ম্মল সুখে যাপিব জীবন!

(১৪)

নিলিম্পনাথনাগরীকদম্বমৌলিমল্লিকঃ-
নিগুম্ফনির্ভরক্ষরন্মধূষ্ণিকামনোহরঃ। †
তনোতু নো মনোমুদং বিনোদিনীমহর্নিশং
পরশ্রিয়ঃ পরং পদং তদঙ্গজত্বিষাং চয়ঃ॥

দেবরাজ বাসবের অপ্সরা-নিকর
বিনত-মস্তকে শিব-চরণ উপর
প্রণাম করেন যবে ভক্তিভরে গিয়া,
তাঁদের মল্লিকা-মধু-তরঙ্গ লাগিয়া
শিবের দেহের বর্ণ করে মনোহর;
যে বর্ণে ভক্তের হয় শুভ নিরন্তর,
দিবানিশি সেই তাঁর সুন্দর বরণ
করে যেন আমাদের আনন্দ-বর্দ্ধন!

(১৫)

প্রচণ্ডবাড়বানলপ্রভা শুভপ্রচারিণী
মহাষ্টসিদ্ধিকামিনীজনাবহূতজল্পনা।
বিমুক্তবামলোচনাবিবাহকালিকধ্বনিঃ
শিবেতিমন্ত্রভূষণা জগজ্জয়ায় জায়তাম্॥

প্রচণ্ড-বাড়বানল-সম অমঙ্গল
বিনষ্ট করিয়া দেয় যাহা অবিরল;
অণিমাদি-অষ্টবিধ-সিদ্ধি-প্রদায়িনী
ব্রহ্মাণী-প্রভৃতি যত সুর-সীমন্তিনী,
আনন্দ-সাগর-তলে হইয়া মগন
করিয়াছিলেন যাহা মুখে উচ্চারণ;
সুলোচনা পার্ব্বতীর বিবাহ-সময়
সেই "শিব-শিব"-মন্ত্র-ধ্বনি শিবময়
চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ
আমার ত্রিলোক-জয়ে হউক কারণ!

(১৬)

ইমং হি নিত্যমেবমুক্তমুত্তমোত্তমং স্তবং
পঠন্ স্মরন্ ব্রুবন্ নরো বিশুদ্ধিমেতি সন্ততম্।
হরে গুরৌ সুভক্তিমাশু যাতি নান্যথা গতিং
বিমোহনং হি দেহিনাং সুশঙ্করস্য চিন্তনম্॥

এ "শিব-তাণ্ডব-স্তব" রাবণ-রচিত,
পরম উত্তম স্তব নাহি যার মত;
গ্রন্থ দেখি' ইহা নিত্য পঠিতে পঠিতে,
স্মরিতে স্মরিতে কিংবা বলিতে, বলিতে,
চিত্ত-শুদ্ধি পায় লোক, জানিও নিশ্চয়,
শিব-পদে ভক্তি রাখে,—অন্যথা না হয়।
যেই জন শিব-চিন্তা করে অবিরত,
নিশ্চয় হইবে তার মন বিমোহিত!

(১৭)

পূজাবসানসময়ে দশবক্ত্রগীতং
যঃ শম্ভুপূজনমিদং পঠতি প্রদোষে।

* "বিমুক্তলোললোচনো ললামভাললগ্নকঃ",
"বিমুক্তলোললোচনা ললামভাললগ্নক" ইত্যপি পাঠৌ দৃশ্যেতে।

† "মধুলিকামনোহরঃ," "মধুষ্ণিকামনোহরঃ" ইত্যপি পাঠান্তরে বর্ত্তেতে।

তস্য স্থিরাং রথগজেন্দ্রতুরঙ্গযুক্তাং
লক্ষ্মীং সদৈব সুমুখীং প্রদদাতি শম্ভুঃ ॥

এ "শিব-তাণ্ডব-স্তোত্র" রাবণ-রচিত
পূজাশেষে যেই জন হ'য়ে অবহিত
সন্ধ্যার সময়ে নিত্য করে উচ্চারণ,
তার প্রতি সুপ্রসন্ন হন্ ত্রিলোচন।
কিবা অশ্ব, গজ, রথ, – শম্ভুর কৃপায়—
সেই জন সুনিশ্চয় পাইবে ধরায়!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট-সাগর।

একবিন্দু।

অলখ অসীম হে মহামহিম!
তোমারে কি যায় ধরা?

আমি মেকির কাঙাল অনাথ আতুর
ফকীরি করিয়া হয়েছি ফতুর
কি সাধ্য আমার—হে শুদ্ধ ঠাকুর!
তোমার প্রতিমা গড়া?

তবু শত বিশেষণে তোমারে সাজাই
নূপুর পরায়ে নিকুঞ্জে নাচাই
ঘটা করে কত ঘণ্টা বাজাই
বিজয় গরবে ভরা!

তুমি ভূমা-ব্যোম-সোম-দিগম্বর
তোমারে কি সাজে বাঘের অম্বর?
সাধ্য কি আমার ওহে বিশ্বম্ভর!
তোমারে ওজন করা?

তবু পূর্ণানন্দে কভু—পর্ণপটে আঁকি
শিবশম্ভু বলে কম্বুনাদে ডাকি
রুদ্ররূপী দেবে বন্দী করে রাখি
মাটির মন্দির মঠে!

আঁধারে তুমি যে অমিয় ইন্দু
বসুধার বুকে সুধার সিন্ধু
ঢেলে দাও প্রভু শুধু একবিন্দু
আমার এ ক্ষুদ্র ঘটে!

শ্রীকুলচন্দ্র দে।

ব্রহ্মানন্দ।

"এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।"—শ্রুতিঃ।

সুধার সাগরে নিমজ্জিত থাকিয়া আজ ক্ষুৎপিপাসায় চীৎকার করিতেছি! বিমল কৌমুদী-পুলকিতা যামিনীতে আজ ভৈরবী তমিস্রার ঔপাধিক দৃশ্য মানস-পটে প্রতিভাত হইতেছে! বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত ক্ষীরোদের পীযূষ সলিলে আজ জগদ্বিধ্বংশকারী গরলোৎক্ষেপের অনুভূতি অন্তঃকরণে আসিয়া জাগিতেছে! আজ সুমন্দ মলয়ের সুধীর হিল্লোলে অমরেপ্সিত পারিজাতের অপূর্ব্ব কাব্যময় নৃত্যকে প্রপঞ্চ জগতের প্রলয়-সম্ভব ভীষণ বিকম্পন বলিয়া ধারণা হইতেছে! ধনধান্যে ঐশ্বর্য্যবতী পৃথ্বীতলকে আজ মরুমরীচিকার বিকট ভ্রূভঙ্গিস্থল ও মর্ম্মস্পর্শী বিদ্রূপ-লহরী-লীলার কেন্দ্র বলিয়া অনুভূতি হইতেছে! চিরশান্তিময়ী ব্রহ্মানন্দোৎসারিণী বৈকুণ্ঠপুরীতে আজ ঘৃণিত তামসিক কুণ্ঠোপলব্ধি আসিয়া হৃদয়কে তিমিরক্লিন্ন করিয়া তুলিল! হায়! হায়। জ্ঞান-সূর্য্য আজ মায়িকাবরণে মেঘাবৃত হইল! চতুর্দ্দিকেই আজ মিথ্যারোপ, প্রপঞ্চ-লীলা, ভ্রম-কুহেলিকা! হে ভগবন্! আজ জ্ঞান-চৈতন্য সংমূঢ় হইল! ইন্দ্রিয়বৃত্তি যেন নিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে। হে হৃষীকেশ! আমার ইন্দ্রিয়-শক্তিকে চৈতন্যরূপিনী করিয়া ব্রহ্মানন্দদর্শিনী, ব্রহ্মানন্দানুসারিণী করুন।

এ জগতে আনন্দ-স্ফূরণ কোথায় নাই? ঐ দেখ সদ্যোজাত শিশুটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাণিপাদ সঞ্চালন করিয়া কেমন ক্রীড়া করিতেছে! স্বর্গীয় লাবণ্যের তরল তরঙ্গ যেন উহার প্রতি লোমকূপে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। মরি! মরি! কি প্রাণতোষিণী হাসির কৌমুদী উহার ক্ষুদ্রাধরে নৃত্য করিতেছে; যেন বিকচ পারিজাত কুসুমটী বালার্ক-রশ্মি-স্নাত হইয়া আজ ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে! শিশুর ঐ সুধামাখা হাসিটুকু সামান্য নহে। উহা মহাসমুদ্রের একটী কণা! আনন্দ সমুদ্রের একটী বিন্দু—একটী স্ফূরণ! ঐ হাসিটুকু যেন নির্ম্মল পদ্ম-মধু। উহাতে সত্ব, রজ, তম গুণের স্পর্শ নাই—পঙ্কিলতা নাই। ঐ শিশুটী যেন ব্রহ্মোপসেবিত মানস-সরোবরের একটি দুর্লভ কমল! উহার স্পর্শেও যেন পৃথিবী পবিত্রা হইয়াছেন। উহার সৌরভে যেন পৃথিবী গৌরবান্বিতা ও মনোহারিণী হইয়াছেন!

ঐ যে যুবক তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, দেখ দেখি, উহার যৌবন-সুলভ লাবণ্যের কি মনোহারিণী স্ফূর্ত্তি? নবনীত-কোমল দেহে যেন কুসুম-কান্তি ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে! প্রশান্ত ললাট যেন জ্ঞান-সূর্য্যের গৌরব-রশ্মিতে দীপ্তিমান্ বলিয়া বোধ হইতেছে। প্রফুল্ল নয়ন-যুগলে যেন সাহস ও গর্ব্বোৎসাহের পূর্ণ প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত দৃষ্ট হইতেছে! ভ্রমর-কৃষ্ণ চাচর চিকুরের সহিত নীরজ-সুন্দর দেহ-কান্তির কি অপূর্ব্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিস্ফূটরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে। যুবক যেন একখানি আনন্দের ছবি; যেন রাফেলের একখানি মনোহর কল্পনা; যেন স্বপ্নরাজ্যের একজন মধুর প্রেমিক;

যেন স্বপ্ন-সমুদ্রের একটী কৌস্তুভ মণি! যুবক যেন একটী আনন্দের তরঙ্গ; তর তর করিয়া, হাসিতে হাসিতে, দুলিতে দুলিতে, আপন গৌরবে, আপন সৌরভে পৃথিবীর উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে! মহাসমুদ্রের মহিমা-ময়ী স্ফূর্ত্তি যেন এই তরঙ্গটীর আপাদ-মস্তকে দীপ্তিশালিনী বলিয়া বোধ হইতেছে।

ঐ যে বৃদ্ধটী বসিয়া আছে, দেখ দেখি উহার জ্ঞান গাম্ভীর্য্য কি মধুর—কি তৃপ্তিকর—কি শান্তিভাবোদ্দীপক! মরি! কি সুন্দর রজতশুভ্র কেশকলাপ, আ-নাভিলম্বিত তুষার-ধবল শ্মশ্রু-রাজি, শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্র-মথিত জ্ঞান-গরিষ্ঠ মুখাবয়ব! মরি কি সুন্দর ব্যাস-বশিষ্ঠোপম গরীয়সী দেহলতা! দেখিলেই মনে হয়, যেন পূতসলিলা, অমৃততোয়া, মন্দাকিনীর একটী পবিত্র, জ্ঞান-তপন-কিরণ-শুভ্র, শান্তিময়, সুমিষ্ট, তরঙ্গ, স্বপ্ন-লহরীর মত লীলা করিতে করিতে, সুমন্থর গতিতে পৃথিবীর উপর দিয়া, আনন্দ বিকীর্ণ করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে! বৃদ্ধ ত নহে, যেন একটী আনন্দ-লহরী, যেন জ্ঞান-বাঁশরীর একটী টোড়ী-রাগিণী! যেন বাসন্তি মলয়ের কুসুমকাননচারী একটী সান্ধ্যোচ্ছাস! বৃদ্ধ ত নহে, যেন সেক্ষপীয়র, ট্যাসো বা কালিদাসের অমৃতময়ী লেখনী-নিঃসৃত একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য! যেন অমৃতোদ্‌গারী জ্ঞান-শৈল-সুলভ নির্ঝর! বৃদ্ধ যেন একটী আনন্দ-পীযূষস্রাবী কাম-ধেনু! আনন্দ মহাসমুদ্রের একটী মহিমাময় তরঙ্গ!

ঐ যে কলনাদিনী, অনন্ত-প্রসারিণী ভাগীরথী তোমার সম্মুখে নাচিয়া নাচিয়া সাগরা-ভিমুখে চলিয়াছে, দেখ দেখি, স্বর্গীয় আনন্দের কি অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি উহার গতিতে পরিব্যক্ত হইতেছে! উহার কল-নাদে কি যেন এক অজানা দেশের প্রাণোন্মাদকারিণী গীতির স্মৃতি ধীরে ধীরে প্রাণে আসিয়া জাগিতেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন কর্ম্ম-কঠোর, গন্ধময়, রূঢ় ভাবগুলি উষালোকোদ্‌ভাসিত নক্ষত্রের মত একটী একটী করিয়া তিরোহিত হইতেছে! ভাগীরথীর তরঙ্গকদম্বের কি মনোমোহিনী নৃত্য-ভঙ্গি! পূর্ণানন্দের পূর্ণোচ্ছ্বাস যেন ঐ তরঙ্গের নৃত্যভঙ্গিতে প্রকাশ পাইতেছে। সলিল ত নহে, যেন সঞ্জীবনী পীযূষ-ধারা! দেখিলে নয়ন সুশীতল হয়, অবগাহনে শরীরের মলিনতা দূর হয়, ভাবিলেও চিত্ত-বৈকল্য বিদূরিত হইয়া যায় ও অন্তঃকরণ কৌমুদীবিমল আনন্দরসে পরিপ্লুত হইতে থাকে। আহা, এমন ব্রহ্মানন্দের আনন্দছবিও আজ চক্ষের সম্মুখে প্রকট রহিয়াছেন, যাঁহার গুণ-কীর্ত্তনেও জিহ্বার জাড্য বিনষ্ট হইয়া যায়! পতিত-পাবনী, শঙ্কর-মৌলী বিহারিণী, জীবোদ্ধারিণী মা আমার যেন নিত্যানন্দের নির্ঝরিণী! পুত্রকলত্র-বিয়োগ-বিধুর ব্যক্তিও এই আনন্দময় আলেখ্যটীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহার শোকোদ্বেগ প্রশমিত হইয়া যায়। মা আমার ব্রহ্মানন্দের পূর্ণস্বরূপিনী!

মস্তকোপরি একবার দৃষ্টিপাত কর দেখি! মরি! কি সুন্দর, সুনির্ম্মল, সুবিরাট্ দেহ বিস্তার করিয়া গগন শোভা পাইতেছে। রঙ্গশালার অঙ্ক-পর্দ্দাঙ্কের মত মুহুর্মুহু ঐ গগনমণ্ডলে কত অদ্ভুত দৃশ্যেরই সুন্দরাভিনয় হইতেছে! ধিক্ মনুষ্য-বুদ্ধিকে! আজ

সামান্য সীমাবদ্ধ ক্ষমতা লইয়া একটী অতি তুচ্ছ অভিনয়ে আপনাকে কৃতী মনে করিয়া গর্ব্বোৎফুল্লচিত্তে কালযাপন করে, সামান্য অভিনয় দর্শনের জন্য আকুলতা ব্যাকুলতা প্রদর্শন করে। কিন্তু, তাহার মাথার উপরে যে পলে পলে অতি মধুর, অতি আশ্চর্য্য, গভীর-শিক্ষাপ্রদ, নৈসর্গিক অভিনয় হইতেছে, তাহা ভ্রমেও একবার হৃদয়ঙ্গম করিবার প্রয়াস পায় না। তাই বলি, মনুষ্য বুদ্ধিকে ধিক্? ঐ গগনমণ্ডলে কখন প্রভাকর উদয় হইয়া বিদ্যুদালোক প্রদান পূর্ব্বক দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিতেছে; কখন বা হেম-কমলিনী-প্রতিম সুধাংশু প্রস্ফুটিত হইয়া কৌমদী-সুধায় তৃণতরুলতাম্বরা পৃথিবীকে নিমগ্ন করিতেছে! কখন বা গগনমণ্ডল অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জে পরিশোভিত হইয়া অয়স্কান্ত, নীলকান্ত, পদ্মরাগ প্রভৃতি মণিমাণিক্য-খচিত চন্দ্রাতপ বলিয়া অনুভূত হইতেছে! কখনও বা ধূম্রকায় ঐরাবত সদৃশ জলদপটলাচ্ছন্ন হইয়া গম্ভীর নির্ঘোষে নির্ঘোষিত হওয়ায় ভীষণ সমরাঙ্গন বলিয়া বোধ হইতেছে! কাশকুসুমশুভ্র মেঘখণ্ড কখনও হয় হস্তী-কুরঙ্গ-বিহঙ্গ প্রভৃতি জীব জন্তুর প্রতিকৃতি ধারণ করিতে করিতে স্বপ্নবিহারিণী চিত্রাবলীর মত চক্ষুর উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে! কখনও বা কাঞ্চনচূর্ণমণ্ডিত কলেবরে, অথবা লোহিত, জরদ প্রভৃতি রাগে রঞ্জিত হইয়া নয়নের তৃপ্তিসাধন করতঃ সর্ব্বব্যাপিনী হ্লাদিনী শক্তির বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন করিতেছে! সুনির্ম্মল শোভায় সত্ত্বগুণের, গ্রহাদির আবির্ভাব-তিরোভাব প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপে রজঃ গুণের এবং ঘন-ঘটাচ্ছন্ন হইয়া তমোগুণের অভিনয় ঐ গগনমণ্ডলে নিয়ত অভিনীত হইতেছে; ব্রহ্মানন্দের স্ফূর্তির বিরাম নাই—বিশ্রান্তি নাই। নিরবচ্ছিন্নভাবে একটানা স্রোতে এই মনোহারিণী আনন্দলহরী মাথার উপরে ঐ সুবিরাট নভোমণ্ডলে অকূল সমুদ্র-তরঙ্গ মত ছুটিয়া ছুটিয়া নাচিয়া নাচিয়া তালে তালে চলিতেছে। মরি! মরি! চতুর্দ্দিকেই কত রমণীয় অভিব্যক্তি! কি প্রাণতোষিণী, শান্তি-বিধায়িনী, উন্মাদকারিণী অনুভূতি!

নবীন-কিসলয়মণ্ডিত বৃক্ষ'পরি ঐ দেখ কলকণ্ঠ কি সুন্দর গাহিতেছে! ঐ দেখ সুরভি কুসুমে কুসুমিতা লতাটি হাস্যময়ী মনোহারিণী রমণীর মত তরুটিকে কেমন প্রেমালিঙ্গনে ধরিয়া রাখিয়াছে! পাঠক! নয়ন হইতে বিষয়-কর্কশ স্বার্থাবরণ দূরে নিক্ষেপ কর; একবার জ্ঞান-স্ফটিকের চশমা চক্ষে দিয়া দেখ কি মধুর আনন্দ—কি সঞ্জীবনীসুধার্ণব তোমার চারিদিকে উদ্বেলিত, তরঙ্গায়িত হইতেছে। সেই ব্রহ্মানন্দের তরঙ্গাঘাতে ঐ দেখ তরুটি কেমন দুলিতেছে, দেখ দেখ কিসলয়গুলি কেমন তর তর করিয়া নড়িতেছে। মরি! মরি! ঐ দেখ আনন্দ-সমুদ্রের দিব্যাভা কুসুম-দামের উপর, ঐ দেখ কিসলয়-নিচয়ের উপর কেমন প্রতিভাত হইয়াছে! কুসুম তো নহে, যেন আনন্দ ফোঁটা ঝর ঝর করিয়া লতার উপর ঝরিয়া পড়িয়াছে। মরি! মরি! কি সুন্দর, কি মধুর, কি মনোহর সুমন্দ সমীর-স্পর্শে লতাটি কি সুন্দর দুলিয়া দুলিয়া তরুর উপর পড়িতেছে। সমীর-স্পর্শে তো নহে, যেন ব্রহ্মানন্দের প্রাণস্পর্শী লহরী-স্পর্শেই লতাটি ঐ মধুর দোলনে দুলিয়া দুলিয়া তরুবরের

অঙ্গ সুশীতল করিতেছে। মরি মরি! ঐ তরুটিও প্রেমের অন্তর্দ্দশাগ্রস্ত সমাধিস্থ সিদ্ধ পুরুষের মত যেন বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া পরমানন্দ-রসপানে বিভোর রহিয়াছে। ঐ শুন কলকণ্ঠের কি প্রাণস্পর্শী তান! আহা স্বর যেন "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো"। ঐ স্বরে যেন প্রাণের কত-কি-কথা সুদূর স্বপ্নের মত একটী একটী করিয়া জাগিয়া উঠিতেছে! ঐ স্বর যেন বহিরঙ্গাসক্তি নিবৃত্ত করিয়া হৃদয়কে অন্তর্ম্মুখ করিয়া তুলিতেছে! ঐ স্বরে যেন বেশ স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে, এই প্রপঞ্চ জগত ব্রহ্মানন্দের তরঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে; যেন বলিয়া দিতেছে যে, আমরা আনন্দ-সমুদ্রের আনন্দ-লহরী; উদ্ভূত হইয়াছি, নৃত্য করিতেছি, আবার সুবিপুল, সুবিরাট, আনন্দ সমুদ্রেই লীন হইব।

শুধু কলকণ্ঠ কেন? ঐ শুন পাপিয়ার পিয়া পিয়া ঝঙ্কার, ঐ শুন শ্যামার সুললিত বীণানিন্দিত নিক্কণ-লহরী, ঐ শুন দয়েল-সংগীত! কি মধুর আনন্দোচ্ছ্বাস! ঐ দেখ অতি তুচ্ছ একটী মধুকর কেমন সুন্দর গুন গুন করিতে করিতে, কেমন সুন্দর সুমিষ্টতানের ক্ষুদ্র লহরী তুলিয়া ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতেছে! মরি মরি! মধুকর তো নহে, যেন অমৃত কণা! বিহঙ্গম তো নহে, যেন আনন্দ নির্ঝর! ব্রহ্মাণ্ডের যেদিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই আনন্দোচ্ছ্বাস—আনন্দ-তরঙ্গ! সৌর জগৎ-সজ্জা, নাক্ষত্রিক দৃশ্য প্রভৃতি যাবতীয় পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ, সেই সর্ব্বব্যাপিনী চৈতন্য-রূপিনী হ্লাদিনী শক্তির স্ফুরণ—ব্রহ্মানন্দের লীলাময় তরঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, স্ত্রী-পুরুষ, পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গম সকলেই ঐ আনন্দের এক একটী সুন্দর ছবি—এক একটী প্রকৃষ্ট মূর্ত্তি! তাই বলিতেছিলাম, আমরা এমন সুধার সাগরে নিমজ্জিত থাকিয়া আজ ক্ষুৎপিপাসায় চীৎকার করিতেছি। এমন আনন্দ সমুদ্রের অংশ হইয়া—লীলাময় তরঙ্গ হইয়া, আজ কিনা নিরানন্দের অলীক কল্পনা করতঃ কল্পিত দুঃখে দুঃখিত হইতেছি! আজ স্নেহবতী জননীর কোলে থাকিয়া মাতৃবিয়োগ-দুঃখ কল্পনা করতঃ 'মা, মা' বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেছি! চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সামগ্রী উপভোগ করিতে করিতে অনশনে প্রাণ বহির্গত হইল বলিয়া নয়নজলে ভাসিতেছি! প্রেমময়ী সহধর্ম্মিণীর বাহু-লতার সোহাগালিঙ্গনে আবদ্ধ থাকিয়া আজ বিরহ-কল্পনা করতঃ হৃদয়ে দারুণ শেলাঘাত অনুভব করিতেছি! ইহাপেক্ষা হাস্যকর বিষয় আর কি হইতে পারে? জলের তরঙ্গ জল ভিন্ন আর কিছুই নহে; তদ্রূপ, আনন্দের তরঙ্গ আনন্দ ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

তবে কি দুঃখ বলিয়া পদার্থ নাই? তবে কি নিরানন্দের অস্তিত্ব নিতান্তই কাল্পনিক? তবে কি সাংখ্যোক্ত ত্রিতাপ অমূলক কল্পনা-প্রসূত জল্পনা? ঐ যে তোমার সম্মুখে পতিহীনা যুবতী ম্রিয়মানা হইয়া অধোবদনে নয়নজলে ভাসিতেছে, উহার দুঃখ কি দুঃখ নহে? আহা সুকেশীর কুসুম-নির্য্যাস-সিক্ত কাক-কৃষ্ণ কুন্তল-তরঙ্গের মাঝে সে কুসুমদামের মনোহারিণী হাসির ছটা কই? অথবা গুরুনিতম্বলম্বিত কাল-ভুজঙ্গিনী-তুল্য

যুবক-নয়নাভিরাম সে বেণীই বা কই ? অধর-পল্লবে সে মনোহারিণী হাসিই বা কোথায় গেল ? প্রেমপ্রফুল্ল আঁখির সে স্বপ্নময়ী, কাব্যময়ী, হাস্যময়ী, সুমিষ্ট চাহনিটুকুই বা কোথায় গেল ! আহা দুঃখানলে দগ্ধ হইয়া ঐ দেখ রমণী এখন যৌবন বৃদ্ধা হইয়াছে ! সাধের কুন্তলে এখন জটা বাঁধিয়াছে ; যে আঁখিতে হাসি, প্রীতি, প্রেম, ঝর ঝর করিয়া নিরন্তর ঝরিত, সেখানে এখন শত শত "তারাকারা ধারা" বহিতেছে ! মধুর বিম্বোজ্জ্বল ওষ্ঠাধর হাস্যতরঙ্গে ঈষৎভিন্ন হইলে মুক্তাশ্রেণীবৎ দন্তশ্রেণীর যে বিকাশ হইত, এখন দুঃখানলের অসহ্য তাপে সেই বিম্বাধরে দেখ কালিমা পড়িয়াছে ! মরি মরি ! পতিহীনা নারীকে দেখিলেই বোধ হইতেছে যে, উহার মত জন্মদুঃখিনী আর নাই। আনন্দপূর্ণ পৃথিবীতে এটীও কি আনন্দের দৃশ্য ? পতিবিরহিনী, শোকসন্তপ্তা রমণীর এই দুঃখ কি তবে দুঃখ নহে ?

ঐ যে পুত্রশোকে জননী আজ রোরুদ্যমানা, আলুলায়িতকেশা, ভূম্যবলুণ্ঠিতা, জীবন্মৃতা, উন্মাদিনী সদৃশী হইয়া রহিয়াছেন ! ঐ যে প্রণয়িনী-বিয়োগে যুবকটী বজ্রাহত তরুর মত দগ্ধহৃদয়ে সংসারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে ! ঐ যে ভ্রাতৃবিপদে বিপন্না স্ত্রী স্বামীর নিকটে দীনদুঃখিনীর ন্যায়, পাগলিনীর মত একাকিনীই নিশাকালে ছুটিয়াছেন ! ঐ যে সূর্য্যমুখীর বিরহে নগেন্দ্র আজ দেশে দেশে পথে পথে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া আকুলপ্রাণে তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন ! ঐ যে ছিন্ন লতিকাটির মত লাবণ্যলতা জনক-দুহিতা মৈথিলী আজ অশোক-বনে নিষ্ঠুর রাক্ষস কর্ত্তৃক দলিত হইতেছেন ! ঐ যে দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া শকুন্তলা আজ অন্তঃকরণে দারুণ শেলাঘাত ধারণ করিয়াছেন ! ঐ যে প্রাণের অভিমন্যু অন্যায় সমরে সপ্তরথী কর্ত্তৃক আজ অন্যায়ভাবে বিনষ্ট হওয়ায় মহাপ্রাজ্ঞ অর্জ্জুনও শোকোদ্বেলিত হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন ! এগুলি কি তবে দুঃখ নহে ? জাগতিক প্রপঞ্চ যদি সকলই আনন্দোচ্ছ্বাস মাত্র, তবে এ দুঃখগুলিকেও কি আনন্দোচ্ছ্বাস বলিয়া বুঝিতে হইবে ?

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥—গীতা ২।১৪ ॥

যাহাকে আমরা দুঃখ বলিতেছি, সাংখ্য যাহাকে ত্রিতাপ বলিতেছেন, কিম্বা যাহাকে আমরা সুখ বলিতেছি, প্রকৃতপক্ষে তাহা অতি তুচ্ছ। সুখ দুঃখ দুইটী স্বতন্ত্র জিনিস নহে। একটী অন্যটীর রূপান্তর মাত্র। উভয়ই ইন্দ্রিয়-সংসর্গ-সম্ভূত। উভয়ই উৎপত্তি-বিনাশশীল। উভয়ই অনিত্য। সেইজন্যই ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন যে, "সুখ দুঃখ উভয়কেই সহ্য কর।" সুখ যদি সদ্বস্তু ও দুখ হইতে স্বতন্ত্র হইবে, তবে "সহ্য কর" একথা বলিবেন কেন ? "উভয়কেই সহ্য কর", এই কথা বলায় ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে,মূলতঃ উভয়ই এক। এতদ্ভিন্ন আর একটু বিবেচনা করিলে, দেখা যায় যে, সুখ ও দুঃখ দুইটী আপেক্ষিক সম্বন্ধ-বাচক শব্দ। সুখ বলিলেই দুঃখের কল্পনা করিতে হইবে। দুঃখের কল্পনা

ব্যতীত সুখের ধারণা অসম্ভব, এবং সুখের কল্পনা ব্যতীত দুঃখের ধারণাও অসম্ভব। আমরা যাহাকে দুঃখের অবস্থা বলিতেছি, অন্য কাহারও নিকট সেটী হয়ত সুখাবস্থা; পক্ষান্তরে আমাদের যেটী সুখাবস্থা, অপরের সেটী দুঃখাবস্থা হইতে পারে। মনুষ্যের ঘৃণিত মলমূত্রাদি অনেক জীবের সুখভোগের অমূল্য ভোগ্যবস্তু। এক মনুষ্যজাতিরই আহার-বিহারাদির বৈসাদৃশ্য আলোচনা করিয়া দেখিলেও এই কথার যাথার্থ্য সহজে অনুভূত হইয়া থাকে। যাহাতে আমার সুখ, তাহাতে তোমার অসুখ; যাহাতে তোমার সুখ, তাহাতে হয়ত আমার অসুখ। নুরজাহানের সৌন্দর্য্য তাহার স্বামীর অপমৃত্যু ঘটিল; কিন্তু সাজাহান বাদসাহের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির পরাকাষ্ঠা হইল। "বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে", কিন্তু মহামতি সক্রেটীসের বিদ্যাবত্তাই তদীয় মৃত্যুর কারণ হইল। কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসের মৃত্যুর কারণও কতকটা তদ্রূপ। অতএব সুখ ও দুঃখ অভিন্ন। পরন্তু একই পদার্থ। তাই ভগবান্ বলিলেন—

"তিতিক্ষস্ব ভারত"।

অর্থাৎ "উভয়কেই সহ্য কর"। এখন কথা হইতেছে, যাহাকে আমরা দুঃখ বলিতেছি, সাংখ্য যাহাকে ত্রিতাপ বলিতেছেন, তবে কি সেটা দুঃখ নহে? তবে কি সেটা ব্রহ্মানন্দের আনন্দোচ্ছ্বাস? যাহাতে স্থায়ীভাবে আত্মার মালিন্য ঘটাইতে পারে, তাহাই দুঃখ। যাহা তাহা পারে না, যাহা ক্ষণ-বিধ্বংশী, সহ্য করিলেই যাহা স্বাভাবিক চাঞ্চল্য-বশতঃ বিদূরিত হইয়া যায়, তাহা আবার দুঃখ কি? স্থায়ী নিত্য জিনিষের কখন অভাব হয় না এবং অস্থায়ী অনিত্য জিনিষেরও নিত্যত্ব কখন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। শ্রীভগবান তাই বলিয়াছেন,——

নাসতো বিদ্যতে ভাবো।
নাভাবো বিদ্যতে সতঃ॥ গীতা ২।১৬॥

দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র উপায় ঐ "তিতিক্ষস্ব", কিনা 'সহ্য কর'। যে দুঃখ এক প্রকার ছায়া-চঞ্চল অনিত্য, তাহার অস্তিত্বই অপ্রতিষ্ঠিত; তাহার বিদ্যমানতাই অস্বীকৃত। অতএব, যাহাকে সাধারণতঃ আমরা সুখ দুঃখ বলি, তাহা সুখ দুঃখ নহে। তাহা আমাদের মনোমালিন্যের কারণ হইতে পারেনা। প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে, ঐ যে কয়টী দুঃখের চিত্র আমরা দেখিলাম, উহাও ব্রহ্মানন্দের অপরূপ স্ফূর্ত্তি। পুত্র মরিল, জননী শোকাকুলা। মৃত পুত্রও ব্রহ্মসমুদ্রের একটী লহরী, ব্রহ্মসমুদ্রে সুন্দরভাবে লীন হইয়া গেল। শোকাকুলা জননীও অন্য একটী তরঙ্গ; ক্রন্দন করিতেছে, বিচরণ করিতেছে, বসিতেছে উঠিতেছে, চলিতেছে ফিরিতেছে। এ সমুদয় কার্য্যই ঐ তরঙ্গের লীলা-ভঙ্গি—ঐ তরঙ্গের আনন্দ-বিকাশ; উহা আবার ব্রহ্মসমুদ্রেই লীন হইবে। হাসি ক্রন্দন সমস্তই ত ব্রহ্মানন্দের নূতন নূতন স্ফূর্ত্তি নূতন নূতন বিকাশ। যাহাকে জীব বলিতেছ, তাহা ব্রহ্মসমুদ্রের তরঙ্গ ভিন্ন কিছুই নহে। ব্রহ্মসমুদ্র চিরানন্দময়; সুতরাং

তরঙ্গও চিরানন্দময়। সুখ-দুঃখাদি ঐ তরঙ্গের ক্ষণিক ক্ষণিক লীলাভঙ্গি। সুতরাং যাহাকে আমরা দুঃখ বলিয়া অনুভব করিতেছি, তাহাও ব্রহ্মানন্দের উচ্ছ্বাসাভিব্যক্তি। যাঁহারা এই তত্ত্ব অবগত আছেন, যাঁহারা ধীর, বুদ্ধিমান, সূক্ষ্মদর্শী, তাঁহারা সুখ-দুঃখে কাতর হয়েন না। তাঁহারা একভাবেই, কিনা সুখদুঃখরূপ ক্ষণস্থায়ী তুচ্ছ বিষয়ে মনোনিবেশ না করিয়া ব্রহ্মানন্দে নিরত থাকেন ও মুক্তিলাভের উপযুক্ত হয়েন। শ্রীভগবানও তাই বলিয়াছেন,—

> যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
> সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ – গীতা ২, ১৫ ॥

অতএব এই পরিদৃশ্যমান্ জাগতিক প্রপঞ্চটী নিত্যানন্দময়ী ঐশী সত্তার অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। এখানে যাবতীয় ক্রিয়া কলাপ, যাবতীয় বৃত্তি ; হাসি কান্না, সুখ দুঃখ যাবতীয় অবস্থা, ঐ পূর্ণানন্দময়ী ভাগবতী স্ফূর্ত্তিরই ভঙ্গিবিন্যাস। আমি সসাগরা পৃথিবীশ্বর,নানা ঐশ্বর্য্যে বিভূষিত,ব্রহ্মানন্দের এই "আমি"তরঙ্গটী এইভাবে নৃত্য করিতেছি ; অপরপক্ষে তুমি দীন দুঃখী, শোকাতুর বিয়োগ-বিধুর অনশনে ক্লিষ্ট। ব্রহ্মানন্দের আর একটী আনন্দময় "তুমি"-তরঙ্গ ঐভাবে নৃত্য করিতেছ। আমরা দুটীই আনন্দ-বিক্ষেপ ব্রহ্মানন্দের দুটী সুন্দর কণা। একটু স্থির হইয়া ভাবিলেই দৃষ্ট হইবে যে, তুমিও যে বস্তু, আমিও সেই বস্তু, চন্দ্রও সেই বস্তু, সূর্য্যও সেই বস্তু, সবই এক। সবই একই সমুদ্রের একই উপাদান-গঠিত তরঙ্গমালা। একই সমুদ্রে উদ্ভূত হইয়াছি, লীলা করিতেছি, আবার একই সমুদ্রে লীন হইয়া যাইব ভেদাভেদ, পার্থক্য কিছুমাত্র নাই। তবে যে এবম্বিধ পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, সে কেবল ঔপাধিক, মায়িক, বাহ্যিক, প্রপঞ্চ-ঘটিত মাত্র। মূলতঃ আমরা সবই এক। আমরা অজ, অব্যয়, সনাতন, নিত্য পুরাণ ; আমরা আনন্দসাগরে উদ্ভূত হইয়া, আনন্দসাগরেই নাচিয়া নাচিয়া, দুলিয়া দুলিয়া, ছুটিয়া ছুটিয়া, অনন্ত ভঙ্গিতে আনন্দস্ফুরণ করিতে করিতে চলিয়াছি। আবার আনন্দ-সাগরেই হাসিতে হাসিতে লীন হইয়া যাইব তাই বলিতেছিলাম, আমরা এমন ব্রহ্মানন্দে নিমজ্জিত থাকিয়া, সুধার সাগরে নিমগ্ন হইয়া, ক্ষুৎপিপাসায় চীৎকার করিয়া উঠিতেছি অলীক দুঃখ কল্পনা করিয়া হৃদয়কে ব্যথিত করিতেছি। ব্রহ্মানন্দের ইহাও এক নবীন আনন্দোচ্ছ্বাস, সন্দেহ নাই।

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ।

বেদান্ত-পরিভাষা।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

[৮]

মূল। নমু রথাদেঃ শুদ্ধচৈতন্যাধ্যস্তে ইদানীং তৎসাক্ষাৎকারাভাবেন * জাগরণেঽপি স্বপ্নোপলব্ধরথাদয়োঽনুবর্ত্তেরন্। উচ্যতে। কার্য্যবিনাশো হি দ্বিবিধঃ। কশ্চিদুপাদানেন সহ, কশ্চিত্তু বিদ্যমান এবোপাদানে। আদ্যো বাধঃ, দ্বিতীয়স্তু নিবৃত্তিঃ। আদ্যস্য কারণমধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারঃ তেন বিনোপাদান-ভূতায়া অবিদ্যায়া অনিবৃত্তেঃ। দ্বিতীয়স্য কারণং বিরোধিবৃত্ত্যুৎপত্তির্দ্দোষনিবৃত্তির্ব্বা। তদিহ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারাভাবাৎ স্বপ্নপ্রপঞ্চো মা বাধিষ্ট মুষলপ্রহারেণ ঘটাদেরিব বিরোধিপ্রত্যয়ান্তরোদয়েন স্বজনকীভূতনিদ্রাদিদোষনাশেন বা রথাদিনিবৃত্তৌ কো বিরোধঃ ?

ব্যাখ্যা। আচ্ছা, (তুমি যখন বলিলে যে) রথ প্রভৃতি শুদ্ধচৈতন্যে অধ্যস্ত হয় (অর্থাৎ রথ প্রভৃতি যখন স্বপ্নে দৃষ্ট হয়, তখন শুদ্ধচৈতন্যই রথ প্রভৃতির অধিষ্ঠান হয়), তখন জাগ্রদবস্থাতেও রথ প্রভৃতির সাক্ষাৎকার না হইলেও স্বপ্নদৃষ্ট রথাদির জ্ঞান হইতে থাকুক। (তাহার উত্তরে) বলিতেছি, কার্য্যবিনাশ দুইপ্রকার। কোনও বিনাশ উপাদানের সহিত ঘটিয়া থাকে, আবার কোনও বিনাশ উপাদান বিদ্যমান থাকিলেও ঘটিয়া থাকে। প্রথম প্রকার বিনাশকে 'বাধ' ও দ্বিতীয় প্রকার বিনাশকে 'নিবৃত্তি' বলে। প্রথমটির কারণ, অধিষ্ঠানের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হওয়া; তাহা না হইলে উপাদানভূত অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় না। [যেমন ব্রহ্মজ্ঞান হইলে অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, ও অবিদ্যা উপাদান হওয়াতে যে ঘটাদির জ্ঞান হইতেছিল, তাহা আর হইতে পারে না; কেননা উপাদান যে মায়া, তাহার যথার্থ তত্ত্ব অবগত হওয়াতে (সমস্তই ব্রহ্ম এই জ্ঞান হওয়াতে উপাদান মায়ার সহিত ঘটাদিরও 'বাধ' হইয়া থাকে।] দ্বিতীয়টির কারণ (১) বিরোধি বৃত্তির উৎপত্তি বা (২) দোষনিবৃত্তি। [যথা স্বপ্নে রথাদি জ্ঞান হইতেছে, এখানে নিদ্রা এই দোষ রহিয়াছে; এই দোষ যদি চলিয়া যায়, তাহা হইলে রথাদিরও বিনাশ হইবে। আবার রথাদি বৃত্তির বিরোধী ঘট, গজ প্রভৃতি বৃত্তির উৎপত্তি হইলেও রথাদির বিনাশ হইবে।]

[আপত্তি হইয়াছিল যে, শুদ্ধচৈতন্যে যখন রথাদির অধিষ্ঠান, তখন কেবল স্বপ্নাবস্থায় কেন, জাগ্রদবস্থাতেও স্বপ্নদৃষ্ট রথাদির জ্ঞান চলিতে থাকুক; কেননা শুদ্ধচৈতন্য যতক্ষণ না

* "অধিষ্ঠান সাক্ষাৎকারাভাবেন" ইতি পাঠান্তরম্।

ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার করিতেছে, ততক্ষণ ত থাকিবে। সাধারণ জাগ্রদবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট রথাদির সাক্ষাৎকার তাহা হইলে হয় না কেন ?

ইহার উত্তর এখন দেওয়া হইতেছে] আচ্ছা, না হয় ধরিয়া লইলাম যে, যতক্ষণ না ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়, ততক্ষণ স্বপ্নসমূহ 'বাধ'প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু মুষল প্রহারের দ্বারা যেরূপ ঘট প্রভৃতি বিনষ্ট হয়, সেইরূপ বিরোধী অন্য প্রত্যয় উৎপন্ন হইলে বা রথাদির জনক নিদ্রা প্রভৃতি দোষ নাশ হইলে রথাদির 'নিবৃত্তি' হইতে বাধা কি আছে ? [অর্থাৎ, দুই প্রকার বিনাশের মধ্যে 'বাধ'-নামক বিনাশ না হয় সাধারণ জাগ্রদবস্থায় নাই হইল, কিন্তু 'নিবৃত্তি' নামক বিনাশ হইতে ত কিছু বাধা দেখি না। কাজেই 'নিবৃত্তি' বিনাশ দ্বারা স্বপ্নদৃষ্ট রথাদির জাগ্রদবস্থায় সাক্ষাৎকার অসম্ভব। সাধারণ জাগ্রদবস্থায় ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারদ্বারা অবিদ্যারূপ উপাদানের সহিত রথাদির 'বাধ' নামক বিনাশ অসম্ভব হইলেও, অন্য বৃত্তির উৎপত্তি বা নিদ্রাদিদোষ নাশ দ্বারা রথাদির 'নিবৃত্তি' নামক বিনাশ হইয়া থাকে।]

মূল। এবঞ্চ শুক্তিরূপ্যস্য শুক্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যনিষ্ঠাবিদ্যাকার্য্যত্বপক্ষে শুক্তিরিতি জ্ঞানেন তদজ্ঞানেন সহ রজতস্য বাধঃ। মূলাবিদ্যাকার্য্যত্বপক্ষে তু মূলাবিদ্যায়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকারনিবর্ত্ত্যতয়া রজতস্য তত্র শুক্তিজ্ঞানান্নিবৃত্তিমাত্রং মুষলপ্রহারেণ ঘটস্যেব।

ব্যাখ্যা। এইরূপ, শুক্তিতে যে রজত জ্ঞান হয় , তাহা শুক্তি-বিশিষ্ট চৈতন্যে নিষ্ঠ মায়ার কার্য্য বলিয়া ধরিলে 'শুক্তি' এই জ্ঞান ও অবিদ্যার সহিত রজতের 'বাধ' উপস্থিত হয়। [অর্থাৎ রজতের 'বাধ' উপস্থিত হইতে হইলে 'শুক্তি' জ্ঞান ও অবিদ্যার বিনাশ হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান হওয়া আবশ্যক] আর যদি বল যে, শুক্তিতে (আরোপিত) রজত মূল অবিদ্যার কার্য্য, তাহা হইলে মুষল-প্রহারে ঘটের বিনাশের ন্যায় শুক্তিজ্ঞান হইলে সেখানে রজতের নিবৃত্তি মাত্র হইবে ; কেননা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার না হইলে মূল অবিদ্যার নাশ হয় না। [অর্থাৎ কেবল শুক্তিজ্ঞান হইলে রজতের নিবৃত্তিরূপ বিনাশ হইবে, বাধ বিনাশ হইবে না। বাধ বিনাশ হইতে হইলে ব্রহ্মজ্ঞান হওয়া চাই]

মূল। নম্বু শুক্তৌ রজতস্য প্রতিভাস-সময়ে সত্ত্বাভ্যুপগমে "নেদং রজত"মিতি ত্রৈকালিকনিষেধজ্ঞানং ন স্যাৎ কিন্তু "ইদানীং ন রজতম্" ইতি স্যাৎ,"ইদানীং ঘটঃ শ্যামো ন" ইতিবৎ, ইতিচৈন্ন, নহি তত্র রজতত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকাভাবো নিষেধবিষয়ঃ, কিন্তু লৌকিকত্বপারমার্থিকত্বাবচ্ছিন্ন-প্রাতিভাসিকরজতপ্রতিযোগিকঃ ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাবাভ্যুপগমাৎ।

ব্যাখ্যা। আচ্ছা, শুক্তিতে যখন রজত জ্ঞান হয়, তখন যদি রজতের অস্তিত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে "ইহা রজত নয়" এইরূপ অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালের

নিষেধ জ্ঞান হইতে পারে না। কেবল "এক্ষণে ইহা রজত নয়" এই জ্ঞানই হয়। (যেমন মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ঘট কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। পরে অগ্নিতে দাহন করিলে রক্তবর্ণ হয়। দাহনের পর বলা যাইতে পারে) "এক্ষণে এই ঘট কৃষ্ণবর্ণ নয়"। (ইহার উত্তরে আমরা বলি) —না। ঐরূপ স্থলে রজতত্ববিশিষ্ট যে প্রতিযোগি-ভাব, তাহাই যে নিষেধের বিষয়, তাহা নয়। অর্থাৎ আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে রজত দেখি, তাহারই অনস্তিত্ব যে আমাদের নিষেধের অভিপ্রেত, তাহা নয়। কেবলমাত্র প্রাতিভাসিক রজতের অনস্তিত্বও আমাদের নিষেধের অভিপ্রেত নয় প্রতিভাস সময়ে লৌকিক অস্তিত্বের যে সকল গুণ থাকা সম্ভব সেই সকল গুণ-সম্পন্ন মিথ্যা রজতের অনস্তিত্ব আমাদের নিষেধের অভিপ্রেত।] কিন্তু লৌকিক ও পারমার্থিক (যথার্থ) ভাববিশিষ্ট যে মিথ্যা রজত, তাহার প্রতিযোগিভাবই নিষেধের বিষয়, কেননা ব্যধিকরণ ধর্ম্ম বিশিষ্ট প্রতিযোগিতার অভাব আমরা ধরিয়া লই।

[ঘটের বেলায় আমরা যেমন বলি "এক্ষণে এই ঘট শ্যামবর্ণ নয়," সেইরূপ রজতের বেলাতেও আমাদের বলা উচিত "এক্ষণে ইহা রজত নয়"। ঘটে যেমন বর্ত্তমান-কাল-বিশিষ্ট শ্যামবর্ণের অভাব বলা হয়, রজতেও সেইরূপ হউক; রজতের বেলায় "ইহা রজত নয়" এইরূপ অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনকাল বিশিষ্ট নিষেধ হইতে পারে না। এই হইল আপত্তি।

বেদান্তবাদীরা বলিতেছেন, বিরুদ্ধ ব্যবহারক রজত প্রভৃতি, লৌকিকত্ব পারমার্থিকত্ব রূপ ধর্ম্মের অধিকরণ। 'লৌকিকত্ব' ব্যাবহারিক রজত প্রভৃতি 'অধিকরণের ব্যধিকরণ ধর্ম্ম'। এই ব্যাধিকরণ ধর্ম্মবিশিষ্ট যে প্রতিযোগি ভাব, তাহার অভাব (অর্থাৎ লৌকিকত্ব-পারমার্থিকত্ব-বিশিষ্ট মিথ্যারজতের অভাব) আমরা এইরূপ স্থলে স্বীকার করি। অর্থাৎ লৌকিকত্ব ও পারমার্থিকত্ব বিশিষ্ট যে মিথ্যা-রজতনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা, তাহার অভাবই আমাদের অভিপ্রেত। সোজা কথায় বেদান্তবাদীর 'ইহা রজত নয়' এই যে নিষেধ বুদ্ধি হইতেছে, এই নিষেধের বিষয় কি? 'রজতত্ববিশিষ্ট প্রতিযোগিতার অভাব' ইহা নিষধের বিষয় নয়। "লৌকিকপারমার্থিকত্ববিশিষ্ট (অর্থাৎ ব্যাবহারিকত্বধর্ম্ম-বিশিষ্ট) যে প্রাতিভাসিক রজত, তাহার প্রতিযোগিতার অভাবই" নিষেধের বিষয়। অতএব পট বিদ্যমান থাকিলেও যেমন 'ঘটরূপে পট নাই' (ঘটত্বেন পটো নাস্তি), এইরূপ ত্রৈকালিক নিষেধ সম্ভব, সেইরূপ প্রাতিভাসিক রজত বিদ্যমান থাকিলেও 'লৌকিকপারমার্থিকত্ব-রূপে শুক্তিতে রজত নাই' (লৌকিকপারমার্থিকত্বেন শুক্তৌ রজতং নাস্তি) এই ত্রৈকালিক নিষেধ করিতে পারি।]

মূল। নন্থ প্রাতিভাসিকে রজতে পারমার্থিকত্বমবগতং ন বা, অনবগতে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নরজতসত্বজ্ঞানাভাবাদভাবপ্রত্যক্ষানুপপত্তিঃ। অবগতে অপরোক্ষাবভাসস্য তৎকালীনবিষয়সত্তানিয়তত্বাৎ রজতে পারমার্থিকত্বমপা-

নির্ব্বচনীয়ং রজতবদেবোৎপন্নমিতি তদবচ্ছিন্নরজতসত্ত্বে তদবচ্ছিন্নাভাবস্তস্মিন্ কথং বর্ত্তত ইতি চেৎ, ন পারমার্থিকত্বস্যাধিষ্ঠাননিষ্ঠস্য রজতে প্রতিভাসসম্ভবেন রজতনিষ্ঠপারমার্থিকত্বোৎপত্ত্যনভ্যুপগমাৎ। যত্রারোপ্যমসন্নিকৃষ্টং তত্রৈব প্রাতিভাসিকবস্তূৎপত্তেরঙ্গীকারাৎ।

ব্যাখ্যা। আচ্ছা, মিথ্যা রজতে পারমার্থিকত্ব (যথার্থ অস্তিত্ব) অবগত হইয়াছ কি না? যদি বল—না, তাহা হইলে ["ইহা রজত নয়" এরূপ স্থলে রৌপ্যের] অভাব প্রত্যক্ষ হওয়া অসম্ভব; কেননা সেখানে পারমার্থিকত্ববিশিষ্ট রজতের অস্তিত্ব জ্ঞান নাই। (অর্থাৎ যথার্থ অস্তিত্বের ধর্ম্মের জ্ঞান নাই [প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক শব্দের অর্থ পারমার্থিকত্ব। প্রতীয়মান রজত যথার্থ রজতের প্রতিযোগী। সুতরাং পারমার্থিকত্ব মিথ্যা রজতের অবচ্ছেদক। পারমার্থিকত্ব এই প্রতিযোগীর বাধিকরণ ধর্ম্ম। প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন অর্থে রজত বুঝাইবে।] আর যদি বল, পারমার্থিকত্ব (যথার্থ অস্তিত্ব) অবগত হইয়াছ, তাহা হইলে রজত নিজে যেমন, সেইরূপ রজতের পারমার্থিকত্বও (যথার্থ অস্তিত্বও) অনির্ব্বচনীয় (অর্থাৎ মায়ার কার্য্য) হইয়া পড়ে; কেননা অপরোক্ষ (বা সাক্ষাৎ) জ্ঞানের সময়, যে বস্তু জ্ঞানের বিষয়, তাহার তৎকালীন অস্তিত্ব থাকাই চাই। যখন পারমার্থিকত্ব-গুণবিশিষ্ট রজত বর্ত্তমান, তখন মিথ্যা রজতে (মূলে "তস্মিন্" শব্দ) পারমার্থিকত্ব (মূলে 'তৎ' শব্দ) গুণবিশিষ্ট রজতের অনস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব? [ইহার উত্তরে বলি] তা নয়। আমরা রজতনিষ্ঠ পারমার্থিকত্বের উৎপত্তি কল্পনা করি না; কেননা নিজঅধিষ্ঠাননিষ্ঠ পারমার্থিকত্ব রজতে প্রতিভাসিত মিথ্যাজ্ঞান) হইতে পারে। [ভাবার্থ এই; বেদান্তবাদী বলিতেছেন, আমরা রজতনিষ্ঠ পারমার্থিকত্বের উৎপত্তি মানি না, প্রাতিভাসিক রজতের অধিষ্ঠান যে শুক্তি, সেই শুক্তিনিষ্ঠ পারমার্থিকত্ব রজতে ভান হয়, ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত।] আরও একটা কারণ এই যে, যেখানে আরোপ্য (প্রতীয়মান বস্তু) আমাদের অসন্নিকৃষ্ট, সেইখানেই আমরা প্রাতিভাসিক বস্তুর উৎপত্তি মানি [অর্থাৎ রজত অন্যত্র আছে, শুক্তিই আমাদের সন্নিকৃষ্ট, সেই জন্য শুক্তিতে রজতের প্রাতিভাসিক সত্তা ধরি। রজত সন্নিকৃষ্ট হইলে, আর তাহার প্রাতিভাসিক জ্ঞান কিরূপে হইবে?]

মূল। অতএব ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্টজবাকুসুমগতলৌহিত্যস্য স্ফটিকে ভানসম্ভবাৎ, ন তৎ স্ফটিকেঽনির্ব্বচনীয়লৌহিত্যোৎপত্তিঃ। নম্বেবং যত্র জবাকুসুমং দ্রব্যান্তর-ব্যবধানাদসন্নিকৃষ্টং তত্র লৌহিত্যপ্রতীত্যা প্রাতিভাসিকং লৌহিত্যং স্বীক্রিয়েত, ইতি চেৎ, ন, ইষ্টত্বাৎ।

এবং প্রত্যক্ষভ্রমান্তরেষ্বপি প্রত্যক্ষসামান্যলক্ষণানুগমো যথার্থপ্রত্যক্ষলক্ষণা-সম্ভবশ্চ দর্শনীয়ঃ।

ব্যাখ্যা। অতএব জবাপুষ্প যখন ইন্দ্রিয়ের সন্নিকৃষ্ট, তখন তাহার রক্তবর্ণ স্ফটিকে পড়িয়া স্ফটিকের লৌহিত্য উৎপাদন করিতে পারে, ঐরূপ স্থলে স্ফটিকে লৌহিত্যের উৎপত্তি আমরা অনির্ব্বচনীয় (অর্থাৎ মায়ার কার্য্য) বলি না। [কেননা জবাকুসুম তখন ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট।] আচ্ছা জবাকুসুম যদি কোনও দ্রব্যের ব্যবধান দ্বারা ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট না হয়, এবং স্ফটিকে যদি লৌহিত্য দেখি, তাহা হইলে সেখানে প্রাতিভাসিক রক্তবর্ণ স্বীকার কর। [উত্তরে আমরা বলি] হাঁ, তাহা আমরা স্বীকার করি। [কেননা জবাকুসুম ইন্দ্রিয়ের অসন্নিকৃষ্ট, কাজেই স্ফটিকে তাহার লৌহিত্যের প্রাতিভাসিক জ্ঞান।]

এইরূপ অন্যান্য স্থলে, প্রত্যক্ষের যেখানে ভ্রম সম্ভব, সেখানে প্রত্যক্ষের সাধারণ লক্ষণই গ্রহণ করিতে হইবে, যথার্থ প্রত্যক্ষের লক্ষণ সেখানে খটিবে না।

মূল। উক্তপ্রত্যক্ষং প্রকারান্তরেণ দ্বিবিধম্। ইন্দ্রিয়জন্যং তদজন্যঞ্চেতি। তত্র ইন্দ্রিয়াজন্যং সুখাদিপ্রত্যক্ষং মনস ইন্দ্রিয়ত্বনিরাকরণাৎ। ইন্দ্রিয়াণি পঞ্চ, ঘ্রাণরসনচক্ষুস্ত্বক্‌শ্রোত্রাত্মকানি, সর্ব্বানি চেন্দ্রিয়াণি স্ববিষয়সংযুক্তান্যেব প্রত্যক্ষজ্ঞানং জনয়ন্তি। তত্র ঘ্রাণরসনত্বগিন্দ্রিয়াণি স্বস্বস্থানস্থিতান্যেব গন্ধরসস্পর্শোপলম্ভান্ জনয়ন্তি, চক্ষুঃশ্রোত্রে তু স্বত এব বিষয়দেশং গত্বা স্ব স্ব বিষয়ং গৃহ্নীতঃ শ্রোত্রস্যাপি চক্ষুরাদিবৎ পরিচ্ছিন্নতয়া ভের্য্যাদিদেশগমনসম্ভবাৎ, অতএবানুভবো "ভেরীশব্দো ময়া শ্রুত" ইতি। বীচীতরঙ্গন্যায়েন কর্ণশষ্কুলীপ্রদেশে অনন্তশব্দোৎপত্তিকল্পনায়াং গৌরবং, "ভেরীশব্দো ময়াশ্রুত" ইতি প্রত্যক্ষস্য ভ্রমত্বকল্পনায়াং গৌরবঞ্চ স্যাৎ।

তদেদং ব্যাখ্যাতং প্রত্যক্ষম্।

ইতি বেদান্তপরিভাষায়াং প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদঃ।

ব্যাখ্যা। কথিত প্রত্যক্ষ আবার আর এক রকমে দুই প্রকার বলা যাইতে পারে। ইন্দ্রিয়-জনিত ও ইন্দ্রিয়দ্বারা অজনিত। তাহার মধ্যে সুখ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়জনিত নয়; কেননা 'মন ইন্দ্রিয় নয়' তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয় পাঁচটি,—ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষু, ত্বক, ও শ্রোত্র। সমস্ত ইন্দ্রিয়ই নিজ নিজ বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপাদন করে। তাহার মধ্যে ঘ্রাণ, রসনা ও ত্বক নিজ নিজ স্থানে স্থিত হইয়াই গন্ধ, রস ও স্পর্শ জ্ঞান উৎপাদন করে। কিন্তু চক্ষু ও শ্রোত্র নিজেরাই, বিষয় (বস্তু) যে স্থানে আছে, সেইখানে গমন করিয়া নিজ নিজ বিষয় গ্রহণ করে। শ্রোত্রেরও চক্ষু প্রভৃতির ন্যায় উপাধি থাকায় ভেরীপ্রদেশে গমন সম্ভব সেই হেতু অনুভব হয়, 'আমি ভেরী শব্দ শুনিয়াছি।' কেহ কেহ বলেন, বীচি তরঙ্গন্যায়ে (একটি ঢেউ আর একটিকে আঘাত করিল, সেইটী আর একটীকে আঘাত করিল, এইরূপে) অনন্ত শব্দ-তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া

কর্ণপটহে আহত হয়। † [পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের এখন ইহাই সিদ্ধান্ত।] কিন্তু এরূপ কল্পনা বাহুল্যমাত্র। এবং (যথার্থতঃ শব্দ ভেরীর নিকটই উৎপন্ন হইয়া কর্ণে আসিয়া আহত হইতেছে, শ্রোত্র সেখানে যাইতেছে, ইহা ভ্রম, এই যুক্তিবলে) "আমি ভেরীশব্দ শুনিয়াছি" এই প্রত্যক্ষকে ভ্রম বলিয়া ধরাও বাহুল্য। এইরূপে প্রত্যক্ষ ব্যাখ্যা করা হইল।

ইতি বেদান্ত-পরিভাষায় প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদ।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

চিত্রশালা।

ওই আকাশের মাঝে
রাখিয়াছি আমি
একটি চিত্রশালা,—

যত কথা মোর,
যত গান মোর,
যত হাসি মোর,
অযুত ছবির ডালা।

কত ঠেলাঠেলি,
কত গলাগলি,
কত চুমোচুমি
আমার তা'দের মাঝে।

অজানা, অচেনা
করে আনাগোনা
আরো কত জনা
আপন আপন কাজে।

কত আঁখি জল—
মুকুতার ফল,
কত না বেদন
(সেথা) রয়েছে লেখা।

কত অভিমান,
বেদনার গান
আমার, সবারে
দিতেছে দেখা।

নিঃশেষ হ'য়ে
যাব আমি যত
ততই ভরিবে
ছবির ডালা।

শেষটুকু মোর
যেদিন ফুরাবে
সাজা শেষ হ'বে
চিত্র-শালা।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।

---

† ভাষাপরিচ্ছেদ, ১৬৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

মৃত্যুর পরপারে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিভিন্ন মানবের বিভিন্ন স্বর্গ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যাহা বলিয়াছি, তদ্দ্বারা পাঠক বোধ হয় বুঝিয়াছেন যে, আমাদের স্পন্দন-গ্রহণ-পটুতার উপরই বাহ্যবস্তুব জ্ঞান নির্ভর করিতেছে। যিনি যত অধিক স্পন্দন গ্রহণ করিতে সমর্থ, তাঁহার বাহ্যবস্তুর জ্ঞান তত অধিক। এই স্পন্দন-গ্রহণ-পটুতা, আবার সুগঠিত দেহ ও ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে। যাঁহার ইন্দ্রিয় যত তীক্ষ্ণ ও কর্ম্মক্ষম, তিনি ততই স্পন্দন গ্রহণ করিতে পারেন। বর্ত্তমানে আমাদের স্থূলদেহ বেশ সুগঠিত ও কর্ম্মক্ষম হইয়াছে। ইহাতে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক,—এই পাঁচটী ইন্দ্রিয় বিকশিত ও কার্য্যক্ষম হইয়াছে। এই ইন্দ্রিয় গুলির দ্বারা আমরা পৃথিবীর (ভূলোকের) অনেক স্পন্দন গ্রহণ করি ও তৎসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করি। অনেক স্পন্দন বলিলাম, কেন না ভূলোকের সকল স্পন্দন-গ্রহণ করিতে পারিনা। ইন্দ্রিয়গুলির এক একটি নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে; ঐ সীমার বাহিরে যে সকল অসংখ্য স্পন্দন আছে, ইন্দ্রিয় তাহা গ্রহণ করিতে অক্ষম। এই অক্ষমতা অনুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ, বারোমিটার, থার্ম্মোমিটার, স্পেকট্রসকোপ্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রদ্বারা কতক দূরীভূত হইয়াছে, তবে সম্পূর্ণরূপে দূর হয় নাই; স্থূলজগতে এখনও অনেক স্পন্দন আছে, যাহা আদৌ আমরা ধরিতে পারি নাই। সে যাহা হউক, মোটামুটি ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, আমাদের স্থূলদেহ বেশ সুগঠিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা আমরা স্থূলজগতের অধিকাংশই জানিতে পারি।

কিন্তু মানস-দেহ সম্বন্ধে একথা বলিবার যো নাই। অধিকাংশ মানবেরই মানস-দেহ (যে দেহে আমরা স্বর্গে বাস করি) এতই অপরিস্ফুট (undeveloped) ও অগঠিত, যে তদ্দ্বারা স্বর্গের স্পন্দন গ্রহণ করা অসম্ভব। অবশ্য, যাঁহারা খুব উন্নত পুরুষ, যোগী বা সিদ্ধ পুরুষ, তাঁহাদের মানস-দেহ বেশ সুগঠিত ও কর্ম্মক্ষম হইয়াছে। তাঁহারা মানস-দেহে অনায়াসে স্বর্গের সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারেন এবং স্বর্গের যাবতীয় স্পন্দন গ্রহণ করিতে সমর্থ। স্বর্গ প্রকৃত কিরূপ, তাঁহারাই কেবল জানিতে পারেন। কিন্তু, সাধারণ মানবের স্বর্গজ্ঞান অন্ধের হস্তি-দর্শনের ন্যায়, অসম্পূর্ণ, আংশিক ও ঐকদেশিক। এই জন্যই বিভিন্ন মানবের স্বর্গজ্ঞান বিভিন্ন হয়।

কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন। একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্,—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় যাঁহার আছে, তিনি পৃথিবী সম্বন্ধে মোটামুটী সবই জানিতে পারেন। এখন মনে করুন, একটি মাত্র ইন্দ্রিয় (চক্ষু) লইয়া এক শিশু পৃথিবীতে

জন্মিল। তাহার পৃথিবীর জ্ঞান কিরূপ হইবে, ভাবিয়া দেখুন। তাহার শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, ঘ্রাণ ও আস্বাদ থাকিবে না। সে কেবল দেখিবে, কতকগুলি চিত্র নড়িতেছে, ফিরিতেছে, চলিতেছে, ঘুরিতেছে; সে কিছুই শুনিবেনা, কঠিন, কোমল, তপ্ত, শীতল প্রভৃতি অনুভব করিবে না, সুগন্ধ দুর্গন্ধ বোধ করিবে না। ধরুন, আর এক শিশু জন্মিল কেবল কর্ণ লইয়া; ইহার চক্ষু নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ নাই। সে ইহার কিছুই দেখিতে পাইবে না, কেবল শুনিবে; তাহার নিকট পৃথিবী কেবল শব্দময়ী। এইরূপে যদি আমরা কল্পনা করি, কেবল স্পর্শ, কেবল ঘ্রাণ বা কেবল আস্বাদ লইয়া আরও তিন জন জন্মগ্রহণ করিল এবং এই পাঁচ জনের পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞান তুলনা করি, তাহা হইলে দেখিব যে, ইহাদের কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই, কেহই সম্পূর্ণ জানিতে পারে নাই, অথচ যে যতটুকু জানিয়াছে ও অনুভব করিয়াছে, তাহা ঠিক, মিথ্যা নহে।

সাধারণ মানব যখন স্বর্গে যান, তখন তাঁহার ঠিক ঐরূপ অবস্থাই ঘটে। তাঁহার মানস-দেহ অপরিস্ফুট থাকায়, তিনি তদ্দ্বারা স্বর্গের সকল স্পন্দন গ্রহণ করিতে পারেন না। পৃথিবীতে বাসকালে তিনি মানস-দেহের যে তারটি কাঁপাইয়াছিলেন, যে দিকের জানালাটি খুলিয়াছিলেন, স্বর্গে গিয়া কেবল সেই তারটিই স্পন্দন গ্রহণ করিতে পারে, সেই দিকের জানালা দিয়াই তিনি দেখিতে পারেন। মনে করুন, পৃথিবীতে তিনি জ্যোতিষের জানালাটি খুলিয়াছিলেন, নিঃস্বার্থভাবে জ্যোতিষেরই চর্চ্চা করিয়াছিলেন। স্বর্গে গিয়া তিনি দেখিবেন, তাঁহার কেবল জ্যোতিষের জানালাটি খোলা। অর্থাৎ তাহার নিকট বোধ হইবে যে, স্বর্গটি যেন কেবল জ্যোতিষের স্পন্দনে পরিপূর্ণ এবং তিনি এই স্পন্দন হইতে বিপুল জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া অভূত পূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিবেন। যে ব্যক্তি পৃথিবীতে স্বভাব-কবি ছিলেন, স্বভাবের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ থাকিতেন, তিনি স্বর্গে গিয়া দেখিবেন যে, স্বর্গ কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ; এরূপ মনোমুগ্ধকর, হৃদয়োন্মত্তকারী বিচিত্র শোভা তিনি আর কখনও দেখেন নাই। যিনি পৃথিবীতে সঙ্গীতের জানালা খুলিয়া গিয়াছেন, নিঃস্বার্থভাবে সঙ্গীত চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার স্বর্গ কেবলই সঙ্গীতময়, অপূর্ব্ব মধুর শব্দহিল্লোলে নিয়ত পরিপূরিত থাকিবে। এইরূপে দার্শনিক দেখিবেন, স্বর্গ দর্শনময়, গণিতজ্ঞ দেখিবেন গণিতময়, চিত্রকর দেখিবেন চিত্রময়। যে যাহা দেখিতেছেন, সবই ঠিক, মিথ্যা নহে; অথচ কোনটীই সম্পূর্ণ নহে,—সবই আংশিক, ঐকদেশিক।

ঐকদেশিক হইলেও প্রত্যেকে স্ব স্ব বিষয়টির সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ আনন্দ প্রাপ্ত হন। ইহাই স্বর্গের বিশেষত্ব। একটী উদাহরণ লওয়া যাক্। মনে করুন, একব্যক্তি পৃথিবীতে খুব সঙ্গীত-প্রিয় ছিলেন, সঙ্গীতের গভীর অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে পারিতেন। স্বর্গে আসিলে তাঁহার জ্ঞান ও আনন্দ কিরূপ বাড়িবে দেখুন। প্রথমতঃ তিনি স্বর্গব্যাপী লয় ও মান যুক্ত এক অভূতপূর্ব্ব সঙ্গীত স্রোত শুনিতে বা দেখিতে পাইবেন। ইহাকে মূর্ত্তিমান্ সঙ্গীত বলা যাইতে পারে। তিনি দেখিবেন, স্বর্গের যাবতীয় পদার্থ যেন একটী মধুর

সঙ্গীত করিতেছে, যেন তালে তালে নাচিতেছে,—যাবতীয় কার্য্যে, যাবতীয় ব্যাপারে যেন একটা লয় ও মান (harmony) আছে। তখন তাঁহার মনে হইবে যে, অরফিউসের (Orpheus এর) বীণার ঝঙ্কারে যে পর্ব্বত-কান্তার, সরিৎ-সাগর, তরুলতা নৃত্য করিত, শ্রীকৃষ্ণের মুরলী-ধ্বনিতে যমুনা যে উজান বহিত,এ সকল কথা মিথ্যা নহে,কবি-কল্পনা নহে। দ্বিতীয়তঃ, স্বর্গে এক প্রকার দেবতা আছেন,(খৃষ্টানেরা ইঁহাদিগকে angels বলেন), যাঁহারা অতিশয় সঙ্গীতপ্রিয়, সর্ব্বদাই মধুর সঙ্গীতে বিভোর হইয়া থাকেন। ইঁহারা আমাদের চির-পরিচিত গন্ধর্ব্ব। ইঁহারা যদি স্বর্গস্থ কোন মানবকে নিঃস্বার্থ সঙ্গীতপ্রিয় দেখেন, তবে তৎপ্রতি অনুকম্পা করিয়া তাঁহাকে (স্বর্গীয় উচ্চ সঙ্গীত শিক্ষা দেন। সুতরাং উক্ত ব্যক্তির কত সুবিধা দেখুন। তিনি গন্ধর্ব্বের নিকট হইতেও সঙ্গীত শিখিয়া পরম আনন্দ ভোগ করিতে থাকেন। তৃতীয়তঃ, ইতিপূর্ব্বে পৃথিবীতে যে সকল বিখ্যাত গায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (Beethoven, Handel, Mozart, তানসেন প্রভৃতি) তাঁহাদের নিকট হইতেও নানাবিধ সঙ্গীত শুনিয়া ও শিখিয়া তিনি বিমল আনন্দ লাভ করেন। তানসেন-আদি পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কেহই মরেন নাই, স্বর্গে উচ্চ জীবন ও উচ্চ আনন্দ ভোগ করিতেছেন। ইঁহারা যদি পৃথিবীতে কোন যোগ্য পাত্র দেখেন, তবে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে একটি অভিনব ও অত্যুচ্চ সঙ্গীত-লহরী পাঠাইয়া দেন। তখন লোকে তাঁহাকে বলে, ইনি একজন inspired musician বা প্রত্যাদিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ। কেবল সঙ্গীতই যে মানুষ প্রত্যাদেশে লাভ করেন, তাহা নহে,—বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, ইতিহাস, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ই স্বর্গীয় মহাপুরুষদিগের নিকট হইতে লাভ করা যায়। কিন্তু উপযুক্ত অধিকারী হওয়া চাই।

সে যাহা হউক, আমরা দেখিলাম যে, বিভিন্ন মানবের স্বর্গ বিভিন্ন। পৃথিবীতে যিনি যে বিষয়টি নিঃস্বার্থ ভাবে ভালবাসেন, স্বর্গে তিনি তাহাই লাভ করেন এবং তজ্জনিত আনন্দে বিভোর হন। যিনি ভূ-তত্ত্ব ভালবাসিতেন, তিনি স্বর্গে ভূ-তত্ত্বেরই নূতন নূতন সত্য আবিষ্কার করেন ও তাহাতেই নিমগ্ন থাকেন। যিনি প্রাণিতত্ত্ব ভালবাসিতেন, তাঁহার স্বর্গ প্রাণিতত্ত্বময়। জ্যোতির্ব্বিদের স্বর্গ তারকা-নক্ষত্রময়; স্বদেশ-প্রেমিকের স্বর্গ স্বদেশময়, ভক্তের স্বর্গ ভগবৎময়। যিনি সন্তানকে ভালবাসিতেন, তিনি সেই প্রিয়তম সন্তানকেই প্রাপ্ত হন এবং তাহারই দর্শন ও সেবা-জনিত আনন্দে ডুবিয়া থাকেন। যিনি একটি বিড়াল বা পক্ষিশিশুকে ভালবাসিতেন, তিনি তাহাই প্রাপ্ত হন এবং তৎপ্রতি অকপট স্নেহ ঢালিয়া পরমানন্দে থাকেন। ফলকথা এই যে, স্বর্গ যেন একটা অগাধ আনন্দ-সমুদ্র। ইহা হইতে যে যতই গ্রহণ করুক, ইহার বিন্দুমাত্রও হ্রাস হয় না। মানব নিঃস্বার্থ ভালবাসারূপ এক একটি আধার বা পাত্র লইয়া এই আনন্দ-সাগরের জল আনিতে যান। যাঁহার পাত্র যত বড়, তিনি ততই আনন্দ সংগ্রহ করেন; কিন্তু ছোটই হউক আর বড়ই হউক, সব পাত্রগুলিই পরিপূর্ণ (ছাপাছাপি) হইয়া যায়,—ইহাই স্বর্গের বিশেষত্ব।

যাঁহার যতটা আনন্দ ভোগ করিবার সামর্থ্য আছে, তিনি ততটাই পান। প্রত্যেক ব্যক্তি কেবল স্বীয় প্রিয় বস্তুটি দেখিতে পান। তাহা না দেখিয়া যদি প্রত্যেকে স্বর্গের সমস্তটা দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে আনন্দিত না হইয়া, তিনি হতবুদ্ধি (confused) ও বিস্ময়-বিহ্বল হইয়া যাইতেন ; সুতরাং স্বর্গের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইত।

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী।

অতৃপ্তি।

"ভূমৈব সুখম্। নাল্পে সুখমস্তি"।

সুখের কণিকা লভি মানবের প্রাণে
সুখের পিপাসা বেড়ে যায়,
উচ্চ হ'তে উচ্চতর আকাঙ্ক্ষার দিকে
ক্রমে তার মুগ্ধ মন ধায়।

একটি একটি করি হৃদয়ের কোণে
জেগে উঠে বাসনা নিচয়,
সতত যতন করে পুরাইতে আশা,—
সাধ কভু তৃপ্ত নাহি হয়।

সঞ্চিত রজতরাশি গণিছে কৃপণ,
তাহে কোথা তৃপ্তি হৃদয়ের ?
এ জগতে কিসে হবে লক্ষপা'ত-নাম
চিন্তা তার নিশি দিবসের।

যে সুধী পেয়েছে কভু জ্ঞানের সন্ধান,
লভিয়াছে এক বিন্দু নীর,
অসীম সে জ্ঞান-সিন্ধু করিবারে পান
ব্যস্ত তার ক্ষুদ্র এক শির।

এইরূপে মানবের বাসনার রাশি
ছুটি যায় অনন্তের পানে,
জগতে যা কিছু আছে, তাহার হৃদয়
তুষিতে পারে না তৃপ্তিদানে।

ফুৎকারে নিবায় তা'র আকাঙ্ক্ষা অনল,
এ জগতে হেন শক্তিমান্
তুমি বিনা বিশ্বেশ্বর! কেবা আছে আর ?
হে অনন্ত! হে ভূমা মহান্।

বিশ্বের বাসনা-রাশি চারিদিক হ'তে
মিলিয়াছে চরণে তোমার,—
সে পদ লভিলে তবে, হে তৃপ্তি-সাগর!
অতৃপ্তির শ্রান্তি রবে কার ?

শ্রীনলিনীনাথ দাস গুপ্ত।

ভক্তিতত্ত্ব।*

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" ঈশ্বরে পরমানুরক্তিই ভক্তি। ভক্তি—শ্রীভগবানের নামরূপ-গুণাত্মিকা মানসক্রিয়া। ভক্তি অন্তঃকরণের উল্লাসময়ী দ্রবাত্মিকা বৃত্তি। ভজ্ ধাতু ক্তিন্—ভক্তি। ভজ ধাতুর অর্থ ভজনা—সেবা ভক্তি—উপাসনা।

ঈশ্বরে পরমানুরক্তি দেহভোগাভিলাষীর জন্মে না; কারণ দেহের সহিত ভক্তির সম্বন্ধ নাই। ভক্তি শারীরিক বৃত্তি নহে, মানস বৃত্তি। মানসবৃত্তি বলিয়া ভক্তির সাধনায় দৈহিক শ্রমের আবশ্যক করে না। ভক্তি ভাব পদার্থ। স্বচ্ছ দর্পণের মত নির্ম্মল অন্তঃকরণেই ভক্তি উপজাত হয়, শ্রীভগবানের মধুর লীলাময়ী চিদ্ঘন মূর্ত্তি প্রতিফলিত হয়। সেই অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা-সাধন ভক্তি-সাধ্য।

ভক্তি অন্তঃকরণের ভাব-মন্দাকিনী। মন্দাকিনী আপনি পবিত্র থাকিয়া যাবতীয় বস্তুকেই পবিত্র করে। যে যে স্থান দিয়া প্রবাহিত হয়, তথাকার সমস্ত মলা ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া তোলে; তটভূমির চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষেত্রগুলিকে উর্ব্বর—শস্যশালী করিয়া দিয়া যায়। ভক্তি স্বভাবপূত পদার্থ। চিত্তকে প্রশস্ত, উদার ও পবিত্র করিতে এমন সামগ্রী আর নাই। যে হৃদয়ে ভক্তির উচ্ছ্বাসময় স্রোত বহে, সে হৃদয়ে কোনও পাপ থাকিতে পারে না। ভক্তিরস কঠোর চিত্তকে অচিরেই কোমলার্দ্র করিয়া তুলে, পাষাণ চক্ষু বাহিয়া করুণার উৎস ছুটায়, মরুভূর মত অনুর্ব্বর মানসক্ষেত্রে ভাবের শতদল বিকসিত করে।

ভক্তি জ্যোতিঃরূপা। এই জ্যোতিতে পাপীর মসীময় অন্তর এক মুহূর্ত্তেই জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠে। বাসনা-মুগ্ধ মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তির পক্ষে জ্ঞানপথ, যোগমার্গ, কর্ম্মবর্ত্ম দুষ্প্রবেশ্য।

যিনি যে পরিমাণে আত্মস্থ, তিনি সেই পরিমাণে বাহ্য বিষয়ে নির্লিপ্ত। মানসিক ক্রিয়া যতই অনুশীলিত হইবে, শারীরিকী ক্রিয়া ততই দূরবর্ত্তিনী হইতে থাকিবে। মনোবৃত্তিরূপা ভক্তির সতত অনুশীলনে শারীরিক বৃত্তি দুর্ব্বলা হইয়া পড়িবেই। ভক্তিসাধনার ফল দৈহিক ভোগাভিলাষে বিতৃষ্ণা। দৈহিকভোগ বাহ্যবিষয়াপেক্ষী, দৈহিক ভোগে বিতৃষ্ণা জন্মিলে বাহ্যজগৎ আর ভোগের আয়তন বলিয়া বোধ হইবে না। তখন, পত্রের শ্যামলতায় শ্যামসুন্দরের বর্ণ, সূর্য্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মপুরুষের জ্যোতি, চন্দ্রবিম্বে উমাবল্লভ মহাদেবের শুভ্ররূপ দৃষ্ট হইবে। যমুনার কলতান শ্যামের বাঁশরীর স্মৃতি জাগাইয়া দিবে, প্রিয়ঙ্গুলতার মৃদু সঞ্চালন শ্যামগত-প্রাণা শ্রীরাধার কম্পিত দেহযষ্টি স্মরণ করাইবে। সহচরগণের প্রতি-অবয়বে দেবত্বের স্বর্গীয় আভা, রমণী-কুলের মুখমণ্ডলে মাতৃত্বের বিমল দীপ্তি, বৃন্দাবনের দৃশ্য অঙ্কিত করিবে। তখনই ভক্তি-সাধনা ফলবতী ও সাধক আত্মস্থ।

---

* কলিকাতা সাহিত্য-সম্মিলনীর গত ভাদ্র মাসের অধিবেশনে পঠিত।

ইহাই তন্ময়াবস্থা। বাহ্যজগতের সত্তা ভক্তের নিকট সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না, ঐ সত্তার অন্তরে বাহিরে শ্রীভগবানেরই বিভূতি প্রকাশ পায়। ভক্ত অনিমাদি সিদ্ধি চাহেন না, যোগজ-শক্তি-লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন না। তাঁহাদের চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়, মন প্রাণ বুদ্ধি শ্রীভগবানেরই নামরূপ ও গুণে আসক্ত হউক—ইহাই কামনা করেন।

সর্ব্বনাম, সর্ব্বরূপ, সর্ব্বগুণময় পরমেশ্বরই ভক্তিগ্রাহ্য; এই নাম রূপ বা গুণ ব্যতীত তাঁহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় না। তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে, তিনিই উদ্ধার করিবেন; কেননা ভক্ত তাঁহার প্রিয়—"ভক্তো মেহতীব প্রিয়ঃ"। আপনার যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহার বিধান তিনিই করিবেন। ভক্তেরা পুরুষকারের বড় গৌরব করেন না। ভক্তের দাস্য, সখ্য, মধুরাদি সর্ব্বভাবেই দীনতার পরাকাষ্ঠা। দীনতা ভক্তের অস্থিমজ্জায় জড়িত। দীন না হইলে ভক্ত হয় না। এই দীনতার আশ্রয়-গ্রহণই ভক্তের স্বভাব। ব্রহ্ম স্বরূপ প্রাপ্তিই যে আত্মজ্ঞান—তাহা ভক্ত হেয় বিবেচনা করেন। তাঁহারা মিষ্টের আস্বাদ চাহেন, মিষ্ট হইতে চাহেন না। মাধুর্য্য-লীলার আস্বাদই ভক্তের অমৃত; এই অমৃত-পানে ভক্ত বিভোর! নাম রূপ ও গুণ ব্যতীত লীলা প্রকটিত হয় না; রসাস্বাদন ঘটে না; আপনার প্রিয়, প্রভু, পতি, সখা প্রভৃতি ভাবও জন্মে না। শ্রীভগবানের নামে যাঁহারা ভাবতরঙ্গে ডুবিয়া যান না, তাঁহার ভুবনমোহন রূপ দর্শনে যাঁহাদের নয়নে প্রেমাশ্রু, শরীরে পুলক ফুটিয়া উঠে না, তাঁহার অলৌকিক গুণাবলী যাহাদিগকে আকুল করিয়া তুলে না, তাঁহারা বড়ই হতভাগ্য। সেই শুষ্ক, কঠোর চিত্তভূমি ভক্তি-আর্দ্র হইলে, তবেই তাহার কর্ষণ হইতে পারে, তবেই শস্য ফলিতে পারে। নিরন্তর ভগবৎচিন্তাই চিত্তকে সরস, মলাশূন্য ও পবিত্র করে। বিষয়ে অত্যাশক্তি, ভোগাভিলাষ, ভগবচ্চিন্তার প্রবল শত্রু। মনঃস্থৈর্য্য ব্যতীত একাগ্রতা জন্মে না; একাগ্রতা ভিন্ন ফল ফলে না। বিষয়াসক্ত ব্যক্তির ভগবচ্চিন্তা আদৌ ভাল লাগে না; বিষয়চিন্তা আসিয়া ভগবচ্চিন্তার স্থান অধিকার করে। সাধু-সঙ্গ, তীর্থযাত্রা, কথা-শ্রবণ, গীতা পুরাণ-ভাগবতাদি পাঠ, ভক্তির উপায়।

ভক্তি, উপাসনা, ধ্যান, রামানুজাচার্য্য একার্থক বলেন। ইহা সকলের সমর্থনীয় নহে। আমরা এ ক্ষেত্রে, রামানুজ স্বামীর মত লইব না। ভক্তির দুইটি ধারা,—একটি উপাসনাত্মিকা, অপরটি ধ্যানাত্মিকা। উপাসনাও দ্বিবিধ—অনুষ্ঠান ও ভাবমূলক।

মানবীয় চিত্তবৃত্তি নানা প্রকার। তদনুসারে অবলম্বনীয় পথও ভিন্ন ভিন্ন, ইহাই শাস্ত্রের অধিকারভেদ। অনেকের চিত্ত মোহাচ্ছন্ন, স্তিমিত-ভাবাপন্ন, বৃত্তি নিস্তেজ। ইঁহারা ধ্যান করিতে বসিলেই অবসাদ-দৈন্যগ্রস্ত হইয়া থাকেন, নিদ্রাপ্রাপ্ত হইয়া পড়েন, চিন্তাধারা কোন মতেই একতান রাখিতে পারেন না। ধ্যান ইঁহাদের পক্ষে অসম্ভব। ধ্যেয় বস্তুকে সম্মুখে আনিয়া হৃদয়ের মধ্যে অনুভব, হৃদয়-পদ্মাসনে বসাইয়া মনশ্চক্ষু ভরিয়া সেই রূপামৃতের আস্বাদন, সহজ নহে। পূজা, অর্চ্চনা, প্রণিপাতাদি ইঁহাদের এক-

মাত্র অবলম্বন। ইঁহাদের পক্ষে কোন মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া আরাধনাই প্রশস্ত, কারণ চিন্তাধারা বিচ্ছিন্ন হইলে, পুনরায় তাহা অবিচ্ছিন্ন করা যায়। পুষ্প, বিল্বদল, তুলসীমঞ্জরী, দেবমূর্ত্তি, চরণে অর্পণ করিলে যে তৃপ্তি, তাহা ধ্যানে নাই। ধ্যানের রাজ্য একমাত্র অন্তরে, পূজাদির বিষয় অন্তর ও বাহ্য উভয়ই। ইহাই ভক্তির উপাসনাধারা, এবং ইহা অনুষ্ঠানমূলক।

চিন্তা (চিত্তবৃত্তি) যাঁহাদের প্রখরা, ভাবপ্রবণতা অল্প, তাঁহারা ধ্যানেই সত্বর ফল পাইবেন। ধ্যানাত্মিকা ভক্তির তাঁহারাই অধিকারী। আর যাঁহাদের চিন্তা ও ভাব-প্রবণতা দুইই অল্প পরিমাণে সমভাবে বর্ত্তমান, তাঁহাদের অনুষ্ঠানমূলক উপাসনা করাই সঙ্গত। কিন্তু যাঁহারা চিন্তাশক্তি লাভে বঞ্চিত হইয়াও ভাবপ্রবণতা অধিক পাইয়াছেন, তাঁহারা ভাবমূলক উপাসনা করিলেই সফল হইবেন। উপাসনাত্মিকা ভক্তি—পূজার্চ্চনাদি শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানসাপেক্ষ। ভাব সঙ্কীর্ত্তনাদি-সাপেক্ষ। চিত্তসংযম যোগ ও বাক্যবিচার —উভয় উপায় দ্বারাই হয়। যোগ অনুষ্ঠানাত্মক। বাক্যবিচার ভাবাত্মক।

ভগবানের দয়া অপার। মানব যতই তাঁহার নিকট হইতে দূরে যাইতেছে, তিনি ততই মানবকে কোলে টানিতেছেন। তাঁহার ধ্যানধারণাদিতে লোকে যতই অশক্ত হইতেছে, ততই আরাধনার নূতন নূতন উপায় নির্দ্দেশ করিতেছেন। অন্তর্নিষ্ঠ বলিয়া ধ্যান কঠিন, অন্তর ও বাহ্যনিষ্ঠ বলিয়া পূজাদি সরল, আবার সঙ্কীর্ত্তনাদি প্রধানতঃ বাহ্য-নিষ্ঠ বলিয়া আরও সরল।

সঙ্কীর্ত্তন

সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা উপাসনা করা বড়ই মনোরম। বলিয়াছি, ইহা ভাবমূলক উপাসনা। ইঁহার প্রবর্ত্তক আমাদের শ্রীচৈতন্য। সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা উপাসনায় ঝটিতি মন আকৃষ্ট হয়, আর ইহা আপামর সাধারণেরই সেব্য। একদিন খোল, করতাল ও ভক্তকণ্ঠ—এই তিনের মিলনে নবদ্বীপ ধামে যে ঘনামৃত ধারা উৎপন্ন হইয়াছিল, সে অমৃতপানে আজিও লক্ষ লক্ষ প্রাণী তৃপ্ত, কৃতার্থ হইতেছেন। সঙ্কীর্ত্তন রূপ ভাবের বন্যায় একদিন সমস্ত বাঙ্গালা ভাসিয়া গিয়াছিল। সামবেদ সঙ্গীতময়। সামসঙ্গীতঝঙ্কারে তপোবন প্লাবিত হইত বটে; সঙ্গীত দ্বারা ঈশ্বরোপাসনা বৈদিক কালেও ছিল বটে; কিন্তু সঙ্কীর্ত্তন শ্রীভগবানের বিশেষরূপে নামকীর্ত্তন। ইহা বেদান্তের নামোপাসনা নহে। বেদান্তের নামোপাসনা ভক্তিবর্জ্জিত; তাহার ফল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি মাত্র,—ভগবৎ-করুণা লাভ বা মোক্ষ নহে। নামোপাসনায় উন্মাদনী শক্তি, প্রেমের মধুময় চল চল ভাব, কোমল প্রাণময় দৃশ্য নাই। এ উভয়ের পার্থক্য আকাশ পাতাল। খোল করতালের সঙ্গে সঙ্গে সমবেত ভক্তকণ্ঠ "কোথা তুমি দয়াল প্রভু" বলিয়া যখন উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে থাকে, সেই শরীরের স্বেদপ্লুত কম্পন, অঙ্গের সহর্ষ পুলক, মুখের কমনীয় করুণ কাতর্য্য, আর নয়নের প্রেমাশ্রু দেখিলে কোন্ পাপীর প্রাণ শ্রীভগবানের জন্য আকুল হইয়া না উঠে? বিক্ষিপ্ত মনো-

বৃত্তিগুলিকে এমন ভাবে একসুরে বাঁধিতে, সঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য উপায় নাই! ভক্তের ইহাই ধ্যান, যোগ, জপ, তপ, পূজা, অর্চ্চনা। সঙ্কীর্ত্তন ভাবমূলক বলিয়া যে অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিতে হইবে, যথেচ্ছ ব্যবহার, যথেচ্ছ আহার বিহার চালাইতে হইবে, এমন কথা নাই। মনটিকে পরমেশ্বর-নিষ্ঠ করিবার জন্য মনের সত্ত্ববৃদ্ধি আবশ্যক। মনের সত্ত্ব-বৃদ্ধি আহার-সাপেক্ষ,—"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্ব শুদ্ধিঃ"। সকল বর্ণে মিলিয়া এক সঙ্গে এক পাতে খাইলেই সত্ত্ব বৃদ্ধি হয় না, বরং হ্রাসই হয়। প্রাণকে তরল করিয়া না আনিলে ভগবানের জন্য প্রাণ কাঁদিবে কেন? সেইজন্য চিত্তশুদ্ধি ও সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করা আবশ্যক। রিপুগণকে দমিত করিতে না পারিলে মনঃ-শুদ্ধি জন্মিবে কেন? অতএব ক্রোধাদি রিপু-গণের জয় করিবার দিকে ভক্তের লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। তবেই শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে উপেক্ষা প্রদর্শন করা ভক্তের ধর্ম্ম হইতে পারে না।

হৃদয়ে ভক্তিকুসুম ফুটাইতে হইলে তাহার চারা রোপণ করিয়া সেই চারায় নিয়মিত জল সেচন, বাতাস ও রৌদ্রের যথাযথ ব্যবস্থা করিতে হয়। ভক্তিমান্ ব্যক্তির অন্তরে সর্ব্বদাই উল্লাসময় দ্রবীভাব বিরাজ করে। (দ্রবীভাব গলিয়া যাওয়া)। করুণ-রসাশ্রিত নাটকের অভিনয় দর্শনেও সহৃদয়ের অন্তরে দ্রবীভাব দৃষ্ট হয়; কিন্তু সে দ্রবীভাব উল্লাস-ময় নহে! তাহাতে তৃপ্তি অতৃপ্তি, প্রীতি বেদনা সমভাবেই অনুভূত হয়! পাত্র-পাত্রীর বেদনার ভার আংশিক বহন করিয়া সহৃদয় দর্শকের বুক ভাঙ্গিয়া যায়, অন্তর বিষাদাপ্লুত হয়। এ মধুররস ঈষৎ লবণাক্ত। ভক্তিরস মধুময়।

ভক্তি ও সেবা।

সেবা দ্বিবিধ—দেবসেবা ও জীবসেবা। দেবসেবা - দেবতার পুজা-বন্দনা, গাত্রমার্জ্জনা ও প্রণিপাতাদি। জীবসেবা—দীনদরিদ্রের সেবা, সর্ব্বভূতে দয়া। দেবসেবা—শ্রীভগ-বানেরই সেবা। সে সেবা মূর্ত্তি ভিন্ন সম্ভব নহে। দেবসেবায় ভক্তির উদয়, অহঙ্কার নাশ, চিত্তমলার মার্জ্জনা ও মানসিক তৃপ্তি। ইহার নিরন্তর অনুশীলনে যাহা দূরস্থ, তাহা অতি নিকটে; যাহা অন্তঃস্থ, তাহা বাহিরে; যাহা হৃদয়াধিষ্ঠিত, তাহা নেত্র-গোলকের উপরি-ভাগে দেখা যায়।

জীবসেবা—বিপন্নকে বিপৎ হইতে রক্ষা, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, শরণাগতকে অভয়-প্রদান, যাচককে অর্থ-বিতরণ। ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, অতিথি দীনদরিদ্র সকলের সেবায় দেব সেবারই ফল পাওয়া যায়। জীব ভগবানেরই প্রিয়। জীবরক্ষা ভগবানের ইচ্ছা, জীবের উদ্ধার তাঁহার অভিপ্রেত। এই কারণেই ত তাঁহার লীলাদেহ গ্রহণ। তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য মানবেরা সাধন করুক, ইহা তাঁহার একান্ত অভিলাষ। এই অভিপ্রেত কার্য্য মানব কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন না হইবার সম্ভাবনা বুঝিলেই শ্রীভগবান্ অবতাররূপে জন্ম-গ্রহণ করেন।

জীবমাত্রেই পরমেশ্বরের সন্তান—এই বোধে জীবসেবাই শিবসেবা। জীবসেবায়

অবহেলা করিলে শিবসেবা নিষ্ফল। কারণ, জীবকে আপনার ভাবে না, এমত ভেদবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীভগবান্‌কে কিছুই বুঝে নাই। ভগবান্‌কে ভালবাসিলে জীবকে ভাল না বাসিয়া কেহই থাকিতে পারে না। রাজার নিয়ম মানাই রাজভক্তি; ভগবানের জীবরক্ষার্থ নিয়ম-পালনই ঈশ্বর-ভক্তি বা দেবভক্তি। আবার যে জীবকে ভালবাসে, সে ভগবান্‌কেই পায়। সর্ব্বভূতে যাঁহার সমজ্ঞান, সেই ত ব্রহ্মজ্ঞানী! সর্ব্বজীবে যাঁহার সমতা-বোধ, তিনিই ত ভগবদ্ভক্ত! যে জীব-সেবা করে না, অথচ দেবসেবা-তৎপর, বুঝিতে হইবে, সে ব্যক্তি ভগবানের পূর্ণ মহিমা জানে নাই!—বুঝিতে হইবে, সে ব্যক্তি মূর্ত্তির বাহ্য সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, অথবা ভোগ বা ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির জন্যই লালায়িত।

ভক্তিবাদে বহুস্থলেই যে জ্ঞানের নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়, বুঝিতে হইবে, সেই জ্ঞান "চিদাত্মক জ্ঞান" নহে, ভক্তিশূন্য শুষ্ক জ্ঞানই সে স্থলে লক্ষ্য। এইরূপ জ্ঞানই ভক্তিবাদীর নিকট হেয়।

ভগবদ্গীতা, পুরাণ, ভাগবতাদির মতে ভক্তিই ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের একমাত্র কারণ। শ্রুতিতে (ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যকাদিতে) যে ভক্তির কথা আছে, তাহা প্রতীকোপাসনার প্রকার-ভেদ। তাহাতে "ঈশ্বরে পরানুরক্তি" যে ভক্তি, আর ইহাই যে আত্ম-সাক্ষাৎকার বা ভগবৎ-প্রাপ্তির কারণ, তাহা উল্লিখিত হয় নাই। কেবল শ্বেতাশ্বতর ও কৈবল্যোপনিষদে ভক্তি শব্দ "ঈশ্বরে পরানুরক্তি" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। "যস্য দেবে পরাভক্তি"। সাধারণতঃ শ্রদ্ধাই ভক্তি অর্থে ব্যবহৃত হইত। ভক্তির একটি আভিধানিক অর্থই শ্রদ্ধা।

ভক্তি—বিশিষ্ট যোগ। যোগে শক্তির চালনা, ভক্তিতে মনোবৃত্তির অনুশীলন। যোগ অনুষ্ঠানময়, ভক্তি ভাবময়ী। যোগ দৈহিক চেষ্টাসাধ্য, ভক্তি মানসিক বল-সাধ্য। যোগের অন্যতম ফল অণিমাদি সিদ্ধি, চরম ফল আত্ম-সাক্ষাৎকার। ভক্তির একমাত্র ফল ঈশ্বর-লাভ।

যে ভক্তি, জ্ঞান বা কর্ম্ম দ্বারা আবরিত নহে, তাহাই উত্তমা ভক্তি। উত্তমা ভক্তিই অ-হেতুকী। ইহাই প্রেমভক্তিতে শেষ পরিণতি লাভ করে। সাধারণ ভক্তি দুগ্ধ,—প্রেমভক্তি নবনী।

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা। ভক্তিরিত্যুচ্যতে—

প্রেমের সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি গোপিকাদেরই দেখা যায়। অন্তঃকরণ দর্পণবৎ নির্ম্মল, স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ, নবনীর মত কোমল হইলে পর মমতাত্মক যে প্রগাঢ়ভাব স্থায়ী হয়—তাহা প্রেমভক্তি।

ভক্তিই একটি রস। ইহার স্থায়ীভাব আনন্দাত্মিকা রতি। ব্যভিচার ভাব—রোমাঞ্চ, হর্ষ, অশ্রুপাত, গদগদভাব, উৎকণ্ঠা, নর্ত্তন, কীর্ত্তন, গান, ক্রন্দন, লজ্জা, দৈন্য, মুহুর্মুহু শ্বাস প্রভৃতি। এই ব্যভিচার-ভাবগুলি দেখা যাইলেই প্রেমভক্তির উদয় হয়।

ভক্তি স্বকীয়া ও পরকীয়া। পরকীয়ার তাৎপর্য্য—ইহাতে সমাজের বন্ধন, কর্ত্তব্যের অনুরোধ, গুরুজনের অনুমোদন নাই, বরং বিরোধিতাই আছে। বাধা পাইলেই ভক্তি

উচ্ছ্বসিত হয়, শৈলগাত্রের আঘাতেই জলের বেগ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। প্রেমের ধর্ম্মই স্বার্থত্যাগ্ করা। প্রেমাস্পদকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াই প্রেমিক সুখী। লজ্জা, ধর্ম্ম, শালীনতা, কুলমর্য্যাদাই যদি প্রেমাস্পদকে না দিতে পারা গেল, তাহা হইলে আর সর্ব্বস্ব দান হইল কৈ? প্রকৃষ্ট স্বার্থই যদি বিসর্জ্জন না দেওয়া হইল, তবে প্রেমের পূর্ণতা সম্পাদন হয় কি করিয়া? রূপ-যৌবন ভগবানেই সমর্পণ বিধি। পরকীয়া ভক্তি-উপাসনাতে এতদ্ব্যতীত সমাজের ভ্রূকুটী, গুরুজনের শাসন, প্রতিবেশীর নিন্দা মাথায় পাতিয়া লইতে হয়। এই গুলিই বাধা। দৃষ্টান্ত শ্রীরাধা ও গোপিকাবৃন্দ।

জ্ঞানবাদীর মতেও ভক্তির উপযোগিতা আছে। জ্ঞানবাদীর মতে জ্ঞানই পুরুষার্থ। "জ্ঞান স্বপ্রকাশ ও অজ্ঞান নিবৃত্তি-সাপেক্ষ ভক্তি জ্ঞানোৎপত্তির সহকারী কারণ। জ্ঞান-ফল জন্মানই ভক্তির কার্য্য; এতদ্ভিন্ন ভক্তির অন্য প্রয়োজন নাই। ভক্তি অন্তঃকরণ-বৃত্তি বিধায় নিত্যস্থায়ী নহে। লক্ষ্যভেদ হওয়াই জ্ঞান; জ্ঞানই স্বরূপ ফল। ভক্তি শর-সন্ধান-চেষ্টা। অতএব জ্ঞান ও ভক্তি দুইটি পরস্পর বিরোধী পদার্থ নহে। কর্ম্ম-সংস্কৃত মনই শর। লক্ষ্য—পরমেশ্বর। পরমেশ্বর ত্রাতা এই যে জ্ঞান, উহা জিজ্ঞাসা, আত্মজ্ঞান নহে। অতএব জ্ঞানই পরম পদার্থ। ইহাতে ভক্তিবাদীর আপত্তির কারণই নাই।"

আপত্তির কারণ অবশ্য আছে। কারণ আত্মজ্ঞান ত স্ব-স্বরূপ-প্রাপ্তি! জ্ঞান স্বপ্রকাশ আত্মস্বরূপ! অবিদ্যাবশে সেই স্বরূপেরই আবরণ ঘটে, ঐ আবরণ নাশ পাইলেই ত স্বতঃপ্রকাশ জ্ঞানের উদ্ভব! অজ্ঞান-নিবৃত্তিই জ্ঞান। তাহা হইলে জ্ঞানলাভ ত নূতন কিছু প্রাপ্তি নহে, অজ্ঞান-নাশই ত লাভ!

এই লাভের জন্য ভক্ত লালায়িত নহেন। ইঁহারা চিনির আস্বাদ পাইতে চাহেন, চিনি হইতে চাহেন না। জন্মে জন্মে শ্রীভগবানের লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া সেই মাধুর্য্যের অনুভব করাই ভক্তের কামনা; শ্রীভগবানের সাযুজ্য লাভ করিয়া সেই রস-সাগরের কণামাত্র পাইয়াই কৃতার্থ হওয়া ভক্তের আকাঙ্ক্ষা। জ্ঞানবাদীর সহিত ভক্তিবাদীর বিরোধ সম্ভব হউক বা না হউক, জ্ঞান বা ভক্তি এই উভয়ের মধ্যে ভক্তির শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত হউক না হউক, তথাপি ভক্তি যে মুক্তির পরম্পরা-কারণ, ইহা জ্ঞানবাদীও মানিতে বাধ্য! অব্যভিচারিণী ভক্তিই জ্ঞানোৎপত্তির কারণ; জ্ঞান ত অজ্ঞান-নিবৃত্তিরই নামান্তর। তবেই জ্ঞানবাদিমতে ভক্তির সার্থকতা। ভক্তি-বিহীন ব্যক্তি পরমার্থ তত্ত্বে অধিকারীই হইতে পারে না।

"তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।"

—একভক্তি—জ্ঞানী। জ্ঞানীরও একনিষ্ঠাত্মিকা ভক্তি থাকা উচিত। ব্রহ্মানন্দ লাভের প্রতি ভক্তির কারণতা অখণ্ডনীয়।

জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় সাধিত হওয়া উচিত। ভক্তি যেমন জ্ঞানবাদীরও পরিহার্য্য নহে, জ্ঞানও তদ্রূপ ভক্তিবাদীর পরিত্যাজ্য নহে। জ্ঞান, যাহা ভক্তিবাদীর মতে অপেক্ষিত ও জ্ঞানবাদীর মতে জিজ্ঞাসাত্মক, তাহার উপযোগিতা না থাকিলে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নের

নিয়ম কেন? ভাগবত, চৈতন্য-চরিতামৃত বৈষ্ণবের নিকট অমূল্য রত্ন কেন? জিজ্ঞাসা ব্যতীত ত সন্দেহই মেটে না! মোট কথা, জ্ঞান বা ভক্তি, যাহারই অনুশীলন কর না কেন, ভক্তি যে সকলের মূলে, ইহা স্বীকার্য্য; তবেই ভক্তিতত্ত্ব উপেক্ষণীয় নহে।

ভক্তি সার্ব্বভৌমিক। বলিয়াছি, জ্ঞানবাদীর যেরূপ অপরিহরণীয়, কর্ম্মীরও তদ্রূপই আদরণীয়। যে কোন কর্ম্মের মূলে, ভক্তি না থাকিলে, সে কর্ম্ম সার্থক নহে। ভক্তিবিহীন কর্ম্ম কখনই কর্ম্মীকে অভীষ্টলাভে যোগ্য করে না। জ্ঞান বা কর্ম্মের অধিকারী অনধিকারী বিচার শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ভক্তির অধিকারী অনধিকারী নাই।

জ্ঞানবাদী ও ভক্তিবাদী ত আছেন, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানের অনুশীলন, ভক্তির চর্চ্চা কে করেন? সকলেই অসংযমী! ধর্ম্মের বন্ধনে, অনুষ্ঠানের কর্ত্তব্যতায়, কেহই আবদ্ধ থাকিতে চাহেন না! যথেচ্ছ আহার বিহার ও অশাস্ত্রীয় আচরণ করিতে সকলেই ইচ্ছুক!—কাজেই জ্ঞানের প্রথম স্তর, কি ভক্তির প্রথম স্তরেও কেহই পৌঁছিতেছেন না। জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা-কীর্ত্তন ছলে কর্ম্মে বিরক্তি দেখাইয়া সকলেই জ্ঞানীর আসনে বসিতে চাহেন। "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন"—অতএব অনুষ্ঠান পদদলিত করিয়া সবাই ভক্ত সাজিতে ভালবাসেন। জ্ঞান বা ভক্তি বাহিরের বস্তু নহে, কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠান বাহিরেরই বস্তু। কর্ম্মানুষ্ঠানে সংযম অভ্যাসাদি আয়াস স্বীকার করিতে হয়, কাযেই কর্ম্মানুষ্ঠানে বীতস্পৃহতা ক্রমেই বাড়িতেছে। আবার নিষ্কাম তত্ত্বের ধূয়া তুলিয়া সকাম কর্ম্মের নিন্দা করাও আজি কালি একটি সংক্রামক ব্যাধি দাঁড়াইয়াছে। তুচ্ছ অর্থের জন্য, ক্ষুদ্র স্বার্থপরতার নিমিত্ত, লোকে কত না পাপই করিতেছে। কামনার পূরণকেই পরম পুরুষার্থ ভাবিয়া, কামনার দাস কে না হইতেছে? অথচ এই সকল কামনার দাস, বিদ্যাভিমানী ব্যক্তিগণ, নিষ্কাম কর্ম্মতত্ত্বের অধিকারী হহেন। জ্ঞান বা ভক্তি সাধনা করিতে হইলে, বিষয়ে মোহত্যাগ, অনাচারে অনাসক্তি, সংযমে অভিরুচি, সৎকর্ম্মে অনুরক্তির আবশ্যকতা। নচেৎ জ্ঞান বা ভক্তির অনুশীলন পণ্ডশ্রম মাত্র।

জ্ঞানবাদীরা কি ভুলিয়া গিয়াছেন, কর্ম্মানুষ্ঠান চিত্তশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানোৎপত্তির জনক? ভক্তিবাদীরাও কি ভাবেন না, সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি ব্যতীত ভক্তি সাধনার সিদ্ধিলাভ সুদূর পরাহত।

ভক্তিবাদী সম্প্রদায়।

বৈষ্ণবেরাই যে কেবল ভক্তিবাদী, তাহা নহে; তথাপি ভক্তিবাদী বলিতে সাধারণতঃ বৈষ্ণবই বুঝায়। বৈষ্ণব ভক্তিবাদীদিগের মধ্যে শ্রী-সম্প্রদায়ী, বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ী, গোবিন্দ-সম্প্রদায়ীই বিখ্যাত। ইহাদিগের মতানুযায়ীই শ্রীচৈতন্য আপনার ধর্ম্ম মত গঠন করেন। ব্রহ্মসূত্রকার একটি ভক্তিবাদী বৈষ্ণব মতের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা * ভাগবত মত। এইমতে নিরঞ্জন, নিত্যজ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবই পরমাত্মা। সঙ্কর্ষণাখ্য জীব পরমাত্মার অংশ স্বরূপ। প্রদ্যুম্ননামা মন। অনিরুদ্ধনামা অহঙ্কার। এই চারিটি ব্যূহ

* ইহা শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মত নহে।

বা মূর্ত্তি ; তজ্জন্য ভাগবত-মতবাদীরা চতুর্ব্যূহবাদী। বাসুদেবই পরা প্রকৃতি আর তিনটি তাহার কার্য্য। কায়মনোবাক্যে দেবমন্দিরে গমন ও দেবগাত্রমার্জ্জন, ভক্তি-পূর্ব্বক দেবতার আরাধনা করিলেই মনুষ্য বাসুদেবকে প্রাপ্ত হইবে। সর্ব্বাত্মস্বরূপ পরমাত্মা আপনাকে এই চারি প্রকার ব্যূহ বা মূর্ত্তিরূপে প্রকটিত করিয়াছেন। শ্রুতি যথা—স একধা ভবতি, ত্রিধা ভবতি, চতুর্ধা ভবতি। পরমাত্মা হইতে জীব, জীব হইতে মন, মন হইতে অহঙ্কার। এই চারিটি ব্যূহের নামই বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ।

আমাদের মনে হয় অদ্বৈতবাদীর যে তুরীয় ব্রহ্ম—তাহাই বাসুদেব। কারণোপহিত চৈতন্য যে প্রাজ্ঞ—তাহাই জীব। সূক্ষ্মোপহিত চৈতন্য যে হিরণ্যগর্ভ (মনঃসমষ্ট্যাত্মক)—তাহাই প্রদ্যুম্ন। স্থূলোপহিত চৈতন্য যে বিশ্ব—তাহাই অনিরুদ্ধ।

অতএব যাহা দেখা গেল, তাহাতে কি অদ্বৈতবাদ কি দ্বৈতাদ্বৈতবাদ সর্ব্বত্রই ভক্তি তত্ত্বের উপযোগিতা ও সার্থকতা বিশেষ ভাবেই বিদ্যমান। বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতবাদে ভক্তিই প্রধান উপজীব্য। তথাপি যে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মের পর ভক্তিতত্ত্ব আরও প্রস্ফুট ও ইহার প্রচার দেশব্যাপী হইয়াছে, সঙ্কীর্ত্তনাদি দ্বারা লোকের মনোবৃত্তি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহই নাই। বৈষ্ণব কবিগণের গীতি কবিতা—যাহা জগৎ সমক্ষে গৌরবে দেখাইবার সামগ্রী—তাহা ভক্তিতত্ত্বেরই কয়েকটি ফল।

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ।

আর একখানি চিঠি।

(১৪ই পৌষ, ১৩১৯)।

শ্রীশ্রীহরি।

বাবা—অনেকদিন গত হইল আপনার একখানি পত্র পাইয়াছি ও সুখী হইয়াছি। ......আপনার পত্রপাঠে বড় আনন্দ হয়।............শ্রীভগবান্ প্রেমের আধার, তাঁর দয়া "ঝরে অবিরত ধারে",—তাঁর কথা কি বলিতে জানি,- তাঁর করুণার অভাব নাই, মানুষ অনুভব করিয়া শান্তি পাইলেই—তাঁ'র সুখ।

কীর্ত্তন কি সুন্দর জিনিষ!.........আমি ছোট হইতে পদাবলী বড় ভালবাসি, প্রায়ই পাঠ করি,—আমাদের মত লোকের প্রার্থনাগুলি খুবই ভাল লাগে। শ্রীভগবানের কীর্ত্তন গান বড় সুখের ও সরস ভজন,—আপনি কীর্ত্তনানন্দে আছেন শুনিয়া বড় আনন্দ পাইলাম; শ্রীভগবান্ আপনাকে বিমল আনন্দে ডুবাইয়া রাখুন প্রার্থনা করি। ....তাঁহার উপর সমস্ত ভার দিয়া, তাঁ'র দাসভাবে সাধ্যমত কর্ত্তব্যপালন বড় সুন্দর ভজন। ইচ্ছা হয় বাবা, পারি না।—সংসারী জীব চিন্তা ছাড়ে কৈ? তবে বাবাজীর কৃপায় যতই নিশ্চিন্ত হইতেছি, ততই আনন্দ অনুভব বেশী হইতেছে। একদিক ঢিলা না হইলে, অন্য দিক শক্ত হয় না। আমরা আনন্দের কাঙ্গাল, আনন্দময়ের দিকে পিছন দিয়া'ছি; ক্রমে তাঁহাকে দূরে

মনে করিয়া, হাহাকার করিতেছি; তাই পূর্ব্ব আনন্দ আবার ফিরে পাইতে ব্যাকুল; একটু বেশী আনন্দ পাইলেই ছোটটুকু ত্যাগ করি; যে যা চাই তাই পাব;—যেদিন খণ্ড ছেড়ে অখণ্ড পাব, ক্ষুদ্র ছেড়ে বৃহৎ পাব, সে দিন এ বাঁধন আপনিই খ'সে যাবে। জোর ক'রে বাঁধন খুলিতে যাওয়া বাবা বড় ভুল; বড় পেলে কে ছোট চায়? যখন সর্ব্বস্ব পাব, তখন কে আর এসব দেখে? তখন যে আমিই নেই, বাবা গো কি সুখের অবস্থা, কি আনন্দ! আনন্দে আপনা হারা। তখন আর কোথা সংসার। কোথায় ছেলেমেয়ে।

শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের কয়েকটা শ্লোক আজকাল কি যে ভাল লাগে—কি জানাব? আপনি কি ভাগবত দেখেন? শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে গোপীর আত্মবিস্মরণ কি অবস্থা!

পদাবলীতে একস্থানে শ্রীরাধিকার আক্ষেপ আছে—

"ধিক র'হু এছার ইন্দ্রিয় মোর সব
সতত কালিয়া কানু করে অনুভব।"

তিনি ভুলিতে ব্যস্ত—ইচ্ছায় নয়, লোকের জ্বালায় ভোলা যায় না।

একটা পদে আছে,— "সখিরে, অব কি করবি উপদেশ—
কানু অনুরাগে মোর তনুমন মাতল
না শুনে ধরম লব লেশ।"

পদাবলীর সব মধুর প্রার্থনা ছাড়িয়া আরও উপরে উঠুন। ব্রজগোপীর ব্যভিচার বিশ্বাস ছাড়িয়া দিন, নিজে গোপী হ'য়ে ভেবে দেখুন কি সুখ, কি আনন্দ—তাঁর মিলনে আনন্দ, তাঁ'র বিরহে আনন্দ—তিনি যে বাবা আনন্দময়, প্রেমময়, তিনি যে সর্ব্বব্যাপী,—সুতরাং তিনি দূরে কোথা যাবেন? কালাচাঁদ গীতায় আছে না—"আমি দূরে চলে যাই, পাছে ক্ষত লাগে গায়, বাহু প্রসারিয়া ধরে গলে।" একবার দেখুন তিনি বুকে নেবার জন্য কি ব্যস্ত; তাঁ'র দয়ার শেষ নাই!

আপনি কি নিয়মিত কোনও বই পড়েন—গীতা, ভাগবত, কি কোন বৈষ্ণব গ্রন্থ? না পড়েন তো খুব গান করুন, গান শুনুন—গান বড় সুন্দর ভজন। রবি বাবুর এগানটী জানেন বোধ হয়;—

"আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি, দিবস কাটে বৃথায় হে,
আমি যেতে চাই তব পথ পানে, শত বাধা পায় পায় হে,
চারিদিকে হের ঘিরেছে কারা শত শত বাঁধনে জড়ায় হে,
আমি ছাড়াতে চাই, ছাড়েনা কেন গো বাঁধিয়ে রাখে মায়ায় হে,
দাও ভেঙ্গে দাও এভবের সুখ, কাজ নাই খেলায় হে,
আমি ভুলে থাকি যত অবোধের মত বেলা ব'য়ে তত যায় হে,
হান শতবাজ হৃদয় গহনে দুঃখানল জ্বাল তায় হে,
তুমি নয়নের জলে ভাসায়ে আমায় আবার দাও মুছায়ে হে,
শূন্য করে দাও হৃদয় আমার আসন পাত তথায় হে,
তুমি এস এস, নাথ হ'য়ে বস ছেড়না আর আমায় হে।"

আমার কি জানেন—পরোপদেশে পাণ্ডিত্য। কি যে করি সারাদিন, কেবল সংসার নিয়েই ব্যস্ত। ভগবান্ কি সংসার ছাড়া? তা নয় সত্য, তবু বড় অসুবিধা। ....কত ভাল গান শুনি, কত ভাল কথা শুনি—শুনিলে মনে থাকে কৈ?—তেমন কাতর প্রার্থনা আসে কৈ? এখন আর অবকাশ নাই—চলিলাম।

শ্রীহেমচন্দ্র সরকার।

উপরে উদ্ধৃত পত্রখানি বিগত পৌষ মাসে পাইয়াছিলাম।

ন্যায়-দর্শনের বাৎস্যায়ন-ভাষ্য।

ভূমিকা।

ভারতের প্রাচীন দর্শনগুলির মধ্যে মহর্ষি গৌতম-প্রণীত ন্যায়-সূত্র অতি দুরূহ বলিয়া প্রথিত। যে সময়ে ন্যায়সূত্র সকল রচিত হয়, তখন শিষ্য পরম্পরাক্রমে এই সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ সূত্রগুলি কেবল স্মৃতি সাহায্যেই প্রচারিত হইয়া ছিল। অবশ্য ইহার অর্থ শিষ্যেরা গুরুর নিকট বুঝিয়া লইত। কিন্তু ইহার পর এমন এক যুগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, যখন ভিন্ন মতাবলম্বী দার্শনিকগণ গৌতমকৃত সূত্র সকলের পাঠান্তর কল্পনা করিয়া, কোথাও বা নিজ মতানুকূল ব্যাখ্যা করিয়া, সূত্রগুলির যথার্থ অর্থবোধে ব্যাঘাত উপস্থিত করিয়াছিলেন। জৈন দার্শনিকগণ যে এরূপ অভিনব ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ জৈন-ন্যায়-গ্রন্থে বিদ্যমান। ঐ সময় ন্যায়সূত্রসমূহের প্রকৃত পাঠ ও যথার্থ অর্থ নির্দ্ধারণ করিতে বাৎস্যায়ন ন্যায়সূত্রের ভাষ্য রচনা করেন। ১।১।৫ সংখ্যক ন্যায়সূত্রের ভাষ্য পাঠ করিলে, বাৎস্যায়ন যে ভ্রান্ত পাঠ ও ব্যাখ্যা সংশোধনার্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন, এ বিষয়ের আভাস পাওয়া যায়।

বাৎস্যায়নভাষ্য গৌতমের ন্যায়সূত্রের বহুপরে রচিত হয়। নিম্নলিখিত বিষয়টি ইহার প্রমাণস্বরূপ উল্লিখিত হইতে পারে। গৌতমের 'ন্যায়' পঞ্চাবয়বাত্মক ;—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন এই পঞ্চ অবয়ব। এই পাঁচটি অবয়বের অতিরিক্ত কোনও অবয়ব গৌতমের কালে যে স্বীকৃত হইত না, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু যিনি দশ অবয়ব স্বীকার করেন, এমন নৈয়ায়িকও আছেন, বাৎস্যায়ন নিজ ভাষ্যে এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন। এই দশটি অবয়ব যথাক্রমে,—জিজ্ঞাসা, সংশয়, শক্যপ্রাপ্তি, প্রয়োজন, সংশয়ব্যুদাস, প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, গৌতমের পঞ্চ অবয়ব স্বীকারের পর অন্য দার্শনিকগণ অন্যান্য অবয়বের কল্পনা করেন। জৈনগ্রন্থে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। বাৎস্যায়নের সময় দশাবয়ববাদী নৈয়ায়িকেরা বর্ত্তমান ছিলেন।

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থগুলির রচয়িতার পরিচয় ও কালনির্ণয় করা অতিশয় কঠিন। বিভিন্ন যুক্তিবলে বিভিন্ন মত প্রকাশমাত্র করা যায় ; কিন্তু নিশ্চয়রূপে কিছু বলা অসম্ভব। যে বাৎস্যায়ন অপূর্ব্ব ভাষ্য রচনা করিয়া ন্যায়সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যাঁহার অসাধারণ তর্কপ্রণালী আজ পর্য্যন্ত সকলের বিস্ময়ের বিষয়, তাঁহার যথার্থ সময় নির্দ্ধারণ করা বহু আয়াসসাধ্য। আমরা সংক্ষেপে প্রচলিত কয়েকটি মতের উল্লেখ করিব।

দিঙ্‌নাগাচার্য্য প্রণীত "প্রমাণ সমুচ্চয়" নামক একখানি গ্রন্থ আছে। উক্ত গ্রন্থে দিঙ্‌নাগ বাৎস্যায়নের মত খণ্ডন করিয়াছেন। দিঙ্‌নাগের সময় নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে, আমরা এপর্য্যন্ত নিশ্চয়রূপে বলিতে সমর্থ হইব যে, বাৎস্যায়ন সেই সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু দিঙ্‌নাগের কাল এপর্য্যন্ত যথার্থরূপে নির্ণীত হয় নাই। কালিদাস মেঘদূতে দিঙ্‌নাগের উল্লেখ করিয়াছেন ;—

"দিঙ্‌নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূল হস্তাবলেপান্।" ইহাতে দিঙ্‌নাগ ও কালিদাস যে সমসাময়িক, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এই জ্ঞান হইতে দিঙ্‌নাগের কালনির্ণয়ের কোন সুবিধা হয় না ; কারণ কালিদাস কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাই নিশ্চিত হয় নাই। পণ্ডিতপ্রবর মোক্ষমূলর বলেন, দিঙ্‌নাগ অসঙ্গ নামক বৌদ্ধগুরুর শিষ্য। শীলভদ্র দিঙ্‌নাগের সহাধ্যায়ী ছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়েন চোয়াং ৬৩১ খৃষ্টাব্দে শীলভদ্রের নিকট অধ্যয়ন করিতেন। সুতরাং দিঙ্‌নাগের সময়ও ষষ্ঠ শতাব্দী। ডাক্তার ভউ-দাজী এই মত অনুসরণ করিয়া কালিদাসকেও ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

বিশ্বকোষে ন্যায়দর্শনের ইতিহাসলেখক পূর্ব্বোক্ত মত খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন, শীলভদ্র

যে অসঙ্গের শিষ্য ছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। ইউয়েন চোয়াং এ কথা কোথাও বলেন নাই। এই লেখকের মতে বসুবন্ধু ও দিঙ্‌নাগ অসঙ্গের শিষ্য এবং তাঁহারা খৃঃ দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। লেখক প্রধানতঃ জৈন পট্টাবলীর উপর নির্ভর করিয়াছেন। পট্টাবলীর তালিকা হইতে নিম্নলিখিত আচার্য্যগণ পরে পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা জানা যায়;—দিঙ্‌নাগ, উদ্যোতকর, ধর্ম্মকীর্ত্তি, ধর্ম্মোত্তর ও মল্লবাদী। ডাক্তার পিটর্‌সন মল্লবাদীর কাল ৩৫৮ খৃষ্টাব্দ বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। ইহা হইতে দিঙ্‌নাগের কাল আনুমানিক খৃঃ ২য় বা ৩য় শতাব্দী ধরা যাইতে পারে। লেখকের আর একটি যুক্তি এই যে, সমন্তভদ্র আপ্তমীমাংসা নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাহাতে বাৎস্যায়নের কাল জৈনপট্টাবলী মতে ৬৮ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং বাৎস্যায়নকে তাঁহারও পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে হইবে। জৈনপট্টাবলীর সত্যতার উপর এই মত স্থাপিত হইয়াছে।

উক্ত মত ভিন্ন আমরা একটি মত স্থাপনে অগ্রসর হইতেছি।

কামসূত্র নামক একখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। তাহা বাৎস্যায়ন রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ন্যায়দর্শনের ভাষ্যের ও কামসূত্রের ভাষা বিলক্ষণ সুসদৃশ। গ্রন্থারম্ভ, যুক্তি, তর্ক প্রভৃতি উভয় গ্রন্থে একই প্রকার। সুতরাং এই উভয় বাৎস্যায়ন যে এক, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। কামসূত্রের টীকায় বাৎস্যায়নের যথার্থ নাম মল্লনাগ, গোত্রনাম বাৎস্যায়ন, ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। (যথা— "বাৎস্যায়ন ইতি স্বগোত্রনিমিত্তা সমাখ্যা। মল্লনাগ ইতি চ সাংস্কারিকী।" প্রথম অধিকরণ দ্বিতীয় অধ্যায় ২০ সূত্রের টীকা)। মল্লনাগই যে বাৎস্যায়ন তাহার অন্য প্রমাণও আছে,—

"মল্লনাগোঽ ভ্রমাতঙ্গে বাৎস্যায়নমুনাবপি"—বিশ্বপ্রকাশ

এখন এই মল্লনাগ বা বাৎস্যায়নের আরও বিবিধ নাম আছে, যথা কৌটিল্য, চাণক্য, পক্ষিলস্বামী, দ্রামিল, বিষ্ণুগুপ্ত ও অঙ্গুল। ইহার প্রমাণ হেমচন্দ্র-বিরচিত অভিধান চিন্তামণির নিম্নলিখিত শ্লোক:—

"বাৎস্যায়নো মল্লনাগঃ কৌটিল্যশ্চণকাত্মজঃ।

দ্রামিলঃ পক্ষিলস্বামী বিষ্ণুগুপ্তোঽঙ্গুলশ্চ সঃ॥"

আরও এক প্রমাণ—উদয়নাচার্য্য, শঙ্করাচার্য্য ও বাচস্পতিমিশ্র স্থলে স্থলে বাৎস্যায়ন-রচিত ন্যায়ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়া, 'পক্ষিলস্বামী ইহা বলিয়াছেন' এইরূপ লিখিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ও কামসূত্রকার বাৎস্যায়ন যদি একই ব্যক্তি হন ও চাণক্য যদি তাঁহার নামান্তর হয়, তাহা হইলে তাঁহার কালনির্ণয়ে কোনও গোলযোগ নাই। সংস্কৃত বহু গ্রন্থে (যথা কামন্দকীয় নীতিসার, বৃহৎকথা, মুদ্রারাক্ষস, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতে) নন্দবংশধ্বংসকারী কুটিল রাজনীতি-প্রবর্ত্তক চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্য, কৌটিল্য বা বিষ্ণুগুপ্তের উল্লেখ আছে। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল ঐতিহাসিকগণ স্থিররূপে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। তাহার সহায়তায় আমরা বলিতে পারি, বাৎস্যায়ন খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। আরও একটা আনুষঙ্গিক প্রমাণ এই পাওয়া যায় যে, ঐ সময় জৈনমত বিশেষভাবে প্রচারিত হইতে থাকে। জৈনন্যায়ে গৌতমসূত্রসকল কল্পিত অর্থে প্রযুক্তও হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বাৎস্যায়ন গৌতমসূত্রের ভ্রান্ত পাঠ ও ব্যাখ্যা নিরাকরণ করিবার জন্যই প্রধানতঃ ভাষ্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী তাঁহার সময় বলিয়া ধরিলে বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।

ন্যায়সূত্রভাষ্য ও কামসূত্র ব্যতীত বাৎস্যায়ন আরও একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার আভাস আমরা কুমারসম্ভব, ৬ষ্ঠ সর্গ, ৩৭ শ্লোকের মল্লিনাথকৃত টীকা হইতে জানিতে পারি। মল্লিনাথ লিখিয়াছেন, "উক্তঞ্চাপি কৌটিল্যঃ। ভূতপূর্ব্বমভূতপূর্ব্বং বা জনপদং পরদেশাপবাহেন স্বদেশাভিষ্যন্দবমনেন বা

নিবেশয়েৎ।" রঘুবংশের পঞ্চদশ সর্গে ২৯ শ্লোকের মল্লিনাথকৃত টীকায়ও পূর্ব্বোক্ত চাণক্য-বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। চাণক্য ও বাৎস্যায়ন যদি একই ব্যক্তি হন, তাহা হইলে যে গদ্যগ্রন্থ হইতে পূর্ব্বোক্ত চাণক্যবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা ঐ কালে বর্ত্তমান ছিল, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। তাহাই বাৎস্যায়নের তৃতীয় রচনা।

দুরূহ বাৎস্যায়নভাষ্যের এ পর্য্যন্ত বঙ্গানুবাদ হয় নাই। ন্যায়দর্শন-পাঠার্থী সকলেরই ইহা পরম আদরনীয়। বঙ্গানুবাদ টিপ্পনীযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইলে সকলেরই মর্ম্মবোধে সহায়তা হইবে, এই আশায় প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় ইহার অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ন্যায়দর্শন-পাঠেচ্ছু সকলেই ইহা সাগ্রহে অধ্যয়ন করিবেন ও বাৎস্যায়নের সহিত একযোগে বলিবেন যে, তর্কশাস্ত্র—

"প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

বাৎস্যায়ন-ভাষ্য।

(মূল, অনুবাদ ও টিপ্পনী)

[১]

ভাষ্য। "প্রমাণতোঽর্থ-প্রতিপত্তৌ প্রবৃত্তিসামর্থ্যাদর্থবৎ প্রমাণং"।

অনুবাদ। (১) প্রমাণের দ্বারা অর্থের (সুখ, দুঃখ এবং তাহার কারণের) প্রতিপত্তি (বোধ) হইলে, প্রবৃত্তির সামর্থ্য (সফলতা) হয়; অর্থাৎ, প্রমাণই যথার্থজ্ঞানরূপ ব্যাপারের দ্বারা সকল প্রবৃত্তির জনক। সেইজন্য, প্রমাণ অর্থবৎ—অর্থের অব্যভিচারী এবং নিরতিশয় প্রয়োজন বিশিষ্ট।

টিপ্পনী। (১) ন্যায়দর্শনের বক্তা মহর্ষি গোতম প্রথমসূত্রের দ্বারা প্রমাণ প্রভৃতি ষোড়শপদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকে নিঃশ্রেয়স-লাভের উপায় বলিয়াছেন। সেই ষোড়শপদার্থের তত্ত্বজ্ঞান তাঁহার ন্যায়দর্শন-সাধ্য। সুতরাং নিঃশ্রেয়সলাভে ন্যায়দর্শন পরম সহায়।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, মহর্ষিকথিত পদার্থ-তত্ত্বজ্ঞান অসম্ভব; কারণ, প্রমাণের তত্ত্বজ্ঞানব্যতীত কোন পদার্থেরই তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারেনা। প্রামাণ্যই প্রমাণের তত্ত্ব। সেই প্রামাণ্যনিশ্চয়ের কোনই উপায় নাই। অনুভূতির সাধন হইলেই তাহাকে প্রমাণ বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না; কারণ, যাহা বস্তুতঃ প্রমাণ নহে, প্রমাণের ন্যায় প্রতীত হয় বলিয়া যাহাকে দার্শনিকগণ "প্রমাণাভাস" বলেন, ভ্রমসাধন সেই প্রমাণাভাসের দ্বারাও কত কত অনুভূতি হইতেছে। যাহা যথার্থ অনুভূতির সাধন, তাহাই প্রমাণ। কিন্তু সেই অনুভূতি যথার্থ হইল কি না, তাহা নিশ্চয় করিবার কোন উপায় না থাকায় প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয় কোনরূপেই হইতে পারে না। প্রমাণকে প্রমাণ বলিয়া যথার্থরূপে বুঝিতে না পারিলেও তাহার দ্বারা তত্ত্বনিশ্চয় করা যায় না।

প্রমাণের প্রামাণ্য এবং তজ্জন্য অনুভূতির যথার্থতা স্বতোগ্রাহ্য, অর্থাৎ তাহা বুঝিতে আর প্রমাণান্তরের প্রয়োজন হয় না, ইহাও সিদ্ধান্ত করা যায় না। কারণ, প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় এবং প্রমাণজন্য জ্ঞানের যথার্থতা নিশ্চয়, ইহা স্বতঃসাধ্য হইলে, নিশ্চয় সংশয়ের বিরোধী বলিয়া প্রমাণের প্রামাণ্য-সংশয় এবং তজ্জন্য জ্ঞানের যথার্থতা-সংশয় হইতে পারিত না। কিন্তু ইহা প্রমাণ কি না, এই জ্ঞান যথার্থ কি না এইরূপে প্রমাণের প্রামাণ্য-সংশয় এবং তজ্জন্য জ্ঞানের যথার্থতা-সংশয় অনেক সময়ে অনেকেরই হইতেছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পরন্তু প্রামাণ্য "স্বতোগ্রাহ্য" হইলে অপ্রামাণ্যও স্বতোগ্রাহ্য হইতে পারে। প্রামাণ্যের ন্যায় অপ্রামাণ্যকেও স্বতোগ্রাহ্য বলিলে ভ্রমজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ভ্রমত্ব নিশ্চয় হইয়া যাইত। বস্তুতঃ সর্ব্বত্র তাহা হয় না। তাহা হইলে ভ্রমজ্ঞানের ভ্রমত্বনিশ্চয় করিবার জন্য আর কোনও প্রয়াস আবশ্যক হইত না। ফলতঃ অপ্রামাণ্যের ন্যায় প্রামাণ্যও স্বতোগ্রাহ্য হইতে পারে না। অন্যপ্রকারেও প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় সম্ভব নহে। সুতরাং মহর্ষি গোতমের উপদিষ্ট পদার্থ তত্ত্বজ্ঞান অসম্ভব। অসম্ভবের উপদেশক বলিয়া তাঁহার এই শাস্ত্র অনর্থক। পদার্থের তত্ত্বনিশ্চয় না হইলেও, দৃষ্টবিষয়ে তত্ত্বসন্দেহেও, হয়ত কোনরূপে কার্য্যকলাপ চলিতে পারে। কিন্তু বহুবিত্তব্যয় ও বহুক্লেশ-সাধ্য অদৃষ্ট-ফলক বৈদিককার্য্য-কলাপ কোনরূপেই চলিতে পারে না।

আর এক কথা প্রমেয়ের তত্ত্বজ্ঞানই মিথ্যাজ্ঞানের নিরাসের দ্বারা মোক্ষের সাক্ষাৎ-কারণ, ইহা মহর্ষি পরে বলিবেন। সুতরাং মোক্ষোপযোগী প্রধান পদার্থ "প্রমেয়ের" প্রথম উল্লেখ না করিয়া সর্ব্বাগ্রে "প্রমাণ" পদার্থের উল্লেখ করা মহর্ষির উচিত হয় নাই।

এই সমস্ত আশঙ্কা নিরাসের জন্য ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ভাষ্যারম্ভে বলিতেছেন—

"প্রমাণতোঽর্থ-প্রতিপত্তৌ প্রবৃত্তিসামর্থ্যাদর্থবৎ প্রমাণং।"

ভাষ্যকারের কথা এই যে,—প্রমাণ তাহার প্রতিপাদ্য পদার্থের অব্যভিচারী; অর্থাৎ, প্রমাণ যে পদার্থকে যেরূপে এবং যে প্রকারে প্রতিপন্ন করিবে, সে পদার্থ সেইরূপে ও সেই প্রকারেই থাকিবে, কখনও তাহার অন্যথা হইবে না; অন্যথা হইলে বুঝিবে, তাহা প্রমাণ নহে "প্রমাণাভাস"। প্রমাণাভাস রজ্জুকে সর্প বলিয়া বুঝাইয়া থাকে; কিন্তু রজ্জুর স্বরূপ প্রত্যক্ষ হইয়া গেলে তখন বুঝা যায়, সেখানে সর্প নাই। সুতরাং "প্রমাণাভাস" তাহার প্রতিপাদ্য পদার্থের ব্যভিচারী। প্রমাণ কিন্তু পদার্থের অব্যভিচারী। এই অর্থের অব্যভিচারিতাই প্রমাণের প্রামাণ্য। ইহা অজ্ঞেয় নহে। অনুমাণ প্রমাণের দ্বারাই ইহা নিশ্চয় করা যায়। কোন্ হেতুর দ্বারা কিরূপে তাহার অনুমান করা যায়, প্রথমতঃ তাহাই দেখাইবার জন্য ভাষ্যকার "প্রমাণং অর্থবৎ" এইরূপ প্রতিজ্ঞা এবং "প্রবৃত্তিসামর্থ্যাৎ" এইরূপ হেতুবাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। "অর্থবৎ" এইস্থলে নিত্যযোগ অর্থে,—মতুপ্ প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। নিত্যযোগ বলিতে নিত্যসম্বন্ধ। প্রমাণে অর্থের নিত্যসম্বন্ধ ঐ অব্যভিচারিতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহা হইলে "প্রমাণং অর্থবৎ" এই কথার দ্বারা

বুঝা গেল প্রমাণ অর্থের অব্যভিচারী। এই অর্থের অব্যভিচারিতাই প্রমাণের প্রামাণ্য, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং প্রমাণে অর্থের অব্যভিচারিতার অনুমানই তাহার প্রামাণ্যের অনুমান। এই প্রামাণ্যানুমানে হেতু "প্রবৃত্তিসামর্থ্য।" "প্রবৃত্তিসামর্থ্য" বলিতে প্রবৃত্তির ফলসম্বন্ধ; ইহা ভাষ্যকার নিজেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐ প্রবৃত্তি-সামর্থ্য সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে প্রমাণে থাকে না; সুতরাং সমর্থপ্রবৃত্তি-জনকত্বই উহার ফলিতার্থ বুঝিতে হইবে। "প্রবৃত্তিসামর্থ্যাৎ "এই কথার প্রতিশব্দ সমর্থ প্রবৃত্তিজনকত্বাৎ। যে প্রবৃত্তির অর্থ (বিষয়) সম্যক্ অর্থাৎ যথার্থজ্ঞানের বিষয় হইয়াছে, তাহাকে "সমর্থ প্রবৃত্তি" বলে। স্থূলকথায় সফলা প্রবৃত্তিকেই সমর্থ প্রবৃত্তি বা সংবাদি প্রবৃত্তি বলে। তাহা হইলে প্রমাণ সফল-প্রবৃত্তির-জনক, এজন্য অর্থের অব্যভিচারী। ইহাই ভাষ্যোক্ত প্রতিজ্ঞা ও হেতু-বাক্যের দ্বারা বুঝা গেল।

অবশ্য প্রমাণ স্বতঃই সফল প্রবৃত্তির জনক নহে। তাই বলিয়াছেন,—"প্রমাণতোঽর্থ-প্রতিপত্তৌ"। অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা অর্থের জ্ঞান হওয়ার পরে, সেই পদার্থ ইষ্ট-সাধন বলিয়া মনে হইলে সংসারীর তাহা পাইতে ইচ্ছা হয়, আর অনিষ্ট-সাধন বলিয়া মনে হইলে তাহার পরিহার করিতে ইচ্ছা হয়; সেই ইচ্ছাবশতঃ তাহার প্রাপ্তি বা পরিহারে প্রবৃত্ত হইলে তাহার প্রাপ্তি বা পরিহার হইয়া থাকে। সুতরাং সেইখানে সেই প্রবৃত্তির সফলতা হয়। এই ভাবে প্রমাণ জন্য অর্থজ্ঞান ঐ সকল প্রবৃত্তির মুখ্য কারণ হইলেও উহা প্রমাণ-ব্যতীত হয় না, উহা প্রমাণেরই ব্যাপার; সুতরাং ঐ অর্থজ্ঞানরূপ ব্যাপারের দ্বারা প্রমাণও সফল-প্রবৃত্তির জনক। প্রমাণাভাস সফল-প্রবৃত্তির জনক নহে। কারণ বস্তু না থাকিলেও, প্রমাণাভাসের দ্বারা অন্য বস্তুতে তাহার ভ্রম হইয়া থাকে; সেখানে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রাপ্তি বা পরিহারের ইচ্ছায় প্রবৃত্ত হইলে, সেই বস্তুর প্রাপ্তি বা পরিহার হইতে পারে না। বস্তু না থাকিলে তাহার প্রাপ্তি বা পরিহার কেমন করিয়া হইবে? প্রমাণাভাস জন্য জ্ঞান,—ভ্রম; সেই ভ্রম সফল-প্রবৃত্তির জনক নহে, সুতরাং তাহার দ্বারা প্রমাণাভাসও সফল-প্রবৃত্তির জনক হইতে পারে না। যে জ্ঞান সমর্থ প্রবৃত্তির জনক, তাহাই যথার্থ; যে জ্ঞান যথার্থ নহে, তাহা সমর্থ প্রবৃত্তির জনক নহে, যেমন ভ্রম। এইরূপে ঐ সমর্থ-প্রবৃত্তি-জনকত্বহেতুর দ্বারা, প্রমাণ জন্য জ্ঞানের যথার্থতাও অনুমিত হইয়া থাকে; সুতরাং প্রমাণ জন্য জ্ঞানের যথার্থতা-নিশ্চয়ও অসম্ভব নহে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, যে প্রমাণের দ্বারা প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় করা হইতেছে, সে প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় কিরূপে হইবে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রদর্শিত অনুমানই প্রমাণের প্রামাণ্য সাধক। ঐ অনুমানের হেতু নির্দ্দোষ বলিয়াই সুনিশ্চিত। যদি প্রমাণ অর্থের অব্যভিচারী না হইত, তাহা হইলে সফল প্রবৃত্তি জন্মাইত না; যাহা অর্থের অব্যভি-চারী নহে, তাহা সফল প্রবৃত্তির জনক নহে, যেমন প্রমাণাভাস; ইহা বুঝিলে ঐ অনুমানের হেতুতে ব্যভিচার-সংশয়ও হয় না। সুতরাং উহার প্রামাণ্য সুনিশ্চিত। প্রমাণান্তরের দ্বারা

উহার প্রামাণ্য নিশ্চয় করিবার কোন প্রয়োজনই নাই। যিনি উহারও প্রামাণ্য-নিশ্চয়ের জন্য ব্যাকুল, তিনি "এই অনুমান প্রমাণ; যেহেতু ইহার হেতু নির্দ্দোষ, ইহার হেতুতে ব্যভিচার-সংশয়ও নাই"—এইরূপে উহার প্রামাণ্যের অনুমান করিয়া ব্যাকুলতা দূর করিবেন। অনুমান মাত্রেই প্রামাণ্য-সংশয় হয় না। তর্ক-পরিশোধিত স্বতঃপ্রমাণ অনুমানও প্রচুর আছে। এই যে ঘড়ি দেখিয়া, সময়ের অনুমান করিয়া, তদনুসারে এখন দেশে অসংখ্যকার্য্য চলিতেছে; লিপিপাঠে অনুমান করিয়া, কত কত তত্ত্বের নির্ণয় হইতেছে; গণিতের দ্বারা কত কত দুরূহ তত্ত্বের অনুমান করিয়া, তদনুসারে নিসংশয়ে কত কত কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে; তুলাদণ্ডের সাহায্যে দ্রব্যের গুরুত্ব বিশেষের অনুমান করিয়া, সুচির-কাল হইতে ক্রয় বিক্রয় ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে; ভূয়োদর্শন-সিদ্ধ অবিসংবাদী সংস্কার সমূহের মহিমায় আরও কত কত অনুমান করিয়া সুচিরকাল হইতে জীবকুল জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে; এই সকল অনুমানে কি বস্তুতঃ সর্ব্বত্রই প্রামাণ্য-সংশয় হইয়া থাকে? অবশ্য অনেকস্থলে প্রমাণে প্রামাণ্য-সংশয় এবং তজ্জন্য জ্ঞানে যথার্থতা-সংশয় হইয়া থাকে; তাই ন্যায়াচার্য্যগণ অন্য দার্শনিকের ন্যায় একেবারে স্বতঃপ্রামাণ্যপক্ষ স্বীকার করেন নাই। কিন্তু অনেক প্রমাণ-বিশেষের স্বতঃপ্রামাণ্য তাঁহারাও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য্যটীকা প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার সংবাদ দিতেছে।

সংশয়বাদী প্রতিপক্ষ ইহা স্বীকার না করিলে স্বপক্ষ সমর্থনই করিতে পারেন না। কারণ তাঁহার স্বপক্ষ-সমর্থনেও প্রমাণ আবশ্যক। প্রমাণ ব্যতীত কোন পক্ষই সিদ্ধ হইতে পারে না। সংশয়বাদীরও পক্ষ আছে, যুক্তির দ্বারাই তিনি তাহা সিদ্ধ করিবেন। যুক্তি বলিয়া স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নাই। অনুমান প্রমাণের প্রচলিত নামই যুক্তি। অনুমান মাত্রেই প্রামাণ্য সংশয় করিলে, তাহার দ্বারা তাঁহার পক্ষও নির্ণীত হইবে না। যুক্তির দ্বারা কিছু স্থির হয় না, সর্ব্বত্র সংশয় থাকে, কোন যুক্তিই প্রতিষ্ঠিত নহে, এরূপ কথাও বলা যায় না। কারণ ঐ কথাগুলিও যুক্তির দ্বারা নির্ণয় করিয়াই বলা হইতেছে। পরন্তু, সংশয় মনোগ্রাহ্য। সংশয় হইতেছে, ইহা মনের দ্বারাই বুঝা যায়। সে মানসপ্রত্যক্ষে মনঃ স্বতঃপ্রমাণ। সুতরাং কোন বিষয়ে সংশয় হইলে সংশয় হইয়াছে কি না এইরূপ সংশয় কাহারও হয় না। সর্ব্বত্র প্রমাণের প্রামাণ্যসংশয় হইলে তাহা মনের দ্বারাই বুঝা যাইত। যে প্রমাণে বস্তুতঃ প্রামাণ্য সংশয় হইবে, তাহাতে সমর্থ-প্রবৃত্তি-জনকত্বহেতুর দ্বারা অথবা ঐরূপ অন্য কোন হেতুর দ্বারা প্রামাণ্যের অনুমান করিতে হইবে। সেই হেতুতে ব্যভিচারাশঙ্কা হইলে অনুকূল তর্কের দ্বারা তাহা দূর করিবে। তাহার পরে কাহারও প্রামাণ্য-সংশয় থাকিবে না। যদি কেহ তাহাতেও প্রামাণ্য-সংশয়ের কথা বলেন, তখন অন্য অনুমানের দ্বারা সেই পূর্ব্বানুমানের প্রামাণ্য বুঝাইয়া দিতে হইবে। এইরূপে স্বতঃ-প্রমাণ অনুমান আসিয়া পড়িলে, তখন আর কেহ প্রামাণ্যসংশয়ের কথা বলিতে পারিবেন না। প্রামাণ্য-সংশয় বলিতে গেলেও তাহার কারণ দেখাইতে হইবে। বিনা-কারণে

সংশয় হইতে পারে না। সে কারণও প্রমাণ-সিদ্ধ করিয়া দেখাইতে হইবে। ফলতঃ যাহা অনুভব-সিদ্ধ, তাহা স্বীকার না করিলে, অবিসংবাদী সত্যের অপলাপ করিলে, সংশয়বাদীরও নিস্তার নাই। মূল কথা, কোনস্থলে স্বতঃ, কোনস্থলে অনুমান প্রমাণের দ্বারা প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয় হইয়া থাকে, ইহা অবিসংবাদী সত্য। সুতরাং প্রমাণের দ্বারা প্রমেয় প্রভৃতির তত্ত্বজ্ঞান অসম্ভব হইতে পারে না। প্রমাণ বিষয়ে অন্যান্য কথা মহর্ষি নিজেই বলিয়াছেন। যথাস্থানেই তাহা প্রকটিত হইবে।

আপত্তি হইতে পারে যে, প্রবৃত্তির সফলতার পূর্ব্বে প্রমাণে সফল-প্রবৃত্তি-জনকত্ব-নিশ্চয় হইতে পারে না। সুতরাং তখন প্রমাণের প্রামাণ্যনিশ্চয়ও হইতে পারে না। প্রামাণ্য-নিশ্চয় না হইলেও পদার্থনিশ্চয় হইতে পারে না; পদার্থনিশ্চয় না হইলে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। প্রবৃত্তি না হইলে কোন কালেই প্রমাণের প্রামাণ্য-নিশ্চয়ের আশা থাকিল না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রবৃত্তিতে পদার্থনিশ্চয় নিয়ত কারণ নহে। পদার্থ সন্দেহ স্থলেও প্রবৃত্তি হইয়া থাকে এবং অনবরত হইতেছে। পরন্তু পূর্ব্বে প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় না থাকিলেও প্রমাণের ফল জ্ঞান হইবার কোন বাধা নাই। প্রমাণের দ্বারা জ্ঞান হইবার পরে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ইচ্ছা বিশেষ প্রযুক্ত প্রবৃত্ত হইয়া যখন ঐ প্রবৃত্তির ফললাভ হয়, তখন ঐ প্রবৃত্তির মূল কারণ প্রমাণে সমর্থ-প্রবৃত্তি জনকত্বনিশ্চয় হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অনুমানের দ্বারা ঐ প্রমাণের প্রামাণ্যনিশ্চয় হইয়া যায়। পদার্থজ্ঞান ও প্রবৃত্তির পূর্ব্বে সর্ব্বত্র প্রমাণের প্রামাণ্যনিশ্চয় না থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই।

যেখানে একজাতীয় প্রমাণের দ্বারা পুনঃ পুনঃ পদার্থজ্ঞান হইতেছে, সেখানে প্রথম প্রমাণে সফল-প্রবৃত্তিজনকত্ব-নিশ্চয়ের পরে তাহার প্রামাণ্যনিশ্চয় হইলে পরবর্ত্তী তজ্জাতীয় প্রমাণে সফলপ্রবৃত্তিজনক জাতীয়ত্ব হেতুরদ্বারা পূর্ব্বেই প্রামাণ্য-নিশ্চয় হয়, সুতরাং সেখানে পূর্ব্বেই পদার্থ নিশ্চয় করিয়া প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। প্রমাণমূলক প্রচলিত ব্যবহারে এইরূপ স্থল প্রচুর। এবং আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি দৃষ্টার্থক বেদের প্রামাণ্য-নিশ্চয় হওয়ায় তজ্জাতীয় অদৃষ্টার্থক বেদেরও প্রামাণ্য নিশ্চয় সফলপ্রবৃত্তিজনক জাতীয়ত্ব হেতুর দ্বারা পূর্ব্বেও হইতে পারে ও হইয়া থাকে। সুতরাং অদৃষ্টফলক বৈদিক কার্য্য কলাপের একেবারে লোপ হইবে না। অদৃষ্টার্থক বেদের প্রামাণ্য কথা মহর্ষি নিজেই বলিয়াছেন। যথাস্থানেই তাহার বিশদ প্রকাশ হইবে।

প্রতিপত্তি শব্দের অর্থ জ্ঞান। কেবল প্রতিপত্তি বলিলে তাহার দ্বারা প্রমাণ বিষয়ক জ্ঞানও বুঝা যায়, কিন্তু তাহা কোন অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মায় না। এবং প্রমাণের দ্বারা জ্ঞান হইলেও উপেক্ষণীয় বলিয়া বুঝিলে উপেক্ষাই করে, সেখানে কোন অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হয় না। উপেক্ষা কোন অনুষ্ঠান নহে। যেখানে ইষ্ট-সাধনত্ব-বোধে প্রাপ্তির ইচ্ছা হয়, অথবা অনিষ্ট-সাধনত্ব-বোধে ত্যাগের ইচ্ছা হয়; সেখানেই তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হয়। সুতরাং প্রবৃত্তির কথায় প্রবর্ত্তক জ্ঞানেরই উল্লেখ করিতে হইবে। তাই বলিয়াছেন "অর্থপ্রতিপত্তৌ"।

প্রাপ্তির ইচ্ছার বিষয় সুখ ও সুখহেতু এবং পরিহারের ইচ্ছার বিষয় দুঃখ ও দুঃখহেতুই "অর্থ", ইহা ভাষ্যকার স্বপদবর্ণনাস্থলে নিজেই বলিবেন। ন্যায়বার্ত্তিককার এক পক্ষে বলিয়াছেন যে, অর্থ বলিতে যাহা অর্থ্যমান। সুখ ও সুখহেতু সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই অর্থ্যমান। দুঃখ ও দুঃখহেতুর পরিহার ও অর্থ্যমান বলিয়া ভাষ্যকার তাহাকেও অর্থ বলিয়াছেন।

"প্রমাণতঃ"এই পদটী তৃতীয়া ও পঞ্চমীবিভক্তির সকল বচনেই সিদ্ধহয়। সুতরাং উহার দ্বারা বিভিন্ন বিভক্তিজ্ঞান পূর্ব্বক এক একটী করিয়া বহুঅর্থ বুঝাইতে পারে। কোন স্থলে একমাত্র প্রমাণের দ্বারা, কোনস্থলে দুই বা বহু প্রমাণের দ্বারা পদার্থ বোধ হয়, ইহা ভাষ্যকার পরে বুঝাইবেন। এখানেও তৃতীয়া বিভক্তির একবচন দ্বিবচন ও বহু বচন সিদ্ধ—"প্রমাণতঃ" এই প্রয়োগের দ্বারা ভাষ্যকার তাহাই প্রকটিত করিয়াছেন। এবং যদিও করণার্থক অনট্ প্রত্যয়সিদ্ধ প্রমাণশব্দের দ্বারাই প্রমাণের করণত্ব বোধ হয়; তথাপি তৃতীয়া বিভক্তির দ্বারা ঐ করণত্বের পুনঃ প্রকাশ করিয়া যথার্থ জ্ঞানের অন্যান্য কারক হইতে তাহার করণ কারক প্রমাণের শ্রেষ্ঠত্ব-বশতঃ তাহার প্রাথম্য ও ব্যুৎপাদ্যতা যুক্তিযুক্ত ইহাই সূচনা করিয়াছেন। এবং পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা প্রমাণ অর্থ প্রতিপত্তির হেতু ইহাও স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যদিও করণত্ব বুঝিলেই হেতুত্ব বুঝা যায়, কারণ হেতু বিশেষই করণ; তথাপি পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা স্পষ্টরূপে শীঘ্র হেতুত্ব-বোধন করিয়া প্রমাণ ও তাহার ফল অর্থপ্রতিপত্তি অভিন্ন নহে ইহাই বিশেষ করিয়া বুঝাইয়াছেন। হেতু বলিয়া বুঝিলে তাহার ফলকে হেতু হইতে ভিন্ন বলিয়াই বুঝা যায়। ফলতঃ "প্রমাণেন প্রমাণাভ্যাং প্রমাণৈঃ প্রমাণাৎ" এই গুলির কোন একটী বাক্যের প্রয়োগ করিলে তাহার দ্বারা ভাষ্যকারের বিবক্ষিত সকল অর্থ প্রকটিত হয় না। তাই প্রয়োগচতুর ভাষ্যকার "প্রমাণতঃ" এইরূপ বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন।

"প্রমেয়" পদার্থের উল্লেখ না করিয়া সর্ব্বাগ্রে প্রমাণ-পদার্থের উল্লেখ করা, মহর্ষির উচিত হয় নাই, এই আশঙ্কা নিরাসের জন্য ভাষ্যকার "অর্থবৎ" এই বাক্যে শ্লিষ্ট "অর্থ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় "অর্থ" শব্দের অর্থ প্রয়োজন। এবং অর্থবৎ এস্থলে "অতিশায়ন" অর্থে মতুপ্-প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। তাহা হইলে "প্রমাণং অর্থবৎ" এ কথার দ্বারা বুঝা গেল, প্রমাণ নিরতিশয় প্রয়োজনবিশিষ্ট। অর্থাৎ প্রমাণের প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহাতেও পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তি-সামর্থ্যই হেতু। তাহা হইলে বুঝা গেল প্রমাণের দ্বারা অর্থ প্রতীতি হইলে প্রবৃত্তির সফলতা হয়। সুতরাং প্রমাণ সফল-প্রবৃত্তির জনক এবং যথার্থ জ্ঞানের সাধন। প্রমাণ ব্যতীত কোন পদার্থেরই যথার্থ জ্ঞান হইতে পারে না। প্রমাণ সকল পদার্থের ব্যবস্থাপক। প্রমেয় প্রভৃতি যাবৎপদার্থই প্রমাণের মুখাপেক্ষী। সুতরাং প্রমাণ নিরতিশয় প্রয়োজনবিশিষ্ট। তাই মহর্ষি সর্ব্বাগ্রে "প্রমাণ" পদার্থেরই উল্লেখ করিয়াছেন।

ক্রমশঃ

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

সরল যোগসাধন।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

যমের চতুর্থ সাধন, ব্রহ্মচর্য্য ;—

কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
সর্ব্বত্র মৈথুন-ত্যাগো ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষ্যতে ॥—যোগি যাজ্ঞবল্ক্য, ১।৫০

শরীর, মন ও বাক্যদ্বারা সর্ব্বতোভাবে মৈথুন ত্যাগ করাকে ব্রহ্মচর্য্য কহে। মনীষিগণ মৈথুনকে অষ্ট প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন।

শ্রবণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্। সংকল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেবচ ॥
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মণীষিণঃ। বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ।—দক্ষসংহিতা।

অর্থাৎ কোন সুন্দরী স্ত্রীর সৌন্দর্য্য বিষয় শ্রবণ করা, কিম্বা তাহা বর্ণন করা, তাহার সহিত রহস্য করা, প্রেক্ষণ ইঙ্গিত করা, একান্ত প্রদেশে তাহার সহিত কথোপকথন করা এবং অধ্যবসায় সহ মনে দৃঢ় সংকল্প করিয়া ক্রিয়া নিষ্পত্তি করা, এই অষ্ট প্রকারই মৈথুনের অঙ্গ। ইহার যে বিপরীতাচরণ, তাহাই ব্রহ্মচর্য্য। এই অষ্টবিধ মৈথুনের অঙ্গ, কায়মন-বাক্যে, সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিলে, ব্রহ্মচর্য্য ব্রত প্রতিষ্ঠা হইয়া, শরীরে বীর্য্যলাভ হইয়া থাকে।

ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ।—যোগসূত্র। ২।৩৮

তাহার শরীর মহাতেজস্বী অথচ সৌম্যভাবাপন্ন হইয়া, হৃদয়ে বল, উৎসাহ, ধৈর্য্য, পরাক্রম ও তপ-প্রভার সঞ্চার হইয়া থাকে। বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইয়া সূক্ষ্ম বিষয় চিন্তা ও ধারণা করিবার উপযোগী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অক্ষুণ্ণভাবে পালন করিয়া ঊর্দ্ধরেতা হয়েন, তিনি মনুষ্য হইয়াও, দেবতার তুল্য পূজ্য হইয়া থাকেন।

ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্‌যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ।—"জ্ঞানসংকলিনী"।
ব্রহ্মচর্য্যং তপোমূলং ধর্ম্মমূলং দয়া স্মৃতা।— ঐ

ব্রহ্মচর্য্য তপস্যা-সাধনের মূল এবং দয়া ধর্ম্মের মূল। যেমন মূল দেশে জল সেচন করিলে বৃক্ষের সমস্ত অঙ্গ পুষ্টতা লাভ করিয়া ফলবান্ হয়, সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিতে পারিলে তপস্যার ফল লাভ হইয়া থাকে। বালক কাল হইতে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিতে হয়, সেইজন্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম সকল আশ্রমের মূল। ব্রহ্মচর্য্য উপকুর্ব্বাণ ও নৈষ্ঠিক ভেদে দুই প্রকার।

ব্রহ্মচর্য্যোপকুর্ব্বাণো নৈষ্ঠিকো ব্রহ্ম-তৎপরঃ।
যোঽধীত্য বিধিবদ্বেদান্ গৃহস্থাশ্রমমাব্রজেৎ ॥
উপকুর্ব্বাণ স জ্ঞেয়ো নৈষ্ঠিকো মরণান্তিকং।

বিধিবৎ বেদাধ্যয়ন ও গুরু-শুশ্রূষাদি ব্রত পালন করিয়া যিনি গৃহস্থ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন তিনি উপকুর্ব্বাণ। আর যিনি আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। কোন সময় সগর রাজা ঔর্ব্ব ঋষিকে এই ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম-ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করাতে ঔর্ব্ব ঋষি বলিয়াছিলেন,—

বালঃ কৃতোপনয়নো বেদাহরণ-তৎপরঃ। গুরুগেহে বসেদ্ভূপ ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ॥
শৌচাচারব্রতো তত্র কার্য্যং শুশ্রূষণং গুরোঃ। ব্রতানি চরতা গ্রাহ্যা বেদাশ্চ কৃতবুদ্ধিনা॥—বিষ্ণুপুরাণ, ৩৷৯৷১

হে ভূপ! বালক উপনয়নান্তে বেদপাঠে তৎপর হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সমাহিত চিত্তে গুরুগৃহে বাস করিবে। শৌচাচার, গুরুশুশ্রূষা করিয়া, সৎবুদ্ধিদ্বারা বেদের তাৎপর্য্যার্থ জ্ঞাত হইয়া, ব্রত পালন করিবে।

গৃহীত গ্রাহ্য বেদাশ্চ ততো হনুজ্ঞামবাপ্য বৈ। গার্হস্থ্যমাবসেৎ প্রাজ্ঞো নিষ্পন্ন গুরুনিস্কৃতিঃ॥—বিষ্ণুপুরাণ,৩৷৯৷৭

এইরূপে বেদের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া, গুরুর আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া প্রাজ্ঞ * গুরু-দক্ষিণা প্রদান করতঃ গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করিবেন।

অনেক সাধকের মনে এরূপ উদয় হইয়া থাকে যে, গৃহী হইয়া কিরূপে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করা যাইতে পারে। গৃহীর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত শাস্ত্রে উল্লেখ আছে; যথা,—

ঋতাবৃতৌ স্বদারাস্নু সঙ্গতির্যা বিধানতঃ। ব্রহ্মচর্য্যং তদেবোক্তং গৃহস্থাশ্রমবাসিনাম্॥—যোগি যাজ্ঞবল্ক্য, ১৷৫৬

ঋতুমতী ভার্য্যার প্রতি শাস্ত্র-বিধানমত উপগত হইলে গৃহস্থের ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করা হইয়া থাকে। শ্রুতিতে উল্লেখ আছে—"অথ ঋতুমতীং জায়ামভিগচ্ছেৎ।"

অথ গর্ভাধানং স্ত্রীয়াঃ পুষ্পবত্যাশ্চতুরহাদূর্দ্ধং
স্নাত্বা বিরজায়াস্তস্মিন্নেব দিবাহ আদিত্যং গর্ভমিত্যাদিত্যামবেক্ষতে গৃহে বা স্নাপয়িত্বা তামভিগচ্ছেদিতি।
—পারস্কর গৃহ্যসূত্র।

ঋতুমতী ভার্য্যার প্রতি শাস্ত্র-বিধানমত ব্যবহার করিলে গৃহস্থের ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন হইয়া থাকে।

পারস্কর গৃহ্যসূত্রে উল্লেখ আছে,—পুষ্পবতী স্ত্রী চতুর্থ দিবসের পর স্নান করিয়া বিগত-রজ হইলে আদিত্যগর্ভ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া আদিত্যদেবকে প্রথম দর্শন করিবে, কিম্বা গৃহে তাহাকে স্নান করাইয়া, পতি গর্ভাধান করিবেন। ইহাতে গৃহীর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করা হয়।

যমের পঞ্চম সাধন, দয়া;—

দয়া সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বত্রানুগ্রহস্পৃহা। বিহিতেষু তদেতেষু মনোবাক্কায় কর্ম্মণা॥—যোগিযাজ্ঞবল্ক্য,৩৷৬৮।

কায়মনোবাক্যে সর্ব্বজীবের প্রতি যে অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছা, তাহার নামই দয়া।

* প্রাজ্ঞ অর্থাৎ উপযুক্ত জ্ঞানবান্।—গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিয়া, যিনি প্রকৃত গৃহস্থ ধর্ম্মের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। বস্তুতঃ উত্তমরূপে ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়া গৃহী হইতে পারিলে, সে গৃহস্থ-জীবন সুখের হয়; নচেৎ, অর্থাৎ বিনা-ব্রহ্মচর্য্যে, গৃহীর কোন বিষয়ে উন্নতি-লাভ হয় না।

নিজ স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ করতঃ পরদুঃখে দুঃখিত হইতে পারিলে হৃদয়ে দয়াভাবের সঞ্চার হয়। পরের মনোবেদনা বা অভাব নিজে অনুভব না করিতে পারিলে প্রকৃত দয়ার উদয় হয় না। পরের দুঃখ দূর করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করা ধার্ম্মিকগণের একটি প্রধান কার্য্য।

ব্রহ্মচর্য্যং তপোমূলং ধর্ম্মমূলং দয়া স্মৃতা। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন দয়াধর্ম্মং সমাশ্রয়েৎ॥

ব্রহ্মচর্য্যব্রত তপস্যা-সাধনের মূল, দয়া ধর্ম্মের মূল; তজ্জন্য যত্ন-সহকারে দয়াধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। দয়াধর্ম্মের সেবা করিতে হইলে নিজের একটু ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়; বস্তুতঃ নিজের একটু ত্যাগ স্বীকার করিতে না পারিলে জীবের প্রতি সম্যক্ প্রকার দয়া করা হয় না। দয়াধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলে মনের বহুবিধ মলিনতা দূর হয়। জীবের প্রতি দয়া থাকিলে, হিংসা দ্বেষ লোভাদি বৃত্তি মনে আর উদয় হইতে পারে না, স্বতঃই উহারা শাস্ত হইয়া যায়। দয়ার প্রধান স্বরূপ দান। হৃদয়ে দয়া না থাকিলে দানশীলতা হয় না এবং পরোপকারও হয় না। সেইজন্য দয়াধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইলে যথাসাধ্য দরিদ্রকে দান করিতে হয়। দানের মধ্যে অভয়দানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যে স্থানে দয়া সেই স্থানেই দান ও অভয়।

কোন সময়ে এক নদীতে একজন তপস্বী সন্ধ্যাবন্দনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটি নিরাশ্রয় বৃশ্চিক স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে তথায় উপস্থিত হইল। তপস্বী উহাকে নিরাশ্রয় দেখিয়া জল হইতে উত্তোলন করিলেন। উত্তোলন করিবামাত্র বৃশ্চিক তাঁহাকে দংশন করিল। বিষজনিত জ্বালায় অস্থির হইয়া তপস্বী তাহাকে জলে নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু পুনরায় জলে ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া তপস্বীর দয়া হইল, সুতরাং তাহাকে উত্তোলন করিলেন। বৃশ্চিক পুনরায় দংশন করিল এবং তিনি তাহাকে পুনরায় পরিত্যাগ করিলেন। পরে তপস্বী মনে ভাবিলেন, বৃশ্চিক তাহার নিজের ধর্ম্ম (দংশন) বার বার প্রতিপালন করিতেছে, কিন্তু আমার ধর্ম্ম সর্ব্বজীবে দয়া। অতএব তাহাকে অভয় প্রদান করিয়া, জীবন রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য। এইরূপ ভাবিয়া তপস্বী বৃশ্চিকের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন।

শাস্ত্রে কথিত আছে—

ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং পুনরপি পুনশ্চন্দনং চারুগন্ধং। ছিন্নং ছিন্নং পুনরপি পুনঃ স্বাদুচৈবেক্ষুকাণ্ডম্॥
দগ্ধং দগ্ধং পুনরপি পুনঃ কাঞ্চনং কান্তবর্ণং। ন প্রাণান্তে প্রকৃতি-বিকৃতি র্জায়তে সজ্জনানাম্॥
—সুভাষিত রত্ন-ভাণ্ডাগার।

বার বার ঘর্ষণ করিলেও চন্দনের চারু গন্ধই নির্গত হয়; বারম্বার ছিন্ন করিলেও ইক্ষুখণ্ড সুমিষ্ট রসই প্রদান করে; বারম্বার দগ্ধ করিলেও সুবর্ণের কান্তি উজ্জ্বলই হইয়া থাকে; সেইরূপ সজ্জনগণের প্রকৃতি প্রাণান্তেও বিকৃতি-প্রাপ্ত হয় না। তপস্বীর প্রকৃতিই দয়া, সুতরাং তাহার বিকৃতি হয় না।

পিবন্তি নদ্যঃ স্বয়মেব নোদকং স্বয়ং ন খাদন্তি ফলানি বৃক্ষাঃ।
ধরাধরো বর্ষতি নাত্মহেতবে, পরোপকারায় সতাং বিভূতয়ঃ॥

নদী নিজবক্ষে প্রচুর জল ধারণ করে, কিন্তু নিজে তাহা পান করে না, সকল জীবকে সমানাধিকার প্রদান করিয়া পরোপকার করাই তাহার ধর্ম্ম। বৃক্ষ নিজ অঙ্গে সুমিষ্ট ফল নিজের ভক্ষণ জন্য ধারণ করে না, সুশীতল ছায়া প্রদান ও ব্যজন করতঃ ফল-প্রদানে তুষ্টি সাধন করাই বৃক্ষজীবনের মহাব্রত। মেঘ নিজ স্বার্থের জন্য বারি বর্ষণ করে না, জীবকুলের জীবনোপায় শস্য উৎপাদনের জন্য বারি প্রদান করিয়া থাকে। এইরূপ পরোপকারই সজ্জনগণের জীবনের মহাব্রত। দয়ার আধার স্বরূপ সেই হৃদয়ে সকলের সমান অধিকার। যাহাতে সকলের সমান অধিকার, তাহাতেই ভগবৎকৃপা বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। সেইজন্য ভগবান্ বলিয়াছেন—"দয়াবান্ সর্ব্বভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।"

অর্থাৎ ভগবানের প্রতি ভক্তিলাভ করিতে হইলে সর্ব্বজীবের প্রতি দয়া করিতে হয়।

যমের ষষ্ঠ সাধন, আর্জ্জব ;—

প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা একরূপত্বমার্জ্জবং।—যোগিযাজ্ঞবল্ক্য, ১।৬৩।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়কেই সমভাবে গ্রহণ করাকে আর্জ্জব কহে। সকল বিষয় সরলভাবে গ্রহণ করা অর্থাৎ অন্তর্বাহ্যে কাপট্য রহিত হওয়াই আর্জ্জব।

যমের সপ্তম সাধন, ক্ষমা ;—

প্রিয়াপ্রিয়েষু সর্ব্বেষু সমত্বং যচ্ছরীরিণাং। ক্ষমা সৈবেতি বিদ্বদ্ভি র্গদিতা বেদবাদিভিঃ॥—যোগিযাজ্ঞবল্ক্য, ১।৬৩

প্রিয় ও অপ্রিয় সকল বিষয়েই যে সমভাব, বেদবাদী পণ্ডিতগণ, তাহাকেই ক্ষমা বলেন। ক্ষমা দুইপ্রকারে সাধিত হয়। প্রথমতঃ অপরকৃত দুষ্কর্ম্মে ক্ষমা, দ্বিতীয়তঃ নিজকৃত অন্যায় আচরণ জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। ক্ষমা করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা, এই উভয় বিধ ক্ষমাবৃত্তি হৃদয়ে উদিত হইলে আত্মাভিমান ত্যাগ হয় ; কারণ অভিমান থাকিলে লোকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা যায় না, এবং অভিমানী ব্যক্তিও অন্যকৃত অপরাধে উপেক্ষারূপ ক্ষমা করিতে সক্ষম হয়েন না। যিনি যাহাকে ক্ষমা করিয়া থাকেন, তিনি তাহার পুণ্যাংশ অলক্ষিতভাবে গ্রহণ করেন, এবং এরূপও কথিত আছে যে, তিনি আত্মপর উভয়কে মহাভয় হইতে রক্ষা করেন।

মহাভারতে মোক্ষপর্ব্বে কথিত হইয়াছে,—

পরশ্চেদেনমতিবাদবাণৈর্ভৃশং বিধ্যেচ্ছম এবেহ কার্য্যঃ।
সংরোষ্যমাণঃ প্রতিহৃষ্যতে যঃ স আদত্তে সুকৃতং বৈ পরস্য।

কোন লোক যদি ধার্ম্মিক পুরুষকে কোন দুষ্কার্য্যাদি দ্বারা মর্ম্মান্তবিদ্ধ করে, তাহা হইলে ক্ষমাবান্ ধার্ম্মিকের ক্ষমা করা উচিত ; কারণ যে পুরুষ পরের দ্বারা প্রপীড়িত হইয়াও হর্ষ করেন, তিনি পীড়নকারী ব্যক্তির সুকৃত গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহা ক্ষমা-

বানের ধর্ম্ম। সেইরূপ যিনি নিজদোষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তাঁহারও কুত্রাপি কোনরূপ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না। শাস্ত্রে এরূপ কথিত আছে,—

ক্ষমা শস্ত্রং করে যস্য দুর্জ্জনঃ কিং করিষ্যতি। অতৃণে পতিতো বহ্নি স্বয়মেবোপশাম্যতি ॥

—সুভাষিতরত্নভাণ্ডার।

যাঁহার হস্তে ক্ষমারূপ অস্ত্র আছে, দুর্জ্জন তাঁহার কি করিবে? তৃণশূন্য স্থানে বহ্নি পতিত হইলে তাহা আপনিই শান্ত হইয়া যায়। যেরূপ শীতল লৌহখণ্ড উত্তপ্ত লৌহখণ্ডকে ছেদন করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ ক্ষমাপ্রার্থীর শীতল হৃদয় ক্রোধে উত্তপ্ত পুরুষের হৃদয় বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। তজ্জন্য ধার্ম্মিকগণ সতত ক্ষমাবৃত্তি যত্নসহ হৃদয়ে ধারণ করিবেন।

যমের অষ্টম অঙ্গ, ধৃতি;

অর্থহানৌচ বন্ধুনাং বিয়োগেচপি সম্পদি। ভূয়ঃ প্রাপ্তৌ চ সর্ব্বত্র চিত্তস্য স্থাপনাধৃতি ॥

—যোগিযাজ্ঞবল্ক্য, ১।৬৫

অর্থহানি, সম্পৎপ্রাপ্তি, হৃত দ্রব্যের পুনঃপ্রাপ্তি ও বন্ধুগণের বিয়োগজনিত সুখ-দুঃখাদিতে চিত্তের যে স্থিরতাভাব, তাহাই ধৃতি। বস্তুতঃ যমের উপরোক্ত সাধনগুলির সাধন না হইলে এরূপ ধৃতিভাব স্থির হয় না। অপরতঃ ঐ গুলির সম্যক্ সাধন হইলে, সহজেই মনে এইরূপ ধৃতি ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

যমের নবম অঙ্গ, মিতাহার;—

সুস্নিগ্ধ মধুরাহারশ্চতুর্থাংশ বিবর্জ্জিতঃ। ভুজ্যতে শিব সংপ্রীত্যৈ মিতাহার স উচ্যতে ॥
দ্বৌভাগৌপূরয়েদন্নৈ স্তোয়েনৈকং প্রপূরয়েৎ বায়োঃ সংচারণার্থায় চতুর্থমবশেষয়েৎ ॥

—হঠযোগ প্রদীপিকা।

অর্থাৎ ঈশ্বরের সংপ্রীত্যর্থ (ঈশ্বরার্পণ করিয়া) সুস্নিগ্ধ মধুর অন্ন দ্বারা উদরের অর্দ্ধাংশ পূরণ করিবে। অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশের একাংশ জলদ্বারা পূর্ণ করিয়া চতুর্থাংশ বায়ু-সঞ্চারণের জন্য শূন্য রাখিতে হইবে। এইরূপ পরিমিত আহারকে মিতাহার কহে।

অত্যাহারমনাহারং নিত্যং যোগী বিবর্জ্জয়েৎ ॥—অমৃতবিন্দু উপনিষদ্।

অত্যন্ত আহার ও এককালীন অনাহার, যোগী বর্জ্জন করিবেন।

ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"নাত্যশ্নতস্ত যোগোঽস্তি নচৈকান্তমনশ্নতঃ ॥"

যে ব্যক্তি অতিরিক্তাহারী, তাহার যোগ-সাধন হয় না এবং যে অতিশয় অল্পাহার করে, তাহার পক্ষেও যোগাভ্যাস অসম্ভব।

কট্বম্ল তিক্তলবণোষ্ণহরীত শাকাঃ সৌবীর তৈলসর্ষপ মৎস্য মদ্যাঃ।
অজাদি মাংস দধি তক্র কুলথকোলাঃ পিণ্যাক হিঙ্গুলসুনাদি ন পথ্যমস্মিন্ ॥

দত্তাত্রেয় সংহিতা ও হঠযোগপ্রদীপিকা।

যোগাভ্যাস কালে কটু, অম্ল, তিক্ত, লবণ ও শজনাশাক, কাঞ্জিক, তৈল, সর্ষপ, মৎস্য,

মস্ত, এবং ছাগাদি মাংস, দধি, তক্র, কুলত্থ, কুল, পিন্যাকহিঙ্গু অর্থাৎ তীক্ষ্ণ হিং, লসুন ও পেঁয়াজাদি যোগীদিগের পক্ষে পথ্য নহে।

শালান্ন যবপিণ্ডঞ্চ গোধুম পিণ্ডকং তথা। মুদ্গাং মাষচণকাদি শুভ্রঞ্চ তুষবর্জ্জিতম্॥
পটোলং পনসং মানং কক্কোলঞ্চ শুকাশকম্॥—যোগশাস্ত্র।

যোগীগণ তুষাদি বর্জ্জিত শালিধ্যান্যের অন্ন, যব ও গোধূমের পিণ্ড, মুগ, কলাই, ছোলা, পটল, কাঁটাল, মানকচু, কাঁকরোল, কাঁকুড় ইত্যাদি ভোজন করিবেন। পঞ্চবিধ শাক (পলুতা, হিংচা, বেতুয়া, চাঁপানটে ও পালুন) যোগীগণ ভক্ষণ করিয়া থাকেন। পরিষ্কৃত সুমধুর স্নেহযুক্ত দুগ্ধ শর্করা ও ফলমূলাদি সাত্বিক আহারীয় বস্তু, সকলের পক্ষে হিতকর মিতাহার হইয়া থাকে। যাহাতে শরীরে বল হয় ও মলমূত্র অল্প হয়, তদ্রূপ আহারই যোগীগণের অভিপ্রেত।

বস্তুতঃ মিতাহার করিলে স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, সহজে কোনরূপ ব্যাধি শরীরকে আক্রমণ করিতে পারে না। এবং তৎসঙ্গে মনেও প্রফুল্লভাবের উদয় হইয়া থাকে। অনেকে এরূপ মনে করিয়া থাকেন যে, আহারের সহিত মনের কোনও সম্বন্ধ নাই; কিন্তু তাহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। কতকগুলি আহারীয় বস্তুর সহিত মনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে, আর কতকগুলি আহারীয় দ্রব্য অলক্ষিত ভাবে মনের উপর কার্য্য করিয়া থাকে; যেমন, কোন মাদকদ্রব্য সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ মনের উপর তাহার কার্য্য হইয়া থাকে, অর্থাৎ শরীরের স্নায়ু আদির উত্তেজনা বশতঃ মনের অবস্থা বিকৃত হইয়া নানারূপ গর্হিত কার্য্য সংঘটিত হইয়া থাকে। এস্থলে মনের সহিত আহারীয় দ্রব্যের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। আমিষভোজীগণ মনে করেন যে মৎস্য ও নানাজাতীয় মাংস নানারূপ সুগন্ধদ্রব্য সহযোগে পাক করিয়া সেবন করিলে, শরীরে বলবৃদ্ধি হয়, শরীরের বলবৃদ্ধি হইলে মস্তিষ্ক পুষ্ট ও চিন্তাশক্তির বৃদ্ধি হয় ইত্যাদি। বস্তুতঃ ইহা তাঁহাদের ভ্রম। কারণ হস্তী স্থলচর প্রাণীর মধ্যে অধিক বলশালী, বৃহৎকায় এবং গম্ভীর ও শান্তস্বভাব; কিন্তু তাহার আহারীয় উদ্ভিজ্জ পদার্থ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। সিংহাদি মাংসভোজী বলবান্ জন্তুও আছে, কিন্তু তাহারা সতত চঞ্চল, হিংস্রক ও ক্রুর-স্বভাবাপন্ন কোন রাসায়নিক সালসা (ঔষধ) দুই একদিবস সেবন করিলে তাহার ফল যেরূপ কিছুই উপলব্ধি হয় না, কিন্তু দীর্ঘকাল ব্যবহার করিলে তাহার ফলে শরীরের ও মস্তিকাদির পুষ্টতা হইয়া মনের অবসাদ দূর হয় ও মেধাশক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে. সেইরূপ মৎস্য ও মাংসাদি, পলাণ্ডু, লসুন ইত্যাদি ভোজন করিলে মনে যে তামস ভাবের উদয় হয়, তাহা একদিনে উপলব্ধি হয় না। কিন্তু অধিক দিন ঐ সকল বস্তু ভোজন করিলে মনে, তামস-ভার উপলব্ধি হইয়া থাকে। একদিন ধূম্রপান করিলে মনে তাহার জন্য তৃষ্ণা হয় না; কিন্তু ধূম্রপান অত্যন্ত অভ্যস্থ হইলে পর, একদিন ধূম্রপান না হইলে মন চঞ্চল হয়, শরীরে অলসতা আসে। বহুদিনের অভ্যাসবশতঃ মনে যেরূপ নেশার অনুভব হয়, সেইরূপ মৎস্য-মাংসাদি বহুকাল ভোজন করিলে, মৎস্য-মাংসভোজীর মনে হিংসাদ্বেষাদিরূপ

নেশার উদয় হয়; অর্থাৎ আমিষভোজী যদিও নিজে হিংসা করে না, কিন্তু হিংসার অনুমোদন করিয়া থাকে। প্রকারান্তরে তাহাতে ঘাতককে প্রশ্রয় দেওয়া হয়; তজ্জন্য মনে হিংসা দ্বেষ, ও তাহা হইতে অবিশ্বাসিতা আদি চিত্ত-মলিনতা উপস্থিত হইয়া থাকে। আজ কাল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণও আহারীয় বস্তুর সহিত মনের ও শরীরের বিশেষ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থির করিতেছেন। তাঁহারা কেহ কেহ সূক্ষ্মতত্ত্ব যতদূর পারেন অনুসন্ধান করিয়া নিরামিষভোজী হইতেছেন। বস্তুতঃ যে দুগ্ধ-ঘৃত দ্বারা শরীরের সম্পূর্ণ পুষ্টি-সাধন হয়, মনে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়, সেই দুগ্ধের আধার স্বরূপ গাভী শুষ্ক-তৃণমাত্র ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। সেইজন্য জিহ্বা-ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি-লালসায় নানারূপ রাজসিক ও তামসিক মাংসাদি, কটু, অম্ল, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, পর্য্যুসিত আহারীয় দ্রব্য ভোজন করা উচিত নহে। পরন্তু শুদ্ধ, সুমধুর, স্নিগ্ধ ফলমূলাদি ও মিষ্টান্ন-দুগ্ধ-ঘৃতাদি সাত্ত্বিক আহারীয় বস্তু মিতাহারীগণের ভোজন করা উচিত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক আহারের কথা উপদেশ দিয়াছেন। যোগ অভ্যাস কালে মিতাহারী হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

মিতাহারং বিনা যস্তু যোগারম্ভঞ্চ কারয়েৎ। নানারোগো ভবেত্তস্য কিঞ্চিদ্ যোগে ন সিদ্ধতি ॥—যোগশাস্ত্র।

অর্থাৎ মিতাহারী না হইয়া যে ব্যক্তি যোগাভ্যাস করেন, তাঁহার নানাবিধ রোগ হইয়া থাকে, এবং কিছুমাত্র যোগ সিদ্ধ হয় না। অতএব আহারের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

যমের দশম সাধন শৌচ;—

শৌচং তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরন্তথা। মৃজ্জলাভ্যাং তু তৎ বাহ্যং মনঃশুদ্ধিস্তথান্তরম্ ॥

—যোগ যাজ্ঞবল্ক্য, ১।৬৭।

বাহ্য এবং অভ্যন্তর ভেদে শৌচ দ্বিবিধ। মৃত্তিকা জলাদি দ্বারা বাহ্য শরীরের শৌচ হইয়া থাকে। মনঃশুদ্ধিই আভ্যন্তরিক শৌচ। বাহ্য শৌচ অর্থাৎ বাহ্যভাবের পবিত্রতা হইতে ক্রমে মন শুদ্ধ হয়। বস্তুতঃ বাহ্য শরীর ও মন উভয়েরই শৌচ দ্বারা পবিত্রভাব হওয়া উচিত। অনেক সময় শরীর পবিত্র থাকিলে মনেও পবিত্র ভাবের উদয় হয়। অনেকে মনে করেন, মন শুদ্ধ হইলে বাহ্যশুদ্ধির প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু তাহা সাধকের পক্ষে ঠিক নহে। শরীরে অশৌচ বশতঃ মলিনতা থাকিলে মনেও অশুদ্ধ ভাবের উদয় হয়। অনেক স্থলে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাহ্য পবিত্রতা বিশেষরূপে রক্ষিত হইতেছে, কিন্তু অভ্যন্তরে অর্থাৎ মনে হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, পরনিন্দাদি মলিনতা পরিপূর্ণ। সেরূপ স্থলে বাহ্য শৌচ কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।

"বেদাস্ত্যাগশ্চ যজ্ঞাশ্চ নিয়মাশ্চ তপাংসি চ ন হিপ্রদুষ্ট ভাবস্তসিদ্ধিং গচ্ছন্তিকর্হিচিৎ" ॥

যাহার হৃদয়ের ভাব শুদ্ধ নহে, তাহার বেদাধ্যয়ন, ত্যাগ, যজ্ঞ, নিয়ম, তপ, কিছুই

সিদ্ধ হয় না। এজন্য শুদ্ধান্তঃকরণে তপ, যজ্ঞ, যোগাদির অনুষ্ঠান করিবে। সেইজন্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, বাহ্য এবং আভ্যন্তর (মানসিক) উভয়বিধ শৌচ সম্পন্ন হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

মঙ্গলাচার-নিয়মাঃ শৌচ-ভ্রষ্টস্য নিষ্ফলাঃ। স্নানং দানং তপস্ত্যাগো মন্ত্রকর্ম্ম বিধিক্রিয়া॥
শুচিং দেবাহি রক্ষন্তি পিতরঃ শুচিমন্তঃ। শুচিং বিভ্যতি রক্ষাংসি যে চান্যে দুষ্টচারিণঃ॥

স্নান, দান, তপ, সন্ন্যাস, মন্ত্রজপ, যাগ, যজ্ঞ এবং মঙ্গলাচার-নিয়মাদি—সকলই শৌচভ্রষ্ট ব্যক্তির নিষ্ফল হয়।

শুচিসম্পন্ন ব্যক্তিকে দেবতারা সতত রক্ষা করেন, তাঁহার প্রতি পিতৃগণ প্রীত থাকেন, এবং ভূত প্রেত প্রভৃতি ক্রূর আত্মা সকল সতত শুদ্ধাচারী ব্যক্তিকে ভয় করিয়া থাকে। অতএব বাহ্যাভ্যন্তর উভয়বিধ শৌচাচার-সম্পন্ন হওয়া ধার্ম্মিকগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

ক্রমশঃ—

শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

যাত্রী।

এতদিনে আজি বরষের পথ
ফুরাল বুঝি রে ফুরাল!
ওই যে অদূরে মন্দির চূড়া
হেরিয়ে নয়ন জুড়াল!
এতদিনকার কঠোর সাধন,
সারা জীবনের মরম দাহন
ওইখানে আজি হবে সমাপন,
সব ব্যথা আজি ঘুচাল!
এতদিনকার আঁখি জল মোর
নিমেষে বুঝিরে মুছাল!

ঐ যে তাঁহার করুণার ধারা
ভাসিছে মুগ্ধ গগনে,
স্নিগ্ধ তাঁহার শীতল পরশ
কাঁপিছে শান্ত পবনে!
আরতির ধ্বনি ওই শোনা যায়,
পূজার পুষ্প গন্ধ বিলায়,
কে যেন ডাকিছে,—"আয়, চলে আয়,
চলে আয় শুভ লগনে!
শ্রান্ত পথিক, আর কেন চেয়ে
অশ্রু সজল নয়নে!"

তবে চলে আয়, ক্লান্ত পথিক,
কেটেছে দীর্ঘ রজনী;—
ওই যে অদূরে কনকবরণ
ভাসিছে আশার তরণী!
হউক শ্রান্ত অবশ চরণ,
নিদ্রাজড়িত কম্প্র নয়ন,
এতদিন পরে ফুরাবে যখন
দীর্ঘ কঠিন সরণি।
সম্মুখে আজি ভাতিছে শান্তি
স্নিগ্ধ সবিতা বরণী।

শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

শ্রীপাদ গদাধর গোস্বামীর জীবনী।*

নদীয়া-গগনেন্দু প্রেমাবতার শ্রীশ্রীশচীনন্দনের পার্ষদগণ মধ্যে শ্রীল গদাধর গোস্বামী একজন সুবিখ্যাত মহাত্মা। তাঁহার মহিমালোকে বৈষ্ণবাকাশ অভিনব স্বর্গীয় কৌমুদী ছটায় বিভাসিত! গদাধর প্রত্যেক বৈষ্ণবেরই আরাধ্য দেবতা, আন্তরিক ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলির অধিকারী। এমন পাষণ্ড কেহই নাই যে, গৌর-গদাধর-লীলা পাঠে তাঁহার নয়ন দিয়া প্রেমাশ্রু বিগলিত হয় না। প্রভুপাদ গদাধর গোস্বামী শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বিতীয় প্রাণ। তাঁহার উন্নত চরিত্রে, প্রেম-গভীরতা ও শ্রীগৌরাঙ্গানুরাগ কতদূর অতল-স্পর্শী, তাহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে সুবিস্তৃত ভাবে লিখিত আছে। কিন্তু উক্ত মহাত্মার বিশদ জীবনী অদ্যাবধি কেহ লিপিবদ্ধ করেন নাই। আমি আকাশ-কুসুম-আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া সেই পরমারাধ্য পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাপাত্র বৈষ্ণবাগ্রগণ্য গদাধর প্রভুর জীবনী সঙ্কলনে অগ্রসর হইতেছি। মাদৃশ অশিক্ষিত ও তৃণাদপি দীনহীনের লেখনী-সঞ্চালনে পাছে সেই মহাত্মার অসীম মহিমায় কোন কালিমা অর্পিত হয়, ইহাও অতীব চিন্তার কারণ। ফলতঃ অন্তর্নিহিত উদ্দাম বাসনা-স্রোতকে আয়ত্ত বা তদ্বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিতে অক্ষম হইয়া, এই ক্ষুদ্রবুদ্ধি, ক্ষুদ্রশক্তি, হীনচেতা, অধমাগ্রগণ্য, নীচাদপি নীচ মানব উক্ত কার্য্যে অগ্রসর হইল। এক্ষণে সর্ব্ব বৈষ্ণবের পদে প্রণামানন্তর অভীপ্সিত কার্য্যে অগ্রসর হইলাম। বৈষ্ণবাশীর্ব্বাদে যদি তাঁহার মহিমা-সিন্ধুর বিন্দুমাত্র প্রকাশ করিতে পারি, তাহা হইলেও কৃতার্থম্মন্য হইব।

"প্রণম্য গৌড়াঙ্গ প্রিয়াগ্রগণ্যং রত্নাবতী-নন্দন মত্যুদারং।
শ্রীমাধবামোদকরং বিচিন্ত্য বক্ষ্যেঽস্য নামানি সুহৃন্মুদেঽহং॥
নিখিল-গুণ-গভীরং পূর্ণলাবণ্যধীরং করুণ-হৃদয়-সারং
মাধবামোদকরং পরম রস-বিভাসং সর্ব্বপাণ্ডিত্যকাশং
বিমল কমল বংশং বন্দ্য বংশোজ্জ্বলাংশুং।"

শ্রীশ্রীপ্রভু সনাতন গোস্বামী কৃত স্তবাবলী।

"শিবানন্দ প্রিয়গুরুং নয়নানন্দ-বন্দিতং রামানন্দ-রসামোদং বন্দে রাধা-গদাধরং।"

শ্রীমৎ রূপগোস্বামী কৃত স্তবাবলী।

কাশ্যপ-গোত্রীয়, বারেন্দ্র-শ্রেণীস্থ দ্বিজোত্তম শ্রীল মাধবাচার্য্যের গৃহে তদীয় ধর্ম্মপত্নী রত্নাবতী দেবীর গর্ভে মহামহিম গদাধর গোস্বামীর চট্টগ্রামে জন্ম হয়। সে সময়টী ১৪০৮ শকের বৈশাখী অমাবস্যা তিথি। তখন স্বভাবের শোভা অতি রমণীয়! পত্র-পুষ্প-কিশলয়ে

---

* এই প্রবন্ধের জন্য লেখক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রঃ সঃ

তরুলতা সুসজ্জিত, বিহঙ্গমগণ সুমধুর স্বরালাপে নিমগ্ন। তখনও পাপিয়া এবং সারঙ্গের মধুর-সঙ্গীত-পূর্ণ একতানস্বরে দশদিক পরিব্যাপ্ত। বিশেষতঃ বৈশাখ মাস হিন্দুগণের পরম পবিত্র সময়। এই সময়ে হিন্দুদের ব্রতোত্থাপন, উপনয়ন, উদ্বাহ, প্রভৃতি শুভ কার্য্যাবলী সমধিক সুসম্পন্ন হয়। বৈশাখী যামিনী যেমন প্রাকৃতিক শোভাচ্ছন্ন, তেমনই সুখপ্রদ। তখন রাত্রিকালে দিঙ্মণ্ডল প্রায়ই অনভ্র-নীলিমাভ সৌন্দর্য্যে মনোরম হয়, শত শত তারকাবলীসহ তারানাথের উদয়ে অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হইতে থাকে। দিবসের আতপতাপিত নরনারী অতিবিশ্বস্ত আত্মীয়ের ন্যায় যামিনীর আলিঙ্গনে আনন্দিত হয়। মৃদুল-দক্ষিণ-পবন-সঞ্চালিত খদ্যোত-মণ্ডিত অশ্বত্থ বৃক্ষের শোভাও বড় হৃদয়গ্রাহী। বেল, যুঁই, কামিনী, রজনীগন্ধা, গোলাপ, টগর প্রভৃতি কুসুমরাজি চন্দ্ররশ্মি-স্নাত হইয়া যেন হাসিতে হাসিতে সৌগন্ধ-বিতরণে নরনারীর প্রাণে এক সজীব আনন্দের তরঙ্গ উৎপাদন করে। বাস্তবিক বৈশাখ মাসটি মানস ও নয়নান্দকর বলিয়াই হিন্দু ঋষিগণ উহাকে পুণ্যতম নামে অভিহিত করিয়াছেন।

বৈশাখ মাসটীও যেমন অন্যান্য মাসাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম, গদাধর প্রভুও তদ্রূপ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

সে যাহা হউক, সদ্যোজাত শিশুর রূপপ্রভায় সূতিকাগৃহ যেন আলোকিত হইয়া উঠিল। কিবা চম্পক-দাম-বিনিন্দিত সুগৌরবর্ণ, অকলঙ্ক-শারদেন্দু-সন্নিভ মুখমণ্ডল, সুললিত রূপ-মাধুর্য্য দর্শকবৃন্দের নয়নে একটী সুখশান্তি-স্রোত আনিয়া দিতে লাগিল। বালকের অলোক-সামান্য মাধুরী দর্শনে আত্মীয়বর্গের মনে অপরিসীম আনন্দ উদয় হইতে লাগিল। এ বালক মানব নহে, নিশ্চয়ই শাপভ্রষ্ট দেব বা গন্ধর্ব্ব-কুমার। বালকের সৌন্দর্য্যাধিক্য শ্রবণে দর্শনাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার আশায় প্রতিবেশী-মণ্ডল মাধবাচার্য্যের অঙ্গনে আগমন করিতে লাগিল। দ্বিজপত্নীগণ ধান্য ও দূর্ব্বা প্রদানে সদ্যোজাত শিশুর মঙ্গলোদ্দেশে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ফলতঃ সে সময়টী যেন একটী অব্যক্ত আনন্দ-প্রবাহে মাধবমিশ্র-নিকেতনটী পরিপ্লুত করিয়া ফেলিল।

গদাধর-জননী রত্নাবতীর অপর একটী নাম দুঃখিনী। (দুঃখিনী নামটী বোধ হয় ডাক নাম)। প্রমাণ যথা ;—

"দুঃখিনী নন্দন, মাধব জীবন, গদাধর নাম যার"।

তাই বলিয়া যে গদাধর দীন-দম্পতির পুত্র, একথা যেন কেহ মনে না করেন। কারণ, বালিকা বয়সে অনেকের প্রকৃত নাম বাদ দিয়া হারাণী, কুড়ানী, প্রভৃতি নামাভিধানে তাঁহাদের আত্মীয়বর্গ ডাকিয়া থাকেন। রত্নাবতী দেবীর দুঃখিনী নামটীও বোধ হয় তদনুকরণে রক্ষিত।

গদাধর প্রভুরা দুই সহোদর, ইহাঁর জ্যেষ্ঠের নাম বাণীনাথ, যথা,—

"মাধবস্য যৌপুত্রৌ বাণীনাথো গদাধরঃ।"

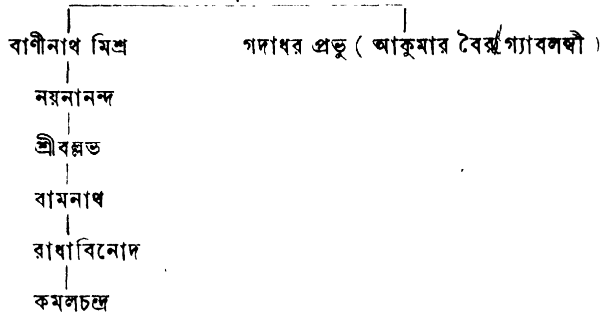
রত্নাবতী দেবীর পিত্রালয় শ্রীনবদ্বীপধাম। গদাধর প্রভুর জন্মের পর অত্যল্প কাল মধ্যেই শ্রীল মাধবমিশ্র সপরিবারে ঢাকার সন্নিকটবর্ত্তী "বেলেটী" * গ্রামে যাইয়া বাস করেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা তথায় এগার বা বারবৎসর অবস্থান করেন। তৎপরে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তঃপাতী কাঁদির নিকটবর্ত্তী ভরতপুর গ্রামস্থ সুররাজ নামক জনৈক খ্যাতনামা পুণ্যশীল ধনবান্ লোকের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীল মাধব মিশ্র মহাশয় সপরিবারে ভরতপুরে আসিতে বাধ্য হন। এক্ষণে স্বতঃই মনে হইতে পারে, ভরতপুর হইতে বেলেটি গ্রাম বহু-দূরবর্ত্তী, তবে কেমন করিয়া সুররাজের সহিত মাধব মিশ্রের সাক্ষাৎ হইল? তাহার কারণ এই মাত্র অনুমান হয়,মাধব মিশ্রের শ্বশুরালয় শ্রীনবদ্বীপধাম; সুতরাং তাঁহার, সময়ে সময়ে, তথায় গমনাগমন অসম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ শ্রীনবদ্বীপধাম তৎকালে বঙ্গের রাজধানী ও বিদ্যাচর্চ্চার কেন্দ্রীভূত স্থান ছিল। তখন নবদ্বীপে সংস্কৃত ভাষার এত চর্চ্চা ছিল যে, উহা 'পণ্ডিতের নবদ্বীপ' নামে আখ্যাত হইয়াছিল। বঙ্গের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের তথায় এক একটি অতিরিক্ত বাটী থাকিত। বঙ্গের প্রধান ব্যক্তিগণকে নানা কার্য্যে ও নানা ঘটনায় প্রায়ই নবদ্বীপে যাইতে হইত। বোধ হয়, সুররাজেরও নবদ্বীপে একটি বাটী থাকিবার সম্ভাবনা। তিনিও যে মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপে না থাকিতেন, একথা কে বলিবে? সুতরাং ঘটনাচক্রে বোধ হয়, সুররাজের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল; সেই কারণে মাধব মিশ্র বেলেটী গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে ভরতপুর আসিতে বাধ্য হন।

উক্ত ভরতপুরে এখনও শ্রীপাদ্ গদাধর প্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ জীউ ঠাকুরের সেবা ও পাট বিদ্যমান। বাণীনাথের বংশধরগণ অদ্যাপি ভরতপুরে বিদ্যমান থাকিয়া উক্ত পাটের সেবাইত আছেন। গদাধর প্রভু কত শকে ঐ শ্রীপাট সংস্থাপিত করেন, তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না; তবে এই মাত্র অবগত হওয়া গিয়াছে যে, গদাধর প্রভু উক্ত শ্রীপাট সংস্থাপিত করিয়া স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র নয়নানন্দকে উহার ভার প্রদান করেন। তাহার কারণ, নয়নানন্দ বাল্যাবধি শিষ্ট, শান্ত, মেধাবী এবং ভক্তি-পরায়ণ ও সুকবি ছিলেন। গদাধর প্রভু আকুমার বিরাগী, তিনি আদৌ দার-পরিগ্রহ করেন নাই। নিম্নে শ্রীল মাধব মিশ্রের অধস্তন বংশাবলীর তালিকা প্রদত্ত হইল,—

---

* মাধব মিশ্রের বাস বেলেটী। চট্টগ্রাম উক্ত মিশ্রের শ্বশুরালয়। উঁহাদের মূল উপাধি ভাদুড়ি, বারেন্দ্র শ্রেণীস্থ কুলীন। মিশ্র পাণ্ডিত্য উপাধি। গদাধরের মাতামহ নৃসিংহ লাহিড়ি চট্টগ্রামে বাস করিতেন। পণ্ডিত গোস্বামীর মাতামহাশ্রয়ে জন্ম হয়। ৫ বৎসর বয়সে শ্রীনবদ্বীপে পিতামহের অজ্ঞাতে আসিয়া মিলিত হন। এখন যে স্থানকে বনচারী ব্রহ্মাশ্রম বলে, তাহাই পণ্ডিত গোস্বামীর তদানীন্তন থাকিবার স্থান। ফলতঃ উহা এখন বাউল দরবেশের স্থান হইয়াছে।

মাধব মিশ্র।



এই কমলচন্দ্র হইতে ললিতমোহন (মিশ্র) গোস্বামী অষ্টাদশ পুরুষ। ইনি এখনও ভরতপুরে বাস করিতেছেন। উল্লিখিত জীবনী-বিবরণ ইঁহার প্রমুখাৎ অধিকাংশ সংগৃহীত হইল। কিন্তু শ্রীপাদ নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয় নিম্নলিখিত গীতটীতে গদাধরের জন্মস্থান বিষয়ে যেরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্ব-লিখিত বৃত্তান্তের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ, যথা ;—

ধন্য ধন্য বলি যেন, চারিযুগ মধ্যে হেন, কলির ভাগ্যের সীমা নাই।
সুন্দর নদীয়া পুরে, মাধব মিশ্রের ঘরে, কি অদ্ভুত আনন্দ বাধাই॥
বৈশাখের কৃষ্ণ দিনে, জনমিলা শুভক্ষণে, গৌড়াঙ্গের প্রিয় গদাধর।
শ্রীমাধব রত্নাবতী, পুত্রমুখ দেখি অতি, উল্লাসে অধৈর্য্য নিরন্তর॥
কিবা গদাধর শোভা, সভার নয়ন লোভা, যেন কত আনন্দের ধাম।
ঝল মল করে বর্ণ, জিনিয়ে সে শুদ্ধ স্বর্ণ, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অনুপম॥
যত নদীয়ার লোক, পাসরিয়া দুঃখ শোক, পরস্পর কহে কুতূহলে।
মাধবের কিবা ভাগ্য, হৈল যেন রত্ন লভ্য, না জানি কতেক পুণ্য ফলে॥
বিপ্র পত্নীগণ আসি, আনন্দ সাগরে ভাসি, রত্নাবতী মায়ে প্রশংসিয়ে।
দেখিয়া সোণার সুতে, ধান্যদূর্ব্বা দিয়ে মাথে, আশীর্ব্বাদ করে হর্ষ হ'য়ে॥
গদাধর প্রভাবেতে, বিবিধ মঙ্গল যাতে; বন্দীগণ করে ধাওয়া ধাই।
নরহরি কহে যেন, জনমে জনমে হেন, গদাই চাঁদের গুণ গাই॥ — শ্রীশ্রীপদ-সমুদ্র। ৪০৩১

শ্রীপাদ নরহরি সরকার সামান্য নহেন। ইনি দ্বাপরে ব্রজলীলায় শ্রীরাধিকার মধুমতী সখীর স্বরূপাবতার। বিশেষতঃ ইনি গদাধর প্রভুর সমসাময়িক মহাত্মা। এরূপস্থলে ইঁহার উক্তিতে অবিশ্বাস করা যায় না। অন্য পক্ষে ভরতপুর-নিবাসী ললিতমোহন গোস্বামীও সত্যনিষ্ঠ উদার-প্রকৃতি ; বিশেষতঃ তিনি স্ববংশের ইতিবৃত্ত যে অনবগত বা উহা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত, তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব ? এক্ষণে কাহার মত অভ্রান্ত, তাহা স্থির-সিদ্ধান্ত করা আমার সাধ্যাতীত। সুধী ও ভক্ত পাঠকগণ ইহার মীমাংসা করিয়া

লইবেন; * বা এ বিষয়ে যদ্যপি আমার কোন ক্রটী বিবেচিত হয়, তাহাও স্বশ্ব মহত্বগুণে ক্ষমা করিবেন। গদাধর প্রভুর জীবনীর অধিকাংশ কার্য্যাবলীর ঘটনা-সমূহ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর সুমহৎ লীলা প্রকাশক কার্য্যাবলীর সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে জড়ীভূত যে, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পবিত্র লীলার বহুস্থান ব্যক্ত না করিলে উক্ত জীবনী সম্পূর্ণ হইতে পারে না, বা পত্রপুষ্পহীন তরুলতার ন্যায় বীতশ্রী ধারণ করে। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলামৃতের অংশমাত্র লিপিবদ্ধ করিতে হইলেও তাঁহার শ্রীকৃষ্ণাবতারে ব্রজলীলার দুই একটী কথা বলা সঙ্গত বোধ হইতেছে। কেননা, শ্রীগৌর গদাধর কে, ইহা প্রকাশ করা উচিত। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রভুই রাসেশ্বরী শ্রীমতীর ভাব ও কান্তি ধারণ করিয়া প্রেম-ভক্তি-রাজ্য সংগঠনার্থে ১৪০৭ শকে নদীয়া-নগর-নিবাসী জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে শচীদেবীর গর্ভাবলম্বনে শ্রীশ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হন। আর এই গদাধরও অন্য কেহ নহেন, ইনিও সেই বৃষভানু-রাজনন্দিনী কৃষ্ণগত-প্রাণা সুলোচনা শ্রীরাধিকারই স্বরূপাবতার। এক্ষণে গৌরের সহিত গদাধরের কোথায় প্রথম সাক্ষাৎ হয়, ইহাই প্রথম আলোচ্য। ললিতমোহন গোস্বামী মহাশয়ের মতে গদাধর গোস্বামী অধ্যয়নার্থে ১৩ বৎসর বয়সে নবদ্বীপের সন্নিকটস্থ বিদ্যানগরে খ্যাতনামা বৃহস্পতি-সদৃশ গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে আগমন করেন। কিন্তু শ্রীপাদ নরহরি সরকার ঠাকুরের মতে বাল্যে বিদ্যাশিক্ষাবস্থায় শ্রীশ্রীচৈতন্য প্রভুর সহিত নদীয়া নগরেই গদাধর প্রভুর সম্মিলন হয়। ফলতঃ বিদ্যালয়েই যে উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তাহা নিম্নলিখিত কবিতাটি পাঠে অবগত হওয়া যায়;—

নব উপবীত ধরি প্রভু বিশ্বম্ভর। পড়িবারে গেলা বিষ্ণু পণ্ডিতের ঘর ॥
সুদর্শন আদি করি গঙ্গাদাস পণ্ডিত। পড়িলা জগৎ গুরু তা সবা সহিত ॥
লোক জাগরণে মায়া মানুষ বিগ্রহ। পড়ায়ে পড়ায়ে প্রভু লোক অনুগ্রহ ॥
অন্তরে রাধিকা ভাব আনে নাহি জানে। পরিহাস করে প্রভু সহাধ্যায়ী সনে ॥

বিদ্যালয়েই গদাধরের সহিত ভক্তমনোরঞ্জন শ্রীশচী-দুলালের চারি চক্ষুর সম্মিলন হইল। গদাধরের অন্তর রাধাভাবে পরিপূর্ণ; তিনি বৃন্দারণ্যবিহারী, মুরলীবদন, নন্দনন্দনের স্বরূপাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে দৃষ্টিমাত্রেই চিনিয়া লইলেন। ফলতঃ তাঁহার নির্ম্মল অন্তঃকরণে তখন ব্রজভাব উদ্বেলিত হইল, তাই তিনি সুকৌশলে মহাপ্রভুর সহিত পরিহাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সে ভাবের মর্ম্মার্থ পরিগ্রহ করা দেবগণেরও সাধ্যায়ত্ত নহে। তরলমতি সহাধ্যায়িগণ তাহার মর্ম্মাবধারণ করিতে পারিলেন না; উভয়ের মনের কথা উভয়েই বুঝিলেন, আর উভয়ের দর্শন-সুখে উভয়ে আনন্দিত হই-

* তবে এ মতদ্বৈধের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে এখনও অনুমান করা যাইতে পারে যে, মাধব মিশ্রের নবদ্বীপে একটী অতিরিক্ত বাটী থাকা সম্ভবপর। বোধ হয়, তিনিও মধ্যে মধ্যে শ্রীনবদ্বীপ ধামে গঙ্গাস্নানোপলক্ষে আসিয়া বাস করিতেন এবং সেই সময় গদাধর প্রভু তাঁহার গৃহে রত্নাবতী গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়েন।

লেন *। কিন্তু গদাধরের সহিত বিরলে মিলন হইবার বাসনা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক হইত। একদিন তাঁহার মন এত অধীর হইয়া উঠে যে, তিনি পাঠ বন্ধ করিয়া গদাধরের সাক্ষাৎ-লাভাশায় নগরমধ্যে গমন করিলেন। যথা,—

গদাধর সহ ভেট করিতে ইচ্ছিলা। পাঠ বন্ধ করি প্রভু নগরেতে গেলা॥
ভ্রমিতে দেখেন পথে যান গদাধর। ধাঞা যাই প্রভু তাঁর ধরে দুটী কর॥

কোন হারাণ ধন দেখিতে পাইলে মনুষ্য মাত্রেই যেমন তাহা গ্রহণ করিতে সোৎফুল্লচিত্তে ধাবমান হয়, মহাপ্রভুও তদ্রূপ গদাধরের দর্শনমাত্রেই এক অভিনব আনন্দাবেগে ধাবিত হইয়া, গদাধরের করপদ্ম ধরিয়া অতি মৃদুমধুর সম্ভাষণে নিম্নলিখিতরূপ উক্তি করিতে লাগিলেন ;—

কোথা যাহ বলি দুটী হাতেতে ধরিয়া। মুক্তি কর মোরে তুমি রাধা নাম দিয়া॥
তব নাম করি গান ভ্রমিব নাচিয়ে। উদ্ধার করিব জীব তব নাম দিয়ে॥
বাঞ্ছা যাহা আছে তাহা পরে ব্যক্ত হবে। আমার মনের ভাব তৈছনে বুঝিবে॥
যোগাবেশ হযেছিলাম তোমার প্রেমেতে। তথাপি তোমার প্রেম নারিনু শোধিতে॥
গুরুমূর্ত্তি ধরি আমি জীব নিস্তারিতে। অধম পড়ুয়াগণ না পারে চিনিতে॥
অতএব মুক্তি ভিক্ষা মাগি তব স্থানে। ইহঃপর দেখা দিও শ্রীবাস অঙ্গনে॥

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর ঈদৃশ সম্ভাষণে গদাধর প্রভুও নিম্নলিখিত রূপ উক্তি করেন ;—

ব্রজভূম করি শূন্য, নবদ্বীপে অবতীর্ণ, এতেক তোমার চতুরাল।
দুঃখ দিয়া নিরন্তর, বর্ণ করি ভাবান্তর, পুনঃ বাড়াও বিরহজঞ্জাল॥
নাই শিখি পুচ্ছ চূড়া, নাই সেই পীতধরা, করে নাই সে মোহন বাঁশরী।
যে বাঁশরী করি গান, বধিলে গোপীর প্রাণ, সে বাঁশরী কোথা গৌড় হরি॥
নাই সে বাঁকা নয়ন, এবে হেরি সুলোচন, কিন্তু সে ভঙ্গিম বাঁকা নাই।
যদি দিলে দরশন, এরূপে ভুলোনা মন, তুমিই কি সেই ব্রজের কানাই॥
কহে নরহরি দাস, যার নাহি বিশ্বাস, সে আসি দেখুক নয়নে।
সে দিনের যেই কথা, বলিতে মরমে ব্যথা, যে হইল উভয় মিলনে॥— শ্রীপদ-সমুদ্র

এই সময়ে একদিন উভয়ে উভয়ের করে ধরিয়া উভয়ের বদন নিরীক্ষণে বিভোর! তখন তাঁহাদের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব প্রীতিপ্রবাহ বহিতে লাগিল ; তাঁহারাও যেন সেই প্রীতিপ্রবাহে নিমগ্ন হইয়া ক্ষণেকের তরে নবদ্বীপ ভুলিলেন। ক্ষণেকের তরে তাঁহাদের কোমলান্তঃকরণে যেন কলনাদিনী-কালিন্দী-কূলস্থ ফল-পুষ্প-পত্র-সম্ভার-শোভিত তরুলতাবৃত নিকুঞ্জ-কাননের কথা উদিত হইতে লাগিল। ক্ষণেকের জন্য তাঁহারা যেন

* এইরূপে উভয়ে উভয়ের প্রতি প্রীতিডোরে আবদ্ধ হইয়া গঙ্গাদাসের সন্নিধানে পাঠ সমাপ্ত করিলেন। শ্রীশ্রীচৈতন্য প্রভু এই সময়ে একটী চতুষ্পাঠী সংস্থাপিত করিয়া বিদ্যাদান-ছলে অনেক মানবকে মুক্তিপথ দেখাইতে লাগিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার ঐশ ভাব কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই।

সুকলকণ্ঠ-বিবিধ-বিহঙ্গম-স্বরাপ্লুত, অলিকুল গুঞ্জরিত নিধুবনে উপস্থিত! গদাধর এখন আর সে গদাধর নন, এখন তিনি আপনার অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া, বহুদিনের পর যেন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে কৃষ্ণভাবে আলিঙ্গন করিতে উন্মত্ত! নিমাইও যেন আর সে নিমাই নহেন, এখন তিনি যেন বিরহ-সন্তপ্ত-হৃদয়ে গদাধরকে কুমুদাননা কমলাক্ষী কনকবরণী রাইকিশোরীর ন্যায় বক্ষে ধরিতে প্রয়াসী। লোকে দেখিতেছে, গৌর-গদাধর সম্মিলিত হইয়া আনন্দে নিমগ্ন; কিন্তু তাঁহারা যে চাঁদ-কুমুদের ন্যায়, ফুল-জ্যোৎস্নার ন্যায়, গঙ্গা-সাগরের ন্যায় পবিত্র মিলনে শ্রীনবদ্বীপে থাকিয়া শ্রীবৃন্দাবনের রসাস্বাদ করিতেছেন, তাহা কেহই বুঝিল না। তাহারা তৎকালে জানিল না যে, গোলোকের প্রেম-অমিয়-বিতরণের জন্য রাধাকৃষ্ণ গৌর-গদাধররূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহারা তৎকালে ইহাও বুঝিল না যে, কোন প্রেম মহাজন নবদ্বীপে আসিয়াছেন; একদিন যে সেই প্রেম-স্রোতে জগৎ প্লাবিত হইবে, তাহা কেহই ছন্দাংশেও জানিতে পারিল না। তাহার কারণ, তিনি তখন প্রকাশ হইবার বাসনা করেন নাই, ভগবানের কৃপা ভিন্ন কেহ ভগবানকে জানিতে পারে না। যথা,—

"তিনি না জানালে তাঁরে কে জানিতে পারে।"

তাঁহাকে জানিতে হইলে ভক্তির একান্ত আবশ্যক। ভক্তিবল ভিন্ন কেহ ঈশ্বরের কৃপা-লাভে ধন্য হইতে পারে না। দীন, হীন, তৃণ-কুটীরবাসী ভক্তিমান্ চণ্ডালও তাঁহার আলি-ঙ্গনে ধন্য হইতে পারে, কিন্তু সসাগরা ধরার একচ্ছত্রাধিপতি দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপান্বিত ভক্তি-হীন নৃপতিও তাঁহার নিকটে অনাদৃত ও অকৃপাপাত্র।

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ॥"

ক্রমশঃ

শ্রীসত্যকিঙ্কর কুণ্ডু।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

তত্ত্ব-সভা-সম্মিলন।—আগামী ২৬শে হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় দিবস বারাণসীধামে তত্ত্ব-সভার মহা-সম্মিলন হইবে। উহাতে জগতের চারিদিক হইতে—আমেরিকা, ইয়োরোপ, আসিয়া, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি বহু দেশ হইতে বহু ব্যক্তি সমবেত হইবেন। ঐ উপলক্ষে অ্যানি বেসান্ত মহোদয়া ২৭শে, ২৮শে, ২৯শে এবং ৩১শে তারিখে চারি দিবস চারিটী বক্তৃতা করিবেন। বক্তৃতার নাম যথাক্রমে নিম্নে লিখিত হইল।—

(১) জাতিভেদ প্রথার পূর্ব্বতন অবস্থা। (২) জাতিভেদ প্রথার বর্ত্তমান অবস্থা। (৩) ভারতবর্ষে তত্ত্ব-বিদ্যার স্থান কোথায়। (৪) সম্মিলিত ভারত।

শ্রদ্ধা-প্রকাশ।—আজকাল তত্ত্ব-সভার বহির্ভূত কোন কোন লোক বিবি বেসান্ত মহোদয়া ও লেডবিটার সাহেব মহোদয়ের প্রতি অযথা গ্লানি ঘোষণা করিয়া সাধারণের মনে ভ্রম ধারণা জন্মাইয়া দিতেছেন এবং মনে করিতেছেন যে, যখন নানাস্থানীয় তত্ত্ব-সভার সভ্যগণ এ বিষয়ে নির্ব্বাকভাবে অবস্থান করিতেছেন, তখন তাঁহাদের উক্তি মিথ্যা নহে। এই অসত্য ধারণা বিদূরিত করিবার উদ্দেশে বহু স্থানের শাখা-তত্ত্ব-সভার সভ্যগণ সভাধিবেশন করিয়া নিম্নলিখিত রূপ প্রস্তাবদ্বয় উত্থাপন, সমর্থন ও অনুমোদন পূর্ব্বক সাধারণের অবগতির জন্য উক্ত প্রস্তাবের প্রতিলিপি আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। সকল সভারই প্রস্তাব প্রায় একরূপ। আমরা সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রস্তাবদ্বয়ের অনুবাদ প্রকাশ করিলাম ;—

১ম। তত্ত্ব সভার অধ্যক্ষ আনিবেসান্ত মহোদয়ার প্রতি এই সমিতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস প্রকাশ করিতেছে। বিবি বেশান্ত সকল সময়েই সাধুতা ও সত্য রক্ষার জন্য অসীম শক্তিতে কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহার জীবনে সর্ব্বোচ্চ স্বার্থ-ত্যাগ ও সাধুতার প্রতি সম্মান পরিস্ফুট রহিয়াছে, এবং তাঁহার মহোচ্চ কার্য্যকলাপ আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ ও বিনীতভাবে অনুসরণ করিব।

২য়। লেডবিটার সাহেব মহোদয়েরও প্রতি এই সমিতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে। তাঁহার গভীর জ্ঞান ও উচ্চ শিক্ষা এবং সরল ও পবিত্র জীবন, যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহাদের সকলেরই জীবনের আদর্শস্বরূপ এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান-লাভের সহায়ক।

চিত্র-প্রসঙ্গ।—বর্ত্তমান সংখ্যক "ব্রহ্মবিদ্যায়" "কনফিউসিয়স" নামক একজন অতি প্রাচীন চীনদেশীয় মহাজ্ঞানীর প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশিত হইল, কিন্তু এবারেও প্রবন্ধাধিক্য বশতঃ স্থানাভাব হওয়াতে তাঁহার জীবন-বিবরণ মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। বারান্তরে তাহা প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল

"শিব-শক্তি"-চিত্র গত মাসের পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। "শিব ও শক্তি" শীর্ষক প্রবন্ধ গতবর্ষের পত্রিকায় কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়াছিল, সংস্কৃত-কলেজের অবসর-প্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ রায় এম, এ, মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ এ পর্য্যন্ত সেই প্রবন্ধের শেষাংশ লিখিয়া পাঠাইতে পারেন নাই। যাহা হউক, আগামী মাস হইতে সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে।

বাৎস্যায়ন ভাষ্য।—মহর্ষি-গৌতম-প্রণীত ন্যায়দর্শন আর্য্যজাতির বুদ্ধিমত্তার গৌরব-পতাকা। ইহা অতীব প্রাচীন, প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ইহার প্রচার হইয়াছিল। ইহার বাৎস্যায়ন ভাষ্যটী সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় ইহার অনুবাদ হয় নাই। আমরা বর্ত্তমান মাস হইতে উক্ত অনুবাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম, ক্রমানুসারে বাহির হইতে থাকিবে। ইহা দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্য বিভব-বান্ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মবিদ্যা

২য় বর্ষ।] মাঘ, ১৩২০। [১০ম সংখ্যা।

তুমি।

ক্ষুদ্র বেলাভূমি'পরে সিন্ধুর বিস্তৃতি প্রায়,
'আমার' গণ্ডীর পারে কি অনন্ত দেখা যায়!
বসুন্ধরা বিন্দু সম,
ক্রোড়ে ল'যে অণু মম,
কোথায় পড়িয়া আছে অন্তহীন সে বিস্তারে;
ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড'পরে তরঙ্গিত পারাবারে।
বসুধার শ্যামকায়া,
দূরে জলদের ছায়া,
আর(ও) দূরে চন্দ্রমার বিম্বিত সুষমারাশি,
পরে তা'র তপনের প্রতাপ তমিশ্রনাশী।
আর(ও) পরে ইতস্তত
তপন চন্দ্রমা কত
উজলিছে দিবারাতি দিবারাত্রহীনস্তরে;
নীরদের রেখা নাই সে নির্ম্মল নীলাম্বরে।
তা'র পর ছায়াপথ;
ছায়া হ'তে অবিরত
নির্ম্মিতেছে নব বিশ্ব, বিশ্বের নির্ম্মাতা কবি,
কারণে ফুটিছে নিত্য নূতন চন্দ্রমা-রবি।
পিছে পড়ে ছায়াপথ;
অবারিত মনোরথ
দূর হ'তে দূরে যায় অগণিত স্তরে স্তরে;
কোথা সীমা, কোথা সীমা, লোক হ'তে লোকান্তরে

কোথা মুক্ত মহাকাশ
বিহগের চির আশ,
কোথা ক্ষুদ্র বিহগের শকতির সম্প্রদার ;
কত দূরে শ্রান্ত হ'য়ে নেমে আসে নীড়ে তা'র।
কোথা পারাবার ধায়
তরঙ্গিত নীলিমায়,
ক্ষুদ্র জলচর-প্রাণ কোথা সাথে যেতে চায় ;
কিছু পরে ভীত হ'য়ে ফিরে তা'র সে বেলায়।
তুমি সেই মহাকাশ,
মহাসিন্ধু, মহাত্রাস,
ধরিতে না পেরে তোমা ফিরি আমি বসুধায় ;
তোমারে আমার সনে হারাই যে সে ভূমায়।
আমার এ নীড়ে নামি
আমারে পাই যে আমি,
আমারে ঘিরিয়া, দেখি আমার মতন যারা ;
বুঝি ব'লে, ভালবাসি এই ঘেরা বেড়া কারা।
তাই ঘেরা বেড়া মাঝে
আমার ঘরের সাজে
চিরদিন আসিতেছ তোমার অনন্ত ছেড়ে,
আমার সামগ্রী দিয়ে আমারে নিতেছ কেড়ে।
কৈলাসে বৈকুণ্ঠে তাই
জনক জননী পাই ;
আর(ও) কাছে আসিয়াছ একে বহুরূপ ধরি,
সংসারের সুধাভরা গোলোকের সেই হরি।
গোপাল যশোদা-কোলে,
নন্দের দুলাল দোলে,
শ্রীদাম-সুদাম-সখা, ভাই কানু বলাই এ'র,
রাধিকা-রমণ তুমি, সাধ সব হৃদয়ের।
তুমি দীক্ষাগুরু হ'য়ে,
গীতা মহামন্ত্র ল'য়ে,
ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে আসিলে শ্রীকৃষ্ণরূপে ;
অঙ্কিত তোমার মর্ম্ম ভারত অমৃতস্তূপে।

তুমি সর্ব্বগুণধাম,
সেই রাম অভিরাম,
জগতে দেখায়েছিলে কর্ম্মনিষ্ঠা ইষ্টহারা ;
বুদ্ধরূপে ঝ'রেছিলে করুণার পূর্ণধারা।
আবার আসিলে তুমি
পুণ্যময় করি' ভূমি
অনিন্দ্য গৌরাঙ্গ দেহে, ভেদশূন্য ভালবাসা ;
বারে বারে সুধাধারে মিটাইছ এ পিপাসা।
তোমাকে চিনা'তে হরি
এলে কত রূপ ধরি ;
কত রূপে আছ নিত্য কত তীর্থে এ ধরায় ;
অনন্তে অজ্ঞাত যাহা, সান্তে তাহা জানা যায়।
এ ভূমায় ভাসিতেছ,
আমি হ'য়ে আসিতেছ ;
আপনি অস্ফুট তুমি, আমাতেই ফুটিতেছ ;
ব্রহ্মাণ্ডে আঁটে না যাহা, অণুতে তা' রাখিতেছ।
তুমি আমি চিরসাথী,
আমাতে তোমার(ই) ভাতি,
তোমার(ই) মৃণালে আমি বিকশিত শতদল,
তোমার(ই) বরণ-শোভা, তোমার(ই) সে পরিমল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র।

চৈতন্য কথা।

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং"

নিমি রাজা নবযোগীন্দ্রকে প্রশ্ন করিলেন,—

কস্মিন্ কালে স ভগবান্ কিং বর্ণঃ কীদৃশোনৃভিঃ।
নাম্না বা কেনবিধিনা পূজ্যতে তদিহোচ্যতাম্॥ ভা, পু, ১১ ৫-১৯।

সত্য ও ত্রেতা যুগের অবতার-প্রসঙ্গ শেষ করিয়া করভাজন ঋষি উত্তর করিলেন,—

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈ রুপলক্ষিতঃ।

'দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামবর্ণ। তিনি পীতবসন ও শঙ্খচক্রাদি-ধারী। শ্রীবৎসাদি তাঁহার উপলক্ষণ।' তাঁহাকে কি বলিয়া লোকে পূজা করে?

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ॥
নারায়ণায় ঋষয়ে পুরুষায় মহাত্মনে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ॥

আমাদের বুঝিতে বাকি থাকিল না, ইনি বাসুদেব কৃষ্ণ, যিনি নারায়ণ ঋষির শরীরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানা তন্ত্র বিধানেন কলাবপি যথা শৃণু॥

হে রাজন্! দ্বাপরে এইরূপে জগদীশ্বরের স্তব করে। নানা তন্ত্রের বিধান অনুসারে, কলিযুগে তাঁহার যেরূপ আরাধনা, তাহা শ্রবণ করুন।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

কলির আরাধ্য কৃষ্ণ, কৃষ্ণবর্ণ হইলেও কান্তিতে অকৃষ্ণ বা শ্বেত। তাঁহার অঙ্গ, উপাঙ্গ অস্ত্র ও পারিষদ আছে। অঙ্গাদি সহিত সেই অকৃষ্ণ কৃষ্ণকে, বুদ্ধিমান্ পুরুষেরা সঙ্কীর্ত্তন-ময় যজ্ঞদ্বারা পূজা করেন।

এই শ্লোকদ্বারা ভাগবত মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন, দ্বাপরের বাসুদেব কৃষ্ণ হইতে কলির অকৃষ্ণ কৃষ্ণ ভিন্ন।

চৈতন্য দেবে এই অকৃষ্ণ কৃষ্ণের আবির্ভাব। বৈষ্ণবেরা নানা অর্থে "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং" শ্লোকের অনুবাদ করেন এবং এই শ্লোক মহাপ্রভু চৈতন্য দেবে প্রয়োগ করেন। স্তবমালায় রূপ গোস্বামী বলেন—

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরাৎ অকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্ত্তন-ময়ৈঃ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং সদেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥

কলিযুগে পণ্ডিতগণ সাক্ষাৎভাবে যাঁহার পূজা করেন, শরীরের অত্যন্ত দ্যুতি বশতঃ যিনি অকৃষ্ণাঙ্গ অথচ যিনি কৃষ্ণ, যাঁহাকে উৎকীর্ত্তনময় যজ্ঞদ্বারা পূজা করা যায়, যাঁহাকে সকলে চতুর্থাশ্রমী পরমহংসগণের উপাস্য বলে, চৈতন্যাকৃতি সেই দেব আমাদিগের প্রতি অতিশয় কৃপাবিস্তার করুন।

কৃষ্ণসন্দর্ভের মঙ্গলাচরণে জীব গোস্বামী বলেন,—

অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদি-বৈভবম্।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্য মাশ্রিতাঃ।

যিনি অভ্যন্তরে কৃষ্ণ ও বহির্দ্দেশে গৌরদেহ ধারণ করিয়া অঙ্গাদির বৈভব দর্শন করাইয়াছেন, আমরা কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তনাদি দ্বারা সেই কৃষ্ণচৈতন্যের আশ্রয় গ্রহণ করি।

শুন ভাই এই সব চৈতন্য মহিমা।
এই শ্লোকে কহে তাঁর মহিমার সীমা॥
কৃষ্ণ এই দুইবর্ণ সদা যাঁর মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তিঁহো বর্ণে নিজ মুখে॥
কৃষ্ণবর্ণ শব্দের অর্থ দুইত প্রমাণ।
কৃষ্ণ বিনু তাঁর মুখে নাহি আইসে আন॥
কেহ তাঁরে বলে যদি কৃষ্ণবরণ।
আর বিশেষণে তাহা করে নিবারণ॥
দেহ কান্ত্যা হয় তিঁহ অকৃষ্ণ বরণ।
অকৃষ্ণ বরণে কহি পীতবরণ॥
প্রত্যঙ্গ তাহার তপ্ত-কাঞ্চনের দ্যুতি।
যাহার ছটায় নাশে অজ্ঞান তমস্ততি॥
জীবের কল্মষ-তমো নাশ করিবারে।
অঙ্গে উপাঙ্গ নাম নানা অস্ত্র ধরে॥
ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম।
তাহার কল্মষ নাম সেই মহাতম॥
বাহু তুলি হরি বলি প্রেমদৃষ্ট্যে চায়।
করিয়া কল্মষনাশ প্রেমেতে ভাসায়॥

চৈ. চ. আ লী. ৩য় পরিচ্ছেদ।

এই 'অকৃষ্ণাঙ্গ কৃষ্ণের' সহিত দ্বাপরের কৃষ্ণের যে ভেদ, ভাগবতের সহিত মহাভারতের সেই ভেদ, শুকদেবের সহিত ব্যাসদেবের সেই ভেদ, নির্গুণ ভক্তির সহিত স্বধর্ম্মমূলক সগুণ ভক্তির সেই ভেদ।

দৃষ্ট্বানুযান্তমৃষিমাত্মজমপ্যনগ্নং দেব্যোহ্রিয়া পরিদধুর্ন সুতস্য চিত্রম্।
তদ্বীক্ষ্য পৃচ্ছতি মুনৌ জগদুস্তবাস্তি স্ত্রীপুং ভিদা ন তু সুতস্য বিবিক্তদৃষ্টেঃ॥—ভা পূ, ১-৪-৫।

পুত্র শুকদেব প্রব্রজ করিয়া সরোবরের তীর দিয়া গমন করিলেন। তিনি নগ্ন থাকিলেও দেবকন্যারা জলকেলি করিতে করিতে তাঁহাকে দেখিয়া লজ্জিত হইলেন না। বৃদ্ধ পিতা ব্যাসদেব সেই পথে তাঁহার অনুগমন করিলেন। তখন লজ্জাবশতঃ দেবকন্যারা বস্ত্র পরিধান করিলেন। এই বিচিত্র ঘটনা দেখিয়া ব্যাসদেব তাঁহাদিগকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবকন্যারা বলিলেন—"আপনার স্ত্রী পুরুষ-ভেদ জ্ঞান আছে। কিন্তু আপনার পুত্র সর্ব্বত্র ভগবান্‌কে দর্শন করিতেছেন। তাঁহার এই ভেদ জ্ঞান নাই।"

ব্যাসদেব বিশাল মহাভারত রচনা করিয়াও হৃদয়ে তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। "আমি ভরত-বংশের আখ্যান করিতে গিয়া সমগ্র বেদের অর্থ দেখাইয়াছি। এই

মহাভারতে ধর্ম্মের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এমন কি স্ত্রী-শূদ্রাদিও ইহার মধ্যে আপনাদের ধর্ম্ম দেখিতে পাইবেন। তথাপি আমার আত্মা অসম্পন্নের ন্যায় বোধ হইতেছে। তবে কি আমি ভাগবত-ধর্ম্ম নিরূপণ করি নাই? এই ভাগবত-ধর্ম্মই পরমহংসদিগের প্রিয়। এমন কি এই ভাগবতধর্ম্ম অচ্যুতেরও প্রিয়।"

সময় বুঝিয়া নারদ ঋষি সেই বিবিক্ত প্রদেশে উপনীত হইলেন। তিনি বলিলেন, "ব্যাসদেব! তুমি যাহা ভাবিতেছ, তাহাই সত্য।"

যথা ধর্ম্মাদয়শ্চার্থা মুনিবর্য্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
ন তথা বাসুদেবস্য মহিমা হ্যনুবর্ণিতঃ॥ ভা, পু, ১-৫-৯

হে মুনিবর্য্য, তুমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছ, বাসুদেবের মহিমা সেরূপ কীর্ত্তন কর নাই।

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে নচার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥

নিরুপাধি ব্রহ্মজ্ঞানও ভগবদ্ভাব-বর্জ্জিত হইলে শোভা পায় না। কর্ম্ম সকামই হউক বা নিষ্কামই হউক, তাহার ত কথাই নাই।

ততোঽন্যথা কিঞ্চন যদ্বিবক্ষতঃ পৃথগ্‌দৃশস্তৎ কৃতরূপনামভিঃ।
ন কর্হিচিৎ ক্বাপিচ দুঃস্থিতা মতির্লভেত বাতাহতনৌরিবাস্পদম্॥

এক ভগবানেরই যথাসাধ্য বর্ণনা কর। তাহা ভিন্ন আর যাহা কিছু বলিতে ইচ্ছা করিবে, লোক একে ভেদদর্শী, নানা রূপ ও নামসমন্বিত তোমার সেই বাক্যে তাহাদের বুদ্ধি স্থিরতা-লাভ করিবে না। বাতাহত নৌকার ন্যায় তাহাদের বুদ্ধি ঘূর্ণিত হইতে থাকিবে।

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্বোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥

যদি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেহ হরির চরণাম্বুজ ভজনা করে, সে অপক্ক অবস্থাতেও যদি পতিত বা মৃত হয়, তাহা হইলে সে যে অবস্থাতেই থাকুক, বা যে বংশেই পুনর্জ্জন্ম-গ্রহণ করুক, তাহার অমঙ্গল হয় না। আর স্বধর্ম্ম আচরণ করিয়া কেহ যদি হরির ভজনা না করে, তবে সেই বা কোন্ অর্থ লাভ করে?

ব্যাসদেব ঐশ্বর্য্য মার্গে ঈশ্বরকে দেখাইয়াছেন। তিনি অপরা প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতির ভেদ করিয়া, সেই দুই প্রকৃতির ঈশিতাকে দেখাইয়াছেন। অর্জ্জুন তাঁহার বিশ্বরূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন। বিশ্ব ও প্রকৃতির পারে তাঁহার কি নিজরূপ নাই? সেই আনন্দ ময়ের কি আনন্দমূর্ত্তি নাই, যাহা দেখিয়া জগৎ আনন্দ লাভ করিতে পারে, ভয় বিসর্জ্জন করিতে পারে, অসম্ভ্রমে ভগবান্‌কে আলিঙ্গন করিতে পারে। ভগবানের কি নিজরূপ নাই? তিনি কি সর্ব্বদাই শাসনকর্ত্তা। তাঁহার কি নিজজন নাই, যাহাদিগকে শাসন করিবার কোন

প্রয়োজন থাকে না, যাহারা শাসনাতীত, যাহারা তাঁহার সহকারী, যাঁহারা তাঁহার হৃদয়াধিকারী।' এই সংসারের ভেদজালের মধ্যে, এই ভেদের অত্যন্ত সংঘর্ষণে, এই 'আমি-তুমি' র নিরন্তর কলরবে, এমন কি দ্বৈত-শাসন-কারী বেদ, বিধি, ধর্ম্মের চীৎকার রবে না ভগবানের মধুর স্বরূপ জানা যায়, না তাঁহার নিজজনের মাহাত্ম্য অনুভব করা যায়।

কেবল মাত্র অকৈতব ধর্ম্মে ভগবান্‌কে জানিতে পারা যায়।

অকৈতব ভক্তি।

অকৈতব ভক্তি নিগুর্ণ ভক্তির নামান্তর মাত্র। যে ভক্তিতে ভগবানের সহিত ব্যবধান নাই, এবং যে ভক্তির মূলে কোন হেতু নাই তাহাকে অকৈতব ভক্তি বলে। ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে ভগবান্‌কে দূর হইতে প্রণাম করিতে হয়, এই জন্য ঐশ্বর্য্য ঈশ্বরের সহিত ব্যবধান করিয়া দেয়, অতএব ঐশ্বর্য্য কৈতবের মধ্যে। ভেদের শাসনের জন্য বেদের বিধি। ভেদের মধ্যেই সেই বিধি ভাল লাগে ও সেই বিধি ভক্তের সহায়ক হয়। কিন্তু যেখানে কেবলমাত্র ভগবৎ-সম্বন্ধ এবং ভগবৎ-সম্বন্ধেই অন্যের সহিত সম্বন্ধ, সেখানে বিধি ভগবানের সহিত ব্যবধান করিয়া দেয়; অতএব বিধিও কৈতবের মধ্যে। ভুক্তি নিজের ভোগ, মুক্তি নিজের বন্ধ-মোচন। শুদ্ধ ভক্তিতে নিজের চিন্তা নাই, কেবলমাত্র ভগবৎ-ভাবনা ও ভগবানের কার্য্য সাধন। অতএব ভুক্তি ও মুক্তি, দুই সমান ভাবে কৈতব।

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতি রবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নিগুর্ণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥
সালোক্য-সার্ষ্টি সামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ ভা, পু ৩—২৯

কপিল দেব নিগুর্ণ ভক্তির এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন। এই অকৈতব নিগুর্ণ ভক্তি লইয়াই ভাগবত পুরাণ।

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিত কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাম্" ১-১-২।

এই ভাগবত পুরাণে নির্ম্মৎসর সাধুদিগের জন্য পরম ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে, যে ধর্ম্মে কৈতব প্রকৃষ্টরূপে ত্যক্ত।

শ্রীধরস্বামী বলেন—"উজ্‌ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ।
প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ। কেবলমীশ্বরারাধন লক্ষণো ধর্ম্মোনিরূপ্যতে।"

অর্থাৎ এ ধর্ম্মে ফলাভিসন্ধানরূপ কপটতা নাই। এমন কি মোক্ষেরও অভিসন্ধান নাই। কেবলমাত্র ঈশ্বরারাধন-লক্ষণ এই ধর্ম্ম।

এই ভাগবত ধর্ম্ম প্রচারের জন্যই মহাপ্রভুর অবতার। তিনি এই ভাগবত ধর্ম্মের জলন্ত, জীবন্ত, চূড়ান্ত উদাহরণ।

প্রহ্লাদ কথিত নবধা ভক্তি এই ভাগবত-ধর্ম্মের বীজমন্ত্র।

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্য মাত্মনিবেদনম্॥

প্রথমে হরির নাম ও লীলা শ্রবণ। তাহার পর হরিনামের ও হরিলীলার উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন। তাহার পর হরির নিত্য স্মরণ ও মনে মনে নিত্য নাম গ্রহণ। তাহার পর মন্দিরে পরিচর্য্যা। তাহার পর প্রতিমাদিতে তাঁহার পূজন। তাহার পর হরির বন্দনা এইরূপে শান্তভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার পর নিত্য ভগবানের দাসত্ব। জীবে দয়া ও অনুরাগ এবং জীবের উপকারই ভগবানের দাসত্ব।

অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্॥—ভাঃ পুঃ ৩।২৯।২৫

সেইকাল পর্য্যন্ত প্রতিমাদিতে ঈশ্বরের আরাধনা করিবে, যে কাল পর্য্যন্ত আপনার হৃদয়ে এবং সকল প্রাণীতে তাঁহাকে অবস্থিত বলিয়া জানিতে না পারিবে।

অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা। - ৩-২৯-২৭

আমি সকল ভূতে অবস্থিত, সকল ভূতেরই আত্মা। এই জন্য অভিন্ন দৃষ্টিতে সকল প্রাণীকে দান, মান ও মৈত্রী দ্বারা পূজা করিবে।

ইহাই হইল ভগবানের দাসত্ব। তাহার পর সখ্য। ভগবানের সহিত এতদূর ঘনিষ্ঠতা আসিয়া পড়ে যে, ভক্ত তখন ভগবান্‌কে আপনার বলিয়া জ্ঞান করেন, এমন কি ভগবান্‌কে আপনার সখা বলিয়া বিবেচনা করেন। বাৎসল্য-ভাবও এই সখ্যভাবের অন্তর্গত। তাহার পর মধুর-ভাবে আত্ম-নিবেদন।

এই ভক্তির মধ্যে ভেদ নাই, বিধি নাই, ভুক্তি মুক্তি নাই।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব নাম-সঙ্কীর্ত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মনিবেদন পর্য্যন্ত ভক্তির সকল অঙ্গই নিজ লীলা দ্বারা দেখাইয়াছিলেন এবং অধিকারী-ভেদে নবধা ভক্তির সকল অঙ্গই প্রচার করিয়াছিলেন।

ভক্তির কপটতা তিনি একবারে সহ্য করিতে পারিতেন না। সুতরাং ভক্তগণকে তিনি সর্ব্বদা অকপট, অকৈতব ভক্তির শিক্ষা দিতেন এবং মধ্যে মধ্যে এই বিষয়ে তাঁহাদের পরীক্ষা লইতেন।

আরদিন প্রভু গেলা জগন্নাথ দরশনে। দর্শন করিলা জগন্নাথ শয্যোত্থানে॥
পূজারি আনিয়া থালা প্রসাদান্ন দিলা। প্রসাদান্ন থালা পাঞা প্রভু হর্ষ হৈলা॥
সেই প্রসাদান্ন থালা অঞ্চলে বান্ধিয়া। ভট্টাচার্য্যের ঘরে আইলা ত্বরাযুক্ত হৈয়া॥

অরুণোদয় কালে হৈল প্রভুর আগমন। সেইকালে ভট্টাচার্য্যের হৈল জাগরণ ॥
কৃষ্ণ-কৃষ্ণ স্ফুট কহি ভট্টাচার্য্য জাগিলা। কৃষ্ণনাম শুনি প্রভুর আনন্দ বাড়িল ॥
বাহিরে প্রভুর তেঁহো পাইল দরশন। আস্তে-ব্যস্তে আসি কৈল চরণ-বন্দন ॥
বসিতে আসন দিয়া দোঁহেত বসিলা। মহাপ্রসাদান্ন খুলি প্রভু হাতে দিলা ॥
প্রসাদান্ন পাঞা ভট্ট আনন্দ হৈল মন। কৃতার্থ হইয়া প্রসাদ করিল ভক্ষণ ॥
স্নান সন্ধ্যা দন্তধাবন যদ্যপি না কৈল। চৈতন্য প্রসাদে মনের সব জাড্য গেল ॥
ভক্তি করি মহাপ্রসাদ কর পাতি লৈল। এই শ্লোক পড়ি অন্ন ভক্ষণ করিল ॥

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বাদূরদেশতঃ। প্রাপ্ত মাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্রকার্য্যা বিচারণা ॥
ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা। প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং দৃষ্টে ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ ॥—পদ্মপুরাণ

দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন। প্রেমাবিষ্ট হৈয়া কৈলা তারে আলিঙ্গন ॥
দুইজন ধরি দোঁহে করেন নর্ত্তন। দোঁহার স্পর্শেতে দোঁহার প্রফুল্ল হৈল মন ॥
স্বেদ কম্প অশ্রু দোঁহে আনন্দে ভাসিলা। প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা ॥
আজি মুঞি অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন। আজি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠে আরোহণ ॥
আজি মোর পূর্ণ হৈল সব অভিলাষ। সার্ব্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস ॥
আজি নিষ্কপটে তুমি হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়। কৃষ্ণ নিষ্কপটে হৈলা তোমারে সদয় ॥
আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি বন্ধন। আজি ছিন্ন কৈলে তুমি মায়ার বন্ধন ॥
আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তি-যোগ্য হৈল তোমার মন। বেদ ধর্ম্ম লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদ-ভক্ষণ ॥

—চৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্যলীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যখন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বেদের বিধি লঙ্ঘন করিতে পারিলেন, তখন নিশ্চয় জানা গেল, যে ভগবৎ-প্রেম তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে। সে হৃদয়ে কি আর মুক্তি স্থান পায়? ভগবানের সেবা ছাড়িয়া মুক্তি? নিজের জন্য মুক্তি? শুদ্ধ ভক্তিতে মুক্তি কপটতা মাত্র।

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়াছিলেন—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥ ১০-১৪-৮

'কেবলমাত্র তোমার কৃপার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, আপন কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে, কায়মনোবাক্যে তোমায় নমস্কার করিতে করিতে, যে ব্যক্তি জীবন ধারণ করেন, সেই ব্যক্তি মুক্তির আশ্রয় স্বরূপ তোমাতে দায়াধিকার লাভ করিয়া থাকেন।'

সার্ব্বভৌম একদিন এই শ্লোক পড়িয়া মহাপ্রভুর স্তব করিলেন। কিন্তু তিনি "মুক্তি-পদে" না বলিয়া "ভক্তিপদে" বলিলেন।

প্রভু কহে "মুক্তিপদে" ইহা পাঠ হয়। ভক্তিপদ কেনে পড় কি তোমার আশয় ॥
ভট্টাচার্য্য কহে মুক্তি নহে ভক্তিফল। ভগবদ্বিমুখের হয় দণ্ড কেবল ॥

কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে। যেই নিন্দা যুদ্ধাদিক করে তাঁর সনে ॥
সেই দুয়ের দণ্ড হয় ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি। তার মুক্তিফল নহে যেই করে ভক্তি ॥
যদ্যপি সে মুক্তি হয় পঞ্চ প্রকার। সালোক্য সামীপ্য সারূপ্য সার্ষ্টি সাযুজ্য আর ॥
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবাদ্বার। তবে কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার ॥
সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়। নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয় ॥
ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুইত প্রকার। ব্রহ্মসাযুজ্য হইতে ঈশ্বর সাযুজ্য ধিক্কার ॥

[যাহার সেবাকরা ভক্তের চরম উদ্দেশ্য, তাহার সহিত এক হওয়া ভক্ত স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন না।]

প্রভু কহে মুক্তি পদের আর অর্থ হয়।
মুক্তিপদ শব্দে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহয় ॥
মুক্তিপদে যার সেই মুক্তিপদ হয়।
নবম পদার্থ মুক্তির কিংবা সমাশ্রয় ॥

[পুরাণের দশ লক্ষণ। তাহার মধ্যে মুক্তি নবম লক্ষণ।]

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চস্থানং পোষণ মূতয়ঃ। মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্। বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা ॥ ভাঃ পুঃ ২-১০

দুই অর্থে কৃষ্ণ কহি কাহে পাঠ ফিরি।
সার্ব্বভৌম কহে ও পাঠ কহিতে না পারি ॥
যদ্যপি তোমার অর্থ এই শব্দে কয়।
তথাপি আশ্লিষ্য দোষে কহনে না যায় ॥
যদ্যপি মুক্তি শব্দের হয় পঞ্চবৃত্তি।
রূঢ়িবৃত্তে কহে তবু সাযুজ্যে প্রতীতি ॥
মুক্তি শব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা ত্রাস।
ভক্তি শব্দ কহিতে মনে হয়ত উল্লাস ॥
শুনিয়া হাসেন প্রভু আনন্দিত মন।
ভট্টাচার্য্যে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গন ॥
চৈ, চ, মধ্য, ৬

ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে ভক্তি মহাপ্রভুর অসহ্য ছিল। তিনি লক্ষ্মীদেবীর ভক্তির উপর কটাক্ষ করিতেন। ব্রজের অকৈতব শুদ্ধ ভক্তি তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তিনি কেবল সেই ভক্তিরই উপদেশ করিতেন।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বেঙ্কট ভট্ট নামে একজন বৈষ্ণব বাস করিতেন। মহাপ্রভু তাঁহার গৃহে চাতুর্মাস্য করিয়াছিলেন। ঐ ভট্ট নিষ্ঠার সহিত লক্ষ্মী-নারায়ণের সেবা করিতেন।

প্রভু কহে ভট্ট তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। কান্তবক্ষঃস্থিতা পতিব্রতা-শিরোমণি ॥
আমার ঠাকুর কৃষ্ণ গোপ গোচারণ। সাধ্বী হঞা কেনে চাহে তাঁহার সঙ্গম ॥
এই লাগি সুখভোগ ছাড়ি চিরকাল। ব্রত নিয়ম করি তপ করিলা অপার ॥
ভট্ট কহে কৃষ্ণ নারায়ণ একই স্বরূপ। কৃষ্ণেতে অধিক লীলা বৈদগ্ধ্যাদি রূপ ॥
তাঁর স্পর্শে নাহি যায় পতিব্রতা ধর্ম্ম। কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম ॥
কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতা-ধর্ম্ম নহে নাশ। অধিক লাভ পাইয়ে আর রাসবিলাস ॥

বিনোদিনী লক্ষ্মীর হয় কৃষ্ণে অভিলাষ।
ইহাতে কি দোষ কেনে কর পরিহাস॥
প্রভু কহে দোষ ইহা নাহি আমি জানি।
রাস না পাইল লক্ষ্মী ইহা শাস্ত্রে শুনি॥
লক্ষ্মী কেনে না পাইলা কি ইহার কারণ।
তপ করি কৈছে কৃষ্ণ পাইল শ্রুতিগণ॥
শ্রুতি পায়, লক্ষ্মী না পায় ইথে কি কারণ।
ভট্ট কহে ইহা প্রবেশিতে নারে মোর মন॥
প্রভু কহে কৃষ্ণের এক স্বভাব লক্ষণ।
স্বমাধুর্য্যে করে সদা সর্ব্ব আকর্ষণ॥
ব্রজলোকের ভাবে পাই তাঁহার চরণ।
তাঁরে ঈশ্বর করি নাহি জানে ব্রজজন॥
কেহ তাঁরে পুত্রজ্ঞানে উদূখলে বান্ধে।
কেহ সখা জ্ঞানে জিনি চড়ে তাঁর কান্ধে॥
ব্রজেন্দ্র-নন্দন তাঁরে জানে ব্রজজন।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞান নাহি নিজ সম্বন্ধ মনন॥
ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন।
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥
শ্রুতি সব গোপীগণের অনুগত হঞা।
ব্রজেশ্বরী সুত ভজে গোপীভাব লঞা॥
ব্যূহান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল।
সেই দেহে কৃষ্ণসঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল॥
গোপজাতি কৃষ্ণ, গোপী প্রেয়সী তাঁহার।
দেবী বা অন্যস্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার॥
লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম।
গোপিকা অনুগা হঞা না কৈল ভজন॥
অন্যদেহে না পাইয়ে রাসবিলাস।
অতএব "নায়ং" শ্লোক কহে বেদব্যাস॥

চৈ, চ, মধ্য, ৯।

ঐশ্বর্য্যে সম্ভ্রম আছে, অপেক্ষা আছে, ভয় আছে। এ সকল ত কৈতব। অকৈতবে, অকপটে কৃষ্ণ সঙ্গমলাভের জন্য এক ব্রজভাব ভিন্ন অন্য ভাব নাই। সে ভাবে বিধি নাই, ঐশ্বর্য্য নাই, মুক্তির প্রলোভন নাই। সে ভাবে অব্যবধানে কৃষ্ণের সহিত মেশামিশি হওয়া সম্ভব। তবে সে ভাবে কোন না কোন গোপীর অনুগত হইতে হয়। এ কথা পরে জানিতে পারিব।

মধ্বাচার্য্যের শিষ্যগণ তত্ত্ববাদী। তাঁহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলেন এবং মুক্তি তাঁহাদের চরম লক্ষ্য। মহাপ্রভু উড়ুপ কৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য মধ্বাচার্য্যের স্থানে গমন করিলেন।

তত্ত্ববাদীগণ প্রভুকে মায়াবাদী জ্ঞানে।
প্রথম দর্শনে প্রভুর না কৈল সম্ভাষণে॥
পাছে প্রেমাবেশ দেখি হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণব জ্ঞানেতে বহু করিল সৎকার॥
বৈষ্ণবতা সবার অন্তরে গর্ব্ব জানি।
ঈষৎ হাসিয়া কিছু কহে গৌরমণি॥
সবার অন্তরে গর্ব্ব জানি গৌরচন্দ্র।
তা সবা সহিত গোষ্ঠী করিল আরম্ভ॥
তত্ত্ববাদী আচার্য্য শাস্ত্রে পরম প্রবীণ।
তাঁরে প্রশ্ন কৈল প্রভু হৈয়া যেন দীন॥
সাধ্য সাধন আমি না জানি ভাল মতে।
সাধ্য সাধন শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে॥
আচার্য্য কহে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ।
এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন॥
পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন।
সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্র নিরূপণ॥
প্রভু কহে শাস্ত্রে কহে শ্রবণ কীর্ত্তন।
কৃষ্ণপ্রেম-সেবা ফলের পরম সাধন॥

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥
ভা, পু, ৭-৫।

শ্রবণ কীর্ত্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা।
সেই পরম পুরুষার্থ পুরুষার্থ সীমা॥

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নাম কীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ॥
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোক বাহ্যঃ॥ ভাঃ পুঃ ২-৪৭ ৩৮।

কর্ম্মত্যাগ কর্ম্মনিন্দা সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি কভু নহে॥

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাংভজেৎ স চ সত্তমঃ॥ ভা, পু, ১১-১১-৩২।

'বেদে বিধিমার্গে আমি যে গুণ-দোষাত্মক স্বধর্ম্মের আদেশ করিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণরূপে জানিয়াও ভক্তির ব্যাঘাত ও বিক্ষেপ কারী বলিয়া সকল ধর্ম্মকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া যিনি আমাকে ভজনা করেন, তিনিই সর্ব্বোত্তম সাধু।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥—ভগবদ্গীতা।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে॥ ভাঃ পুঃ ১১—২০—৯।

পঞ্চবিধ মুক্তিত্যাগ করে ভক্তগণ।
ফল্গুকরি মুক্তি দেখে নরকের সম॥

সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ। ভা, পু, ৫-১৪-৪৩।

কৃষ্ণসেবানুরক্ত মহাত্মাদিগের নিকট অভব বা নির্ব্বাণমুক্তিও তুচ্ছ।

কর্ম্মমুক্তি দুইবস্তু ত্যজে ভক্তগণ।
সেই দুই স্থাপ তুমি সাধ্য সাধন॥ চৈ, চ, মধ্য, ৯।

বৈধভক্তি, ঐশ্বর্য্যমার্গ ও মুক্তি বাঞ্ছা, এই তিন ত্যাগ করিয়া রাগমার্গে অকৈতব ভক্তি করাই চৈতন্যদেবের শিক্ষা। কিন্তু অধিকারী ভেদে বহিরঙ্গ ভক্তের জন্য তিনি একবারে বৈধভক্তি ত্যাগের নিষেধ করিতে পারেন নাই। বৈধভক্তির বন্ধন তিনি শিথিল করিয়া গিয়াছেন এবং বৈধভক্তির অনুকল্পও তিনি বিধান করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বে তীর্থযাত্রায়, উপবাস ও ক্ষৌর না করিয়া কেহ মহাপ্রসাদ পর্য্যন্ত ভোজন করিতেন না। রাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্য-ভক্তগণের বিপরীত বিধান দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

রাজা কহে উপবাস ক্ষৌর তীর্থের বিধান।
তাহা না করিয়া কেনে খাবে অন্ন পান॥
ভট্ট কহে তুমি কহ সেই বিধিধর্ম্ম।
এই রাগমার্গে আছে সূক্ষ্ম ধর্ম্মকর্ম্ম॥

* * * *
* * * *

যারে কৃপা করি করে হৃদয়ে প্রেরণ।
কৃষ্ণাশ্রয় ছাড়ে সেই বেদ লোকধর্ম্ম॥

যদা যস্যানুগৃহ্লাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥—ভা, পু, ৪-২৯-৪৫।

যখন আত্মভাবিত ভগবান্ অনুগ্রহ করেন, তখন ভক্ত লোকব্যবহারে ও বেদে পরিনিষ্ঠিতা বুদ্ধি ত্যাগ করে।—চৈ, চ, মধ্য, ১১।

প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার॥
এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ ক্ষয়।
নববিধ ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়॥
দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে॥
আনুসঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষয়ে করে কৃষ্ণপ্রেমোদয়॥

চৈ, চ, মধ্য, ১৫।

বাস্তবিক পক্ষে নবধা ভক্তিতেও বহিরঙ্গ সাধন ও অন্তরঙ্গ সাধন আছে। দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন অন্তরঙ্গ। আর সব বহিরঙ্গ। রাগানুগা ভক্তিতে বহিরঙ্গ বা বৈধ সাধনের প্রয়োজন হয় না। বহিরঙ্গ অধিকারীর জন্য বৈধ ভক্তির প্রয়োজন হয়। মহাপ্রভু নিম্নলিখিত রূপে বৈধী ভক্তির অনুকল্প দেখাইয়াছেন।

রাগহীন জন ভজে শাস্ত্র আজ্ঞায়।
বৈধীভক্তি বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তি বহুত বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধুসঙ্গ সার॥
গুরুপদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন।
সদ্ধর্ম্ম-শিক্ষা পৃচ্ছা সাধুমার্গানুগমন॥
কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ কৃষ্ণতীর্থে বাস।
যাবৎ নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ একাদশ্যুপবাস॥
ধাত্র্যশ্বত্থ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণব-পূজন।
সেবা-নামাপরাধাদি দূরে বর্জ্জন॥
অবৈষ্ণব সঙ্গ ত্যাগ বহু শিষ্য না করিবে।
বহুগ্রন্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিবে॥
হানিলাভ সম শোকাদি-বশ না হইবে।
অন্যদেব অন্যশাস্ত্র নিন্দা না করিবে॥
বিষ্ণু বৈষ্ণব নিন্দা গ্রাম্য বার্ত্তা না শুনিবে।
প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পূজন বন্দন।
পরিচর্য্যা দাস্য সখ্য আত্মনিবেদন॥
অগ্রে নৃত্যগীত বিজ্ঞপ্তি দণ্ডবৎ নতি।
অভ্যুত্থান অনুব্রজ্যা তীর্থগৃহে গতি॥
পরিক্রমা স্তবপাঠ জপ সঙ্কীর্ত্তন।
ধূপ মাল্য গন্ধ মহাপ্রসাদ ভোজন॥
আরাত্রিক মহোৎসব শ্রীমূর্ত্তি দরশন
নিজপ্রিয়-দান ধ্যান তদীয় সেবন॥
তদীয় তুলসী বৈষ্ণব মথুরা ভাগবত
এই চারিসেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত॥
কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা তৎকৃপাবলোকন
জন্মদিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ॥

সর্ব্বদা শরণাগতি কার্ত্তিকাদি ব্রত।
চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ব॥
সাধুসঙ্গ নামকীর্ত্তন ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তি শ্রদ্ধায়ে সেবন॥
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় পাঁচের অল্পসঙ্গ॥

মহাপ্রভু প্রথমে চৌষট্টি অঙ্গ সাধন বলিয়া, তাহার পর পঞ্চ অঙ্গ সাধন বলিলেন। এই পঞ্চ অঙ্গ সাধন বলিয়াও তিনি তৃপ্ত হইলেন না।

এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈতে উপজায় প্রেমের তরঙ্গ॥
এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ।
অম্বরীষাদি ভক্তের বহু অঙ্গ সাধন॥

কিন্তু মহাপ্রভুর মন রাগানুগা ভক্তিতেই আবিষ্ট। কেবল লোকসংগ্রহের জন্য এবং সকল অধিকারীর উপযোগের জন্য বৈধী ভক্তির উল্লেখ।

বিধি ধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন॥
অজ্ঞানেও হয় যদি পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে না করে প্রায়শ্চিত্ত॥

চৈ, চ, মধ্য, ২২।

স্বপাদ মূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্য ভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥ ভা, পু. ১১-৫-১৮।

যদি কোন প্রিয়ভক্ত অনন্যভাব হইয়া হরির চরণ ভজনা করে, সে প্রমাদবশতঃ কোন নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলেও, হরি তাহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া সকল পাপ দূর করিয়া দেন।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

মৃত্যুর প্রতি।

হে মরণ, ধ্রুব, নিত্য, অতৃপ্ত-অতিথি
মোর জন্ম দিন হ'তে ধীরে অতি ধীরে
যাত্রা তুমি করিয়াছ ; সঙ্গোপনে নিতি
আসিতেছ পথ বহি' জীবনের তীরে,
অনিশ্চিত কোন্ মহাক্ষণে তরীখানি
লাগিবে তোমার অলক্ষিতে, নাহি জানি ;
তাই আজি হ'তে, রিক্ত, শূন্য, মুক্ত করি'
রাখিয়াছি আপনারে সব পরিহরি'।
হে মরণ মহাত্মীয় তুমি জীবনের
একমাত্র আরাধ্য বাঞ্ছিত ; যবে এর
বর্ণ গন্ধ গীতময় আনন্দের ক্ষণ
আসে ফুরাইয়া —তুমি তারে লহ তুলি'
বিরাট উৎসঙ্গে তব ; সুখ দুঃখ সব ভুলি'
অবশ-আবেশে তোমা করি আলিঙ্গন
চির-নিদ্রা মাঝে লভে বিশ্রাম-শয়ন।
আস' তুমি ওগো মৃত্যু, দুর্দ্দিনে বান্ধব,
দুঃখময় রিক্ততার দিনে যবে সব
শেষ হয়ে আসে, যবে সবে ছেড়ে যায়,
তুমি আস' তবে, নিষ্কাম প্রেমিক প্রায়—
স্বরাহীন, অচঞ্চল, গম্ভীর-প্রণয়ী
হে বৈরাগী, হে আমার জীবন-বিজয়ী।

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন

মৃত্যুর পরপারে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

স্বর্গবাসীর আত্মীয় স্বজন।

মানবের স্বজন-প্রীতি এতই প্রবল যে,স্বর্গ অতি সুখের স্থান জানিয়াও তিনি একাকী ঐ সুখ ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন না। মৃত্যুকালে যদি তাঁহাকে বলা যায় যে, তিনি যেখানে যাইতেছেন, তাহা অতি রমণীয় স্থান, আনন্দ নিকেতন. তথায় দুঃখের লেশমাত্র নাই ; তথাপি তিনি যেন আশ্বস্ত হন না। ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা, আমার প্রিয়তম-গুলিকে সেখানে দেখিতে পাইব কি ?" যেন প্রিয়তমগুলিকে ছাড়িয়া তিনি স্বর্গেও সুখ পাইবেন না! আহা! করুণাময়. এই নিঃস্বার্থ ভালবাসার পুরস্কারের অতি সুন্দর ব্যবস্থাই করিয়াছেন। মানবমাত্রই তাঁহার প্রিয়তমগণকে স্বর্গে দেখিতে পাইবেন, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই ; পৃথিবী অপেক্ষা ভালরূপে দেখিতে পাইবেন।

কিরূপে দেখিতে পাইবেন ? স্বর্গবাসী কি পৃথিবী দেখিতে পান ? তাঁহার আত্মীয়-স্বজন পৃথিবীতে কি করিতেছেন, কি খাইতেছেন, কি ভাবিতেছেন, তাঁহাদের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিরূপ উন্নতি অবনতি, সুখ দুঃখ ঘটিতেছে,— এ সবই কি তিনি স্বর্গ হইতে দেখিতে পান ? না, তা' পান না তা' যদি পাইতেন,তাহা হইলে তাঁহার কিছুমাত্র সুখ ও শান্তি থাকিত না। কারণ পৃথিবী দুঃখেরই আগার, সুখ অপেক্ষা দুঃখই এখানে অনেক বেশী। প্রিয়তমগণ নিত্য নূতন নূতন দুঃখে পড়িতেছেন, রোগ, শোক, মনস্তাপ, জরা, উদ্বেগ, ভয় প্রভৃতিতে নিয়ত ছট্‌ফট্ করিতেছেন, ইহা দেখিলে কোন্ ব্যক্তি নিশ্চিন্ত মনে স্বর্গসুখ ভোগ করিতে পারেন ? শুধু কি তাই ? হয়ত তিনি দেখিতেন, তাঁহার প্রিয়-তমগণ তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় (অথবা আদৌ) ভালবাসেন না, তাঁহার নিন্দা করিতেছেন, তাঁহাকে গালি দিতেছেন। এ সকল দৃশ্য দেখিয়া তিনি স্বর্গে কিরূপে শান্তি পাইবেন ? তবে কি স্বর্গে গিয়া তিনি তাঁহাদের জন্য প্রতীক্ষা করেন ? যতদিন না তাঁহারা স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে আইসেন, ততদিন কি তাঁহাদের আশাপথ চাহিয়া থাকেন ? তা'ই বা কিরূপে হইতে পারে ? চিত্ত যদি উদ্বেগ ও প্রতীক্ষায় সর্ব্বদা আন্দোলিত হয়, তাহা হইলে উহাতে সুখ ও শান্তি কিরূপে থাকিতে পারে ? স্বর্গ একটি বিশ্রামের স্থান। কর্ম্মক্লান্ত জীবকে কিয়ৎকাল অবিমিশ্র শান্তি ও আনন্দ দান পূর্ব্বক পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত করাই মঙ্গলময়ের উদ্দেশ্য। অতএব যাহাতে এই শান্তির বিঘ্ন হয়, আনন্দের ব্যাঘাত হয়, স্বর্গে তাহা থাকিতে পারে না। তবে, এ সমস্যা কিরূপে পূর্ণ হয় ? এ বড় কঠিন সমস্যা! মানব আত্মীয় স্বজনকে ভালবাসেন ; ইহাদিগকে না দেখিলে তিনি

স্বর্গে সুখ পাইবেন না। কিন্তু পৃথিবীস্থিত আত্মীয়গণকে দেখিলে তিনি সুখ না পাইয়া দুঃখই পাইবেন। তবে উপায়? মানব ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কোনও উপায় স্থির করিতে না পারিলেও, ভগবান্ সুন্দর উপায় করিয়াছেন। তাহা কি? দেখা যাক্।

মনের যে কি অসাধারণ শক্তি, তাহা আমরা অনেকেই অবগত নহি। মনের দ্বারা আমরা পদার্থ সৃষ্টি ও ধ্বংস করিতে পারি, কোনও জিনিষ গড়িতে ও ভাঙ্গিতে পারি। বাস্তবিক, আমরা অজ্ঞাতসারে নিয়তই উহা করিতেছি। আমরা যে বস্তুটির চিন্তা করি, ধ্যান করি, সেই বস্তুটি প্রকৃতই সূক্ষ্মপদার্থে নির্ম্মিত হয়, গঠিত হয়। উহা আমরা দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু দিব্যদর্শিগণ (Clairvoyants) দেখিতে পান। মনে করুন, কল্য যে গোলাপ ফুলটি দেখিয়াছিলাম, অন্য ঘরে বসিয়া, চক্ষু মুদিত করিয়া, তাহার ধ্যান করিতে লাগিলাম, উহার একটি মানসিক চিত্র (mental picture) প্রস্তুত করিলাম, উহার পাতা, বোঁটা, সুন্দর পাপ্ড়ি, বর্ণ,— সমস্তই মানস চক্ষে দেখিতে লাগিলাম। উহার ফল এই হইবে যে, তেজস্তত্ত্বে ঐ গোলাপ ফুলটি নির্ম্মিত হইবে এবং (আমি ধ্যান হইতে বিরত হইলেও) উহা সূক্ষ্ম জগতে বহুকাল থাকিবে; ক্রমে ক্রমে পরমাণুগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। ধ্যান যতই দীর্ঘ, প্রগাঢ় ও একাগ্র হয়, সৃষ্ট বস্তুটি ততই অধিক কাল সূক্ষ্মজগতে অবস্থান করে। ইহাদিগকে thought-forms বা ধ্যানসৃষ্ট বস্তু বলে। যাঁহারা যোগমার্গে অগ্রসর হইয়াছেন (অর্থাৎ চিত্তের বল, দৃঢ়তা ও একাগ্রতা খুব বাড়াইয়াছেন), তাঁহারা ইচ্ছা করিলে ধ্যান-সৃষ্ট বস্তুকে স্থূলতত্ত্বে পরিণত (materialised) করিতে পারেন। জগদ্বিখ্যাত ম্যাডাম্ ব্লাভাট্স্কি এইরূপে অনেক ফুল, আংটি, ঘড়ি, রুমাল, ব্রুচ, প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া অনেককে উপহার দিতেন। হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন যে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডটি বিরাট্ পুরুষের (ব্রহ্মার) ধ্যান-সৃষ্ট বস্তু (thought-form); ইহা শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। তিনি অসীম যোগ-বলে সকল বস্তুরই ধ্যান করিতেছেন; তাই সমস্তই আছে। যেমন তিনি এই ধ্যান হইতে বিরত হইবেন, অমনি সব বিলুপ্ত হইবে, - ক্ষিতিতত্ত্ব অপ্‌তত্ত্বে, অপ্ তেজে, তেজ বায়ুতে, এইরূপে সকল পদার্থই আদিতত্ত্ব বা প্রকৃতিতে পরিণত হইবে।

সে যাক্। এখন স্বর্গবাসীর পক্ষে কিরূপ ঘটে দেখা যাউক। স্বর্গে গিয়া যেমন তিনি আত্মীয়-স্বজনের বিষয় ধ্যান করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহাদের চিন্তা করিতে থাকেন, অমনই তৎক্ষণাৎ সেই মূর্ত্তিগুলি তেজস্তত্ত্বে নির্ম্মিত হয়, অর্থাৎ সেই আত্মীয়গণকে তিনি সম্মুখে দেখিতে পান। পৃথিবীতে ধ্যান-সৃষ্ট বস্তুগুলি আমরা দেখিতে পাই না, কারণ আমাদের সূক্ষ্মদৃষ্টি নাই। কিন্তু স্বর্গবাসীর এ সমস্তই প্রত্যক্ষ হয়। কেবল প্রত্যক্ষ নহে, বাস্তব ও সজীব হয়। প্রিয়তমগণের যে ভাবটি তাঁহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম ও চিত্তাকর্ষক ছিল, তিনি অবশ্য সেই ভাবটিরই ধ্যান করেন। সুতরাং তাঁহাদের পরম রমণীয় ও স্নেহোজ্জ্বল ভাবগুলিই তাঁহার নিকট আবির্ভূত হয়, কুৎসিত ও স্বার্থপর

ভাবগুলি তিলার্দ্ধও প্রকাশ পায় না। অতএব, স্বর্গবাসী তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের নিকৃষ্ট ও কদর্য্য ভাবগুলি না দেখিয়া, কেবল তাঁহাদের উৎকৃষ্ট ও সৌম্যভাবগুলিই দেখিতে পান।

আচ্ছা। একটা মূর্ত্তি বা আধার ত' সৃষ্ট হইল। কিন্তু মূর্ত্তি ত' একটি জড়পদার্থ। ইহাতে প্রাণ, হৃদয়,আত্মা না আসিলে স্বর্গবাসীর কি তৃপ্তি হইতে পারে? তিনি কি একটা জড় মূর্ত্তিকেই সজীব ভাবিয়া প্রতারিত হন? না, ভগবান্ তাঁহাকে এরূপে প্রতারিত করেন না। ঐ মূর্ত্তি প্রকৃতই সজীব হয়, উহাতে প্রকৃতই প্রাণ, হৃদয়, আত্মা আইসে। কিরূপে? দেখা যাক্। প্রেম একটি বড় শক্তিশালী জিনিস; প্রেমের ন্যায় শক্তি বোধ হয় জগতে আর কিছুরই নাই। আমরা যাঁহাকে ভালবাসি, তিনি (যেখানেই থাকুন না কেন) আমাদের দিকে আকৃষ্ট হন, আমাদের প্রেম গিয়া তাঁহার আত্মাকে আকর্ষণ করে। সুতরাং সেই আত্মা তৎক্ষণাৎ আমাদের প্রেমের স্পন্দনে সাড়া দেন, প্রতি-স্পন্দন (response) পাঠান; এবং যদি কোন আধার পান, সেই আধারে আসিয়া অধিষ্টিত হন। সুতরাং সেই আধারটি, সেই মূর্ত্তিটি সজীব হইয়া উঠে; এবং আমরা তখন প্রকৃতই আমাদের প্রিয়তম আরাধ্য বস্তুটিকে সম্মুখে দেখিতে পাই। হিন্দু যে দেবতা পূজা করেন, মূর্ত্তিপূজা করেন, সেই জড় মূর্ত্তিগুলি কোন কোন সময়ে,—যদি ভক্তের ঐকান্তিক প্রেম ও শ্রদ্ধা থাকে,—প্রকৃতই কোন দেবতা দ্বারা অধিষ্ঠিত হয়। তাহা যেন হইল। কিন্তু স্বর্গবাসীর আত্মীয়স্বজনেরা আছেন পৃথিবীতে। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ স্বর্গে আসিয়া ধ্যান-সৃষ্ট মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠান করেন কিরূপে? তবে কি তাঁহারা স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন? অথবা যুগপৎ এক সময়েই, দুই মূর্ত্তিতেই বিরাজ করেন? তাঁহারা স্থূল দেহ ত্যাগ করেন না, যুগপৎ দুই মূর্ত্তিতেই বাস করেন। ইহা শুনিয়া আমাদের অনেকেরই আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে। হইবারই কথা। কারণ, আত্মা কি পদার্থ আমরা জানিনা, আত্মাতে জড়বস্তুর গুণ বা ধর্ম্ম আরোপ করিয়া সেইরূপই বিচার করি। আমরা অনেকেই মনের উপরে উঠিতে পারিনা, মনকেই আত্মা বিবেচনা করি। কিন্তু তাহা নহে। তেজস্তত্ত্ব-নির্ম্মিত একটি কোষ বা দেহ আছে। ঐ দেহে আত্মার একটি রশ্মি বা আলোক-রেখা বা স্ফুলিঙ্গ নিপতিত হইয়া চেতনা, বুদ্ধি,মেধা, যুক্তি, কল্পনাদি যে শক্তিগুলি উৎপাদন করে, তাহাদের সমষ্টিই মন। সুতরাং মন আত্মার একটি বিশেষ বিকাশ (a particular manifestation) মাত্র, একটি আভাস বা প্রতিবিম্ব (a reflection) মাত্র। যেমন একটি আলোক যুগপৎ সহস্র দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে, যেমন একটি চুম্বক যুগপৎ সহস্র লৌহদণ্ডকে শক্তিযুক্ত ও সক্রিয় করিতে পারে, ইহাতে যেমন উক্ত আলোক বা চুম্বকের কিছুমাত্র ক্ষয় বা হানি হয় না, সেইরূপ একই আত্মা যুগপৎ সহস্র আধারে বিরাজ করিতে পারেন, তাহাতে উক্ত আত্মার কিছুমাত্র ক্ষয় হয় না। মনে করুন, আত্মা একটি ঘন-ক্ষেত্র (cube)

এবং মন একটি বর্গক্ষেত্র (square)। আপনি একটি ঘন ক্ষেত্র লইয়া (কাগজে ছাপ মারিয়া) সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, বর্গক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে পারেন। ইহাতে ঘন ক্ষেত্রটি যেমন তেমনই থাকে, কোনও হানি হয় না। অথচ উহা হইতে সহস্র সহস্র বর্গক্ষেত্র সৃষ্ট হইল। আবার, এই বর্গক্ষেত্রগুলি যেমন সমগ্র ঘন-ক্ষেত্রকে প্রকাশ করিতে পারেনা, উহার এক অংশ বা এক দিক মাত্র প্রকাশ করে, সেইরূপ আত্মা যুগপৎ সহস্র মনে অধিষ্ঠিত হইলেও, সমগ্রভাবে, সম্পূর্ণরূপে, প্রকাশ পান না।

অতএব দেখা গেল, স্বর্গবাসীর আত্মীয়-স্বজন (পৃথিবীতেই থাকুন বা ভুবর্লোকেই থাকুন) স্বচ্ছন্দে ধ্যান-সৃষ্ট মূর্ত্তিতেই বিরাজ করিতে পারেন। কেবল দুইটি মূর্ত্তিতে কেন, যুগপৎ সহস্র মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতে পারেন। মহাপুরুষ বা সাধুদিগের আত্মা প্রকৃতই এইরূপ করিতেছেন। মনে করুন, ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। ইহাঁর সহস্র সহস্র ভক্তগণ (কেহবা স্বর্গে,কেহবা মর্ত্ত্যে) অনুক্ষণ ধ্যান করিয়া সূক্ষ্মজগতে ইহাঁর যে এক একটি মূর্ত্তি সৃষ্টি করিতেছেন, ইনি যুগপৎ সকল মূর্ত্তিতেই অধিষ্ঠিত হইয়া, সকলেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছেন। যাঁহাকেই সহস্র সহস্র লোকে ভালবাসেন, ভক্তি করেন, তাঁহাকেই এইরূপ করিতে হয়। এখন, জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "আত্মা যুগপৎ অনেক দেহে বাস করেন, তিনি কি সকল দেহেরই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন? তিনি কি জানিতে পারেন যে, তিনি যুগপৎ দুইটি বা পাঁচটি দেহে বাস করিতেছেন?" আত্মা জানিতে পারেন নিশ্চিতই; কিন্তু মন অনেক সময় জানিতে পারে না। যে সকল মহাপুরুষের মন আত্মার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ যাঁহারা ইচ্ছামত আত্মার ভূমি (plane) হইতে মনের ভূমিতে যাতায়াত করিতে পারেন, তাঁহাদের মনও জানিতে পারে। একই আত্মা কিরূপে অনেক গুলি দেহ হইতে যুগপৎ জ্ঞান সঞ্চয় করেন, ইহার ধারণা করা একটু কঠিন বোধ হইতে পারে। একটা উদাহরণ দিলে বোধ হয় বিষয়টি পরিস্ফুট হইবে। মনে করুন, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ প্রভৃতি অঙ্গগুলি এক একটি দেহ এবং মস্তিষ্ক (বা মন) আত্মা। আমি যখন চেয়ারে বসিয়া হারমোনিয়ম বাজাই, আমার সমস্ত অঙ্গগুলিই যুগপৎ কার্য্য করে এবং মস্তিষ্ক সকল জ্ঞানগুলিই যুগপৎ গ্রহণ করে। হস্তপদাদি দ্বারা স্পর্শ,চক্ষুদ্বারা দর্শন,কর্ণদ্বারা শ্রবণ ইত্যাদি যাবতীয় জ্ঞানই মস্তিষ্ক একসঙ্গে এককালে গ্রহণ করে। এইরূপে, আত্মাও সকল দেহের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যুগপৎ গ্রহণ করেন।

আর একটি কথা এই যে, আত্মীয়-স্বজনের পৃথিবীস্থ দেহগুলি স্থূল দেহ, কিন্তু ধ্যান-সৃষ্ট দেহগুলি সূক্ষ্মদেহ। কোন্ দেহে আত্মা সমধিক প্রকটিত হন,—স্থূল-দেহে না সূক্ষ্ম-দেহে? মনে করুন একটি লণ্ঠনের চারিদিকে কাচ আছে। কিন্তু একদিকের কাচের উপর প্রথমে একটি সাদা কাগজ এবং তাহার উপর একখানি নীল কাগজ বসান হইল। আচ্ছা লণ্ঠনের আলোক কোন্ দিকে অধিক প্রকাশ পাইবে? যে দিকে শুধু কাচ আছে, অথবা

যে দিকে কাগজ বসান হইয়াছে? নিশ্চয়ই যে দিকে সুধু কাচ আছে। এখন, এই সুধু কাচটি সূক্ষ্ম দেহ, কাগজ বসান দিকটি স্থূলদেহ এবং আলোকই আত্মা। অতএব, বুঝা যাইতেছে যে, স্বর্গবাসী তাঁহার আত্মীয়-স্বজনকে স্বর্গে যতটা প্রকৃতরূপে দেখিতে পান, পৃথিবীতে কখনও ততটা পান নাই।

স্বর্গে মানবকে দীর্ঘকাল বাস করিতে হয়। এই দীর্ঘকাল তিনি পরমানন্দে অতিবাহিত করেন, বুঝিলাম। এখন প্রশ্ন এই যে, "ইহাতে তাঁহার কিছু উন্নতি হয় কি?" যথেষ্ট উন্নতি হয়, কেবল তাঁহার নিজের নহে, প্রিয়তমগণেরও হয়। কিরূপে হয়, দেখা যাক। প্রথমে তাঁহার আত্মীয় স্বজনের কথা ধরা যাক। ক্রমোন্নতির নিয়ম এই যে, প্রতি জন্মে আত্মা এক একটি নূতন দেহ গ্রহণ করিয়া সংসারের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এইরূপে শিক্ষা করিতে করিতে যখন তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সকল জ্ঞানই লাভ করেন, যখন চতুর্দ্দশ ভুবনের কোন অবস্থাই তাঁহার অজ্ঞাত থাকে না, তখন তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, যতই অধিক দেহ বা আধার তিনি প্রাপ্ত হন, ততই সত্বর তাঁহার উন্নতি হয়। এ সম্বন্ধে আত্মীয়স্বজনদিগের কত সুবিধা হয় দেখুন। তাঁহারা এককালে দুইটি দেহে বাস করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সুযোগ পান,—পৃথিবীতে স্থূলদেহে এবং স্বর্গে সূক্ষ্মদেহে। যিনি যতই অধিক লোকের প্রিয়, তাঁহার সুযোগ ততই অধিক; কারণ তিনি যুগপৎ সহস্র সহস্র দেহ বা আধার প্রাপ্ত হইতে পারেন। বহুলোকের প্রীতিভাজন বা ভক্তিভাজন হওয়ার ইহাই অন্যতম সুফল। যাঁহারা জগতের হিতসাধন করিয়া সর্ব্বজনপ্রিয় হন, এই কারণেই তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া অচিরে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন।

স্বর্গবাসীর আত্মীয়স্বজনসাক্ষাৎজনিত আনন্দলাভে দুইটী কারণে কিঞ্চিৎ বিঘ্ন হইতে পারে। প্রথম, তিনি যদি প্রিয়তমগণের সব গুণগুলি স্মরণ ও মনন করিতে না পারেন, তাহা হইলে ধ্যান-সৃষ্ট মূর্ত্তিগুলি কিছু অসম্পূর্ণ হয়; সুতরাং তিনি পূর্ণ আনন্দলাভে বঞ্চিত হন। দ্বিতীয়, তিনি যদি কোন অযোগ্যপাত্রকে যোগ্য ভাবিয়া ভক্তি ও প্রীতি অর্পণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ধ্যান-সৃষ্ট মূর্ত্তিতে ঐ অযোগ্য ব্যক্তি কখনও আদর্শানুরূপ, আশানুরূপ যোগ্যতা দেখাইতে পারেন না। এই শেষোক্ত কারণে আমাদের সকলেরই সতর্ক হওয়া উচিত, যেন প্রকৃত যোগ্য পাত্রে আমরা ভক্তি ও প্রীতি অর্পণ করিতে পারি, যেন উপযুক্ত গুরুর পদপ্রান্তে জীবন-মন সমর্পণ করিয়া ধন্য হইতে পারি। পরাবিদ্যা-সমিতির শ্রীগুরুচরণে যাঁহারা আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহাদের আশঙ্কার কোন হেতু নাই; কারণ এই গুরুগণ (Masters) আমাদের উচ্চতম আদর্শের ও অনেক উচ্চে।

সে যাহা হউক, স্বর্গবাসীর এখানে কিরূপে উন্নতি হয়, দেখা যাক। তিন প্রকারে তিনি উন্নতি লাভ করিতে পারেন। প্রথমঃ—"অনুশীলনেই বিকাশ", ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। সুতরাং তিনি স্বর্গে যে গুণ ও শক্তিগুলির দীর্ঘকাল অনুশীলন করেন, সে গুলি খুব বৃদ্ধি-

প্রাপ্ত হয়, বিকাশ লাভ করে। যিনি শত শত বৎসর ধরিয়া কেবল প্রেম বা ভক্তি চাহেন, তাঁহার প্রেম ও ভক্তি খুব বাড়িয়া উঠে; সুতরাং পরজন্মে তিনি প্রেমিক বা ভক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপে, যিনি সুদীর্ঘকাল বিজ্ঞান, সঙ্গীত, দর্শন বা পুরাতত্ত্বাদির আলোচনা করেন তাঁহার তত্তৎ শক্তি বিকশিত হয়। সুতরাং পরজন্মে তিনি সেই সেই বিষয়ে সমুন্নত হইয়া আইসেন। দ্বিতীয়ঃ—তিনি দেবগণের নিকট হইতে প্রত্যক্ষ-ভাবে উপদেশ ও শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। সঙ্গীতজ্ঞগণ কিরূপে গন্ধর্ব্বের সাহায্য পান তাহার উল্লেখ করিয়াছি। অন্যান্য বিষয়েও অন্যান্য দেবতার অনুগ্রহ পাইতে পারেন। তৃতীয়ঃ—তিনি ধ্যান-স্থষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট হইতে অনেক সময় অনেক জ্ঞান লাভ করেন। এই ব্যক্তিগণ যতই উন্নত ও যোগ্যপাত্র হন, তাঁহার সুবিধা ততই অধিক হয়। অতএব পুনরায় আমরা উপযুক্ত গুরুর চরণে আশ্রয় লওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেছি।

আমরা স্বর্গলোক সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলিলাম। স্বর্গলোকের সাতটী বিভাগ বা স্তর আছে, পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহার নিম্ন চারিটী স্তরই (অর্থাৎ ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম) প্রকৃত স্বর্গলোক; কারণ এই চারিলোকে ভোগ শেষ হইলেই মানবের মানস-দেহটি খসিয়া যায়। তখন তিনি সূক্ষ্মতর ও উজ্জ্বলতর দেহে তৃতীয় স্তরে চলিয়া যান। এই দেহটির নাম কারণ-দেহ। এই কারণ-দেহই সাধারণ লোকের জীবাত্মা। এই কারণ-দেহের ধ্বংস বা নাশ হয় না। ইনিই (অথবা ইঁহারই একটি রশ্মি) তেজস্তত্ত্ব ও অপ্-তত্ত্বাদির আবরণ গ্রহণ করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন। সাধারণ মানবের কারণ-দেহ (জীবাত্মা) সম্যক্ বিকাশ-প্রাপ্ত হয় নাই *। সুতরাং তৃতীয় স্তরে উঠিবামাত্র তাঁহারা প্রায় অচেতন বা অর্দ্ধচেতন হইয়া পড়েন। উচ্চ তিনটি স্তর (১ম, ২য়, ৩য়,) জীবাত্মার স্বীয় ভূমি (own plane); সুতরাং এখানকার আনন্দ ও জ্ঞান স্বর্গ অপেক্ষা অনেক অধিক। কিন্তু আমরা অনেকেই, এখনও সে আনন্দ ও জ্ঞানের অধিকারী হই নাই। অল্পে অল্পে আমাদিগের জীবাত্মা বিকাশ-প্রাপ্ত হইতেছে। যে সকল মহাত্মার কারণ-দেহ বেশ সুগঠিত ও পরিস্ফুট হইয়াছে, তাঁহারাই এই অসীম জ্ঞান ও আনন্দ উপভোগ করেন,—কেবল স্বয়ং উপভোগ করেন না, অপরকে দান করেন, জীবের ক্রমোন্নতির জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে বদ্ধপরিকর হন। ইঁহারা জন্মমৃত্যুর শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়াছেন; বাধ্য হইয়া ইঁহাদিগকে জন্মিতে হয় না, কারণ জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে,—ইঁহারা আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়াছেন ইঁহারা জাতিস্মর হইয়াছেন, অর্থাৎ সহস্র সহস্র পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত ইঁহাদের ইচ্ছামাত্র বায়োস্কোপের চিত্রের ন্যায়

* কারণ-দেহের কিরূপে বিকাশ (development) হয়, A. P. Sinnett তাঁহার "Growth of the Soul" নামক পুস্তকে সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। আমরা সকলকে উহা পড়িতে অনুরোধ করি।

ধ্যান-নেত্রে উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। ইঁহারা পরম করুণাময়, পরমজ্ঞানী ও পরম শক্তিশালী। মানবের হিতার্থে, শিক্ষার্থে, ইঁহারা কৃপাপূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। ইঁহারাই কিছুকাল পূর্ব্বে আমাদের ন্যায় জরা-মরণাধীন দুর্ব্বল মানবই ছিলেন, কিন্তু সাধনাবলে আজ এইরূপ উচ্চ হইয়াছেন। উচ্চ হইলেও আমাদিগকে ত্যাগ করেন নাই। মানবই মানবের দুঃখ সম্যক বুঝেন। তাই ইঁহারা সজল-নয়নে দুই হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহাদের পদানুসরণ করিতে আমাদিগকে নিত্য আহ্বান করিতেছেন, আর বলিতেছেন, "ভ্রাতৃগণ! ভীত হইও না। নিরাশ হইও না। ধীরভাবে অগ্রসর হও। সকল মানবই, সকল জীবই, এককালে এখানে আসিবে। ইহাই ভগবানের ইচ্ছা। যতদিন না তোমরা সকলে এখানে আসিবে, ততদিন তোমাদের ছাড়িয়া যাইব না। ইহাই আমাদের পণ, জীবনের ব্রত।"

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী।

কর্ম্ম-সিন্ধু।

অন্তহীন, সীমাহীন কর্ম্ম পারাবার
বক্ষে ভাসে জীর্ণ, ভগ্ন তরণী আমার!
ফেনিল তরঙ্গাঘাত লক্ষ শত শত,
সহিতে হ'তেছে হায়! তরীরে নিয়ত।

জানি না, কখন আমি ভিড়াব তাহারে,
বিরাট, মহান এই কর্ম্ম-সিন্ধু-পারে!
এখনও নাহিক হায়! কূলের আভাস,
পলে পলে নিরুৎসাহ, হ'তেছি হতাস।

—হেরি নাই, দেখা যায় ওই তীর-ভূমি,
মিশিয়াছে বালুতট নীলাম্বর চুমি!
নিয়ে যাই ওই দিকে তরণী আমার,—
কর্ম্ম-সিন্ধু পরপারে এসেছি এবার।

—একি! একি! যত যাই নাহি পাই কূল,—
তটরেখা মরীচিকা, শুধু ভ্রান্তি, ভুল!

শ্রীশৈলেশ্বর সেন।

শিব ও শক্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

প্রায় সকল দেবতারই পিতামাতা ও কুলশীল আছে; কিন্তু শিবের এ সকল কিছুই নাই। কবি বলিয়াছেন,—

বপুর্বিরূপাক্ষমলক্ষ্য জন্মতা দিগম্বরত্বেন নিবেদিতং বসু।
বরেষু যদ্বালমৃগাক্ষি মৃগ্যতে তদস্তি কিং ব্যস্তমপি ত্রিলোচনে॥

কিন্তু যিনি অজ, যাঁহার জন্ম নাই এবং যিনি বিশ্বের পিতামাতা, তাঁহার আবার পিতামাতা কে হইবে? কুলশীলই বা কি হইবে? ফলে তিনি সকলের আদি, কিন্তু তাঁহার আদি নাই; এই সত্যটী বুঝাইবার জন্য বলা হয় যে, তাঁহার পিতামাতা বা কুলশীল নাই। কবি গাহিয়াছেন,—

"জগদ্‌যোনিরযোনিস্ত্বং," ইত্যাদি।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে বিষ্ণুপ্রমুখ দেবতাদিগের পূজা, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কাহারও করিবার অধিকার নাই; কিন্তু শিবের পূজা স্ত্রী, শূদ্র প্রভৃতি সকলেই করিতে পারে। আপাততঃ এরূপ বিধানের তাৎপর্য্য বুঝা কঠিন। কিন্তু শিব এবং বিষ্ণু প্রমুখ দেবতাতে প্রভেদ কি, তাহা বুঝিলেই এই প্রভেদের কারণ স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। শিব প্রলয়ের ও মোক্ষের অধিষ্ঠাতৃদেবতা—কেবল অধিষ্ঠাতৃদেবতাই বা কেন বলি, তিনিই স্বয়ং মোক্ষস্বরূপ। প্রলয়ের অবস্থায়, মোক্ষের অবস্থায়, এই জগৎ প্রপঞ্চের (differentiated Universe এর) অস্তিত্ব নাই:—

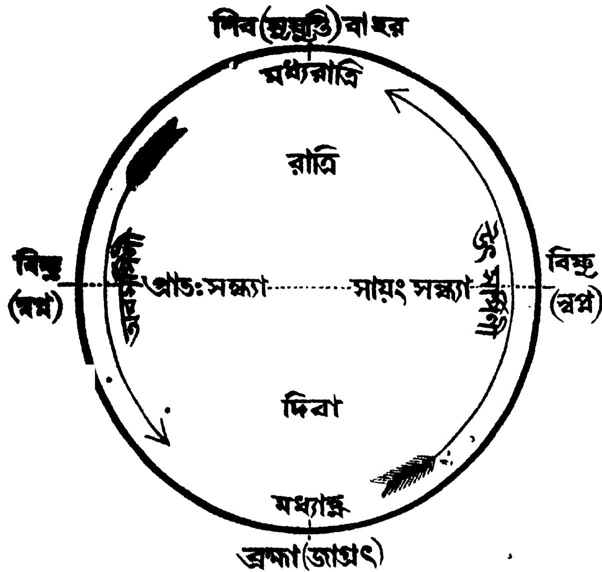
"প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং" ইত্যাদি—মাণ্ডুক্যশ্রুতি।

সুতরাং ঐ অবস্থায় যখন কিছুই নাই, তখন স্ত্রী-পুরুষ, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, বৈশ্য-শূদ্র প্রভৃতি কোন ভেদও থাকিতে পারে না। এই জন্য শিবপূজাতে উপাসক সম্বন্ধে বর্ণ ভেদ প্রভৃতি কোন প্রকার ভেদই স্বীকার করা হয় না। কিন্তু বিষ্ণু বিশ্বের স্থিতি বা পালনের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা এবং ভেদ লইয়া, ভেদ হইতেই, বিশ্ব; ভেদ না থাকিলে এই ভেদ-ভিন্ন বিশ্ব থাকে না; এমন কি ভেদ না থাকিলে স্বয়ং বিষ্ণুও থাকেন না; কারণ বিষ্ণু হইতে আরম্ভ করিয়াই ভেদের প্রথম প্রবর্তন, যে হেতু বিষ্ণু ত্রিমূর্ত্তির দ্বিতীয় মূর্ত্তি। বিষ্ণুর পূর্ব্বে "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" সুতরাং বিষ্ণুপূজায় ভেদ স্ত্রী পুরুষ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অধিকারী-ভেদ, অবশ্য স্বীকার্য্য। বিজ্ঞানমূলক হিন্দু ধর্ম্মে অসঙ্গত ও অযৌক্তিক কিছু নাই। তবে যাহা কিছু অসঙ্গত বা অযৌক্তিক লক্ষিত হয়, বুঝিতে হইবে যে, তাহা সম্ভবতঃ আরোপিত বা প্রক্ষিপ্ত।

শিব ত্রিপুরারি, ত্রিলোচন ও ত্রিশূলধারী এবং ত্রিপত্র (বিল্বদল)-প্রিয়। এতদ্দ্বারা এই দেবতাতে তিন সংখ্যার একটু আধিক্য স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। আর কোন দেবতাতেই এই বিশেষ লক্ষণটি দৃষ্ট হয় না। অতএব ইহার রহস্য জানিবার জন্য পাঠকের স্বতঃই কৌতূহল হইতে পারে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শিবশব্দ নির্গুণ ব্রহ্ম এবং সগুণ ব্রহ্ম এই উভয় অর্থেই প্রয়োগ করা হইয়া থাকে; এবং নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম স্বরূপতঃ একই; সুতরাং স্বরূপতঃ শিবও এক। কিন্তু যদিও শিব স্বরূপতঃ এক, তথাপি তাঁহার আর দুইটী বিভাব (aspects)[১] আছে, যথা, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা। তন্মধ্যে শিব বা হর কারণ-রূপী ও সুষুপ্তি অবস্থাগত, (sushuptic consciousness),[১] বিষ্ণু সূক্ষ্মরূপী ও স্বপ্নাবস্থা-গত (swapnic consciousness) এবং ব্রহ্মা স্থূলরূপী ও জাগ্রদবস্থা-গত (waking consciousness) যথা,

"জাগরিতে ব্রহ্মা, স্বপ্নে বিষ্ণুঃ, সুষুপ্তে রুদ্রঃ, তুরীয়ে পরমাক্ষরম্॥" ব্রহ্মোপনিষৎ, ১৭ এবং জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই অবস্থাদ্বয়ের উৎপত্তি ও লয়স্থান সুষুপ্তি অবস্থা। অতএব বুঝিতে হইবে যে, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা—ত্রিমূর্ত্তির এই দুই মূর্ত্তি শিব হইতে উৎপন্ন এবং শিবেতেই লয় প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ উৎপত্তিকালে শিব হইতে বিষ্ণু এবং বিষ্ণু হইতে ব্রহ্মা প্রকাশ হন এবং প্রলয় কালে বিলোম ক্রমে ব্রহ্মা বিষ্ণুতে এবং বিষ্ণু হরে লীন হন। লোকেরও ইহা নিত্যই প্রত্যক্ষীভূত হয়; যথা,—দৈনিক প্রলয়রূপী মধ্যরাত্রিতে আমাদের সুষুপ্তি (গাঢ়নিদ্রা) অবস্থা হয়; তাহা হইতে, শেষরাত্রিতে আমাদের স্বপ্নাবস্থার উৎপত্তি হয় এবং প্রাতঃকালে তাহা হইতে আমাদের জাগ্রদবস্থা হয়। আবার রাত্রি আসিলে প্রথমে আমাদের জাগ্রদবস্থা স্বপ্নাবস্থায় লীন হয় এবং পরে সেই স্বপ্নাবস্থা সুষুপ্তিতে লয় প্রাপ্ত হয়। নিম্নে প্রদর্শিত প্রতিকৃতির সাহায্যে বোধ হয় বিষয়টি আরও বিশদ হইতে পারে।



এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, শিব ত্রিমূর্ত্তির সমষ্টি অর্থাৎ এক মাত্র শিবে

ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং হর এই তিনই বীজভাবে বিদ্যমান, যদিও আমাদের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, এই তিনজন, বাস্তবপক্ষে তিনজন নহেন, একজন ;—

জ্যোতিঃ শান্তমনন্তমজমদ্বয়ংতত্তদ্গুণোন্মীলনাৎ।
ব্রহ্মেত্যচ্যুত ইত্যুমাপতি রিতি প্রভূয়তে হ্যনেকধা ॥

অর্থাৎ, যিনি অজ, অদ্বয়, অনন্ত, শান্ত, জ্যোতিঃ স্বরূপ, তাঁহাতে রজোগুণের বিকাশ হইলে তাঁহাকে ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণের বিকাশে বিষ্ণু এবং তমোগুণের বিকাশে হর * বলা হয়। ফলে তিন সংখ্যার আধিক্য দ্বারা এই সত্যটি সূচিত হইয়াছে।

পাঠকের স্মরণ হইতে পারে যে, খৃষ্টানেরা তাঁহাদের ত্রিমূর্ত্তি † সম্বন্ধেও বলিয়া থাকেন, "The One in three and the three in One" লেখকের যতদূর স্মরণ আছে, তাহাতে তাঁহারা এই ব্যাপারের কোন বিশদ ব্যাখ্যা দেন না ; পরন্তু ইহা মানুষের অবিজ্ঞেয় একটি দৈব রহস্য (divine mystery) বলিয়া নিরস্ত থাকেন। কিন্তু ইহার ব্যাখ্যাও যে পূর্ব্বোক্ত প্রকার হইবে, তাহাতে সংশয় নাই।

হিন্দুধর্ম্মের যথাযথ মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিলে, প্রায় অপর সমস্ত ধর্ম্মই সহজে বুঝিতে পারা যায়। তাহার কারণ এই যে, এই ক্ষণ পৃথিবীতে যে সমস্ত ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা সত্যবহুল, বিজ্ঞান-সম্মত ও পূর্ণ অর্থাৎ সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সংস্কৃত ব্যাকরণের সহিত প্রথম পরিচয় হইলে তাঁহারা ইহার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং পরে সেই ভিত্তি অবলম্বন করিয়া Comparative Grammar এবং তাহা হইতে Science of Language বা ভাষা-বিজ্ঞানের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সেইরূপ হিন্দুধর্ম্মের সহিত তাঁহাদের পরিচয়ের ফলে Comparative Religion এর উৎপত্তি হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা এখনও Science of Religion বা ধর্ম্মবিজ্ঞান আখ্যা পাইবার যোগ্য হয় নাই। হিন্দুধর্ম্মের অসারতা ইহার কারণ নহে। যে সমস্ত পণ্ডিত হিন্দুধর্ম্ম অধ্যয়নে নিযুক্ত হন, তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি নাস্তিক অথবা সংশয়বাদী ছিলেন ; সুতরাং তাঁহারা কোন ধর্ম্মই সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না। অতএব ইঁহারা যে হিন্দুধর্ম্মের সারবত্তা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন তাহা সম্ভবপর নহে। অপর পণ্ডিত গুলি গোঁড়া খৃষ্টান। কেবল খৃষ্টান ধর্ম্মই সত্য, অপর সমস্ত ধর্ম্মই মিথ্যা, পূর্ব্ব হইতে এই রূপ কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া, ইঁহারা হিন্দুধর্ম্মের দোষানুসন্ধানের উদ্দেশে হিন্দুধর্ম্ম অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। সুতরাং এতাদৃশ ব্যক্তিগণও যে হিন্দুধর্ম্মের সারভাগ দেখিতে পাইবেন না, তাহা নিশ্চিত।

অধিকন্তু স্থূল, লৌকিক বিষয় সমস্ত বুঝা যেমন সহজ, সূক্ষ্ম, অলৌকিক ধর্ম্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা তত সহজ নহে। ফলে হিন্দুধর্ম্মের মৌলিক তত্ত্বগুলি এতই সারবান্ যে,

* শিবের প্রলয়কারী বিভাবের দুইটী বিশেষ নাম হর ও রুদ্র।
† The Father, the Son and the Holy Ghost.

পক্ষপাতিতা ও অজ্ঞতা উভয়ে মিলিত না হইলে হিন্দুধর্ম্মের সহিত পাশ্চাত্য সুধীগণের পরিচয়ের ফলে আমরা নিশ্চয়ই এতদিনে ধর্ম্মবিজ্ঞান (Science of Religion) পাইতাম। কিন্তু আমার প্রিয় হিন্দু-সন্তানের নিকট এ হেন হিন্দুধর্ম্মেরও আদর নাই। সুশিক্ষা ও স্বাধীন চিন্তার অভাবই এই শোচনীয় অবস্থার কারণ। সার চিনিতে হইলে নিজে সারবান হওয়া আবশ্যক। যাহা হউক, এখন প্রকৃত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

শিবের একটি নাম বৈদ্যনাথ। শিব অর্থাৎ ঈশ্বর যে ভব-রোগের—সংসার-বাসনার একমাত্র বৈদ্য, তাহাতে সংশয় নাই। আমরা রোগগ্রস্ত হইলে যে সমস্ত মানুষ-বৈদ্যের চিকিৎসাধীন হই, তাঁহারা সময় সময় শারীরিক রোগ মাত্র নিবারণ করিতে পারেন, পরমায়ু দিতে পারেন না। কিন্তু শিব আমাদের সর্ব্বপ্রকার দোষ বা ব্যাধি নষ্ট করিয়া আমাদিগকে মুক্তি—অনির্ব্বাচনীয় আনন্দের অনন্ত জীবন প্রদান করেন। অতএব এমন বৈদ্য আর নাই, সুতরাং তিনি "বৈদ্যনাথ"।

তমেব জ্ঞাত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।—শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি।

"কেবল তাঁহাকে (ব্রহ্মকে, শিবকে) জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারা যায়, অয়নের (মুক্তির) নিমিত্ত অন্য উপায় নাই।

অধিকন্তু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, শিবই আয়ুর্ব্বেদের প্রথম প্রণেতা। বাস্তব পক্ষে আয়ুর্ব্বেদের ভিত্তি-স্বরূপ যে জ্ঞান, তাহা সেই সর্ব্ব-ভূতাশয়স্থিত সর্ব্বজ্ঞানাধার ব্যতীত অপর কোথা হইতে আসিবে? বিশেষতঃ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র যে প্রধানতঃ যোগীদিগের দ্বারা উদ্ভাবিত, তাহা যাঁহারা মনোযোগ-সহকারে ঐ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন এবং শিব সেই যোগীদিগের ঈশ্বর। এদিকে দেবগৃহ (দেওঘর) নামক স্থানে যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহার 'বৈদ্যনাথ' নামটীর যে বিশেষ সার্থকতা আছে, তাহা রোগজীর্ণ বাঙ্গালি বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছে।

শিবের আর একটি নাম বিশ্বেশ্বর। কাশীধামে যে শিবলিঙ্গ আছেন, এই নামটী বিশেষ করিয়া তাঁহাকে দেওয়া হয়। কিন্তু তীর্থরহস্য সম্বন্ধে এস্থলে অধিক বলিবার স্থান নাই। সময়ান্তরে তাহা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

বঙ্গদেশে শিব সম্বন্ধে চৈত্রমাসে একটি উৎসব বা ব্রত অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে "গাজন" বলে। ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে এই প্রথা দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ হয় বাঙ্গালি মাত্রেই এই উৎসব সন্দর্শন করিয়াছেন; অতএব এস্থলে ইহা বিশেষরূপে বর্ণন করিবার প্রয়োজন নাই। এই উৎসবের বিষয় চিন্তা করিলে শিব সম্বন্ধে অনেক বিষয় বুঝিতে পারা যায় এবং আমাদের ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রধান প্রধান উৎসবগুলি কি সুন্দর ভাবে ব্রহ্মবিদ্যারূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে বিস্ময়ে ও আনন্দে মগ্ন হইতে হয়।

যাঁহারা এই ব্রত পালন করেন, কিংবা এই উৎসবে যোগদান করেন, তাহাদিগকে "সন্ন্যাসী" বলে। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন ব্যক্তি কোন উৎকট রোগে আক্রান্ত হইলে, কিংবা কোন বিপদে পতিত হইলে "মানসিক" করে যে, "আমি মুক্ত হইলে অমুক শিবের 'সন্ন্যাস' করিব।" পরে চৈত্র মাস আসিলে, তাহারা সেই সেই শিবের "সন্ন্যাস" গ্রহণ করে। ঐ সময় উহাদের কার্য্যকলাপ দেখিলে "ছেলে খেলার" মত দেখায় বটে, কিন্তু যাঁহারা শিবতত্ত্ব একটুও বুঝেন তাঁহারা চিন্তা করিলে সহজেই ইহার অন্তর্নিহিত গুঢ় সত্যটি দেখিতে পাইবেন। ইহাতে যেমন নির্ব্বোধ লোকের শিখিবার অনেক জিনিস আছে, তেমন বুদ্ধিমানেরও জানিবার অনেক বিষয় আছে।

এই উৎসবে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণকে যোগদান করিতে বড় দেখা যায় না। ইহার প্রথম কারণ এই যে, এই ব্রতে বিলক্ষণ কঠোরতা আছে এবং বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ উত্তরোত্তর অধিকতর বিলাসপ্রিয় হইতেছেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, কেবল ধনীরা 'বাবু' ছিলেন, এখন আমরা সকলেই "বাবু" হইয়াছি। বলা বাহুল্য যে, "বাবুরা" শারীরিক বা মানসিক সকল প্রকার শ্রমে অসমর্থ। দ্বিতীয়তঃ এই ব্রত কাহারও কাহারও চক্ষে "ছেলে খেলার" মত দেখায়। "ছেলে খেলা" ত বটেই। এ সংসারটাই যে "ছেলে খেলা", কিন্তু যাহারা "ছেলে মানুষ", "ছেলে খেলা"ই তাহাদের শিক্ষার একমাত্র উপায়। তৃতীয়তঃ ইহাতে বর্ণভেদের অভিমান পরিহার করিতে হয় এবং আরও দুই একটি এরূপ অনুষ্ঠান আছে, যাহা সাধারণ গৃহীর পক্ষে অসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

এই ব্রত চৈত্র মাসে অনুষ্ঠিত হয়। চৈত্রমাস বৎসরের শেষ মাস এবং বৎসরটি কালচক্রের এমন একটি আবর্ত্ত (cycle), যাহা সাধারণ মনুষ্যের বোধগম্য ও দৃষ্টিগোচর হয়। যুগ, মহাযুগ, মন্বন্তর, কল্প প্রভৃতি বৃহত্তর আবর্ত্তগুলি (cycles) সঙ্কীর্ণদৃষ্টি, সাধারণ মনুষ্যের দৃষ্টির বহির্ভূত। অতএব মনে কর, এই ক্ষুদ্র আবর্ত্তরূপী বৎসরই যেন সেই বৃহত্তর আবর্ত্ত—ব্রহ্মার কল্প। মনে কর, সেই কল্পশেষে যেমন সমষ্টি প্রলয় হয় এবং ব্যষ্টি মোক্ষ হয়, এই বর্ষরূপী কল্পশেষেও যেন সেইরূপ প্রলয় ও মোক্ষ হয়।* পূর্ব্বে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, শিবই বিশেষ করিয়া প্রলয় ও মোক্ষের কর্ত্তা—দেবতা—প্রভু। এমন কি সে সময় শিবই একমাত্র দেবতা বিদ্যমান থাকেন, কারণ তখন ব্রহ্মার প্রলয় হইয়াছে বিষ্ণুতে এবং বিষ্ণুর লয় হইতেছে শিবে। সুতরাং তখন শিবই জীবের একমাত্র আরাধ্য দেবতা ও গতি। এই জন্য বৎসরের শেষ মাস চৈত্রমাসে শিবের গাজন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এই ব্রত যাহারা পালন করে, তাহাদিগকে "সন্ন্যাসী" বলা হয়। সন্ন্যাসী অর্থে চতুর্থাশ্রমী, ভিক্ষু, সংসার-বাসনা ত্যাগী এবং "শিব"-শব্দ মোক্ষের নামান্তর মাত্র। অতএব যাঁহারা শিবের উপাসক হইবেন, অর্থাৎ মোক্ষকামী হইবেন, তাঁহাদের

* বাস্তবপক্ষে আংশিক প্রলয় হয়।

পক্ষে সংসার-বাসনা পরিহার করা, সর্ব্বত্যাগী অর্থাৎ সন্ন্যাসী হওয়া, নিতান্ত আবশ্যক। পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে,—

> "যদা সর্ব্বে প্রমূচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ।
> অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥
> যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
> অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনম্॥"—কঠ-শ্রুতি।

অর্থাৎ "যে সমস্ত বাসনা মর্ত্ত্যজীবের হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া আছে, সেই সমুদায় যখন বিনষ্ট হয়, তখন মর্ত্ত্য অমর হন এবং ইহলোকেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

যখন ইহলোকে হৃদয়ের গ্রন্থিসমূহ ছিন্ন হয়, তখন মর্ত্ত্য অমর হন, এইমাত্র বেদান্ত সকলের উপদেশ।"

পক্ষান্তরে কল্পশেষে (অর্থাৎ বর্ষশেষে) প্রলয়কাল উপস্থিত হওয়াতে স্বতঃই সংসারের, বিশ্বের লয় হইতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, "সন্ন্যাসী" অভিধানটি যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। কিন্তু ইহারা কেবল নামেই "সন্ন্যাসী" নহে, সন্ন্যাসীর অন্ততঃ কতকটা বাহ্যিক আচরণও করিতে হয়। অর্থাৎ প্রথম কয়েকদিন শুদ্ধাচারে থাকিয়া স্ত্রী, তৈল, আমিষ প্রভৃতি পরিহার পূর্ব্বক হবিষ্যাশী হইতে হয়; পরে ফলমূলাশী হইতে হয়। তাহার পর ফলমূল এমন কি জল পর্য্যন্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক বায়ু মাত্র সেবন করিয়া থাকিতে হয়। অতঃপর শিবের আরাধনা। সংযম ও যোগাভ্যাসের ফলে যেন প্রকৃত সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় ইহাদেরও সিদ্ধিলাভ হইয়াছে, এইরূপ ভাবে তাহারা সাধারণের সমক্ষে নানাপ্রকার কার্য্য দেখায়। তন্মধ্যে শরীরের নানাস্থানের মাংস ভেদ করিয়া লৌহশলাকা প্রবেশ করান (বাণ ফোঁড়া), কুল, বাবলা প্রভৃতি কাঁটাগাছের ডাল সকল ভূমির উপর ঘন করিয়া বিছাইয়া উচ্চ মঞ্চ হইতে তদুপরি লম্ফপ্রদান প্রভৃতি, যোগবলের পরিচায়ক; ঊর্দ্ধে পদদ্বয় বন্ধন করিয়া অধোমুখ হইয়া অগ্নিকুণ্ডের উপর ঝুলাও কঠোর তপস্যার পরিচায়ক; এবং শ্মশান হইতে কতকগুলি অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড আহরণ করিয়া, তাহাতে অগ্নিসংযোগ পূর্ব্বক ১ ফুট, ১॥০ ফুট গভীর ও ৮।১০ বর্গফুট পরিসরবিশিষ্ট জলন্ত অঙ্গারপূর্ণ একটি অগ্নিক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া ঊর্দ্ধ হইতে লম্ফ প্রদান দ্বারা সূচিত হয় যে, যোগীর যেন অগ্নিস্তম্ভনের শক্তি হইয়াছে এবং শ্মশানস্থ দগ্ধাবশিষ্ট কাষ্ঠাহরণ হইতে বুঝা যায় যে, প্রথমতঃ সন্ন্যাসী যেন গৃহীর পালনীয় বিধি-নিষেধ অতিক্রম করিয়াছেন এবং দ্বিতীয়তঃ যেন যোগাগ্নিদগ্ধকলেবর সন্ন্যাসী নিজদেহকে চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়া বিদেহমুক্তি (শিবত্ব) লাভ করিতেছেন।

গাজনের শেষে চৈত্র-সংক্রান্তির দিন চড়ক হয়। "চরকা" "চরকী" প্রভৃতির ন্যায় চড়ক শব্দটিও যে চক্রশব্দের অপভ্রংশ এবং "মূল সন্ন্যাসী" শূন্যে চক্রাকারে ঘূর্ণিত হয় বলিয়াই যে এই পর্ব্বের 'চড়ক' বা 'চক্র' নাম হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই। "মূল সন্ন্যাসী" অথবা যে কোন সন্ন্যাসী এই উৎসবে শূন্যে কেন ঘূর্ণিত হয়, তাহার তথ্য জানিবার জন্য স্বতাই কৌতূহল হইতে পারে।

কাল দুই প্রকার। একের নাম 'মহাকাল','অনন্ত' (Eternity,Infinite duration); অপরের নাম খণ্ডকাল। মহাকাল সম্বন্ধে বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় নাই; অতএব জগৎ-প্রপঞ্চও নাই; 'প্রপঞ্চোপশম',সুতরাং দেশ নাই,(খণ্ড) কাল নাই; ফলে যাহা কিছু আন্তবান্, যাহা কিছু আপেক্ষিক (relative) তাহা নাই। অথচ আবার এই মহাকাল সম্বন্ধে সকলই কেবল আছে নহে—যুগপৎ আছে। বৌদ্ধরা ইঁহার "কিছু নাই" বিভাবটী লক্ষ্য করিয়া ইহাকে "মহাশূন্য" বলিলেন, আর হিন্দুরা ইহার "সকলই আছে" বিভাবটী লক্ষ্য করিয়া ইহাকে "ব্রহ্ম" বলিলেন। না বুঝিয়া বৌদ্ধকে শূন্যবাদী নাস্তিক বলিয়া গালি দেওয়া পক্ষপাতের লক্ষণ; কারণ যাহারা নির্ব্বাণ স্বীকার করে, তাহারা নাস্তিক হইতে পারে না। উভয়ত্রই সত্য আছে, কিন্তু আংশিকভাবে। এই দুইটী আংশিক সত্যকে একত্র করিলে যাহা হয়, তাহা সাধারণ মনুষ্যের জ্ঞানের অগম্য—বাক্যের অগোচর। সুতরাং শূন্যবাদী বৌদ্ধ ও ব্রহ্মবাদী হিন্দু, এতদুভয়ের কাহারও দোষ নাই; কারণ তাঁহারা যে পূর্ণ সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা পান নাই। এইজন্য প্রকারান্তরে বলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে,—

"ন সন্নচাসচ্ছিব এব কেবলঃ"।—শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি।

পুরাণে এই নাম-রূপ-বিহীন মহাকালকে কিয়ৎ পরিমাণে সাধারণের বোধগম্য করিবার অভিপ্রায়ে, স্থূলভাবে সর্পাকারে আকারিত করিয়া ইহার 'অনন্ত' 'শেষনাগ' প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, বিষ্ণু প্রলয় কালে 'অনন্ত' শয্যায় শয়ান হন, অর্থাৎ কালিক সৃষ্টি কালাপরিচ্ছিন্ন অনন্ত ব্রহ্মে—খণ্ডকাল মহাকালে—লীন হন।

এই মহাকালের হ্রাস বৃদ্ধি নাই, ক্ষয় লয় নাই; ইহা শাশ্বত, অব্যয়। কিন্তু ইহাকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্টির সঙ্গে অসংখ্য খণ্ডকালের উৎপত্তি হইয়াছে। সৃষ্টির ন্যায় এই খণ্ড-কালগুলিও মায়িক এবং আদ্যন্তবান, যথা, দিবা, রাত্রি, মাস, বৎসর, যুগ, মহাযুগ, মন্বন্তর, কল্প প্রভৃতি। পুরাণে মহাকালের যেমন সর্পাকার কল্পিত হইয়াছে, অনন্তব্রতের তাগা দ্বারাও অনন্তের বা অনন্তকালের সেই সর্পাকার, বলয়াকার বা চক্রাবর্ত্তের আকার সূচিত হয়। খণ্ডকালগুলি সম্বন্ধেও চক্রাবর্ত্তের উক্ত প্রকার আকার (Cycle) কল্পিত হয় এবং জীব এই আবর্ত্তাকৃতি পথে (cyclic path) তাহার ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। অতএব বর্ষশেষে চড়ক বা চক্র ঘূর্ণিত হওয়াতে তদ্দ্বারা সূচিত হয় যে, বর্ষরূপী কালচক্র একবার ঘুরিয়া গেল, জগৎ উন্নতির দিকে—প্রলয়ের দিকেও বটে—একপদ অগ্রসর হইল; জীব উন্নতির দিকে—মৃত্যুর দিকেও বটে—একপদ অগ্রসর হইল। এবং মূল সন্ন্যাসী শূন্যে ঘূর্ণিত হওয়াতে বুঝাইল যে, তিনি সাধন-বলে খণ্ডকাল সমূহের ক্ষুদ্র আবর্ত্তগুলি অতিক্রম করিয়া ক্রমে 'মহাকালে' ও 'মহাশূন্যে' মিশিতে চলিলেন—অর্থাৎ নির্ব্বাণ মুক্তির দিকে অগ্রসর হইলেন। ক্রমশঃ।

শ্রীহরিকিরণ রায়।

ভারতীয় ভূমাবাদ।

(৩)

শক্তি-প্রস্রবণ।

জগতের যে দিকেই আমরা নেত্রপাত করি না কেন, সেখানেই শক্তির উৎস উৎসারিত দেখিতে পাই। আকাশে মহাজ্যোতিষ্কমণ্ডল মহাবেগে ঘূর্ণ্যমান হইতেছে; চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা কেহই স্থির নহে—অনন্তকাল প্রচণ্ড গতিতে ছুটিতেছে। নীচে অনন্ত সাগর, ঊর্ম্মি উত্থিত করিয়া অনন্ত কাল হইতে পৃথিবীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। জীব, জন্তু, কীট, পতঙ্গ, লতা, পাদপ—কেহ স্থির নহে, সকলেই চঞ্চল, গতিশীল। এই বিবিধ বিচিত্র বিশাল শক্তির প্রস্রবণ কোথায়? কোথা হইতে এই শক্তি প্রসৃত হইয়া বিশ্বময় ক্রীড়া করিতেছে?

প্রথম দৃষ্টিতে শক্তির বিবিধ বৈচিত্র্যে আমরা উদ্‌ভ্রান্ত হই; মনে করি যে, শক্তির অনন্ত ভেদ। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে বিশ্বময় শক্তিপুঞ্জের বিশ্লেষণ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, ভৌতিক শক্তির যতই বৈচিত্র্য থাকুক না কেন, তাহারা ছয়টি মাত্র বিধার অন্তর্গত—গতি, উত্তাপ, আলোক, তাড়িত, চৌম্বুক এবং রসায়ন শক্তি। বিজ্ঞানের ভাষায় এই শক্তি-ষট্‌কের নাম—Motion, Heat, Light, Electricity, Magnetism, এবং Chemism। বিশ্বের যেখানে যেভাবে যত প্রকার ভৌতিক শক্তি (Force, Energy বা Power) থাকুক না কেন, তাহা এই ছয় বিধার কোনটীর অন্তর্গত হইবেই হইবে। ইহা ছাড়া বিশ্বে আর দুইটী শক্তি আছে। তাহারা ভৌতিক শক্তি (Physical force) হইতে বিভিন্ন। ইহারা জীবন-শক্তি বা প্রাণ (Vital force) এবং ক্ষেত্রজ্ঞ-শক্তি বা জীব (Psychic force)। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বিশ্বের শক্তিপুঞ্জের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিশ্লেষণ করিলে শক্তির এই অষ্টভেদ।

বহুদিন পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক শক্তিরাজ্যে বিভ্রান্ত হইয়া বিচরণ করিতেন; কারণ তাঁহার ধারণা ছিল যে, এই অষ্টবিধ শক্তি পরস্পর বিভিন্ন, মৌলিক স্বতন্ত্র বস্তু। ইহারা যে এক মহাশক্তিরই ভাবান্তর, এ তত্ত্ব তাঁহার পরিজ্ঞাত ছিল না। পরে সার উইলিয়ম গ্রোভ নানাবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করেন যে, উক্ত ষড়্‌বিধ ভৌতিক শক্তিকে পরস্পর রূপান্তরিত করা যায়—অর্থাৎ তাড়িত হইতে তাপ, আলোক, চৌম্বুক শক্তি উৎপন্ন করা যায়; আবার তাপ, আলোক প্রভৃতিকে তাড়িতে রূপান্তরিত করা যায়। এই প্রক্রিয়ার তিনি নামকরণ করেন—শক্তির সমাবর্ত্তন (correlation of physical forces)। * হেলমহোট্‌স্ (Helmhots) এবং মায়র (Myer) এই তত্ত্ব আরও

* The principle that anyone of the various forms of physical force may be converted into one or more of the other forms.

বিশদ করেন। পরিশেষে প্রসিদ্ধ দার্শনিক হারবার্ট স্পেন্‌সার এই তত্ত্বের সম্প্রসারণ করিয়া প্রতিপন্ন করেন যে, শুধু ভৌতিক শক্তি নহে—জীবন শক্তি এবং স্নেহাত্ম শক্তিও—উক্ত সমাবর্ত্তন বিধির অন্তর্ভুক্ত। সকল জাতীয় শক্তিই অন্যজাতীয় শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে। শক্তির বস্তুতঃ হ্রাসবৃদ্ধি নাই, উৎপত্তি-বিনাশ নাই, অপচয়-উপচয় নাই; আছে শুধু আবির্ভাব ও তিরোভাব; আছে শুধু ভাবান্তর, রূপান্তর, বিধান্তর। বিজ্ঞানের ভাষায় এই তত্ত্বকে (Conservation of Energy) বলে। হারবার্ট স্পেন্‌সার বলেন যে, কোন এক অজ্ঞেয়, অমেয়, অচিন্ত্য 'পাওয়ার' (power) রহিয়াছে, যাহা রূপান্তরিত হয়, ভাবান্তরিত হয়; কিন্তু কখনও বিনষ্ট বা হ্রস্ব হয় না।

অর্থাৎ যেমন নিখিল রাগ-রাগিণী সপ্তস্বরের প্রসার মাত্র, যেমন অনন্ত পদবাক্য পঞ্চাশৎ বর্ণের সমন্বয় মাত্র, সেইরূপ বিশ্বের সমস্ত শক্তিপুঞ্জ বিবিধ বৈচিত্র্যময় হইলেও প্রথমতঃ ঐ অষ্ট মৌলিক শক্তির অন্তর্ভূত, আবার ঐ অষ্ট মৌলিক শক্তিও এক মহাশক্তিরই রূপান্তর বা ভাবান্তর।

এই মহাশক্তি জড় নহে,—চিন্ময়। জগৎ অন্ধ জড়শক্তির খেলা নহে, ইহা চিন্ময়ের লীলা-বিলাস। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা এখন এ তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছেন। সেইজন্য তাঁহারা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, জড়জগতে আমরা যে শক্তির ক্রীড়া দেখিতে পাই, তাহা চেতন শক্তিরই ভাবান্তর। সেই জন্য তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এ শক্তিকে এখন আর force না বলিয়া power বলিতে চান। *

বাস্তবিক বিশ্বময় সেই এক অদ্বিতীয় মহাশক্তিরই উৎস উৎসারিত হইতেছে—জড়ে জীবে, স্থাবরে জঙ্গমে, সর্ব্বত্রই সেই শক্তি-প্রস্রবণ অজস্র ধারায় প্রসৃত হইতেছে। সে মহাশক্তি কি? তিনি আমাদের চিরপরিচিত ভূমা—তিনি ভারত-ঋষির সাধন-সম্পদ্ ব্রহ্ম। সেইজন্য তাঁহার নাম ঈশান, সর্ব্বেশ্বর, মহেশ্বর।

তম্ ঈশানং বরদং দেবমীড্যম্।—শ্বেত, ৩৪।১১

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যামী—মাণ্ডূক্য ৬

'ইনি সকলের ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ অন্তর্যামী।' সমস্ত লোক তাঁহার বশে।

বশী সর্ব্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ।—শ্বেত, ৩।১৮

'স্থাবর জঙ্গম সমস্ত লোক তাঁহার বশে।'

য ঈশেঽস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ। শ্বেত, ৪।১৩

* The power which manifests itself in consciousness is but a differently conditioned form of the power which manifests itself beyond consciousness.—Herbert Spencer's Ecclesiastical Institutions. p. 838.

The power which manifests throughout the Universe distinguished as material is the same power which in ourselves wells up under the form of consciousness.—Ibid p. 839.

'তিনি এই দ্বিপদ ও চতুষ্পদ সমস্ত জীবের প্রভু।'

য ঈশেঽস্য জগতো নিত্যমেব নান্যো হেতুর্বিদ্যত ঈশনায়।—শ্বেত, ৬।১৭

'যিনি সদাকাল এই জগতের প্রভুত্ব করিতেছেন, যিনি ভিন্ন ঈশনের অন্য হেতু নাই।'

তিনি সর্ব্বশক্তিমান্—সকল শক্তি, সমস্ত সামর্থ্যের প্রস্রবণ। সেইজন্য শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

য একো জালবান্ ঈশত ঈশনীভিঃ সর্ব্বান্ লোকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ।—৩।১

একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ য ইমান্ লোকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ।—৩।২

'সেই এক জালবান্, সমস্ত লোককে শক্তির দ্বারা শাসিত করেন। এক রুদ্র—তাঁহার দ্বিতীয় নাই। তিনি এই সমস্ত লোককে শক্তির দ্বারা চালিত করেন।' এইজন্য বলা হইয়াছে,—

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।—শ্বেত, ৬।৮

'তাঁহার পরাশক্তি বিবিধ বলিয়া শ্রুত হয়। জ্ঞানশক্তি, বল (ইচ্ছা)-শক্তি এবং ক্রিয়া-শক্তি তাঁহার স্বাভাবিক।' অর্থাৎ তাঁহার শক্তিতে সমস্ত শক্তিমান্, তাঁহার দ্যুতিতে সমস্ত দ্যুতিমান্, তাঁহার জ্যোতিতে সমস্ত জ্যোতিষ্মান্। সেইজন্য গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ ভাসয়তেঽখিলং।

যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তৎ তেজো বিদ্ধি মামকম্॥—১৫ ১২

'আদিত্যে, চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে তেজ আলোকরূপে দীপ্তি পায়, তাহা আমারই তেজ।'

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।

পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥ -১৫।১৩

'পৃথিবীতে মাধ্যাকর্ষণরূপে যে শক্তি অভিব্যক্ত হয় এবং রসাত্মক সোমরূপে যে শক্তির দ্বারা ওষধিসমূহ পুষ্ট হয়, সে শক্তিও আমারই।'

শুধু ভৌতিক শক্তি নহে, প্রাণ-শক্তির উৎসও তিনি এবং ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি তাঁহারই।

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।

প্রানাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্॥ ১৫।১৪

'বৈশ্বানররূপে প্রাণীদিগের দেহের মধ্যে অবস্থিত হইয়া প্রান ও অপান সহযোগে আমিই চতুর্ব্বিধ অন্ন পাক করি।'

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। ১৫।৫

'জীবলোকে যে সনাতন জীব (ক্ষেত্রজ্ঞ), সে আমারই অংশ কারণ আমিই ক্ষেত্রজ্ঞ-রূপে সর্ব্বক্ষেত্রে বিরাজিত আছি।'

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।—১৩।২

অন্যত্র গীতা এই তত্ত্বের বিস্তার করিয়া বলিতেছেন,—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎকিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।

ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥
বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥ ৭।৭।১০

'আমা হ'তে পরতর নাহি কিছু ধনঞ্জয়।
আমাতে গ্রথিত বিশ্ব সূত্রে যথা মণিচয়॥
সলিলেতে রস আমি, প্রভা-শশি-দিবাকরে।
বেদেতে প্রণব, শব্দ আকাশে, পৌরুষ নরে॥
অনলেতে তেজ আমি, পৃথিবীতে পুণ্যঘ্রাণ।
তপস্বীর তপ আমি, আমি সর্ব্বভূতে প্রাণ॥
সকল ভূতের পার্থ! আমি বীজ সনাতন।
বুদ্ধি আমি বুদ্ধিমানে তেজস্বীর তেজ মম॥
বলবানে বল আমি কামরাগ বিবর্জ্জিত।
ধর্ম্ম-অবিরুদ্ধ ভূতে কামরূপে আমি স্থিত॥'

এই তত্ত্বের সম্প্রসারণ করিয়া গীতার দশম অধ্যায়ে ভগবান্ বিভূতিযোগের অবতারণা করিয়াছেন। তাহার সার মর্ম্ম এই যে,

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদ্-উর্জ্জিতমেববা।
তৎ-তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশং সম্ভবম্॥ ১০।৪১

'যে কিছু বস্তু বিভূতিযুক্ত, শ্রীযুক্ত, অথবা ওজোযুক্ত, সে সমস্ত আমারই তেজের প্রকাশ জানিবে।'

অর্থাৎ জগতে যেখানেই শক্তি, মহিমা বা ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ, সে তাঁহারই প্রভাব বুঝিতে হইবে। এই তত্ত্ব বিশদ করিবার জন্য ভগবান্ যে গণের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ, নিজেকে তাহাই বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন।

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্। মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রানামহং শশী॥
বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ। ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥
রুদ্রানাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্। বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্॥
পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্। সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ॥ গীতা,১০।২১ হইতে ২৪

অর্থাৎ 'আদিত্যগণের মধ্যে তিনি বিষ্ণু, জ্যোতির্গণের মধ্যে তিনি দিবাকর, মরুদ্‌-গণের মধ্যে তিনি মরীচি, নক্ষত্রগণের মধ্যে তিনি চন্দ্রমা, বেদগণের মধ্যে তিনি সামবেদ, দেবগণের মধ্যে তিনি ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে তিনি মন এবং ভূতগণের মধ্যে তিনি

চেতনা। রুদ্রগণের মধ্যে তিনি শঙ্কর, যক্ষঃ-রক্ষোগণের মধ্যে তিনি কুবের, বসুগণের মধ্যে তিনি অগ্নি, পর্ব্বতগণের মধ্যে তিনি মেরু, পুরোহিতগণের মধ্যে তিনি বৃহস্পতি, সেনানীগণের মধ্যে তিনি স্কন্দ (কার্ত্তিকেয়) এবং জলাশয়গণের মধ্যে তিনি সাগর ইত্যাদি।'

মহাকবি সেক্সপীয়র এক স্থানে বলিয়াছেন,—'There is providence in a sparrow's fall'—অর্থাৎ 'তিত্তিরির পতনেও পরমাত্মার প্রকাশ আছে।' এ কথাটী অতিশয় ঠিক ; কারণ সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের ঈশনা ভিন্ন বিশ্বের কোন কিছু সিদ্ধ হয় না—পাতাটীও নড়ে না, ফলটীও পড়ে না, ফুলটীও ফুটে না, পাখীটীও উড়ে না। তিনিই যে সমস্ত বলের উৎস, সমস্ত শক্তির প্রস্রবণ, মহাভারতের একটী আখ্যানে এ কথা সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রভাসের মহাশ্মশানে অন্তর্বিগ্রহে যদুকুল উৎসন্ন হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জরাব্যাধের গুপ্তশর নিমিত্ত করিয়া নরলীলা সংবরণ করিলেন। হস্তিনায় এই সংবাদ আনীত হইলে গাণ্ডীবধারী মহাবীর অর্জ্জুন যদুকামিনীদিগকে আনিবার জন্য প্রভাস যাত্রা করিলেন। সেখানে যে শোকের দৃশ্য তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইল, তাহা বর্ণনাতীত। অর্জ্জুন কোনরূপে ধৈর্য্যধারণ করিয়া বন্ধুকৃত্য সমাপনান্তে যদুমহিষীগণকে সঙ্গে লইয়া হস্তিনার পথে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে আভীর দস্যুগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত ও বিপর্য্যস্ত করিল। হতশ্রী অর্জ্জুন গাণ্ডীব বহন করিয়া অতিকষ্টে হস্তিনায় প্রত্যাগত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিতে লাগিলেন,—

বঞ্চিতোঽহং মহারাজ হরিণা বন্ধুরূপিণা।
যেন মেঽপহৃতং তেজো দেববিস্মাপনং মহৎ ॥ ভাগবত, ১।১৫।৫

'হে মহারাজ ! বন্ধুরূপী শ্রীহরি আমাকে বঞ্চনা করিয়া তিরোধান করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে দেবতারও বিস্ময়াবহ আমার মহৎ তেজ তিরোহিত হইয়াছে।'

তদ্বৈ ধনুস্ত ইষবঃ স রথোহয়াস্তে সোঽহং রথী নৃপতয়ো যত আনমন্তি।
সর্ব্বং ক্ষণেন তদভূদসদীশরিক্তং ভস্মন্ হুতং কুহকরাদ্ধমিবোপ্তমূষ্যাং ॥ ভাগ, ১।১৫।২১

'সেই আমার লোকবিশ্রুত ধনু,সেই বাণ, সেই রথ,সেই অশ্ব, আমিও সেই রথী ; কিন্তু আজ ঈশ্বর-রিক্ত হওয়ায় এ সমস্তই ভস্মে আহুতির ন্যায়, মায়িক ধনের ন্যায়, উষরে নিক্ষিপ্ত বীজের ন্যায় নিষ্ফল হইয়াছে।'

বস্তুতঃ কথাই তাই। ঈশ্বর-রিক্ত হইলে সমস্তই নির্ব্বল, কারণ তিনিই একমাত্র শক্তির প্রস্রবণ। বাস্তবিক জগদ্ব্যাপার তাঁহারই শক্তির লীলাবিলাস। তাঁহারই শাসনে বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য্য উদিত হয়, অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, সৃষ্টি বিধৃত হয়। তাঁহারই শক্তি শিরে ধারণ করিয়া দেবতাগণ স্ব স্ব অধিকারে নিযুক্ত থাকেন, বিশ্বের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে, জগৎ ঋতমার্গে পরিচালিত হয়। সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যক উপনিষদে তাঁহার পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

স যস্তান্ পুরুষান্ নিরুহ্য প্রত্যুহ্যাত্যক্রামৎ। তং ত্বা ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি।—৩।৯।২৬

'সেই উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য পুরুষের বিষয় প্রশ্ন করিতেছি, যিনি প্রমত্ত মেবকে প্রমত্ত পুরুষকে নিরোধ করিয়া, প্রমোদ করিয়া তাহাদের অতিক্রম করিয়াছেন।'

এই তত্ত্ব বিশদ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য অন্যত্র বলিতেছেন,—

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত, এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠত, এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণি অর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সম্বৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি, এতস্য বা অক্ষরস্য গার্গি প্রশাসনে প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যা যাং যাং চ দিশমনু, এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি যজমানং দেবা দর্ব্বীং পিতরোঽন্বায়ত্তাঃ। — বৃহ ৩।৮।৯

'হে গার্গি! ইঁহারই প্রশাসনে চন্দ্র সূর্য্য বিধৃত রহিয়াছে; এই অক্ষর পুরুষের প্রশাসনেই স্বর্গ মর্ত্ত্য বিধৃত রহিয়াছে; এই অক্ষর পুরুষের প্রশাসনেই নিমেষ মুহূর্ত্ত অহোরাত্র অর্দ্ধমাস মাস ঋতু সংবৎসর বিধৃত রহিয়াছে; হে গার্গি! এই অক্ষর পুরুষের প্রশাসনেই পূর্ব্বদিগ্‌বাহী নদীচয় শ্বেত পর্ব্বত হইতে প্রবাহিত হইতেছে। পশ্চিমদিগ্‌বাহী নদীচয় অন্যদিকে প্রবাহিত হইতেছে; এই অক্ষর পুরুষের প্রশাসনেই দান, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ, —মনুষ্যগণ, দেবগণ ও পিতৃগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইতেছে।'

এই তত্ত্ব বৃহদারণ্যক উপনিষদের "অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণে" সম্প্রসারিত হইয়াছে। ঈশ্বরের অন্তর্য্যামিত্ব উপদেশ দিয়া ঋষি বলিতেছেন,—

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরম্ যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।

যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোঽন্তরো যমাপো ন বিদুর্যস্যাপঃ শরীরং যোঽপোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ॥

যোঽগ্নৌ তিষ্ঠন্নগ্নেরন্তরো যমগ্নির্ন বেদ যস্যাগ্নিঃ শরীরং যোঽগ্নিমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ॥

যোঽন্তরিক্ষে তিষ্ঠন্নন্তরিক্ষাদন্তরো যমন্তরিক্ষং ন বেদ যস্যান্তরিক্ষং শরীরং যোঽন্তরিক্ষমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ॥

যো বায়ৌ তিষ্ঠন্ বায়োরন্তরো যং বায়ুর্ন বেদ যস্য বায়ুঃ শরীরং যো বায়ুমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ॥

যো দিবি তিষ্ঠন্ দিবোঽন্তরো যং দ্যৌর্ন বেদ যস্য দ্যৌঃ শরীরং যো দিবমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ॥ ইত্যাদি

অর্থাৎ 'যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীর অন্তর, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি পৃথিবীকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্যামী।'

'যিনি সলিলে থাকিয়া সলিলের অন্তর, সলিল যাঁহাকে জানে না, সলিল যাঁহার শরীর, যিনি সলিলকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্যামী।'

'যিনি অগ্নিতে থাকিয়া অগ্নির অন্তর, অগ্নি যাঁহাকে জানে না, অগ্নি যাঁহার শরীর, যিনি অগ্নিকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্যামী।'

'যিনি অন্তরীক্ষে থাকিয়া অন্তরীক্ষের অন্তর, অন্তরীক্ষ যাঁহাকে জানে না, অন্তরীক্ষ যাঁহার শরীর, যিনি অন্তরীক্ষকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্যামী।'

'যিনি বায়ুতে থাকিয়া বায়ুর অন্তর, বায়ু যাঁহাকে জানে না, বায়ু যাঁহার শরীর, যিনি বায়ুকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্যামী।'

'যিনি দিবে থাকিয়া দিবের অন্তর, দিব্ যাঁহাকে জানে না, দিব্ যাঁহার শরীর, যিনি দিব্‌কে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্যামী।'

অর্থাৎ সমস্ত প্রাকৃতিক, সমস্ত জৈবিক, সমস্ত দৈহিক ব্যাপারের পশ্চাতে অন্তর্যামীরূপে ঈশ্বর বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাঁহারই শক্তিতে তাঁহারা শক্তিমান্, তাঁহারই প্রাণনে তাহারা ক্রিয়াবান্; তাঁহারই সংযমনে তাহারা ব্যাপারবান্—তিনিই সমস্ত শক্তির প্রস্রবণ। এই তত্ত্ব বিশদ করিবার জন্য 'কেন' উপনিষদ্ একটী প্রাচীন উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন।

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে। তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত। ত ঐক্ষন্ত অস্মাকমেবায়ং বিজয়ঃ অস্মাকমেবায়ং মহিমা।—৩।১

'কোন সময়ে ব্রহ্ম দেবতাদিগকে জয়ী করিয়াছিলেন। ব্রহ্মকৃত এই বিজয়ে দেবতারা স্পর্দ্ধিত হইয়া মনে করিলেন, 'এই বিজয় আমাদের, এই মহিমা আমাদেরই।'

ব্রহ্ম তাঁহাদের এই ভ্রম দূর করিবার জন্য অদ্ভুত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাদের সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন।

তন্ন ব্যজানন্ত কিমিদং যক্ষমিতি।

'দেবতারা তাঁহাকে জানিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, 'কি এ অদ্ভুত পদার্থ!' তাঁহারা অগ্নিকে বলিলেন 'জাতবেদা! এ কি 'যক্ষ' জানিয়া আইস।' অগ্নি তাঁহার সমীপস্থ হইলে তিনি অগ্নিকে বলিলেন, 'কোঽসি'—'কে তুমি?' অগ্নি উত্তরে বলিলেন 'আমাকে জাননা! আমি অগ্নি, আমি জাতবেদা!' ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিলেন—

তস্মিন্ ত্বয়ি কিং বীর্য্যম্।

'সেই তোমাতে কি বীর্য্য—কি শক্তি আছে।' অগ্নি বলিলেন,—

অপীদং সর্ব্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যাম্।

'পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সমস্ত দহন করিতে পারি।'

ব্রহ্ম বলিলেন—'বেশ! এই তৃণগাছটী দহন কর দেখি।'

তদ্ উপপ্রেয়ায়। সর্ব্বজবেন তন্ন শশাক দাগ্ধুম্। স তত এব নিববৃতে, নৈতৎ অশকং বিজ্ঞাতুং যদেতৎ যক্ষমিতি।—কেন, ৩।১০

'অগ্নি সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া সেই তৃণ দগ্ধ করিবার প্রয়াস করিলেন। কিন্তু পারিলেন না। তিনি নিবৃত্ত হইয়া দেবতাদিগকে বলিলেন, এ কি অদ্ভুত যক্ষ! আমি জানিতে পারিলাম না।'

দেবতারা তখন বায়ুকে পাঠাইলেন—

বায়ো! এতদ্ বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি।

'বায়ু! এ কি অদ্ভুত যক্ষ, তুমি জানিয়া আইস।' বায়ুরও অগ্নিরই অবস্থা ঘটিল। ব্রহ্ম তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, 'কে তুমি?' বায়ু বলিলেন,—

বায়ুর্বা অহমস্মি, মাতরিশ্বা বা অহমস্মি।

'আমি বায়ু আমি মাতরিশ্বা, সমস্ত জগৎ আদান করিতে পারি।'

অপীদং সর্ব্বমাদদীয়ং যদিদং পৃথিব্যাম্।

ব্রহ্ম বলিলেন—'বেশ! এই তৃণগাছটী আদান কর দেখি।' বায়ু সর্ব্বভাবে, সমস্ত শক্তিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহাকে স্পন্দিত করিতেও পারিলেন না। তিনিও বিফল-প্রযত্ন হইয়া দেবতাদিগের সকাশে ফিরিয়া আসিলেন। দেবতারা এবার ইন্দ্রকে পাঠাইলেন। ইন্দ্রকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ব্রহ্ম তিরোধান করিলেন। তখন ইন্দ্র সেই আকাশে বহুশোভমানা এক রমণীমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলেন। ইনি ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী উমা হৈমবতী।

স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানাম্ উমাং হৈমবতীম্ তাং হোবাচ কিমেতদ্‌যক্ষমিতি।

—কেন, ৩।১২

'ইন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ অদ্ভুত যক্ষ কে?' উমা বলিলেন, 'আর কে? যাঁহার শক্তিতে তোমরা শক্তিমান্, যাঁহার বিজয়ে তোমরা জয়ী হইয়াছিলে, সেই ব্রহ্ম।' তখন দেবতাদিগের ভ্রম অপনীত হইল।

স ব্রহ্মেতি হোবাচ। ব্রহ্মণো বা এতদ্ বিজয়েমহীয়ধ্বমিতি। ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি।—কেন, ৪।১

অর্থাৎ সমস্ত আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ব্যাপার ঈশ্বরের শক্তিদ্বারাই নিষ্পন্ন হয়। সুধু আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক কেন, আধ্যাত্মিক ব্যাপারের পশ্চাতেও তিনিই। প্রশ্ন উপনিষদে প্রাণের উপাখ্যান হইতে আমরা এই তত্ত্ব অবগত হই। কথিত আছে, একবার প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, "আমাদের মধ্যে কে বরিষ্ঠ কে শ্রেষ্ঠ" এই বিষয় লইয়া। ইন্দ্রিয়গণ বলিতে লাগিল যে, "আমরাই এই শরীর ধারণ করিতেছি।"

তে প্রকাশ্য অভিবদন্তি বয়ম্ এতদ্‌বাণম্ অবষ্টভ্য বিধারয়াম।—প্রশ্ন, ২।২

প্রাণ বলিলেন, "তাহা নহে, আমিই পঞ্চ প্রাণরূপে নিজেকে বিভক্ত করিয়া এই দেহ রক্ষা করিতেছি।"

তে অশ্রদ্দধানা বভূবুঃ।

ইন্দ্রিয়গণ এ কথায় অশ্রদ্ধা করিল। তখন প্রাণ অভিমানে দেহ ছাড়িবার উপক্রম করিলেন। তাঁহার উৎক্রমণে দেহের বিনাশ ঘটে দেখিয়া ইন্দ্রিয়গণ শান্ত হইল এবং প্রাণকে স্তব করিতে লাগিল,—

সোঽভিমানাৎ ঊর্দ্ধং উৎক্রমিত ইব। তস্মিন্ উৎক্রামতি অথ ইতরে সর্ব্ব এব উৎক্রামন্তে।

এবং বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রং চ তে প্রীতাঃ প্রাণং স্তুন্বন্তি।—২।৪

এষোঽগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য্য এষ পর্জ্জন্যো মঘবানেষ।
বায়ুরেষ পৃথিবী রয়ির্দেবঃ সদসচ্চামৃতং চ যৎ॥ ২।৫
অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্। ২।৬
ইন্দ্রস্ত্বং প্রাণ তেজসা রুদ্রোঽসি পরিরক্ষিতা।
ত্বমন্তরিক্ষে চরসি সূর্য্যস্ত্বং জ্যোতিষাং পতিঃ। ২।৯
প্রাণস্যেদং বশে সর্ব্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্।
মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাং চ বিধেহি ন ইতি।—২।১৩

অর্থাৎ 'প্রাণই অগ্নি, প্রাণই তপন সূর্য্য, প্রাণই বর্ষক মেঘ, প্রাণই ইন্দ্র বায়ু, পৃথিবী, রয়িদেব, সৎ, অসৎ, অমৃত। রথের নাভিতে যেমন অরগণ প্রতিষ্ঠিত থাকে, সেইরূপ প্রাণে সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত। হে প্রাণ! তুমিই ইন্দ্র, তুমিই তেজস্বী রুদ্র, তুমিই জগতের ধারক, তুমিই জ্যোতিঃপতি সূর্য্যরূপে অন্তরীক্ষে বিচরণ কর। * * ভূলোকে দ্যুলোকে যাহা কিছু প্রতিষ্ঠিত আছে, সমস্তই প্রাণের বশে। হে প্রাণ! মাতা যেমন পুত্রগণকে রক্ষা করেন, সেইরূপ তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর এবং সম্পৎ ও প্রজ্ঞা প্রদান কর।'

বলা বাহুল্য, এই প্রাণই ব্রহ্ম—সর্ব্বশক্তির প্রস্রবণ ভূমা। তিনি অন্ধ জড়শক্তি নহেন—তিনি প্রজ্ঞা-দাত্রী গায়ত্রী, চিৎশক্তি। ভারতীয় ভূমা-বাদের এই এক দিক্। বারান্তরে আমরা অন্যান্য দিক্ দেখিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

মহা শ্মশান।

খুঁজিলাম বার বার, খুলিয়া হৃদয় দ্বার,
"আমি" বলে কই সেথা কিছুই ত নাই!
সুধু চারিধার ঘিরে' জলে চিতা ধূ ধূ করে;
রয়েছে ছড়ায়ে সুধু যত চিতা-ছাই।
পড়ে' সুধু আছে শব, হ'তেছে ডমরু-রব,
বাজিছে শিবের নামে বৈরাগ্য সানাই;
আছে হাড় জড় করা, অস্থির হতেছে ছড়া,
সংস্কার লহরী-মালা চলেছে সদাই।
হেরিয়া শিবের মূর্ত্তি হতেছে জীবের স্ফূর্ত্তি
জীব শিব হইতেছে শিব-পদে যাই'
হইয়াছে শিবময় শিব-অঙ্গে হ'য়ে লয়
নাচিতেছে ভূতগণ শিব জয় গাই।

শ্রীরাধা—

শ্রীপাদ গদাধর গোস্বামী প্রভুর জীবনী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

সে যাহা হউক, ভরতপুরনিবাসী ললিতমোহন গোস্বামী মহাশয় বলেন, তিনি তাঁহাদের ঊর্দ্ধতন পুরুষগণের নিকটে শ্রবণ করিয়াছেন, শ্রীপাদ গদাধর প্রভু শৈশবাবধিই শিষ্ট, শান্ত ও কৃষ্ণানুরক্ত। বাল্যকালেও কৃষ্ণ কথা শুনিলে তিনি স্থির কর্ণে তাহাই শ্রবণ করিতেন। আতিথেয়তা তাঁহার জীবনের প্রিয়কার্য্য ছিল। তিনি বিষ্ণুভক্ত নরগণকে বড় ভক্তির চক্ষে দেখিতেন। শৈশবে সযত্নে মৃত্তিকায় কৃষ্ণমূর্ত্তি গঠন করিয়া ধড়া চূড়া পরাইতেন, করে বাঁশরী দিতেন, ভালে তিলক আঁকিয়া দিতেন, এবং নানাবিধ বনফুল মালা তাঁহার গলে পরাইয়া দিয়া অতি আনন্দভরে দর্শন করিতেন। তাঁহার বর্ণ-ফলা শিক্ষা হইলে অধিকাংশ সময়ই কৃষ্ণনাম লিখিতেন। তাঁহার পাঠ্যপুস্তকের উপরে প্রায়ই কৃষ্ণমূর্ত্তি অঙ্কিত থাকিত।

এই কথাগুলি অতিরঞ্জিত বোধ হয়না। কেননা যে দিবসটি পরিষ্কার হইবে, সে দিনের প্রাতঃকাল দেখিয়া প্রায়ই তাহা অনুমান করিয়া লওয়া যায়। মানব-জীবনটীকে একটি দিবসের সহিত তুলনা করিলে, বাল্যজীবনই ইহার প্রাতঃকাল, যৌবনই উহার মধ্যাহ্ন, প্রাচীনাবস্থাই উহার অপরাহ্ণ। সুতরাং অনেকের বাল্যরূপ প্রাতঃকাল দেখিয়া তাহার মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন জীবন কিরূপে পরিণত হইবে, তাহা প্রায়ই জানিতে পারা যায়। গদাধর যে এতাদৃশ গৌরগত-প্রাণ হইবেন, তাহা তাঁহার জীবন-প্রভাতের প্রথমাবধিই বহু কার্য্যে আভাস পাওয়া যাইত। ইহা ভিন্ন তাঁহার কৃষ্ণভক্তি হইবার আর এক কারণ,—তিনি রাধিকার অবতার। মতান্তরে, অর্থাৎ গণোদ্দেশ-দীপিকার মতে শ্রীশ্রীবাণীনাথ গোপিকা পর্য্যায়ে ব্রজের কলভাষিণী সখি, নিবাস শ্রীহট্টে। শ্রীপাদ ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী বলেন, শ্রীবাণীনাথ শ্রীগৌরাঙ্গের চতুঃষষ্ঠি মহান্তের মধ্যে ঊনপঞ্চাশত্তম মহান্ত। ইনি শ্রীহট্ট প্রদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ইনি গদাধরের জ্যেষ্ঠ বা নয়নানন্দের জনক নহেন। পদামৃত-তরঙ্গিনী বা পদসমুদ্র গ্রন্থে শ্রীনয়নানন্দের পিতামাতার নাম উল্লেখ নাই। "গণোদ্দেশ"-দীপিকার-মতে ইনি কালীনাম্নী সখী। যথা,—

গোপালী হারাণী কালী কাকাক্ষী নিত্যমঞ্জরী।
হথ্যাচার্য্য গৌড় সাক্ষী মিশ্রশ নয়ন তথা॥ —গণোদ্দেশ দীপিকা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় শ্রীশ্রীগদাধর প্রভুর শাখা বর্ণনে কহেন,—

অনন্ত, আচার্য্য, কবিদ ও শ্রীমিশ্র নয়ন। গঙ্গা মন্ত্রী মামু ঠাকুর কণ্ঠাভরণ।
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত। আদিখণ্ড

পদামৃত-তরঙ্গিনী ও পদসমুদ্র পাঠে এই মাত্র বিদিত হওয়া যায় যে, শ্রীনয়নমিশ্র শৈশবাবধিই গদাধর প্রভুর সন্নিকটে থাকিয়া বিদ্যাধ্যয়ন করিতেন। ফলতঃ নয়নের

বিবিধ সদ্গুণাবলোকনে গদাধর প্রভু তাঁহাকে নিরতিশয় স্নেহচক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। পক্ষান্তরে নয়নানন্দও তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি করিত। অবশেষে তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ গদাধর প্রভু নয়নকে এত ভালবাসিতেন যে, তাঁহাকে সমভিব্যাহারে ভিন্ন অন্যত্র গমন করিতেন না। এমন কি তিনি যখন ভক্তপ্রাণবল্লভ, ভক্তহৃদয়-কুমুদ-বান্ধব শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর দর্শনে যাত্রা করিতেন. তখনও সেই প্রিয়তম নয়নানন্দকে সঙ্গে লইতে বিস্মৃত হইতেন না। গদাধর প্রভু যখন মহাপ্রভুর সহিত নৃত্য-গীতাদিতে ভাব-বিভোর চিত্তে উন্মত্ত-প্রায় হইতেন, ভক্তপ্রাণ নয়নানন্দ সেই সমস্ত চাক্ষুষ অবলোকনান্তে হৃদয়গ্রাহী পদাবলী রচনা করিতেন। এই সময়ে নয়নের বয়স সবে মাত্র ন্যূনাধিক দশবর্ষমাত্র। তাহার এই বয়সেই চিত্তদ্রবকারী কবিত্ব শক্তি সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়াছিল। ফলতঃ ভগবানের কৃপায় না হইতে পারে কি ? যাঁহার মহিমাসিন্ধুর বিন্দুমাত্র সংস্পর্শে জগাই, মাধাই-এর মত অত্যাচারী ঘোর পাষণ্ডও ভক্তিভরে হরিনামে উন্মত্ত হয়, যাঁহার মহিমায় চারিবর্ষ বয়স্কা নারায়ণীর ন্যায় বালিকাও 'হরি, হরি' বলিয়া ভূম্যবলুণ্ঠিত হয়, যাঁহার মহিমা-কণাস্পর্শে উত্তপ্ত-বালুকা কঙ্করাবৃত ঊষর ভূমিও ফল-পত্র-শোভিত কুঞ্জকাননে পরিশোভিত হয়, ঘোর কুজ্ঝটিকাবৃত নিবিড় চিরতমসাচ্ছন্ন প্রাকৃতিক-শোভা-বিহীন বীভৎস প্রদেশেও মুহূর্ত্ত মধ্যে অগণ্য তারকাবলী-বেষ্টিত শারদীয় শশাঙ্কের রজত-চ্ছটায় বিভাসিত হয়, তাঁহারই করুণাবলে 'নয়ন' এত অল্প বয়সে সুকবি। নয়নের হৃদয়োন্মাদকারী পদাবলী শ্রবণে শ্রীশ্রীগদাধর প্রভু নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নয়নানন্দ নামে অভিহিত করেন। শ্রীশ্রীপ্রভু বল্লভ আচার্য্য তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন।

পণ্ডিতের স্নেহপাত্র শ্রীনয়ন মিশ্র। বাল্যকালে প্রভু যারে করিলেন শিষ্য ॥
পণ্ডিতের পাছে নয়ন থাকি সর্ব্বক্ষণ। প্রভুলীলা দেখি পদ করয়ে বর্ণন।
ঐছে চেষ্টা দেখি প্রভু হরষিত হৈল। নয়নানন্দ বলি নাম পশ্চাৎ থুইলা ॥—শ্রীপদসমুদ্র।

নয়নানন্দ ও বাণীনাথের ইতিবৃত্ত গদাধর প্রভুর সহিত নিঃসম্পর্কীয় হইলেও, ইহা স্পষ্ট অবগত হওয়া যাইতেছে, যে নয়নানন্দ বাল্যাবধিই গদাধর প্রভুর স্নেহছায়া-তলে অনুগৃহীত হইয়া বিদ্যাধ্যয়ন ও বিবিধ ভক্তিযোগ শিক্ষা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ নয়নানন্দও যেমন শান্ত, শিষ্ট, বিমল-প্রকৃতি-প্রাপ্ত বালক, ভাগ্যবলে তেমনই প্রগাঢ়-পাণ্ডিত্যমণ্ডিত প্রেমভক্তির অদ্বিতীয় পাত্র গদাধর হেন গুরু পাইয়াছিলেন। ভূমি যতই উচ্চতর হউক না কেন, সুকৃষকের হস্তে না পড়িলে পর্য্যাপ্ত শস্যোৎপাদনে সক্ষম হয় না; তরণী যতই সুদৃঢ় হউক না কেন, উপযুক্ত কর্ণধারাভাবে উত্তাল তরঙ্গ মালা ভেদ করিয়া উপকূলে আসিতে পারে না; বাদিত্র যত উৎকৃষ্ট হউক না কেন, উপযুক্ত বাদকের দ্বারা বাদিত না হইলে শ্রুতি-সুখকর হইতে পারে না; তেমনই নয়নের যত কেন গুণাবলী থাকুক না কেন, তিনি গদাধরের ন্যায় সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন গুরু না পাইলে কখনও সর্ব্বগুণধাম হইয়া নয়নানন্দ নামে অভিহিত হইতে পারিতেন না। বস্তুতঃ মানব মাত্রেরই সদ্গুরু-লাভ নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

সদ্‌গুরু-হীন মানবচিত্তে কখনই ভক্তি ও প্রেম রাজ্যের কোটী-কোহিনুর-জ্যোতির্দ্দীপ্ত স্বর্ণ-নিকেতনের শান্তিপ্রদ ছায়া অবলম্বন করিয়া স্বর্গসুখ উপলব্ধি করিতে পারেনা; তাঁহাদের আত্মা ভ্রমাত্মক মরীচিকায় বিভ্রান্ত হইয়া সংসার-মরুভূর উত্তপ্ত বালুকা-কঙ্করাবৃত প্রান্তর মধ্যে অহর্নিশি দাবদগ্ধ কুরঙ্গের ন্যায় অশান্তি উপভোগ করে। জীবের সর্ব্বসুখ-কল্যাণের ধ্রুব-তারা একমাত্র সদ্‌গুরুই জানিতে হইবে। সদ্‌গুরুলাভ, মানবের কোটী জন্মের সৌভাগ্য-ফল-প্রসূত।

অনুমান ১৪২১।২২ শকে যে সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু শিষ্যগণকে বিদ্যাদানে ধন্য করিতে-ছিলেন ও শ্রীঅদ্বৈতাদি মহাভগবতগণ বঙ্গে প্রেমভক্তির বীজ-অঙ্কুরণে কৃতপ্রযত্ন, (এই স্থানে কেশব ভারতীর উল্লেখ আবশ্যক), তদানীন্তন কালে কৃষ্ণগত-প্রাণ, পরম-বৈষ্ণব, দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী মহোদয় প্রচ্ছন্ন বেশে শ্রীনবদ্বীপধামে আগমন করিয়া অদ্বৈত-মন্দিরে হঠাৎ উপস্থিত হন। যথা—

> হেন কালে নবদ্বীপে শ্রীঈশ্বরপুরী। আইলেন অতি অলক্ষিত বেশ ধরি॥
> কৃষ্ণরসে পরম বিহ্বল মহাশয়। একান্ত কৃষ্ণের প্রিয় অতি দয়াময়॥
> তান বেশে তানে কেহো চিনিতে না পারে। দৈবে গিয়া উঠিলেন অদ্বৈত মন্দিরে॥ শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

ফলতঃ বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীঅদ্বৈত প্রভু তাঁহার অঙ্গে জ্যোতির্দ্দীপ্ত বৈষ্ণব তেজাবলোকনে জিজ্ঞাসা করিলেন;

> অদ্বৈত বোলেন বাপ তুমি কোন জন। বৈষ্ণব সন্ন্যাসী তুমি হেন লয় মন॥

তাঁহার বাক্য শ্রবণানন্তর শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন এবং মুকুন্দের মুখে কৃষ্ণগুণগান শ্রবণে ভূমি পৃষ্ঠে ঢলিয়া পড়িলেন। তাঁহার নয়ন দিয়া অবিরল ধারে প্রেম-গঙ্গা-স্রোত বহমান, নয়ন সলিলে সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত, তাঁহার তদানীন্তন প্রেমার্ত্ত কলেবর দর্শনে সকল ভাগবৎগণই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে শ্রীল মহাপ্রভু বালকদিগকে বিদ্যাদান করিয়া গৃহাভিমুখে আসিতেছিলেন, রাজবর্ত্মে শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। শ্রীঈশ্বরপুরী মহাপ্রভুর কোটী-কাম-বিনিন্দিত লাবণ্য-ললাম সম্ভৃত মনোহর রূপ সন্দর্শনে বিস্ময়াকুলনেত্রে পরস্পর দৃষ্টি করিতে লাগিলেন; এবং অতি ব্যাকুল অন্তরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে দ্বিজসত্তম! আপনার নাম কি এবং আপনার নিবাসই বা কোথায়?" কিন্তু মহাপ্রভুকে আর নিজমুখে কেন উত্তর করিতে হইল না। সকলে বলিলেন,—"ইঁহারই নাম ভারত-বিখ্যাত নিমাই পণ্ডিত"।

শ্রীল ঈশ্বরপুরীর হর্ষোৎফুল্ল বদনে তখন, "তুমি কে" এইমাত্র উচ্চারিত হইল। মহাপ্রভুও তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া সমাদরে নিজগৃহে আনিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীসত্যকিঙ্কর কুণ্ডু।

বাৎস্যায়ন ভাষ্য।

মূল ও অনুবাদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

(২)

ভাষ্য। "প্রমাণমন্তরেণ নার্থপ্রতিপত্তিঃ, নার্থপ্রতিপত্তিমন্তরেণ প্রবৃত্তিসামর্থ্যং। প্রমাণেন খল্বয়ং জ্ঞাতাঽর্থমুপলভ্য তমর্থমভীপ্সতি জিহাসতি বা। তস্যেপ্সাজিহাসা-প্রযুক্তস্য সমীহা প্রবৃত্তিরিত্যুচ্যতে। সামর্থ্যং পুনরস্যাঃ ফলেনাভিসম্বন্ধঃ। সমীহমানস্তমর্থমভীপ্সন্ জিহাসন্ বা তমর্থমাপ্নোতি জহাতি বা। অর্থস্তু সুখং সুখহেতুশ্চ দুঃখং দুঃখহেতুশ্চ। সোঽয়ং প্রমাণার্থোঽপরিসংখ্যেয়ঃ প্রাণভৃদ্‌ভেদস্যাপরিসংখ্যেয়ত্বাৎ।"

অনুবাদ। (ভাষ্যকার ভাষ্যলক্ষণানুসারে পূর্ব্বোক্ত ভাষ্যের পদবর্ণন করিতেছেন)। (১) প্রমাণ ব্যতীত অর্থের যথার্থ বোধ হয় না। অর্থের যথার্থবোধ ব্যতীত প্রবৃত্তির সামর্থ্য (সফলতা) হয় না। জ্ঞাতা ব্যক্তি প্রমাণের দ্বারাই অর্থকে উপলব্ধি করিয়া সেই অর্থকে পাইতে ইচ্ছা করে, অথবা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে। প্রাপ্তির ইচ্ছা, অথবা ত্যাগের ইচ্ছা-প্রণোদিত সেই জ্ঞাতার সমীহা (প্রযত্ন-বিশেষ), 'প্রবৃত্তি' এই শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। এই প্রবৃত্তির সামর্থ্য কিন্তু ফলের সহিত অভিসম্বন্ধ—অর্থাৎ সফলতা। সমীহমান 'প্রবর্ত্তমান) জ্ঞাতা, সেই অর্থকে পাইতে ইচ্ছা করতঃ, অথবা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করতঃ, সেই অর্থকে প্রাপ্ত হয়, অথবা ত্যাগ করে।

(২) অর্থ কিন্তু সুখ ও সুখের হেতু, এবং দুঃখ ও দুঃখের হেতু।

(৩) প্রাণিভেদের অপরিসংখ্যেয়ত্ব অর্থাৎ অনিয়ম্যত্ব বশতঃ সেই এই প্রমাণার্থ (প্রমাণের প্রয়োজন সুখদুঃখাদি) ও অপরিসংখ্যেয় অর্থাৎ অনিয়ম্য (নিয়ম করা যায় না)।

টিপ্পনী। (১) "সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।
স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যংভাষ্যবিদোবিদুঃ॥"

ইহাই ভাষ্যের লক্ষণ। সূত্রের উল্লিখিত এখনও হয় নাই, সুতরাং সূত্রানুসারী পদের দ্বারা সূত্রার্থবর্ণন এখন সম্ভবই নহে। কিন্তু স্বপদ-বর্ণন রূপ ভাষ্যলক্ষণ আদিভাষ্যেও রাখিতে হইবে। নচেৎ তাহা ভাষ্যই হয় না। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও ইহাকে আদিভাষ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী ভাষ্যার্থ বুঝিতে এই ভাষ্যার্থ-

জ্ঞান আবশ্যক, সুতরাং পরবর্ত্তী ভাষ্যের সহিত এই ভাষ্যের "উপোদ্‌ঘাত" নামে সঙ্গতি আছে, এই বলিয়া কেহ কেহ এইরূপ আদিভাষ্যকে "উপোদ্‌ঘাত ভাষ্য" বলিয়া থাকেন। ফলতঃ ইহা ভাষ্য বলিয়াই ভাষ্যকার ভাষ্যের রীতিতে এখন প্রথম ভাষ্যসন্দর্ভের পদবর্ণন করিতেছেন। নিজের কথার নিজে ব্যাখ্যা করাই স্বপদ-বর্ণন।

(২) "প্রমাণমন্তরেণ নার্থপ্রতিপত্তিঃ" ইত্যাদি ভাষ্যসন্দর্ভে অনেকবার অর্থশব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। "প্রমাণতোঽর্থপ্রতিপত্তৌ"—এই আদিভাষ্যেও অর্থশব্দই প্রযুক্ত হইয়াছে। এখন এই অর্থশব্দের প্রতিপাদ্য কি, ইহা জানিবার আকাঙ্খা হইবেই। অর্থ-শব্দের দ্বারা পদার্থমাত্রই বুঝিয়া বসিলে এখানে ভাষ্যকারের 'অর্থ' বুঝা হইবে না। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাই ভাষ্যকার তাঁহার অর্থশব্দের প্রতিপাদ্য বর্ণন করিয়াছেন "অর্থস্তু" ইত্যাদি। অর্থাৎ সুখ, সুখহেতু এবং দুঃখ ও দুঃখ হেতু, এই প্রাপ্য ও ত্যাজ্য পদার্থগুলিই এখানে 'অর্থ'।

"প্রমাণমন্তরেণ নার্থপ্রতিপত্তিঃ"—এই স্থলে "প্রমাণ" শব্দ আছে বলিয়া "অর্থপ্রতিপত্তি" বলিতে অর্থের যথার্থ জ্ঞানই বুঝিতে হইবে। প্রমাণব্যতীত প্রমাণাভাসের দ্বারা অর্থের ভ্রমজ্ঞান হইতে পারে; কিন্তু যথার্থ জ্ঞান হয় না, ইহাই তাৎপর্য্য।

(৩) সুখ দুঃখ প্রভৃতি "অর্থ" এক একটী গণনায় অসংখ্য হইলেও, ভাষ্যে সুখ, সুখহেতু এবং দুঃখ ও দুঃখহেতু—এই চারি প্রকারে তাহার বিভাগ করিয়া সংখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং প্রমাণার্থ অসংখ্য ইহা ভাষ্যার্থ নহে। "প্রমাণার্থ" এই স্থলে অর্থ শব্দের অর্থ প্রয়োজন। প্রমাণের প্রয়োজন সুখ দুঃখ প্রভৃতি অপরিসংখ্যেয় অর্থাৎ তাহার পরিসংখ্যা করা যায় না, নিয়ম করা যায় না। চন্দনবিষয়ক প্রমাণের প্রয়োজন সুখ; কণ্টকবিষয়ক প্রমাণের প্রয়োজন দুঃখ। আবার কোন প্রাণীর পক্ষে ইহা বিপরীত। যাহা একের সুখহেতু, তাহা অন্যের দুঃখহেতু। যাহার কারণের নিয়ম নাই, তাহার নিয়ম থাকিতে পারে না; তাই হেতু দেখাইয়াছেন "প্রাণভৃদ্ভেদস্য পরিসংখ্যেয়ত্বাৎ"; অপরি-সংখ্যেয় বলিতে এখানে অসংখ্য নহে। এখানে উহার অর্থ অনিয়ম্য। ভাষ্যকার 'অসংখ্য' শব্দের প্রয়োগ করেন নাই, ইহাও এখানে চিন্তনীয়।

ভাষ্য। "অর্থবতিচ প্রমাণে প্রমাতাপ্রমেয়ং প্রমিতি রিত্যর্থবন্তি ভবন্তি। কস্মাৎ? অন্যতমাপায়েঽর্থস্যানুপপত্তেঃ। তত্র যস্যেপ্সাজিহাসাপ্রযুক্তস্য প্রবৃত্তিঃ স প্রমাতা। স যেনার্থং প্রমিণোতি তৎ প্রমাণং। যোঽর্থঃ প্রমীয়তে তৎ প্রমেয়ং। যদর্থবিজ্ঞানং সা প্রমিতিঃ। চতসৃষ্বেবং বিধাস্বর্থ-তত্ত্বং পরিসমাপ্যতে"।

অনুবাদ। (১) প্রমাণ অর্থবান্ (পূর্ব্বোক্তরূপে অর্থের অব্যভিচারী) হইলেই অর্থাৎ প্রমাণ অর্থের অব্যভিচারী বলিয়া সিদ্ধ হইলেই প্রমাতা, প্রমেয়,

প্রমিতি, ইহারা অর্থবান্ (সমর্থ) অর্থাৎ সমীচীনার্থ হয়। অথবা পক্ষান্তরে—প্রমাণ অর্থবান্ (নিরতিশয় প্রয়োজনবিশিষ্ট) হইলেই প্রমাতা, প্রমেয়, প্রমিতি, ইহারা অর্থবান্ (সেইরূপ প্রয়োজনবিশিষ্ট) হয়। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু (২) অন্যতমের অর্থাৎ প্রমাণের অভাবে অর্থের উপপত্তি হয় না। তাহাদিগের মধ্যে প্রাপ্তির ইচ্ছা ও ত্যাগের ইচ্ছা প্রণোদিত যে ব্যক্তির প্রবৃত্তি হয়, তাহাকে "প্রমাতা" বলে। সেই প্রমাতা যাহার দ্বারা "অর্থ" কে যথার্থরূপে জানে, তাহাকে প্রমাণ বলে। যে অর্থ যথার্থরূপে জ্ঞাত হয়, তাহাকে "প্রমেয়" বলে। যাহা অর্থবিজ্ঞান (অর্থবিষয়ক যথার্থ জ্ঞান) তাহাকে "প্রমিতি" বলে। এইরূপ চারিটি প্রকারে অর্থের তত্ত্ব ( ) পরিসমাপ্ত হয়।

( ) তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রমাণ প্রমেয়-বিষয়ের অব্যভিচারীরূপে সিদ্ধ বলিয়াই প্রমাতা অর্থবান্ হয় অর্থাৎ সেই বিষয় প্রাপ্ত হয়। প্রমেয় অর্থবান্ অর্থাৎ সমীচীনার্থ হয় অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা তাহা (প্রমেয়) যেরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে সেইরূপই হয়, কখনও সেইরূপের অন্যথা হয় না। "প্রমতি" অর্থবতী হয়, উহা সেই অর্থ-বিধায়িনীই হয়, অর্থাৎ যথার্থ হয়। প্রমাণাভাসের দ্বারা জ্ঞান হইলে এইরূপ হইতে পারে না। কারণ প্রমাণাভাস অর্থের ব্যভিচারী। প্রমাণাভাস জন্য জ্ঞান ভ্রম। আদিভাষ্যের "অর্থবৎ" এইস্থলে অর্থ শব্দের প্রয়োজনার্থ ধরিলে এই ভাষ্যেরও সেইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। "পক্ষান্তরে" বলিয়া সে অর্থও অনুবাদে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রমাণ জ্ঞানাদি সম্পাদন দ্বারা প্রয়োজন বিষয়ে সমর্থ বলিয়া নিরতিশয় প্রয়োজনবিশিষ্ট হইলে প্রমাতা প্রভৃতিও সেইরূপ প্রয়োজনবিশিষ্ট হয়, কারণ তাহারাও প্রয়োজন-বিষয়ে প্রমাণের ন্যায়ই সমর্থ, ইহাই দ্বিতীয় পক্ষের তাৎপর্য্য। প্রথম ব্যাখ্যায় 'অর্থবন্তি' এইস্থলে প্রাশস্ত্যার্থে মতুপ্ প্রত্যয় বুঝিতে হইবে।

(২) "অন্যতমাপায়ে"—এইস্থলে অন্যতমশব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ, প্রমাতা, প্রমেয় প্রমিতি, এই চারিটী অর্থই বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু ন্যায়বার্ত্তিককার বলিয়াছেন যে, এখানে প্রমাতা প্রভৃতি হইতে প্রমাণের বৈশিষ্ট্য-প্রদর্শনই ভাষ্যকারের উদ্দেশ্য। "অর্থ-বতি চ প্রমাণে" ইত্যাদি ভাষ্যসন্দর্ভ প্রমাণের প্রাধান্য সমর্থনের জন্যই কথিত হইয়াছে। সুতরাং ঐস্থলে "অন্যতম" শব্দটী প্রমাণরূপ বিশেষার্থ তাৎপর্য্যেই প্রযুক্ত বুঝিতে হইবে। প্রমাণের অভাবে অর্থের উপপত্তি (যথার্থ জ্ঞান) হয় না, এই হেতুর দ্বারা প্রমাণের প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে। অনুবাদে এই ব্যাখ্যাই গৃহীত হইয়াছে।

(৩) "অর্থের তত্ত্বপরিসমাপ্ত হয়"—এখানে তত্ত্বপরিসমাপ্তি বলিতে গ্রহণযোগ্যতা, ত্যাগ, এবং উপেক্ষা। প্রমাণের দ্বারা প্রমাতার প্রমেয়-বিষয়ক প্রমিতির পরে তাহা সুখসাধন বলিয়া মনে হইলে গ্রহণ করে। কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ গ্রহণ না ঘটিলেও

গ্রহণযোগ্যতা থাকে। দুঃখসাধন বলিয়া মনে হইলে ত্যাগ করে। সুখসাধনও নহে, দুঃখসাধনও নহে, ইহা মনে হইলে উপেক্ষা করে। সুতরাং অর্থের এই তত্ত্বপরিসমাপ্তি, ভাষ্যোক্ত প্রমাণ, প্রমাতা, প্রমেয়, প্রমিতি, এই চারিটী প্রকারেই হয়।

ভাষ্য। কিং পুনস্তত্ত্বং? সতশ্চসদ্ভাবোঽসতশ্চাসদ্ভাবঃ। সৎ সদিতি-গৃহ্যমানং যথাভূতমবিপরীতং তত্ত্বং ভবতি। অসচ্চাসদিতিগৃহ্যমানং যথাভূতমবিপরীতং তত্ত্বং ভবতি।

অনুবাদ। (প্রশ্ন) তত্ত্ব কি? (১) (উত্তর) সৎপদার্থের (ভাবপদার্থের) সদ্ভাব (ভাবরূপতা) এবং অসৎপদার্থের (অভাবপদার্থের) অসদ্ভাব (অভাবরূপতা)। বিশদার্থ এই যে—"সৎ অর্থাৎ ভাবরূপবস্তু, "সৎ" এইরূপে অর্থাৎ ভাবরূপে জ্ঞায়মান হইয়া, যথাভূত অবিপরীত (২) হইয়া অর্থাৎ ঐ বস্তু ঠিক্ যেরূপ তাহা হইতে ভিন্নরূপে অজ্ঞাত হইয়া, তত্ত্ব হয়। এবং অসৎ অর্থাৎ অভাবপদার্থ, "অসৎ" এইরূপে, অর্থাৎ অভাবরূপে জ্ঞায়মান হইয়া (পূর্ব্বোক্তরূপে) যথাভূত অবিপরীত হইয়া তত্ত্ব হয়।

(১) পূর্ব্বে যে তত্ত্ব-পরিসমাপ্তির কথা বলা হইয়াছে সেই তত্ত্ব কি, তাহা বলিবার জন্য ভাষ্যকার প্রশ্ন করিতেছেন "কিং পুনস্তত্ত্বং"? শ্রোতৃবর্গের অবধান ও বিশদ বোধের জন্য স্বয়ং প্রশ্নপূর্ব্বক উত্তর প্রদান করাই প্রাচীনদিগের রীতি ছিল। এখনও কোন বিষয় বুঝাইতে অনেক বক্তারই ঐ রীতি দেখা যায়। "তস্য ভাবঃ" এই অর্থে তত্ত্ব শব্দটী নিষ্পন্ন। ঐ তত্ত্ব শব্দের অন্তর্গত "তৎ" শব্দের প্রতিপাদ্য সৎ ও অসৎ পদার্থ। ঐ দ্বিবিধ পদার্থের পদার্থস্বরূপে প্রত্যেকের প্রাধান্য সূচনার জন্য ভাষ্যকার "সতশ্চ" "অসতশ্চ" এই দুই স্থলে দুইটি "চ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। "অসৎ" বলিতে এখানে অলীক নহে। "সৎ" বলিতে ভাবপদার্থ। "অসৎ" বলিতে সদ্ভিন্ন অর্থাৎ ভাবভিন্ন পদার্থ। তাহা হইলে "অসৎ" বলিতে এখানে অভাব পদার্থই বুঝা গেল। কারণ, ভাব-ভিন্ন পদার্থই অভাব পদার্থ। যাহার সত্তা নাই অর্থাৎ যাহা অলীক, বস্তুতঃ তাহা কোন পদার্থই নহে। ফলতঃ "সৎ" ও "অসৎ" বলিতে যথাক্রমে ভাব ও অভাব। পদার্থ সামান্যতঃ এই দুই ভাগেই বিভক্ত। "তৎ" শব্দের প্রতিপাদ্য এই সৎ ও অসতের ভাবই তত্ত্ব। বিধায়ক-প্রমাণ অর্থাৎ ভাবসাধক প্রমাণের বিষয়ত্বই সৎপদার্থের ভাব। নিষেধক প্রমাণ অর্থাৎ অভাব সাধক প্রমাণের বিষয়ত্বই "অসৎ" পদার্থের ভাব। এই তত্ত্ব "সৎ" ও "অসৎ" পদার্থ হইতে বস্তুতঃ কোন ভিন্ন পদার্থ নহে। উহা সৎ ও অসতের স্বরূপ। ভাষ্যকার "সৎ সদিতিগৃহ্যমানং" ইত্যাদি ভাষ্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত স্বপদবর্ণন করিয়া ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার ফলিতার্থ এই যে, ভাব ও অভাব এই দ্বিবিধ পদার্থকেই 'তত্ত্ব' বলে; তবে যাহার যেটী অসাধারণ ধর্ম্ম, অর্থাৎ যে পদার্থ যেরূপে অবস্থিত, ঠিক সেইরূপে (তাঁহার

বিভিন্নরূপে নহে ' জ্ঞাত সেই পদার্থ সেইরূপে তত্ত্ব হইবে। ভাব ও অভাব পদার্থের প্রকৃত স্বরূপ বুঝাইবার জন্য সতের ভাব অর্থাৎ ভাবসাধক প্রমাণ-বিষয়ত্ব এবং অসতের ভাব অর্থাৎ অভাবসাধক প্রমাণবিষয়ত্বই প্রথমতঃ "তত্ত্ব" বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে প্রকৃত সিদ্ধান্তের কোন ব্যাঘাত হয় নাই। প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই যে, প্রকৃতরূপে অবিপরীতভাবে জ্ঞাত পদার্থ মাত্রই তত্ত্ব। তাহা সামান্যতঃ "সৎ" ও "অসৎ" (ভাব ও অভাব) এই দুই ভাগে বিভক্ত।

(২) ভাষ্যে "যথাভূতমবিপরীতং" এই স্থলে "অবিপরীতং" এই কথাটী "যথাভূতং" এই পূর্ব্বকথারই ব্যাখ্যা। প্রাচীন ভাষ্যাদি গ্রন্থে এইরূপ স্বপদবর্ণন ও ব্যাখ্যার অনু-ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। বিশদ বোধের জন্যই প্রাচীনগণ ঐ প্রণালীতে ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। অনেক স্থলেই এইরূপ প্রণালীতে বাক্য রচনা এই পরম প্রাচীন ন্যায়-ভাষ্যে আছে। সেই সব স্থলে অনুবাদের ভাষাও ভাষ্যের প্রণালীতেই হইবে। পাঠকগণ এ কথাটা মনে রাখিলে আর পুনরুক্তি দোষের কথা মনে আসিবে না।

কথমুত্তরস্যপ্রমাণেনোপলব্ধিরিতি সত্যুপলভ্যমানে তদনুপলব্ধেঃ প্রদীপ-বৎ। যথা দর্শকেন দীপেন দৃশ্যে গৃহ্যমানে তদিব যন্নগৃহ্যতে তন্নাস্তি,যদ্য-ভবিষ্যদিদমিব ব্যজ্ঞাস্যত,বিজ্ঞানাভাবান্নাস্তীতি। এবং প্রমাণেন সতি গৃহ্য-মানে তদিব যন্নগৃহ্যতে তন্নাস্তি,যদ্যভবিষ্যদিদমিব ব্যজ্ঞাস্যত বিজ্ঞানাভাবা-ন্নাস্তীতি। তদেবং সতঃ প্রকাশকং প্রমাণমসদপি প্রকাশয়তীতি।

অনুবাদ। (প্রশ্ন) উত্তরটীর অর্থাৎ ভাব ও অভাব নামে যে দ্বিবিধ তত্ত্ব বলা হইল, তাহার মধ্যে পরবর্ত্তী অভাবের প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হয় কিরূপে ? (উত্তর)—সৎপদার্থ উপলভ্যমান হইলে তখন তাহার, অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা যাহার অভাবের উপলব্ধি হয়, সেই পদার্থান্তরের উপলব্ধি না হওয়ায়—যেমন প্রদীপ। বিশদার্থ এই যে—যেমন কোন দর্শক প্রদীপের দ্বারা দৃশ্যপদার্থ দেখিতেছে ; ঐ সময়ে তাহার ন্যায় (সেই দৃশ্য পদার্থের ন্যায়) যাহা দেখিতেছে না, তাহা নাই। যদি থাকিত, তাহাহইলে ইহার ন্যায় (যেটী দেখিতেছে তাহার ন্যায়) জানিত। জ্ঞান হইতেছে না, সুতরাং (তাহা) নাই। এইরূপ প্রমাণের দ্বারা সৎপদার্থ জ্ঞায়মান হইলে তখন তাহার ন্যায় (সেই জ্ঞায়মান সৎপদার্থের ন্যায়) যেটী জ্ঞানের বিষয় হইতেছে না, তাহা নাই। যদি থাকিত, তাহা হইলে ইহার ন্যায় (জ্ঞায়মান বিষয়টীর ন্যায়) জ্ঞানের বিষয় হইত। জ্ঞান না হওয়ায় (তাহা) নাই। অতএব এইরূপে (প্রদীপের ন্যায়) সৎপদার্থের (ভাব পদার্থের) প্রকা-শক প্রমাণ, অসৎ পদার্থকেও (অভাবপদার্থকেও) প্রকাশ করিতেছে।

(১) প্রমাণ-বোধিত না হইলে তাহাকে পদার্থ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। অভাব পদার্থ হইলে তাহা প্রমাণ বোধিত হওয়া চাই; তাই প্রশ্ন পূর্ব্বক উত্তর দিতেছেন যে,ভাবের ন্যায় অভাবও প্রমাণ-বোধিত। প্রমাণ অভাবকেও প্রকাশ করে. ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার প্রদীপকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ প্রদীপ সর্ব্বলোকসিদ্ধ। সাধারণ লোকেও প্রদীপের দ্বারা ভাবের ন্যায় অভাবেরও নির্ণয় করিয়া থাকে। গৃহ হইতে তস্কর বহির্গত হইলে বালকও প্রদীপের সাহায্যে কোন্‌টী আছে, কোন্‌টী নাই ইহা বুঝিয়া থাকে। প্রদীপের সাহায্যে যাহা থাকে, তাহাই দেখে; যাহা থাকে না, তাহা দেখে না। তখন তাহা নাই বলিয়াই বুঝে। এই "নাই" বলিয়া যে বুঝা, ইহাই অভাবের বোধ। প্রদীপ প্রমাণের দৃষ্টান্ত। প্রমাণ যাহা প্রকাশ করে, তাহা আছে, যাহা প্রকাশ করে না, তাহা নাই; থাকিলে প্রমাণ তাহারও প্রকাশ করিত। প্রমাণ যাহা প্রকাশ করিতেছেনা, তাহার অভাবই তাহার দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। সুতরাং প্রমাণ যেমন ভাব-পদার্থের প্রকাশক, তদ্রূপ অভাব-পদার্থেরও প্রকাশক। অভাব ভাবপরতন্ত্র। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রকার ভিন্ন অন্য প্রকারে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। আমরা ঘটাদি ভাব-পদার্থ দেখিয়া তাহার সজাতীয় পদার্থ না দেখিলে মনে করি, তাহা এখানে নাই, থাকিলে অবশ্যই দেখিতাম। এইরূপে ভাব পদার্থের ন্যায় অভাব-পদার্থও প্রমাণ-বোধিত হইয়া থাকে।

সচ্চখলু ষোড়শধা ব্যূঢ়মুপদেক্ষ্যতে।

অনুবাদ। (১) সৎপদার্থও (ভাবপদার্থও) ষোড়শ প্রকারেই সংক্ষেপে উপদেশ করিবেন।

(১) অভাব পদার্থ মহর্ষি গোতমের সম্মত হইলে পদার্থ-গণনায় মহর্ষি কেন তাহার উল্লেখ করেন নাই এই প্রশ্নের উত্তরে ন্যায়-বার্ত্তিককার পরম প্রাচীন উদ্যোতকর বলিয়াছেন "তত্র স্বাতন্ত্র্যেণাসদ্‌ভেদা ন প্রকাশন্তে ইতি নোচ্যন্তে।" অর্থাৎ অভাবের স্বতন্ত্রভাবে (ভাব ব্যতিরেকে) জ্ঞান হইতে পারে না, যাহার অভাব এবং যে অধিকরণে অভাব, তাহার নিরূপণ ভিন্ন অভাবের নিরূপণ অসম্ভব; এজন্য অভাবকে পৃথক্‌ভাবে বলেন নাই। ভাবপ্রপঞ্চ বলাতেই অভাবপ্রপঞ্চ বলা হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। এপক্ষে "সৎচ খলু" এই ভাষ্যে "চ" শব্দের অর্থ অবধারণ, খলু শব্দের অর্থ স্পষ্টাবধারণ। "সচ চ খলু" ইহার প্রতিশব্দ সদেব খলু। অর্থাৎ মহর্ষি ভাব পদার্থই ষোড়শ প্রকারে উপদেশ করিবেন, ভাবপরতন্ত্র বলিয়া অভাব-পদার্থের উপদেশ করিবেন‌না। ন্যায়বার্ত্তিকব্যাখ্যায় ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র, চরমকল্পে বাস্তবসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। "অথবা কথিতা এব তে যেষাং তত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সোপযোগি, যেতু ন তথা ন তেষাং প্রপঞ্চোঽনুপযুক্তভাবপ্রপঞ্চইব বক্তব্যঃ।" অর্থাৎ মহর্ষি গোতম অভাব-পদার্থও বলিয়াছেন, যেমন প্রমেয়ের মধ্যে অপবর্গ অভাব-পদার্থ। প্রয়োজনের মধ্যে দুঃখাভাব অভাব-পদার্থ। এইরূপ আরও অনেক অভাব-পদার্থ তিনি বলিয়াছেন। আবার অনেক

ভাব-পদার্থও তিনি বলেন নাই। ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে,যে সমস্ত পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির উপযোগী, সেই সমস্ত পদার্থই তিনি ষোড়শ প্রকারে বিভাগ করিয়া বলিয়াছেন; যে পদার্থ মুক্তির উপযোগী নহে,তাহা তিনি বলেন নাই। ফলতঃ গোতমের মতে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থ ভিন্ন আর পদার্থ নাই, ইহা সিদ্ধান্ত নহে। এপক্ষে "সচ্চ খলু ষোড়শধা" এই ভাষ্যে "চ" শব্দের অর্থ সমুচ্চয়। "খলু" শব্দের অর্থ অবধারণ। "সচ্চ" সদপি ষোড়ষধা খলু শোড়ষধৈব—এইরূপে ভাষ্য ব্যাখা করিলে বুঝা যায়, "সৎপদার্থও ষোড়শ প্রকারেই সংক্ষেপে বলিবেন।" অনুবাদে এই ব্যাখ্যাই গৃহীত হইয়াছে। "সচ চ" এইস্থলে 'চ' শব্দের দ্বারা অভাবেরও সমুচ্চয় হইয়াছে। অর্থাৎ ভাবপদার্থ ষোড়শ প্রকারেই (মোক্ষোপযোগী পদার্থ বলিবার জন্য) বলিবেন; তাহার মধ্যে অভাবেরও উপদেশ থাকিবে। সৎপদার্থও সেই সেই ব্যক্তিস্বরূপে বলা অসম্ভব। সবগুলি মোক্ষোপযোগীও নহে। তাই প্রমাণত্ব প্রমেয়ত্ব প্রভৃতিরূপে বিভাগ করিয়া কতকগুলি পদার্থের উল্লেখই সংক্ষেপে উল্লেখ। প্রমাণাদি পদার্থ বর্গের বিশেষ বিভাগে অভাবের উল্লেখ করিলেও ভাবপদার্থ ষোড়শ প্রকারেই বলা হইয়াছে। মহর্ষি দ্বিতীয়াধ্যায়ে অভাবরূপ প্রমেয় সাধন করিয়াছেন, তাহাতেও মহর্ষির সিদ্ধান্ত সুব্যক্ত হইয়াছে। ভাষ্যে "ব্যূঢ়ং" এই পদের ব্যাখ্যা 'সংক্ষেপতঃ'।

"তাসাংখল্বাসাং সদ্বিধানাং"

অনুবাদ। (১) সেই এই সদ্বিধা অর্থাৎ ভাবপদার্থের (মোক্ষোপযোগী) প্রকার গুলিরই (প্রমাণাদি ষোড়শ প্রকারের) উদ্দেশ করিতেছেন (নামকীর্ত্তন করিতেছেন।)

সূত্র। প্রমাণ প্রমেয় সংশয় প্রয়োজন দৃষ্টান্ত সিদ্ধান্তাবয়ব তর্ক নির্ণয় বাদ জল্প বিতণ্ডা হেত্বাভাস চ্ছল জাতি নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।১।

অনুবাদ। (১) প্রমাণ, (২) প্রমেয়, (৩) সংশয়, (৪) প্রয়োজন, (৫) দৃষ্টান্ত, (৬) সিদ্ধান্ত, (৭) অবয়ব, (৮) তর্ক, (৯) নির্ণয়, (১০) বাদ, (১১) জল্প, (১২) বিতণ্ডা, (১৩) হেত্বাভাস, (১৪) ছল, (১৫) জাতি, (১৬) নিগ্রহস্থান—এই ষোলটী পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান প্রযুক্ত নিঃশ্রেয়স লাভ হয়।

(১) "তাসাং খল্বাসাং সদ্বিধানাং" এই ভাষ্যসন্দর্ভের দ্বারা ভাষ্যকার মহর্ষি গোতমের প্রথমসূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ঐ ভাষ্যসন্দর্ভের পরে 'উদ্দেশঃ ক্রিয়তে" এই বাক্যের পূরণ করিতে হইবে। এইরূপ অধ্যাহার এই ভাষ্যে অনেক স্থানেই আছে। কোনস্থলে সূত্রের সহিত ভাষ্যের যোজনাও ভাষ্যকারের অভিপ্রেত থাকায় তাহাও করিতে হইবে। "সৎপদার্থও ষোড়শ প্রকারেই বলিবেন",—ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছেন। সৎপদার্থ অনেক থাকিলেও মোক্ষোপযোগী সৎপদার্থগুলিই ষোড়শ প্রকারে বলিবেন, ইহাই তাহার

দ্বারা বুঝিতে হইবে। তাই এখন "তাসাং খলু" এই কথার দ্বারা ভাষ্যকার তাহাই স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিলেন। "তসাং খলু" এই কথার ব্যাখ্যা তাসামেব। ঐ উৎশব্দের দ্বারা ভাষ্যকার মহর্ষি-বর্ণিত মোক্ষোপযোগী পদার্থগুলিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহা হইলে বুঝা গেল, সেই মোক্ষোপযোগী ভাবপদার্থের ষোলটী প্রকারই মহর্ষি বলিতেছেন, মোক্ষের অনুপযোগী পদার্থ তিনি বলেন নাই। মোক্ষোপযোগী সেই ভাবপদার্থের প্রকারগুলিও প্রথমসূত্রের দ্বারা এখনই জানাইতেছি, তাহারা দূরবর্ত্তী নহে—ইহাই জানাইবার জন্য আবার বলিয়াছেন "আসাং"।

ভাষ্য। নির্দ্দেশে যথাবচনং বিগ্রহঃ। সর্ব্বপদার্থপ্রধানোদ্বন্দ্বঃসমাসঃ। প্রমাণাদীনাং তত্ত্বমিতি শৈষিকী ষষ্ঠী। তত্ত্বস্যজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সস্যাধিগম ইতি-কর্ম্মণি ষষ্ঠ্যৌ। ত এতাবন্তো বিদ্যমানার্থাঃ। এষামবিপরীতজ্ঞানার্থমি-হোপদেশঃ। সোঽয়মনবয়েন তন্ত্রার্থ উদ্দিষ্টো বেদিতব্যঃ।

অনুবাদ। (১) নির্দ্দেশে অর্থাৎ (পরবর্ত্তী) প্রমাণাদিপদার্থের লক্ষণসূত্র বা বিভাগসূত্রে যেরূপ বচন (একবচন বহুবচন) আছে, তদনুসারে এস্থলে "বিগ্রহ" (এই সূত্রের সমাসার্থ-বোধক ব্যাসবাক্য) জানিবে। (২) সর্ব্বপদার্থ প্রধান দ্বন্দ্বসমাস জানিবে। (৩) প্রমাণাদীনাং তত্ত্বং এইস্থলে ষষ্ঠী বিভক্তি শৈষিকী অর্থাৎ শেষার্থে বিহিত। তত্ত্বস্য জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সস্য অধিগমঃ—এই দুই স্থলে দুই ষষ্ঠী বিভক্তি কর্ম্মকারকে বিহিত। সেই (মোক্ষোপযোগী) এতগুলি ভাব পদার্থ। ইহাদিগের তত্ত্বজ্ঞানের জন্য এই শাস্ত্রে উপদেশ হইয়াছে। সেই এই তন্ত্রার্থ অর্থাৎ মোক্ষোপযোগী ন্যায়শাস্ত্র প্রতিপাদ্য পদার্থ, সম্পূর্ণরূপে উদ্দিষ্ট হইয়াছে জানিবে।

(১) পদার্থের নামকীর্ত্তনকে উদ্দেশ বলে। স্বরূপকীর্ত্তন অর্থাৎ লক্ষণ এবং বিভাগ অর্থাৎ প্রকারভেদ কীর্ত্তনকে নির্দ্দেশ বলে। প্রমাণপদার্থের নির্দ্দেশে মহর্ষি প্রমাণগুলির পরস্পর নিরপেক্ষভাবে প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ প্রামাণ্য আছে, ইহা সূচনা করিবার জন্য "প্রমাণানি" এইরূপ বহুবচন প্রয়োগ করিয়াছেন। এবং আত্মাদি দ্বাদশ পদার্থকে প্রমেয় বলিলেও তাহারা প্রমেয়স্বরূপে এক—তাহাদের কোন একটীরও তত্ত্বজ্ঞান না হইলে প্রমেয় তত্ত্বজ্ঞান এবং তজ্জন্য মোক্ষলাভ হয় না—ইহা সূচনা করিবার জন্য প্রমেয় নির্দ্দেশে "প্রমেয়ং" এইরূপ একবচনের প্রয়োগ করিয়াছেন। এইরূপ অন্য পদার্থগুলির নির্দ্দেশেও অর্থবিশেষ সূচনার জন্য কোনস্থলে একবচন, কোনস্থলে বহুবচন প্রয়োগ করিয়াছেন। ভাষ্যকার বলিতেছেন নির্দ্দেশে যেখানে যেরূপ বচন প্রযুক্ত আছে উদ্দেশ ও নির্দ্দেশের একবাক্যতা বশতঃ উদ্দেশেও সেইরূপ বচন প্রয়োগপূর্ব্বক অর্থাৎ প্রমাণানিচ প্রমেয়ঞ্চ ইত্যাদিরূপে এই সূত্রে দ্বন্দ্বসমাসের ব্যাসবাক্য করিতে হইবে। ক্রমশঃ।

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

সাঙ্খ্য ও বেদান্ত।

তৃতীয় প্রস্তাব।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনি সাঙ্খ্যদর্শনের মতখণ্ডন বিষয়ে গত দুই দিন আমাকে অনেক গুলি যুক্তি বলিয়াছেন, ঐ সকল যুক্তি ও তর্ক আমার বেশ ভাল লাগিয়াছে। শেষের দিনে আপনি বলিলেন সাঙ্খ্যদর্শনের মতখণ্ডন বিষয়ে আরও অনেক যুক্তি-তর্ক আছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক আজ আমাকে সেই অবশিষ্ট যুক্তি ও তর্ক গুলি বলুন।

গুরু। বৎস! তোমাকে যেরূপ ভাবে বিস্তার করিয়া বলিতেছি, তাহাতে আজও যে অবশিষ্ট সকল যুক্তি ও তর্ক বলিয়া শেষ করিতে পারিব এরূপ মনে হয় না।

শিষ্য। তা বেশ, আজ যতগুলি যুক্তি-তর্ক বলিয়া বুঝাইতে আপনার সময়ে কুলায়, অনুগ্রহ করিয়া এখন আমাকে সেইগুলিই আস্তে আস্তে বুঝাইয়া বলুন, অবশিষ্ট গুলি না হয় আর একদিন শুনিব।

গুরু। তোমার অভিপ্রায় অনুসারে বলিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। সাঙ্খ্য-দর্শন-প্রণেতা মহর্ষি কপিল, সত্ত্ব, রজঃ এবং তমো নামক তিনটী গুণ আছে স্বীকার করেন। এই তিনটী গুণই বিভিন্ন স্বভাবের মৌলিক তিনটি পদার্থ। যে অবস্থাতে এই তিনটি গুণ সমভাবে বর্ত্তমান থাকে, ত্রিগুণের সেই অবস্থাকে তিনি প্রকৃতি বলিয়াছেন। সৃষ্টি করার জন্য অথবা প্রলয়ের সম্পাদন বিষয়ে, প্রকৃতির পরিচালক আর যে কেহ আছে, তাহা তিনি স্বীকার করেন না; এই প্রকৃতির চেতনা নাই, তিনি জড়। তাঁহার মতে যাঁহার চেতনা আছে তাঁহার নাম পুরুষ, তিনি উদাসীন, সুতরাং ক্রিয়ারহিত; পুরুষ প্রকৃতিকে সৃষ্টি করিতেও পারিচালনা করেন না; অথবা প্রকৃতি যে সময়ে প্রলয় করিয়া থাকেন, তাহারও পরিচালক পুরুষ নহেন; তিনি আকাশের মত ক্রিয়া রহিত হইয়া সকল সময়ে একভাবেই বর্ত্তমান রহিয়াছেন। অতএব প্রকৃতি বা প্রধান আর কাহারও সহায়তা না লইয়া স্বাধীন-ভাবে কোন সময়ে জগতের সৃষ্টি করিতেছেন, আবার কখনও বা জগতের প্রলয় করিয়া থাকেন। এইত হইল সৃষ্টি ও প্রলয় বিষয়ে সাঙ্খ্যদর্শন-প্রণেতা কপিলের মত। এবিষয়ে আমাদের প্রশ্ন এই—সাঙ্খ্যমতে প্রকৃতি অচেতন, তাহার চৈতন্য নাই, সুতরাং কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য এই দ্বিবিধ বিষয়ে যে বিবেচনার প্রয়োজন, সে বিবেচনাও প্রকৃতির নাই। তিনি স্বাধীন তাই সৃষ্টি অথবা প্রলয় ইত্যাদি যতগুলি কর্ত্তব্য বিষয় তাহার আছে, তাহার কোন বিষয়েও অপর কাহারও বিবেচনা তাহার প্রয়োজনীয় হয় না; প্রকৃতি স্বভাবতই সৃষ্টি ও প্রলয় এই দ্বিবিধ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। এইরূপই যদি প্রকৃতির স্বভাব হইল, তাহা হইলে মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব, শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র প্রভৃতি ত্রয়ো-বিংশতি প্রকার প্রকৃতির যে পরিণাম আছে, তাহা কোন সময়ে প্রকৃতি হইতে হইয়া থাকে

আর কোন সময়ে প্রকৃতি হইতে হয় না, এই যে দ্বিবিধ অবস্থা ইহার কারণ কি? প্রকৃতির প্রবৃত্তিই স্বভাব? অথবা নিবৃত্তিই স্বভাব? কিম্বা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ই প্রকৃতির স্বভাব? অচেতন প্রকৃতির যদি প্রবৃত্তিই স্বভাব হয়, তবে সকল সময়ে প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি হয় না কেন? আর যদি নিবৃত্তিই প্রকৃতির স্বভাব হয়, তবে সকল সময়ে প্রলয় হয়না কেন? অপর পক্ষে যদি প্রকৃতির উভয়বিধ স্বভাব বল, তবে একদা সৃষ্টি ও প্রলয় হয় না কেন? সেই প্রকৃতির নিয়ন্তা ত কোন বিবেচক ব্যক্তি নাই। আরও বলি,—যে যে স্থানে অচেতনের গতি দেখিতে পাওয়া যায়, সেই স্থানেই যে পর্য্যন্ত আর কোন পদার্থ অচেতনের গতির প্রতিকূল না হয়, সে পর্য্যন্ত অচেতন পদার্থ অবিরত চলিতে থাকে; ইহাই ত অচেতনের স্বভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই নিয়ম প্রকৃতির গতিতে নাই কেন? অতএব অচেতন প্রকৃতিই যে সৃষ্টি ও প্রলয় এই দ্বিবিধ কার্য্য সম্পাদন করেন, আর কাহারও সহায়তার অপেক্ষা করেন না, সাঙ্খ্যদর্শনকারের এবংবিধ যে মতবাদ তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। আমাদের বেদান্তদর্শনের মতে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর সৃষ্টি ও প্রলয় করিয়া থাকেন। কখন কি করিতে হইবে, কখন কি করিতে হইবে না, কোন জিনিষ প্রয়োজনীয়, কোন জিনিষ প্রয়োজনীয় নহে, কোন সময়ে সৃষ্টিকরা আবশ্যক, কোন সময়ে বা প্রলয় করা প্রয়োজনীয় ইত্যাদি সকল বিষয়ই পরমেশ্বর জানিতেছেন; সৃষ্টি করার শক্তিও পরমেশ্বরের আছে, প্রলয় ঘটাইবার সামর্থ্যও পরমেশ্বরের রহিয়াছে; যখন যাহা কর্ত্তব্য তাহাও তিনি বুঝিয়া করিতে পারেন, আর যখন যাহা করা উচিত নয় তাহাও তিনি বিবেচনা করিয়া নিবৃত্ত হইতে পারেন। অতএব সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান, যে পরমেশ্বর তিনিই যথাসময়ে জগতের সৃষ্টি এবং উপযুক্ত সময়ে জগতের প্রলয় করিয়া থাকেন; অচেতন প্রকৃতি যথা সময়ে জগতের সৃষ্টি বা প্রলয় করিতে পারেন না।

সাঙ্খ্যদর্শনকার কপিলমুনি জগতের আদিকারণ যে প্রকৃতি হইতে পারে, এবিষয়ে আর একটী উদাহরণ দেখাইয়া থাকেন এবং ঐ উদাহরণ দ্বারা তিনি বলিতে চান যে, সকল স্থলেই অচেতন পদার্থের পরিণামের প্রতি চেতন পদার্থের পরিচালনা আবশ্যক করে না, কোন কোন স্থানে অচেতন পদার্থেরও বিবিধ প্রকার পরিণাম স্বভাবতই হইয়া থাকে; অতএব জগতের আদি কারণ যে প্রকৃতি, তাহার যে পরিণাম, তাহাও স্বভাবতই হইয়া থাকে, ঐ পরিণাম বিষয়ে চেতন পদার্থের কোন রূপ পরিচালনা আবশ্যক করে না। তিনি বলেন তৃণজল প্রভৃতি গাভীগণের যে কিছু খাদ্য দ্রব্য আছে, ইহারা সকলেই অচেতন পদার্থ, ইহাদের মধ্যে কাহারও চৈতন্য নাই, গাভীগণ এই সকল বস্তু খাইলে এই তৃণজলাদি গোশরীরে প্রবেশ করে; গোশরীরে প্রবেশ করিয়া এই সকল তৃণ ও জল প্রভৃতি দুগ্ধ রূপে স্বভাবতই পরিণত হইয়া যায়। এই যে তৃণ জলাদির দুগ্ধ রূপে পরিণাম, ইহাতে কোন প্রকার চেতনের প্রেরণা আবশ্যক হয় না। কেন না তৃণজলাদি গোশরীরে প্রবেশ করিয়া দুগ্ধ রূপে যে পরিণত হইয়া থাকে, তাহা যদি স্বাভাবিক

না হইত এবং যদি ইহার অপর কোন কারণ থাকিত, আর সেই কারণ বশতই যদি তৃণাদির পরিণাম দুগ্ধ হইতে পারিত, তবে সেই সকল কারণ দ্বারা তৃণজলাদি হইতে যখন ইচ্ছা তখনইত দুগ্ধ প্রস্তুত করিতে পারা যাইত। তাহা যখন পারা যায় না, তৃণজলাদি হইতে অন্য কোন উপায় দ্বারা শত শত চেষ্টা করিয়াও যখন দুগ্ধ প্রস্তুত করিতে পারা যায় না, তখন তৃণাদির যে দুগ্ধ রূপে পরিণাম তাহা স্বভাবতই হইয়া থাকে বলিতে হইবে; চেতন মনুষ্যগণের চেষ্টা হইতে তাহা হয় না। এই তৃণাদির দুগ্ধ রূপে পরিণাম যেরূপ স্বাভাবিক, জগতের আকারে প্রকৃতির যে পরিণাম, তাহাও সেইরূপ স্বাভাবিক। সাঙ্খ্যদর্শন প্রণেতার এবংবিধ যুক্তি ও তর্কের প্রত্যুত্তরে আমরা বলি যে তৃণজলাদি দুগ্ধ রূপে স্বভাবতই পরিণত হইয়া থাকে, অপর কোন কারণ বশতঃ হয় না—একথা যদি যুক্তি দ্বারা স্থির হইতে পারিত, অথবা আমরা স্বীকার করিতাম, তবেই সাঙ্খ্যকার বলিতে পারিতেন যে "তৃণাদির মত প্রকৃতিরও স্বভাবতঃ পরিণাম হইয়া থাকে"। তৃণ জল প্রভৃতির পরিণামে যে দুগ্ধ হয়, তাহা যে স্বভাবতঃ চেতনের সাহায্য ব্যতীত হইয়া থাকে এ কথাও আমরা স্বীকার করিনা; বিশেষতঃ যুক্তিদ্বারাও তাহা স্থির হইতে পারে না; তৃণজলাদি হইতে যে দুগ্ধ হয় তাহাতে অপর একটী বিশেষ কারণই যে রহিয়াছে। যদি বল সেই কারণ দ্বারা অন্যান্য স্থলে তৃণাদি হইতে দুগ্ধ প্রস্তুত হয় না কেন? তাহার উত্তরে আমরা বলি যে অপরাপর স্থলে তৃণাদি হইতে দুগ্ধ প্রস্তুত হওয়ারত কারণ নাই, কেন না চেতন গাভীগণের যে শরীর, তাহাই তৃণজলাদি হইতে দুগ্ধ হওয়ার প্রধান কারণ। সেই প্রধান কারণ অন্যান্যস্থলে বিদ্যমান থাকে না, তাই তৃণজলাদি অপরাপর স্থলে দুগ্ধ-রূপে পরিণত হইতে পারে না। যদি গোশরীরে প্রবেশ করিয়াই তৃণজলাদি স্বভাবতঃই দুগ্ধরূপে পরিণত হইতে পারিত, তবে ঐ তৃণজলাদি আহার দ্বারা বৃষগণের শরীরে প্রবেশ করিয়াও দুগ্ধরূপে পরিণত হয় না কেন? বিশেষতঃ যদি এই পরিণাম স্বভাবতঃই হইত, চেতন গাভীগণের শরীর যদি বিশেষ কারণ না হইত, তবে ধেনুগণের শরীরে প্রবেশ না করিয়াও অপরাপর স্থলে তৃণজলাদি স্বভাবতঃই দুগ্ধরূপে পরিণত হয় না কেন? মনুষ্যগণ যে কার্য্য করিতে পারে না, তাহারই যে চেতন কারণ নাই এ কথাও বলা চলে না, কেননা, বেদান্ত-দর্শনকার বলিতেছেন, জগতের কতকগুলি কার্য্য যেরূপ চেতন মনুষ্যগণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ জগতের অপর কতকগুলি কার্য্য চেতন পরমেশ্বরও করিতেছেন; গাভীগণ-ভুক্ত তৃণজলাদি হইতে দুগ্ধের যে পরিণাম হইয়া থাকে তাহাও পরমেশ্বরই সম্পাদন করিয়া থাকেন। সুতরাং তৃণজলাদির পরিমাণ যে দুগ্ধ তাহাত' স্বভাবতঃ হয় না। আরও বলি মানবগণের চেষ্টা দুগ্ধের উৎপত্তি বিষয়ে যে কোনরূপ কারণ হইতে পারে না, তাহাও বলা চলে না, কেননা দুগ্ধ প্রচুর পরিণামে হইবে এই জন্যই কি গাভীগণের পুষ্টিকর খাদ্য প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হয় না? এবং যাহারা প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য গাভীগণকে দিয়া থাকেন তাহারা কি গাভীর দুগ্ধ

প্রচুর পরিমাণে পান না? অতএব তৃণজলাদির পরিণাম যে দুগ্ধ তাহাও যেরূপ স্বাভাবিক হয় না, সেইরূপ প্রকৃতির পরিণামও স্বভাবতঃ হইতে পারে না।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার যুক্তিগুলি শুনিয়া আমার বড়ই ভাল লাগিতেছে তাই আমার এখন ইহার বিরুদ্ধে কোনরূপ আর তর্ক করিতে ইচ্ছা হইতেছে না। আরও কতকগুলি যুক্তি যাহা সাঙ্খ্য-দর্শনের মতের বিরুদ্ধে রহিয়াছে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা আমাকে বলুন।

গুরু। বৎস! সাঙ্খ্যদর্শন প্রণেতা বলিয়া থাকেন যে,—"অচেতন প্রকৃতিই জগতের সৃষ্টি করেন, জগতের সৃষ্টি বিষয়ে তাহার যে প্রবৃত্তি তাহাও স্বাধীনভাবে হইয়া থাকে, ঐ প্রবৃত্তির প্রতি চেতনের কোনরূপ পরিচালনা নাই"। তাঁহাদের এবংবিধ মতবাদ যে যুক্তিযুক্ত নহে, তাহা তোমাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়াছি, উক্ত বিষয়ে তাঁহারা যে সকল উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া যুক্তি দিয়া থাকেন, সেই সকল উদাহরণ ও যুক্তি যে সঙ্গত হইতে পারে না, তাহাও তোমাকে বলিযাছি। সুতরাং প্রকৃতির যে প্রবৃত্তি বা পরিণাম তাহা যে স্বভাবতঃ হইতে পারে না, ইহাই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এখন তোমাকে সাঙ্খ্যদর্শন প্রণেতার মতে আর যে সকল অযৌক্তিক কথা আছে তাহা বলিতেছি। "প্রকৃতির যে পরিণাম তাহা স্বভাবতঃই হইয়া থাকে"—সাঙ্খ্যদর্শন প্রণেতার এই যে মতবাদ ইহা যদি আমরা মানিয়াও লই, তবুও তাঁহার মতে যে যে দোষ হইতে পারে, যে সকল যুক্তিবিহীন কথা মানিতে হয়, এখন তাহাই তোমাকে বলিব। স্বীকার করিলাম,—প্রকৃতির যে প্রবৃত্তি বা পরিণাম, তাহা স্বাভাবতঃ হইয়া থাকে, আর কোন কারণের অপেক্ষা করে না, কেহ প্রকৃতির এই পরিণাম বিষয়ে সহকারী কারণ হয় না; প্রকৃতির পরিণাম বিষয়ে অন্য কিছুর অপেক্ষা নাই ;—ইহাই যদি সাঙ্খ্যদর্শনের সিদ্ধান্ত হয়, তবে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে প্রকৃতির এই পরিণামের প্রতি কোনরূপ প্রয়োজন আছে কি না? যদি বলেন প্রয়োজন আছে, প্রকৃতির পরিণাম বিনা প্রয়োজনে হয় না, তাহা হইলে স্বভাবতই প্রকৃতির পরিণাম হয় একথা কিরূপে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? যে প্রয়োজনে প্রকৃতির পরিণাম হইয়া থাকে, সেই প্রযোজনই ত প্রকৃতির পরিণামের প্রতি কারণ হইতে পারে? প্রকৃতির পরিণাম তবে স্বভাবতঃ হইল কৈ? যে কাজের কোন উদ্দেশ্য থাকে—প্রয়োজন থাকে, তাহাকে স্বাভাবিক বলা যায় কি? আর যদি বলেন প্রকৃতির পরিণামের প্রতি কোনরূপ প্রয়োজন নাই, তাহা হইলে সাঙ্খ্যদর্শনকার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা ত ঠিক থাকিল না। কেন না সাঙ্খ্য দর্শনকার বলিয়া থাকেন পুরুষ বা আত্মা সংসারে যে সকল ভোগ করিয়া থাকেন, তাহা এবং পুরুষের মুক্তি, এই দুইটীই প্রকৃতির পরিণামের প্রয়োজন।

শিষ্য। সাঙ্খ্যদর্শনকার যদি বলেন প্রকৃতির পরিণামের প্রতি সহকারী অপর কোন কারণ নাই, এই জন্যই পরিণাম স্বাভাবিক হইয়া থাকে বলা হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতির

পরিণামের প্রতি কোন প্রয়োজন যে থাকে না ইহা ত আমরা স্বীকার করি না ; তাঁহার এই কথায় আপনারা কি বলিবেন ?

গুরু। প্রকৃতির পরিণামের প্রতি প্রয়োজন আছে একথা স্বীকার করিলে, প্রকৃতির পরিণাম যে স্বাভাবিক হইতে পারে না, তাহা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি ; এখন আরও যে সকল দোষ হইতে পারে তাহা তোমাকে বলিতেছি। সাঙ্খ্যকার প্রকৃতির পরিণামের প্রয়োজন আছে স্বীকার করিলে আমরা জানিতে চাই যে,—সে প্রয়োজন কি ? প্রকৃতির পরিণাম বিষয়ে পুরুষের ভোগ প্রয়োজন ? না পুরুষের মুক্তি প্রয়োজন ? অথবা পুরুষের ভোগ ও মুক্তি উভয়ই প্রয়োজন ? যদি বল প্রকৃতির প্রবৃত্তি বিষয়ে পুরুষের ভোগই প্রয়োজন, তাহা হইলে বলিতে হইবে সাঙ্খ্যদর্শনকারের মতে পুরুষের ভোগ কিরূপ ? এবং সেই ভোগ কিরূপেই বা সম্ভব হইতে পারে ? যিনি কূটস্থ নিত্য, সর্ব্বদা যিনি একভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন, যাহার উপচয়, অপচয় প্রভৃতি, কোনরূপ অবস্থান্তর কোন কালেই হয় না, অথবা হইতে পারে না, যাহাতে গুণ ও ক্রিয়া কখনও দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া যিনি নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়, তাহার আবার ভোগ কি ? ভোগ বলিলেই ত অবস্থান্তর আসিয়া পড়ে। যে সময়ে পুরুষের ভোগ থাকে না তখনও তাহার যে অবস্থা, আর যখন পুরুষের ভোগ হইতে থাকে তখনও তাহার সেই অবস্থা, অবস্থা বিষয়ে পুরুষের কোনরূপ অতিশয় বা বিসদৃশ ভাব নাই। ইহাই যদি সাঙ্খ্য মতের সিদ্ধান্ত হয়, তবে পুরুষের যে ভোগ হইয়া থাকে তাহা কিরূপে বুঝিতে পারি ? তর্কস্থলে যদিও পুরুষের অনির্ব্বচনীয় কোনরূপ ভোগ স্বীকারও করা যায়, তাহা হইলেও সাঙ্খ্যদর্শনকারের মত যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না ; কেননা প্রকৃতির যাহা প্রয়োজন, সেই বিষয়েই তাহার প্রবৃত্তি হইবে, প্রকৃতির পরিণামের প্রতি পুরুষের ভোগই প্রয়োজন, সেই ভোগ বিষয়েই প্রকৃতির প্রবৃত্তি হইতে পারে ; মুক্তি বিষয়ে প্রকৃতির প্রবৃত্তি হইবে কেন ? সুতরাং ভোগের জন্য—কেবল ভোগের জন্যই যদি প্রকৃতির পরিণাম হয় তাহা হইলে পুরুষের মুক্তি হইতে পারে না। আর যদি বল প্রকৃতির পরিণামের প্রতি পুরুষের মুক্তিই প্রয়োজন, তাহা হইলেও জিজ্ঞাসা করি,—পুরুষের মুক্তির জন্য প্রকৃতির পরিণাম আবশ্যক হইবে কেন ? মুক্তি হইলে পুরুষের যে অবস্থা হইয়া থাকে, প্রকৃতির পরিণামের পূর্ব্বেইত পুরুষের সেই অবস্থা সততই রহিয়াছে, তাহার জন্য আবার প্রকৃতির পরিণাম হইবে কেন ? পাঁক ধোয়ার জন্য কেহ শরীরে পাঁক মাখিয়া থাকে কি ? আরও বলি পুরুষের মুক্তিই যখন প্রকৃতির পরিণামের প্রয়োজন, তখন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস প্রভৃতি যে সকল বিষয় সংসারাবস্থায় পুরুষের উপভোগ্য রহিয়াছে, পুরুষ যাহা উপভোগ করিয়া থাকেন তাহাও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না ; কেন না পুরুষের ভোগ সম্পাদন করাত প্রকৃতির প্রয়োজন নহে। পুরুষত সর্ব্বদাই বিশুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ রহিয়াছেন, তাহার আবার কর্ম্ম, জ্ঞান, বা কামনা হওয়ার প্রতি কোন কারণ আছে কি ? সুতরাং কেবল মুক্তির জন্যও প্রকৃতির পরিণাম হইতে পারে না। এখন যদি বল

প্রকৃতির পরিণামের প্রতি পুরুষের ভোগ ও মুক্তি এই উভয়ই প্রয়োজন; তাহা হইলেও প্রকৃতির পরিণামের প্রয়োজন পুরুষের মুক্তি হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে; কেন না প্রকৃতির পরিণাম না হইলেইত পুরুষের মুক্তি স্বতঃসিদ্ধ রহিয়াছে, তাঁহার জন্য প্রকৃতির পরিণাম প্রয়োজনীয় হইতে পারে কি? আর প্রকৃতির পরিণামের অন্যতর প্রয়োজন যে ভোগ সেই পক্ষে বক্তব্য এই যে প্রকৃতির কোন একটী বিষয় ভোগ করিলেই যদি পুরুষের মুক্তি হইতে পারে তবে যে কোন একটি শব্দাদি বিষয় উপভোগ করিলেই ত পুরুষ মুক্ত হইয়া যান, সুতরাং মোক্ষ অযত্নসাধ্য হইয়া পড়ে। আর যদি বল প্রকৃতির বিষয় যতগুলি আছে তাহা নিঃশেষরূপে ভোগ না করিয়া পুরুষ মুক্ত হইতে পারে না, তাহা হইলে ত পুরুষের মুক্তি সম্ভবই হইতে পারে না; কেন না প্রকৃতি অনন্ত ও অসীম, তাহার বিষয়ও অনন্ত ও অসীম, সুতরাং পুরুষের ভোগও অনন্ত ও অসীম হইতে হইবে; তবে আর পুরুষের মুক্ত হইল কৈ? অতএব পুরুষের ভোগ ও মুক্তি এই উভয়ও প্রকৃতির পরিণামের প্রয়োজন হইতে পারে না। যদি বল প্রকৃতির পরিণামের প্রতি ঔৎসুক্য বা ইচ্ছা বিশেষের যে নিবৃত্তি তাহাই প্রয়োজন, আর কোন প্রয়োজন নাই। তাহা হইলেও জিজ্ঞাসা করি—এই ঔৎসুক্য কাহার? যে ঔৎসুক্যের বিনাশ হইলে প্রকৃতির পরিণাম থাকিবে না, সেই ঔৎসুক্য প্রকৃতির? না পুরুষের? সাঙ্খ্যদর্শনের মতে ইহাদের মধ্যে কোনও একটীরও ত ঔৎসুক্য থাকিতে পারে না, যাহার নিবৃত্তি প্রকৃতির পরিণামের প্রয়োজন হইবে। কেন না প্রকৃতি অচেতন, তাহার আবার ঔৎসুক্য কি? অচেতন পদার্থের ইচ্ছা হওয়া সম্ভব হইতে পারে কি? পাহাড়ের ইচ্ছা হওয়া কোথাও কেহ শুনিয়াছে কি? অতএব ঔৎসুক্য প্রকৃতির নহে। আর পুরুষ ত নির্গুণ, নির্লিপ্ত ও নির্ম্মল, তাহারই বা ইচ্ছা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? ইচ্ছা থাকিলেই ত বিকার থাকিয়া যায়, গুণ আসিয়া পড়ে। সুতরাং প্রকৃতির পরিণামের প্রতি ঔৎসুক্য-নিবৃত্তিও প্রয়োজন হইতে পারে না।

শিষ্য। সাঙ্খ্যমতে যাহাকে পুরুষ বলে তিনি দৃক্‌শক্তি বা জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন; যদি কোন প্রকার জ্ঞেয় পদার্থ না থাকে, তাহা হইলে পুরুষের সেই জ্ঞানশক্তির কোনরূপ প্রয়োজন থাকে না; আর সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিরও সৃষ্টিশক্তি রহিয়াছে, সৃষ্টির কোন বিষয় না থাকিলে তাহার সৃষ্টিশক্তিও প্রয়োজন বিহীন হইয়া যায়; তাই পুরুষের জ্ঞানশক্তি আর প্রকৃতির সৃষ্টিশক্তি যাহাতে নিরর্থক না হয়, উভয়ের উভয়বিধ শক্তি যাহাতে বিফল হইতে না পারে, এই জন্যই কি প্রকৃতির পরিণাম হয় না? আর প্রকৃতির পরিণামের এই প্রকার কারণ বলিলেই বা আপনাদের কোন প্রকার আপত্তি থাকে কি?

গুরু। পুরুষের দৃক্‌শক্তি আর প্রকৃতির সৃষ্টিশক্তি এই উভয়কে সফল করাই যদি

প্রকৃতির পরিণামের প্রয়োজন হয়, তবুও সাঙ্খ্যদর্শনের মত দোষবিহীন হইতে পারিল না; কেননা প্রকৃতির আদি বা উৎপত্তি অথবা বিনাশ কিছুই নাই, তাই প্রকৃতি অনাদি ও অনন্ত, সুতরাং তিনি নিত্য, অতএব তাহার সৃষ্টিশক্তিও অনাদি কাল হইতে আছে এবং অনন্ত কাল পর্য্যন্ত থাকিবে; আর আদি বা সৃষ্টি, অন্ত বা বিনাশ এই উভয়বিধ অবস্থা না থাকায় পুরুষও অনাদি ও অনন্ত, অতএব নিত্য; সুতরাং তাঁহার দর্শনশক্তিও অনাদি কাল হইতে বিদ্যমান আছে এবং অনন্ত কাল পর্য্যন্ত থাকিবে; এই উভয়বিধ সৃষ্টিশক্তি ও দর্শনশক্তির মধ্যে কোন একটী শক্তির বিনাশ না হইলে, সৃষ্টির বিনাশ বা সংসারের উচ্ছেদ ত হইতে পারে না; আর এই উভয়বিধ শক্তি অনাদি ও অনন্ত বলিয়া প্রকৃতির পরিণামও ত অনাদি কাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিয়া যাইবে; তাহা হইলে পুরুষের মুক্তি হওয়া সম্ভব হইতে পারে কি? অনন্তকালই যদি দৃকশক্তি ও সৃষ্টি-শক্তি থাকিতে পারিল, তবে প্রকৃতির পরিণাম অনন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিবে না কেন? আর অনন্তকালই যদি প্রকৃতির পরিণাম চলিতে থাকিল, তবে পুরুষের সংসার অনন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিবে না কেন? সুতরাং সাঙ্খ্যদর্শনের মতে পুরুষের মুক্তি হওয়া অসম্ভব নয় কি?; অতএব "পুরুষের প্রয়োজন জন্য প্রকৃতির পরিণাম হইয়া থাকে" সাঙ্খ্যদর্শনকারের এই যে সিদ্ধান্ত ইহা কোন প্রকারেই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং জড় প্রকৃতি জগতের আদি কারণ নহে—সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বশক্তিমান্, চেতন যে পরমেশ্বর তিনিই জগতের আদি কারণ। এ বিষয়ে আর যে সকল যুক্তি থাকিল, তাহা আর একদিন বলিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রসন্নকুমার বেদান্ততীর্থ, বিদ্যালঙ্কার,
কাব্যতীর্থ, বেদান্তভূষণ, বিদ্যাবিনোদ সাঙ্খ্যরত্ন।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

তত্ত্ব-সভা-সম্মিলন।—গত ২২শে হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় দিবস তত্ত্ব-সভা-সম্মিলনের অষ্টাত্রিংশত্তম বার্ষিক অধিবেশন কাশীধামে মহাসমারোহে নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ এবং ইউরোপ, আমেরিকা আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি পৃথিবীর নানাস্থান হইতে সমাগত প্রায় ৬০০ প্রতিনিধি ও ২০০০ দর্শকবর্গের মিলনে সম্মিলন অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। সভাস্থলে অ্যানি বেসান্ত মহোদয়ার উপস্থিতি সকলের আনন্দ-বর্দ্ধক হইয়াছিল। তাঁহার প্রতি সমবেত ব্যক্তিগণের একযোগে সাগ্রহ, সাদর সম্বর্দ্ধনা প্রদর্শন একটী সুন্দর প্রীতিকর দৃশ্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছিল। বিশেষতঃ যোগল-

সরাই, বেনারস ক্যান্টনমেণ্ট প্রভৃতি ষ্টেসনসমূহে উদ্যমশীল উৎসাহোৎফুল্ল, শোভন, পুষ্পমালাধারী, ছাত্রবৃন্দের সরল-হৃদয়োত্থিত স্বাভাবিক সম্মানপ্রদর্শনের দৃশ্য আরও চমৎকার হইয়াছিল। এত আনন্দের উপর কিন্তু একটী কারণে উপস্থিত ব্যক্তিগণের আশাভঙ্গ হইয়াছিল। বিশেষ কারণে অ্যানি বেসান্ত মহোদয়া দুই দিন পূর্ব্বে কাশী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়াতে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট চারিটি বক্তৃতা তিনটিতে সংকুচিত করিতে হইয়াছিল। আধুনিক জাতিভেদ প্রথার সম্বন্ধে বেসান্ত মহোদয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা অবশ্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রাহ্য হইতে পারে না, কিন্তু তাহাতে অনেকেই সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ তদনুসারে কার্য্য করিতে উদ্যোগী আছেন। তাঁহার "সম্মিলিত ভারত" সম্বন্ধে বক্তৃতা কিন্তু, সকলেরই চিত্তাকর্ষক ও উত্তেজক হইয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতার শেষাংশ শ্রবণ করিয়া কেহই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। এই সম্মিলনের সম্পূর্ণ বিবরণী এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

নূতন সংবাদপত্র।—গত ২রা জানুয়ারি তারিখ হইতে মান্দ্রাজ হইতে "কমন উইল" (Common Weal) নামে একখানি নূতন সাপ্তাহিক ইংরাজী সংবাদপত্র নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইতেছে। অ্যানি বেশান্ত মহোদয়া এই পত্রের সম্পাদিকার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ভগবানের নামে যাহাতে পৃথিবীতে সত্য ও সুন্দরের সুসংস্কৃত নবযুগ প্রবর্ত্তিত হয়—এ সংবাদপত্রের ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহাতে ধর্ম্মনীতি, শিক্ষানীতি, সমাজ নীতি ও রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশিত হইবে এবং তাহাদের সামঞ্জস্যে সত্য আবিষ্কার করাই এ পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষে ইহার বার্ষিক মূল্য সডাক ৬৲ ছয় টাকা এবং ষান্মাসিক ৩॥০ সাড়ে তিন টাকা। "কমন উইলের" কার্য্যাধ্যক্ষ Care of T. P. H. আদয়ার, মান্দ্রাজ এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে সমস্ত বিষয় অবগত হওয়া যায়। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই নূতন সংবাদ পত্রের দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

প্রবন্ধাধিক্য।—দেশকালোপযোগী প্রবন্ধ বাহুল্যবশতঃ পূর্ব্ব প্রাপ্ত কয়েকটি প্রবন্ধ এবারও আমরা মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। তজ্জন্য আশা করি, লেখক মহোদয়গণ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। আমরা সুবিধামত ঐ প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত করিব।

সাগর-সঙ্গীত।—সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস প্রণীত এই বহুচিত্র শোভিত কাব্য গ্রন্থখানি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আগামীবারে আমরা ইহার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

ব্রহ্মবিদ্যা

২য় বর্ষ।] ফাল্গুন, ১৩২০। [১১শ সংখ্যা।

আকাশ।

ভাস ভাস এ নয়নে দিবস যামিনী ধরি',
যেন কা'র কি আভাসে সতত র'য়েছ ভরি';
হেরিলে হরে যে ভাষা,
হৃদয়ে ভরে কি আশা,
মরমের যত কথা যেন হোথা আছে লেখা,
নিশিদিন চাহি যা'রে, যেন তা'রে যায় দেখা।

তোমারে হেরিলে মনে নির্ব্বাক্ লহরী ওঠে,
ধূলার আসন ছেড়ে মানস কোথায় ছোটে!
যেথা ধূলা মলা নাই,
যেথা জ্যোতি চিরস্থায়ী,
যেথায় কুসুমকুল অম্লান সরস সদা,
যেথা গন্ধ মকরন্দ বিলয় না পায় কদা,

যেথা রবি শশী তারা পথে পথে খেলা করে,
অনন্ত কৌমাররঙ্গে, অক্ষয় প্রমোদভরে,
যেথা বায়ু মহাযন্ত্রে
প্রাণময় তন্ত্রে তন্ত্রে
মহাগীতে ভরিতেছে মহান্ অঙ্গন কা'র,
অনন্ত উৎসব হয় কি অনন্ত প্রতিমার!

কত উচ্চে, হে উদার, তোমার ও রঙ্গস্থল ;
কত তুচ্ছ মহী'পরে ও উন্নত হিমাচল !
শিখর শিখর 'পরে
যেন তোমা' স্পর্শ করে,
উঠিলে শিখরে কিন্তু বুঝি তুমি কত দূরে ;
ভূতলে, অচলশিরে, স্পর্শাতীত মায়াপুরে !

ভাস ভাস এ নয়নে ওই মায়ারূপ ধরি,
সেই চিরনব দৃশ্যে ওই দৃশ্যপট ভরি' ;
সেই উভ সন্ধ্যাবেলা
বসাও ত্রিদিব মেলা,
সেই মুক্ত দ্বিপ্রহরে রঙ্গালয় সীমা হ'তে
নীরব বীণার রব আসুক অনন্ত পথে।

সেই যামিনীর ছায়ে অসীমের নিত্য রাস ;
যেন বনফুলে বন ভরা আছে বারমাস ;
মধ্যে মন্দাকিনীধারা
বহিতেছে সীমাহারা,
পূব হ'তে পূবান্তরে, পুলকিত পথে পথে,
কুমুদ কহ্লার কত ফুটি'ছে সলিল হ'তে।

সেই স্বচ্ছ বক্ষভরা শারদ নীরদরাশি,
অঙ্গে অঙ্গে উছলিত শারদ কৌমুদী হাসি,
ত্রিদিব বরণ ঘটা,
রজত-কাঞ্চন-ছটা,
মহেন্দ্র-মন্দিরে যেন অলিন্দের ইন্দ্রনীল,
ধরিত্রীর ধ্যানপীঠ সুপবিত্র অনাবিল।

ভাস ভাস আমার সে বাসনার বেশ ধরি'
যদিও অচিন্ত্য ইচ্ছা উল্লাস নিয়েছে হরি',
তবু সেই আকর্ষণ
এখন(ও) বাঁধিছে মন,
হৃদয়ের খেলা গেছে, আছে ভরা ভালবাসা,
ক্ষণিকের মোহ ভেঙ্গে আসিয়াছে চির-আশা।

আজি জীবনের ধারা শিখরে শিখরে আর
আবেগ-মুখর স্রোতে কল্লোল করে না তার ;
আজি সিন্ধু সন্নিকটে,
ঘেরা শ্যাম উভতটে,
সলিল ধ'রেছে শান্ত প্রান্তরের প্রতিচ্ছায়া,
অনন্ত নীলিমামুগ্ধ ধ্যানমগ্ন স্তব্ধকায়া।

আশৈশব ওইখানে খুঁজেছি আকুল মনে,
সে শৈশবে হারায়েছি জীবনের যেই ধনে ;
তুমি সে হারান হাসি,
জুড়ান সে স্নেহরাশি,
জড়াইয়া রাখিয়াছ হাসিমাখা নীলিমায় ;
ঘুমান সে সহোদরে জাগায়েছ তারকায়।

তা'র পর, জীবনের তরুমাঝে, পুনরায়
কত খদ্যোতের আলো জ্বলিল নিভিল হায় ;
আর ত' তা' স্ফুরিবে না,
সেদিন ত' ফিরিবে না,
তুমি যেন ক্ষণে ক্ষণে তারকাকণার ভাসে
আমার সে আলোকণা দেখাইছ ও আবাসে।

আজি শুধু স্মৃতি নও সেই প্রিয় অতীতের ;
অতীতের ভাষ্যে ভরা মূল সূত্র ভবিষ্যের ;
আজি দেখাইছ তা'রে,
যে ও ছায়াপথ পারে
আলোকিত করিতেছে জীবনের ছায়াপথ ;
সুখদুঃখে শুধু যা'র অচিন্ত্য কি মনোরথ !

আজি মিলে গেছে নীলে আমার সে শশী তারা,
শীতল ক'রেছে হৃদি নয়নের নীরধারা ;
রাখিও সে ব্যোমমাঝে,
য'দিন বুদ্বুদ সাজে
থাকিব এ সিন্ধু 'পরে ; তার পর সব তুমি—
বিরহিত, বিলীনের চির মিলনের তুমি।

হে ঊর্দ্ধের নীলসিন্ধু! উদয়াস্ত উভঘাটে
কত সূর্য্য উঠিতেছে, কত সূর্য্য বসে পাটে;
কিন্তু, আঁধারের কোলে
ঝড়ে যবে তরী দোলে,
যবে সিন্ধুমাঝে কাঁপে শত পান্থ পথহারা,
পথ দেখাইতে থাকে শুধু তব ধ্রুবতারা।

বিষাদ-বারিধিমাঝে জ্ঞানরবি ডুবে যায়,
কর্ম্মের সুধাংশু ছবি অবসাদে ক্ষয় পায়,
শুধু দূরমেরু হ'তে
ভাসে অন্ধকার পথে
ভকতির ধ্রুবতারা, করুণার রশ্মি ল'য়ে;
শুধু অহেতুকী আশা ভাসে শূন্যে সেতু হ'য়ে।

কত কথা ওইখানে, কত আশা ঢাকা আছে!
কতদূরে নয়নের, হৃদয়ের কত কাছে!
এস এস এ হৃদয়ে
সেই গুপ্ত আশা ল'য়ে,
অবিমুখ করুণার মূকভাষা শুনাইয়ে,
এ মহান্ আঁধারের ধ্রুবতারা দেখাইয়ে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র।

তুমি এস।

১

অনন্ত শকতি তব
নাহি অন্ত দেখি তার।
ভূলোকে দ্যুলোকে সব
তুমি এক সারাৎসার॥

২

তোমারি মহিমা করে
ঘোষণা দাঁড়ায়ে যত।
মহান গগনতলে
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ শত॥

৩

প্রভাতের সূর্য্য জাগে
মঙ্গল তোমারি গানে।
তেমনি মধুর ডাকে
জাগাও আমার প্রাণে॥

৪

মহান পুরাণ তুমি
অবাক হইয়া দেখি।
হেথা ক্ষুদ্র নর আমি—
অপরূপ রূপ একি॥

৫

জানি না কেমন করে
তোমায় ডাকিতে হবে।
তুমি না শিখালে পরে
কে আর শিখাবে তবে॥

৬

ডাকিতে শিখেছি শুধু
এস এস এস বলে।
থাক হে পরাণ বঁধু
সকল হৃদয় ভরে॥

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চৈতন্য কথা।

শ্রীরূপের শিক্ষা।

রাগানুগা ভক্তির বিশেষ তত্ত্ব জানিবার জন্য রূপগোস্বামীর শিক্ষা, সনাতন গোস্বামীর শিক্ষা ও রামানন্দ রায়ের সহিত কথোপকথন, এই তিনটি বিষয় বিশেষ রূপে পর্য্যালোচনা করিতে হয়।

এইরূপে দশদিন প্রয়াগে রহিয়া। শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া॥

শুদ্ধ ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন। অতএব শুদ্ধ ভক্তির কহিয়ে লক্ষণ॥

শুদ্ধ ভক্তিতে, স্বধর্ম্ম নাই, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম নাই, জ্ঞান নাই। এই জন্য এই ভক্তির নাম শুদ্ধ ভক্তি। এই ভক্তি অনুরাগাত্মক। অনুরাগ গাঢ় হইয়া ক্রমে প্রেম-রূপ স্থায়ী ভাবে পর্য্যবসিত হয়।

অন্যবাঞ্ছা অন্যপূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম্ম। আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলন॥

'অন্য বাঞ্ছা'—এক কৃষ্ণভিন্ন অন্য বাঞ্ছা একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। অনন্যমনা হইয়া কৃষ্ণকে ভজনা করিতে হইবে।

"অন্যপূজা"—কেবল মাত্র কৃষ্ণেরই পূজা করিতে হইবে। অন্য দেব দেবীর যথেষ্ট সম্মান করিবে। কিন্তু মনে মনে এই ভাবিবে যে, সকল দেবদেবীই কৃষ্ণের অন্তর্গত। এক কৃষ্ণকে পূজা করিলেই, সকল দেবদেবীর পূজা করা হইল। যদি অন্য কোন দেব-দেবীর পূজা দেখা যায়, তবে মনে ভাবিতে হইবে যে, সেই দেব-দেবীর দ্বারে কৃষ্ণেরই পূজা হইতেছে।

"ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম"—কৃষ্ণবিমুখ জ্ঞান,—যেমন মায়াবাদ—কৃষ্ণে ঐকান্তিক ভক্তির বিরোধী। সহস্র সহস্র জ্ঞানীর মধ্যে কদাচিৎ কেহ কৃষ্ণভক্ত হয়। প্রথমে জ্ঞানের অধিকার জন্মে, তাহার পর কৃষ্ণভক্তির অধিকার। যতদিন পর্য্যন্ত ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তি হৃদয়ে স্থান না পায়, ততদিন পর্য্যন্ত জ্ঞাননিষ্ঠা থাকিতে পারে। হৃদয় কৃষ্ণভক্তিতে সরস হইলে, শুদ্ধ জ্ঞান স্বতঃ তিরোহিত হয়। শুদ্ধ ভক্তির পথে পথিক হইতে হইলে, জ্ঞান মার্গ ছাড়িয়া দিতে হয়।

সেই রূপ 'কর্ম্ম'। কৃষ্ণনাম গ্রহণই সকল কর্ম্মের সার। কর্ম্মের ফল দুরিত-ক্ষয় ও মনের নির্ম্মলতা। একান্ত ভক্তিতে কৃষ্ণনাম করিলেও এই ফল লাভ হয়। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ভেদমূলক। সেই ভেদের পঙ্কিল সলিলে মন বিক্ষিপ্ত ও মলিন হইতে পারে। নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মও কিয়ৎ কালের জন্য মনকে কৃষ্ণচিন্তা হইতে বিরত রাখে। কিন্তু যতদিন জীব একবারে অন্তর্মুখ হইতে না পারে, ততদিন তাহাকে কর্ম্ম করিতে হয়। সে কর্ম্ম কৃষ্ণের কর্ম্ম, কৃষ্ণের সেবা—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পরিচর্য্যা, অর্চ্চন, বন্দন ও দাস্য। পূর্ব্বেই

বলিয়াছি, সর্ব্বঘটে কৃষ্ণকে দেখা এবং সকল জীবকে কৃষ্ণের অংশ বলিয়া আদর ও সৎকার করা দাস্যের প্রধান অঙ্গ।

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহু মানয়ন্। ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি॥ ভা, পু, ৩-২৯-৩৪

সকল প্রাণীকেই মনে মনে প্রণাম ও সম্মান করিবে। ভগবান্ জীবরূপ অংশদ্বারা সকল ঘটেই প্রবিষ্ট আছেন। যজ্ঞের জন্য নিষ্কাম কর্ম্ম করা অপেক্ষা এই দাস্য শতগুণ শ্রেষ্ঠ। যজ্ঞে পরস্পর ভাবনা আছে। দাস্যে কেবল ভগবদ্ভাবনা। যতদিন পর্য্যন্ত গোপভাব ও গোপীভাব না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সকল ভক্তেরই বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ ভাব থাকে। কি অন্তরঙ্গ, কি বহিরঙ্গ, সকল ভাবেই, ভক্তের ভগবৎসেবা বা দাস্য অবশ্য কর্ত্তব্য। বহিরঙ্গ ভাবে জীবে দয়া, মান ও সৎকারই দাস্যের প্রধান অঙ্গ।

"আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলন"—জ্ঞান মার্গে ও ঐশ্বর্য্য মার্গে ইন্দ্রিয়ের দমনই একমাত্র প্রয়োজন; কিন্তু পরম পুরুষার্থের জন্য ইন্দ্রিয়ের উপযোগিতা নাই। রাগমার্গে ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ প্রয়োজন বাহ্যবিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ রূপে বিরত হওয়া চাই। কিন্তু সেই ইন্দ্রিয় অনুরাগ-ভরে কৃষ্ণের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ গ্রহণ করিবে। চৈতন্যদেবের নিম্নলিখিত বিলাপ-বাক্য 'আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলনের' উদাহরণ।

কৃষ্ণ রূপ, শব্দ, স্পর্শ সৌরভ্য অধর-রস
যার মাধুর্য্য কহন না যায়।
দেখি লোভে পঞ্চজন এক অশ্ব মোর মন
চড়ি পঞ্চ পাঁচদিকে ধায়॥
সখিহে শুন মোর দুঃখের কারণ।
মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ মহালম্পট দস্যুগণ
সবে কহে 'হর পরধন'॥ ধ্রু॥
এক অশ্ব এক ক্ষণে পাঁচ পাঁচ দিকে টানে
এক মন কোন্ দিকে যায়॥
ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ ইহা সবার কাঁহা দোষ
কৃষ্ণ-রূপাদি মহা আকর্ষণ।
রূপাদি পাঁচ পাঁচ টানে গেল ঘোড়ার পরাণে
মোর দেহে না রহে জীবন॥
কৃষ্ণরূপামৃত সিন্ধু তাহার তরঙ্গ কন্দু
এক বিন্দু জগৎ ডুবায়।
ত্রিজগতে যতনারী তার চিত্ত উচ্চগিরি
তাহা ডুবায় আগে উঠি ধায়॥

কৃষ্ণের বচন মাধুরী নানারস নর্ম্মধারী
তার অন্যায় কহনে না যায়।
জগতের নারীর কাণে মাধুরী-গুণে বান্ধি টানে
টানাটানি কাণের প্রাণ যায়॥
কৃষ্ণ অঙ্গ সুশীতল কি কহিব তার বল
ছটায় জিনে কোটীন্দু চন্দন।
সশৈল নারীর বক্ষ তাহা আকর্ষিতে দক্ষ
আকর্ষয়ে নারীগণ মন॥
কৃষ্ণাঙ্গ সৌরভ্যভর মৃগমদ মনোহর
নীলোৎপলের হরে গর্ব্বধন।
জগত নারীর নাসা তার ভিতর পাতে বাসা
নারীগণের করে আকর্ষণ॥
কৃষ্ণের অধরামৃত তাতে কর্পূর মন্দস্মিত
স্বমাধুর্য্যে হরে নারী মন।
অন্যত্র ছাড়ায় লোভ না পাইলে মনে ক্ষোভ
ব্রজনারীগণের মূলধন॥
এত কহি গৌরহরি দুইজনার কণ্ঠে ধরি
কহে—'শুন স্বরূপ রামরায়।
কাঁহা কর কাঁহা যাঙ কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ
দোঁহে মোরে কহ সে উপায়॥'

রাগমার্গে ইন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণকে লাভ করিতে পারা যায়, এইজন্য কৃষ্ণকে "গোবিন্দ" বলে। সেই কৃষ্ণ, মধুর কৃষ্ণ। ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই মধুর কৃষ্ণকে লাভ করিতে পারা যায়, এইজন্য তাঁহার লোককে "গোলোক" বলে। সেই লোকে তাঁহার সখা ও সখীগণ "গোপ" ও "গোপী"।

পৃথিবীতে এই অধিকার স্থাপন করিবার জন্য, কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণের পর ইন্দ্রিয় সকলের রাজত্ব ইন্দ্রের হস্ত হইতে নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কেবলমাত্র বৃন্দাবন লীলার জন্য।

গোমাতা সুরভি বলিলেন,—

কৃষ্ণকৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বসম্ভব। ভবতালোকনাথেন সনাথা বয়মচ্যুত॥
ত্বং নঃ পরমকং দৈবং ত্বং ন ইন্দ্রো জগৎপতে। ভবায় ভব গোবিপ্রদেবানাং যে চ সাধবঃ॥
ইন্দ্রং ন স্ত্বাভিষেক্ষ্যামো ব্রহ্মণা নোদিতাবয়ম্। অবতীর্ণোঽসি বিশ্বাত্মন্ ভূমের্ভারাপনুত্তয়ে॥
ভা, পু, ১০-২৭

"আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলন"—সেই জন্য রাগানুগা ভক্তির প্রধান উপকরণ। এই শুদ্ধ ভক্তি ইহা হৈতে প্রেম হয়। পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥

"অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম, আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলন"—ইহাকেই শুদ্ধ ভক্তি বলে।

ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥
সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তাতে প্রেমনাম কয়॥
প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥
যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড়খণ্ড সার।
শর্করা সিতা মিশ্রি উত্তম মিশ্রি আর॥

* * * *

ভক্তভেদ রতিভেদ পঞ্চ পরকার।
শান্তরতি দাস্যরতি সখ্যরতি আর॥
বাৎসল্যরতি মধুররতি পঞ্চ বিভেদ।
রতিভেদ কৃষ্ণভক্তি রস পঞ্চভেদ॥
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস নাম।
কৃষ্ণভক্তি রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান॥
শান্তভক্ত নবযোগেন্দ্র সনকাদি আর।
দাস্যভক্ত সর্ব্বত্র সেবক অপার॥
সখ্যভক্ত শ্রীদামাদি পুরে ভীমার্জ্জুন।
বাৎসল্য ভক্ত মাতা পিতা যত গুরুজন॥
মধুর রস ভক্ত মুখ্য ব্রজে গোপীগণ।
মহিষীগণ লক্ষ্মীগণ অসংখ্য গণন॥
পুনঃ কৃষ্ণরতি হয় দুইত প্রকার।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-মিশ্রা কেবলা ভেদ তার॥
গোকুলে কেবলা রতি ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানহীন।
পুরীদ্বয়ে বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য্য প্রবীণ॥
ঐশ্বর্য্য জ্ঞান প্রাধান্যে সঙ্কোচিত প্রীতি।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য কেবলার রীতি॥
শান্তদাস্য রসে ঐশ্বর্য্য কাহা উদ্দীপন।
বাৎসল্যে সখ্যে মধুররসে সঙ্কোচন॥

শান্ত ও দাস্যরস ঐশ্বর্য্য দ্বারা কখনও কখনও পরিপুষ্ট হয়। দাস ঈশ্বরকে বড় জানিলে সন্তুষ্ট হয় এবং ঈশ্বরের মহিমা জ্ঞানে শান্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু পিতা, মাতা, সখা ও প্রেয়সীর ভাব ঈশ্বর জ্ঞানে সঙ্কুচিত হয়।

বসুদেব দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে দোঁহার মনে ভয় হৈল॥
কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখি অর্জ্জুনের হৈল ভয়।
সখাভাবে ধার্ষ্ট্য ক্ষমায় করিয়া বিনয়॥
কৃষ্ণ যদি রুক্মিণী করিল পরিহাস।
কৃষ্ণছাড়িবেন জানি রুক্মিণীর হৈল ত্রাস॥
কেবলার শুদ্ধ প্রেম ঐশ্বর্য্য না জানে।
ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজ সম্বন্ধ না মানে॥
শান্তি রসে স্বরূপবুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা।
শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি শ্রীমুখগাথা॥

"শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয় সংযমঃ।"

কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণাত্যাগ তার কার্য্য মানি।
অতএব শান্ত কৃষ্ণভক্ত এক জানি॥
শান্ত রসে স্বরূপ বুদ্ধি বা স্বরূপ জ্ঞান হয়।
আত্ম জ্ঞানেই শান্ত যোগী স্থিতপ্রজ্ঞ হয়॥

তাহার ঈশ্বর জ্ঞানে নিষ্ঠা থাকে না এবং ঈশ্বরে মমতা ভাব হয় না। তবে তিনি

সকাম হইয়া কর্ম্ম করেন না। এবং আত্মরূপী কৃষ্ণবিনা সকল তৃষ্ণা ত্যাগ করেন! এই তাঁহার কৃষ্ণনিষ্ঠা।

স্বর্গ মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত নরক কবি মানে। কৃষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্ণাত্যাগ শান্তের দুই গুণে॥
এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্ত জনে। আকাশের শব্দ গুণ যেন ভূত গণে॥

যে রসেই ভক্ত কৃষ্ণে রতি করুক না কেন, কৃষ্ণনিষ্ঠা ও তৃষ্ণাত্যাগ সকল ভক্তেরই সাধারণ গুণ।

শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতা গন্ধ হীন। পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ॥
কেবল স্বরূপ জ্ঞান হয় শান্ত রসে। পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভুর জ্ঞান অধিক হয় দাস্যে॥
ঈশ্বর জ্ঞান সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর। সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে অধিক সেবন। অতএব দাস্য রসের এই দুই গুণ॥

অর্থাৎ দাস্যরসে শান্তের গুণ (কৃষ্ণনিষ্ঠা ও তৃষ্ণাত্যাগ) আছে এবং অধিকন্তু সেবনও আছে।

শান্তের গুণ দাস্যের সেবন সখ্যে দুই হয়। দাস্যের সম্ভ্রম গৌরব সেবা—সখ্য বিশ্বাসময়॥
কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়ারণ। কৃষ্ণসেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন॥
বিশ্রম্ভপ্রধান সখ্য গৌরবসম্ভ্রমহীন। অতএব সখ্য রসের তিনগুণ চিহ্ন॥
মমতা অধিক কৃষ্ণে আত্মসম জ্ঞান। অতএব সখ্য রসে বশ ভগবান্॥

সখ্যরসে কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণাত্যাগ, অসম্ভ্রম, বিশ্বাসময় সেবন। অধিকন্তু কৃষ্ণে মমতা ও আত্মসম জ্ঞান।

বাৎসল্যে শান্তের গুণ দাস্যের সেবন। সেই সেই সেবনের ইহা নাম পালন॥
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ অগৌরব সার। মমতাধিক্যে তাড়ণ ভর্ৎসন ব্যবহার॥
আপনাকে পালক জ্ঞানে কৃষ্ণে পাল্যজ্ঞান। চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান॥
মধুর রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়। সখ্যে অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয়॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন। অতএব মধুর রসের হয় পঞ্চগুণ॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে। এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
এইমত মধুরে সব ভাব সমাহার। অতএব আস্বাদ-আধিক্যে করে চমৎকার॥
এই ভক্তি রসের করিল দিগ্ দরশন। ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন॥
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে। কৃষ্ণ কৃপায় অজ্ঞে পায় রসসিন্ধু পারে॥
এত বলি প্রভু তারে করিল আলিঙ্গন। বারাণসী চলিবারে প্রভুর হৈল মন॥

চৈ, চ, মধ্য, ১৯,

এইরূপে মহাপ্রভু রূপ-গোস্বামীর নিকট রাগমার্গের সূত্র সকল বর্ণনা করিলেন। রূপ উজ্জ্বল-নীলমণি-রসে ও ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে এই সূত্রের বিস্তার করিলেন। যাঁহার হৃদয়ে অনুরাগ স্থান পাইবে, তিনি ঐ দুই গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

সরল যোগসাধন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জ্ঞানী-গণ এইরূপ বলিয়া থাকেন,—

যদ্দুস্তরং যদ্দুরাপং যদ্দূরং যচ্চদুষ্করং। সর্ব্বং তৎ তপসা সাধ্যং তপোহি দুরতিক্রমম্॥
মহাপাতকিনশ্চৈব শেষাশ্চা কার্য্যকারিণঃ। তপসৈব সুতপ্তেন মুচ্যন্তে কিল্বিষাৎ ততঃ॥

'জগতে যাহা কিছু দুস্তর, দুষ্প্রাপ্য, দুর্গম এবং দুষ্কর বিষয় আছে, তৎসমুদায়ই তপস্যা-সাধ্য। তপস্যাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। মহাপাতকীগণ এবং অন্যান্য অকার্য্যকারীগণও তপঃপ্রভাবে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।' ভারতে লিখিত আছে, স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবার মানসে চারিদিক এবং ঊর্দ্ধ, অধঃ নিরীক্ষণ করিয়া যখন কাহাকেও দেখিতে পান নাই, তখন ধ্যানস্থ হওয়ায় আকাশ হইতে 'তপ' এই শব্দটী উত্থিত হয়, এবং ব্রহ্মা তদনন্তর এই তপঃপ্রভাবেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যোগী হইতে হইলে জন্মজন্মার্জ্জিত পাপরাশি দগ্ধ করিয়া পাপশূন্য হইতে হয়, তাহা না হইলে যোগের পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই পূর্ণাবস্থাই আত্মজ্ঞান, তপস্যা তল্লাভের মূল।

নিয়মের দ্বিতীয় সাধন সন্তোষ,—

যদৃচ্ছালাভতো নিত্যং মনঃ পুংসোভবেদিতি। যাধীস্তামৃষয়ো প্রাহুঃ সন্তোষং সুখলক্ষণং॥—যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

প্রতিদিন যাহা কিছু লাভ হয়, তাহাতে মনের যে সন্তুষ্টি ভাব, তাহাকেই ঋষিগণ সন্তোষ কহেন। সন্তোষই সকল প্রকার সুখের আকর। হৃদয়ে তৃষ্ণা থাকিতে সন্তোষ-ভাবের উদয় হয় না। তৃষ্ণাই সকল অনর্থের মূল, এবং দরিদ্রতার প্রথম লক্ষণ। সন্তোষ সকল অর্থের মূল ও শ্রীমানের লক্ষণ।

শঙ্করাচার্য্য বলিয়া গিয়াছেন,—

কোবা দরিদ্রোহি বিশাল তৃষ্ণঃ।—মণিরত্নমালা।

অর্থাৎ দরিদ্র কে? যাহার বিশাল তৃষ্ণা আছে, সেই দরিদ্র।

শ্রীমাংশ্চ কো যস্য সমস্ত তোষঃ।—মণিরত্নমালা।

অর্থাৎ শ্রীমান্ কে? যাঁহার সমস্ত বিষয়ে সন্তোষ আছে। জগতে অভাব অপেক্ষা আর দুঃখ নাই। অভাব একটি প্রধান দুঃখ। কি ধনী, কি দরিদ্র, সকল লোকেরই কিছু না কিছু অভাব আছে এবং তজ্জনিত দুঃখও আছে। কিন্তু জগতে যাহার কোন দ্রব্যের অভাব নাই, সকল বিষয়েই পরিতোষ, তিনি ধনী হউন অথবা পর্ণকুটীরবাসী কিম্বা নিরাশ্রয় ভিক্ষু বা সন্ন্যাসী হউন, তিনিই জগতে প্রকৃত সুখী। বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন।

সন্তোষামৃততৃপ্তানাং চিরং বিশ্রান্তচেতসাং। সাম্রাজ্যমপি শান্তানাং জরতৃণলবায়তে॥

'যিনি সন্তোষরূপ অমৃত পানে তৃপ্ত এবং বিশ্রান্তচিত্ত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট চক্রবর্ত্তী-রাজ্যের সুখও শুষ্কতৃণের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে।' অমৃত পান করিলে যেরূপ সমস্ত তৃষ্ণার অবসান হইয়া পরমা তৃপ্তি লাভ হয়, সেইরূপ জ্ঞানদ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইয়া পরম সন্তোষ লাভ হয়, সমস্ত বাসনার উপশম হইয়া জগতে আর কোন বিষয়ের অভাব বোধ হয় না।

নিয়মের তৃতীয় সাধন আস্তিক্য,—

ধর্ম্মাধর্ম্মেষু বিশ্বাসো যত্তদাস্তিক্যমুচ্যতে।

ইহা ধর্ম্ম এবং ইহা অধর্ম্ম, এইরূপ যে বিশ্বাস, তাহাকে আস্তিক্য কহে। বিশ্বাসই ধর্ম্ম-জীবনের মূল। ঊষরভূমিতে যেরূপ কোন বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না, তদ্রূপ অবিশ্বাসীর হৃদয়ে ধর্ম্ম-বৃক্ষের অঙ্কুর কদাচ উৎপন্ন হয় না। অনেকে এরূপ মনে করেন, ঈশ্বরকে কখনও দেখি নাই, তাঁহার বিষয়ে কোন জ্ঞান নাই, কেবল কর্ণে শুনিয়া কিরূপে বিশ্বাস হইতে পারে? প্রত্যক্ষ না দেখিয়া অন্ধবিশ্বাস ত করা যায় না, এবং গুরু যিনি প্রকৃত পথ প্রদর্শক, তাঁহাতেই বা কিরূপে স্থির-বিশ্বাস করিতে পারা যায়, যে তিনি প্রকৃত ঈশ্বর-প্রাপ্তির পথ-প্রদর্শক? বস্তুতঃ যাঁহারা এরূপ মনে করেন, তাঁহাদের তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম। কি ধর্ম্মবিষয়ে, কি লৌকিক বিষয়ে বিশ্বাস না করিলে সংসারে কোন কার্য্যই সাধিত হয় না। বস্তুতঃ জগতে অন্ধবিশ্বাস কিছুই নাই, এবং যদিই অন্ধবিশ্বাস থাকে, তবে সেই অন্ধবিশ্বাসই প্রত্যক্ষ বিশ্বাসের কারণ। বৎসরের অমুক সময়ে সূর্য্যগ্রহণ হইবে, অমুক দিবসের নির্দ্দিষ্ট সময়ে সূর্য্যগ্রহণ হইবে, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস হয় কেন? আর্য্যঋষি-প্রণীত জ্যোতিষ-গ্রন্থের বিচার করিয়া আমাদের সে বিশ্বাস স্থির হয়; কিন্তু আর্য্যঋষিগণকে আমরা কেহ প্রত্যক্ষ দেখি নাই। তাঁহাদের বিষয় কেবল শ্রবণ করিয়াছি মাত্র; তাঁহারা পুরাকালে বর্ত্তমান ছিলেন এবং এই প্রত্যক্ষবিশ্বাসপ্রদ জ্যোতিষশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, ইহা আমাদের অন্ধবিশ্বাস; এই অন্ধবিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া আমাদের প্রত্যক্ষ বিশ্বাস স্থাপিত হয়। 'অদ্য সূর্য্যগ্রহণ হইবে' ইহা কেহ বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, সূর্য্য-গ্রহণ কিন্তু হইবেই হইবে অবিশ্বাস করিলে যে সূর্য্যগ্রহণ হইবে না, এরূপ কখন সম্ভবপর নহে। সেইরূপ ঈশ্বর সম্বন্ধে বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, তিনি আছেন, তাঁহার অবিদ্যমানতা নাই। ঈশ্বর-প্রাপ্তির পথ-প্রদর্শক গুরুতে বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, তিনি কিন্তু প্রকৃত সৎপথ-প্রদর্শক। অমুক দেশে অমুক পর্ব্বত আছে, যাহা আমরা কেহই দেখি নাই, তাহাতে বিশ্বাস হয় কেন? ভূগোল শাস্ত্রপাঠ করিয়া, কিম্বা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের বাক্য শুনিয়া, বিশ্বাস করিয়া থাকি। সেইমত ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া, এবং যাঁহারা ঈশ্বরের বিষয় জ্ঞাত আছেন, সেই মহাত্মাগণের মুখে শ্রবণ করিয়া, ঈশ্বর, শাস্ত্র এবং গুরুতে বিশ্বাস করিয়া কার্য্য করিলে ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

নিয়মের চতুর্থ সাধন দান,—

ন্যায়ার্জ্জিতং ধনঞ্চাপি বিধিবদ্‌যৎ প্রদীয়তে। অর্থিভ্যঃ শ্রদ্ধয়াযুক্তং দানমেতদুদাহৃতং॥—যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

ধর্ম্মপথে থাকিয়া ন্যায়-পূর্ব্বক উপার্জ্জিত অর্থ প্রার্থীগণকে বিধি এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্পণ করার নাম দান।

উপার্জ্জিতানাং বিত্তানাং দানমেব হি রক্ষণং। তড়াগোদরসংস্থানাং পরিবাহ ইবাম্ভসাম্॥

পরিবাহ (জলবিকাশ দ্বারা যেমত জলের সংশুদ্ধি রক্ষিত হয়, সেইরূপ একমাত্র দানই উপার্জ্জিত বিত্তের রক্ষার উপায়। বস্তুতঃ যিনি নিজ উপার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহারে, দীন-দুঃখীর দুঃখ নিবারণ না করিয়া, সঞ্চয় করিয়া রাখেন, তিনি প্রকারান্তরে নিজেকে বঞ্চিত করেন। উপার্জ্জিত বা সঞ্চিত শস্য উত্তম উর্ব্বর ক্ষেত্রে বপন না করিয়া যদি তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখা যায়, তাহাতে প্রকৃত পক্ষে শস্য রক্ষা হয় না। কিন্তু সেই শস্য যদি উত্তম উর্ব্বর ক্ষেত্রে বপন করা যায়, তবেই সেই শস্য প্রকৃত পক্ষে রক্ষা করা হয়; কারণ তাহা হইতে অঙ্কুরাদি উদ্গত হইয়া সময়ে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। সেইরূপ ধন যদি উপযুক্ত পাত্রে দান না করিয়া রাশীকৃত করিয়া সঞ্চয় করা যায়, সেই সঞ্চিত অর্থ আগামী জন্মে কোন ফলই উৎপন্ন করিবে না। কিন্তু সেই অর্থ যদি উত্তম সৎপাত্রে দান করা হয়, তাহাতে আগামী জন্মে অবশ্যই সুফল উৎপন্ন হইবে।

চত্বারো ধনদায়াদা ধর্ম্মাগ্নিনৃপতস্করাঃ। জ্যেষ্ঠস্য অবমানেন কুপ্যন্তি সোদরাস্ত্রয়ঃ।—মহাভারত।

অর্থাৎ ধর্ম্ম, অগ্নি, রাজা এবং তস্কর এই চারিজন সঞ্চিত ধনের অধিকারী, তন্মধ্যে ধর্ম্মই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তাহার অপমান করিলে শেষোক্ত তিন ভ্রাতা অগ্নি, রাজা এবং তস্কর কুপিত হইয়া থাকেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সঞ্চিত অর্থ যদি ধর্ম্ম কার্য্যে ব্যয় না হয়, তাহাতে ধর্ম্মের অপমান করা হয় এবং ধর্ম্মের অপমান হইলে সেই অর্থ অগ্নিতে নষ্ট হইতে পারে, কিম্বা কাহারও সহিত বিবাদ বা বংশলোপ বশতঃ রাজকোষভুক্ত হইতে পারে, অথবা তস্করে অপহরণ করিতে পারে। সেই জন্য শাস্ত্রে কথিত আছে,—

বিভবেন কিং যদি কৃপা তব নাস্তি দীনে।"

তোমার অতুল ঐশ্বর্য্যে কি ফল হইবে, যদি দীনজনের প্রতি তোমার কৃপা না থাকে। পরাশর স্মৃতিতে কথিত আছে,—

অভিগম্যোত্তমং দানমাহূতং চৈব মধ্যমম্। অধমং যাচ্যমানং স্যাৎ সেবা দানং তু নিষ্ফলং॥

অভাবগ্রস্ত পুরুষের অভাবের বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া তাহার গৃহে যাইয়া যে দান করা হয়, তাহাই উত্তম; আর আপনার গৃহে আহ্বান করিয়া যে দান করা হয়, তাহা মধ্যম; এবং স্বয়ং উপস্থিত প্রার্থীকে যে দান করা হয়, তাহা অধম; আর প্রার্থীর নিকট সেবা গ্রহণ করিয়া যে দান করা হয় তাহা নিষ্ফল হয়।

ভগবান্ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন,—

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তে২নুপকারিণে। দেশে কালেচ পাত্রেচ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতং॥

অর্থাৎ পবিত্র কুরুক্ষেত্র, বা কাশী আদি তীর্থস্থানে, সূর্য্য গ্রহণাদি পুণ্যকালে এবং

উপকার পাইবার প্রত্যাশা যাহার নিকট নাই, এরূপ ব্রাহ্মণাদি পাত্রে যাহা দান করা যায়, তাহাই সাত্ত্বিক দান।

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ। দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥

পরিক্লিষ্ট অর্থাৎ মনঃক্ষুণ্ণ ভাবে, প্রত্যুপকার পাইবার উদ্দেশে ও ফল-কামনায় যে দান করা হয়, তাহা রাজসিক দান।

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে। অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্॥

অর্থাৎ অপবিত্র দেশে, অনুপযুক্তকালে ও অপাত্রে বা অসৎকার্য্যে অবজ্ঞা করিয়া যে দান তাহাই তামস নামে অভিহিত হয়।

অনেকে এরূপ মনে করেন যে, আমার বহু অর্থ নাই আমি কিরূপে দান করিব। কিন্তু সেরূপ মনে করা উচিত নয়। কারণ যাহার যেরূপ সাধ্য তাহার সেইরূপ দান করা উচিত। গৃহী ব্যক্তির পক্ষে দান একটি প্রধান ধর্ম্ম। এক মুষ্টি অন্ন দানই সামান্য গৃহীর পক্ষে যথেষ্ট দান ধনী ব্যক্তির এক সহস্র মুদ্রাপেক্ষাও দরিদ্রের এক মুষ্টি অন্নদানই শ্রেষ্ঠ।

সর্ব্বেষামেব দানানামন্নদানং পরং স্মৃতং। সর্ব্বেষামেব জন্তূনাং যতস্তজ্জীবিতং ফলম্॥

যস্মাদন্নাৎ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ কল্পে কল্পে ২সৃজৎ প্রভুঃ। তস্মাদন্নাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি॥

'সকল প্রকার দানের মধ্যে অন্নদানই শ্রেষ্ঠ; কারণ অন্ন সকল প্রাণীর জীবন অর্থাৎ অন্ন দ্বারাই সকল জীবের পুষ্টিসাধন হয়। ব্রহ্মা অন্ন সহযোগে প্রতিকল্পে জীবের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, * সেই জন্য অন্নদানাপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ দান নাই।' ইহাতে সকল জীবের সমানাধিকার আছে। সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া যত সংখ্যক মনুষ্যকে অন্ন দান দেওয়া যাইতে পারে, তাহার চতুর্গুণ জীবকে এক পয়সার অন্ন প্রদান করিয়া তাহাদের পরিতোষ করিতে পারা যায়। দরিদ্রের এক পয়সার চিনি কিম্বা ময়দাতে বহুসংখ্যক পিপীলিকার ভোজন হইয়া থাকে।

সেই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।

ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব গুহায় নিহিত আছে।

গহনা কর্ম্মণো গতিঃ।

কর্ম্মের গতি অতি গহন (দুর্জ্ঞেয়)। পরাশর ঋষি বলিয়া গিয়াছেন,—

দানেন প্রাপ্যতে স্বর্গো দানেন সুখমশ্নুতে। ইহামুত্র চ দানেন পূজ্যো ভবতি মানবঃ॥

দান দ্বারা পুরুষ স্বর্গ প্রাপ্ত হয়, দানধর্ম্ম দ্বারাই পরম সুখ লাভ হইয়া থাকে। ইহলোকে ও পরলোকে দানধর্ম্ম দ্বারাই মানব পরম পূজ্য হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

---

* অন্নাদ্রেতঃ রেতস সঃ পুরুষঃ। অর্থাৎ অন্ন হইতে রেত উৎপন্ন হয়, এবং সেই রেতঃ হইতেই পুরুষ অর্থাৎ জীব জন্মায়।

মৃত্যুর পরপারে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রক্ষক-দেবতা।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে এবং প্রাচীন ও আদিম ধর্ম্মমাত্রেই দেবতাদিতে বিশ্বাস প্রচলিত দেখা যায়। মানবাপেক্ষা শক্তিশালী ও মানবের অদৃশ্য অনেক জীব আছেন, যাঁহারা আমাদের ভাল করিতে পারেন,—এরূপ একটা সংস্কার পৃথিবীতে নূতন নহে। হিন্দুরা ইঁহাদিগকে দেবগণ, খৃষ্টানগণ angels, মুসলমানগণ ফেরিস্তা এবং অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ অন্যান্য নামে অভিহিত করেন। কেবল যে তাঁহাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে তাহা নহে, তাঁহারা অনেক সময়ে মানবের বিপদ আপদে সাহায্য করেন, এরূপ বহু কিম্বদন্তীও প্রচলিত আছে। সাবিত্রী যমরাজকে প্রসন্ন করিয়া কিরূপে সত্যবানের জীবন পাইয়াছিলেন, প্রহ্লাদ বিষ্ণু-কৃপায় কিরূপে নৃশংস পিতৃহস্ত হইতে রক্ষা পান, মানব-কুল মহিষাসুর ও শুম্ভ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইলে কিরূপে দুর্গা ও কালীর আবির্ভাব হয়,—ইত্যাদি অনেক কথাই হিন্দুর সুপরিচিত। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগেও বেহুলা কিরূপে মনসাদেবীর কৃপা লাভ করিয়াছিলেন, শ্রীমন্তের আসন্ন বিপদে দেবী কিরূপে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিলেন এবং সত্যনারায়ণ ভক্তগণের প্রতি কিরূপে অনুগ্রহ করেন,—এই সকল কথা এখনও হিন্দুর গৃহে গৃহে পঠিত ও গীত হয় এবং সহস্র সহস্র হিন্দু এখনও উহা বিশ্বাস করেন। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের ইতিবৃত্তেও এরূপ অনেক কিম্বদন্তী আছে। লেক্ রেজিলসের (Lake Regillusএর) যুদ্ধে, দুইটি দেবতা (Castor এবং Pollux) নব জাতির সেনা-নায়কত্ব করিয়া তাহাদিগের বিপুল সাহায্য করিয়াছিলেন, ইহা প্রাচীন রোমকেরা বিশ্বাস করিতেন। আধুনিক যুগে সেন্ট্ জেম্স্ স্পেনের সেনাপতি হইয়া যুদ্ধ করায়, স্পেনের জয়লাভ হইয়াছিল, ইহা তাঁহাদের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অতএব, এরূপ প্রবাদ, এরূপ কিম্বদন্তী, সকল দেশেই সকল জাতির মধ্যেই প্রচলিত আছে।

জড়বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানব যেমন বিশ্বাসের ভূমি হইতে যুক্তির ভূমিতে উন্নীত হইতে লাগিলেন; যখন তিনি বিশ্বাসের পক্ষপাতী না হইয়া, যুক্তির পক্ষপাতী হইতে লাগিলেন; যখন তাঁহার চিত্তের অবস্থা এরূপ দাঁড়াইল যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতিরেকে উহা কোন কথাই শুনিতে বা গ্রহণ করিতে চায় না; তখন হইতে তিনি এই সকল কিম্বদন্তীকে "অলীক", "কুসংস্কার (superstition)", "মূর্খের কথা" ইত্যাদি বলিয়া উড়াইয়া দিতে লাগিলেন। ইহার ভাল মন্দ দুই দিকই আছে। জ্ঞানপিপাসা মানবের

একটি অতি অমূল্য সম্পত্তি, ইহা ভগবানের চিৎ-শক্তিরই বিকাশ। "না বুঝিয়া কিছুই বিশ্বাস করিব না; যতক্ষণ না স্বয়ং দেখিতে বা বুঝিতে পারিব, যতক্ষণ না যুক্তি ও প্রমাণ পাইব, ততক্ষণ (ঋষিই বলুন আর শাস্ত্রই বলুন) উহা বিশ্বাস করিব না",—ইহাতে মানবের সহজ জ্ঞানপিপাসারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তাঁহার অন্তরাত্মা বুঝিতে চাহিতেছে, জানিতে চাহিতেছে। সুতরাং ইহা প্রশংসার্হ। এইটিই ইহার ভাল দিক। কিন্তু "আমি যাহা বুঝিতে পারি না, অথবা আধুনিক বিজ্ঞান যাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারে না, তাহা পৃথিবীতে কেহই বুঝেন নাই ও বুঝেন না, তাহা অলীক, মিথ্যা, কল্পনা মাত্র, সুতরাং শ্রবণেরও অযোগ্য এবং যাঁহারা তাহা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা সকলেই অন্ধবিশ্বাসী, না বুঝিয়াই বিশ্বাস করেন"—ইহা মনে করা ঘোর সংকীর্ণতা, দাম্ভিকতা ও অজ্ঞতা। এইটুকুই ইহার মন্দ দিক। ফিজি দ্বীপপুঞ্জের অসভ্য বর্ব্বরগণ আমাদের তারশূন্য টেলিগ্রাফ, বায়ুপোত (airship) ও গ্রামোফোনের বৃত্তান্ত শুনিয়া যদি হাস্য করিয়া বলে,—"একি কখনও সম্ভব? এরূপ বিশ্বাস কেবল কুসংস্কার মাত্র,"—তাহা হইলে তাহারা যেরূপ আমাদের কৃপাপাত্র, সেইরূপ পণ্ডিতাভিমানী তথা-কথিত শিক্ষিত ব্যক্তিগণও দিব্যদর্শী ঋষিগণের করুণার পাত্র। নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি, কোনও বিষয় তাঁহার অসম্ভব বোধ হইলেও, কখনও উহা মিথ্যা বা অসম্ভব বলেন না। তিনি বলেন "আমি উহা এখনও বুঝিতে পারি নাই। যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা বিশ্বাস করুন, আপত্তি নাই। আমি কিন্তু যতক্ষণ না বুঝিব, বিশ্বাস করিব না, এবং অনুসন্ধান করিতেও ছাড়িব না।" ইহাই প্রকৃত ধীর ও জিজ্ঞাসু ব্যক্তির কথা। এইরূপ ব্যক্তিই অচিরে সত্য লাভ করেন। এইরূপ ব্যক্তিকেই পরাবিদ্যা সমিতি (Theosophical Society) সাদরে আহ্বান করিতেছেন। পরাবিদ্যা (Theosophy) অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের পোষকতা করেন না; পরন্তু,সাধারণ অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিগণ অজ্ঞতাবশতঃ যে সকল প্রাচীন মত ও বিশ্বাসকে কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান, তাহাদের মূলে যে সত্য নিহিত আছে, তাহাই জগতে ঘোষণা করিতেছেন, তাহাই আবিষ্কার করিবার পথ দেখাইয়া দিতেছেন। সত্যের প্রতিষ্ঠা, সত্যের প্রচারের জন্যই, থিওসফির আবির্ভাব,—মিথ্যার পোষকতার জন্য নহে, কুসংস্কার-সমর্থনের জন্য নহে। "সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ"—ইহাই থিওসফির মূল মন্ত্র। অতএব, এস ভাই নির্ভীক সত্যানুসন্ধিৎসু! থিওসফি তোমারই জন্য। হে রক্ষণ-শীল (conservative)! তুমি যদি কুলক্রমাগত সযত্নপোষিত প্রাচীন আচার ও বিশ্বাসগুলিকে অন্ধভাবে ধারণ না করিয়া, উহারা সত্য কি না, নির্ভয়ে পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত থাক এবং অসত্য হইলে প্রকৃত বীরের ন্যায় উহাদিগকে হৃদয়-ক্ষেত্র হইতে উৎপাটিত করিতে তিলার্দ্ধ পশ্চাৎপদ না হও, তবে এস ভাই, থিওসফি তোমারই জন্য। আবার, হে উন্নতি-শীল (Liberal)! জপ, তপ, যজ্ঞ, হোম, দেবপূজা, তর্পণ, শ্রাদ্ধ, তীর্থদর্শন, অন্নপ্রাশনাদি দশবিধ সংস্কার,

অখাদ্যবর্জ্জন প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় ও হিতকর প্রাচীন আচারগুলিকে (তোমার ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগম্য হইলেও) কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া না দিয়া যদি ধীরচিত্তে, নিরপেক্ষ ভাবে, উহাদের অন্তর্নিহিত সত্য জানিতে সমুৎসুক থাক, তবে এস ভাই, থিওসফির দ্বার তোমার জন্য উন্মুক্ত আছে। থিওসফির অর্থ ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ সত্যের জ্ঞান, কারণ ব্রহ্মই সত্য।

তবে কি দেবতারা প্রকৃতই আছেন? হাঁ, তাঁহারা প্রকৃতই আছেন। শুধু তাহাই নহে, সময় সময় (যদিও এরূপ সময় খুব কম) মানবের উপকারও করেন। দেবতারা কি? পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তাঁহারা কি ঈশ্বর? না, তাঁহারা ঈশ্বর নহেন, আমাদের ন্যায়ই সৃষ্ট জীব; তবে, তাঁহারা সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠ জীব, জ্ঞানে প্রেমে ও শক্তিতে মানবাপেক্ষা উন্নত। তাঁহাদের মধ্যেও শ্রেণী-বিভাগ আছে, উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন।*

তাঁহারা যে আছেন, তাহার প্রমাণ কি? প্রথম, প্রত্যক্ষ জ্ঞান (direct knowledge)। আমাদের সমিতির কেহ কেহ (যাঁহাদের দিব্যদৃষ্টি খুলিয়াছে) সাক্ষাৎভাবে দেবতাগণকে জানিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন, দেবতাগণের নানা শ্রেণী বা স্তর আছে। অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর দেবগণের নাম কাম-দেব। ইহাঁরা ভুবর্লোকে বাস করেন। যক্ষ রক্ষ অপ্সরা কিন্নরাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তদপেক্ষা উচ্চ দেবগণের নাম রূপ-দেব ও অরূপ-দেব। ইহাঁরা যথাক্রমে স্বর্গের নিম্ন ও উচ্চ স্তরের অধিবাসী। আদিত্য, বসু, রুদ্রাদি ইহাঁদেরই অন্তর্গত। ইহাঁদিগকেই খৃষ্টানগণ angels বলিয়া থাকেন। ইহাঁদের উপরেও মহর্জনাদি-লোকে উচ্চ হইতে উচ্চতর, মহৎ হইতে মহত্তর দেবগণ স্তরে স্তরে বিরাজিত। ইঁহারাই খৃষ্টানদিগের arch-angels, বৌদ্ধগণের ধ্যান-চোহান, এবং হিন্দুর লোকপাল, দিক্‌পাল, মানস-পুত্র ও প্রজাপতি।

দেবতা সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রমাণ,—অনুমান। আমরা পৃথিবীতে দেখিতে পাই, অতি ক্ষুদ্র জীবাণু (minutest microbe) হইতে আরম্ভ করিয়া মানব পর্য্যন্ত অসংখ্য জীব ক্রমোন্নতি অনুসারে স্তরে স্তরে বিরাজিত রহিয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে ডারউইন (Darwin) প্রমাণ করিয়াছেন যে, উদ্ভিদ হইতে আরম্ভ করিয়া জীব ক্রমোন্নতি দ্বারা (by gradual evolution) মানবত্ব প্রাপ্ত হয়; সুতরাং মানবের নিম্নে অসংখ্য শ্রেণী বিদ্যমান। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, মানবের উপরেও ঈশ্বর পর্য্যন্ত অসংখ্য ক্রমোন্নত জীব স্তরে স্তরে বর্ত্তমান আছেন। ভগবানের রাজ্যে সর্ব্বত্রই একটি সম-বিধি (uniformity of law) পরিদৃষ্ট হয়; সুতরাং মানবের নিম্নে যে বিধি-অনুসারে কার্য্য হইতেছে, উপরেও তাহাই হওয়া সম্ভব। বিশেষতঃ, মানব এবং ঈশ্বরের মধ্যে একটা অসীম, অনন্ত ব্যবধান রহিয়াছে; মানব এক লম্ফে এই

* এ সম্বন্ধে পাঠক যদি কিঞ্চিৎ অধিক জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমার অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র-নাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, প্রণীত The Philosophy of the Gods নামক পুস্তকখানি পাঠ করিবেন।

ব্যবধান অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের নিকট পঁহুছিবে, ঈশ্বরতুল্য হইবে, ইহা কি যুক্তিসিদ্ধ? পৃথিবীতে মধ্যে মধ্যে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন (বুদ্ধ, যীশু, কবীর, নানক, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি), তদ্দারাই প্রমাণ হয় যে, মানবের উপরেও উচ্চতর, শ্রেষ্ঠতর জীব আছেন।

দেবতা সম্বন্ধে তৃতীয় প্রমাণ,—আপ্তবাক্য। প্রায় সকল দেশে, সকল ধর্ম্মে, ঋষিগণ (যাঁহারা সাধারণ মানবাপেক্ষা অনেক উন্নত ও জ্ঞানী) দেবতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়াছেন। শাস্ত্রগ্রন্থ (revealed books) এই ঋষিদিগের দ্বারাই লিখিত। প্রায় সর্ব্বদেশের শাস্ত্রই দেবতা স্বীকার করেন।

এখন প্রশ্ন এই যে, মানব অনেক সময়ে বিপদ্-আপদে, রোগ-শোকে, সঙ্কট-সংশয়ে, যে অপার্থিব অদৃশ্য সাহায্য প্রাপ্ত হন, তাহা কি পূর্ব্বোক্ত দেবতাগণের নিকট হইতেই আইসে? না, তাহা নহে। অবশ্য হইতে পারে যে, কদাচিৎ কোন দেবতা কোন মানবের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কিঞ্চিৎ সাহায্য করিলেন; কিন্তু সচরাচর এরূপ ঘটে না। সাধারণতঃ তাঁহারা মানবের বড় খোঁজ-খবর রাখেন না। মানব এরূপ অহঙ্কারী ও গর্ব্বিত, সে আপনাকে এত বড় মনে করে যে, সে ভাবে, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণাদি দেবতা তাহার সেবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, ভগবানের বিরাট সৃষ্টির মধ্যে মানব একটী ধূলিকণাপেক্ষাও অধম, অতি নগণ্য ও তুচ্ছ। মানবের নিকট পিপীলিকা, ভেক বা সরীসৃপাদি যেরূপ, অধিকাংশ দেবতার নিকট মানবও সেইরূপ। আমরা যেমন সাধারণতঃ আমাদের কার্য্য লইয়াই থাকি, কোন্ খানে কোন্ পক্ষীটি বা ভেকটি বিপদে পড়িল, অনুসন্ধান করিয়া বেড়াই না, সেইরূপ দেবগণও তাঁহাদের ভগবৎ-নিরূপিত স্ব স্ব বিরাট কার্য্য লইয়াই ব্যস্ত। তবে, কখনও কখনও কোন কার্য্যে যাইবার সময় আমরা পথে হয়ত কোন পক্ষী বা বিড়ালের আর্ত্তস্বর শুনিয়া যেরূপ তদ্দিকে আকৃষ্ট হই এবং তাহাদিগকে বিপন্ন দেখিলে উদ্ধার করি, দেবগণও সেইরূপ কখনও কখনও মানবের কাতরোক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া সাহায্য করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ সাহায্য খুবই বিরল, বিশেষতঃ আধুনিক যুগে। বহুপূর্ব্বে যখন মানব খুব নিম্নাবস্থায় ছিল, যখন কোনও মানবই স্বজাতিকে সাহায্য করিবার উপযুক্ত উন্নতি লাভ করেন নাই, তখন দেবগণ প্রায়ই মানবদিগকে সাহায্য করিতেন। কিন্তু এখন অনেক মানব উচ্চলোক হইতে মানবকে সাহায্য করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এইজন্যই দেব-সাহায্য আরও বিরল হইয়াছে, কারণ, এখন দেব-সাহায্যে মানবের ইষ্ট না হইয়া ঘোর অনিষ্টই হইবে।

তবে কি পরী, অপ্সরা, যক্ষ, রক্ষ, প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীস্থ দেবযোনি হইতে সাহায্য আইসে? পূর্ব্বে যে দেবতাদিগের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা ছাড়া আর এক শ্রেণীর জীব আছে। ইহারা ভুবর্লোকে এবং এমন কি ভূলোকেও ইথারনির্ম্মিত দেহে বাস করে।

ইহারা জ্ঞানবুদ্ধিতে মানবাপেক্ষা নিকৃষ্ট। ইংরাজিতে ইহাদিগকে nature spirits, fairies, pixies, sylphs, gnomes প্রভৃতি বহুনামে অভিহিত করা হয়। হিন্দুশাস্ত্রে ইহারা নিকৃষ্ট দেবযোনি বলিয়াই উক্ত হইয়াছে। ইহারা সাধারণতঃ নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসে, মানবের সংস্পর্শে বড় আসিতে চায় না; কারণ মানবের ক্রোধ লোভ হিংসাদির স্পন্দন ইহাদিগের বড়ই অপ্রীতিকর। ইহারা মানবাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব, সুতরাং মানুষের কি উপকার করিবে? তবে কচিৎ এক আধটি কোন মানবের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ভৃত্যের ন্যায় সেবা করিতে পারে। সেক্ষপীয়রের Ariel বোধ হয় এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

তবে কি জীবন্মুক্ত মানবগণ (Masters বা Adepts) হইতে দৈব সাহায্য আইসে? না, সাধারণতঃ তাহা নহে। এই মহাপুরুষগণ সম্বন্ধে অনেকে কিছুই জানে না, সুতরাং সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলিব। ইহারা পূর্ব্বযুগে বা মন্বন্তরে আমাদের ন্যায় মানব ছিলেন, কিন্তু জীবে প্রেম, ভগবদ্ভক্তি, দৃঢ়তা, একাগ্রতা ও সাধনা দ্বারা মুক্তিলাভ করিয়াছেন। ইহাদের জ্ঞান, শক্তি ও করুণা এতই অধিক যে, তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষ ভগবান্ বা ঈশ্বর বলিয়াই আমাদের বোধ হয়। ইহারাই মানবের বিপুল সহায়, ভরসা ও অবলম্বন। যাহাতে এই জরামরণাধীন দুর্ব্বল মানব অচিরে দুঃখ-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া ভগবানের স্বরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে, মুক্তির বিপুল আনন্দ লাভ করিতে পারে, তাহাতেই—সেই পবিত্র জীবসেবাতেই, ইহাঁরা স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। স্বয়ং অমর হইয়া ইহারা তৃপ্ত নহেন, সমগ্র মানবজাতিকে অমর করিতে চান! তাই, যুগ-যুগান্তর, কল্প-কল্পান্তর, ইহাঁরা নিজের পরমানন্দধাম ত্যাগ করিয়া দুঃখ-সঙ্কুল মর্ত্ত্যধামে বাস করিতেছেন। ইহাঁদের কার্য্য এতই অধিক, এতই উচ্চ, এতই সার্ব্বভৌমিক যে, আমরা উহা কল্পনা করিতে পারি না। ইহারা সমগ্র মানব-জাতির আত্মার উৎকর্ষ সাধনে নিযুক্ত। আমরা যখন কোন নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে আশ্রয়াভাবে কষ্ট-ভোগ করিতে দেখি, কোন পীড়িতকে শুশ্রূষাভাবে, অথবা নিরন্নকে খাদ্যাভাবে ক্লেশ পাইতে দেখি, তখন বলিয়া থাকি, "যদি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ থাকেন, তাঁহারা কি এই সকল ক্লেশ দেখিতে পান না? তাঁহারা আসিয়া সাহায্য করেন না কেন?" এরূপ উক্তি আমাদের অজ্ঞতারই পরিচয় দেয়। মিতব্যয়িতার নিয়ম (law of economy) এই যে, ভগবানের রাজ্যে যাঁহার দ্বারা যত উচ্চ ও অধিক কার্য্য পাওয়া যায়, তাঁহা দ্বারা সেই কার্য্য করাইলে শক্তির অপব্যয় (waste of energy) হয় না। এই জন্যই সুবিজ্ঞ ব্যক্তি নিরক্ষর বিদ্যাবুদ্ধিশূন্য বলিষ্ঠ কৃষকদ্বারাই হলচালনাদি কৃষিকার্য্য করাইয়া থাকেন এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি, চিন্তাশীল, জ্ঞানী ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের উপরই সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম্মচর্চ্চার ভার অর্পণ করেন। কিন্তু কেহ যদি বলেন, "বিজ্ঞান, দর্শনাদিতে কয় জনের উপকার হয়? শস্যই কেবল সকলের উপকারে আইসে", এবং এই বলিয়া যদি তিনি

যাবতীয় বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কবি ও ভক্তগণকে স্ব স্ব কার্য্য ত্যাগ করিয়া হলচালনা ও ভূমিকর্ষণ করিতে পরামর্শ দেন, তাহা হইলে তাঁহার সুবুদ্ধির প্রশংসা করা যায় কি? আমরাও মহাপুরুষগণকে তাঁহাদের বিশ্বহিতকর কার্য্য ত্যাগ করিয়া রাস্তায় রাস্তায় রোগীর ঔষধ যোগাইয়া বেড়াইতে পরামর্শ দিয়া ততোধিক কুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়া থাকি। অতএব সাধারণতঃ ইঁহারা আমাদের স্থূলদেহের সাহায্য করেন না। যদি করেন তবে তাহা খুবই কম। তবে, মানব যে সকল অদৃশ্য সাহায্য প্রাপ্ত হন, তাহা কোথা হইতে আইসে! কে সে সাহায্য করেন? পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহাই দেখাইব।

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী।

মলিনার আত্ম-কাহিনী।

অভাগিনী।

১

একদা দুপুরে বৃকভানু-পুরে
অঙ্গনে ছিনু দাঁড়ায়ে আমি;
বাতায়ন-পথে দেখিনু—চকিতে
রাধার সজল বদনখানি।
কি জানি কি দুখে হাসিয়া উঠিনু,
কি সুখে কাঁদিনু পাগলী প্রায়;—
সখীরে ডাকিয়ে অঙ্গুলি দিয়ে
দেখায়ে আমারে কহিল তায়,—

২

"রাজ-নন্দিনী যেন বন্দিনী
করি' মোরে কেন গড়িল বিধি?
যদি তা করিল, কেন বা গাঁথিল
এ পোড়া হৃদয়ে প্রণয়-নিধি?
যদি লো বিধাতা উহারি মতন
নীচ-কুল-নারী করিত মোরে,
স্বাধীন জীবনে রহিতু সজনি!
দাসী হ'য়ে মোর বঁধুর ঘরে!

৩

"বঁধুর উপেখা ফুল শরসম
ধরিতাম সখি! পাতিয়া বুক,
গোপন সোহাগে চরণ সেবিয়া
উপজিত মনে পরম সুখ!
বনফুল তুলি' ফুলমালা গাঁথি'
সাঁঝের আলোকে দিতাম গলে,
জানিত না নাথ প্রেম-নিবেদন;
ধরিতাম পদ ধোবার ছলে।"

৪

গোপীর বচনে মলিনার মনে
নিরমল প্রেম বেকত ভেল,
গভীর গভীর গোপীর পিরীতে
মরম-বেদনা ডুবিয়া গেল।
হায় অভাগিনী নাথ-ভিখারিণী,
বঁধু আদরিণী রাজার ঝি;
হায়' সে সুভগা অতি অভাগিনী
স্মরি শিহরিনু, কহিব কি!

ক্রমশঃ

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

শ্রীপাদ গদাধর গোস্বামী প্রভুর জীবনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীচৈতন্য প্রভুর গৃহে শ্রীল ঈশ্বরপুরী মহোদয় ভক্তি-গদ্‌গদ চিত্তে অনেক কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করেন ; সেখানেও তাঁহার নয়নদ্বয় দিয়া সুপবিত্র প্রেমধারা অবিরল ধারে বহিয়াছিল। মহাপ্রভু তাঁহার এতাদৃশ প্রেমধারাবলোকনে নিরতিশয় সন্তুষ্ট হন, কিন্তু আত্ম প্রকাশ করেন না।

দেখিয়া প্রেমের ধারা প্রভুর সন্তোষ। না প্রকাশে আপনা লোকের দিন দোষ॥—চৈঃ ভাঃ।

শ্রীল ঈশ্বরপুরী শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যের গৃহে দুই তিন মাস অবস্থান করিলেন। সকলে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া নিরতিশয় আনন্দিত হইত, মহাপ্রভুও প্রতিদিন তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেন। শ্রীল গদাধর পণ্ডিতও প্রায়ই পুরী মহোদয়ের সন্নিকটে উপস্থিত থাকিয়া কৃষ্ণ-গুণ-গান শ্রবণে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। শ্রীল গদাধর গোস্বামী স্বগুণে সকল বৈষ্ণবের প্রীতিপাত্র হইয়াছিলেন। শ্রীপাদ পুরী মহোদয়ও তাঁহার অলৌকিক প্রেম ভক্তির পরাকাষ্ঠা দর্শনে তাঁহাকে অতি বিশ্বস্তভাবে স্নেহ করিতে লাগিলেন। এমন কি তাঁহাকে এত স্নেহ ও সুপ্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, অতি সস্নেহ সমাদরে স্বকৃত "কৃষ্ণলীলামৃত" পুঁথি পড়াইতেন। যথা—

গদাধর পণ্ডিতের দেখি প্রেমজল। বড় প্রীত বাসে তানে বৈষ্ণব সকল॥
শিশু হৈতে সংসারে বিরক্ত বড় মনে। ঈশ্বর পুরীও স্নেহ করেন তাহানে॥
গদাধর পণ্ডিতেরে আপনার কৃত। পুঁথি পড়ায়েন নাম কৃষ্ণলীলামৃত॥—চৈতন্য ভাগবত।

ঈশ্বর-ভক্ত ভাগবতগণের প্রায়ই সংসারে বিতৃষ্ণা জন্মে। শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের প্রগাঢ় কৃষ্ণভক্তি তাঁহাকে শৈশবাবধি সংসার-বিতৃষ্ণ করিয়াছিল, তাহা শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন দাস ঠাকুর প্রণীত কবিতায় সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইতেছে।

একদিন প্রভাতে গদাধর, গোপীনাথ, রামাই, শ্রীবাস ইত্যাদি ভাগবতগণ সুরধুনী স্নানান্তর প্রাতঃকৃত্য সমাপন করতঃ শ্রীবাসমন্দিরস্থ এক বৃহৎ কুন্দবৃক্ষ মূলে সকলে মিলিয়া কৃষ্ণারাধনার জন্য পুষ্পচয়নে প্রবৃত্ত। এ হেন সময়ে শ্রীমান্ পণ্ডিত মহোদয় হর্ষোৎফুল্ল বদনে তথায় উপস্থিত হইলেন। সকল বৈষ্ণবে তাঁহার হর্ষের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি কহিলেন, "একটী মহা অসম্ভব ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলাম,—মহোদ্ধত নিমাই পণ্ডিত গয়াধাম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া, গত কল্য অপরাহ্নে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ মানসে গমন করি। কিন্তু দেখিলাম, আর সে নিমাই পণ্ডিত নাই, ঔদ্ধত্যের তিলমাত্র চিহ্ন বিদ্যমান নাই। দেখিলাম, পাদপদ্মতীর্থের নাম করিবামাত্র তাঁহার নয়ননীরে ভূমিতল অভিষিক্ত। স্বেদ, কম্প, পুলকে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিকম্পিত এবং কৃষ্ণ কৃষ্ণ ধ্বনি করিয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। তখন তিনি যেন মৃতবৎ অবস্থায়

পরিণত, শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া পর্য্যন্ত রহিত। তাঁহার তদানীন্তন অবস্থা পরিদর্শনে মৃত বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। এইরূপে বহুক্ষণ অতীত হইলে তিনি বাহ্যজ্ঞান লাভ করিলেন, এবং "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" রবে কাঁদিতে কাঁদিতে আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আদেশ করিলেন, তুমি সদাশিব এবং মুরারি পণ্ডিতাদি বৈষ্ণবগণ, শুক্লাম্বরের গৃহে কল্য প্রভাতেই গমন করিবে, এবং আমি তোমাদের নিকটে আত্ম দুঃখ বিবৃত করিব।" যথা,—

সবে এই কথা কহিলেন বাহ্য হৈলে। শুক্লাম্বর গৃহে কালি মিলিবা সকলে॥
তুমি আর সদাশিব পণ্ডিত মুরারি। তোমা সবা স্থানে দুঃখ করিব গোছারি॥

এই কথা শুনিয়া ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া পুষ্প চয়ন করতঃ কৃষ্ণপূজার জন্য গমন করিলেন। শ্রীমান্ পণ্ডিত গঙ্গাতীরে এবং শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী মহোদয় তাঁহার মন্দিরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীমান পণ্ডিতের মুখে পূর্ব্বোক্ত কাহিনী শ্রবণ করিয়া গদাধর প্রভু নিমাই পণ্ডিতের সহিত নিভৃতে ইহাদের কি কৃষ্ণকথা হয়, তাহা শ্রবণের জন্য শুক্লাম্বরের গৃহে গোপনে লুক্কায়িত রহিলেন।

ক্রমে সদাশিব, মুরারি, শ্রীমান, শুক্লাম্বর প্রভৃতি মহাত্মাগণ এক স্থানে সমবেত হইলেন। এ হেন সময়ে প্রেম-ভক্তির স্বরূপাবতার শ্রীশচীকুমার বিশ্বম্ভর প্রভু তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে সসম্ভ্রমে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিল, কিন্তু সেই জগন্নাথ-সুত তখন বাহ্যদৃষ্টি-রহিত। কমল-নয়ন মুদিত করিয়া কেবল ভক্তি-উদ্দীপক শ্লোক পাঠে নিমগ্ন। এবং "পাইলুঁ ঈশ্বর মোর কোন্ দিগে গেলা" ইহা বলিয়াই একটী স্তম্ভ বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। প্রভুর আবেগে সুদৃঢ় স্তম্ভ ভগ্ন হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। মহাপ্রভুও "হা কৃষ্ণ!" বলিয়া আলুলায়িত কেশে ধরণী-পৃষ্ঠে পতিত হইলেন। ভক্তগণও প্রেম-বিগলিত-চিত্তে ঢলিয়া ঢলিয়া পতিত হইলেন। গৌরগতপ্রাণ প্রেমাধার গদাধর প্রভুও গৃহ মধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

পাইলুঁ ঈশ্বর মোর কোন্ দিগে গেলা। এত বলি স্তম্ভ কোলে করিয়া পড়িলা।
ভাঙ্গিল গৃহের স্তম্ভ প্রভুর আবেশে। কোথা কৃষ্ণ বলি পড়িলেন মুক্ত কেশে॥
প্রভু পড়িলেন মাত্র হা কৃষ্ণ বলিয়া। ভক্ত সব পড়িলেন ঢলিয়া ঢলিয়া॥
গৃহের ভিতরে মূর্চ্ছা গেলা গদাধর। কেবা কোন্ দিকে পড়ে নাহি পরাপর॥

এইরূপে কিয়ৎ কাল অতিবাহিত হওয়ার পর, সকলে বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর মুখে অন্য বাক্য নাই। কেবল "হা কৃষ্ণ! হা নন্দনন্দন! হা ব্রজদুলাল! হা গোপীবল্লভ! তুমি কোথা?" এই কথা বলিয়া পুনঃ পুনঃ ভূমিতলে পতিত হইতে থাকিলেন; আর কমল-নয়নে সেই অবিশ্রান্ত প্রেমধারা! সে ধারার বিরাম নাই, শিব-শিরশ্চারিণী ত্রৈলোক্যতারিণী মন্দাকিনী দেবী যেন মহাপ্রভুর নয়নযুগলে প্রেমধারারূপে প্রবাহিতা। ক্ষণকালের তরে শুক্লাম্বর ভবন যেন অনন্ত প্রেম-ভক্তির নিকেতন স্বরূপ হইল। মহাপ্রভু ভূম্যবলুণ্ঠিত হইয়া "কৃষ্ণ" বলিয়া রোরুদ্যমান, আর ভক্তগণ তাঁহার

চতুষ্পার্শ্ব পরিবেষ্টন করিয়া প্রেমাশ্রুবর্ষণে উন্মাদিত! সে অশ্রু মর্ত্ত্যের বস্তু নহে, তাহা গোলোকের অমিয়মাখা ধন। সেরূপ অশ্রু যাঁহার নয়নে বিগলিত হয়, তিনি ত মানব নহেন, তিনি দেবতারও দেবতা; পর্ণকুটীরবাসী দীনদরিদ্র হইলেও একচ্ছত্রাধিপতি সম্রাট অপেক্ষাও বৈভবশালী। তাদৃশ মহাত্মাই শোক-তাপ-সমাচ্ছন্ন সংসার-মরুভূর শান্তিপাদপ, পাপীতাপীর একমাত্র পরিত্রাণকর্ত্তা। যাহা হউক, ভক্তগণ-পরিমণ্ডিত শ্রীশচীনন্দন অব্যক্ত পুলকনীরে নিমগ্ন হইয়া কেবল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বান্তর্য্যামী বিশ্বম্ভরের অবিদিত কি আছে? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "গৃহ মধ্যে কে অবস্থান করিতেছে?" শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী মহাত্মা কহিলেন, "আপনার গদাধরই কাঁদিতেছে।" মহাপ্রভু দেখিলেন, গদাধর হেটমুখে রোদনপরায়ণ, অশ্রুধারায় বিরাম নাই, তাঁহার নলিন-নয়নদ্বয়-বিগলিত প্রেমাশ্রুধারায় ভূমিতল কর্দ্দমাক্ত! শ্রীশচীনন্দন গদাধরের এতাদৃশ কৃষ্ণপ্রেমাধিক্য দর্শনে কহিলেন, "গদাধর! তোমরাই ধন্য, তোমরাই শ্রীনন্দ-নন্দনের প্রিয়তম সুকৃতিশীল ভক্ত। বিশেষতঃ তুমি শৈশবাবধিই কৃষ্ণানুরক্ত, তোমার তুলনা ত্রিভুবনে নাই। কিন্তু আমার এ হেন জন্ম বৃথা রসে ব্যয়িত হইল! অমূল্যনিধি পাইয়াও হেলায় হারাইলাম!

"প্রভু বোলে গদাধর তোমরা সুকৃতি। শিশু হৈতে কৃষ্ণেতে করিলা দৃঢ়মতি।
আমার সে হেন জন্ম গেল বৃথা রসে। পাইনু অমূল্যনিধি গেল দিন দোষে।"

গদাধরের প্রেমভক্তির গভীরতা সন্দর্শনে মহাপ্রভু শ্রীমুখে তাঁহার গুণগানে বিরত হন নাই। বস্তুতঃ গদাধর প্রেমভক্তির নিকেতন স্বরূপ। তাঁহার উপমা বৈষ্ণবজগতেও অতি দুর্লভ। এক দিবস নদীয়াগগনেন্দু প্রেমময় শ্রীশচীনন্দন পড়ুয়াগণকে সন্ধি সূত্র স্থাপন ও খণ্ডন করিয়া বুঝাইতেছেন। রাত্রি ৪ দণ্ড অতীত, তথাপি তাঁহার বিরাম নাই, তিনি একই মনে সন্ধি সূত্র ব্যাখ্যায় নিমগ্ন। এ হেন সময়ে কোন এক নাগরিকের দ্বারদেশ হইতে রত্নগর্ভ আচার্য্য নামক একজন মহাভাগবত পরম ভক্তিভরে নিম্নলিখিত শ্লোকটী আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। যথা—

শ্যামং হিরণ্য পরিধিং বনমালা বর্হ ধাতু প্রবাল নটবেশমনু ব্রতাংশে।
বিন্যস্ত হস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং কর্ণোৎপলালক কপোল মুখাব্জহাসকং॥

(কালিন্দীতীরস্থ উপবনমধ্যে ব্রজপত্নীগণ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন)—তিনি শ্যামলবর্ণ, সুবর্ণসুন্দর, পীতাম্বর, বনমালা, শিখিপুচ্ছ, গৈরিকাদি ধাতু ও প্রবাল সমূহে নব-নটবর-বেশে শোভমান। তিনি একটি কর অনুগত সহচর স্কন্ধে স্থাপন করিয়া অপর করে ক্রীড়া কমল সঞ্চালিত করিতেছেন। তাঁহার কর্ণযুগলে যুগল পদ্ম, কুটিল কুন্তল কপোলচুম্বিত, আর সুমধুর হাস্যবিস্ফারিত মুখাব্জ নিরতিশয় শোভমান।

দৈবক্রমে ঐ শ্লোকধ্বনি মহাপ্রভুর কর্ণে প্রবেশ করিল। প্রভু অমনই প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন।

"ভক্তির প্রভাব মাত্র শুনিল থাকিয়া। সেইক্ষণে পড়িলেন মূর্চ্ছিত হইয়া॥"

এইরূপে কিয়ৎকাল গতে মহাপ্রভু বাহ্যভাব প্রকাশ করতঃ কেবল "বোল বোল" শব্দে অবনী-পৃষ্ঠে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। তাঁহার অশ্রু-কম্প-পুলকের সঙ্গে সঙ্গে অনর্গল প্রেমাশ্রুধারায় ভূমিতল অভিষিক্ত হইতে লাগিল। ভক্তপ্রবর রত্নগর্ভ আচার্য্য মহাশয় তাঁহার এতাদৃশ অলৌকিক প্রেম অবলোকন করিয়া পরম ভক্তিভরে উক্ত শ্লোকটি বারম্বার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

ভক্তপ্রাণ-বল্লভ ভক্তমুখে এতাদৃশ ভক্তিমাখা শ্লোক শ্রবণ করিয়া আনন্দাপ্লুত হৃদয়ে ভাগ্যবান্ রত্নগর্ভ আচার্য্যকে আলিঙ্গন দানে ধন্য করিলেন। ত্রৈলোক্যনাথের সুপূতালিঙ্গন প্রাপ্তে বিপ্রবর প্রেমে উন্মত্ত হইয়া শ্রীশ্রীচৈতন্য প্রভুর চরণকমল ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, এবং ভক্তিভরে পুনঃ পুনঃ সেই শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুও শ্লোক শ্রবণে প্রেমোন্মত্ত চিত্তে কভু ধরাতলে পড়েন, কভু সিংহনাদ করেন, কভু উর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করেন এবং বোল বোল শব্দে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করেন।

প্রভুর হেন দশা অবলোকন করিয়া গদাধর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি দেখিলেন,শ্রীগৌরাঙ্গের কনক-চম্পকাভ কোমল তনু ধূলি-ধূসরিত, কুটিল কুন্তল আলু থালু, নয়ন-কমলে অশ্রুনদী প্রবাহিত, পরিধেয় কটি-বসন স্খলিত। তাই তাঁহার কোমল অন্তরে বেদনা লাগিল, তিনি রত্নগর্ভকে সেই শ্লোক পাঠ করিতে নিষেধ করিয়া অন্যান্য পড়ুয়াগণ-সহ প্রভুকে ধারণ করিলেন।

না পড়িহ আর বলিলেন গদাধর। সভে মিলি ধরিলেন প্রভু বিশ্বম্ভর ॥

গদাধর শ্রীশচীনন্দনের বড় প্রিয়তম। আর একদিন গদাধর প্রভুকে সমভিব্যাহারে লইয়া অখিলতারণ জগন্নাথনন্দন শ্রীমৎ মহাপ্রভু, অদ্বৈত প্রভুর সন্দর্শনে গমন করিলেন।

"একদিন প্রভু গদাধর করি সঙ্গে। অদ্বৈতে দেখিতে প্রভু চলিলেন রঙ্গে ॥"

তাঁহারা অদ্বৈত-ভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অদ্বৈত প্রভু তখন তুলসী দেবীকে জল দান করিতেছেন। আর তাঁহার নয়নযুগল প্রেমাশ্রু-পরিপ্লুত, বাহুদ্বয় উর্দ্ধোত্থিত, বদনমণ্ডলে কেশরী-গর্জ্জনে হরি হরি ধ্বনি! তিনি কখন রোরুদ্যমান, কখন হাস্যধ্বনিতে দশদিক্ বিকম্পিত করিতেছেন। শ্রীপাদ অদ্বৈত প্রভুর এ হেন ভক্তিপ্রাচুর্য্য দর্শন করিয়া, ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনের পূর্ণাবতার শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভর মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। অদ্বৈত প্রভুও যোগবলে জানিতে পারিলেন, যে চোর সূর্য্যতনয়া কালিন্দীতীরস্থ ব্রজধামে বাৎসল্যে নন্দ-যশোমতীর, সখ্যতায় গোপবালকবৃন্দের এবং মধুর ভাবে ব্রজগোপীগণের মন হরণ করিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বানন্দময় শ্রীনন্দনন্দনই শচীসুত রূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ। আজি চোরের চাতুরী ধরিয়াছি এবং চোরের উপরে আজি চুরি করিব।

ভক্তিযোগ প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল। এই মোর প্রাণনাথ জানিলা সকল ॥

কতি যাবে চোরা আজি ভাবে মনে মনে। এত দিন চুরি করি বুল এই খানে।
অদ্বৈতের ঠাঞি চোর না লাগে চোরাই। চোরের উপরে চুরি করিব এথাই"॥

অদ্বৈতের হৃদয়-নিকুঞ্জ তখন বাসন্তি ফল, ফুল, পল্লবে হাস্যময়। প্রেমমন্দাকিনী শতধারে অশ্রু আকারে নয়নদ্বয়ে বিগলিত! তিনি যে শ্রীনন্দনন্দনের অবতার-কামনায় দিবানিশি কত লোকের কত গঞ্জনা সহ্য করিয়াছেন, কত প্রতিদ্বন্দ্বীর তীব্রাক্রমণ বক্ষঃ পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কত নয়ন-জলে ভূমিতল আর্দ্র করিয়া হৃদয়স্থ গভীর বেদনা প্রকাশ করিয়াছেন, যাঁহার লাগিয়া শয়নে স্বপনে স্বস্তি অনুভব করিতে পান না, আজি সেই সর্ব্ব-প্রাণনাথ তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত! তাঁহার কি হর্ষের সীমা থাকিল? সিন্ধুনীর-মগ্ন বিপন্নের উপকূল প্রাপ্তির ন্যায়, উত্তপ্ত মরুভূ-প্রান্তরস্থ পথভ্রান্ত পান্থের ওয়েসিস্ প্রাপ্তির ন্যায়, দস্যু বিতাড়িত বিপদাপন্নের সাধুসন্ন্যাসীর আশ্রম লাভের ন্যায়, তাঁহার হৃদয়ে এক মহৎ আনন্দ-স্রোত ছুটিতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বিবিধ পূজা উপচার সংগ্রহ করিয়া মূর্চ্ছাপন্ন মহাপ্রভুর চরণ-কমল-পূজায় মনোনিবেশ করিলেন।

"সর্ব্ব পূজা সজ্জা লই নামিলা তখনে।"
পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনী লই সেই ঠাঞি। চৈতন্য চরণ পূজে অদ্বৈত গোসাঞি॥
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, চরণ-উপরে। পুনঃ পুনঃ এই শ্লোক পড়ি নমস্করে॥

অদ্বৈত প্রভু তখন নিমাইএর চরণে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপাদি রক্ষা করিয়া ভক্তিগদ্‌গদ চিত্তে বলিতে লাগিলেন।

নমোব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণহিতায়চ জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥

শ্রীপাদ অদ্বৈত প্রভু শ্রীমুখে একবার এই শ্লোক উচ্চারণ করেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীগৌরাঙ্গের ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ শোভিত শ্রীপাদপদ্মে পতিত হন। আর তাঁহার নয়ন-বিগলিত প্রেমধারায় গোরা-পদ-কমল ভাসিতে থাকে।

শ্রীপাদ অদ্বৈত প্রভুর এতাদৃশ আকুলি ব্যাকুলি সন্দর্শনে করুণ-হৃদয় গদাধরের চিত্ত বিগলিত হইল। তাই তিনি নিম্নোক্ত যুক্তি অবলম্বনে তাঁহাকে ক্ষান্ত করিতে প্রয়াসী হইলেন।

হাসি বোলে গদাধর জিহ্বা কামড়ায়ে। বালকেরে গোসাঞি! এমত না জুয়ায়ে॥

কিন্তু শ্রীঅদ্বৈতের চিত্ত কি তাহাতে ক্ষান্ত হয়! তিনি জানিয়াছেন, এই সেই কৌশল্যা-অঙ্কোজ্জ্বল নবঘনশ্যাম, যশোদার স্নেহ পুত্তলী পুতনা-নিধনকারী কালীয়-দমন কালাচাঁদ, বটপত্রশায়ী বালকরূপী ভগবান্, আজি হিরণ্ময়-জ্যোতির্দীপ্ত কলেবরে নদীয়ায় অবতীর্ণ! তিনি কি গদাধরের কথায় স্বীয় সংকল্প পরিত্যাগ করিতে পারেন? তাই তিনি কহিলেন।

হাসয়ে অদ্বৈত গদাধরের বচনে। গদাধর! বালক জানিবা কথো দিনে।

ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যকিঙ্কর কুণ্ডু।

বাৎস্যায়ন ভাষ্য।

(মূল, অনুবাদ ও টিপ্পনী)

(৩)

(২) প্রমাণের যে প্রমেয়, তাহার যে প্রয়োজন ইত্যাদিরূপে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস বুঝিলে অথবা অন্য কোন সমাস বুঝিলে মহর্ষির বিবক্ষিতার্থ বুঝা হয় না। দ্বন্দ্বসমাস বুঝিলেই তাহা বুঝা হয় এবং দ্বন্দ্বসমাস সমাসান্তর হইতে শ্রেষ্ঠ, তাই এখানে দ্বন্দ্বসমাসই বুঝিতে হইবে। দ্বন্দ্বসমাস সমাসান্তর হইতে শ্রেষ্ঠ কেন? তাহার হেতু দেখাইবার জন্য বলিয়াছেন,—"সর্ব্বপদার্থপ্রধানঃ"। এবং এখানে তৎপুরুষ সমাস হইলে চরম পদার্থ নিগ্রহস্থানেরই প্রাধান্য হয়, তাহাতে বিবক্ষিতার্থ হানি হয়। দ্বন্দ্বসমাস হইলে সকল পদার্থের প্রাধান্য হয়, তাহাতে বিবক্ষিতার্থ সিদ্ধিও হয়; তাই "সর্ব্বপদার্থপ্রধানঃ" এই কথার দ্বারা দ্বন্দ্বসমাসের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রচলিত বাৎস্যায়ন ভাষ্যে এখানে—"চার্থেদ্বন্দ্বঃ সমাসঃ"—এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু পরম প্রাচীন উদ্দ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র—"সর্ব্বপদার্থপ্রধানঃ"—এইরূপ পাঠ অবলম্বন করায়, মূলে সেই পাঠই গৃহীত হইয়াছে। চার্থে অর্থাৎ চকারের অর্থে দ্বন্দ্বসমাস, ইহাই পূর্ব্বোক্ত পাঠের অর্থ। চকারের অর্থ ভেদ। এখানে প্রমাণ প্রভৃতি পদার্থগুলির মধ্যে অনেকগুলি অভিন্ন পদার্থ থাকিলেও প্রমাণত্ব প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের ভেদ থাকায় দ্বন্দ্বসমাস হইয়াছে। যেমন "হরিহরৌ"। হরি ও হরে বস্তুতঃ ভেদ না থাকিলেও হরিত্ব ও হরত্বধর্ম্মের ভেদ থাকাতেই ঐরূপ দ্বন্দ্বসমাস হইয়াছে।

(৩) প্রমাণ হইতে নিগ্রহস্থান পর্য্যন্ত ষোড়শ পদার্থের যে তত্ত্ব, তাহার জ্ঞানপ্রযুক্ত নিঃশ্রেয়স লাভ হয়, এইরূপই সূত্রার্থ। সুতরাং 'প্রমাণ…নিগ্রহস্থানানাং'—এই স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ সম্বন্ধ। তত্ত্বের সহিত উহার অন্বয়। "উক্তাদন্যৎশেষঃ"—ইহাই শেষের লক্ষণ। অর্থাৎ কর্তৃত্ব কর্ম্মত্ব প্রভৃতি কারকার্থ ভিন্ন সম্বন্ধ অর্থকেই "শেষ" বলে। প্রমাণাদি পদার্থের সহিত তাহার তত্ত্বের সম্বন্ধ কর্তৃত্বাদি নহে; সুতরাং উহা শেষ। ঐ শেষার্থে বিহিত ষষ্ঠী হইলেই তাহাকে "শৌষিকী" ষষ্ঠী বলে। যেমন ব্রাহ্মণস্য কমণ্ডলুঃ, রাজ্ঞঃ পুরুষঃ ইত্যাদি। ঐ ষষ্ঠ্যর্থ সম্বন্ধের একদেশান্বয় হইতে পারে, যথা—"রামস্য নামমহিমা", "চৈত্রস্য দাসভার্য্যা", ইত্যাদি। "তত্ত্বস্য জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সস্যাধিগমঃ" এই দুই বিগ্রহে "তত্ত্বজ্ঞান" এবং "নিঃশ্রেয়সাধিগম" এই দুইটী সমাস হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বিগ্রহবাক্যদ্বয়ে যে দুইটী ষষ্ঠী বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা শৌষিকী নহে। কারণ, তত্ত্ব, জ্ঞানের কর্ম্ম কারক। নিঃশ্রেয়স, অধিগমের কর্ম্ম কারক। তাহা হইলে ঐ দুই ষষ্ঠী কৃদ্‌যোগে কর্ম্মকারকে বিহিত। উহার অর্থ কর্ম্মত্ব; তাহা শেষ নহে। ঐ ষষ্ঠীবিভক্তি কর্ম্মবিহিত অর্থাৎ কর্ম্মত্বার্থে বিহিত। কৃদ্‌যোগে কর্ম্মবিহিত ঐরূপ ষষ্ঠীবিভক্তির দ্বারা বিগ্রহ করিয়া তৎপুরুষ সমাস হইতে পারে, ইহা "অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা"—এই ব্রহ্মসূত্রের শারীরক ভাষ্য ও শ্রীভাষ্যে সমর্থিত হইয়াছে। ভাষ্যে "অনবয়বেন" এই স্থলে "অবয়ব" শব্দের অর্থ অংশ। "অনবয়বেন" ইহার ব্যাখ্যা "সাকল্যেন"॥

"আত্মাদেঃ খলু প্রমেয়স্য তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ। তচ্চৈতদুত্তরসূত্রেণানূদ্যত ইতি। হেয়ং তস্য নির্ব্বর্ত্তকং হানমাত্যন্তিকং, তস্যোপায়োঽধিগন্তব্য ইত্যেতানি চত্বার্য্যর্থপদানি সম্যগ্‌বুদ্ধ্বা নিঃশ্রেয়সমধিগচ্ছতি।"

অনুবাদ। আত্মা প্রভৃতি প্রমেয়ের তত্ত্বজ্ঞান জন্যই (সাক্ষাৎ) মোক্ষলাভ হয় (১)। সেই এই কথাও পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারা অনূদিত হইতেছে (২)। হেয় অর্থাৎ দুঃখ, তাহার

(দুঃখের) নির্ব্বর্ত্তক অর্থাৎ জনক (অবিদ্যা তৃষ্ণা ধর্ম্ম অধর্ম্ম), তাহার আত্যন্তিক হান অর্থাৎ সেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির কারণ তত্ত্বজ্ঞান, তাহার উপায় (শাস্ত্র) অধিগন্তব্য, অর্থাৎ মোক্ষ, এই চারিটী (হেয়, হান, উপায়, অধিগন্তব্য) অর্থপদ অর্থাৎ শাস্ত্র-প্রতিপাদ্যবিষয় যথার্থরূপে বুঝিয়া মোক্ষলাভ করে।

(১) প্রথমসূত্রে প্রমাণ প্রমেয় প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান মুক্তিলাভের উপায় রূপে অভিহিত হওয়ায়, আত্মা প্রভৃতি প্রমেয়ের তত্ত্বজ্ঞান মুক্তিলাভের উপায়, ইহা বলাই হইয়াছে। আবার দ্বিতীয় সূত্রে বিশেষ করিয়া তাহার পুনরুল্লেখ কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে ভাষ্যকার বলিয়া গিয়াছেন, "অনূদ্যতে",—অর্থাৎ অনুবাদ করা হইয়াছে। সপ্রয়োজন পুনরুক্তিকেই অনুবাদ বলে। আত্মাদির তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষলাভে সাক্ষাৎ কারণ, কেননা আত্মাদি বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানই সংসারের নিদান। আত্মাদির তত্ত্বসাক্ষাৎকার ব্যতীত (দ্বিতীয় সূত্রভাষ্যবর্ণিত) সেই মিথ্যাজ্ঞান সমূহের সমুচ্ছেদ হইতে পারে না। আলোক ব্যতীত কি অন্ধকারের উচ্ছেদ হইতে পারে? ফলতঃ প্রথম সূত্রে সামান্যতঃ বলা হইলেও আত্মাদি প্রমেয় তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষলাভে সাক্ষাৎ কারণ, ইহাই দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা পুনরায় বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। যুক্তি এবং পৃথক্ উপদেশের দ্বারাও মহর্ষির ঐ সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। আত্ম-সাক্ষাৎকার মোক্ষলাভের চরম কারণ, ইহা শ্রুতিসম্মত সত্য। ঐ আত্ম-সাক্ষাৎকারে আত্মমনন শ্রুতি-বোধিত উপায়। ঐ আত্মমননে প্রমাণাদির তত্ত্বজ্ঞান নিতান্ত প্রয়োজন, ইহা ক্রমে পরিস্ফুট হইবে। সুতরাং প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থ তত্ত্বজ্ঞান আত্ম-মননের সহায় হইয়া আত্ম-সাক্ষাৎকার সম্পাদন করিয়া মোক্ষলাভের প্রযোজক। তাই উহারা মোক্ষোপ-যোগী পদার্থ। পরন্তু নিঃশ্রেয়স দ্বিবিধ, দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। ন্যায়-বার্ত্তিককার উদ্যোতকর এবং ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও একথা বলিয়াছেন। প্রথম সূত্রোক্ত ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে অদৃষ্ট নিঃশ্রেয়সের ন্যায় দৃষ্ট নিঃশ্রেয়সেরও লাভ হয়। এই যে সুচিরকাল হইতে সর্ব্বত্র "প্রমাণের" দ্বারাই "প্রমেয়" সিদ্ধি হইতেছে; অভিলষিত "প্রমেয়" সিদ্ধির জন্য "প্রমাণের" অন্বেষণে ছুটাছুটি হইতেছে; আবার "সংশয়" হওয়ায় বিচারের "প্রয়োজন" হইতেছে; "দৃষ্টান্ত" দেখাইয়া "সিদ্ধান্ত" সমর্থন হইতেছে; প্রতিজ্ঞা, হেতু প্রভৃতি (অবয়ব) প্রয়োগ পূর্ব্বক প্রকৃত বক্তব্যের প্রতিপাদন ও সমর্থন হইতেছে; বিশুদ্ধ "তর্কের" সাহায্যে "নির্ণয়" হইতেছে; সভা, সমিতি, রাজধর্ম্মাধিকরণ ও সংবাদপত্রে যথাসম্ভব "বাদ" "জল্প" ও "বিতণ্ডা" চলিতেছে; অপর পক্ষের যুক্তি খণ্ডনকালে এ হেতু হেতুই নহে, ইহা দুষ্ট হেতু, ইত্যাদি রূপে "হেত্বাভাসের" প্রদর্শন চলিতেছে; প্রকৃত কথা বাহির করিবার জন্য কত "ছল" করা হইতেছে; বাদি-নিরাস প্রয়োজন হওয়ায় কত অসদুত্তর ("জাতি") চলিতেছে—আবার অসদুত্তর জানিয়া তাহার উপেক্ষাও চলিতেছে; "নিগ্রহস্থানের" উদ্ভাবন করিয়া পরাজয় ঘোষণা হইতেছে; পরাজয়ে অনেক সময়ে তত্ত্বনির্ণয়ও হইতেছে, এগুলি কি গোতমোক্ত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের প্রকাণ্ড গণ্ডীর ভিতরে থাকিয়াই হইতেছে না? এবং উহার দ্বারা কি সমাজের কোন কার্য্যই হইতেছে না? সত্যের অপলাপ না করিলে বলিতে হয়, উহারা লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের যথাসম্ভব জ্ঞান তত্ত্বান্বেষী ব্যক্তির সর্ব্বদাই যথাসম্ভব উপকার করিতেছে। যাহার মুক্তি কামনা নাই, মুক্তির কথা যিনি ভাবিতেও পারেন না, তাঁহারও অভিলষিত দৃষ্ট ফল লাভের জন্য ঐ জ্ঞান আবশ্যক হইয়া থাকে। প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হইলে তাহার দ্বারা বহু বহু দৃষ্ট নিঃশ্রেয়স লাভ হইয়া থাকে এবং উহার সাহায্যে শ্রুতিবোধিত আত্মমনন সম্পাদন করিয়া মোক্ষমন্দিরের তৃতীয় সোপান—নিদিধ্যাসনে বসিয়া আত্মসাক্ষাৎকারপূর্ব্বক অদৃষ্ট নিঃশ্রেয়স মোক্ষলাভও হইয়া থাকে। মনে হয়, এই জন্যই মহর্ষি দ্বিতীয়

সূত্রের ন্যায় প্রথম সূত্রে অপবর্গশব্দের প্রয়োগ না করিয়া দৃষ্টাদৃষ্ট সাধারণ "নিঃশ্রেয়স" শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। দ্বিতীয় সূত্রে বিশেষ করিয়া অপবর্গের সাক্ষাৎ কারণ প্রকাশ করিয়াছেন।

(২) হেয়, হান, উপায়, অধিগন্তব্য এই কথাগুলির অর্থ ন্যায়বার্ত্তিকের ব্যাখ্যানুসারেই গৃহীত হইয়াছে। "তত্ত নির্ব্বর্ত্তকং" এই কথার দ্বারা দুঃখের জনক যে গুলিকে ধরা হইয়াছে, তাহারা দুঃখের সাধন বলিয়া বিবেকীর দৃষ্টিতে দুঃখ মধ্যেই গণ্য, সুতরাং তাহাদিগকে "হেয়" পক্ষে রাখিয়া গণনা করিয়াই ভাষ্যকার "চত্বার্য্যর্থপদানি"—এইরূপ বলিয়াছেন, নচেৎ উহারা পাঁচটী হয়। ন্যায়বার্ত্তিককার আদি ভাষ্য ব্যাখ্যান স্থলে বলিয়াছেন,—"হেয়ং দুঃখং তদ্ধেতুশ্চ দুঃখমুক্তং"। এখানে বলিয়াছেন,—"হেয়হানোপায়াধিগন্তব্য ভেদাচ্চত্বার্য্যর্থপদানি সম্যকবুদ্ধা নিঃশ্রেয়সমধিগচ্ছতি"। ইহার দ্বারা বুঝা যায়, দুঃখের হেতুকে দুঃখের মধ্যে গণ্য করিয়া তাহাকে আর পৃথকভাবে "অর্থপদ" বলেন নাই। আত্মাদির তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত এই চারিটী অর্থপদের সম্যক্ জ্ঞান হইতে পারে না; সুতরাং এ কথার দ্বারা ভাষ্যকার এখানে দ্বিতীয় সূত্রের মর্ম্মার্থই উদ্ঘাটিত করিয়া গিয়াছেন।

তত্র সংশয়াদীনাং পৃথগ্বচনমনর্থকং সংশয়াদয়োহি যথাসম্ভবং প্রমাণেষু প্রমেয়েষু চান্তর্ভবন্তো নব্যতিরিচ্যন্ত ইতি। সত্যমেতৎ, ইমাস্তুচতস্রো বিদ্যাঃ পৃথক্প্রস্থানাঃ প্রাণভৃতামনুগ্রহায়োপদিশ্যন্তে, যাসাং চতুর্থীয় মান্বীক্ষিকী ন্যায়বিদ্যা। তস্যাঃ পৃথক্প্রস্থানাঃ সংশয়াদয়ঃপদার্থাঃ, তেষাং পৃথগ্বচনমন্তরেণাধ্যাত্মবিদ্যামাত্রমিয়ংস্যাৎ, যথোপনিষদঃ। তস্মাৎ সংশয়াদিভিঃ পদার্থৈঃ পৃথক্প্রস্থাপ্যতে।

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) (১) তাহাদিগের মধ্যে (কথিত ষোড়শ পদার্থের মধ্যে) সংশয় প্রভৃতি পদার্থের (সংশয় হইতে নিগ্রহস্থান পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ পদার্থের) পৃথক্ উল্লেখ নিরর্থক; কারণ সংশয় প্রভৃতি পদার্থগুলি যথাসম্ভব প্রমাণ ও প্রমেয় পদার্থে অন্তর্ভূত হওয়ায় (তাহা হইতে) অতিরিক্ত হইতেছে না। (উত্তর) একথা সত্য; (২) কিন্তু পৃথক্ প্রস্থান অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বিষয়ের বৈলক্ষণ্যবিশিষ্ট এই চারিটী বিদ্যা প্রাণিগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে। যে চারিটী বিদ্যার মধ্যে এই আন্বীক্ষিকী ন্যায়বিদ্যা চতুর্থী। সংশয় প্রভৃতি পদার্থগুলি সেই ন্যায়বিদ্যার পৃথক্প্রস্থান অর্থাৎ অসাধারণ প্রতিপাদ্য। তাহাদিগের পৃথক্ উল্লেখ ব্যতীত এই ন্যায়বিদ্যা উপনিষদের ন্যায় কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা হইয়া পড়ে। অতএব সংশয়াদি পদার্থগুলির দ্বারা মহর্ষি এই ন্যায়বিদ্যাকে পৃথক্ প্রস্থাপিত অর্থাৎ অসাধারণপ্রতিপাদ্যবিশিষ্ট করিয়াছেন।

(১) পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্য্য এই যে, প্রমেয় পদার্থের মধ্যে প্রমাণ পদার্থ থাকিলেও প্রমাণ সকল পদার্থের ব্যবস্থাপক বলিয়া প্রমাণস্বরূপে তাহার জ্ঞান আবশ্যক। তজ্জন্য প্রমাণের পৃথক উল্লেখ আবশ্যক; কিন্তু সংশয় প্রভৃতি পদার্থগুলির উল্লেখের প্রয়োজন কি? উহারা যথাসম্ভব কথিত প্রমাণ ও প্রমেয় পদার্থেই অন্তর্ভূত আছে। অবশ্য উহারা সকলেই প্রমেয় পদার্থে অন্তর্ভূত, ইহা বলিলেও প্রকৃতস্থলে কোন ক্ষতি ছিল না; উহাদিগের এক একটী ধরিয়া পৃথক উল্লেখের কারণসমর্থনস্থলে ভাষ্যকার কেবল প্রমেয়ে অন্তর্ভাবের কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু এখানে একসঙ্গে সংশয়াদি চতুর্দ্দশ পদার্থের কথিত পদার্থে অন্তর্ভাব বলিতে যাইয়া নিজ বাক্যের ন্যূনতা পরিহারের জন্য প্রমাণে অন্তর্ভাবের কথাও বলিয়াছেন। কারণ উহাদের

মধ্যে কোন পদার্থ প্রমাণেও অন্তর্ভূত আছে, যেমন "নির্ণয় পদার্থ"। প্রমাণের ফল নির্ণয় অন্য ফলের সাধন হইয়া প্রমাণও হইবে,—ইহা প্রমাণসূত্রের ভাষ্যে প্রকটিত আছে। ন্যায়-বার্ত্তিককারও স্থলান্তরে—"অন্তর্ভাবঃ প্রমাণেষু প্রমেয়েষুবা" ইত্যাদি গ্রন্থসন্দর্ভের দ্বারা নির্ণয়ের প্রমাণে অন্তর্ভাবের কথা বলিয়া গিয়াছেন। অবশ্য উঁহারা সকলেই প্রমাণে অন্তর্ভূত নহে তাই বলিয়াছেন "যথাসম্ভবং।"

(২) উত্তরপক্ষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ন্যায়বিদ্যার প্রস্থানভেদ রক্ষার জন্য সংশয়াদি পদার্থগুলির পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। ত্রয়ী, দণ্ডনীতি, বার্ত্তা ও আন্বীক্ষিকী এই চারিটী বিদ্যা মানবের অশেষ মঙ্গলের সাধন। মহর্ষি মনুও রাজার শিক্ষণীয় বিষয় বলিতে বলিয়াছেন,—"ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাদ্দণ্ডনীতিঞ্চশাশ্বতীং। আন্বীক্ষিকীঞ্চাত্মবিদ্যাং বার্ত্তারম্ভাংশ্চলোকতঃ" ।৭।৪৩। প্রাচীন ভাষ্যকার মেধাতিথির চরম ব্যাখ্যায় মনুবচনে "আত্মবিদ্যা" "আন্বীক্ষিকী"রই বিশেষণ। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নেরও ঐমত বলিয়া বুঝা যায়। এই চারিটী বিদ্যার মধ্যে ত্রয়ীর প্রস্থান অর্থাৎ অসাধারণ প্রতিপাদ্য অগ্নিহোত্রহবনাদি। দণ্ডনীতির প্রস্থান স্বামী অমাত্য প্রভৃতি। বার্ত্তার প্রস্থান হলশকটাদি। আন্বীক্ষিকীর প্রস্থান সংশয়াদি পদার্থ। এই প্রস্থানভেদেই ঐ চারিটী বিদ্যার ভেদ হইয়াছে। যদি এই "আন্বীক্ষিকী"তে সংশয়াদি পদার্থগুলির বিশেষ করিয়া পৃথক্ উল্লেখ না থাকে, তাহা হইলে ইহা "ত্রয়ী"র মধ্যেই পড়ে, বার্ত্তা বা দণ্ডনীতির মধ্যে পড়িবার সম্ভাবনাই নাই। তাই বলিয়াছেন,—"অধ্যাত্মবিদ্যামাত্রমিয়ংস্যাৎ"। এখানে "মাত্র" শব্দের দ্বারা আন্বীক্ষিকী আত্মবিদ্যা কিন্তু কেবল উপনিষদের ন্যায় আত্মবিদ্যা নহে ইহারই সূচনা করিয়াছেন। ত্রয়ীর মধ্যে পড়িলে ইহা চতুর্থী বিদ্যাও হইতে পারে না কারণ তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত বিদ্যা কেবল তিনটী হইয়া পড়ে। ফলতঃ অন্য বিদ্যার প্রতিপাদ্য হইতে ন্যায়বিদ্যার প্রতিপাদ্য ভেদ করিয়া তাহার দ্বারা অন্য বিদ্যা হইতে ন্যায়বিদ্যার ভেদসাধন ও ভেদজ্ঞাপনই সংশয়াদি পদার্থের পৃথক্ উল্লেখের কারণ; সুতরাং উহা নিরর্থক নহে।

তত্র নানুপলব্ধে ননির্ণীতেঽর্থে ন্যায়ঃ প্রবর্ত্ততে। কিং তর্হি? সংশয়িতেঽর্থে। যথোক্তং "বিমৃশ্যপক্ষ প্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়" ইতি। বিমর্শঃসংশয়ঃ, পক্ষপ্রতিপক্ষৌ ন্যায়প্রবৃত্তিঃ, অর্থাবধারণং নির্ণয়স্তত্ত্বজ্ঞানমিতি। সচায়ং কিংস্বিদিতি বস্তুবিমর্শমাত্র মনবধারণং জ্ঞানং সংশয়ঃপ্রমেয়েঽন্তর্ভবন্নেবমর্থং পৃথগুচ্যতে॥

অনুবাদ। (১) সেই সংশয় প্রভৃতি পদার্থগুলির মধ্যে (প্রথমোক্ত সংশয়ের কথাই ক্রমানুসারে প্রথমতঃ বিশেষ করিয়া বলিতেছেন) অজ্ঞাত পদার্থে ন্যায় (প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি অবয়বসমূহ) প্রবৃত্ত হয় না। নিশ্চিত পদার্থে ন্যায় প্রবৃত্ত হয় না। (প্রশ্ন) তবে কি? (উত্তর) সন্দিগ্ধ পদার্থে ন্যায় প্রবৃত্ত হয়। যথা মহর্ষি বলিয়াছেন,—"বিমৃশ্যপক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ" (ন্যায়সূত্র ১ অঃ ৪১ সূত্র)। বিমর্শ বলিতে সংশয়। পক্ষ ও প্রতিপক্ষ বলিতে ন্যায় প্রবৃত্তি। অর্থাবধারণ বলিতে নির্ণয়, তত্ত্বজ্ঞান। "কিং স্বিৎ" অর্থাৎ ইহাই কি? এইরূপে বস্তুর বিতর্ক মাত্র অনবধারণ জ্ঞানরূপ সেই এই (ন্যায়াঙ্গ) সংশয়, প্রমেয়ে অন্তর্ভূত হইলেও "এবমর্থ", অর্থাৎ ন্যায় প্রবৃত্তির নিমিত্ত পৃথক্ উক্ত হইয়াছে।

(১) অনুপকারী পদার্থের পৃথক্ উল্লেখে বিদ্যার প্রস্থানভেদ হইতে পারে না। তাহা হইলে যে কোন পদার্থের দ্বারাই তাহা হইতে পারিত। সংশয়াদি বিশেষ পদার্থগুলির পৃথক উল্লেখের কোন বিশেষ হেতু থাকা চাই। এজন্য এখন ঐ সংশয় প্রভৃতি পদার্থের যথাক্রমে প্রত্যেকের উল্লেখপূর্ব্বক এবং প্রকৃত বক্তব্য সমর্থনের জন্য উহাদিগের অনেক পদার্থের স্বরূপ কীর্ত্তনপূর্ব্বক ন্যায়বিদ্যাতে উহাদিগের উপযোগিতা

দেখাইয়া পূর্ব্বোক্ত পৃথক্ উক্তির কারণ সমর্থন করিতেছেন। "নানুপলব্ধে",—ইত্যাদি ভাষ্যের দ্বারা সংশয়ের ন্যায়াঙ্গতা প্রকটিত হইয়াছে। অর্থাৎ সন্দিগ্ধ পদার্থেই ন্যায় প্রবৃত্তি হয়, সুতরাং সংশয় ন্যায়ের অঙ্গ। অতএব ন্যায়বিদ্যার সংশয় বিশেষরূপে ব্যুৎপাদ্য, তাই প্রমেয়ের মধ্যে জ্ঞানস্বরূপে সামান্যতঃ সংশয়ের উল্লেখ থাকিলেও বিশেষরূপে আবার তাহার পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা একেবারে অজ্ঞাত অথবা নির্ণীত সেই পদার্থে ন্যায় প্রবৃত্তি হয় না, একথা বলিলে যাহা জ্ঞাত এবং অনির্ণীত এমন পদার্থেই ন্যায় প্রবৃত্তি হয়, ইহাই বুঝা যায়; কিন্তু যাহা জ্ঞাত তাহা অনির্ণীত হইবে কিরূপে? জ্ঞাত হইলেই নির্ণীত হইল, একথার উত্তরে ন্যায়বর্ত্তিককার বলিয়াছেন যে, সামান্যতঃ নির্ণীত হইলেও বিশেষরূপে অনির্ণীত হইতে পারে। পর্ব্বতস্বরূপে পর্ব্বত নির্ণীত হইলেও বহ্নিমত্ত্বাদিরূপে অনির্ণীত হইতে পারে, তাই তাহাতে ন্যায় প্রবৃত্তি হয়। "বিমৃশ্য পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়:",—এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষি বলিয়াছেন যে, বিমর্শ পূর্ব্বক অর্থাৎ সংশয়পূর্ব্বক পক্ষ-প্রতিপক্ষের দ্বারা অর্থাবধারণই নির্ণয়। ভাষ্যকার এ কথার দ্বারাও সংশয়ের ন্যায়াঙ্গতার সমর্থন করিয়াছেন। বিপরীতভাবে অর্থাবধারণ মহর্ষির নির্ণয় পদার্থ নহে, তাই নির্ণয়ের পুনর্ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"তত্ত্বজ্ঞানং"।

অথ প্রয়োজনং, যেন প্রযুক্তঃ প্রবর্ত্ততে তৎপ্রয়োজনং যমর্থমভীপ্সন্ জিহাসন্ বা কর্ম্মারভতে। তেনানেন সর্ব্বে প্রাণিনঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সর্ব্বাশ্চবিদ্যাব্যাপ্তাঃ। তদাশ্রয়শ্চ ন্যায়ঃ প্রবর্ত্ততে।

অনুবাদ। (১) অনন্তর (সংশয়ের পর) প্রয়োজন (পৃথক উক্ত হইয়াছে)। যাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া (জীব) প্রবৃত্ত হয় তাহাই প্রয়োজন। যে পদার্থকে পাইতে ইচ্ছা করতঃ অথবা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করতঃ (জীব) কর্ম্ম আরম্ভ করে (সেই পদার্থ প্রয়োজন)। সেই এই প্রয়োজন কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রাণী, সর্ব্বকর্ম্ম এবং সর্ব্ববিদ্যা ব্যাপ্ত। এবং তদাশ্রয় হইয়া অর্থাৎ সেই প্রয়োজনের আশ্রিত হইয়া ন্যায় প্রবৃত্ত হয়।

(১) সংশয়ের পরে প্রয়োজনের কথা। "প্রযুজ্যতেঽনেন"—এই ব্যুৎপত্তিতে প্রয়োজন শব্দটী সিদ্ধ। যেন 'প্রযুক্তঃ প্রবর্ত্ততে' এই কথার দ্বারা ভাষ্যকার প্রয়োজন শব্দের ব্যুৎপত্তি সূচনার সহিত প্রয়োজনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অর্থাৎ যাহা জীবের প্রবৃত্তির প্রয়োজক তাহাই প্রয়োজন। ভাষ্যকারের মতে প্রাপ্য পদার্থের ন্যায় ত্যাজ্য পদার্থও প্রয়োজন। কারণ ত্যাজ্য পদার্থকে ত্যাগ করিবার ইচ্ছাবশতঃও জীব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে;—সুতরাং প্রাপ্য পদার্থের ন্যায় ত্যাজ্য পদার্থও কর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রয়োজক। ভাষ্যকার ইহা বিশদ করিয়া বলিবার জন্যই—"যমর্থমভীপ্সন্ জিহাসন বা কর্ম্মারভতে"—এই ভাষ্য সন্দর্ভের দ্বারা প্রয়োজনের পুনর্ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রয়োজন ন্যায়ের অঙ্গ। পূর্ব্বে প্রয়োজন জ্ঞান পরে ন্যায় প্রবৃত্তি। এবং প্রয়োজন কেবল ন্যায়েরই অঙ্গ নহে। উহা সর্ব্বপ্রাণীর সর্ব্বকর্ম্মের মূল। সর্ব্ববিদ্যার প্রবর্ত্তক। তাই ভাষ্যকর বলিয়াছেন সর্ব্বপ্রাণী সর্ব্বকর্ম্ম সর্ব্ববিদ্যা প্রয়োজন ব্যাপ্ত। প্রয়োজন সকলেরই ব্যাপক। প্রয়োজনশূন্য কিছুই নাই। প্রয়োজন জ্ঞান ব্যতীত কেহ ন্যায় প্রয়োগ করেন। তাই শেষে বলিয়াছেন,—"তদাশ্রয়শ্চ ন্যায়ঃ প্রবর্ত্ততে"। এখানে "তৎপ্রয়োজনং আশ্রয়োযস্য"—এইরূপ সমাসে "তদাশ্রয়" বলিতে তদাশ্রিত। বার্ত্তিককার বলিয়াছেন, যেমন পণ্ডিত রাজাশ্রিত, তদ্রূপ ন্যায় প্রয়োজনের আশ্রিত। প্রয়োজনেরই আশ্রয়ত্ব বলিয়াছেন উপকারকত্ব। প্রয়োজন ন্যায়ের উপকারক কেন? ইহার উত্তরে বলিয়াছেন,—"তন্মূলত্বাৎ পরীক্ষাবিধেঃ" অর্থাৎ ন্যায়ের দ্বারা যে বস্তু পরীক্ষা হয় তাহার মূলই প্রয়োজন। ফলতঃ ন্যায়াঙ্গ বলিয়া ন্যায় বিদ্যায় "প্রয়োজন" বিশেষরূপে ব্যুৎপাদ্য, তাই প্রয়োজন বিশেষ করিয়া পৃথক্রূপে অভিহিত হইয়াছে।

কঃ পুনরয়ংন্যায়ঃ ? প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং ন্যায়ঃ। প্রত্যক্ষাগমাশ্রিতমনুমানং সাঽন্বীক্ষা। প্রত্যক্ষাগমাভ্যামীক্ষিতস্যান্বীক্ষণমন্বীক্ষা তয়াপ্রবর্ত্তত ইত্যান্বীক্ষিকী ন্যায়বিদ্যা ন্যায়শাস্ত্রং। যৎপুনরনুমানং প্রত্যক্ষাগমবিরুদ্ধং ন্যায়াভাসঃ স ইতি।

অনুবাদ। (প্রশ্ন) এই ন্যায় কি ? (উত্তর) প্রমাণ সমূহের দ্বারা (১) অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি সর্ব্ব প্রমাণ মূলক প্রমাণ-প্রতিরূপক প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পঞ্চাবয়বের দ্বারা অর্থের অর্থাৎ হেতুর পরীক্ষা ন্যায়। প্রত্যক্ষ এবং আগম প্রমাণের আশ্রিত অনুমান সেই (শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ) অন্বীক্ষা। বিশদার্থ এই যে,—(২ "প্রত্যক্ষ এবং শব্দপ্রমাণের দ্বারা ঈক্ষিত অর্থাৎ জ্ঞাত পদার্থের অন্বীক্ষণ (পশ্চাৎ জ্ঞান) অন্বীক্ষা। সেই অন্বীক্ষার দ্বারা প্রবৃত্ত হয়, এই জন্য আন্বীক্ষিকী, ন্যায়বিদ্যা ন্যায়শাস্ত্র। (৩) যাহা কিন্তু প্রত্যক্ষ ও আগম বিরুদ্ধ অনুমান, তাহা ন্যায়াভাস (ন্যায় নহে)।

(১) প্রয়োজনকে ন্যায়ের আশ্রয় বলা হইয়াছে। এই ন্যায় কাহাকে বলে, তাহা বলিতে হয়, এ জন্য প্রশ্নপূর্ব্বক সেই ন্যায়ের স্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন। প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পঞ্চাবয়ব প্রমাণ না হইলেও সর্ব্বপ্রমাণ-মূলক। উহাদিগের মূল প্রমাণগুলিকে লক্ষ্য করিয়াই উহাতে প্রমাণ শব্দের গৌণ প্রয়োগ করিয়াছেন। উহারা মূলীভূত প্রমাণগুলির সূচনার দ্বারাই অর্থ পরীক্ষায় উপযোগী হয়, সুতরাং উহারা প্রমাণ-চতুষ্টয়ের অবান্তর ব্যাপার। তাই উহারা প্রমাণ-প্রতিরূপক, অর্থাৎ প্রমাণ সদৃশ ; তাই প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বকেই প্রমাণ শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন,—"প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং ন্যায়ঃ"। এখানে অর্থ পরীক্ষা বলিতে হেতুর পরীক্ষা। তাৎপর্য্য-টীকাকার তাহাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হেতু পরীক্ষিত হইলেই তাহার দ্বারা সাধ্যসিদ্ধি হইয়া যায় ; সুতরাং এখানে হেতু পরীক্ষাকেই ন্যায় বলিয়াছেন। ভাষ্যকার আন্বীক্ষিকী শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াও কথিত ন্যায়স্বরূপের সমর্থন করিতেছেন,— "প্রত্যক্ষাগমাশ্রিত-মনুমানং" ইত্যাদি।

(২) প্রত্যক্ষ ও আগমের আশ্রিত অনুমানকে "অন্বীক্ষা" বলিয়া পরে স্বপদ বর্ণন করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ ও শব্দ প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত পদার্থের পশ্চাৎ জ্ঞান অন্বীক্ষা। এই অন্বীক্ষার দ্বারা প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ এই অন্বীক্ষার নির্ব্বাহক বলিয়াই ন্যায়বিদ্যাকে আন্বীক্ষিকী বলে। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, যখন ন্যায়বিদ্যার সাক্ষাৎ ফল অন্বীক্ষা প্রত্যক্ষ ও শব্দ-প্রমাণ-মূলক, তখন "প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং ন্যায়ঃ"— এই কথা বলা যাইতে পারে। পঞ্চাবয়বের মধ্যে "প্রতিজ্ঞা" শব্দ-প্রমাণ-মূলক ; "উদাহরণ" প্রত্যক্ষপ্রমাণ-মূলক ইহা পরে সুব্যক্ত হইবে। সুতরাং ন্যায়স্থলীয় অনুমান পঞ্চাবয়ব-যুক্ত বলিয়া প্রত্যক্ষ ও আগমের আশ্রিত হইবেই। অর্থাৎ ন্যায় প্রয়োগ করিয়া প্রত্যক্ষ ও আগমের দ্বারা বিবেচিত পদার্থেরই অন্বীক্ষণ করা হইয়া থাকে। "আন্বীক্ষিকী" শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখাইয়া তাহার রূঢ়ার্থ দেখাইয়াছেন "ন্যায়বিদ্যা"। কোষকার অমর সিংহও বলিয়াছেন—"আন্বীক্ষিকী তর্কবিদ্যা"। "ন্যায়বিদ্যা" বলিলে ন্যায়বিষয়ক জ্ঞানও বুঝিতে পারা যায়, তাই শেষে তাহারও বিবৃতি করিয়াছেন "ন্যায়শাস্ত্রং"।

পরন্তু শ্রুতিতে আত্মার শ্রবণের পরে মননের বিধান আছে। ঐ আত্ম-মননরূপ অন্বীক্ষার নির্ব্বাহক বলিয়াই ন্যায়বিদ্যাকে আন্বীক্ষিকী বলে। "শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ"—এই শ্রুতির "মন্তব্যঃ" এই অংশে ভিত্তি স্থাপন করিয়াই ন্যায়বিদ্যার গঠন। তাই আন্বীক্ষিকী মননশাস্ত্র অর্থাৎ শ্রুতিসিদ্ধ আত্মমননই ন্যায়বিদ্যার মুখ্য লক্ষ্য ব্যাপার। আত্মা মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ ; ঐ আত্মাকে আগমের দ্বারা বুঝিয়া পশ্চাৎ তাঁহার মনন

(অনুমান বিশেষ) করিলে উহা প্রত্যক্ষ ও আগমের দ্বারা ঈক্ষিত পদার্থেরই অন্বীক্ষা হয়; সুতরাং এখানে অন্বীক্ষা বলিতে সেই শ্রুতিসিদ্ধ আত্মমননকে বুঝিয়াও আন্বীক্ষিকী শব্দের ব্যুৎপত্তি বুঝা যাইতে পারে। ভাষ্যে "সাংবীক্ষা" এই স্থলে প্রসিদ্ধার্থক তৎ শব্দের দ্বারাও শ্রুতিসিদ্ধ মননই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে প্রদর্শিত ন্যায় স্বরূপের সমর্থন হয় না বলিয়া, এখানে এরূপ ব্যাখ্যা অনেকেরই সম্মত নহে। শ্রুতিসিদ্ধ আত্মমনন মুমুক্ষুর স্বার্থানুমান—উহা পরার্থানুমান নহে; সুতরাং তাহাতে ন্যায় প্রয়োগ নাই। "প্রত্যক্ষাগমাশ্রিতমনুমানং"—ইত্যাদি ভাষ্যের মূল তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যক্ষ ও আগমের অবিরোধী না হইলে তাহা ন্যায় হইবে না। তাই শেষে বলিয়াছেন,—"যৎ পুনরনুমানং" ইত্যাদি।

(৩) "বহ্নিরনুষ্ণঃ কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ"—এইরূপে বহ্নিতে অনুষ্ণত্বের অনুমান, প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ। বহ্নির উষ্ণত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ; সুতরাং তাহাতে অনুষ্ণত্ব প্রত্যক্ষ-বাধিত। অনুমান অপেক্ষায় প্রত্যক্ষ প্রবল প্রমাণ; সুতরাং ঐ অনুমান প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ বলিয়া উহা ন্যায়াভাস।

"নরশিরঃ-কপালং শুচি প্রাণ্যঙ্গত্বাৎ শঙ্খবৎ"—এইরূপে নরশিরঃ-কপালে শুচিত্বের অনুমান আগমবিরুদ্ধ; সুতরাং উহাও ন্যায়াভাস। নরশিরঃ-কপালের অশুচিত্ব শাস্ত্রসিদ্ধ। শঙ্খ মৃত প্রাণীর অঙ্গ হইলেও তাহার শুচিত্ব শাস্ত্রসিদ্ধ। শঙ্খের শুচিত্ব-বোধক-শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়াই শঙ্খকে ঐ অনুমানে দৃষ্টান্ত করা হইয়াছে; সুতরাং ঐ শাস্ত্রের সজাতীয় অন্যশাস্ত্রের দ্বারা নরশিরঃ কপালের অশুচিত্ব সিদ্ধ হওয়ায় তাহার শুচিত্বানুমান শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। যিনি শাস্ত্র মানেন না তিনিও ঐরূপ অনুমান করিতে পারেন না; কারণ শঙ্খের শুচিত্ব শাস্ত্র দ্বারাই তাহাকে সিদ্ধ করিতে হইবে। ঐ অনুমানের আশ্রয় বলিয়াও শাস্ত্র অনুমান অপেক্ষায় প্রবল প্রমাণ ইহা তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ "ঈশ্বরো ন কর্ত্তা অশরীরিত্বাৎ প্রয়োজনা-ভাবাদ্বামুক্তাত্মবৎ"—এইরূপে ঈশ্বরে কর্তৃত্বাভাবের অনুমানও পূর্ব্বোক্তরূপে শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া ন্যায়াভাস। ফলতঃ দ্বিবিধ শব্দ প্রমাণ বিরুদ্ধ অনুমানই ন্যায়াভাস। কারণ শব্দ প্রমাণ অনুমানের অপেক্ষায় প্রবল। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন, ঈশ্বরে কর্তৃত্বাভাবের অনুমান করিতে ঈশ্বরকে আশ্রয় করিতে হইবে। সুতরাং কর্তৃত্বরূপে ঈশ্বর সাধক অনুমান ঐ অনুমানের মূল। ঐ মূলানুমান বিরুদ্ধ বলিয়াও ঐ অনুমান ন্যায়াভাস। ভাষ্যকার অনুমান বিরুদ্ধ অনুমানকে ন্যায়াভাস বলেন নাই কেন? ইহার উত্তরে ন্যায়বার্ত্তিককার বলিয়াছেন, একত্র দুইটী অনুমানের সমাবেশ হইতে পারে না বলিয়া, অনুমান, অনুমানবিরুদ্ধ হইতে পারে না। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, পরস্পর নিরপেক্ষ সমানকাল প্রবৃত্ত সমর্থ দুইটী অনুমানের একত্র সমাবেশ হইতে পারে না; ইহাই বার্ত্তিককারের তাৎপর্য্য। দুইটী অনুমান তুল্যবল হইলে সৎপ্রতিপক্ষ হয়, তাহা অনুমিতি জন্মাইতে সমর্থ নহে; সেখানে সাধ্য ও সাধ্যাভাব বিষয়ে সংশয়ই জন্মিয়া থাকে। দুইটীই তুল্যবল বলিয়া সেখানে কেহ কাহাকেও বাধা দিতে পারে না। প্রত্যক্ষ ও শব্দ প্রমাণ অনুমান অপেক্ষা প্রবল বলিয়া অনুমানকে বাধা দিতে পারে। এবং কোন স্থলে পূর্ব্বপ্রবৃত্ত মূলীভূত অনুমানও (যেমন ঈশ্বরে কর্তৃত্বাভাবের অনুমান করিতে পূর্ব্বপ্রবৃত্ত ঈশ্বরের অনুমান) প্রবল বলিয়া প্রকৃতানুমানকে বাধা দিতে পারে। এবং উপমান-বিরুদ্ধ অনুমানও ন্যায়াভাস। তবে সেখানে সেই অনুমান উপমান প্রমাণের মূল শব্দ প্রমাণ বিরুদ্ধ হওয়াতেই ন্যায়াভাস হইতে পারিবে, ইহা মনে করিয়া ভাষ্যকার উপমান-বিরুদ্ধ অনুমানের কথা পৃথক্ করিয়া বলেন নাই। ইহাই বাচস্পতি মিশ্রের মীমাংসা।

ভাষ্য। "তত্রবাদজল্পৌ সপ্রয়োজনৌ, বিতণ্ডাতু পরীক্ষ্যতে"।

অনুবাদ। (১) তাহাতে (পূর্ব্বোক্ত ন্যায়াভাসে) বাদ ও জল্প (বাদ ও জল্পনামক

কথা-বিশেষ) সপ্রয়োজন, কিন্তু বিতণ্ডাকে বিতণ্ডানামক কথা-বিশেষকে) পরীক্ষা করিতেছি (২) (সপ্রয়োজন কি নিষ্প্রয়োজন তাহা বিচার করিতেছি)।

(১)। ভাষ্যের "তত্র" এই কথার ব্যাখ্যায় ন্যায়-বার্ত্তিককার লিখিয়াছেন—"তস্মিন্ ন্যায়াভাসে"। ন্যায়-বার্ত্তিক তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন, অব্যবহিত পূর্ব্বে ন্যায়াভাসের কথা থাকাতেই বার্ত্তিককার ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ ন্যায়েও বাদ ও জল্প সপ্রয়োজন। বাদ ও জল্পস্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে একের ন্যায় এবং অপরের ন্যায়াভাস হইয়া থাকে। কারণ দুইটী বিরুদ্ধতত্ত্ব কোন মতেই প্রমাণ-সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং ন্যায়াভাসে বাদ ও জল্পের সপ্রয়োজনত্ব কথা অসঙ্গত হয় নাই। বাদ ও জল্পস্থলে একপক্ষে ন্যায়াভাস থাকিবেই।

(২)। বাদ ও জল্পের সপ্রয়োজনত্ব নির্ব্বিবাদ। কিন্তু বিতণ্ডার সপ্রয়োজনত্বে বিবাদ আছে। উহা সন্দিগ্ধ। কারণ-প্রতিপক্ষ স্থাপনাহীন বাক্যসমূহই বিতণ্ডা। বিতণ্ডায় প্রতিপক্ষের অর্থাৎ প্রতিবাদীর স্বপক্ষের স্থাপনা (প্রমাণাদির দ্বারা সাধন) না থাকায় তাহার স্বপক্ষই নাই ইহা বুঝিতে পারা যায়, কারণ স্থাপনীয়কেই স্বপক্ষ বলে। বৈতণ্ডিকের স্বপক্ষ থাকিলে তাহার স্থাপনা থাকিতই। আবার "বিতণ্ডাতে ব্যাহন্যতে পরপক্ষসাধনমনয়া"—এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে 'পরপক্ষ-খণ্ডনের দ্বারা পরিশেষে স্বপক্ষ-সিদ্ধিই বিতণ্ডার প্রয়োজন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং বিতণ্ডার সপ্রয়োজনত্ব সন্দিগ্ধ। এখন যদি বিতণ্ডার নিষ্প্রয়োজনত্ব পক্ষই সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে "বিতণ্ডা" রূপ কর্ম্ম বা বিদ্যা প্রয়োজন ব্যাপ্ত হয় না। "সর্ব্বকর্ম্ম, সর্ব্ব বিদ্যা প্রয়োজন-ব্যাপ্ত" এই পূর্ব্ব সিদ্ধান্তের ব্যাঘাত হয়, তাই ভাষ্যকার এখন বিতণ্ডার নিষ্প্রয়োজনত্ব পক্ষ খণ্ডন করিয়া সপ্রয়োজনত্ব পক্ষের সমর্থন করিবেন। তাই বলিয়াছেন, "বিতণ্ডাতু পরীক্ষ্যতে"। ফলতঃ "তত্র বাদজল্পৌ" ইত্যাদি ভাষ্য "প্রয়োজন ব্যাখ্যারই অঙ্গ"। সংশয়ের পরে "প্রয়োজনের" ব্যাখ্যাই চলিতেছে।

ক্রমশঃ

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

শান্তি-সাধনা।

মানুষ সামান্য জ্ঞান লাভ করিলে দেখিতে পায়, সে যেন একটি গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ, তাহার কর্ম্মক্ষেত্রের পরিসর সঙ্কীর্ণ। শৈশব হইতে যতই আমরা অগ্রসর হই,—ততই দেখি, আমাদের জীবনের পরিধি ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, স্বার্থ ভুলিয়া পরার্থ, পরিবার ভুলিয়া জগৎ, যেন আমাদের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। এমন কি দেখিতে পাই, কোন কোন মহাত্মা প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া পশুপক্ষী, বৃক্ষ, লতাপাতা কর্ম্মজীবনের পরিধির ভিতর ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু যতই আমরা এই পরার্থপরতার দিকে ধাবিত হই, আমরা দেখিতে পাই,—কর্ম্ম অনন্ত,—কর্ম্মক্ষেত্র সীমাহীন গগনের ন্যায় দিগন্ত-বিস্তৃত হইয়া বিরাজ করিতেছে। এই অনন্তপ্রবাহ কর্ম্ম-স্রোতে কতরূপে কতশক্তি খেলা করিতেছে, দেখিলে সত্য সত্যই চিত্ত স্তম্ভিত ও বিস্মিত হয়। এই সীমাহীন কর্ম্মক্ষেত্রে তুমি, আমি কর্ম্মী—আজীবন নিজের পরিধিতে বেষ্টিত থাকিয়া কর্ম্ম করিতেছি। ফল পাইতেছি,—সুখ বা দুঃখ। যখন নিজের অভিলাষ-অনুযায়ী ফল লাভ করিতেছি, তখন হৃদয়ে অনুকূল-বেদনীয় স্পন্দন হইতেছে—অনুভব হইতেছে সুখ; যখন প্রতিকূল-বেদনীয় স্পন্দন হইতেছে—তখন অনুভব হইতেছে দুঃখ। মোটা কথায়, যখন কোন অভাবের পূরণ হইতেছে, তখন আমরা সুখ পাইতেছি; আর যখন কোন অভাবের পূরণ হইতেছে না তখন পাইতেছি দুঃখ। মানবজীবন অভাবময়—অভাবকে জীবনের কেন্দ্রীভূত করিয়া মানব কর্ম্মজগতে অহর্নিশ ঘুরিতেছে। কর্ম্ম যদি অভাব মোচন করিয়া দেয়, আমরা সুখ পাই, যদি মোচন না করিতে পারে, আমরা দুঃখ পাই। তবেই দেখিতেছি, মানবজীবন সুখ ও দুঃখের ভিতর খেলা করিতেছে কবি ঠিকই বলিয়াছেন—Human life is just like a pendulum between smiles and tears। অনন্ত কর্ম্মপথের পথিক! এ ভিন্ন তোমার আর গত্যন্তর নাই। তোমার ক্ষুদ্র কর্ম্মজীবনের পরিধি যতই বড় হোক্ না কেন, অনন্তের দিক্ দিয়া তাহা চিরকালই ক্ষুদ্র—তোমায় খাটিতে হইবে, দৌড়াইতে হইবে, কখনও সুরস আস্বাদনে তুমি তৃপ্ত হইবে, কখনও দুঃখ-প্রাপ্তিতে অবসন্ন হইবে—কিন্তু পাইবে না শান্তি। হায়! তোমার জীবন, তোমার কোমল অন্তঃকরণ, সুখদুঃখের চিরন্তন দ্বন্দ্বের নিবাসস্থল। আরও দেখ, তোমার অভাব যতই পূরণ হোক্ না কেন, তোমার নিত্য নূতন অভাব সৃষ্ট হইতেছে;—তুমি ত ভাব না, তুমি ছোট, তুমি অণু, অভাবই তোমার স্বরূপ! একদিকে অভাব পূরণ করিতে গেলে অন্য দিক্ দিয়া অভাব আসিয়া তোমার হৃদয়মন অধিকার করিয়া বসে। তুমি বীর, তোমায় যুদ্ধ করিতে হইতেছে, কিন্তু এ যে অনন্ত যুদ্ধ—শেষ নাই, বিরাম নাই—তোমার কর্ম্ম-জীবনের সম্পূর্ণতা নাই। হে বীর! যখন তুমি ভিতর হইতে বাহির হইয়া এই কর্ম্মজগতে আইস, দেখ তোমার সম্মুখে

কর্ম্মসমুদ্রের অনন্ত কল্লোল। ঐ দেখ কতশত যাত্রী লহরী মালার ভিতর উঠিতেছে, ডুবিতেছে। তুমি ভাবিতেছ—আমি কি করিয়া পার হইব। এই চিন্তায় তোমার শরীর-মন জর্জ্জরিত। তোমার যদি বিশ্বব্যাপী হৃদয়ও থাকে, তবু তুমি এই কর্ম্মজীবনে সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে না, যতই অগ্রসর হও, দেখিবে, তোমার লক্ষ্য আরও দূরে। তখনও হয়ত বলিবে 'পথ ত আর ফুরায় না'। হে সাধক! তুমি হয়ত পাশ্চাত্যজগতের জয়দুন্দুভি-নাদ শুনিয়া মোহিত হইয়া ভাবিতেছে, কর্ম্মপ্রতিষ্ঠাই ভারতের দুঃখদিনের অবসান করিবে; কিন্তু একটু ধীরচিত্তে চিন্তা কর, দেখিবে এই সীমাহীন কর্ম্ম-জীবনরূপ আপনার মোহে যাঁহারা মুগ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের সমাজের ভিতর কি অশান্তি-অনলের সৃষ্টি হইয়াছে,—কতশত মানব সে অনলে পড়িয়া পুড়িয়া মরিয়াছে, কতশত পুড়িতেছে, আরও কত পুড়িবে। হে সমাজতত্ত্ববিৎ! তুমি দিনরাত ভাবিয়া সমাজের ধনবৃদ্ধির, লোকবৃদ্ধির, রণসম্ভারের উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছ, কিন্তু মানবের শান্তির পথ তুমি দেখাইতেছ কই? কর্ম্মজীবনে প্রতিযোগিতার ফলে কেহ বা সুখী, কেহ বা দুঃখী—শান্তি কিন্তু কাহারও নাই। তবেই দেখ, অনন্তকাল খাটিবে, যুদ্ধ করিবে, তবু কিন্তু তৃপ্তি নাই, বিশ্রাম নাই! ক্ষণিক সুখ, আলেয়ার আলোকে ভ্রান্ত পথিকের মত, তোমাকে প্রলোভিত করে বটে, কিন্তু তৎপর মুহূর্ত্তেই তুমি দেখ, সব দিকেই অন্ধকার, আর পথ পাওনা। হায় সাধক! মরণের ঘরে বসিয়া কেন অনন্তজীবন খোঁজ? অভাবে বেষ্টিত থাকিয়া কেন কর্ম্মজগতে পূর্ণতার সন্ধান কর? হইতে পারে—তুমি পুণ্য কর্ম্ম করিলে, তোমার স্বর্গবাসের আদেশ হইল, তুমিও সেখানে দেবদুর্লভ সুখ ভোগ করিলে; কিন্তু তোমার তৃপ্তি হইল কই? পুণ্যক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে তুমি সেখান হইতে পতিত হইলে! খৃষ্টানদের সহিত তুমি বিশ্বাস করিতে পার—যীশু আর একদিন আসিয়া তোমাকে অমৃতের রাজ্যে লইয়া যাইবেন, কিন্তু সেখানেও ত তোমার কর্ম্মের ক্ষয় নাই; কারণ দাসভাবে জীবন যাপন করিয়া, অনন্ত জীবন আজ্ঞাবাহী হইয়া তোমাকে ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখ ভোগ করিতে হইবে।

বলিতে পার,—প্রেমের রাজ্যে সুখদুঃখ কি? প্রেমও কি অভাবাত্মক নয়?—যত পাই ততই পাইতে ইচ্ছা করে, এই কি প্রেমের স্বভাব-গত ধর্ম্ম নয়? প্রিয়তমের সহিত চিরমিলনের আকাঙ্ক্ষা কি কখনও নষ্ট হয়? আর আকাঙ্ক্ষাই যদি থাকিল, তবে ত অভাব আছেই। প্রেমে যেমন মিলন আছে, বিরহও তেমনই আছে। মিলনের সংস্পর্শে সহস্র বৎসরের সাধনার দুঃখ ভুলিয়া যাইতে পার, প্রেমের আবেগে তাহার সহিত অভিন্ন-ভাবে মিলিতে পার, কিন্তু প্রিয়তম যে আবার লুকোচুরি করেন, তোমাকে 'মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া' আবার তোমার অদৃশ্য হন। তুমিও তো নেশার ঘুমের ন্যায় ঘুমায়ে পড়, ঘুম থেকে উঠে দেখ, তোমার চির-অভীপ্সিত ধন পলাইয়া গিয়াছে, চির-আকাঙ্ক্ষিত মিলন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তুমি "হারাই হারাই" করিয়া তাহাকে 'হারাইয়া কেন চকিতে'। হে

প্রেমিক! বলত এক মুহূর্ত্তের বিচ্ছেদ তোমায় কতদুঃখ আনিয়া দেয়। তাই প্রেমিক! কাঁদ, কান্নাই তোমার সার—তোমার জীবন নিরবচ্ছিন্ন ক্রন্দনের প্রস্রবণ। প্রিয়তমের অভাবে তুমি আত্মহারা হইয়া তাহাকে দশদিকে খোঁজ, কিন্তু সে ত নিষ্ঠুর, তোমাকে কাঁদাইতে ভালবাসে, দেখা দেয় না,—হয়ত যখন তুমি তাহার অভাবে মরণ-যন্ত্রণা অনুভব করিয়া মরিতে গেলে, তখন আবার সে তোমার মনোমোহনরূপে দেখা দিল। তুমি সব ভুলিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলে, মিলনের পীযুষে তোমার চিরদিনের বেদনা নিবিয়া গেল। কিন্তু ভাই! সাবধান, আর যেন ঘুমাইয়া পড়িও না। তোমার সাধ্য কি? এমন কপট তিনি, তাঁহার সহস্র প্রলোভনে তোমার মন ভুলিল, তুমি আবার হারাইলে। হে প্রেমিক! তোমার জীবন ত দেখি কর্ম্মীর ন্যায় সুখ ও দুঃখের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আর ভাই ঠিক বলিও তো, প্রেম কি একটি বিষয়ের জন্য তৃষ্ণা নয়? তৃষ্ণা কি কখনও নিরবচ্ছিন্ন সুখের কারণ?—যতই চায় ততই পায়, এ তৃষ্ণার, এ মদিরার অন্ত নাই, পূর্ণতা নাই, শেষ নাই। প্রেমিক জীবনও একটি সীমাহীন দুর্জ্জয় নেশার তর তর গতি। তাই কবি বলিয়াছেন,—

জনম অবধি হাম্ রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল।

তোমায় দেখিলাম,—কতবার দেখিলাম, জীবনে মরণে দেখিলাম, দেখিতে দেখিতে প্রাণ স্থির হইল, কর্ম্মেন্দ্রিয় শিথিল হইল, তবুও দেখা শেষ হইল না,—দেখি, আবার দেখি! পিয়াসা বাড়িয়া যায়, বুকে করিয়া থাকি ইচ্ছা হয়, ভিতরে লই, ভিতরে লইয়াও ত শান্তি নাই—প্রেমিকের জীবনে এই অনন্ত পিপাসা, এই অনন্ত তৃষ্ণা। এই অনন্ত নেশার ভিতরে একটি মদিরা আছে, একটি ভাবের প্রবাহ আছে, একটি কি যেন মধুরতা-মাখান অভাব আছে, কিন্তু শান্তি নাই! অচিন্ত্যভেদাভেদ বড়ই আস্বাদ্য বস্তু হইতে পারে, কিন্তু সেখানে মিলনও আছে, বিরহও আছে, সুখও আছে দুঃখও আছে—কিন্তু সুখদুঃখের অতীত শান্তি নাই। প্রেমিক প্রিয়তমের কোলে আশ্রয় পায়, প্রাণের অনন্ত পিপাসায় ইচ্ছা হয় এই মধুমাখা কোল, এই অমৃতবর্ষণকারী বদন, আর ছাড়িব না—কোলে থাকিব, মুখে মুখ রাখিব; ইচ্ছা হয়, কঠিন শরীর জল হইয়া যাক্, আমি সর্ব্ব অঙ্গে মিশিয়া যাই; প্রার্থনা করি,—নাথ! যদি দেখা দিলে, এস এস আমার ভিতরে—আরও ভিতরে, অন্তরের অন্তরে এস, আমিময় হইয়া যাও, আমি তুমিময় হইয়া যাই; দুইটি শরীর রেখে আর মিলন ভাল লাগে না, মিলিলাম ত একেবারেই মিলিয়া যাই, এ শরীর চন্দন চুয়া হইয়া তব অঙ্গে মিলিত হউক। শরীর শরীরে, মন মনে, প্রাণ প্রাণে মিলিত হউক—আর যেন না হারাই, আর যেন না কাঁদি—আমার সর্ব্ব অঙ্গ কাঁদিছে সর্ব্ব অঙ্গ লাগি। ভক্তের এই ভাব আহা বড়ই প্রাণস্পর্শী! কিন্তু সাধক, দেখ—কি অনন্ত পিপাসা ঐ ভাবের পিছনে লুকান আছে। এই গভীর প্রেমানুরাগে ভক্ত ভগবানের অনুসন্ধান করিয়া মিলত হন, কিন্তু একেবারে ত মিলিতে পারেন না; কারণ

হে প্রেমিক ! তুমি বলিতেছ, আমি অভেদ চাইনা। তুমি ভেদ রাখিয়া ঐ পিপাসা চাও, তোমার জীবনে—পিপাসা, তারপর মিলন, মিলন আবার পিপাসা—এই গতিতে চলিতেছে ; এই ভাঙ্গা গড়া লইয়াই ত তোমার প্রেমের সংসার। হঠাৎ একদিন ঘুমঘোরে তাঁহাকে দেখিয়া তুমি পাগল হইলে, কত চেষ্টা করিলে, তাঁহার দয়া হইল, তুমি শুনিলে তিনি আসিবেন, তুমি কত করিয়া প্রীতিপ্রসূন দিয়া তোমার হৃদয়-বৃন্দাবন সাজাইলে, সে আসিল, মনোমতরূপে সাজাইয়া তাঁহাকে তোমার অন্তরে লইলে, তোমার প্রেমের বাগানে তাঁহাকে লইয়া কত খেলা খেলিলে, তোমার দুঃখ দূর হইয়া গেল—তুমি মনে করিলে,—

যতহুঁ আছিল মঝু হৃদয়ক সাধ। সো সব পূরল পিয়া পরসাদ॥
রভস আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল। অধরকি পানে বিরহ দূর গেল॥

কিন্তু আবার তুমি এ কি বলিতেছ ?—

"কত মধু যামিনী, রভসে গোঁয়াইনু, না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ, হিয়াপর রাখনু, তবু হিয়া জুড়ান না গেল॥"

ভাই তুমি পাইয়া ত পাইতেছ না, তোমার সাধ মিটিয়াও ত মিটিতেছে না। তোমার এই দুঃখের কারণ তাঁহাকে তুমি আপনা হইতে পৃথক করিয়া দেখিয়াছ। তুমি মধুরতায় ডুবিতেছ বটে, কিন্তু তোমার খেলা ভাঙ্গিতেছে না—তুমি প্রেমের সংসারে অফুরন্ত লীলা করিতেছ। কর্ম্মী অনন্ত মানব-সঙ্ঘ লইয়া খেলে, দুঃখ ও সুখ পায় ; তুমি সব ছাড়িয়া নিজের সহিত যৎকিঞ্চিৎ পরিমাণে একত্ব অনুভব করিয়া একটী বিষয় লইয়া খেলিতেছ—তাহাতেই তোমার চিরমলিন নাই, মধ্যে মধ্যে বিরহ এবং দুঃখ আছে।

হে সাধক, অন্তরের আরও গভীরতম প্রদেশে এস, আনন্দময় কোষ ভেদ কর, হিরণ্ময় কোষ ভেদ কর, দেখিবে জগৎ উড়িয়া গিয়াছে, বিষয় উড়িয়া গিয়াছে, তুমি সর্ব্বময়—তোমার ভিতর তুমি এবং তুমি সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম। তুমি আপনাকে বিস্তার করিয়া বহু দেখিতেছিলে, এইজন্য তোমার বিষয়-জ্ঞান ছিল, দ্বৈতজ্ঞান ছিল—সুখদুঃখ তোমার সাথী হইয়াছিল। কর্ম্মই বল আর ভক্তিই বল, দুই পথেই তুমি মৃগতৃষ্ণিকার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সুখদুঃখ পাইতেছিলে। ভাই ! বাহির হইতে ভিতরে এস, ইন্দ্রিয়শক্তি লোপ করিয়া দেও, বাসনারাজিকে জলাঞ্জলি দেও ; যাও, ভিতরে যাও, দেখিবে—"হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং"। এই শ্বেতশুভ্র জ্যোতির্ম্ময় সত্তার অনুভূতি হইলে, যখন তুমি চোখ খুলিবে, দেখিবে, জগৎ ব্রহ্মময়—দেখিবে, কোন কোলাহল নাই, কোনও বিষয় নাই—সর্ব্বত্র সত্তাবান্ চৈতন্যের পূর্ণ বিকাশ—তোমার অনুভব হইবে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। দ্বৈতজ্ঞান রহিত হইয়া গেল, জগৎ ও তুমি লয় পাইলে,—সুখও গেল দুঃখও গেল ; কারণ তাহাদের উৎপত্তি তোমার ও বিষয়ের সংস্পর্শে। থাকিল কেবল নির্ব্বিশেষ অখণ্ড চিন্ময় সত্তা। মিলন নাই, বিরহ নাই, আছে চিরস্থিতি, চিরপূর্ণতা। এস ভাই, নিবৃত্তির শান্ত তপোবনে, এস, এখানে আলো নাই, অন্ধকার নাই, সূর্য্য নাই, চন্দ্রমা নাই, আশা নাই,

আকাঙ্ক্ষা নাই, তৃপ্তি নাই—আছে চিরশান্তি—শান্তির অনন্ত প্রস্রবণ—"সত্যং শিবং সুন্দরং"। দূর ক'রে দেও সেই মায়া, যে তোমার মহামহিম স্বরূপতাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে; দূর করে দেও স্বার্থ পরার্থের চিরদ্বন্দ্ব; দূর করে দেও প্রেমের অনন্ত তৃষ্ণা। যাও নিজের ভিতর যাও, হৃদয় কবাট বন্ধ কর, ভিতরে যাও আরও ভিতরে. অন্তঃকরণ ভেদ কর, মায়ার সহস্র বিকার ভেদ কর। দূরে হইতে দেখ, যেন কে তোমার বাসনাময় অবিদ্যার পিছন থেকে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে, কে যেন সদাই স্থির, সদাই জেগে আছে;—তোমার অন্তঃকরণের শিবগ্রন্থি, রুদ্রগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ হউক, তুমি দেখ তোমার ভিতর এক অনিমেষ আঁখি সদাসর্ব্বদা চেয়ে আছে;—চিত্তের মেঘ উড়াইয়া দেও, দেখ জ্ঞানসূর্য্য তোমার ভিতর চির আলোকে আলোকিত;—আরও ভিতরে যাও, আলোকময় হইয়া যাও,—দেখ তুমিও আলো সেও আলো;—আরও অন্তরে যাও, আর কিছু নাই - শুধু শ্বেতশুভ্র পবিত্র জ্ঞানের দীপ্তি—আদি-অন্তহীন, স্বপ্রকাশ,—নীরবতার নিস্তব্ধতার ভিতরে চৈতন্যের মহা জাগরণ!

শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার।

সিয়ান-পাখী।

টোড়ী-ভৈরবী—একতালা।

কাল বিহঙ্গ এক, আকুল করি', মজাইল মন প্রাণ।
পথে ঘাটে মাঠে, থেকে থেকে ডেকে, "রাধা" বুলি ঢালি' স্থান॥
কোন খানে যাবো, কাহারে শুধাব, কেন যে মজান বিহঙ্গের রব,
অসাড় করি' কেড়ে লয় সব, না দিয়ে মূলের সন্ধান॥
মনে লয় পাখী অন্তহীন পাখা, প্রসারি নিখিল রাখিয়াছে ঢাকা,
অণু পরমাণু যার ছবি মাখা, বিরাজে বিশ্বে অখণ্ড প্রমাণ:—
গুরুমুখে শুনি' সে পাখীর লীলা, হেরিতে বারেক মতি যে বিভলা,
কোথায় পাখীটী, কেমন সে খেলা, জানিতে চাহে পরাণ॥
পাখী নাকি আসি' ব্রহ্ম গিরি হতে', মায়াতে ভুলায়ে এ মর জগতে,
সদাই ফিরিছে জীব সাথে সাথে, আপনা করিতে দান:—
(যদি) এ পাখী ধরিয়া রাখিতে বাসনা, প্রেম ও ভকতি শিকলে বাঁধনা,
তার সাধা-বুলি "রাধা" বলনা বলনা, পাবে শেষে ত্রাণ॥

বেদান্ত পরিভাষা।

দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

মূল। অথানুমানং নিরূপ্যতে: অনুমিতিপ্রমাকরণমনুমানম্। অনুমিতিশ্চ ব্যাপ্তিজ্ঞানত্বেন ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্যা। ব্যাপ্তিজ্ঞানানুব্যবসায়াদেস্তত্বেন তজ্জন্যত্বাভাবান্নানুমিতিত্বম্।

অনুমিতিকরণঞ্চ ব্যাপ্তিজ্ঞানং তৎসংস্কারোঽবান্তরব্যাপারঃ ন তু তৃতীয়লিঙ্গপরামর্শোঽনুমিতিকরণং তস্যানুমিতিহেতুত্বাসিদ্ধ্যা তৎকরণত্বস্য দূরনিরস্তত্বাৎ। ন চ সংস্কারজন্যত্বেন অনুমিতেঃ স্মৃতিত্বাপত্তিঃ স্মৃতিপ্রাগ্‌ভাবজন্যত্বস্য সংস্কারমাত্রজন্যত্বস্য বা স্মৃতিত্বপ্রয়োজকতয়া সংস্কারধ্বংসসাধারণসংস্কারজন্যত্বস্য তদপ্রযোজকত্বাৎ।

ব্যাখ্যা। এখন অনুমান নিরূপিত হইতেছে। অনুমিতির যথার্থ জ্ঞান যাহা দ্বারা হয়, তাহাই অনুমান। ব্যাপ্তিজ্ঞানরূপে যে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়, অনুমিতি তাহা হইতে উৎপন্ন হয়। ব্যাপ্তিজ্ঞানের অনুব্যবসায় প্রভৃতি অনুমিত নয়; কেননা তাহারা যথার্থ ব্যাপ্তিজ্ঞানরূপে কল্পিত ব্যাপ্তিজ্ঞানোৎপন্ন নহে। [ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানরূপে অনুমিতির হেতু। আবার ব্যাপ্তিজ্ঞানের অনুব্যবসায়, স্মৃতি বা শাব্দজ্ঞানের হেতুও এই ব্যাপ্তিজ্ঞান। কিন্তু অনুমিতির সহিত পূর্ব্বোক্ত অনুব্যবসায়, স্মৃতি বা শাব্দজ্ঞানের প্রভেদ এই—পূর্ব্বোক্ত অনুব্যবসায়ে ব্যাপ্তিজ্ঞান বিষয়রূপে হেতু। স্মৃতিতে সমান-বিষয়ানুভবত্বরূপে হেতু, শাব্দজ্ঞানে পদার্থজ্ঞানত্বরূপে হেতু। কিন্তু অনুমিতির বেলায় ইহা ব্যাপ্তিজ্ঞানরূপে হেতু। ("অনুব্যবসায়স্মৃতিশাব্দজ্ঞানাদিষু বিষয়ত্ব-সমানবিষয়ানুভবত্ব-পদার্থজ্ঞানত্বাদিনা হেতুত্বাৎ তত্বেনাহেতুত্বম্। তত্বেন ব্যাপ্তিজ্ঞানত্বেন ইত্যর্থঃ।") অনুব্যবসায়াদি এই 'আদি' পদে স্মৃতি, শাব্দজ্ঞান প্রভৃতি ধরা হইয়াছে। ("আদিপদং তজ্জন্য-স্মৃতি-শাব্দজ্ঞানাদিসংগ্রহার্থম্")]

[করণ কাহাকে বলে? "ব্যাপারবদসাধারণকারণং করণম্।" অনুমিতির করণ কি? ব্যাপ্তিজ্ঞান। এস্থলে ব্যাপার কি? ব্যাপ্তিজ্ঞানের সংস্কার।]

ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির করণ। তাহার (ব্যাপ্তিজ্ঞানের) সংস্কার, (ব্যাপ্তিজ্ঞান ও অনুমিতির) মধ্যবর্ত্তী ব্যাপার।

[নৈয়ায়িকেরা 'তৃতীয়লিঙ্গপরামর্শ'কে অনুমিতির করণ বলিয়াছেন। ধূম দেখিয়া পর্ব্বতে বহ্নি অনুমিত হয়। নৈয়ায়িকেরা এইরূপে অনুমান করেন, পর্ব্বত বহ্নিমান্, কেননা ইহাতে ধূম আছে। যেখানে যেখানে ধূম, সেইখানেই অগ্নি। যেমন মহানসে (রন্ধনশালায় চুল্লীতে) দেখা যায়। এই পর্ব্বত বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্! অতএব ইহা বহ্নিমান্। মহানসে ধূম প্রভৃতির জ্ঞান প্রথম লিঙ্গ পরামর্শ। তাহার পর পক্ষে (পর্ব্বতে) ধূমাদির জ্ঞানকে দ্বিতীয় পরামর্শ বলে। তাহার পর যেখানে ধূম সেখানে বহ্নি" এই

ব্যাপ্তিস্মরণের পর, পক্ষে (পর্ব্বতে) 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবানয়ং পর্ব্বতঃ'—এই পর্ব্বত বহ্নিব্যাপ্যধূম-বিশিষ্ট, এই জ্ঞানকে তৃতীয় লিঙ্গ পরামর্শ কহে। নৈয়ায়িকগণের পরিভাষায় পর্ব্বতাদিকে পক্ষ, ধূমাদিকে সাধন, হেতু বা লিঙ্গ, ও বহ্নিকে সাধ্য বলে।]

তৃতীয় লিঙ্গ পরামর্শ অনুমিতির করণ নয়; কেননা সে যে অনুমিতির হেতু, ইহারই কোনও প্রমাণ নাই, করণ হওয়া ত দূরের কথা।

অনুমিতি সংস্কার হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহাকে যে 'স্মৃতি' বলিবে তাহার উপায় নাই। স্মৃতি হইতে হইলে স্মৃতির প্রাগভাব (পূর্ব্বে অনস্তিত্ব) অথবা কেবল সংস্কার কারণ হয়। স্মৃতি সহিত, সংস্কারের দ্বারা ইহা উৎপন্ন হয় না। সংস্কার-ধ্বংস-স্মৃতি।) [ধূম বহ্নিব্যাপ্য (অর্থাৎ যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি) এই জ্ঞান মনে সংস্কাররূপে থাকে। যখন ধূম দেখি তখন এই সংস্কার স্মরণ হয়। ইহাই স্মৃতি। কিন্তু সংস্কার ও স্মৃতি হইতে "এই পর্ব্বত বহ্নিমান্" এইরূপ যে জ্ঞান জন্মে তাহা স্মৃতি নহে, অনুমান। সুতরাং অনুমান ও স্মৃতি এক নহে।]

মূল। ন চ যত্র ব্যাপ্তিস্মরণাদনুমিতিস্তত্র কথং সংস্কারো হেতুরিতি বাচ্যং ব্যাপ্তিস্মৃতিস্থলেঽপি তৎসংস্কারস্যৈবানুমিতিহেতুত্বাৎ নহি স্মৃতেঃ সংস্কারনাশকত্ব-নিয়মঃ, স্মৃতিধারাদর্শনাৎ। ন চ অনুদ্বুদ্ধসংস্কারাদনুমিত্যাপত্তিস্তদুদ্বোধস্যাপি সহকারিত্বাৎ। এবঞ্চ 'অয়ং ধূমবান্' ইতি পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানে 'ধূমো বহ্নিব্যাপ্য' ইত্যনুভবাহিতসংস্কারোদ্বোধে চ সতি 'বহ্নিমান্' ইত্যনুমিতির্ভবতি। ন তু মধ্যে ব্যাপ্তিস্মরণং, তজ্জন্যং 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবানয়ম্' ইত্যাদি বিশিষ্টজ্ঞানং বা হেতু-ত্বেন কল্পনীয়ং, গৌরবান্মানাভাবাচ্চ। তচ্চ ব্যাপ্তিজ্ঞানং বহ্নিবিষয়কজ্ঞানাংশ এব কারণং ন তু পর্ব্বতবিষয়কত্বাংশ ইতি "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" ইতি জ্ঞানস্য বহ্ন্যংশে এব অনুমিতিত্বম্, ন পর্ব্বতাদ্যংশে, প্রত্যক্ষত্বস্যোপপাদিতত্বাৎ।

ব্যাপ্তিশ্চাশেষসাধনাশ্রয়াশ্রিত সাধ্যসামানাধিকরণ্যরূপা। সা চ ব্যভিচারা-দর্শনে সতি সহচারদর্শনেন গৃহ্যতে। তচ্চ সহচারদর্শনং ভূয়োদর্শনং সকৃদ্ দর্শনং বা ইতি বিশেষো নাদরণীয়ঃ সহচারদর্শনস্যৈব প্রযোজকত্বাৎ।

ব্যাখ্যা। "ব্যাপ্তি স্মরণ হইলে যখন অনুমিতি হইতেছে তখন আবার সংস্কারকে অনুমিতির হেতু বলিতেছ কেন?" এইরূপ আপত্তি করিতে পার না। যে যে স্থলে ব্যাপ্তি স্মরণ হয় সেই সেই স্থলে ব্যাপ্তির সংস্কারই অনুমিতির হেতু। স্মৃতি যে সংস্কার নাশ করিয়া দেয় এরূপ কোনও নিয়ম নাই, কেননা আমরা ধারাবাহিক স্মৃতি দেখিতে পাই।

সংস্কার অনুৎপন্ন হইলেও (অর্থাৎ সংস্কার-জ্ঞান না হইলেও) যে অনুমিতি হইবে এ কথাও বলিতে পার না; কেননা উৎপন্ন সংস্কারই অনুমিতির হেতু, এ কথা মনে রাখিতে হইবে।

এইরূপে "ইহা ধূমবান্" এইরূপ পক্ষের (পর্ব্বতের) ধর্ম্মের জ্ঞান হইলে, "ধূম বহ্নি-ব্যাপ্য" (যেখানে ধূম সেখানেই বহ্নি) এই পূর্ব্বকার অনুভবজনিত সংস্কার উৎপন্ন হয়। তাহার পর (ইহা) "বহ্নিমান্" এই অনুমিতি হয়। [নৈয়ায়িকদের মতে] মধ্যে ব্যাপ্তিস্মরণ হয় ও তজ্জন্য "বহ্নি-ব্যাপ্য-ধূমবান্ এই পর্ব্বত" এই বিশিষ্ট জ্ঞান হয়, এই হেতু স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহা নয়; কারণ ইহাতে বাহুল্য হইয়া পড়ে ও এরূপ জ্ঞানের কোনও প্রমাণ নাই।

পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞান বহ্নিবিষয়ক জ্ঞানের অনুমিতির কারণ, পর্ব্বত বিষয়ক জ্ঞানের নহে। 'পর্ব্বত বহ্নিমান্' এই জ্ঞানের বহ্নিই অনুমিতিসাধ্য, পর্ব্বতাদির জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইতেই হইতে পারে।

[ব্যাপ্তির লক্ষণ দেওয়া হইতেছে।] অশেষ সাধনের (হেতুর ধূমাদির) আশ্রয়ে (পক্ষ পর্ব্বতাদি) আশ্রিত সাধ্যের (বহ্নি প্রভৃতির) সহিত সমান-অধিকরণরূপ ধর্ম্মকে ব্যাপ্তি বলে। [পর্ব্বত পক্ষ। ধূম হেতু। বহ্নি সাধ্য। পক্ষে যুগপৎ হেতু ও সাধ্যের অবস্থানকে সামানাধিকরণ্য বলে। পর্ব্বতে ধূম ও বহ্নির একত্র অবস্থান সামানাধিকরণ্য। সাধন অর্থে হেতু, যথা ধূম। সাধনাশ্রয় অর্থে পক্ষ, যথা পর্ব্বত। যাবৎপক্ষে আশ্রিত সাধ্যের সহিত সামানাধিকরণ্যকে ব্যাপ্তি বলে।] এই ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যাভিচার দর্শন না হইলে (বিসদৃশ দৃষ্টান্ত না থাকিলে) সহচার দর্শনে (সদৃশ দৃষ্টান্ত দর্শনে) হইয়া থাকে। [সব দৃষ্ট কাকই যদি কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহা হইলে এই কৃষ্ণবর্ণ হেতু কাকগুলির সাদৃশ্য, কিন্তু একটি শুভ্র কাক দৃষ্ট হইলেই তাহা বিসদৃশ দৃষ্টান্ত হইয়া পড়িল। এইরূপ বিসদৃশ দৃষ্টান্ত যদি না থাকে, কেবল সদৃশ দৃষ্টান্তই যদি দেখি, তাহা হইলেই আমাদের ব্যাপ্তি জ্ঞান হয়।] এই সহচার দর্শন একবারই হউক বা অনেকবারই হউক তাহাতে কোনও ইতরবিশেষ নাই, সহচারদর্শন হইলেই আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইবে। [কথা হইতেছে এই যে বিসদৃশ দৃষ্টান্ত না থাকিলেই হইল, সদৃশ দৃষ্টান্ত একই হউক বা অনেকই হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না। বিসদৃশ দৃষ্টান্ত নাই, অথচ সদৃশ দৃষ্টান্ত আছে, এরূপ হইলেই ব্যাপ্তিজ্ঞান হইবে।]

মূল। তচ্চানুমানমন্বয়িরূপমেকমেব। ন তু কেবলান্বয়ি, সর্ব্বস্যাপি ধর্ম্মস্য অস্মন্মতে ব্রহ্মনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বেন অত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগি-সাধ্যকত্বরূপ-কেবলান্বয়িত্বস্যাসিদ্ধেঃ। নাপি অনুমানস্য ব্যতিরেকিরূপত্বং সাধ্যাভাবে সাধনাভাব-নিরূপিত-ব্যাপ্তিজ্ঞানস্য সাধনেন সাধ্যানুমিতাবনুপযোগাৎ। কথং তর্হি ধূমাদাবন্বয়-ব্যাপ্তিমবিদুষোঽপি ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানাদনুমিতিঃ? অর্থাপত্তি-প্রমাণাৎ ইতি বক্ষ্যামঃ। অতএব অনুমানস্য নান্বয়-ব্যতিরেকি-রূপত্বং ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানস্য অনুমিত্য' হেতুত্বাৎ।

ব্যাখ্যা। [ন্যায় মতে অনুমিতি তিন প্রকার,—কেবলান্বয়ি, কেবলব্যতিরেকি, ও অন্বয়ব্যতিরেকি। বেদান্তবাদী বলিতেছেন, আমাদের মতে অনুমিতি এক প্রকার। তাহা অন্বয়িরূপ। নৈয়ায়িকদের তিন প্রকার অনুমিতি আমরা মানি না।]

সেই অনুমান অন্বয়িরূপ ও একমাত্র (অর্থাৎ তাহার আর ভেদ নাই)। [বেদান্তবাদীর মতে যেখানে অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞান হয় (অর্থাৎ যেখানে ধূম সেখানে অগ্নি, এইরূপ জ্ঞান হয়) সেখানে উক্ত সংস্কার প্রভৃতি দ্বারা অনুমিতি হয়। কিন্তু যেখানে ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি জ্ঞান হয় (অর্থাৎ যেখানে অগ্নি নাই, সেখানে ধূম নাই, এইরূপ জ্ঞান হয়) সেখানে নৈয়ায়িকদের মতে অনুমিতি হইলেও বেদান্তবাদী তাহাকে অনুমিতি বলিবেন না। বেদান্তবাদীর মতে ঐ সকল স্থানে অর্থাপত্তি স্বীকার করিতে হইবে।]

ইহা কেবলান্বয়ি নয়। [ন্যায়মতে যেখানে সাধ্য সাধনের অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী নয়, সেখানে কেবলান্বয়ি। যথা "যাহা প্রমেয় (যাহার বিষয় জ্ঞান হয়) তাহা অভিধেয়" (তাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে)। এখন উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক্, পর্ব্বত। পর্ব্বত 'পক্ষ'। ঘট, পট প্রভৃতি পর্ব্বত নয়, সুতরাং পর্ব্বতে তাহাদের অত্যন্তাভাব। ঘট, পট প্রভৃতি এই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী। নৈয়ায়িকের ভাষায় বলিতে গেলে "পর্ব্বতনিষ্ঠ-ঘটত্বাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগি ঘটত্বম্।" কিন্তু অভিধেয়ত্ব বা প্রমেয়ত্বরূপ ধর্ম্ম পর্ব্বতে বিদ্যমান। (অর্থাৎ পর্ব্বতের নাম দিতে পারি, পর্ব্বতের জ্ঞান করিতেও পারি)। সুতরাং ইহারা পর্ব্বতে বর্ত্তমান অভিধেয়ত্ব বা প্রমেয়ত্বরূপ ধর্ম্মের অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী নয়, কিন্তু অপ্রতিযোগী। কাযেই অভিধেয়ত্ব ও প্রমেয়ত্ব কেবলান্বয়ি। ইহারাই সাধ্য ও সাধন।]

কেবলান্বয়িত্ব (বেদান্তমতে) অসিদ্ধ, কেননা (ন্যায়মতে কেবলান্বয়ির লক্ষণ এই :—) অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী সাধ্যকত্বই কেবলান্বয়িত্ব [উপরে ইহা বুঝান হইয়াছে] কিন্তু আমাদের মতে (বেদান্ত মতে) সমস্ত ধর্ম্মই ব্রহ্মনিষ্ঠ ও প্রত্যেক ধর্ম্ম নিজ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী। [ব্রহ্মের কোনও ধর্ম্ম নাই। ব্রহ্মে সমস্ত ধর্ম্মেরই অত্যন্তাভাব। সকল ধর্ম্মই ব্রহ্মনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী। কাজেই ন্যায়ের 'অত্যন্তাভাবের অপ্রতি-যোগী' বলিয়া কোন কিছু থাকিতে পারে না, সুতরাং কেবলান্বয়িত্ব বলিয়া কিছু নাই।]

অনুমানকে ব্যতিরেকিরূপও বলিতে পার না। সাধ্যের (যথা অগ্নির) অভাব হেতু সাধনের (ধূমের) অভাব যেখানে নিরূপিত হয়, সেইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান সাধনের (ধূমের) দ্বারা সাধ্যের (অগ্নির) অনুমিতি বিষয়ে অনুপযোগী। [কেবল-ব্যতিরেকির উদাহরণ—যেখানে অগ্নি নাই, সেখানে ধূমও নাই। এস্থলে অগ্নির অভাব ও ধূমের অভাব এই দুইটির ব্যাপ্তিজ্ঞান আছে। বেদান্তবাদী ধূম দেখিয়া যেখানে অগ্নি অনুমান করিতেছেন, সেখানে পূর্ব্বোক্ত অভাবরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুপযোগী। বেদান্তবাদী পূর্ব্বোক্ত 'যেখানে অগ্নি নাই, সেখানে ধূম নাই' উদাহরণকে অনুমিতির মধ্যে না আনিয়া 'অর্থাপত্তি' নামক পৃথক্ প্রমাণের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।]

তবে যাহাদের ধূম প্রভৃতিতে অন্বয়ব্যাপ্তি জ্ঞান নাই, ('যেখানে ধূম সেখানে অগ্নি এ জ্ঞান যাহাদের নাই) তাহারা কিরূপে ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে (যেখানে অগ্নি নাই, সেখানে ধূমও নাই, এই জ্ঞান হইতে) অনুমান করে? [তাহার উত্তরে বলি, উহা অনুমান নয়] 'অর্থাপত্তি' প্রমাণ হইতে তাহাদের ঐ জ্ঞান জন্মে। এ কথা পরে বলিব।

অতএব অনুমান অন্বয়-ব্যতিরেকিরূপও নয়, কেননা ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির হেতু নয় [তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি]।

[সার কথা এই। নৈয়ায়িকদের মতে তিন প্রকার অনুমান,—কেবলান্বয়ি, কেবল-ব্যতিরেকি ও অন্বয়ব্যতিরেকি। ন্যায় মতে যেখানে সাধ্যের ধর্ম্ম 'অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী' সেখানে কেবলান্বয়িত্ব। বেদান্তবাদী বলিতেছেন, আমাদের মতে সকল ধর্ম্মই 'অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী'। কাজেই কেবলান্বয়ি অসিদ্ধ।

নৈয়ায়িক যাহাকে কেবলব্যতিরেকি অনুমান বলেন, বেদান্তবাদী তাহাকে 'অর্থাপত্তি' প্রমাণ বলিতে চাহেন। তাহাকে 'অনুমান' বলিতে স্বীকৃত নন। ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে অনুমান হইতে পারে না, ইহাই বেদান্তবাদীর সিদ্ধান্ত। ইহা হইতেই (ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে অনুমান হয়, ইহাই যখন মানি না, তখন) অন্বয়ব্যতিরেকি নামক অনুমান যে হইতেই পারে না তাহাও প্রতিপন্ন হইল।]

মূল। তচ্চানুমানং স্বার্থপরার্থভেদেন দ্বিবিধম্। তত্র স্বার্থন্তুক্তমেব পরার্থন্তু ন্যায়সাধ্যম্। ন্যায়ো নামাবয়বসমুদায়ঃ। অবয়বাশ্চ ত্রয় এব প্রতিজ্ঞাহেতূ-দাহরণরূপাঃ, উদাহরণোপনয়নিগমনরূপা বা। ন তু পঞ্চ, অবয়বত্রয়েণৈব ব্যাপ্তিপক্ষধর্ম্ময়োরুপদর্শনসম্ভবেনাধিকাবয়বদ্বয়স্য ব্যর্থত্বাৎ।

ব্যাখ্যা। সেই অনুমান স্বার্থ ও পরার্থভেদে দুইপ্রকার। [স্বার্থ অর্থাৎ নিজের জন্য যে অনুমান করা হয়, নিজেই যে অনুমান করি; আর পরার্থ অর্থাৎ পরকে বুঝাইবার জন্য যে অনুমান করিতে হয়।] তাহার মধ্যে স্বার্থ অনুমানের কথা বলাই হইয়াছে। পরার্থ অনুমান ন্যায় দ্বারা করিতে হয়। অবয়ব সমুদায় একত্র ন্যায় নামে কথিত হয়। অবয়ব তিনটি,—প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণ; অথবা, উদাহরণ, উপনয়ন ও নিগমন। [নৈয়ায়িকদের মতে পাঁচটি অবয়ব। বেদান্তবাদী তাহা মানেন না। তাঁহার মতে তিনটি অবয়ব। তাই তিনি বলিতেছেন যে, অবয়ব] পাঁচটি নয়। তিনটি অবয়বের দ্বারাই ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্ম্মের প্রদর্শন সম্ভব, কাজেই অধিক আর দুইটি অবয়ব কল্পনা করা ব্যর্থ।

মূল। এবমনুমানে নিরূপিতে তস্মাৎ ব্রহ্মভিন্ননিখিলমিথ্যাত্বসিদ্ধিঃ। তথাহি ব্রহ্মভিন্নং সর্ব্বং মিথ্যা ব্রহ্মভিন্নত্বাৎ যদেবং তদেবং যথা শুক্তিরূপ্যম্। ন চ

দৃষ্টান্তাসিদ্ধিঃ, তস্য সাধিতত্বাৎ। ন চ অপ্রয়োজকত্বং শুক্তিরূপ্যরজ্জুসর্পাদীনাং মিথ্যাত্বে ব্রহ্মভিন্নত্বস্যৈব লাঘবেন প্রযোজকত্বাৎ। মিথ্যাত্বঞ্চ স্বাশ্রয়ত্বেনাভিমতযাবন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বম্। অভিমতপদং বস্তুতঃ স্বাশ্রয়াপ্রসিদ্ধ্যাসম্ভববারণায়, যাবৎপদমর্থান্তরবারণায়। তদুক্তম্,

"সর্বেষামপি ভাবানাং স্বাশ্রয়ত্বেন সম্মতে।
প্রতিযোগিত্বমত্যন্তাভাবং প্রতি মৃষাত্মতা॥" ইতি।

যদ্বা 'অয়ং পটঃ' এতত্তন্তুনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগী পটত্বাৎ, পটান্তরবৎ, ইত্যনুমানং মিথ্যাত্বে প্রমাণম্। তদুক্তম্—

"অংশিনঃ স্বাংশগাত্যন্তাভাবস্য প্রতিযোগিতা।
অংশিত্বাদিতরাংশীব দিগেষৈব গুণাদিষু॥" ইতি।

ন চ ঘটাদের্মিথ্যাত্বে 'সন্ ঘট' ইতি প্রত্যক্ষেণ বাধঃ, অধিষ্ঠানব্রহ্মসত্তায়াস্তত্র বিষয়তয়া ঘটাদেঃ সত্ত্যত্বাসিদ্ধেঃ।

ব্যাখ্যা। এইরূপ অনুমান নিরূপিত হইলে, তাহা হইতে ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্ত মিথ্যা ইহা সিদ্ধ হইবে। যথা—ব্রহ্মভিন্ন সকল মিথ্যা কেননা তাহারা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। যাহা এইরূপ (ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন), তাহা এইরূপ (মিথ্যা)। যথা শুক্তিতে (মিথ্যা) রজত। (পূর্বোক্ত) দৃষ্টান্তকে অসিদ্ধ বলিতে পার না; কেননা পূর্বে ঐ দৃষ্টান্তে রজতের মিথ্যাত্ব প্রমাণ করিয়াছি। এই কারণ অনুপযুক্ত—এ আপত্তিও করিতে পার না (অর্থাৎ পূর্বে মায়ার কার্য্য বলিয়া ঐ সকল মিথ্যা বলিয়াছি, তাই এক্ষণে তুমি বলিতে পার যে এ সকল ব্রহ্মভিন্ন বলিয়া মিথ্যা নয়, মায়ার কার্য্য বলিয়াই মিথ্যা। এ কথার উত্তরে বলিতেছি) শুক্তিতে রজত বা রজ্জুতে সর্প প্রভৃতি ব্রহ্মভিন্ন বলিয়াই মিথ্যা, এই কথাই সহজ। [বাস্তবিক ব্রহ্মভিন্ন বলিয়াই এগুলি মিথ্যা। তবে এই মিথ্যাজ্ঞান মায়া আছে বলিয়া জন্মে,—এ কথা বলিয়াছি। সেইজন্য "মায়াবশে উৎপন্ন বলিয়া এগুলি মিথ্যা" এ কথা না বলিয়া "ব্রহ্মভিন্ন বলিয়া এগুলি মিথ্যা" এই কথা বলাই সহজ।]

[মিথ্যাত্বের লক্ষণ কি?] নিজের আশ্রয়রূপে অভিমত যাবৎপদার্থনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বকে মিথ্যাত্ব বলে। এই লক্ষণে যে "অভিমত" শব্দটি ব্যবহার করিলাম, তাহার হেতু এই—মিথ্যাজ্ঞানের আশ্রয় বাস্তবিক অপ্রসিদ্ধ বলিয়া অসম্ভবতা নিবারণ করিবার জন্যই "অভিমত" শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে।* এইরূপ "যাবৎ" শব্দটি অর্থান্তর

* শুক্তিরজতের আশ্রয় যথার্থতঃ অপ্রসিদ্ধ। কিন্তু শুক্তিরজত বস্তুতঃ অপ্রসিদ্ধ হইলেও প্রতীতিকালে নিজ আশ্রয়রূপে অভিমত শুক্তি প্রভৃতিতে অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব বর্তমান থাকে। ইহাই মিথ্যাত্ব। 'অভিমত' পদটি ব্যবহার না করিলে সংজ্ঞায় দোষ পড়ে। কেননা তাহা হইলে আপত্তি হইতে পারে যে আশ্রয়অপ্রসিদ্ধ, কাজেই তাহার অত্যন্তাভাব প্রভৃতি অসম্ভব।

নিবারণের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ (চিৎসুখাচার্য্য কর্ত্তৃক) কথিত হইয়াছে—"সমস্ত বস্তুর মিথ্যাত্ব নিজের আশ্রয়রূপে অভিমত অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব" (অর্থাৎ সমস্ত পদার্থের নিজের আশ্রয়রূপে অভিমত যে অধিকরণ, সেই অধিকরণনিষ্ঠ যে অত্যন্তাভাব তাহার প্রতিযোগী হওয়ার নামই মিথ্যারূপত্ব)। কিংবা এইরূপে অনুমান করা যাক্।

(১) এই পট ইহার সূত্রনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী।

(২) কেননা ইহা পট।

(৩) অন্য পটের ন্যায়।

এইরূপ অনুমান মিথ্যাত্বের প্রমাণ।

[চিৎ সুখাচার্য্য] বলিয়াছেন—অংশী (যাহার অংশ আছে, যথা পট ; কেননা পটের অংশ সূত্র) নিজের অংশস্থিত (সূত্রেস্থিত) অত্যন্তাবের প্রতিযোগী ; কেননা ইহার অংশ আছে। উদাহরণ—অন্যান্য অংশবিশিষ্ট বস্তু।

এইরূপ গুণ প্রভৃতিতেও ধরিতে হইবে।

[অর্থাৎ আমরা পট দ্রব্যের মিথ্যাত্ব যেরূপ দেখাইলাম, সেইরূপ সর্ব্ব পদার্থের মিথ্যাত্ব ঐ প্রকার অনুমান দ্বারা সিদ্ধ করা যায়। যথা

(১) "রূপং রূপিনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগী, গুণত্বাৎ, স্পর্শবৎ।"

(২) "এষা ক্রিয়া এতদ্দ্রব্যনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিনী, ক্রিয়াত্বাৎ, ক্রিয়ান্তরবৎ।"

(৩) "ঘটত্বং, ঘটনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগি, ধর্ম্মত্বাৎ, পটত্বাদিবৎ।"

(৪) "অয়ং বিশেষঃ, এতৎ পরমাণুনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগী, বিশেষত্বাৎ, বিশেষান্তরবৎ।"

(৫) "সমবায়ঃ, স্বসমবায়িনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগী, সম্বন্ধত্বাৎ, সংযোগবৎ।" ইত্যাদি]

মূল। ন চ নীরূপস্য ব্রহ্মণঃ কথং চাক্ষুষাদিজ্ঞানবিষয়তেতি বাচ্যং নীরূপস্যাপি রূপাদেঃ প্রত্যক্ষবিষয়ত্বাৎ। ন চ নীরূপস্য দ্রব্যস্য চক্ষুরাদ্যযোগ্যত্বমিতি নিয়মঃ, মন্মতে ব্রহ্মণো দ্রব্যত্বাসিদ্ধেঃ গুণাশ্রয়ত্বং সমবায়িকারণত্বং বা দ্রব্যত্বম্ ইতি তেঽভিমতং, নহি নির্গুণস্য ব্রহ্মণো গুণাশ্রয়তা নাপি সমবায়িকারণতা সমবায়াসিদ্ধেঃ। 'অস্তু বা দ্রব্যত্বং ব্রহ্মণস্তথাপি নীরূপস্য কালস্যেব চাক্ষুষাদিজ্ঞানবিষয়ত্বেনাবিরোধঃ।

ব্যাখ্যা। রূপহীন ব্রহ্ম চাক্ষুষ প্রভৃতি জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না, এ কথা বলিও না। (দ্রব্যের) 'রূপ' প্রভৃতি রূপহীন হইলেও প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে। [ন্যায় মতে কোনও গুণের আর গুণ থাকিতে পারে না। 'রূপে'র আর রূপ নাই] রূপহীন দ্রব্য চক্ষুরাদির বিষয়ীভূত হওয়ার অযোগ্য, এ কথাও বলিতে পার না ; কেননা আমার মতে

ব্রহ্ম দ্রব্যই নয়। তোমাদের (নৈয়ায়িকদের) লক্ষণমতে দ্রব্য গুণ সকলের আশ্রয় বা সমবায়ি কারণ। কিন্তু নিগুর্ণ ব্রহ্ম কোনও গুণেরই আশ্রয় নন, এবং তিনি সমবায়ি কারণও নন; কারণ সমবায় বলিয়া কোনও পদার্থই নাই। [প্রথম পরিচ্ছেদে ইহা দেখান হইয়াছে] আর যদিই ব্রহ্মকে দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করি, তথাপি রূপহীন 'কাল' (অর্থাৎ সময়) যেরূপ চাক্ষুষাদি-জ্ঞানের বিষয় হয়, সেইজন্য রূপহীন ব্রহ্মও হইতে পারে, ইহাতে কোনও ব্যাঘাত নাই।

মূল। যদ্বা ত্রিবিধং সত্ত্বং, পারমার্থিকং, ব্যাবহারিকং, প্রাতিভাসিকঞ্চেতি। তত্র পারমার্থিকং সত্ত্বং ব্রহ্মণঃ, ব্যাবহারিকং সত্ত্বমাকাশাদেঃ, প্রাতিভাসিকং সত্ত্বং শুক্তিরজতাদেঃ। তথা চ 'ঘটঃ সন্' ইতি প্রত্যক্ষস্য ব্যবহারিকসত্ত্ববিষয়ত্বেন প্রামাণ্যম্। অস্মিন পক্ষে ঘটাদের্ব্রহ্মণি নিষেধো ন স্বরূপেণ কিন্তু পারমার্থিকত্বেনেতি ন বিরোধঃ। অস্মিন্ পক্ষে চ মিথ্যাত্বলক্ষণে পারমার্থিকত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিকত্বমত্যন্তাভাববিশেষণং দ্রষ্টব্যম্। তস্মাদুপপন্নং মিথ্যাত্বানুমানমিতি।

ইতি বেদান্তপরিভাষায়ামনুমান পরিচ্ছেদঃ।

ব্যাখ্যা। অথবা সত্ত্ব (অস্তিত্ব) তিন প্রকার :—পারমার্থিক, ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক। ব্রহ্মের পারমার্থিক অস্তিত্ব, আকাশ প্রভৃতির ব্যাবহারিক অস্তিত্ব ও শুক্তিতে রজত প্রভৃতির প্রাতিভাসিক অস্তিত্ব। এইরূপ "ঘট বিদ্যমান রহিয়াছে" এই প্রত্যক্ষ ব্যাবহারিক অস্তিত্ব বিষয়ে প্রামাণ্য [কিন্তু যথার্থতঃ পারমার্থিক অস্তিত্ব ধরিতে গেলে ঘট প্রভৃতি কিছু নাই, সবই ব্রহ্ম] এই পক্ষে [ব্যাবহারিক অস্তিত্ব ধরিলে] ঘটরূপে ঘটের অস্তিত্ব ব্রহ্মে অস্বীকার করা হয় না। পারমার্থিক অস্তিত্ব ধরিতে গেলেই ঘটের অস্তিত্ব থাকে না; [কারণ যথার্থতঃ সকলই ব্রহ্ম] এই পক্ষে মিথ্যাত্বের লক্ষণে "অত্যন্তাভাব" এই শব্দটির এই বিশেষণটি দিতে হইবে—"পারমার্থিকত্ববিশিষ্ট প্রতিযোগিকত্ব"। এই হেতু মিথ্যাত্ব অনুমান সিদ্ধ হইল।

ইতি বেদান্ত-পরিভাষায় অনুমান-পরিচ্ছেদ।

তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

মূল। অথোপমানং নিরূপ্যতে।

সাদৃশ্যপ্রমাকরণমুপমানম্। তথাহি নগরেষু দৃষ্টগোপিণ্ডস্য পুরুষস্য বনং গতস্য গবয়েন্দ্রিয়সন্নিকর্ষে সতি; ভবতি প্রতীতিঃ "অয়ং পিণ্ডো গোসদৃশ" ইতি। তদনন্তরঞ্চ ভবতি নিশ্চয়ঃ "অনেন সদৃশী মদীয়া গৌঃ" ইতি। তত্র অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং গবয়নিষ্ঠগোসাদৃশ্যজ্ঞানং করণং গোনিষ্ঠগবয়সাদৃশ্যজ্ঞানং ফলম্।

ন চেদিদং প্রত্যক্ষেণ সম্ভবতি, গোপিণ্ডস্য তদা ইন্দ্রিয়াসন্নিকর্ষাৎ। নাপি অনুমানেন, গবয়নিষ্ঠগোসাদৃশ্যস্য অতল্লিঙ্গত্বাৎ। নাপি

মদীয়া গৌরেতদ্গবয়সদৃশী
এতন্নিষ্ঠসাদৃশ্যপ্রতিযোগিত্বাৎ
যো যৎসাদৃশ্যপ্রতিযোগী স তৎসদৃশঃ
যথা মৈত্রনিষ্ঠসাদৃশ্যপ্রতিযোগী চৈত্রোমৈত্রসদৃশঃ,

ইত্যনুমানাৎ তৎসম্ভব ইতি বাচ্যম্। এবংবিধানুমানানবতারেঽপি “অনেন সদৃশী মদীয়া গৌঃ” ইতি প্রতীতেঃ অনুভবসিদ্ধত্বাৎ, “উপমিনোমি” ইত্যনুব্যবসায়াচ্চ। তস্মাদুপমানং মানান্তরম্।

ব্যাখ্যা। অনন্তর উপমান (নামক প্রমাণ) নিরূপিত হইতেছে। সাদৃশ্যের যথার্থ জ্ঞান যাহা দ্বারা হয়, তাহাই উপমান। যেমন নগরে গরু দেখিয়া কোনও পুরুষ বনে যাইলে গবয়ের (গরুর ন্যায় একপ্রকার প্রাণী) সহিত যদি তাহার ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হয়, তাহা হইলে তাহাব প্রতীতি হয় “এই প্রাণী গোসদৃশ”। তাহার পর এই নিশ্চয় হয় “ইহার ন্যায় আমার গরু।” এস্থলে অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা গবয়নিষ্ঠ গোসাদৃশ্যজ্ঞান (অর্থাৎ ‘এই প্রাণী গোসদৃশ’ “অয়ং পিণ্ডো গোসদৃশঃ” এই জ্ঞান) করণস্বরূপ ও গোনিষ্ঠ গবয়সাদৃশ্যজ্ঞান (অর্থাৎ ‘ইহার ন্যায় আমার গরু’ ‘অনেন সদৃশী মদীয়া গৌঃ’ এই জ্ঞান) ফলস্বরূপ হইয়া থাকে।

প্রত্যক্ষের দ্বারা ইহা (এই জ্ঞান) হইতে পারে না; কেননা গরু তখন কোনও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকৃষ্ট নহে। (বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ না হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না)। অনুমানের দ্বারাও ইহা হইতে পারে না; কেননা গবয়নিষ্ঠ গোসাদৃশ্য (‘এই প্রাণী গোসদৃশ’) অনুমানের সাধক হেতু হইতে পারে না। আর নিম্নলিখিতরূপে অনুমান দ্বারা ইহা (অর্থাৎ উপমান) সম্ভবপর, এ কথাও বলিতে পার না:— *

১। আমার গরু এই গবয়ের ন্যায়,
২। কেননা ইহা (গরু) গবয়নিষ্ঠ সাদৃশ্যের প্রতিযোগিতাযুক্ত,
৩। যে বস্তু কোনও বস্তুর সাদৃশ্যের প্রতিযোগী, তাহা শেষোক্ত বস্তুর সদৃশ,
৪। যথা মৈত্রনিষ্ঠসাদৃশ্যপ্রতিযোগী চৈত্র মৈত্রসদৃশ।

---

* উপমানকে অনুমানের এক ভেদ বলিয়া ধরিতে গেলে সাধ্য হইবে—“গোনিষ্ঠগবয়সাদৃশ্যবত্ত্বম্।” পক্ষ হইবে “মদীয়া গৌঃ”। লিঙ্গ হইবে “গবয়নিষ্ঠসাদৃশ্যবত্ত্বম্।” কিন্তু বেদান্তবাদী এই লিঙ্গকে দোষযুক্ত বলিতেছেন; কেননা, লিঙ্গেরই পক্ষেতে থাকা উচিত; কিন্তু এখানে তাহা হইতেছে না। মূলে যে ‘তৎ’ শব্দ আছে (“অতল্লিঙ্গত্বাৎ”) তাহার অর্থ “গোনিষ্ঠগবয়সাদৃশ্যজ্ঞানম্”।

কেননা, এইরূপ অনুমানের উৎপত্তি ব্যতীতও "ইহার ন্যায় আমার গরু" ইত্যাদি প্রতীতি হয়, ইহা সকলেই অনুভব করিয়া থাকে। এবং "আমি উপমান করিতেছি" এইরূপ অনুব্যবসায় (উপমান জ্ঞান, আবার উপমানরূপ জ্ঞানের জ্ঞান অর্থাৎ 'আমি উপমান করিতেছি' এই জ্ঞানকে অনুব্যবসায় বলে) হইয়া থাকে।

অতএব উপমান একটি পৃথক্ প্রমাণ (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা অনুমান হইতে বিভিন্ন একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ)।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

শিব ও শক্তি।

ভৈরবী কাওয়ালী।

মরা মানুষ হয়েছে শিব পড়ে' মায়ের চরণ তলে।
মায়ের পদতলে নয়'ক ভোলা,
(সে যে) মায়ের হৃদ্ কমলে॥

বলে বলুক যে যাহা চায়,
মহেশ নয় মায়ের পায়,
ঐ দেখ শিব মায়ের মাথায়,
হাস্‌ছে বসে মেঘের কোলে॥

ব্রহ্মময়ী যে শিবের তরে,
সোনার সংসার ত্যজ্য করে,
(সদা) শ্মশানে মশানে ফেরে,
ভুতের সঙ্গে নাচে মিলে॥

দ্বিজ বলে ভাই মনে প্রাণে,
শ্মশানে বাস যার কারণে,
পায়ের তলে সেই রতনে,
রাখ্‌তে পারে কে কোন কালে?

ব্রহ্মতত্ত্ব।

(১)

"পায়াস্তত্ত্বং স্বাত্মনিসস্তং পুরুষং যো ভক্ত্যাস্তৌতীত্যাঙ্গিরসং বিষ্ণুরিমং মাম্।
ইত্যাত্মানং স্বাত্মনি সংহৃত্য সদৈকত্বং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে"॥ হরিমীড়ে স্তোত্রম্।

ওঁ গণেশায় নমঃ। শ্রীগুরুভ্যো নমঃ। শ্রীকেশবানন্দায় নমঃ। শ্রীকাশীবিশ্বেশ্বরাভ্যাম্ নমঃ॥ যে গুরু অজ্ঞানতিমিরান্ধজনের চক্ষু জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার দ্বারা উন্মীলিত করিয়াছেন, সেই গুরুকে আমার নমস্কার। সূত্রকার কেশবাবতার ভগবান্ বেদব্যাস এবং ভাষ্যকার সাক্ষাৎ শিবাবতার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি। সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল সেই এক ও অদ্বিতীয়,—বায়ু ব্যতিরেকে, আত্মামাত্র অবলম্বনে, নিশ্বাস প্রশ্বাসযুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তাঁহার নিঃশ্বসিত ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, এই চারি বেদ সাক্ষাৎ প্রাণ হইতে প্রকট (আবির্ভাব) হইয়াছিল। এজন্য সেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ মহতের নিঃশ্বসিত বেদচতুষ্টয় অপৌরুষেয় এবং নিত্য, ইহাতে সন্দেহ কি? শ্রুতি যথা,—"অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদোর্যজুর্ব্বেদঃসামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতি"। অনন্তর সেই পরম কৃপালু পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রারম্ভে জীবের মোক্ষের জন্য বেদ রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে প্রথম যে কর্ম্মকাণ্ড, তাহাতে জীবের চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নিরূপণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় যে উপাসনাকাণ্ড, তাহাতে জীবের বিক্ষেপ নিবৃত্তির নিমিত্ত নানাপ্রকার উপাসনা নিরূপিত হইয়াছে। তৃতীয় যে উপনিষদ্রূপ জ্ঞানকাণ্ড, তাহাতে কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত মুমুক্ষুব্যক্তি, ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তি ও জন্মমরণ-দুঃখ নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, এজন্য জীব ও ব্রহ্মের অভেদ নিরূপণ করা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা ইহা সিদ্ধ হইতেছে যে, সম্পূর্ণ বেদ জীবব্রহ্মের অভেদ-প্রতিপাদক। পরন্তু ভেদপ্রতিপাদক কখনই নহে। শ্রুতিতে লিখিত আছে, জীবব্রহ্মের ভেদদ্রষ্টা পুরুষ জন্মমরণরূপ দুঃখ পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রুতি যথা,—"মৃত্যোঃস মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি", "অথ তস্য ভয়ং ভবতি"। অনন্তর পরম কৃপালু ভগবান্ শঙ্কর জীবগণের দুঃখ অবলোকন করিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্য রূপ অবতার ধারণ করিয়া উপনিষৎ ও মহর্ষি বেদব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। সেই সমস্ত ভাষ্য হইতে উপনিষদের অর্থ বোধ করিতে যে সকল মুমুক্ষুর বুদ্ধি সমর্থ নহে, তাঁহাদিগের জন্য ইন্দ্রপ্রতর্দনউপাখ্যান নামে কৌষীতকী সারার্থ নিরূপণ করা যাইতেছে। ইহাতে গুরুশিষ্য-সংবাদ ছলে প্রথমতঃ অধিকারীর লক্ষণ নিরূপণ করা যাইতেছে। যিনি বেদ পাঠ করিয়াছেন, যাঁহার বুদ্ধি গুরূপদিষ্ট বেদার্থ ধারণ করিতে সমর্থ, যাঁহার মন অত্যন্ত কৃপাযুক্ত, এরূপ কোনও মুমুক্ষু ব্যক্তি (১) জীব-ঈশ্বরের ভেদ (২) জীবের পরস্পর ভেদ

(৩) জীব ও জড়ের ভেদ, (৪) ঈশ্বর ও জড়ের ভেদ (৫) জড় ও জড়ের ভেদ, এই পঞ্চপ্রকার ভেদ জ্ঞান দ্বারা ভয়সঙ্কুল এই যে জগৎ, তাহা দেখিয়া কোন সময়ে বিচার করিতে লাগিলেন,—ইহা অত্যন্ত কষ্টের বিষয় যে, সম্পূর্ণ দেহধারী জীবগণ সংসাররূপ শূল দ্বারা জন্মমরণ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঈদৃশ সংসাররূপ শূল হইতে সর্ব্ব প্রাণীর ইহলোক সম্বন্ধে ভয় কেন না হইবে? এই বিচার করিয়া সেই বুদ্ধিমান্ মুমুক্ষু ব্যক্তি গুরুকে জিজ্ঞাসা করিল,—"হে ভগবন্! এই সংসারশূল পরিত্যাগ করিয়া কি উপায়ে মনুষ্য মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে?" ঐ কৃপাসমুদ্র গুরু, শিষ্যের দ্বারা এইরূপ পৃষ্ট হইয়া, শিষ্যকে কহিতে লাগিলেন,—"হে শিষ্য! একমাত্র জ্ঞানই অজ্ঞান-নিবৃত্তির ও মোক্ষপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। শ্রুতি যথা,—'জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যং নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হি অয়নায়'। সুতরাং স্বস্বরূপ অজ্ঞান-নিবৃত্তির জন্য, "আমি ব্রহ্ম" এই জ্ঞান, বেদান্ত শ্রবণাদির দ্বারা অবশ্য সম্পাদন করিবে। হে শিষ্য। "আমি ব্রহ্ম" এই যে জীবব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান, তাহা লাভ করা যদ্যপি অনন্ত কোটী জন্মান্তেও দুর্লভ, তথাপি বিবেকী পুরুষ গুরুসেবা ও শ্রদ্ধাদি সাধনের দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ। আর এই আত্মজ্ঞান বিনা কোনও পদার্থ মানবের হিততম নহে। আত্মজ্ঞানই অত্যন্ত হিততম। কারণ এই আত্মজ্ঞানই মূলসহিত সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দ-প্রাপ্তির প্রধান সাধন। আত্মজ্ঞান বিনা সর্ব্বপদার্থ বন্ধনের কারণ। হে শিষ্য! এই অর্থে পূর্ব্বে ইন্দ্র ও প্রতর্দ্দন রাজার সম্বাদরূপ ইতিহাস কথিত হইয়াছে। সেই ইতিহাস তুমি শ্রবণ কর। শ্রীকাশীনগরীতে পূর্ব্বে দিবোদাস নামে এক রাজা ছিলেন। সেই দিবোদাস রাজার প্রতর্দ্দন নামে এক পুত্র ছিলেন। সেই প্রতর্দ্দন রাজা কিরূপ? পৃথিবীতে যে সমস্ত রাজাদি তাঁহার শত্রু ছিল এবং শরীরাভ্যন্তরে কামক্রোধাদি যে শত্রু আছে, সেই সমস্ত শত্রু ইনি জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে অত্যন্ত প্রীতি ছিল। সেই প্রতর্দ্দন রাজা ধর্ম্মবুদ্ধি করিয়া পৃথিবীর সমস্ত রাজাকে জয় করিয়াছিলেন। একদা নারদ মুনি তাঁহার সভাতে আসিয়া কহিলেন,—'আপনি পৃথিবীর সমস্ত রাজাকে জয় করিয়াছেন, সুতরাং আপনি পৃথিবীর ইন্দ্র। স্বর্গে দেবতাদিগের রাজা আর এক ইন্দ্র আছে, তাহাকে আপনি জয় করিতে পারেন নাই।' ইহা শ্রবণ করিয়া দেবরাজকে জয় করিবার নিমিত্ত সেই প্রতর্দ্দন রাজা একাকী ধনুর্ব্বাণ লইয়া স্বর্গে গমন করিলেন; তথায় স্বর্গদ্বারোপরি উপনীত হইয়া তিনি ইন্দ্রের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। রাজা বলিলেন, 'হে দূত! দেবরাজ ইন্দ্রকে আমার এই সন্দেশ-বচন গিয়া কহ,—"হে দেবরাজ! যদ্যপি সমস্ত লোক তোমাকে দেবতাদিগের ইন্দ্র কহে এবং আমাকে মনুষ্যের ইন্দ্র কহে, তথাপি তুমি এবং আমি উভয়ের ইন্দ্রত্ব সম্ভবে না। কারণ যে পরম ঐশ্বর্য্যবান্ হইবে তাহাকেই ইন্দ্র কহা যায়। যে ঐশ্বর্য্যের সমান কিংবা অধিক অন্য ঐশ্বর্য্য নাই, তাহাই পরম ঐশ্বর্য্য। এরূপ পরম ঐশ্বর্য্য একজনের সম্ভবে, দুইজনের সম্ভবে

না। সুতরাং তোমার এবং আমার সম্বন্ধে ইন্দ্র শব্দ মুখ্য নহে কিন্তু গৌণ। হে দেবরাজ! তোমা ভিন্ন যত রাজা পৃথিবীতে আছে তাহাদিগের সকলকে আমি জয় করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে নিজের ইন্দ্রত্বের গৌণতা নিবৃত্তির জন্য তোমাকে জয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া আমি স্বর্গে আসিয়াছি। সুতরাং হে দেবরাজ! আমার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সৈন্য-সামন্ত লইয়া শীঘ্র আইস। অথবা একাকী আইস। আর যদি যুদ্ধ করিতে তোমার সামর্থ্য না হয়, তাহা হইলে আমার সমীপে আসিয়া বল যে, আমি পরাজিত হইয়াছি। এই দুই বার্ত্তা বিষয়ে যাহা তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা কর। আর দেখ আমি প্রতর্দ্দন, ধনুঃ মাত্র সহায় করিয়া তোমার প্রিয়ধাম স্বর্গে উপস্থিত হইয়াছি। এই আমার প্রভাব বিচার করিয়া যাহা তোমার কর্ত্তব্য, তাহা কর।" এই প্রকারে উপদিষ্ট হইয়া প্রতর্দ্দন রাজা কর্ত্তৃক প্রেরিত দূত দেবসভায় গমন করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে নমস্কার করিয়া প্রতর্দ্দন রাজার সন্দেশ-বাক্য কহিতে লাগিল। দূত দেখিল, ইন্দ্র সুধর্ম্মা নামক দেবসভায় উপবিষ্ট, সূর্য্যসম তেজস্বী এবং সর্ব্বদেব দ্বারা পরিবেষ্টিত। দূত কহিল, "হে ভগবন্! সর্ব্বলোকের এবং সমস্ত লোকপালের আপনিই একমাত্র স্বামী। পরন্তু একবার্ত্তা আমি আপনাকে বলিতেছি। ভূমিলোকে কাশীনামে একটি মহানগরী আছে। তাহা আপনার স্বর্গ হইতেও অত্যন্ত রমণীয়। কারণ, দেবতাদিগের নদী যে ভোগবতী গঙ্গাদেবী, তিনি স্বর্গকে উপেক্ষা করিয়া শ্রীকাশী নগরীতে বিরাজমানা। সুতরাং স্বর্গ হইতেও কাশীমগপুরী রমণীয়। এই গঙ্গাতীরে কাশীনাম্নী পুরী বিদ্যমান্। উহা মহাদেবের ত্রিশূলোপরি সংস্থাপিত এবং নিজের শোভায় স্বর্গকেও তিরস্কার করিতে সমর্থ। এই কাশীতে অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ, যে কোন জীব মরিলেই মহাদেবের তারকমন্ত্র উপদেশ-বলে (আত্মজ্ঞান দ্বারা) মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।* আর এই কাশীপুরীতে ভগবান্ মহাদেব বিরাজমান্। সেই ভগবান্ মহাদেব কিরূপ? তিনি সর্ব্বপ্রাণী মাত্রেরই আত্মাস্বরূপ, তিনি সম্পূর্ণ জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় করিতে সমর্থ, আর ভবানীর হৃদয়-কমল প্রফুল্লিত করিতে সমর্থ। তিনি সূর্য্য এবং কর্পূরের ন্যায় গৌরবর্ণ। ভগবান্ মহাদেবকে নমস্কার করিতে সমর্থ যে দেবতাগণ, তাঁহাদের মস্তকস্থিত রত্নযুক্ত ভূষণের কিরণ দ্বারা তাঁহার

* অর্থাৎ কাশীতে মৃত্যু হইলে বেদপাঠী ব্রাহ্মণ যে মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে, সেই মোক্ষই কৃমি পতঙ্গ-আদি ক্ষুদ্র জন্তুও প্রাপ্ত হইবে। এই বাক্য পুরাণ, সংহিতা, ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত হইলেও ক্রমমুক্তিই ইহার তাৎপর্য্য। কাশীতে মৃত্যু হইলে আর গর্ভযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না এবং তজ্জন্য অনন্ত কোটি জন্মমরণ-পথে বিচরণ করিতে হয় না সত্য, তথাপি যে পর্য্যন্ত না পাপক্ষয় হয়, সে পর্য্যন্ত কর্ম্মফল-ভোগ অনিবার্য্য। পাপক্ষয় হইলে চিত্তশুদ্ধি বশতঃ তারক-মন্ত্র-প্রভাবে জ্ঞানের বিকাশ হওয়াতে, কৈবল্য-মুক্তি হয়। ইহা ভগবান্ শঙ্করানন্দ আত্মপুরাণে লিখিয়াছেন,—"ত্রিনেত্রত্বমুপৈতি হি"।

চরণ কমল প্রকাশমান। তাঁহার উপকার স্বীকার করিয়া সমস্ত মুনিগণ ও চারি বেদ বারম্বার তাঁহার বর্ণন করিতে থাকেন। যেরূপ বন্দী ও চারণ, মহারাজের গুণ কীর্ত্তন করে, অর্থাৎ রাজা বন্দী ও চারণদিগকে ধন দিয়া উপকার করেন, এজন্য তাহারা যেরূপ রাজার গুণ কীর্ত্তন করে, সেইরূপ মহাদেবও মুনিদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদানরূপ উপকার করেন; এজন্য মুনিগণ ভগবান্ মহাদেবের বর্ণন করিয়া থাকেন এবং তিনি বেদের প্রমাণতা প্রাপ্তিরূপ উপকার করেন, এজন্য সর্ব্ববেদ তাঁহারই বর্ণন করিয়া থাকে। * পুনরায় সেই মহাদেব কিরূপ? যাঁহার ইচ্ছামাত্রে ব্রহ্মাদি-দেবগণ এবং এই জগৎ অনন্তবার প্রাদুর্ভাব ও তিরোভাব প্রাপ্ত হইতেছে এবং যে মহাদেবকে প্রাপ্তির ইচ্ছা করিয়া হিমাচল-কন্যা পার্ব্বতী দেবী উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই পার্ব্বতী কিরূপ? তিনি সমস্ত স্ত্রীজাতির প্রধানা আর পূর্ব্বজন্মে সতীরূপে ভগবান্ মহাদেবের পত্নী ছিলেন। আর এই ভগবান্ মহাদেবের সেনানী ও গণেশনামে মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র আছেন। এবং এই মহাদেবের নাম গ্রহণে জীব সংসাররূপ দুঃখ প্রাপ্ত হয় না। এবং এই মহাদেবের চরণ-যুগল পূজা করিলে পুরুষের মনোবাঞ্ছিত ফল প্রাপ্তি হয়। এই বার্ত্তা শিবপুরাণে ভগবান্ ব্যাস কহিয়াছেন;—

"মহাদেব মহাদেব মহাদেবেতি যো বদেৎ। একেনৈব ভবেন্মুক্তির্দাভ্যাং শম্ভুঋণী ভবেৎ।"

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক 'মহাদেব' 'মহাদেব' 'মহাদেব' এইরূপ তিনবার মহাদেবের নাম উচ্চারণ করে, সেই পুরুষের একনাম দ্বারা ত মুক্তিরূপ ফলপ্রাপ্তি মহাদেব করান, আর দুইনাম দ্বারা মহাদেব ভক্তজনের নিকট ঋণী থাকেন। কারণ মুক্তি হইতে অধিক এমন কোন বস্তু জগতে নাই, যাহা প্রদান করিয়া মহাদেব ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারেন।

পুনরায় সেই মহাদেব কিরূপ? ব্রহ্মাণ্ডে স্থিত যে বিষয়ভোগ, সেই ভোগের ইচ্ছা হইতে তিনি রহিত। আর তিনি ব্রহ্মবিদ্যার সমুদ্র এবং নিত্যশুদ্ধ। এবং চিত্তনিরোধকারী সর্ব্বযোগীজনের গুরু। আর এই ভগবান্ মহাদেব হইতে সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, এই ভগবান্ মহাদেবে সমস্ত স্থিত। এবং এই ভগবান মহাদেবে সমস্ত জগৎ লয়প্রাপ্ত হইতেছে। এরূপ ভগবান্ মহাদেবের গুণ বর্ণন করিতে কোন্ প্রাণী সমর্থ? এইরূপ ভগবান্ মহাদেব সেই কাশীপুরীতে বিরাজমান। আর দেখুন মুক্তি প্রদানে সমর্থ অযোধ্যাপুরী, মথুরাপুরী, মায়াপুরী, কাশীপুরী, কাঞ্চীপুরী, অবন্তিকাপুরী ও দ্বারকাপুরী, এই সপ্তপুরী। তাহাদের মধ্যে শ্রীকাশীপুরীই অধিক সৌভাগ্যশালী।

* কারণ ফলবান্ অর্থ বোধন করাতেই বেদের প্রমাণতা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। অনাত্মবস্তুর জ্ঞান হইতে সুখপ্রাপ্তিরূপ ফল এবং সংসার-দুঃখ-নিবৃত্তিরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং অনাত্ম বস্তু বেদও বোধন করে না, কিংবা বোধন করিয়া বেদের প্রমাণতা সিদ্ধ হয় না। পরন্তু সর্ব্বান্তর্য্যামী মহাদেবের জ্ঞান হইতেই সংসার-দুঃখ-নিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তিরূপ ফল লাভ হয়। সুতরাং ভগবান্ মহাদেবের 'অহং ব্রহ্মাস্মি'রূপে বোধন করিয়াই বেদের প্রমাণতা সিদ্ধ হইয়াছে।

ইহা সমস্ত জীবের অনুভবসিদ্ধ। কারণ কাশীপুরীতে ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই সুলভ। আর হে দেবগণ! তোমাদের যে অমরাবতী পুরী, তাহাও কাশীপুরীর সমান নহে। কারণ তোমাদের পুরীসম্প্রাপ্ত যে জীব তাহার ভোগান্তে মর্ত্যলোকে পতনের সর্ব্বদা ভয় থাকে। আর নাগলোকের যে ভোগবতী পুরী আছে, তাহাও কাশীপুরীর সমান নহে। যখন তোমাদের অমরাবতী আর নাগলোকের ভোগবতীপুরী কাশীপুরীর সমান না হইল, তখন অন্য পুরীর কথা আর কি আছে? আর কাশীপুরীতে গঙ্গা সর্ব্বদা বিরাজিতা এবং ভগবান্ মহাদেব সর্ব্বদা বিরাজমান্। এই পুরী জগতের সর্ব্বপুরী হইতে অধিক সৌভাগ্যশালী। এই কারণে তাহার নাম কাশীপুরী হইয়াছে। প্রকাশমানের নাম কাশী। এইরূপ কাশীপুরীর দিবোদাস নৃপতি সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। সেই দিবোদাস রাজা কিরূপ? তিনি সমস্ত শত্রু জয় করিয়াছেন এবং আপনার প্রতিজ্ঞা সদা প্রতিপালন করিতে সমর্থ এবং ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি। এবং হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, এই চারি প্রকার সেনাযুক্ত। আর সেই দিবোদাস রাজা নিজেও অত্যন্ত বলশালী এবং যজ্ঞাদি কর্ম্মে অতিশয় তৎপর। সুতরাং তোমরা যে দেবতা, তোমাদের নিকটও তিনি প্রসিদ্ধ। এইরূপ দিবোদাস রাজার পুত্র প্রতর্দ্দন নামে রাজাও অতিশয় প্রসিদ্ধ। সেই প্রতর্দ্দন রাজা কিরূপ? আপনার পিতা ও পিতামহের ন্যায় সমস্ত শুভগুণ সম্পন্ন। আর প্রত্যেক প্রাণীর প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ কৃপাদৃষ্টি আছে। এই প্রতর্দ্দন রাজার পর্ব্বতের সমান অনেক কোটী হস্তী আছে। এবং সূর্য্যের অশ্বের ন্যায় অনন্তগুণশালী অশ্বও অনন্ত কোটী আছে। এই মহারথের রথের ন্যায় মহাশব্দ করিতে সমর্থ রথও অনেক কোটী আছে এবং আপনার সমান বলবান্ পদাতি-সৈন্যও অসংখ্য আছে। আর এই প্রতর্দ্দন রাজা শস্ত্রবিদ্যাবিষয়েও অতিশয় নিপুণ। যুদ্ধাদি বিষয়ে কপটতা-রহিত। আর এই প্রতর্দ্দন রাজা যদিও মহাদেবের প্রসাদে সম্পূর্ণ অস্ত্রপ্রয়োগরূপ সন্ধান অবগত আছেন এবং নির্ম্মোক্ষরূপ বিসর্গও জ্ঞাত আছেন এবং অস্ত্রের মর্য্যাদারূপ স্থিতিও অবগত আছেন, আর উপসংহাররূপ সংহৃতিও জানেন; তথাপি এই প্রতর্দ্দন রাজা কাহারও উপর অস্ত্রনিক্ষেপ করিতেন না। কিন্তু শত্রুর যেরূপ যুদ্ধের ইচ্ছা হইবে, সেইরূপই যুদ্ধ করিয়া থাকেন।" আর এই প্রতর্দ্দন রাজা শত্রুকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া প্রথমে শত্রুকে আঘাত করেন না; পরন্তু শত্রুকর্ত্তৃক আহত হইলে পর শত্রুকে হনন করিয়া থাকেন। আর শত্রুকর্ত্তৃক প্রথমে তাড়িত হইলেও এই প্রতর্দ্দন রাজা পঞ্চাশ বৎসরের উর্দ্ধ যাঁহাদের বয়স, তাঁহাদিগকে হনন করেন না এবং ষোড়শ বৎসরের ন্যূন যাঁহার বয়স, তাঁহাকেও আঘাত করেন না; কারণ শূরবীরের ব্রত প্রতর্দ্দন রাজা ধারণ করিয়াছেন। ধনুর্ব্বেদে শূরবীরের ধর্ম্ম, ইহা শাস্ত্রে কথিত আছে। যথা,—

মূর্চ্ছিতং নৈব বিকলং না শস্ত্রং নান্যবোধিনম্।
পলায়মানং শরণং গতং নৈব চ হিংসয়েৎ॥

অর্থাৎ, "মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত শত্রুকে, তথা ব্যাকুলকে, তথা শস্ত্ররহিতকে, তথা অন্যের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত শত্রুকে, তথা পলায়মান ব্যক্তিকে, তথা শরণাগতকে, এই সকল লোকদিগকে শূরবীর হনন করিবে না।"

আর এই প্রতর্দ্দন রাজার অন্য কি ব্রত আছে? ব্রাহ্মণকে এবং দেবতাকে এবং গোদিগকে এবং বৃষভদিগকে কদাচিৎ অপমান করেন না। আর হে দেবরাজ! এই প্রতর্দ্দন রাজার অন্য কি ব্রত আছে? দেবতাই হউক, কিংবা ব্রাহ্মণই হউক, অথবা আপনার পিতা পিতামহই হউক, তাহাদের সকলকে 'স্ববলে আমি জয় করিব' এই প্রকার ব্রতযুক্ত প্রতর্দ্দন রাজার সমীপে কোন সময়ে নারদ গিয়াছিলেন। এবং কদাচিৎ প্রসঙ্গক্রমে প্রতর্দ্দন রাজাকে এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—'হে প্রতর্দ্দন রাজা! তুমি সমস্ত পৃথিবীর রাজাদিগকে জয় করিয়াছ। পরন্তু ইন্দ্রাদি দেবতা ক্ষত্রধর্ম্ম দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর রাজা অপেক্ষা বলবান্। কারণ সেই দেবতার সহিত অসুর, দানব, দৈত্য, কেহই যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহে যখন অসুর, দানব, দৈত্য ও দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহে, তখন মনুষ্যের ত কথাই নাই। আর এই লোকে এক ইন্দ্রকেই জয় করিতে কেহই সমর্থ নহে। তবে সম্পূর্ণ সেনা-সামন্ত-সম্পন্ন তথা লোকপালযুক্ত ইন্দ্রকে কে জয় করিতে সমর্থ?' এই প্রকার নারদাদি মুনির বচন শ্রবণ করিয়া এবং আপনার প্রতিজ্ঞারূপ ব্রত স্মরণ করিয়া, সেই প্রতর্দ্দন রাজা দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত উৎসাহ করিয়া একাকীই স্বর্গে আগমন করিয়াছেন হে দেবরাজ! সেই প্রতর্দ্দন রাজা এখানে আসিয়া আপনার পুরীর দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন। আর সেই প্রতর্দ্দন রাজা আমাকে দূতভাবে আহ্বান করিয়া দেবতাদিগের সমীপে প্রেরণ করিয়াছেন। এই প্রতর্দ্দন রাজা আমাকে সন্দেশ-বচনও কহিয়া দিয়াছেন। তাহা সমস্ত আমি আপনাকে কহিয়াছি, এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিরুচি হয়, সেইরূপ করুন।" এইরূপ দূত সমস্ত সন্দেশ-বচন দেবরাজ ইন্দ্রসমীপে কহিল। এইপ্রকার দূতের বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং প্রতর্দ্দন রাজার অভয়রূপ পুরুষার্থ বিচার করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রও অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং নিজের ক্ষত্রধর্ম্ম স্মরণ করিয়া ক্রোধান্বিত হইতে লাগিলেন। তখন তিনি সমস্ত দেবতাদিগকে সঙ্গে লইয়া শীঘ্রই আপনার পুরীর বহির্দ্দেশে বহির্গত হইলেন। পরন্তু যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত সমস্ত দেবতাদিগকে দেখিয়াও সেই প্রতর্দ্দন রাজা সেই স্থান হইতে বিচলিত হইলেন না।

ক্রমশঃ

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র।

ভক্তের মান।

(মূল "ভক্তমাল হরিভক্তিপ্রকাশিকা" অবলম্বনে।)

একদা জনৈক সন্ন্যাসী আসি শুধায় নগর-জনে,
তঙ্কা রাখিয়া কে দিবে হুণ্ডী তীর্থের দরশনে ?
বিদ্রূপ করি কহে একজন, "ওই গৃহ দেখা যায়,
নরসী শেঠজী আছেন সেথায় দেন যেবা যাহা চায় !

জুনাগর-বাসী সাধু যে নরসী পরম ভক্তিমান্,
হরির পূজায়, অতিথি-সেবায়, অর্পিত সারা প্রাণ !
বিদ্বেষী তাঁর মহত্ব হায়, বুঝিবে কেমন ক'রে,
তাই তাঁরে আজি বিপাকে ফেলিতে মাগে হেন ছল-ভরে !

সন্ন্যাসী কিছু রাখে না খবর সাধু পাশে গিয়া কয়,
"যাইব দ্বারকা দাও গো হুণ্ডী টাকা রেখে মহাশয় !"
নরসী কহেন "একি কথা ভাই, আমি নই মহাজন,
কা'র নামে আমি সঁপিব হুণ্ডী কে চিনিবে অকিঞ্চন !"

সন্ন্যাসী কোন কথা নাহি মানে বেয়াকুল অতিশয়,
সাত শ টাকার থলিয়া নামায়ে দুয়ারে বসিয়ে রয় !
নরসী তখন না হেরি উপায়, লিখে দিল্ এই বাণী —
"শামল শাহজী, সাত শত টাকা দিও হে ইঁহারে আনি !"

পুলকিত চিতে সন্ন্যাসী ত্বরা উপনীত দ্বারকায়,
কোথায় 'শামল' খুঁজে দ্বারে দ্বারে কেহ ত জানে না তাঁয় !
ক্ষুধায় তৃষায় শ্রান্ত যে কায়, ভাবে যতি মনে মনে—
প্রসাদ লইয়া ফিরিবে আবার শাহের অন্বেষণে।

'শামল শাহেরে' কে চিনিবে আজি নাহি সে দ্বারকা আর,
সমুদ্র বৃথায় যেতেছে বহিয়া করি শুধু হাহাকার !
'শামল শাহের' লীলা তো থামেনি, থামেনি মধুর বাণী,
অন্ধ জগত মূঢ়ের মত কুড়ায় ভস্মরাশি !

সন্ন্যাসী হেরে, কে আসিছে ওই, হর্ষে নাচিল বুক, -
শ্যামল বরণ পুরুষ রতন করুণা-কোমল মুখ !
মস্ত পাগড়ী বেঁধেছে মাথায়, ঝোলান কুর্ত্তি গায়,
কানেতে কলম, বগলে কেতাব, স্কন্ধে থলিয়া হায় !

নিকটে আসিয়া শুধায় সাধুরে "নরসীর পাশ হ'তে,
কে আনে হুণ্ডী? সন্ধানে তার ফিরি আমি পথে পথে!"
সন্ন্যাসী কয় "আমি যে সে জন তোমারে খুঁজিয়া মরি,
কোথা তুমি থাক? চিনে না তোমায় সারাটী নগর-ভরি!"
"হরি-দাস বিনে নগরবাসীরা কেহ ত চিনে না মোরে,
তোমারেও আমি খুঁজি কত দিন!"—কহিল সে করযোড়ে।
তার পর হাসি হুণ্ডী লইয়া টাকাটী গণিয়া দিল,
নরসীর নামে পত্র লিখিয়া তা'রি সনে অরপিল!

সন্ন্যাসী ফিরে দেশে আপনার সকল তীর্থ হ'য়ে,
পথে জুনাগড়, নরসীর সাথে ভেটিল পত্র ল'য়ে!
আনন্দ তাঁরে জানা'ল কতই—কহিল সকল কথা—
বিস্মিত সাধু সহসা পরাণে জাগে একি আকুলতা!

ত্রস্ত-আবেগে খুলিলা পত্র, হেরিলা লিখিত তাহে—
"পেয়েছি হুণ্ডী, দিল সব টাকা তোমারি 'শামল শাহে!'
গোমস্তা মোরে জানিয়ে তোমার, যখন যে কাজ হয়,
করুণা করিয়ে লিখিও নিয়ত নরসীজী মহাশয়।"

বক্ষে চাপিয়া শামল শাহের মধুর পত্রখানি,
সজল-নেত্রে কহিলা নরসী হইয়া যুক্ত-পাণি—
"শামল! শামল! ইষ্টদেবতা! কৃপাময় ভগবান্!
গোমস্তা সাজি রাখিলে কি হায়, অধম দাসের মান!"

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

আবাহন।

কোথা হে প্রাণের হরি, কৃপা করি, পরাণ টুকু লও হে পদে।
শুন হে হৃদয়ের ধন, হৃদয়-শোভন, মোহন বেশে দাঁড়াও হৃদে॥
জানি ত আর কিছু নাই, ও ভাই কানাই, বিনা তোমার চরণ-রেণু।
লভিতে হয়েছে সাধ, দাও হে প্রসাদ, আকুল হয়ে হেথায় এনু॥
কত কাল বলহে আর, সাধনের সার, ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ্‌ব ব'সে।
বাড়ায়ে ভক্তের মান, শ্রীরাধার প্রাণ, রাখহে প্রাণ রাধার এসে॥

শ্রীরাধা।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

বোধিসত্ত্বের আবির্ভাব।—ব্রহ্মদেশীয় আচার্য্য ও ভিক্ষু শ্রীমৎ এঁ মগ্যী সয়দউ উ জউ টীক মহাশয়ের নাম বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে সুপরিচিত। মেকৃতিলা জিলায় উনছাই'ল গ্রাম সমীপস্থ থৈন দউন শৈলে, ইঁহার আশ্রম। যখন তাঁহার বয়ক্রম দ্বাদশ বর্ষমাত্র, তখন এই বালক-তপস্বী কিরূপ কার্য্যে জগতহিতার্থে ভবিষ্যৎ জীবন অতিবাহিত করিবেন, ইহারই ধ্যানে নিয়ত নিরত থাকিতেন। একদিন তাঁহার অন্তরের অন্তর হইতে কে যেন বলিয়া দিল, "যাও বালক, সন্ন্যাস গ্রহণ কর, জগৎ হিতার্থে আত্মসুখ, আত্ম-জীবন উৎসর্গ কর।" সেই দিন হইতেই মগ্যি সয়দউ টীক সন্ন্যাসী; এবং এই সপ্তবিংশ বর্ষ তিনি জগৎ-কল্যাণ-কার্য্যে ও পরোপকার-ধ্যানে নিরত। তাঁহার এখন বয়ক্রম ৩৯ বৎসর; এই অল্প বয়সে তিনি চতুর্দ্দশটি বৌদ্ধ সংঘের প্রধান আচার্য্য, চতুর্দ্দশ বিভিন্ন বিহারের পরিচালক। তাঁহারই উপদেশে ৯০ জন বিদ্বান ভিক্ষু সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছেন; তাঁহার নির্দ্দিষ্ট নীতিমালা ১০০ ধর্ম্মপ্রাণ শিষ্যবর্গ পালন করিতেছেন। সকলে শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, সেই পরহিতব্রতী, পরকল্যাণনিরত পূজনীয় আচার্য্য এখন প্রচার করিতেছেন যে,—মানব মধ্যে বোধিসত্ব মৈত্রেয় বুদ্ধ শীঘ্রই আবির্ভূত হইবেন। প্রায় পঞ্চাশ সহস্র ব্রহ্মদেশবাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার বাক্য সাদরে গ্রহণ করিয়া পবিত্র ভাবে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন; তাঁহার আদর্শে নিজ নিজ জীবন গঠন করিতেছেন; জীবে করুণা মানব জীবনের দৈনন্দিন অবশ্য-কর্ত্তব্য, ইহা তাঁহারা স্থির করিয়া লইয়াছেন।

থিওসফিক্যাল সোসাইটির কর্ণধার মাননীয়া শ্রীমতী আনিবেসান্তও বহু জন কর্ত্তৃক উপহাসিত হইয়াও, জগতের সর্ব্বত্র নির্ভীক চিত্তে সেই শুভ সংবাদ প্রচার করিতেছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ষ্টার অব্ দি ইষ্ট (Star of the East) সম্প্রদায় জগতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। তাহার সভ্য সংখ্যা অন্যূন ১৫০০০। তাঁহারাও তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় ভক্তিভরে অবস্থিতি করিতেছেন ও প্রীতি দয়া করুণা ইত্যাদি ধর্ম্ম সাধনা করিতেছেন।

জাগ ভারত।—গত বৎসর শ্রীমতী অ্যানি বেসেন্ট মান্দ্রাজনগরে সমাজ ও ধর্ম্ম-সংস্কার সম্বন্ধে কয়েকটি ওজস্বিনী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ঐ সকল বক্তৃতা Wake up India (জাগ ভারত) নামক গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। সমাজশরীরে আঘাত না করিয়া, হিন্দুত্ব ও হিন্দু আদর্শ অপ্রতিহত রাখিয়া, হিন্দুজাতিকে কি ভাবে উন্নতির উচ্চ শিখরে আবার উপস্থাপিত করিতে পারা যাইতে পারে, ঐ গ্রন্থে সমাজ, ধর্ম্ম, শিক্ষা, শিল্প প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করিয়া বেসেন্ট মহোদয়া তাহারই উপায় নির্দ্ধারণে উদ্যোগী হইয়াছেন। এই গ্রন্থের বক্তব্য সম্বন্ধে অনেকাংশে সকলেই একমত হইবেন; কিন্তু জাতিভেদ ও যৌবন বিবাহ সম্বন্ধে কাহারও কাহারও মতভেদ হইবার সম্ভাবনা। সে যাহা হউক 'জাগ ভারত' গ্রন্থ যে ভারতবাসীর জাতীয় জাগরণে বিশেষ সহায়তা করিবে, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়।



Lao-Tsze. লাওট্‌জি ।

(চীনদেশীয় ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ।)

ব্রহ্মবিদ্যা

২য় বর্ষ।] চৈত্র, ১৩২০। [১২শ সংখ্যা।

অষ্টমূর্ত্তি-স্তোত্রম্

(বাণেশ্বরতন্ত্রোদ্ধৃতম্)

(১)

দেবদেব মহাদেব বিরূপাক্ষ ত্রিলোচন।
নমস্তে কৃতনাশায় সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে॥

দেবদেব মহাদেব ওহে ত্রিলোচন!
তুমি সর্ব্ব বিরূপাক্ষ সংহার-কারণ।
অনন্ত পৃথিবী এই তোমারি মূরতি,
তোমার চরণে দেব! করি হে প্রণতি।

(২)

পার্ব্বতীনাথ লোকেশ ভূতাধিপ সনাতন।
নমস্তে বামদেবায় ভবায় জলমূর্ত্তয়ে॥

লোকনাথ ভূতনাথ তুমি সনাতন,
তুমি ভব বামদেব পার্ব্বতী-রমণ।
এ অনন্ত জলরাশি তোমারি মূরতি,
তোমার চরণে দেব! করি হে প্রণতি।

(৩)

বিশ্বনাথ ত্রিলোকেশ ব্যোমকেশ মহেশ্বর।
নমস্তে স্মরনাশায় রুদ্রায় চাগ্নিমূর্ত্তয়ে॥

তুমি রুদ্র মহেশ্বর মদন-নাশন,
বিশ্বনাথ ব্যোমকেশ ত্রিলোক-তারণ।
এই যে অনল-রাশি তোমারি মূরতি,
তোমার চরণে দেব! করি হে প্রণতি।

(৪)

গঙ্গাধর বিশালাক্ষ বৃষধ্বজ জটাধর।
নমস্তে শূলহস্তায় উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে॥

তুমি শূলপাণি উগ্র বৃষভ-বাহন,
গঙ্গাধর জটাধর বিশাল-নয়ন;
এ অনন্ত বায়ু-রাশি তোমারি মূরতি,
তোমার চরণে দেব! করি হে প্রণতি।

(৫)

ত্রিপুরান্তক সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকণ্ঠ প্রমথাধিপ।
নমস্তে চন্দ্রচূড়ায় ভীমায়াকাশমূর্ত্তয়ে॥

তুমি ত্রিপুরারি ভীম শশাঙ্ক-শেখর,
শ্রীকণ্ঠ সর্ব্বজ্ঞ তুমি প্রমথ-ঈশ্বর;
অনন্ত আকাশ এই তোমারি মূরতি,
তোমার চরণে দেব! করি হে প্রণতি।

(৬)

কৃশানুরেতা হংসশ্চ শিতিকণ্ঠঃ কপালভৃৎ।
নমস্তে পশুনাথায় যজমানপ্রমূর্ত্তয়ে॥

তুমি হংস নীলকণ্ঠ, তুমিই কপালী,
তুমিই কৃশানুরেতাঃ, তুমি পশুপালী;
এই সোমযাগ-কর্ত্তা তোমারি মূরতি,
তোমার চরণে দেব! করি হে প্রণতি।

(৭)

শাশ্বতীশ জগন্নাথ মৃত্যুঞ্জয় পিনাকধৃক্।
মহাদেবায় তে সোমমূর্ত্তয়ে চ নমো নমঃ॥

তুমিই পার্ব্বতী-পতি, তুমি জগন্ময়,
তুমিই পিনাকী, মহাদেব, মৃত্যুঞ্জয়;
এই যে প্রশান্ত চন্দ্র তোমারি মূরতি,
তোমার চরণে দেব। করি হে প্রণতি।

(৮)

শ্রুতেঃ শ্রুতিধরাপেশ সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়ক।
ঈশানায় যশোদায় নমস্তে সূর্য্যমূর্ত্তয়ে॥

তুমিই শ্রুতির একমাত্র শ্রুতিধর;
সমস্ত সম্পৎ তুমি দাও নিরন্তর;
তুমি হে কৈলাস-নাথ, তুমিই ঈশান,
তুমিই মানব-গণে কর যশোদান;
এই যে প্রচণ্ড সূর্য্য তোমারি মূরতি,
তোমার চরণে দেব। করি হে প্রণতি।

কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর।

মলিনার আত্মকাহিনী।

যোগমায়া।

একদা বিপিনে যমুনা পুলিনে ধরিয়া ললিতা কর
(শুনিনু আড়ালে) গাহে বিনোদিনী বঁধু-প্রেমে গরগর:—

"(আমি) নীল রতনে নীল বসনে
আবরি রাখিব বুকে;
নয়ন মুদিয়া রহিব ডুবিয়া
তাহার পরশ-সুখে।
নীল যমুনায় সিনান করিতে
আঁচলে বাঁধিয়া নিব;
করে পরশিয়া উঠিব নাহিয়া,
কারে না জানিতে দিব।
নিশীথ আকাশে নিবিলে জোছনা,
তিমিরে বাহির করি,'
নিরালা হেরিব নীল মণিটিরে
মণির আলোকে মরি!"

গাহিতে ললনা পুলক মগনা নিমীলিল আঁখি-তারা,
উরস চাপিল, বুঝিবা ভাবিল আছে কি বা হ'ল হারা!
যতেক ভুবনে আছে সাধুজন, সবে যে মণির চোর,
রাজ-সম্পদ দলি' পদতলে যে মণিতে রহে ভোর,
যে মণির লাগি' মুনি ঋষি কত বরষ বরষ ধরি'
যুগে যুগে যুগে যোগ-নিমগণ চুরির সাধন করি',
সাধন ভজন নাহি কিছু যার এহেন গোপের নারী
না জানি কি গুণে লভিল সে মণি কেমনে বুঝিতে পারি!

ভাবিতে সহসা পুলকে পূরিনু, বুঝিনু গোপন মনে:—
গোপ-নারী বেশে নিজে যোগমায়া বিহরে বরজ বনে!
সাধনা তাহার সরল পরাণ, বঁধুর পিরীতি যোগ;
বঁধুর চরণে চিত সমপিয়া আপনারে দিল ভোগ!
এ হেন পিরীতি যে করে, তাহার আঁচলে বঁধুয়া বাঁধা,
মুনি ঋষি যার চরণ ভিখারী, তার অধিকারী রাধা!
হায় যে মলিনা আপন মগনা, কেমনে মিলিবে মোরে?
বঁধুর যে বঁধু, সে বাঁধে বঁধুরে সহজ পিরীতি-ডোরে।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী

চৈতন্য কথা।

সনাতনের শিক্ষা।

মহাপ্রভু সনাতনকে সকল তত্ত্বেরই শিক্ষা দিয়াছিলেন। রাগানুগা ভক্তি সম্বন্ধে তিনি যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, আমরা কেবল তাহারই সমালোচনা করিব।

রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন।
রাগানুগা-ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী-জনে।
তার অনুগত ভক্তের রাগানুগা নামে॥
ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগ স্বরূপ লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থ লক্ষণ-কথন॥

ভক্তের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ দুইভাব থাকে। যখন সংসারের মধ্যে থাকিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা যায়, এবং ভক্তি প্রচারের জন্য বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধ রাখা যায় এবং জীব-সেবা দ্বারা ভগবানের সেবা করা যায়, তখন ভক্তের বহিরঙ্গ বা বাহ্য ভাব। আর যখন ভক্ত বাহ্য ভুলিয়া মনে মনে কৃষ্ণের সঙ্গম-সুখ লাভ করেন, তখন তাঁহার অন্তরঙ্গ ভাব। বাহ্য-ভাবেও ভক্ত কৃষ্ণে আবিষ্ট-চিত্ত থাকিবেন। অন্তরঙ্গ ভাবে ভক্তের কৃষ্ণ সম্বন্ধে গাঢ় তৃষ্ণা ও অনুরাগ ভিন্ন আর কিছুই থাকেনা।

রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম। তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্।
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুমতি। শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥

অসংখ্য সনাতনধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে, কত লোক জ্ঞানী, কত লোক কর্ম্মী, কত লোক ভক্ত। আবার অসংখ্য ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে, কেহ কেহ প্রকৃতপক্ষে রাগমার্গাবলম্বী। কেবল রাধাকৃষ্ণের পূজা করিলেই বা যুগল-মন্ত্র গ্রহণ করিলেই রাগানুগ ভক্ত হয় না। যাঁহারা যথার্থ রাগানুগ, মধুর কৃষ্ণ তাঁহাদের উপর লক্ষ্য রাখেন। গোপ ও গোপীর অনুগত হইয়া কোন না কোন কালে তাঁহারা মধুর কৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করিতে পারিবেন।

বাহ্য অন্তর ইহার দুইত সাধন। বাহ্যে সাধকদেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥

এই হইল বহিরঙ্গ ভাবের সাধন।

মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥

এই হল অন্তরঙ্গ সাধন। অন্তরঙ্গ সাধনে সিদ্ধদেহ ভাবনা করিতে হইবে। আমাদের যে স্থূল দেহে কামের উদ্দীপনা হয়, যে দেহে ইন্দ্রিয় সকল বাহ্য স্পর্শে কলুষিত হয়, যে দেহে নিত্য কপটতা ও কপট সম্বন্ধের সঙ্গম লাভ হয়, সে দেহে প্রেমময় কৃষ্ণভাবনা হইতে পারে না। তুমি যথার্থ সিদ্ধ হও বা না হও, অন্তরঙ্গ ভাব যখন মধুর কৃষ্ণকে লইয়া

খেলা তখন তুমি কল্পনা করিয়াও কামবর্জ্জিত সিদ্ধ দেহ ধারণ করিবে। কেবল গোপ ও গোপীভাব লইয়াই সিদ্ধ দেহ ধারণ করা যায়।

মহাপ্রভু রঘুনাথ দাসকেও সংক্ষেপে বাহ্য ও আন্তরিক সাধনের কথা বলিয়াছিলেন। "গ্রাম্য কথা না কহিবে গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে। ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥

অমানী-মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥
এই ত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ। স্বরূপের ঠাঞি ইহার পাবে সবিশেষ॥"

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। তদ্ভাব লিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছেত লাগিয়া। নিরন্তর মনে করে অন্তর্মনা হঞা॥
এই মত করে যেবা রাগানুগা ভক্তি। কৃষ্ণের চরণে তার উপজয়ে প্রীতি॥
প্রেমাঙ্কুরে রতি ভাব হয় দুই নাম। যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণের প্রেমের সাধন॥

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশু সাম্যভাক্। রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্য কৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

'ভাব' একরূপ শুদ্ধ সত্ত্ববিশেষ, প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণ তুল্য। কৃষ্ণে রুচি ও আসক্তি জন্মাইয়া, এই ভাব চিত্তের মসৃণতা উৎপাদন করে।

এই দুই ভাবের স্বরূপ-তটস্থ লক্ষণ। প্রেমের লক্ষণ এবে শুন সনাতন॥

সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ। ভাবঃ সএব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমানিগদ্যতে॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

যাহাতে মন সম্যক্ রূপে মসৃণিত হয়, যে ভাবে কৃষ্ণে অতিশয় মমতা জন্মে, ঘনীভূত সেই ভাবকে পণ্ডিতেরা 'প্রেমা' বলিয়া থাকেন। রূপের শিক্ষাতে প্রেমের এইরূপ ক্রম পাইয়াছি- স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব।

সনাতনের শিক্ষায় রতি ও ভাব প্রেমের এই সকল অবান্তর ভাব হইতে ভিন্ন ও প্রেমের পূর্ব্বসূচি।

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়। তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন। সাধন ভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়। নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যের রুচি উপজয়॥
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর। আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে রতির অঙ্কুর॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম। সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ ধাম॥
এই নব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়। প্রাকৃত ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয়॥
কৃষ্ণ সম্বন্ধ বিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায়। ভুক্তি সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায়॥
সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা প্রধান। নাম গানে সদা রুচি লয়ে কৃষ্ণনাম॥
কৃষ্ণগুণাখ্যানে করে সর্ব্বদা আসক্তি। কৃষ্ণলীলা স্থানে করে সর্ব্বদা বসতি॥

কৃষ্ণে রতির চিহ্ন এই কৈল বিবরণ। কৃষ্ণ প্রেমের চিহ্ন এবে শুন, সনাতন ॥
যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম করয়ে উদয়। তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয় ॥
প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ মান প্রণয়। রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয় ॥

যখন কৃষ্ণচরণে প্রীতি জন্মে, তখন সেই প্রীতি রতি ও ভাবে পরিণত হয়। অঙ্কুরে এই ভাব রতির নামান্তরমাত্র।

রতি গাঢ় হৈলে প্রেমের উৎপত্তি হয়। এই প্রেম একটি মাধুর্য্যময়, উন্মাদক, আত্ম-বিস্মারক, কৃষ্ণে গাঢ় লালসাময় দেবভাব। প্রথমে সহজ প্রেম। তাহার পর উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত প্রেমের গাঢ়তর ও গাঢ়তম সাতভাব;—১ স্নেহ, ২ মান, ৩ প্রণয়, ৪ রাগ, ৫ অনুরাগ, ৬ ভাব, ৭ মহাভাব।

শান্তরসে শান্তিরতি প্রেম পর্য্যন্ত হয়। দাস্যরতি রাগ পর্য্যন্ত ক্রমেতে বাঢ়য় ॥

শান্তরসে কেবলমাত্র সহজ প্রেম হয়। দাস্যরসে, স্নেহ, মান, প্রণয় ও রাগ পর্য্যন্ত জন্মিতে পারে।

সখ্য বাৎসল্য রতি পায় অনুরাগ সীমা। সুবলাদ্যের ভাব পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা ॥

সাধারণতঃ সখ্যরসে ও বাৎসল্য রসে প্রেম "অনুরাগের" সীমা পর্য্যন্ত উঠিতে পারে। কিন্তু সুবলাদি সখার প্রেম "ভাব" পর্য্যন্ত পরিণত হইতে পারে।

রূঢ় অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুরে। মহিষীগণের রূঢ়, অধিরূঢ় গোপিকা নিকরে ॥

মহিষীগণের রূঢ়ভাব, গোপীগণের অধিরূঢ় ভাব।

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নায়ক শিরোমণি। নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী ॥

চৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যলীলায় দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে এইরূপে সনাতনের শিক্ষা বর্ণিত হইয়াছে। আমি অনেক অংশ পরিত্যাগ করিয়াছি। প্রেমের শাস্ত্র শ্রীচৈতন্যের শিক্ষামত সম্পূর্ণ আলোচনা করিতে হইলে একটি বৃহৎ পুস্তক লিখিতে হয়। আমি কেবল সেই শাস্ত্রের দিগ্‌দর্শন করিতেছি মাত্র। প্রেমের সম্পূর্ণ আলোচনায় আমার অধিকার জন্মে নাই। একমাত্র ভগবৎকৃপা ভিন্ন সে অধিকার জন্মিতে পারে না।

সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ। একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী। চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥
সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধ সত্ব নাম। ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥
মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর। এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্বের বিকার ॥
কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সংবিতের সার। ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥
হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেমসার ভাব। ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব ॥
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী। সর্ব্বগুণ-খনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি ॥

চৈ, চ, আদি ৪।

প্রেম ভগবানের নিজ শক্তির পূর্ণ বিকাশ। সেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা মহাভাব। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব প্রেমের এই মহাভাব দেখাইয়াছিলেন। এই জন্যই স্বরূপগোস্বামী তাঁহাকে "রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং" বলিয়া নমস্কার করিয়াছেন।

সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর শিক্ষা বলে পাণ্ডিত্য ও যুক্তি আশ্রয় করিয়া প্রেমের প্রাধান্য দেখাইয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, ব্রহ্মবাদীদিগের মুক্তি তুচ্ছ। তাহা হইতে ভক্তের মুক্তি অধিকতর বিচিত্র। কিন্তু প্রেম এই দুই প্রকার মুক্তি হইতে কোটি গুণ অধিক।

তিনি দেখাইয়াছেন, ইন্দ্রিয়ের আবশ্যকতা আছে। কিন্তু সকল ইন্দ্রিয় মনের অন্তর্ভূত। বাহ্যদৃষ্টিতে ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয় না। অন্তর্দৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়াই ভক্তের উদ্দেশ্য থাকিবে।

সমাধৎস্ব মনঃ স্বীয়ং ততো দ্রক্ষ্যসি তং স্বতঃ। সর্ব্বত্র বহিরন্তশ্চ সদা সাক্ষাদিব স্থিতম্॥

বৃহদ্ভাগবতামৃত, ২-২-৮৭।

নিজের মন সমাহিত কর। তাহা হইলে সেই সর্ব্বব্যাপক ভগবানকে সাক্ষাৎ অবস্থিত বলিয়া দেখিতে পাইবে।

পরমাত্মা বাসুদেবঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ। নিতান্তং শোধিতে চিত্তে স্ফুরত্যেব ন চান্যতঃ। ২-২-৮৮।

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, পরমাত্মা, বাসুদেব নিতান্ত শোধিত-চিত্তেই প্রকাশিত হন। বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারা যায় না। যদি বল চিত্তদ্বারা গ্রহণকে ধ্যান বলা যায়, দর্শন বলা যায় না, কারণ চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণকেই দর্শন বলে; তাহার উত্তর এই যে, মন দ্বারাই চক্ষুর কার্য্য হয়।

তদানীং মনোবৃত্ত্যন্তরাভাবাৎ স্ফুরসিদ্ধ্যতি। চেতসা খলু যৎ সাক্ষাচ্চক্ষুষাদর্শনং হরেঃ॥ ২-২-৮৯

ভগবৎ-স্ফূর্ত্তি সময়ে মনে অন্য বৃত্তি থাকে না। ভগবানের মূর্ত্তিতে যখন মন অভিনিবিষ্ট থাকে, তখন এমন জ্ঞান হয় না যে, আমি মন দ্বারাই ভগবান্‌কে দেখিতেছি, চক্ষুদ্বারা দেখিতেছি না। এই জন্য চক্ষুর কায মনের দ্বারাই সিদ্ধ হয়।

মনঃসুখেঽন্তর্ভবতি সর্ব্বেন্দ্রিয় সুখং স্বতঃ। তদ্বৃত্তিষপি বাক্‌চক্ষুঃ শ্রুত্যাদীন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ॥ ২-২-৯০

সকল ইন্দ্রিয়ের সুখ মনের সুখেই অন্তর্ভূত। সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিও সেইরূপ মনের বৃত্তি মধ্যে অবস্থিত হয়। মন দ্বারাই শ্রবণ কীর্ত্তন দর্শনাদি সিদ্ধ হয়।

মনোবৃত্তিং বিনা সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং বৃত্তয়োঽফলাঃ। কৃতাপীহাঽকৃতৈব স্যাদাত্মস্বনুপলক্ষিতঃ॥ ২-২-৯১

মনোবৃত্তির সহিত সংলগ্ন হইলেই চক্ষুরাদির রূপাদি গ্রহণ আত্মায় উপলব্ধি হয়। নতুবা চক্ষুরাদির কার্য্য নিষ্ফল হয়।

এখন মোক্ষ কাহাকে বলে?

সোঽয়ংশবদ্ধঃবন্ধসো বাঽবিদ্যা কর্ম্মজয়োঽথবা। মায়াকৃতান্তথারূপ ত্যাগাৎ স্বানুভবোঽপিবা॥

বৃহদ্ভাগবতামৃত ২-২-১৭৫

অশেষ দুঃখের নাশকে মোক্ষ বলে। কিম্বা অবিদ্যাকৃত কর্ম্মক্ষয়কে মোক্ষ বলে। কিম্বা মায়াকৃত দেহাদি অন্যথা রূপ ত্যাগ করিয়া স্বরূপ বা আত্মার অনুভবকে মোক্ষ বলে। মোক্ষের দুই অংশ—নাশাত্মক অভাব ও অনুভাবাত্মক ভাব। অনুভবেই আনন্দ। কিন্তু সে আনন্দ, ভগবানের সাক্ষাৎকার হইতে যে আনন্দ লাভ করা যায়, তাহা হইতে অতি তুচ্ছ।

জীব স্বরূপভূতস্ত সচ্চিদানন্দ বৃংহনঃ। সাক্ষাদনুভবেনাপি স্যাত্তাদৃক্ সুখমল্পকম্॥ ২-২-১৭৬

সচ্চিদানন্দ জগদীশ্বর অংশরূপে জীবের স্বরূপ ধারণ করেন। "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ"। সেই অংশীভূত স্বরূপের অনুভব সাক্ষাৎ হইলেও তাহা দ্বারা যে সুখ লাভ হয়, তাহা অতি অল্পমাত্র।

শুদ্ধাত্মতত্ত্বং যদ্বস্তু তদেব ব্রহ্ম কথ্যতে। নির্গুণং তচ্চ নিঃসঙ্গং নির্ব্বিকারং নিরীহিতম্॥ ২-২-১৭৭

যদি বল জ্ঞানীর কেবল স্বরূপানন্দ হয় না, জ্ঞানী ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন। সে ব্রহ্মানন্দই বা কি? জীবপ্রকৃতি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন শুদ্ধ আত্মতত্ত্বকেই ব্রহ্ম বলে। সে ব্রহ্ম নির্গুণ, নিঃসঙ্গ, নির্ব্বিকার ও নিরীহিত। সুতরাং ব্রহ্মানুভব দ্বারা যে আনন্দ লাভ হয়, তাহাও তদ্রূপ।

ভগবাংস্তু পরব্রহ্মপরাত্মা পরমেশ্বরঃ। সুসান্দ্র সচ্চিদানন্দ বিগ্রহো মহিমার্ণবঃ॥ ২-২-১৭৮

যিনি ভগবান্, তিনি পরব্রহ্ম পরমাত্মা ও পরমেশ্বর। তিনি অত্যন্ত ঘনীভূত সচ্চিদানন্দ রূপ। তাঁহার মহিমার সীমা নাই।

সগুণত্ব গুণত্বাদি বিরোধাঃ প্রবিশন্তি তম্। মহাবিভূতি ব্রহ্মাস্ত প্রসিদ্ধেত্থং তয়োর্ভিদা॥ ২-২-১৭৯

সগুণত্ব অগুণত্বাদি সকল বিরোধ সেই ভগবানে প্রবেশ করে। ব্রহ্মরূপ ও জীবতত্ত্বরূপ তাঁহার মহাবিভূতি।

অতঃ সান্দ্রসুখং তস্য শ্রীমৎপাদাম্বুজদ্বয়ম্। ভক্ত্যানুভবতা সান্দ্রং সুখং সম্পদ্যতে ধ্রুবম্॥ ২-২-১৮০

ভগবানের চরণ-পদ্ম ঘন আনন্দ স্বরূপ। যেমন ঘনমণ্ডল সূর্য্যে সকল কিরণ ঘনীভূত হয়, সেইরূপ ভগবচ্চরণারবিন্দে সকল আনন্দ ঘনীভূত হয়। ভক্তিমার্গে আনন্দ অনুভব করিলে, সেই ঘন আনন্দ লাভ হয়।

সুখরূপং সুখাধারঃ শর্করাপিণ্ডবন্মতম্। শ্রীকৃষ্ণচরণদ্বন্দ্বং সুখং ব্রহ্ম তু কেবলম্॥ ২-২-১৮১

শ্রীকৃষ্ণের চরণ যুগল কেবল যে আনন্দরূপ, তাহা নহে। শর্করা পিণ্ডবৎ ঐ চরণ-যুগল আনন্দের রূপ ও আনন্দের আধার। ব্রহ্ম কেবল আনন্দমাত্র, আনন্দের আধার নহে। ভগবান্ সমুদ্রকোটিগম্ভীর, পরমাশ্চর্য্য মহিমাবান্। ভেদ ও অভেদ রূপ বিচিত্র বিরোধ প্রবাহ ঐ ভগবানে প্রবেশ করিতেছে। তিনি সকলেরই আধার ও বিচিত্র আনন্দময়।

জীবস্বরূপঞ্চ যদ্বস্তু পরংব্রহ্ম তদেব চেৎ। তদেব সচ্চিদানন্দঘনং শ্রীভগবাংশ্চ তৎ॥ ২-২-১৮২

যে বস্তু জীবস্বরূপ, তাহাই যদি পরব্রহ্ম হয়, এবং জীব যদি সচ্চিদানন্দঘন হয়, এবং জীবস্বরূপও যদি ভগবান্ হয়—

তথাপি জীব-তত্ত্বানি তস্যাংশা এব সম্মতাঃ। ঘনতেজঃসমূহস্য তেজোজালং যথা রবেঃ॥ ২-২-১৮২

তথাপি জীবতত্ত্ব ব্রহ্মের অংশ। এই তত্ত্বই সাধুসম্মত। যেমন ঘন-তেজ-মণ্ডল সূর্য্যের কিরণজাল, সেইরূপ ঘনতেজ ব্রহ্মের কিরণজাল জীব।

একদেশস্থিতস্যাগ্নে র্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা। পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ ॥—পরাশর।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্যচ।—ভগবদ্গীতা।

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি। কোটিষশেষ বসুধাদি বিভূতিভিন্নম্।

তদ্ ব্রহ্মনিষ্কল মনন্ত মশেষ ভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥—ব্রহ্মসংহিতা।

নিত্যাসিদ্ধান্ততো জীবা ভিন্না এব যথা রবেঃ। অংশবো বিস্ফুলিঙ্গাশ্চ বহ্নে র্ভঙ্গাশ্চ বারিধেঃ ॥—২-২-১৮৪

মায়ার অপগম হইলে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ হয়, এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ তত্ত্ববাদীগণের মত অনুসারে, জীব পরব্রহ্মের নিত্য অংশরূপে সিদ্ধ। সে অংশ মায়ার ভ্রম নহে। এই জন্য রবির কিরণের ন্যায়, অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায়, সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায়, জীব ব্রহ্ম পদার্থ হইতে নিত্য ভিন্ন।

অনাদি সিদ্ধয়া শক্ত্যা চিদ্বিলাস স্বরূপয়া। মহাযোগাখ্যয়া তস্য সদাতে ভেদিতাস্ততঃ ॥ ২-২-১৮৫

পরব্রহ্মরূপ ভগবানের অনাদি এক শক্তি আছে। সেই শক্তি চিদ্বিলাস-স্বরূপ। সেই শক্তির নাম মহাযোগ, যোগমায়া। সেই শক্তি দ্বারা জীব পরব্রহ্ম হইতে নিত্য অংশরূপে বিভেদিত হয়।

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ।—ভগবদ্গীতা।

অতস্তস্মাদভিন্নাস্তে ভিন্না অপি সতাং মতাঃ। মুক্তৌ সত্যামপি প্রায়োভেদস্তিষ্ঠেদতো হি সঃ ॥—২-২-১৮৬

এই জন্য জীব পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। 'সচ্চিদানন্দত্বাদি ব্রহ্ম সাধর্ম্ম্যবত্বাৎ'। সচ্চিদানন্দত্বাদি ব্রহ্মেও আছে, জীবেও আছে। জীবে পরিচ্ছিন্ন, ব্রহ্মে অপরিচ্ছিন্ন। অংশত্ব দ্বারা এই পরিচ্ছেদ ও ভেদ। মুক্তিলাভ করিলেও প্রায় ব্রহ্মের সহিত জীবের ভেদ থাকিয়া যায়।

এই শ্লোকের উপর স্বয়ং সনাতন গোস্বামী এইরূপ টীকা করিয়াছেন।

"ভগবৎপাদ শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলেন,—'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং বিরাজন্তি।' মুক্ত পুরুষও লীলা দ্বারা ভগবৎ-শরীর রচনা করিয়া বিরাজ করেন। 'মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ পরায়ণঃ। সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষপি মহামুনে।' কোটি কোটি সিদ্ধ ও মুক্ত পুরুষের মধ্যে কেহ কেহ নারায়ণ-পরায়ণ হয়। মুক্ত পুরুষের পরব্রহ্ম হইতে ভেদ থাকিলেই, মহাপুরাণাদির এই সকল বচন সঙ্গত হয়। যদি মুক্ত পুরুষ-ব্রহ্মে লীন হন, তাহা হইলে লীলায় বিগ্রহরচনা কিরূপে সম্ভব হয়? আর কেই বা মুক্তির পর নারায়ণ-পরায়ণ হইতে পারে? কিছু না কিছু মুক্ত পুরুষের পৃথক সত্তা থাকিয়া যায়। যদি বল ঐ সকল উক্তি জীবন্মুক্ত পুরুষের জন্য। তাহা অসম্ভব। কারণ জীবন্মুক্ত পুরুষের ত শরীর থাকে। সে আবার শরীর-রচনা কি করিবে? আবার পুরাণ-বচনে সিদ্ধ ও মুক্ত পুরুষ দু'য়ের উল্লেখ আছে। জীবন্মুক্তই সিদ্ধ পুরুষ। পাদ্ম-কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে কথিত

আছে, যে নৃদেহধারী মহামুনি ভগবানে লীন হইলেও পুনরায় নারায়ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বৃহন্নারসিংহপুরাণে নরসিংহ-চতুর্দ্দশী ব্রত প্রসঙ্গে কথিত আছে, বেশ্যা সহিত ব্রাহ্মণ ভগবানে লীন হইয়াও পুনরায় ভার্য্যার সহিত প্রহ্লাদরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এইরূপ অনেক উপাখ্যান ও প্রমাণ আছে। 'প্রায়' ভেদ থাকে। কারণ কদাচিৎ ভগবৎ-ইচ্ছায় সাযুজ্যাখ্য নির্ব্বাণও হইতে পারে।"

সচ্চিদানন্দরূপাণাং জীবানাং কৃষ্ণমায়য়া। অনাদ্যবিদ্যয়া তত্ত্ব বিস্মৃত্যা সংসৃতি ভ্রমঃ॥ ২-২-১৮৭

সচ্চিদানন্দরূপ জীব-সকলের কৃষ্ণমায়ায় অনাদি অবিদ্যা কর্ত্তৃক তত্ত্ববিস্মৃতি হয় এবং জীব সকল দেহাদিকে আপনার ও 'আমি' মনে করিয়া সংসার-ভ্রমে পতিত হয়।

মুক্তৌ স্বতত্ত্বজ্ঞানেন মায়াপগমতোহিসঃ। নিবর্ত্ততে ঘনানন্দ ব্রহ্মাংশানুভবো ভবেৎ॥ ২-২-১৮৮

মুক্তি হইলে জীব নিজ তত্ত্ব জানিতে পারে, কারণ তখন মায়ার অপগম হয়। আর ঘনানন্দ ব্রহ্মের অংশের অনুভব হয়।

স্বসাধনানুরূপং হি ফলং সর্ব্বত্র সিদ্ধ্যতি। অতঃ স্বরূপজ্ঞানেন সাধ্যে মোক্ষেহল্পকং ফলম্॥ ২-২-১৮৯

সকলেই আপন আপন সাধনা অনুসারে ফল লাভ করে। স্বরূপ-জ্ঞানে যে মোক্ষ লাভ করা যায়, তাহার ফল অল্পমাত্র।

সুখস্য তু পরাকাষ্ঠা ভক্তাবেব স্বতো ভবেৎ। তদ্বয় শ্রীপদাম্ভোজসেবিনাং সাধনোচিতা॥ ২-২-১৯১

ভক্তিমার্গে মুক্তিলাভ করিলে সুখের পরাকাষ্ঠা লাভ করা যায়। কারণ ভগবান্ ঘনানন্দ। তখন আর অংশের আনন্দ নহে। কিন্তু ভক্তিতেও সাধনোচিত আনন্দ। কোন ভক্তের মোক্ষ পরম পদার্থ, আর কোন ভক্তের কৃষ্ণচরণই পরম পদার্থ।

কৃষ্ণভক্ত্যৈব সাধুত্বং সাধনং পরমং হি সা। তয়া সাধ্যং তদঙ্ঘ্র্যব্জযুগলং পরমং ফলং॥ ২-২-২০২

কৃষ্ণভক্তি দ্বারাই সাধুত্বলাভ হয়। কৃষ্ণভক্তিই পরম সাধন। কৃষ্ণভক্তি দ্বারা সাধ্য পরম ফল তাঁহার চরণ-পদ্মযুগল।

তদ্ভক্তিরসিকানাস্তু মহতাং তত্ত্ববেদিনাম্। সাধ্যা তচ্চরণাম্ভোজ-মকরন্দাপ্তিরেব সা॥—২-২-২০৩।

ভক্তি রসিক, তত্ত্ববেদী, মহাত্মাগণ কৃষ্ণচরণ-পদ্মের মধুকেই পরম সাধ্য বলিয়া জানেন।

সা কর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যাপেক্ষকস্য ন সিধ্যতি। পরং শ্রীকৃষ্ণকৃপয়া তন্মাত্রাপেক্ষকস্য হি॥—২-২-২০৪।

এই নিরপেক্ষ ভক্তি কর্ম্ম, জ্ঞান বা বৈরাগ্যের অপেক্ষা রাখে না। একমাত্র কৃষ্ণ-ভক্তিই পরম সম্বল।

কর্ম্মবিক্ষেপকং তস্যা বৈরাগ্যং রসশোষকম্। জ্ঞানং হানিকরং তত্তৎ শোধিতং ত্বনুযাতি তাম্॥ ২-২-২০৫

কর্ম্ম এই কৃষ্ণভক্তির বিক্ষেপক, বৈরাগ্য রসশোষক, জ্ঞান সেই ভক্তির হানিকর। কিন্তু কর্ম্ম বৈরাগ্য ও জ্ঞান শোধিত হইলে কৃষ্ণভক্তির অনুগামী হয়। কর্ম্মফল ত্যাগ-পূর্ব্বক ভগবৎ-প্রীতির জন্য অর্পিত হইলে শোধিত হয়। সংসার তুচ্ছ, কিসে আমি এই সংসার হইতে মুক্ত হইব, এই ভাবনায় বৈরাগ্য রস শুকাইয়া যায়। কিন্তু যখন মোক্ষে

বিতৃষ্ণা জন্মে এবং ভগবৎ সেবায় অনুরাগ হয়, তখন বৈরাগ্য শোধিত হয়। অদ্বৈত আত্ম-তত্ত্ব-বোধের ত্যাগ, ভগবানের নিজজন বলিয়া আপনাকে মনে করা এবং ভগবদ্ভক্তি-মহিমায় নির্দ্ধারণ দ্বারা জ্ঞান শোধিত হয়।

অবান্তরফলং ভক্তেয়ের মোক্ষাদি যদ্যপি। তথাপি নাত্মারামত্বং গ্রাহ্যং প্রেম-বিরোধি যৎ॥ ২-২-২০৯

যদিও ভক্তির অবান্তর ফল কখন কখন মোক্ষাদি হইতে পারে, তথাপি আত্মারামত্ব কখনও গ্রাহ্য নহে। কারণ আত্মারামত্ব প্রেমের বিরোধী।

সপ্রেমভক্তেঃ পরিপাকতঃ স্যাৎ কাচিন্মহাভাব বিশেষ সম্পৎ।
সাবৈ নরীনর্ত্তি মহাপ্রহর্ষ সাম্রাজ্য-মূর্দ্ধোপরি তত্ত্বদৃষ্ট্যা॥ ২-৪-২২৯

এই প্রেমভক্তির পরিপাক দ্বারা ক্রমশঃ মহাভাবরূপ সম্পত্তিবিশেষ হয়। এই মহাভাবই মহানন্দ সাম্রাজ্যের মূর্দ্ধে নৃত্য করে।

মহাপণ্ডিত, পরম ভক্ত সনাতন গোস্বামী এইরূপে প্রেমের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি যুক্তিদ্বারা, শাস্ত্রদ্বারা প্রেমকে মুক্তির শীর্ষ স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন এবং অকৈতব কৃষ্ণভক্তির জ্ঞান, কর্ম্ম, ও মোক্ষাপেক্ষী ভক্তির উপর প্রাধান্য নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা সর্ব্বতোভাবে সফল করিয়াছেন।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

দুঃস্বপ্ন।

গভীর নিশীথে, হেরিয়া স্বপন
সহসা উঠিনু জাগি'—
যেন উষাকালে আকুল পরাণে
দেবতার পূজা লাগি'
উত্তরিনু একা পূজার ভবনে
যতনে সাজায়ে ডালা;
দেখিনু তথায় প্রাণেশে আমার
গেলাম প'রাতে মালা।
পূরিল না সাধ পরাবার কালে
গেল ছিঁড়ে মালা গাছি;

অভাগা আমায় বিমুখ দেবতা
সেই হ'তে বুঝিয়াছি!
দুই করে চাপি' ভাঙা বুক খানি
ফিরিয়া আসিনু হায়!
বিজয়ার দিনে যথা ফিরে নর
জলে ফেলি' প্রতিমায়।
পূজিবার সাধ রহিল পরাণে
পূজা তো হ'ল না আর;
সুর-বাঁধা বীণা বাজাবার কালে
ছিঁড়িয়া ফেলিনু তার!

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন।

মৃত্যুর পরপারে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অদৃশ্য সহায়।

আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে দেখিয়াছি মানব কখনও কখনও উচ্চদেবতা, নিম্নশ্রেণীর দেবযোনি (nature spirits) এবং এমন কি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণের নিকট হইতেও সাহায্য পাইয়া থাকেন। কিন্তু ইহা খুবই বিরল। প্রধানতঃ আমরা যাঁহাদের নিকট হইতে অদৃশ্য সাহায্য পাই, তাঁহারা আর কেহই নহেন, মানব,—প্রায় আমাদের ন্যায়ই মানব। ইহাঁদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। "মৃত" মানবগণ (যাঁহাদিগকে আমরা মৃত বলি, তাঁহারা) এক শ্রেণীর অদৃশ্য সহায়। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, "মৃত" মানবগণ আমাদিগকে ছাড়িয়া দূরে চলিয়া যান না, আমাদের নিকটে, অতি সন্নিকটেই, অবস্থান করেন এবং আমাদের স্থূলদেহ দেখিতে না পাইলেও, কাম-দেহ (astral body) সর্ব্বদা দেখিতে পান ও আমাদিগের মনোভাব বুঝিতে পারেন। অনেক সময়, ইহাঁরা আমাদিগকে বিপন্ন দেখিলে সাহায্য করিতে চেষ্টা করেন এবং সময়ে সময়ে সফলও হন। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, তাঁহাদের শক্তি সীমাবদ্ধ এবং তাঁহারা ক্রমাগত উচ্চতর বা সূক্ষ্মতর স্তরে উঠিতে থাকেন ; সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও অনেক সময় সাহায্য করিতে সক্ষম হন না। যাঁহাদের সাহায্য করিবার শক্তি আছে, যাঁহারা উন্নত, তাঁহারা আবার ভুবর্লোকে অধিককাল থাকেন না, সত্বর স্বর্গে চলিয়া যান। এ সকল প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও, আমরা অনেক সময় ইহাঁদের সাহায্য পাই। কোন সময়ে আমাদের ভয় ও সংশয় দূর করিয়া, কোন সময়ে একটা জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া, কোন সময় আমাদের নিদ্রাবস্থায় একটি হৃত বা অপহৃত বস্তুর সন্ধান বলিয়া দিয়া,—এইরূপে নানা প্রকারে ইহাঁরা সাহায্য করেন। আমরা জানিতেও পারি না, কোথা হইতে সাহায্য আসিল। এইরূপ সাহায্যের অনেকগুলি বিবরণ, পাঠক শ্রীযুক্ত লেড্‌বিটারের "The other side of death" নামক পুস্তকে দেখিতে পাইবেন।

অতএব, "মৃত" মানবগণই এক শ্রেণীর অদৃশ্য সহায়। আর এক শ্রেণীর কাহারা ? কতকগুলি "জীবিত" (অর্থাৎ স্থূলদেহবিশিষ্ট) মানব। পৃথিবীতে কতকগুলি মানব আছেন, (এরূপ মানব সকলদেশে সকল জাতি ও ধর্ম্মের মধ্যে আছেন) যাঁহারা প্রায়ই পূর্ব্বোক্ত Adepts বা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণের শিষ্য বা শিষ্যানুশিষ্য। ইহাঁরা জিতেন্দ্রিয়, সত্যপরায়ণ, দয়ালু, দৃঢ়ব্রত ও পরহিতব্রত। যাঁহাদের নীচ বৃত্তিগুলি (কাম-ক্রোধ-লোভাদি) সম্যক্ বিজিত হয় নাই, যাঁহারা ধন মান যশঃ প্রভৃতি পার্থিব সম্পদকে এখনও

অসার তুচ্ছ বলিয়া জ্ঞান করিতে পারেন নাই, যাঁহারা এক অনাদি অনন্ত সৎ পদার্থে (যাহাতে সব জাত, স্থিত ও লীন হয়) বিশ্বাসবান নহেন, যাঁহারা সকল মানবকে ভ্রাতৃবৎ জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের প্রতি এখনও অসূয়া-শূন্য হইতে পারেন নাই,—তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষদিগের শিষ্য হইতে পারেন না। সে যাহাহউক, এই শিষ্যগণ মহাপুরুষদিগের নিকট হইতে (সাক্ষাৎভাবে বা পরম্পরাক্রমে) উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হন এবং অচিরে দিব্যদৃষ্টি এবং সূক্ষ্মদেহে ভুবঃ স্বঃ আদি লোকে ভ্রমণ ও কার্য্য করিবার শক্তি লাভ করেন। তখন মহাপুরুষগণ কৃপা করিয়া ইহাঁদের উপর জীব-সেবার কিঞ্চিৎ ভার অর্পণ করেন। এই ভার-প্রাপ্ত, সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন, মানবহিতে জীবনোৎসর্গকারী শিষ্যবৃন্দই আমাদের প্রধান অদৃশ্য সহায়। ইহাঁদিগকে অদৃশ্য-সেবক-সম্প্রদায় (band of invisible helpers) বলা যাইতে পারে। ইহাঁরা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে পৃথিবীস্থ সকল মানবেরই সেবা করেন। বস্তুতঃ ইহাঁদের নিকট জাতিভেদ নাই; সকল মানবই ইহাদের ভাই,—কেহ বড় ভাই, কেহ ছোট ভাই। এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে কোন বিশেষ জাতি বা বিশেষ ধর্ম্মের প্রয়োজন হয় না; কেবল গুরুভক্তি, ভগবানে বিশ্বাস এবং সমগ্র মানব-জাতির প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেম ও উপচিকীর্ষা থাকিলেই যথেষ্ট হয়। ইহাঁদের গুরুগণ (পূর্ব্বোক্ত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ) যেরূপ জাগতিক ও বিশ্বজনীন কল্যাণসাধনে সক্ষম ও অনুক্ষণ রত, ইহারা এখনও সেরূপ করিতে সক্ষম হন নাই, অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে (ভূলোকে ভুবর্লোকে ও স্বর্লোকে) মানবের হিত সাধন করেন। ইহাঁদের শক্তি থাকিলেও, স্বেচ্ছামত যত্র তত্র সেই শক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন না, সর্ব্বদা গুরুনির্দ্দিষ্ট কতকগুলি নিয়ম মানিয়া ইহাঁদিগকে চলিতে হয়। প্রধান নিয়মগুলি এই:—১ম, স্বার্থসিদ্ধির জন্য কদাপি কোনও শক্তি প্রয়োগ করিবে না। ২য়, অপরের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য কদাপি অলৌকিক কিছু দেখাইবে না। ৩য়, অবিশ্বাসীর বিশ্বাস-উৎপাদনের জন্য কদাপি পরীক্ষা দিবে না। ৪র্থ, শক্তিদ্বারা অন্যের গোপনীয় বিষয় কদাপি জানিবে না। কেবল পরহিতের জন্য, জীবের মঙ্গলের জন্য, শক্তি ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু ইহাতেও তাঁহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নাই। গুরু যে উপকার গুলি করিতে বলিবেন, তাহাই করিতে পারিবেন, তদ্ভিন্ন কিছু করিতে হইলে গুরুর অনুমতি না লইয়া করিতে পারিবেন না। কারণ, কিসে জীবের প্রকৃত মঙ্গল বা অমঙ্গল হয়, তাহা সর্ব্বদর্শী গুরুই বুঝেন।

এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—"ইহাঁরা মানবের কিরূপ উপকার করেন?" অদৃশ্য সেবক-সম্প্রদায়ের অগ্রণী এবং মানব-হিতে-সমর্পিত-মনোবুদ্ধি দয়ালু লেড্‌বিটার, তাঁহার "Invisible Helpers" নামক পুস্তকে ইহার সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন। উক্ত পুস্তকে তিনি বহু প্রকৃত ঘটনা (facts) সবিস্তারে বিবৃত করিয়াছেন। ইহাদের অধিকাংশ স্থলে, সম্ভবতঃ, তিনি নিজেই অদৃশ্য সহায় ছিলেন। সুতরাং কৌতূহলী পাঠকবর্গকে

আমরা উক্ত পুস্তকখানি পাঠ করিতে সবিশেষ অনুরোধ করি। * তাঁহাদের পাঠ-শ্রম সার্থক হইবে। আমরা এ সম্বন্ধে মোটামুটি দু'একটি কথা বলিব। ইহাঁরা নানারূপে মানবের হিতসাধন করেন। পীড়িত ও শোকার্ত্ত ব্যক্তিগণকে সান্ত্বনা ও শান্তিদান, বিবদমান ব্যক্তিগণের মনোমিলন ও বন্ধুত্ব স্থাপন, উপযুক্ত সময়ে সতর্ক করিয়া দিয়া ভাবী বিপদ আপদ হইতে রক্ষা, অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য বিপদের সময় বন্ধুরূপে আশা, সাহস ও বলদান, ভীষণ জলপ্লাবন, অগ্নিকাণ্ড, ট্রেণ-সংঘর্ষ, জাহাজডুবি প্রভৃতি বিপদের সময় যাঁহাদের প্রাক্তন কর্ম্মফলে এরূপ মৃত্যু নাই, তাঁহাদের রক্ষা এবং যাঁহাদের মৃত্যু অনিবার্য্য, মৃত্যুর পর ভুবর্লোকে তাঁহাদিগকে আশা ও সাহস দান, এইরূপ অসংখ্য প্রকারে ইহাঁরা মানবের উপকার করেন। ইহাঁরা সাধারণতঃ নিদ্রাকালে (অর্থাৎ যখন ইহাঁদের স্থূলদেহ নিদ্রিত থাকে) সূক্ষ্মদেহে গুরুর নিকট গমন করেন এবং তাঁহার আদেশানুসারে সাহায্য করিতে বহির্গত হন। কেহ হয়ত আদেশ পাইলেন, "অষ্ট্রেলিয়ার অমুক নগরে একটি অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে, তথায় গিয়া অমুক অমুক ব্যক্তিকে রক্ষা কর", অথবা "আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের মধ্যস্থলে একখানি জাহাজ ডুবিতেছে, তথায় গিয়া এইরূপ সাহায্য কর" ইত্যাদি। আদেশ পাইবামাত্র তাঁহারা বিদ্যুৎগতিতে তথায় উপস্থিত হন এবং নিরূপিত কার্য্য করেন। তাঁহাদের কোন যানের বা দিঙ্‌নির্ণয়-যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। সূক্ষ্মদেহে সাহায্য করা যতক্ষণ সম্ভব হয়, ততক্ষণ তাঁহারা স্থূলদেহ গ্রহণ করেন না। কিন্তু অসম্ভব হইলে অগত্যা সূক্ষ্মদেহকে স্থূলে পরিণত করেন, অর্থাৎ materialised হন। এরূপ করিবার শক্তি তাঁহাদের আছে।—উক্ত পুস্তকে অনেক দৃষ্টান্ত পাইবেন।

ইহা শুনিয়া অনেকের হয়ত ঐরূপ হইবার বাসনা হইবে, সেবক-সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে পারিলে অনেকে হয়ত আপনাকে ভাগ্যবান মনে করিবেন। বাস্তবিকই, ইহা পরম সৌভাগ্য ;—নিঃস্বার্থভাবে পরম পবিত্র জীব-সেবারূপ ভগবৎকার্য্যে দেহমন সমর্পণ করিতে পারা আমাদের একটি উচ্চ অধিকার (privilege), সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা এই অধিকার পাইতে যত ইচ্ছুক, মহাপুরুষগণ ও সেবক-সম্প্রদায় এই অধিকার দিতে তদপেক্ষা সহস্রগুণ ইচ্ছুক। প্রকৃতই, তাঁহারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র সেবাভিলাষী ব্যক্তি খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন এবং যাঁহাকেই একটু উন্নত ও ইচ্ছুক দেখিতেছেন, তাঁহাকেই অজ্ঞাতসারে শিক্ষা (training) দিয়া উপযুক্ত করিয়া লইতেছেন। এ রহস্য অনেকেই অবগত নহেন। সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানব মাত্রই নিদ্রাকালে স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া কামদেহে ভুবর্লোকে বিচরণ করেন। কিন্তু যাহারা এখনও খুব অনুন্নত (undeveloped) (যেমন অসভ্য সাঁওতাল, কোল, ভীল, প্রভৃতি), তাহাদের

* শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু উহার একখানি বঙ্গানুবাদও প্রকাশ করিয়াছেন।

কামদেহ স্থূলদেহের অতি নিকটেই থাকে, অধিক দূর যাইতে পারেনা। একটু দূরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়া দেখা গিয়াছে, যে তাহারা অতিশয় ভয় পায় এবং তৎক্ষণাৎ জাগরিত হইয়া উঠে। সুতরাং ইহারা এখনও সাহায্য করিবার আদৌ উপযুক্ত হয় নাই। সভ্য মানবের কামদেহ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, ইহারা ভুবর্লোকে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারে বটে, কিন্তু প্রায়ই নিজের চিন্তাতে নিজে এরূপ নিমগ্ন হইয়া থাকে যে, ভুবর্লোকের কোথায় কি আছে বা ঘটিতেছে, তাহা আদৌ লক্ষ্য করে না। তাঁহাদের স্ব স্ব চিন্তার আবরণ, একটা ঘন কুজ্ঝটিকার ন্যায়, তাঁহাদের কাম-দেহকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, বাহিরের বস্তু দেখিতে দেয় না। অবশ্য ইঁহাদের কাম-দেহ পরিপুষ্ট এবং ভুবর্লোকে কার্য্য করিবার কতকটা উপযুক্ত হইয়াছে। কেবল স্বকীয় চিন্তারূপ এই আবরণটি ভাঙ্গিতে পারিলেই, স্বার্থচিন্তাময় চিত্তকে বহির্মুখী করিলেই, তাঁহারা ভুবর্লোক দেখিতে পাইবেন। কিরূপে এই আবরণটি ছিন্ন করা যায়? সাধারণতঃ চারি প্রকারে ইহা ঘটিতে পারে। প্রথম, সুদূর ভবিষ্যতে যখন কাম-দেহটি খুব পরিপুষ্ট হইবে, তখন (অণ্ডের মধ্যে শাবক পরিপুষ্ট হইলে যেমন খোলাটি ভাঙ্গিয়া যায়, সেইরূপ) ঐ আবরণটি আপনা আপনিই ছিন্ন হইয়া যাইবে। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। দ্বিতীয়, মানব প্রতি রাত্রে স্বয়ং চেষ্টা করিয়া ইহা অনেক পরিমাণে দূর করিতে পারেন। প্রত্যহ নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে যদি তিনি দৃঢ় সংকল্প করেন, আজ অমুক স্থানে গিয়া অমুক সাহায্য করিব, অথবা অমুক বস্তুটী নিশ্চয়ই দেখিব, তাহা হইলে তিনি ক্রমশঃ ভুবর্লোকে জাগরিত হন। এরূপ করাতে দোষ নাই; তবে সাহস, হৃদয়ের বল এবং ধর্ম্মভাব থাকা চাই, নচেৎ বিপদ ঘটিতে পারে। তৃতীয়, কোনও তান্ত্রিক বা আভিচারিক ক্রিয়া দ্বারা হঠাৎ সূক্ষ্মদৃষ্টি এরূপ খুলিয়া যাইতে পারে যে, মানব দিবারাত্র সূক্ষ্মজগৎ দেখিতে থাকেন। ইহা বড়ই ভয়ানক ক্লেশকর অবস্থা। লর্ড লিটন (Lord Lytton) তাঁহার "জানোনি" (Zanoni) নামক উপন্যাসে এইরূপ একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। চতুর্থ, দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষগণ যে সকল মানবকে সম্পূর্ণ উপযুক্ত মনে করেন, তাঁহাদিগকে শিক্ষাধীনে রাখিয়া ভুবর্লোকে কর্ম্মক্ষম করিয়া তুলেন। কি কি গুণ (qualifications) থাকিলে মহাপুরুষগণের কৃপা ও সাহায্য লাভ করা যায়, তাহাও পূর্ব্বোক্ত পুস্তকে (Invisible Helpersএ) সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। নিঃস্বার্থ পরোপচিকীর্ষা, মনের বল ও সাহস, গুরুর প্রতি অকাট্য বিশ্বাস এবং পবিত্রতাই প্রধান। এরূপ মানব পাইলেই সেবক-সম্প্রদায়ভুক্ত কোনও মহাত্মা গুরুর অনুমতি লইয়া প্রতিরাত্রিতে শিক্ষা training) দিতে থাকেন। উক্ত ব্যক্তিগণ অনেক সময় জানিতেই পারেন না যে, অলক্ষ্যে তাঁহারা শিক্ষিত (trained) হইতেছেন। পরে যখন তাঁহারা কর্ম্মক্ষম হন, তাঁহাদের সূক্ষ্মদৃষ্টি খোলে, তখন তাঁহাদের গুরুদর্শন হয়, তাঁহারা অদৃশ্য সেবক-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হন।

এই সেবক-সম্প্রদায় গুরূপদেশে নিঃস্বার্থ জীবসেবা রূপ পরম কঠোর সাধনা করিতে

অচিরে এরূপ অসাধারণ ও অমানুষিক উন্নতি লাভ করেন যে, তাহা সাধারণ মানবের কল্পনাতীত। এই উন্নতির চারিটি সোপান আছে। প্রথম সোপানে উঠিলে সাধক পরিব্রাজক হন, দ্বিতীয় সোপানে কুটীচক, তৃতীয় সোপানে হংস এবং চতুর্থ সোপানে পরমহংসের অবস্থা প্রাপ্ত হন। এই চারিটি অবস্থা অতিক্রম করিয়া পঞ্চম সোপানে উঠিলে তিনি জীবন্মুক্ত পুরুষ (Adept) হন।* এই সেবক-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিবার দ্বার সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে ছিল এবং এখনও আছে। ইহা প্রাচীন ইজিপ্টে ছিল, গ্রীসে ছিল, ভারতবর্ষে আছে। ইহা হিন্দুর মধ্যে ছিল, বৌদ্ধদিগের মধ্যে ছিল, খৃষ্টান-দিগের মধ্যে ছিল; এবং এখনও গুপ্তভাবে আছে। আধুনিক যুগে, পরাবিদ্যা সমিতিই (Theosophical Society) এই সেবক-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিবার সর্ব্বজন-পরিচিত ও সুলভ দ্বার।

সে যাহা হউক, এখন প্রশ্ন এই যে, এই অদৃশ্য সেবক-সম্প্রদায় কেবল কি "জীবিত" (স্থূলদেহ বিশিষ্ট) মানবেরই সাহায্য করেন? "মৃত" মানবদিগের সাহায্য করেন না? করেন বৈ কি। কিরূপে? পর পরিচ্ছেদে দেখিব।

নবম পরিচ্ছেদ।

"মৃত" ব্যক্তির উপকার।

কিরূপে "মৃত" ব্যক্তিদিগকে সাহায্য করা হয়, তাহা জানিবার পূর্ব্বে অগ্রে আমাদের বুঝা উচিত যে, মৃত ব্যক্তির প্রকৃত কল্যাণ কিসে হয় এবং তাঁহার অভাবই বা কি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পৃথিবী একটি বিদ্যালয়-স্বরূপ, একটি কর্ম্মক্ষেত্র এবং স্বর্গই বিশ্রাম-স্থান। প্রতি জন্মে মানব পৃথিবীতে আসিয়া কিছু কিছু শিখিতেছেন,—জ্ঞানে, প্রেমে, ও শক্তিতে কিছু কিছু উন্নতিলাভ করিতেছেন। কিন্তু অবিশ্রান্ত কর্ম্মকরণ অসম্ভব; এইজন্যই ভগবান্ মৃত্যুর পর একটি দীর্ঘ বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সে যাহা হউক, এইরূপে উন্নতি করিতে করিতে মানব যখন মনুষ্যত্বের চরম উন্নতি লাভ করিবেন, তখন তিনি জীবন্মুক্ত হইবেন, তখন আর তাঁহাকে সংসারে গতায়াত করিতে হইবে না। অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে, যাহাতে পরলোকে তাঁহার বিশ্রামের কোন ব্যাঘাত না হয়, যাহাতে তিনি সত্বর ভুবর্লোক অতিক্রম করিয়া স্বর্গে গমন করিতে পারেন, তাহা করাই তাঁহার পক্ষে প্রকৃত কল্যাণ-কর। অপর পক্ষে তাঁহাকে পৃথিবীর দিকে আকর্ষণ করিলে, পৃথিবীর দিকে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিলে, তাঁহার ক্রমোন্নতির ব্যাঘাত হয়, তাঁহার বিষম অনিষ্ট করা হয়। কিন্তু হায়! অজ্ঞতা বশতঃ তাঁহার পৃথিবীস্থ আত্মীয়স্বজন প্রায়ই এই বিষম অনিষ্ট করিয়া

* এ সম্বন্ধে বিশেষ জানিবার ইচ্ছা হইলে পাঠক Mrs Besant প্রণীত The Path of Desciple&ship এবং In the outer Court পাঠ করিবেন।

থাকেন। তাঁহারা মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করিয়া, তাঁহাকে নিয়ত পৃথিবীর দিকে আকর্ষণ করেন। তাঁহাদের প্রত্যেক দীর্ঘনিশ্বাস, প্রত্যেক অশ্রুজল, প্রত্যেক হাহাকার মৃতের অন্তরে শেল বিদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবার নিষ্ফল বাসনা জাগাইয়া দেয়। সম্প্রতি মৃতব্যক্তির অনিষ্ট করিবার, মৃত ব্যক্তিকে যাতনা দিবার, একটি নূতন উপায় সৃষ্ট হইয়াছে। ইহা প্রেততত্ত্ববিদ্‌দিগের বৈঠক (Spiritualistic Seance)। ইহাঁরা অনেক সময় মৃতব্যক্তিদিগকে পৃথিবীতে টানিয়া আনিয়া অনর্থক ক্লেশ দেন ও তাঁহাদের ক্রমোন্নতির পথে বাধা উৎপাদন করেন। কিন্তু ইহাও স্বীকার করি, মধ্যে মধ্যে ইহাঁরা মৃত ব্যক্তির অনেক উপকারও সাধন করেন। যাঁহাদের হঠাৎ মৃত্যু হয়, তাঁহারা অনেক সময়ে শেষ কথা বলিয়া যাইতে পারেন না, বাঞ্ছনীয় বন্দোবস্তগুলি করিয়া যাইতে পারেন না ; সুতরাং ভুবর্লোকে গিয়া একটা দারুণ উদ্বেগ ও অশান্তি ভোগ করিতে থাকেন। কখনও কখনও এই অশান্তি এরূপ প্রবল হয় যে, তাঁহারা কিছুতেই উপরে উঠিতে পারেন না, পৃথিবীতে আসিয়া শেষ কথাগুলি বলিয়া যাইতে ইচ্ছা করেন। এরূপ অবস্থায় প্রেততত্ত্ববিদের মিডিয়ম্ (medium) দ্বারা তাঁহাদের বিশেষ উপকার সাধিত হয় ; তাঁহারা শেষ কথা বলিয়া গিয়া নিশ্চিন্ত মনে উচ্চ স্তরে উঠিতে পারেন।

অদৃশ্য সেবকগণ মৃত ব্যক্তিকে নানাপ্রকারে সাহায্য করেন। প্রথম, ভুবর্লোক মৃতব্যক্তির নিকট একটি সম্পূর্ণ নূতন স্থান। এখানে আসিয়া তিনি অনেক বিষয় বুঝিতে পারেন না, সমস্তই যেন প্রহেলিকাময় বোধ হয়। সেবকগণ এই সব বুঝাইয়া দেন। দ্বিতীয়, অনেকে পৃথিবী হইতে একটা কুসংস্কার লইয়া আইসেন—রৌরব, কুম্ভীপাক, hell প্রভৃতিতে সত্বর অশেষ যাতনা পাইতে হইবে, এইরূপ ভ্রমমূলক ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ভয়ে ও উদ্বেগে ছট্‌ফট্ করেন। সেবকগণ ইহাঁদিগকে প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া দিয়া দারুণ অশান্তি হইতে মুক্ত করেন। তৃতীয়, অনেকে এখানে আসিয়া আপনাদিগকে এই প্রথম চিনিতে পারেন, তাঁহাদের মনোবৃত্তি কিরূপ জঘন্য ও নিকৃষ্ট, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন ; সুতরাং অনুতাপে ও শোকে দগ্ধ হইতে থাকেন। সেবকগণ ইহাঁদিগকে বলেন, "ভাই ! হতাশ হইও না, মানবমাত্রেই এককালে না এককালে জ্ঞান ও পবিত্রতায় সমুন্নত হইয়া ভগবানের নিকট যাইবেই যাইবে। অতএব, যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য দুঃখ করিয়া লাভ কি ? ভবিষ্যতে আর সেরূপ হইতে না পারে, এস ভাই, তজ্জন্য বদ্ধপরিকর হই।" চতুর্থ, অনেকে এখানে আসিয়া পৃথিবীর চিন্তায় বড়ই কাতর হন। কেহ হয়ত প্রিয়তম পুত্র, স্ত্রী বা মাতাপিতার জন্য, কেহ বা প্রিয়তম উদ্যান, গৃহ, বন্ধুবান্ধব বা নাচ-তামাসার জন্য, এবং কেহবা তাঁহাদের শেষ বন্দোবস্তগুলি করিয়া আসিতে পারেন নাই, বা শেষ কথা বলিয়া আসেন নাই, তজ্জন্য ব্যাকুলতা বোধ করিতে থাকেন। সেবকগণ ইহাঁদিগকে ক্রমোন্নতির নিয়মগুলি বুঝাইয়া দিয়া বলেন, "এখন বুঝিলে তো ভাই ? ভগবান যাহাই করেন, সবই মঙ্গলের জন্য। পৃথিবীর আমন্দের জন্য কাতর ? তদপেক্ষা

সহস্রগুণ আনন্দ স্বর্গে পাইবে। আত্মীয়স্বজনের জন্য কাতর? যাঁহার জিনিষ, তিনিই তাঁহাদের ব্যবস্থা করিবেন। অতএব, তুমি নিশ্চিন্তমনে তোমার কর্ত্তব্য করিয়া চল।" কখনও কখনও সেবকগণ মৃতের শেষ কথাগুলি আত্মীয়স্বজনকে বলিয়া যান, অথবা মৃতের ইচ্ছানুরূপ বন্দোবস্ত (সম্পত্তি-বিভাগাদি) করিতে আদেশ করেন। এই প্রত্যাদেশ গুলি আত্মীয়েরা সাধারণতঃ স্বপ্নাবস্থাতেই প্রাপ্ত হন। এইরূপে এবং অন্যান্য বহুপ্রকারে সেবকসম্প্রদায় মৃতব্যক্তির উপকার সাধন করেন।

অনেকে ভাবেন, আমরা নিদ্রায় যে সময়টা অতিবাহিত করি, তাহা অপব্যয়িত হয়, বৃথাই যায়। কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে। প্রথমতঃ দেহকে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দেওয়া প্রয়োজন, মস্তিষ্ক অবিশ্রান্ত কর্ম্ম করিতে পারে না। তাহার পর সূক্ষ্মদেহে মানব অপরের যতটা উপকার করিতে পারে, অনেক সময় স্থূলদেহেও ততটা পারে না। অবশ্য এরূপ উপকার করিতে হইলে কতকগুলি শক্তি থাকা প্রয়োজন।* প্রথমতঃ একটা খুব বলবতী ইচ্ছা বা জিদ্ থাকা চাই। দ্বিতীয়তঃ সম্পূর্ণ আত্মসংযম থাকা প্রয়োজন। যিনি অল্প কিছু দেখিলেই ভয় পান অথবা সামান্য কারণে বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হন, তিনি একার্য্যের উপযুক্ত নহেন; কারণ, ভুবর্লোকে অনেক অদৃষ্টপূর্ব্ব ও ভীতিপ্রদ বস্তু আছে। তৃতীয়তঃ, চিত্তের প্রশান্ততা ও প্রফুল্লতার একান্ত প্রয়োজন। এখানে যে সকল কার্য্য করিতে হইবে তাহাদের অধিকাংশই অপরকে সান্ত্বনা, শান্তি ও আনন্দদান। যিনি নিজেই বিষণ্ন অপ্রফুল্ল ও অশান্ত, তিনি অপরকে কিরূপে প্রফুল্ল ও শান্ত করিবেন? চতুর্থতঃ, তাঁহার ভুবর্লোক সম্বন্ধে কতকটা জ্ঞান থাকা চাই। দিব্যদর্শিগণের পুস্তকাদি পাঠ করিয়া বা তাঁহাদের মুখে শুনিয়া পরলোকসম্বন্ধে যতটা জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা তাঁহাকে করিতে হইবে। পঞ্চমতঃ, তাঁহাকে সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য ও নিরহঙ্কার হইতে হইবে। তাঁহাকে নিজের কথা না ভাবিয়া কেবল সেবার কথাই ভাবিতে হইবে। "অপরে উত্তম কার্য্যটির ভার পাইল, আর আমাকে এই হীন ও নিকৃষ্ট কার্য্যটি করিতে হইবে"—ইহা ভাবিয়া যিনি ঈর্ষ্যাবান্ হন, অথবা "আমি সর্ব্বোচ্চ কার্য্যের ভার পাইয়াছি, সুতরাং আমি সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত," ইহা চিন্তা করিয়া যিনি আত্মগরিমায় স্ফীত হন,—তিনি এখনও সেবার উপযুক্ত হন নাই। ষষ্ঠতঃ, মানব-জাতির প্রতি গভীর ও প্রগাঢ় প্রেম এবং ভগবানের প্রতি ভক্তি থাকা প্রয়োজন। পরম করুণাময় পরমেশ্বর কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বক্ষে ধারণ করিয়া অনন্তকাল জীবকে পালন ও পোষণ করিতেছেন। অতএব আমারও ক্ষুদ্র দেহ ও ক্ষুদ্র শক্তি তাঁহারই কার্য্যে, তাঁহারই চরণে উৎসর্গ করিয়া জীবন ধন্য করিব,—এইরূপ একটা আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই।

ইহা শুনিয়া হয়তঃ অনেক পাঠক হতাশ হইয়া পড়িবেন; তাঁহারা হয়তঃ ভাবিবেন,

* এ গুলি Invisible Helpers নামক পুস্তকের শেষভাগে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

এতগুলি গুণ ও শক্তি কি সাধারণ মানুষের হওয়া সম্ভব ? আমরা তাঁহাদিগকে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, প্রত্যেক মানবই চেষ্টা করিলে পূর্ব্বোক্ত শক্তিগুলি লাভ করিয়া, অদৃশ্য ভাবে সেবা করিতে পারেন। অবশ্য শক্তিগুলি লাভ করিতে সময় লাগিবে ; কিন্তু সে সময়টা অপব্যয়িত হইবে না। অতএব, ভাই! হতাশ হইবেন না। মানবসেবাই, জীবসেবাই, ভগবানের প্রকৃষ্ট সেবা। যদি এই পবিত্র, মহান্, উচ্চ জীবসেবা দ্বারা জীবনকে সার্থক করিবার বাঞ্ছা হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে, আসুন, অবিলম্বে পূর্ব্বোক্ত শক্তিগুলি লাভ করিতে বদ্ধপরিকর হউন। কিন্তু যতদিন সমস্ত শক্তিগুলি অর্জ্জিত না হয়, যতদিন জ্ঞানপূর্ব্বক সূক্ষ্মলোকে ভ্রমণ ও সাহায্য করিতে সক্ষম না হন, ততদিন কি সেবা কার্য্য আদৌ চলিবেনা ? চলিবে বৈ কি। প্রতিরাত্রিতে শয়ন করিবার পূর্ব্বে দৃঢ়ভাবে সংকল্প করুন যে, অদ্য সূক্ষ্মদেহে অমুক ব্যক্তিকে এইরূপ সান্ত্বনা, শান্তি বা উপদেশ দিয়া সাহায্য করিব। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, এইরূপ করিয়া যাউন। ইহার ফল কি হইতেছে, হয়তঃ কিছুই জানিতে পারিবেন না। প্রথম প্রথম হয়ত প্রাতঃকালে উঠিলে কোন কথাই স্মরণ থাকিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া ভাবিবেন না যে, আপনার সংকল্প নিষ্ফল হইতেছে। এমন একদিন আসিবেই আসিবে, যে দিনে, যে শুভ মুহূর্ত্তে আপনি জানিতে পারিবেন, আপনার শুভ সংকল্পগুলি ব্যর্থ হয় নাই। সেই দিন হইতে আপনার জীবনে একটি নূতন যুগের সূত্রপাত হইবে, সেই দিন হইতে আপনার দিবারাত্রি থাকিবে না, রাত্রিকালে চৈতন্যের বিরাম বা বিচ্ছেদ (break of consciousness) ঘটিবে না, একই চৈতন্য তৈলধারার ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহিত হইবে।

ভ্রাতৃগণ! শুভ সংকল্পের, প্রেমের, সেবার, একটা অচিন্ত্য শক্তি আছে। সেই শক্তি অমোঘ, অব্যর্থ। কিছুতেই উহা ব্যর্থ হয় না, কেহই ব্যর্থ করিতে পারে না। প্রকৃতিতে শূন্য থাকিতে পারে না (Nature abhors vacuum)। আপনি যেমন দিবেন, তেমনই পাইবেন ; আপনি যেরূপ সাহায্য করিবেন, সেইরূপ সাহায্য পাইবেন। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে একই প্রাণ অনুস্যূত রহিয়াছে। ক্ষুদ্র কীট হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত একই ব্রহ্মের বিকাশ, স্তরে স্তরে সজ্জিত। উচ্চতর জীবগণ নিম্নশ্রেণীর সাহায্য করেন,—ইহাই নিয়ম। আমরা উপর হইতে অনুক্ষণ, ক্রমাগত, সাহায্য পাইতেছি। অতএব নিম্নস্তরে এই সাহায্য না পাঠাইলে সেবা-চক্র (cycle of service) চলিবে কেন ? এই জন্যই ভগবান্ বলিতেছেন,—

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ। অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥—গীতা, ৩।১৬।

ব্রহ্মা যে কর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছেন, যে চক্রদ্বারা সৃষ্টি রক্ষিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি পৃথিবীতে সেই চক্রের অনুবর্ত্তন না করেন (অর্থাৎ জীবসেবা হইতে বিরত হয়েন), সেই পাপাত্মা নিজের ইন্দ্রিয়-সুখ ও ভোগ-বিলাস লইয়াই থাকে এবং তাহার জীবনই বৃথা।

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী।

এষণাত্রয়।

ভগবান্ আত্রেয় পুনর্বসু বলিতেছেন, বৎস অগ্নিবেশ! মন ও বুদ্ধি বিকৃত না হইলে এবং শারীর ও মানস বলের অপচয় ঘটিলে পুরুষ ঐহিক ও পারলৌকিক সুখের জন্য সতত অভিলাষী হইয়া থাকে। সুখৈষী মানবগণ কোন্ পথ অবলম্বন করিলে পূর্ণকাম হইতে পারে, তাহাই তোমাকে বলিব। মানুষ চায় ইহজীবনে নীরোগতা দীর্ঘ আয়ু ও ধন এবং মৃত্যুর পর স্বর্গ বা মোক্ষ। আমরা পুরুষের এই চেষ্টাকে তিনভাগে বিভক্ত করিতে পারি। যথা, প্রাণৈষণা, ধনৈষণা ও পরলোকৈষণা। এষণা অর্থে সাধন।

এষণাত্রয়ের মধ্যে প্রাণৈষণার প্রতি প্রথম যত্নবান্ হওয়া উচিত। প্রাণই সকলের মূলাধার। প্রাণ গেলে, ধন ও পরলোক বৃথা হয়। প্রাণ থাকিলে পুরুষ ভোগ ও মোক্ষের জন্য চেষ্টা করিতে পারে। সুতরাং যাহাতে সবল দেহে দীর্ঘ আয়ু লাভ করা যায়, তাহার প্রতি প্রথমতঃ দৃষ্টিপাত করা উচিত।

বৎস! এই প্রাণ রক্ষা কিরূপে হয়, তাহাও বলিতেছি। আয়ুর্ব্বেদে স্বস্থের স্বাস্থ্যরক্ষা-কল্পে নানা উপদেশ ব্যাখ্যাত হইয়াছে; এই সকল উপদেশ অনুসারে চলিলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয় না এবং দীর্ঘ আয়ু লাভ করা যায়। স্বাস্থ্য সুরক্ষিত হইলে রোগ হইতে পারে না। আয়ুর্ব্বেদের আর একটী প্রয়োজন—রোগীর রোগ-প্রশমন। আয়ুর্ব্বেদে এই রোগ-প্রশমনের জন্য যে উপদেশ আছে, তদনুসারে চলিলে রোগ প্রশমিত হয় এবং পরে স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়ম রক্ষা করিলে শরীর নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে। মানবের এই প্রাণ রক্ষার্থ যে সাধনা, তাহারই নাম প্রাণৈষণা।

দ্বিতীয়তঃ ধনৈষণার কথা বলিতেছি। বৎস। প্রাণের পর ধনের বিষয়ই চিন্তা করা এবং তদর্থ চেষ্টা করা উচিত। ধন দ্বারা প্রাণ রক্ষার উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইয়া থাকে। "উপকরণ-হীন ব্যক্তি দীর্ঘায়ুঃ হয়"—ইহা অপেক্ষা অসৎ কল্পনা কি হইতে পারে?

এস্থলে সংক্ষেপে অর্থ-সংগ্রহের কতকগুলি উপায় বলিতেছি। কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য, রাজসেবা প্রভৃতি অর্থ-সংগ্রহের প্রকৃষ্ট উপায়। এতদ্ব্যতীত সাধুজন-সেবিত অন্যান্য পন্থাও আছে, যাহা অবলম্বন করিলে অনিন্দিত অর্থ উপার্জ্জন করা যাইতে পারে। এই সাধুসেবিত পথে থাকিয়া ধনোপার্জ্জন করিলে, তদ্দ্বারা জীবিকা সুচারু-রূপে নির্ব্বাহিত হইবে এবং আয়ুষ্কাল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। ধনী ব্যক্তি শিষ্টানুশাসিত বিবিধ পুণ্যজনক কার্য্য করিয়া ইহলোকে যশস্বী হইয়া থাকেন এবং পরলোকেও উৎকৃষ্ট স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

---

* চরক-সংহিতা সূত্রস্থান ১১শ ত্রিস্রৈষণীয় অধ্যায় অবলম্বনে লিখিত। এই অধ্যায়ের ব্যাখ্যাতা ভগবান পুনর্বসু এবং শ্রোতা তৎশিষ্য অগ্নিবেশ।—লেখক।

তৃতীয়তঃ পরলোকৈষণা। বৎস অগ্নিবেশ! এই পরলোক বিষয়ে নানারূপ সন্দেহ আছে। প্রথম সন্দেহ পুনর্জ্জন্ম লইয়া। ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করার পর জীব পুনরায় উৎপন্ন হয় কি না? তুমি ভাবিতেছ, এরূপ সন্দেহ হইবার কারণ কি? কারণ আছে। এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা কেবল প্রত্যক্ষপরায়ণ। তাঁহারা বলেন যে, ঘট, পট, শব্দ, শীত, উষ্ণ, কটু, মধুর প্রভৃতি আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিতে পারি। সুতরাং ইহাদের সত্তা সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। কিন্তু এইরূপে ইন্দ্রিয় দ্বারা সাক্ষাৎভাবে পুনর্জ্জন্মের অনুভূতি হয় না। পুনর্জ্জন্ম তোমরাও পরোক্ষই বলিয়া থাক। এই পরোক্ষ বিষয়ে আমরা নিঃসংশয় হইতে পারি না। সুতরাং 'পুনর্জ্জন্ম নাই' ইহাই আমাদের মত।

বৎস! এই গেল এক শ্রেণীর অভিমত। আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা আগম প্রমাণ দ্বারাই পুনর্জ্জন্মের স্বীকার করেন। মত বিরোধ এখানেই শেষ হয় নাই। জীবের জন্মসম্বন্ধে কতকগুলি বিভিন্ন মতের কথাও শুনা যায়।

এক শ্রেণীর মত—মাতাপিতাই জন্মের কারণ।
দ্বিতীয় ,, মত—স্বভাবই জন্মের কারণ।
তৃতীয় ,, মত—পরই জন্মের কারণ।
চতুর্থ ,, মত—যদৃচ্ছাই জন্মের কারণ।*

বৎস অগ্নিবেশ! এই সকল কারণে সন্দেহ হয় যে, পুনর্জ্জন্ম আছে, অথবা নাই।

আমার একটী কথা এই যে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির নাস্তিক্য-বুদ্ধি এবং সন্দেহ পরিত্যাগ করা উচিত; কেন? তাহা পূর্ব্বোক্ত মতের খণ্ডনস্থলেই বলিতেছি।

তুমি প্রত্যক্ষবাদী, বলিতেছ যে, আমি ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা উপলব্ধি করিতে পারি, তাহাই স্বীকার করি মাত্র। পুনর্জ্জন্ম ইন্দ্রিয়-বেদ্য নয়; সুতরাং ইহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। আচ্ছা বুঝিলাম! কিন্তু প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত দ্রব্য অতি অল্পই আছে। পক্ষান্তরে

* এই ব্যাখ্যায় চক্রপাণি বলিতেছেন:—প্রথম পক্ষবাদীর মত—মাতাপিতাই আত্মান্তর-নিরপেক্ষ হইয়া সন্তানোৎপাদন করে। সুতরাং, মাতাপিতাই জন্মের কারণ হইলে, কোনও আত্মা যে পূর্ব্ব শরীর ত্যাগ করিয়া শরীরান্তর গ্রহণ করে, এই মত সত্য নহে। আত্মা নাই, সুতরাং পরলোকও নাই। দ্বিতীয় স্বভাব-বাদীর মত, এই যে পরিদৃশ্যমান ভৌতিক জগৎ, ইহার ভূতগণের এমন একটী ধর্ম্ম আছে যে, সংযোগ-বিশেষে মিলিত হইয়া সচেতন জীব সৃষ্টি করিয়া থাকে। এ পক্ষেও আত্মা নাই; সুতরাং পরলোকও নাই। তৃতীয়তঃ পরপক্ষবাদীর মত—পর অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যাদিগুণযুক্ত আত্মবিশেষের প্রভাবে ভূতগণ সচেতন হইয়া থাকে। মৃত্যুর পর জন্মিবে, বা পরলোকে গমন করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিবে, এমন আত্মা নাই। সুতরাং পরলোক বা পুনর্জ্জন্ম নাই। চতুর্থতঃ যদৃচ্ছাবাদীর মত—যদৃচ্ছা অর্থাৎ কারণের অননুরূপ কার্য্যোৎপত্তি। সকলেই বলেন যে, কারণানুরূপ কার্য্য হইয়া থাকে। কিন্তু ইঁহারা বলেন, এমন নিয়ম আমরা মানিতে পারি না। যেখানে কারণের অপ্রতিরূপ কার্য্য হয়, সেইটীই যদৃচ্ছার কার্য্য। এই যদৃচ্ছা-বশতঃ অচেতন ভূত সচেতন হয়। সুতরাং পরলোক বা পুনর্জ্জন্ম নাই।

প্রত্যক্ষের অবিষয়ীভূত এমন অনেক বস্তু আছে, যাহা আমরা আগম, অনুমান ও যুক্তি দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারি। এ কথা যাউক, দেখ, অন্ধ কি কাহাকেও পথ দেখাইতে পারে? শাস্ত্রেও একটা কথা আছে,—"স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়তি", যে নিজেই অসিদ্ধ, সে কি করিয়া অপরকে সাধন করিবে।

তুমি যে ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের কথা বলিলে, এই ইন্দ্রিয়চয় নিজে নিজকে বুঝিতে পারে না। চক্ষু চক্ষুকে দেখিতে পায় কি? আরও কথা আছে, অনেক সময় বস্তু থাকিলেও তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। দেখ রূপ অতি নিকটবর্ত্তী হইলে বা অত্যন্ত দূরবর্ত্তী হইলে প্রত্যক্ষ হয় না। আরও দেখ, বস্তু কোন আবরণ দ্বারা আবৃত, অথবা ইন্দ্রিয়সমূহ দুর্ব্বল এবং অন্যমনস্ক হইলেও বস্তুর উপলব্ধি হয় না। আরও দেখ, কোন বস্তুর প্রভাবে অন্য বস্তু অভিভূত হইলেও প্রত্যক্ষ হয় না। ঢাক বাজিলে পুরোহিত তন্ত্রধারের কথা শুনিতে পায় না। কত আর বলিব? বস্তু অতি সূক্ষ্ম হইলে, অথবা কোন বস্তু তৎসম দ্রব্যের সহিত মিলিত হইলে তাহার প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধি হয় না। সুতরাং তুমি যে বলিতেছ, প্রত্যক্ষই আছে অন্য কিছু নাই, ইহা অপরীক্ষিত।

বৎস! এইত গেল প্রথম পক্ষ। দ্বিতীয় পক্ষ বলিতেছে, মাতাপিতাই জন্মের কারণ; এ কথা ঠিক নহে। দেখ, মাতা বা পিতার আত্মা যদি অপত্যে সংক্রমিত হয়, তবে দুই প্রকারে হইতে পারে,—প্রথমতঃ সর্ব্বাবয়বে এবং দ্বিতীয়তঃ অংশক্রমে। এই দুই মতই ভ্রান্ত প্রথমতঃ যদি সর্ব্বাবয়বে আত্মা অপত্যে সঞ্চারিত হইত, তবে মাতা বা পিতার মৃত্যু অবশ্য ঘটিত। সুতরাং প্রথম পক্ষ অপরীক্ষিত। দ্বিতীয় পক্ষও তদ্রূপ। সূক্ষ্ম আত্মার কোন অংশ হইতে পারে না। দেখ, এই পক্ষ যদি বলে, মাতাপিতার আত্মা অপত্যে সংক্রমিত হয় না, বুদ্ধি বা মনই সংক্রমিত হয়, ইহাও পূর্ব্ববৎই হইল। এইরূপ সংক্রমনেও মাতা বা পিতাকে নির্ব্বোধ বা অমনস্ক হইতে হয়; তাহা ত ঘটে না। বুদ্ধি ও মনের অংশও হয় না; সুতরাং এ পক্ষও অপরীক্ষিত।

দেখ ইঁহাদের মতে চলিলে আর একটী বাধাও আছে। মাতা পিতা জন্মের কারণ হইলে যে সকল চেতনের মাতা পিতা প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধ হয় না, তাহাদের চেতনা শক্তি কোথা হইতে আইসে? চেতন চারি প্রকার—জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও সংস্বেদজ। ইহার মধ্যে উদ্ভিজ্জ ও সংস্বেদজের মাতা পিতা ত নাই; সুতরাং তাহাদের অচেতন হওয়া উচিত।

তৃতীয় পক্ষ বলেন,—বস্তুগত স্বভাবই চৈতন্যের কারণ। বৎস! এ কথাও অপরীক্ষিত। দেখ, এই ষড়ধাতুক জগৎ ও পুরুষের প্রত্যেক ধাতুর একটা আত্মগত লক্ষণ আছে। যেমন পৃথিবীর কাঠিন্যাদি, জলের দ্রবত্বাদি, তেজের উষ্ণত্ব প্রভৃতি, বায়ুর তির্য্যগ্ গতি প্রভৃতি, আকাশের অপ্রতিঘাতাদি এবং আত্মার ভজনাদি স্বাভাবিক লক্ষণ। আত্মরহিত পঞ্চভূতের চৈতন্য কোনটীরই নাই।

পঞ্চভূতের একটীরও যে গুণ নাই, সেই গুণ মিলিত ভূতে কি করিয়া আসিতে পারে? কেবল লাল সুতা দিয়া কাপড় বুনিলে ময়ূরকণ্ঠী শাড়ী হয় না। সুতরাং আত্মা ভিন্ন পুরুষে চৈতন্যের উদ্ভব হয় না। অতএব এ পক্ষও অপরীক্ষিত। পঞ্চভূতের সহিত আত্মার সংযোগে জন্ম, এবং বিয়োগে মরণের কারণও পুরুষের জন্মান্তর-কৃত কর্ম্ম।

চতুর্থ পক্ষের মত পরিষ্কার নহে। তাঁহারা যদি এই পর অর্থে আত্মা বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের কোনই আপত্তি থাকে না। আমরা পর-নির্ম্মিতি স্বীকার করিয়া লইতে পারি; কিন্তু পর অর্থে আত্মা ভিন্ন অন্য বস্তু বলিয়া স্বীকার করিলে, আমরা তাহা স্বীকার করিতে পারি না। প্রথমতঃ, আত্মা ব্যতীত জীবের চৈতন্য হইতে পারে না; সচেতন স্রষ্টা অর্থে আত্মারও স্রষ্টা বুঝাইতেছে। আত্মা নিত্য, নিত্য বস্তুর সৃষ্টিই নাই; সুতরাং আত্মা ব্যতীত জীবের অন্য স্রষ্টা কল্পনা হইতে পারে না।

পঞ্চম পক্ষ যদৃচ্ছামতাবলম্বী। ইঁহারা বস্তুনির্ণয়ে কোন প্রমাণের আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। ইঁহারা বলেন, পরীক্ষা, পরীক্ষ্য, কর্ত্তা, কারণ, দেবতা, ঋষি, কর্ম্ম, কর্ম্মফল, প্রভৃতি কিছুই নাই। অপিচ আত্মাও নাই। ইঁহারা নাস্তিক্য-মতাবলম্বী। ইঁহাদিগের নাস্তিক-গ্রন্থ মহাপাতকের প্রতিমূর্ত্তি।

হে বৎস! এই যদৃচ্ছামতাবলম্বীর নাস্তিক্য বুদ্ধিতে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ অবলম্বন করিয়া বস্তু নির্ণয় করিবে।

বৎস! তোমাকে শিষ্টানুমত বস্তু-নির্ণয়-প্রণালী বলিতেছি। আমরা বলিয়াছি, পরলোক আছে এবং পুনর্জ্জন্ম আছে। আমাদের এই সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইলে যে সকল প্রমাণ অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি।

প্রমেয় দ্বিবিধ, সৎ ও অসৎ। সৎ—ভাব, অসৎ—অভাব। সৎ—নিত্য আত্মা, এবং অসৎ—পাঞ্চভৌতিক জগৎ। সৎ অর্থাৎ বিধি-বিষয় প্রমাণগম্য ভাববস্তু, এবং অসৎ নিষেধ-বিষয় প্রমাণগম্য অভাব-বস্তু। এই সদসৎ বস্তুর পরীক্ষা অর্থাৎ স্বরূপ-নির্ণয়ের পন্থার চারি প্রকার প্রমাণ, যথা—আপ্তোপদেশ, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও যুক্তি।

বৎস! আপ্তোপদেশকে প্রথম প্রমাণ স্বীকার করা হইল। শিশুর পক্ষে তাহার মাতা পিতা প্রভৃতি আপ্তস্থানীয়; তাঁহারা যে উপদেশ প্রদান করেন, যে রকম করিতে, চলিতে, খাইতে বলেন, শিশু—তেমনই করে। কিন্তু আত্মবস্তু, পরলোক প্রভৃতি নির্ণয়ে আপ্তের স্থান অত্যন্ত উচ্চে। যাঁহারা তপশ্চরণ ও জ্ঞানবলে রজস্তমোগুণমুক্ত, যাঁহাদের ত্রৈকালিক জ্ঞান অব্যাহত, তাঁহারাই আপ্ত, শিষ্ট ও বিবুদ্ধ। ইঁহাদের বাক্য সংশয়শূন্য এবং সত্য। এই সকল রজস্তমোগুণরহিত ব্যক্তি কেন মিথ্যা বলিবেন? এই আপ্তোপদেশই প্রথম প্রমাণ।

আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন এবং অর্থ অর্থাৎ জ্ঞেয় বস্তুর সন্নিকর্ষবশতঃ তৎকালে যে অনুভূতি হয়, তাহার নাম প্রত্যক্ষ।

অনুমান তিন প্রকার। এই প্রকার-ভেদ কাল-অনুসারে হইয়া থাকে ; যথা—অতীত বিষয়ের অনুমান, বর্ত্তমান বিষয়ের অনুমান এবং ভবিষ্যৎ বিষয়ের অনুমান। কোন ব্যাপারের কতকাংশ প্রত্যক্ষ হইলে তাহার সহায়তায় যে কৌশলে অজ্ঞেয় অংশের অনুভূতি হইতে পারে, তাহার নাম অনুমান।

একটী উদাহরণ দিতেছি। প্রথমতঃ বীজ সংগ্রহ করা হইল, ইহা উপযুক্ত ভূমিতে উত্তমরূপে বপন করা হইল, বীজ হইতে যথা সময়ে একটী লতা জন্মিল, লতাটি যথাকালে পুষ্পিত এবং ফলিত হইল। এখন কেহ যদি একটি বীজই কাহারও হাতে দেখিয়া বলে, "হাঁ, ইহাতে বেশ সীম হইবে," তাহা হইলে একথা ভুল বলা যাইতে পারে না। এইরূপ অহরহঃ ঘটিতেছে। এই যে বীজ সংগ্রহ হইতে ফলোৎপত্তি পর্য্যন্ত একটী ব্যাপার, ইহার বীজমাত্র প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। এই প্রত্যক্ষীভূত বস্তুর সাহায্যেই আমাদের ভবিষ্যৎ ফলের অনুভূতি হইতেছে। এই অনুভূতির নামই অনুমান।

উপরে যে উদাহরণ প্রদত্ত হইল, তাহা প্রথম শ্রেণীর অনুমানের অন্তর্গত।

দ্বিতীয় শ্রেণীর উদাহরণ দিতেছি। তিনখানা পাকাটী লও ; দেখ, এই বস্তুতে যে অগ্নি আছে, তাহার অনুভূতি হইতেছে না। দেখ, তুমি দুইখানা পাকাটী রাখ, আর উহার হাতে একখানা দাও। উহার পাকাটী খানা তোমার দুইখানার ভিতরে গুঁজিয়া দিয়া আঁটিয়া ধর এবং উহাকে বল, হস্তদ্বারা পাকাটী মন্থন করুক। ঐ দেখ, পাকাটীগুলি ক্রমে উষ্ণ হইয়া পাংশুটে রং ধারণ করিতেছে। এখনও অগ্নির সত্বা অনুভূত হইতেছে না। আরও একটু জোরে মন্থন কর। একি ! এ যে ধূম নির্গত হইতেছে। এমন ধূম ত ভিতরে আগুণ না থাকিলে হয় না। শীতকালে মুখ হইতে ও পুকুর হইতে যে ধূম নির্গত হয়, এ যে তাহার মত নয়। এ যেন পাকশালার ধূমের মত। বৎস ! এই ধূম দেখিয়া আমরা বলিতে পারি, পাকাটীর ভিতর গূঢ় ভাবে অগ্নি আছে। তোমরা আর একটু মন্থন কর, ঐ দেখ, গূঢ় অগ্নি প্রকাশ পাইল। আগুণ জলিয়া উঠিল। এস্থলে ধূম প্রত্যক্ষ দ্বারাই গূঢ় অগ্নির অনুভূতি হইল। ইহাও অনুমান।

বৎস ! গর্ভ দর্শনে মৈথুনের অনুমান তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

বৎস ! এবার তোমাকে যুক্তির কথা বলিব। এই যুক্তি কখনও উপমান প্রমাণের অন্তর্গত, কখনও বা অনুমানের অন্তর্গত হইতে পারে। এজন্য অনেক দার্শনিক ইহার পৃথক সত্বা স্বীকার করেন না। আমি আয়ুর্ব্বেদ উপদেশ করিতেছি। আয়ুর্ব্বেদের অনেক স্থল এই যুক্তির সাহায্যে বুঝিয়া লইতে হইবে। এজন্য আমি ইহা পৃথকভাবে বলিতেছি। অপিচ লোক ব্যবহারে অনেক সময় এই যুক্তির আবশ্যকতা বুঝিবে এবং আমি যে উপক্রমে এই অধ্যায় আরম্ভ করিয়াছি, তাহাতে যুক্তির আবশ্যকতা আছে বলিয়াই আমি ইহা স্বীকার করিলাম। অন্যত্র আমি যুক্তিকে গ্রহণ করিব না।

মানবের যে বুদ্ধি বহু উপপত্তিসহকারে অর্থাৎ নানারূপ দার্ষ্টান্তিক (দৃষ্টান্তযুক্ত)

বিতর্কের পর আবশ্যক বস্তুর উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়, তাহার নাম যুক্তি। এই যুক্তি কালত্রয়েই প্রযুক্ত হইতে পারে এবং ইহা দ্বারা ত্রিবর্গ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত এষণাত্রয় সাধিত হইয়া থাকে।

ইহার উদাহরণ দিতেছি। শারীর-স্থানে গর্ভোৎপত্তি ব্যাকরণে বলা হইবে, ষড়্ধাতু অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত এবং আত্মার সংযোগে গর্ভের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই ব্যাপার বুঝিতে হইলে আমাদের বাহিরের ব্যাপারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। অন্যথা একথা যে সত্য, তাহা কিরূপে বুঝিব? বাহিরে দেখ, কৃষক ঋতু অনুসারে ভূমি কর্ষণ করিয়া শস্যোৎপাদক ভূমি প্রস্তুত করে, তাহাতে বীজ রোপণ করিয়া জল সেচন করে; এই সংযোগ হইতে পাঞ্চভৌতিক শস্য উৎপন্ন হয়। আরও দেখ, মন্থন-রজ্জু, মন্থনের উপযোগী কাষ্ঠ এবং মন্থন-ক্রিয়ার যোগ হইলে, তাহা হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়। আমরা এই সকল বাহিরের উদাহরণ হইতে উদাহৃত গর্ভাধান ব্যাপারটী সহজে বুঝিতে পারি।

চিকিৎসার চারিটী পাদ যথা—চিকিৎসক, ঔষধ, পরিচারক ও রোগী। এই চারিটী পাদ যদি যথোক্ত গুণযুক্ত হয়, তাহা হইলেও যুক্তিযুক্ত না হইলে ফলপ্রদ হয় না। যুক্তিযুক্ত হইলেই ব্যাধিনাশক হইয়া থাকে।

বৎস! এই যে তোমাকে চতুর্ব্বিধ পরীক্ষার কথা বলিলাম ইহাদ্বারা সকল পরীক্ষ্য বস্তুই পরীক্ষিত হইতে পারে। অপিচ এই সকল পরীক্ষা দ্বারা পুনর্জ্জন্ম যে আছে, তাহাই প্রমাণিত হয়।

পূর্ব্বে যে তোমাকে আগমের কথা বলিয়াছি; এই আপ্তাগম অর্থে চারি বেদ এবং বেদের অনুকূল লোকানুগ্রহার্থ আপ্তপ্রণীত এবং শিষ্টানুমোদিত শাস্ত্রসমূহ। এই সকল শাস্ত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে, দান, তপ, যজ্ঞ, সত্য, অহিংসা ও ব্রহ্মচর্য্য, অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স-কর। আপ্তগণ এমন উপদেশ করেন নাই যে, যাহাদের রজস্তমোদোষ প্রশমিত হয় নাই, তাহাদের পুনর্জ্জন্ম হইবে না। বৎস! পূর্ব্ব পূর্ব্বতর আপ্ত মহর্ষিগণ দিব্য চক্ষুতে দেখিয়াছিলেন যে, পুনর্জ্জন্ম আছে। তাই তাঁহারা পুনর্জ্জন্মের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন।

কতকগুলি প্রত্যক্ষ প্রমাণেও বুঝা যায় যে, পুনর্জ্জন্ম আছে। মাতাপিতার বিসদৃশ সন্তান হয়; এক মাতাপিতার সন্তানদিগের বর্ণ, স্বর, আকৃতি, মন, বুদ্ধি ও ভাগ্যের পার্থক্য হয়। কেহ নীচকুলে, কেহ উচ্চকুলে জন্মে। কেহ দাসত্ব করে, কেহ বা ঐশ্বর্য্য ভোগ করে। কাহার আয়ুষ্কাল সুখে কাটিয়া যায়, কেহ বা চিরকাল দুঃখ ভোগ করে। সকলের আয়ুঃ সমান হয় না। এই সংসারেই অনেকে অনেক কাজ করিয়া তাহার ফল পায় না। অশিক্ষিত শিশুগণ জাতমাত্র রোদন, স্তনপানাদি করে কি করিয়া? কেহ জাতিস্মর হয়। দেখ, যদি এক নিয়মেই সৃষ্টি হইত, তবে এ পার্থক্য হইত কি? ইহা হইতেই অনুমিত হয় যে, পূর্ব্ব জন্মের আচরিত অবিনাশী কর্ম্ম, যাহা দৈব সংজ্ঞায় সংজ্ঞক, তাহাই এই

সকল পার্থক্যের কারণ। ইহা হইতে লোকের কর্ম্ম দ্বারা ভাবি জন্মের ভোগ ও আয়ুঃ মনে করা যায়। যেমন ফল হইতে বীজের এবং বীজ হইতে ফলের অনুমান করা যায়, তেমন পুনর্জ্জন্মের বিষয় অনুমিত হইয়া থাকে।

যুক্তিদ্বারাও ইহা বুঝিতে পারা যায়। দেখ, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুরুষ ষড়্ধাতুক অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত এবং আত্মার সংযোগে পুরুষের সৃষ্টি। এই সৃষ্টির মূলে এবং সৃষ্ট বস্তুর চৈতন্য সম্পাদনেও আত্মাই কর্ত্তা। এই আত্মাই ভোক্তা, দ্রষ্টা ইত্যাদি।

ইহলোকে মনুষ্যগণ কৃত-কর্ম্মের ফলই ভোগ করিয়া থাকে। অকৃত-কর্ম্মের ফল কেহ ভোগ করে না। ইহারই মত আত্মা পরলোক ও স্বকৃত কর্ম্মের ফলই ভোগ করিয়া থাকে। অন্যথা কেহ দাস ও কেহ রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিত না।

আরও দেখ, কর্ত্তা ও করণের সংযোগে কার্য্য হয়; বীজ না হইলে অঙ্কুরোৎপত্তি ঘটে না; এক জাতীয় বীজ হইতে অন্য জাতীয় বৃক্ষ বা ফল উৎপন্ন হয় না। ইহা হইতেও বুঝা যায়, লোকে যে যেমন কাজ করে, ফলও তদনুরূপ পাইয়া থাকে।

এই সকল যুক্তিবলে আমরা বলিতে পারি, পুনর্জ্জন্ম আছে।

বৎস! পুনর্জ্জন্ম ও পরলোক যখন স্থিরীকৃত হইল, তখন যাহাতে উৎকৃষ্ট কুলে জন্মগ্রহণ হইতে পারে, অথবা উৎকৃষ্ট লোক লাভ হয় তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়াই পরলোকৈষণা।

শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী।

পথিক।

দিবা অবসান প্রায়, রবি ডুবে যায়,
আঁধার আসিছে নামি ধরণীর গায়;
পথহারা পান্থ আমি ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর,
শ্রমে অবসন্ন তনু, ভ্রমি বহুদূর।
আশ্রয়ের তরে কত করি অন্বেষণ,
কিন্তু হায় কেবা দিবে?—আমারি মতন
পথ-শ্রান্ত দেখি সবে অবসন্ন প্রায়,
আশ্রয়ের অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায়,
পিপাসায় শুষ্ক-কণ্ঠ, ক্ষুধায় কাতর,
অস্থি-চর্ম্ম-সার মরি! ক্ষীণ কলেবর।
অদূরে পথের ধারে ঘুমে অচেতন,
এড়ায়ে যন্ত্রণা যত আহা! কত জন।
—সকলেই পথহারা আমারি সমান,
—বুঝিতে না পারি কিছু;—স্তব্ধ হতজ্ঞান!

শ্রীশৈলেশ্বর সেন।

দাদা ঠাকুর।

(গুরু ও অবতার)

হারাণ সন্ধ্যার পর দাদা ঠাকুরের বাড়ী আসিয়া বসিয়াছে, সঙ্গে আরও কয়েক জন বৃদ্ধ আছেন। দাদা ঠাকুর এখনও সন্ধ্যা করিতেছেন ; কাজেই তাঁহাদের সন্দেহ মীমাংসা হইতেছে না। দাদা ঠাকুর সমস্ত গ্রামের দাদা ঠাকুর, সম্পদে বিপদে সকলেরই সহায়, ধর্ম্ম উপদেশে সমস্ত গ্রামখানি যেন একটী ধর্ম্ম-মন্দির করিয়া তুলিয়াছেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অথবা বৈষয়িক যে কোন বিষয়ে কাহারও কিছু সন্দেহ হইলে, অমনি আসিয়া দাদাঠাকুরের নিকট হইতে বুঝিয়া লইয়া যাইত। দাদা ঠাকুরও সরল গ্রাম্য ভাষায় ইতর ভদ্র সকলকে সমানভাবে বুঝাইয়া দিতেন। অদ্য হারাণ প্রভৃতি কেহ কেহ সন্দেহ মীমাংসার্থ আসিয়া তাঁহার অনুপস্থিতি হেতু নিজেরাই গল্প করিতেছে।

হারাণ বলিল,—দাদাঠাকুর সে দিন সদ্‌গুরুর কথা বলিয়াছিলেন, গুরু রাখ্‌তে হবে না এ কথা ত বলেন নাই ; কিন্তু নরেশ বলে কি ? কতকগুলা ইংরাজী প'ড়ে একেবারে নাস্তিক হ'য়ে প'ড়েছে। বাপ এত টাকা খরচ ক'রে পড়ালে, তা'র ফল হ'ল কি না— বাপ পিতা'মর নাম ডুবা'তে ব'সেছে। গুরু দেবতা মান্‌তে চায় না।

আর একজন বৃদ্ধ বলিল,—"আমি শুনেছি আগে যেমন কামাখ্যায় গেলে সেখানকার মেয়েমানুষে পুরুষকে ভেড়া ক'রে রাখ্‌ত, এখন কল্‌কাতা সহরে তা'ই হ'য়েছে ; এখানকার জড়বাদীগণ বাবুগুলাকে ভুলাবার জন্য চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়, হাতে পেলেই তা'দের নিজের বশে এনে 'ঠাকুর দেবতা নাই, গুরুর দরকার নাই,' এই রকম বুঝা'য়ে যা'তে আর ঠাকুর দেবতা মেনে মানুষের মত হতে না পারে, সেই ফন্দি ক'রে ছেড়ে দেয়। বাবুরাও সেই সমস্ত বুঝে এক সৃষ্টিছাড়া মানুষ হ'য়ে যান।"

অপর বৃদ্ধ বলিল,—"যা' ব'লেছিস্ ভাই ! ঐ যে সে দিন চাটুয্যেদের হরেন্ বাড়ী এল, ছেলে বেলা হ'তে আমাদের বাড়ী আস্‌ত, আমোদ আহ্লাদ ক'র্‌তো, কাজেই একবার দেখা ক'র্‌তে এল। ভদ্রতাটুকু বেশ জানে, তবে ঐ দোষের মধ্যে যা' ব'ল্লে, মানুষের মত হ'তে গেলে যে ঠাকুর দেবতা চাই, তা' মান্‌তে চায় না। সে দিন আমাদের বাড়ী সংকীর্ত্তন হ'চ্ছিল, সকলে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ" ব'লে গান কচ্ছিল, তা' শুনে বল্লে কিনা,— কৃষ্ণচৈতন্য ব'লে তোমরা অত চেঁচাও কেন ? সংকীর্ত্তন ক'র্‌তে হয় 'হরি হরি', বল, চৈতন্য আবার দেবতা নাকি ? দাদাঠাকুরকে বল্লাম, তিনি ব'ল্লেন আর এক দিন আসিস্। আজ এটাও জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব।"

এমন সময় দাদাঠাকুর আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে উঠিয়া প্রণাম করিল। দাদাঠাকুর কুশল-প্রশ্নান্তে আসিবার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলেন।

হারাণ বলিল,—আজ ঘোষেদের নরেশ বাড়ী এসেছে, সে সকালে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলছিল কি—"তোমরা 'গুরুদেব ভরসা' বল, গুরু আবার কি? ওর দরকার কিছুই নাই।" শুনে মনটা বড় খারাপ হ'য়ে গেল। তা'ই আপনার কাছে জিজ্ঞাসা ক'রতে এলাম।

দাদাঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন,—যে যা' বলে, তা'ই শুনে মন খারাপ কর কেন? যা' বলে, শুধু শুনে যাবে। তোমার নিজের কাজ নিজের মনেই ক'রবে। যা'ই হ'ক, ও বিষয়ে বুঝ্যে দিচ্ছি শুন। প্রথমে জীব কি, না বল্‌লে গুরুর দরকার বুঝ্‌বে না, কাজেই আগে জীব কি বলি শুন।—

তোমরা শুনেছ, "যত্র জীব তত্র শিব", অর্থাৎ যত প্রাণী আছে, সমস্তই ভগবানের 'স্বরূপ'। নরেশ যে নিরাকার ব্রহ্মের কথা ব'লেছে, সেটা ঠিক। যখন কিছুই থাকে না, তখন তিনি নিরাকার; তখন এই জগৎ-জ্ঞানও থাকে না। কাজেই যতক্ষণ আমি, আমার নিজের ভাবনা মুছে ফেলে, সমস্ত মিশিয়ে দিতে না পারব, ততক্ষণ, একজন ঈশ্বর আছেন, তাঁ'র কাজ ক'রবার ক্ষমতা আছে, তিনি নিরাকার নির্ব্বিকার ভাবে চুপ ক'রে ব'সে ন'ন, এটা মান্‌তে হ'বে। একে সগুণ-ঈশ্বর বলে। তিনি সমস্ত জগৎময় আছেন। এই ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই অর্থাৎ এই সগুণ অবস্থায় জগৎ সৃষ্টি, তাঁ'র ইচ্ছায় তিনি অখণ্ড থাকিয়া বহুখণ্ডে বিভক্ত হ'লেন। মনে ক'র, এই ঘরময় একটি আগুনের কুণ্ড আছে, তাহার উপর একটা লোহার জাল ফেলে দিলাম, তখন সেই জালের প্রত্যেক ছিদ্র দিয়ে এক একটা আলাহিদা শিখা উঠ্‌বে। মূল সেই এক আগুণ কুণ্ড বটে, কিন্তু ছিদ্রস্থ প্রত্যেক শিখা, মনে করে, আমি একটা আলাহিদা প্রাণী। তা'র কারণ, ঐ জালটা ভগবানের ইচ্ছা-শক্তি প্রকৃতি। তাঁ'র মায়ার গুণে, যেমন গুটী পোকা সুতার উপর সুতা দিয়া নিজের ঘর তৈয়ারী করে, সেই রকম মানুষ তখন নিজের উপর অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন, কাজ কর্‌বার শক্তি, স্থূল ইন্দ্রিয়, এই কয়টা আবরণ দিয়ে ছিদ্রের ঘরগুলি বেশ ক'রে তৈয়ারী ক'রে নিলে। সেই ছিদ্রের মধ্যে সেই ভগবানের অংশ চৈতন্যটুকু বাস ক'রতে লাগ্‌ল।

হারাণ—আচ্ছা, তা' হ'লে ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী পর্য্যন্তও ভগবানের অংশ, আমিও যা' সেও তা'ই?

দাদা—হাঁ তা'ই ত, "যত্র জীব তত্র শিব" এত আগেই ব'লেছি। তবে তা'তে আর তোমাতে এইটুকু প্রভেদ যে, তা'র চাইতে তোমাতে ব্রহ্মের বিকাশ বেশী। তুমি এখন তোমার নিজের বিষয় জেনে, যেখান হ'তে এসেছ, সেখানে ফিরে যেতে পার, ওরা তা' পারে না।

হারাণ—ওরা তবে মুক্তি পা'বে কি ক'রে?

দাদা—সেই দয়ালু ভগবানের খেলায়, তিনি খেলা দেখ্‌বার জন্য নিজে বহুখণ্ড হ'য়ে সকলকে অহং-জ্ঞান দিয়ে খেলা দেখ্‌ছেন। তাঁহারই খেলায় ওরা ক্রমে ক্রমে উপরে উঠ্‌বে। গানে শুনেছ ত—"আশীলক্ষ যোনি ভ্রমণ ক'রে, মানব জনম পেয়েছ রে"।

ক্রমে ক্রমে ঘুরে ঘুরে তবে এই মানুষ হ'তে পেরেছ। আগুনের ক্ষমতা কি জান ত? ধাতু জিনিষকে গলা'য়ে দেয়। ঐ যে জালে ঢাকা আগুন নিজের তেজে তা'র আবরণকে গলা'য়ে পাৎলা করতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে আগুনের তেজ অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তিও বাড়তে লাগল, আকারও পরিবর্ত্তিত হ'তে থাক্‌ল। ক্রমে যখন মানুষের আকারে এল, তখন তা'র তেজ এত বেড়ে গেল যে, সে ইচ্ছা করলে আবরণটাকে নষ্ট করতেও পারে, আবার ময়লা মাটী দিয়ে সেটাকে পুরু ক'রতেও পারে। তা'ই মানুষ সকল জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কীট-পতঙ্গও ভগবানের অংশ, তুমিও ভগবানের অংশ, তোমাতে আর তাহাতে এই প্রভেদ।

হারাণ—আপনি যে ব'ল্লেন—ভগবান্ নিরাকার, নরেশের কথা মিছা নয়, তবে আমরা তাঁ'র আকার গড়ি কেন?

দাদা—নিরাকার কোন্ সময়! যখন জগৎ-জ্ঞান থাকে না, তখন; যতক্ষণ অহং জ্ঞান থাক্‌বে, ততক্ষণ ঈশ্বরকে আমাদের মত আকার-বিশিষ্ট মনে করতে হ'বে। যাঁ'রা সমাধি দ্বারা নিজের অস্তিত্ব ভুলতে পেরেছেন, তাঁ'রাই বলতে পারেন যে, ঈশ্বর নিরাকার নির্ব্বিকার। তোমার আমার তা' বল্‌বার অধিকার নাই। কারণ, আমাদের সুখ-দুঃখ-বোল আনা জ্ঞান আছে।

হারাণ—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য কি ঈশ্বর নন?

দাদা—হাঁ; দয়াল প্রভু আমাদের উদ্ধারের জন্য মধ্যে মধ্যে আসেন।

বৃদ্ধ—সে দিন হরেন্ চাটুর্য্যে বল্‌ছিল, তিনি মানুষের আকারে আস্‌তে পারেন না।

দাদা—তিনি ইচ্ছাময়, ইচ্ছাতে তিনি সব পারেন; তিনি ভক্তবৎসল, ভক্তের জন্য তিনি সব করেন। সে সকল পরে বুঝাচ্ছি।

বৃদ্ধ—জীব বলতে সমস্ত জগদ্ব্যাপী পূর্ণ চৈতন্যের অহংজ্ঞানযুক্ত ক্ষুদ্র চৈতন্য-বিশিষ্ট প্রকৃতি-আবৃত জীবকে বুঝায় ত?

দাদা—হাঁ। আরও একটু বলি শুন'—যখন খুব বৃষ্টি হয়, তখন দেখেছ আকাশ হ'তে পৃথিবী পর্য্যন্ত সমস্ত বৃষ্টিকণায় ছেয়ে থাকে, ছোট বড় সুতার মত নানারকমের জল-কণা থাকে। মেঘগুলা কি তা'ত শুনেছ,—জলের কণা সুতার মত বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। একটু যেই বড় হচ্ছে, আর অমনি সাগরের সঙ্গে মিশ্‌বার জন্য ছুটে আসছে; যারা বেশ বড় হচ্ছে, তারা প'ড়ে যাচ্ছে, যারা নেহাৎ ছোট, তারা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আকাশ হ'তে পৃথিবী পর্য্যন্ত যেন একটা অখণ্ড জলস্রোত দেখাচ্ছে। কিন্তু তার প্রত্যেক কণাটি স্বতন্ত্র। জীবও সেই রকম, সমস্ত জীব ও জগৎ লইয়া ভগবান্; কিন্তু প্রত্যেক জীব এক একটি আলাহিদা অংশ। যেটিতে ব্রহ্মের বিকাশ পূর্ণরূপে হ'ল, সে ভগবানের সঙ্গে মিশে গেল; যে ছোট থাক্‌ল, সে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এই মনুষ্য-আকারে মিশ্‌বার ক্ষমতাটুকু হয়, সেই জন্য মনুষ্য সর্ব্বপ্রধান।

হারাণ—তা হলে আলাহিদা ঈশ্বর আবার কে?

দাদা—নীচের অগ্নিকুণ্ড। বৃষ্টির জল মিশ্‌বার জন্য অনন্ত সাগর যেমন, সেই রকম। আবার অনেকে এই জন্যেই বলেন, যতদিন সকলেই মুক্ত না হবে, ততদিন নিজের মুক্তি নাই। অর্থাৎ যেমন সব এক ছিলাম, খানিকটা থেকে গেলে ত আর সব এক হ'ল না। কাযেই লয় হবে না; তবে এই সুখ দুঃখের হাত হতে রক্ষা পাওয়া যায়,—আমাদের এই বন্ধন মুক্ত হয়।

এখন গুরু কি, তাই শুন। ভগবান্ যেন আগুনের কুণ্ড। জীব যেন সাতস্তর-বিশিষ্ট জাল ঢাকা শিখা। আগুন অর্থাৎ সেই ছিদ্রস্থ চৈতন্য ক্রমশঃ নিজ স্বভাবগুণে আবরণ পাতলা ক'রতে ক'রতে মনুষ্যরূপে পরিণত হ'ল, তখন তার চৈতন্য বিকাশ ভালরকমই হ'য়েছে, চেষ্টা করলে এখন সে মহাচৈতন্যে যুক্ত হতে পারে। সে বুঝেছে যে, সে এখানকার জীব নয়, যেখানকার বস্তু; সেখানে যেতে পারে এটা জেনে সাধনাদ্বারা সেখানে যেতে পারে। জীব যাতে নিজের যায়গায় যেতে না পারে, তা'র জন্য প্রকৃতি তা'কে নানারকমে ভুলা'য়ে রাখ্‌তে চেষ্টা করে, সেই জন্য সে নিজেরটি ভাল বুঝ্‌তে পারে না, কিন্তু বুঝালে বুঝ্‌তে পারে। এই অজ্ঞানতার সময় যিনি 'জগৎ মিথ্যা', এইটী বুঝায়ে দেন, 'মায়ারূপ অজ্ঞান'—অন্ধকারে তুমি প'ড়ে আছ, এইটি জানায়ে দেন, তিনি গুরু; সেইজন্য গুরুর প্রণাম মন্ত্র,—

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

'আমার এই অজ্ঞান দূর করিয়া, যিনি 'জগত মিথ্যা, ভগবান্ সত্য', এই জ্ঞানরূপ শলাকা দ্বারা চক্ষু খুলিয়া দেন, অর্থাৎ সমস্ত বিষয় ভাল রকম বুঝায়ে দেন, তিনি গুরু, তাঁহাকে প্রণাম। তার পর, যখন ভগবানই সত্য, এইটী ধারণা হ'ল, তখন যিনি সেই ভগবান্‌কে কিরূপে দেখা যায়, তাহার উপায় বলিয়া দিয়া, তাঁহাকে দেখাইয়া দেন, তিনি গুরু; সেইজন্য গুরুর অপর প্রণাম মন্ত্র,—

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

তারপর যখন ভগবান্‌কে দেখা গেল, তখন 'সমস্ত জগৎই ভগবান্' বোধ হয়; সেই জন্য অপর প্রণাম মন্ত্র,—

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ। গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

তখন সমস্ত দেবতা, সমস্ত জগৎ এক পূর্ণব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই বোধ হয় না।

হারাণ—গুরু কাহাকে বলে, তা'ত বুঝ্‌লাম; কিন্তু গুরুর দরকার কি এইটাই ত জিজ্ঞাসা ক'রেছি।

দাদা—পূর্ব্বেইত ব'লেছি, প্রকৃতির প্রলোভনে জীব মুগ্ধ, তা'কে জ্ঞান দেয় কে? প্রথম এই জ্ঞান দেওয়ার জন্য গুরুর আবশ্যক। তা'র পর পথ দেখাবার জন্য,তুমি যদি কাশী যেতে চাও, তবে যে লোক কাশী গিয়াছে, তা'কে সঙ্গে ক'রে ল'বে। তা' না হ'লে পশ্চিম দিকে না গিয়ে পূর্ব্ব দিকে গিয়ে বস্‌বে। হয়ত পথের মধ্যে এমন খাদে পড়্‌বে যে, আর উঠ্‌তে

পারবে না। হয়ত এমন বনে ঢুকবে যে, আর বা'র হতে পারবে না। সেইজন্ত একজন পথজানা লোকের দরকার। তিনি এমন লোক হবেন, যেন পথ ভালরকম চিনেন; তা'হলে আর প্রত্যেক স্থানে জিজ্ঞাসা করতে হ'বে না। তিনি এমন লোক হবেন, যেন তোমার কষ্ট হ'লে তোমাকে শক্তি দিয়ে সাহায্য করতে পারেন। তুমি শুধু তাঁ'র উপর নির্ভর ক'রে চলে যাবে, দেখবে তোমার কোনও কষ্ট হ'বে না,—কত শীঘ্র কত সহজে তুমি তোমার যায়গায় পৌঁছেছ, দেখতে পাবে। গুটী পোকার সূতা তোলা কত কষ্ট, জানত। যা'রা না জানে, তা'রা ছিঁড়ে ফেলে, কিছুতেই তুলতে পারে না; কিন্তু যারা জানে, তারা বেশ সহজেই খুলতে পারে। আমাদেরও এই সপ্তকোষ আবরণ যাঁ'রা নিজে খুলেছেন জানেন, তাঁরা উপদেশ দিয়া আমাদেরটাও খুলে দিতে পারেন, নিজে অনর্থক টানাটানি ক'রলে কষ্ট পাওয়া ছাড়া, আর কোন লাভ হবে না।

হারাণ—আপনি ত বল্লেন,—ঈশ্বর নির্গুণ, তখন জগৎ থাকে না। তার পর তাঁর যখন সৃষ্টি ইচ্ছা হ'ল, তখন সেই ইচ্ছাশক্তি-বিশিষ্ট সগুণ ঈশ্বর, জগৎ সৃষ্টি করলেন। তখনও তিনি অনন্ত। তবে তিনি শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্ত প্রভৃতি মানুষ হলেন কি রকমে?

দাদা—দয়াল প্রভু দয়া ক'রে আমাদের উদ্ধারের জন্ত মধ্যে মধ্যে আসেন। তিনি নিজেই ব'লেছেন যখন কুপ্রবৃত্তি বশে ধর্ম্মের স্থানে অধর্ম্মের প্রাধান্ত বাড়ে, তখন তিনি এসে সেটাকে সংশোধন করে দিয়ে যান। যখন মানুষের মনের গতিকে পুরাতন পদ্ধতি অনুসারে সাধনা আর হ'য়ে উঠে না, তখন নূতন ভাবে—তখনকার উপযোগী ক'রে সাধনার শিক্ষা দেওয়ার জন্ত তিনি আসেন। কি রকমে এটা হ'তে পারে, তা'ই শুন। জালে আবৃত শিখাগুলি জীব। যখন অধর্ম্ম স্রোত প্রবল হ'ল, তখন সকলেই অসাধু হয় না; বিশেষতঃ জীবের মঙ্গল জন্ত একদল মহাপুরুষ সকল সময়েই অবস্থান করেন। অধর্ম্মের প্রাবল্যের সময় সেই ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্ত মহাত্মাগণ প্রাণপণ-শক্তিতে ভগবান্‌কে ডাকেন—জীবের ভ্রান্তিবশতঃ জগতের দুর্গতি দেখে ডাকেন,—"ভগবান্! এস! এই সকল অধম জীবকে উদ্ধার কর। এই উৎপীড়নের হাত হ'তে জগৎকে উদ্ধার কর!" তাঁহাদের সেই প্রবল আকর্ষণে, কাতর আহ্বানে—নীচের অগ্নিকুণ্ড হ'তে তেজ পূর্ণবেগে একটী ছিদ্রের মধ্য দিয়া উঠে। সে শুধুই তেজ, তা'র আবরণ নাই; ছিদ্র-মধ্যস্থ বলিয়া সেটী ঠিক মনুষ্যের মতই দেখায়, সেই রকমই কাজকর্ম্ম করেন। তিনি তাঁর সেই তেজে নিকটস্থ অন্ত ছিদ্রগুলির আবরণ পোড়াইয়া দেন; যে তাঁ'র সংস্রবে আসে, তা'রই আবরণ নষ্ট হইয়া যায়, অথবা পাতলা হইয়া যায়। এইরূপে যাঁহারা তাঁহা দ্বারা উপকৃত হয়, তাঁহারা বলেন—"ইনি ভগবান্, আমাদের উদ্ধারের জন্ত আসিয়াছেন।" অন্তে তা' স্বীকার করে না। যাঁহারা তাঁহার সংসর্গে আসিয়া আবরণ দূর করিতে পারিলেন, তাঁহারা তখন অন্তের আবরণ পাতলা করিতে লাগিলেন; এইরূপে সেই তেজকে কেন্দ্র ক'রে একটী ধর্ম্ম-সম্প্রদায় গ'ড়ে উঠে। তা'রা তাঁ'কে অবতার বলে।

শ্রীচৈতন্যদেব এইজন্য অবতার। আধুনিক ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবও এই জন্য তাঁহার সম্প্রদায়ের নিকট ভগবানের অবতার। যাহারা তাঁহাদের সংসর্গে না আসিয়াছে, তাহারা তাঁহাৰারা উপযুক্ত নয় বলিয়া অবতার বলিতে চায় না। যাঁহারা বুঝেন, তাঁহারা তা' স্বীকার করেন। তাঁহারা জানেন, আকর্ষণ শক্তিতে তেজকে অনায়াসে আনা যায়; আর বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ কারণে তাঁ'র আবির্ভাব হয়। এখন বুঝ্‌লে, অবতার কি এবং তাহা সম্ভব কি না ?

হারাণ—আজ্ঞা হাঁ, বুঝ্‌লাম। আমরা সামান্য মানুষ, আমাদের অত অনন্ত অসীমের ধারণা শীঘ্র হ'বে না ব'লে তিনি আমাদের মত হ'য়ে, কি ক'রে সাধনা ক'রে মুক্ত হ'তে হয়, তা'ই দেখায়ে দিতে—তেজে অধর্ম্মরাশি নষ্ট কর্‌তে আসেন। ভগবান্! তোমার এত দয়া!

তবে এখন আসি দাদাঠাকুর, অনেকটা রাত হ'য়েছে। প্রণাম।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

প্রার্থনা।

পরমেশ! এইবার খুল গো দুয়ার।
সংসার-জলধি মাঝে হারায়ে ফেলেছি নিজে,
যে দিকে নিরখি হেরি নিবিড় আঁধার।
কোথা তুমি—কোথা তুমি, হৃদয় যে মরুভূমি,
ভবের মোহন সুখ দুদিনে ফুরায়,
আলেয়ার আলো প্রায়, মরু মরীচিকা প্রায়
সকলি অসার রহে বিশাল ধরায়।

পরমেশ! এইবার খুল গো দুয়ার।
ভব-মোহ-মায়া-ডোরে, আর বাঁধিওনা মোরে,
মিনতি, মিটাও তৃষা তৃষিত আত্মার।
সব আবিলতা রাশি তব পূত স্পর্শে নাশি,
তোমার কিরণে কর উজ্জ্বল জীবন,
স্বাধীন বিহগ প্রায়, কর মুক্ত এ আত্মায়,
অনন্ত আত্মায় কর এ আত্মা মিলন।

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।

হিন্দুর বৈরাগ্যবাদ।

বিখ্যাত বিরাট-রাজ্যে ঐ দেখ অমিত-বিক্রম ধনঞ্জয়ের ভুবন-বিশ্রুত গাণ্ডীব-নিঃসৃত সম্মোহন-শরে বিপুল কৌরববাহিনী সমর-ক্ষেত্রে অসাড়, নিস্পন্দ, ধূল্যবলুণ্ঠিত! বিরাট-কন্যা উত্তরার কৌতূহল-পরিতৃপ্তির জন্য ঐ দেখ যোদ্ধবর্গের মহামূল্য বসন-ভূষণ অপহৃত হইতেছে। তত্রাপি, উঁহারা নিশ্চেষ্ট, সংজ্ঞা-শূন্য! আমরা ভারতবাসী হিন্দু। আমাদিগের আধুনিক অবস্থাও প্রায় ঐরূপই দাঁড়াইয়াছে। এই বিশাল, বিরাট ভারত-রাজ্যে যে দিন কপট বৈরাগ্যের ভীষণ সম্মোহন সায়ক নিক্ষিপ্ত হইল, সেই দিন হইতেই ভারতের কর্ম্মবীরগণ অসাড়, নিস্পন্দ, জড়ভরত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাই আজ ভারত গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। তাই আজ জগতের জাতিদিগের সমক্ষে ভারত ভূম্যবলুণ্ঠিতা।

জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, অহোরাত্র মধ্যে "কুক্ষণ" বলিয়া অতি অমঙ্গলজনক মুহূর্ত্ত সকল আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতেছে। দুর্দ্দৈব-বশতঃ কোন কোন ব্যক্তি বা কোন কোন জাতি বা কোন কোন দেশ ঐ সকল 'কুক্ষণের' আবর্ত্তে পড়িয়া অশেষবিধ নির্য্যাতন, নিষ্পীড়ন ভোগ করিতেছে। আবার কত শত রাজ্য ঐ আবর্ত্তের অতলস্পর্শ ঘূর্ণিপাকে পতিত হইয়া চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। তাহাদের অস্তিত্ব-রেখাটী পর্য্যন্ত প্রপঞ্চভূত জগৎ হইতে মুছিয়া যাইতেছে। পঞ্চবটীবনে "কুক্ষণে" জটা-বল্কলধারী, নবদূর্ব্বাদলশ্যাম, রাজীব-লোচন শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে রক্ষঃকুলরবি-রাবণ-ভগিনী সূর্পনখার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। কুক্ষণে; কেননা, সেই ক্ষণ দোষে অমরাবতীলাঞ্ছিত, সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণা ত্রিভুবনেশ্বরী স্বর্ণলঙ্কা লণ্ডভণ্ড, বিপর্য্যস্ত হইল। ত্রিভুবন-বিজয়ী বীরবৃন্দ প্রচণ্ড সমর-হুতাশনে তৃণবৎ ভস্মীভূত হইয়া গেল। কল্পনার কলনাদিনী মন্দাকিনী প্রেতপুর-পরিখা ভীষণ বৈতরণীতে পরিণত হইল। মধুর আনন্দ-ছবি লঙ্কা ঐ দেখ পিশাচ-সঙ্কুল শ্মশানস্থল হইয়া দাঁড়াইল। কুক্ষণের এমনই অনিষ্টকারিণী শক্তি!

ঐরূপ "কুক্ষণেই" হিন্দুকুল কুলাঙ্গার জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের সঙ্গে কলহ-সূত্রে যবনের সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছিল। পরিণামে, ভারতের সনাতন স্বাধীনতা-গৌরব-দীপ চির-দিনের মত নির্ব্বাপিত হইল। অনুপম-সুন্দরী চিতোর-পঙ্কজিনী পদ্মিনীর দেহলতার অপূর্ব্ব লাবণ্যও "কুক্ষণেই" দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীনের কলুষিত নেত্র-পথে পতিত হইয়াছিল। ফলে, অমরেপ্সিত চিতোর ভয়াবহ শ্মশানে পরিণত হইল।

তাই বলিতেছি, কুক্ষণের আবর্ত্ত অতীব ভীষণ। ঠিক ঐরূপ কুক্ষণেই ঈশোপনিষদের ভাগবতী বীণার এই ঝঙ্কারটীর হিন্দু কদর্থ করিল,—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্॥

অর্থ—জগতে যাহা কিছু প্রপঞ্চভূত চঞ্চল বিষয় আছে, সেই সমুদয়কে পরমেশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হইবে, অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্মময় এরূপ জানিয়া বিষয়-বুদ্ধি ত্যাগ করিতে

হইবে। সেই ত্যাগদ্বারা অর্থাৎ বিষয়-বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া পরমাত্মাকে সম্ভোগ কর; কাহারও ধনে আকাঙ্খা করিও না।

"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা" অর্থাৎ বিষয়-বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া পরমাত্মাকে সম্ভোগ কর। বেশ কথা। কিন্তু যদি পরমাত্মাকে না চাই বা না পাই অথচ বৈরাগ্যের ভাণ করি? ঐরূপ বৈরাগ্যই হিন্দুজাতির আধুনিক সর্ব্বপ্রকার অকল্যাণ ও অধঃপতনের মূলীভূত কারণ। উহাতে তাঁহাদের যত ক্ষতি করিয়াছে, গজনীর সুলতান মামুদও সপ্তদশ বার ভারত লুণ্ঠন করিয়া ততটা ক্ষতি করিতে সক্ষম হয়েন নাই। ঐ অসৎ বৈরাগ্যই মর্ম্মভেদী সম্মোহন শর। এই দুর্জ্জয় শরাঘাতে আজ হিন্দুজাতির শিরায় শিরায় বিষম বৈরাগ্য-বিষ সঞ্চারিত হইতেছে।

আবার, গীতায়ও অর্জ্জুনের ধর্ম্মসংমোহ উপস্থিত হইলে উপরোক্ত প্রকার বৈরাগ্য ব্যাধি সংক্রামিত হইয়াছে দেখিতে পাই। সে ব্যাধির একটী প্রলাপ এই:—

"গুরূন্ অহত্বা হি মহানুভাবান্ শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে। হত্বার্থকামাস্তু গুরূনিহৈব ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধির প্রদিগ্ধান্।"—গীতা ২য়, ৬।

অর্থ—মহানুভব গুরুগণকে বধ না করিয়া ইহলোকে আমি ভিক্ষান্ন ভোজন করিলেও আমার কল্যাণ হইবে। কেবল পরলোকভয়েই বা কেন, ইহাঁদিগকে নিধন করিলেই আত্মীয়গণের রুধিরযুক্ত অর্থকামনারূপ ভোগ্য বিষয় উপভোগ করিতে হইবে।

"শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষমপীহ লোকে"! বলিহারি অর্জ্জুনের শ্রেয়োজ্ঞান! যাহাদের যেমন সাধনা, তাহাদের সিদ্ধিও তদ্রূপ। ভারতে বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ উপনয়ন-কালে ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করেন। সাধনানুরূপ সিদ্ধিও হাতে-হাতেই ফলিতেছে। এতদ্ভিক্ষুবৃত্তি ব্রাহ্মণের আজও ঘুচিল না—কখন যে ঘুচিবে, তাহারও সম্ভাবনা অল্প। যদি বর্ণগুরু, সমাজ-চালক, শাস্ত্রকর্ত্তা ব্রাহ্মণেরই এবম্প্রকার বৃত্তি ও লক্ষ্য, তবে তন্নিম্নতর শ্রেণীর "শ্রেয়োজ্ঞান" আর কত উচ্চ হইতে পারে?

বিষয়াসক্তি ও ধনাকাঙ্খা ত্যাগ করিলে পুত্র-কলত্র লইয়া সংসার-ধর্ম্ম কি প্রকারে হইতে পারে? তাহাদিগকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে প্রতিপালন করিতে হইলেই বিষয়-বিভব, ধনৈশ্বর্য্য একান্ত আবশ্যক। যদি বল, ঐ সকল ঐহিক বস্তু অর্জ্জন কর, কিন্তু তত্তদ্বিষয়ে অনাসক্ত থাকিও। ইহা সাধারণের পক্ষে কদাচ সম্ভবপর হইতে পারে না। অসম্ভব কথা বলিলে রসনা পীড়িত হয় না বটে, কিন্তু তাহার কি কোন অর্থানুভূতি হইয়া থাকে? আমি যদি বলি—তুমি যুগপৎ উত্তর ও দক্ষিণে যাও, তাহা হইলে আমার এতদ্বাক্যটী প্রতিপালনীয় হইতে পারে কি? তদ্রূপ, আসক্তিপরিশূন্য হইয়া কেহ কখনও অর্থার্জ্জন বা বিষয়-সম্পত্তি করিতে পারে না। অতএব, স্বীয় কর্ত্তব্য করিব না বরং ভিক্ষা করিব, ধনাকাঙ্খা ত্যাগ করিব, বিষয়ানুরাগ-পরিশূন্য হইব—মোহগ্রস্ত অর্জ্জুনের এবম্প্রকার ক্লীবত্ব, কোন প্রকারেই আমাদিগের অবলম্বনীয় নহে।

উপরোক্ত জড়ত্বপ্রসবিনী কুশিক্ষায় ভারতের কি ক্ষতিই না হইয়াছে! রাজপুত্র বুদ্ধ স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করিয়া ধনৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া ফকীর হইলেন। তিনি অনন্যসাধারণ প্রতিভা লইয়া জগতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ দীপ্তিশালিনী প্রতিভা যদি রাজনৈতিক ক্ষেত্রানুসারিণী হইত, তাহা হইলে ভারত-সাম্রাজ্যে সম্ভবতঃ আজও আর্য্য বিজয়-বৈজয়ন্তী সুনীল অম্বর চুম্বন করিয়া মহা গৌরবে উড্ডীন থাকিত। "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।" যদি বল, কীর্ত্তি রাখিবেন বলিয়াই তিনি জগতে একটী মহান্ ত্যাগস্বীকারের জলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গেলেন। তবে কি তিনি স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া, রাজকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করতঃ কীর্ত্তি রাখিতে পারিতেন না? সেকন্দর বাদসাহ, জুলিয়স সীজর, দীলিপ, রঘু প্রভৃতি কি কীর্ত্তি রাখিয়া যান নাই? যদি বল, তিনি ধর্ম্ম চিন্তা করিতে ভালবাসিতেন। রাজকার্য্যে থাকিলে কি ধর্ম্মানুরাগ হয় না? রাজন্যবৃন্দ কি সকলেই অধার্ম্মিক? স্ত্রীপুত্র তাঁহার প্রতিপাল্য, তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাওয়াই কি তাঁহার ধর্ম্ম হইয়াছিল। রাজপুত্র হইয়া বুদ্ধদেব শৃগাল-কুক্কুরের মত বৃক্ষতলে দেহত্যাগ করিলেন। বৈরাগ্যের দুর্দ্দশা আর কি হইতে পারে?

বৈরাগ্যের ঐ সম্মোহন শরে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন স্বামী শঙ্করাচার্য্যও বিদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন:—

"বদ্ধো হি কো যো বিষয়ানুরাগী কা বা বিমুক্তির্বিষয়ে বিরক্তিঃ।
* * * * তৃষ্ণাক্ষয়ঃ স্বর্গপদং কিমস্তি॥"

সাধারণ মানুষ যদি বাসনাশূন্য হইল, তবে সে মৃতবৎ জড়পিণ্ডস্বরূপ। এবম্প্রকার জড়াবস্থা যদি স্বর্গপদ বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে সে প্রকার স্বর্গে কাহারও আরোহণ ভাল নহে। স্বদেশবাসীকে ঐ প্রকার মৃত্যুপ্রসারিণী, সর্ব্বনাশসাধিনী শিক্ষাদ্বারা এক-দল নিশ্চেষ্ট জীব প্রস্তুত করিয়া যাওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য হয় নাই। তিনি যে প্রকার মহীয়সী মেধা, সর্ব্বগ্রাসিনী বুদ্ধি ও সুপ্রখরা তর্ক-শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে যদি তিনি বিজ্ঞানানুশীলনে মনোনিবেশ করিতেন, তাহা হইলে আর্করাইট, নিউটন, ষ্টিফেনসন প্রভৃতি মনীষীগণের অপেক্ষাও জগতের প্রভূত উপকার সংসাধন করতঃ ভূয়সী-প্রশংসালাভে সমর্থ হইতেন। তাঁহার সেই কীর্ত্তি-মেখলায় ভারত-মাতাও বিশেষ প্রকার মহিমান্বিতা হইতেন। শঙ্করের জগদ্বিমোহিনী-প্রতিভাপ্রসূন বৈরাগ্য-কীটদষ্ট হইয়াই আশানুরূপ ফলপ্রসবিনী হইল না।

এ কীট আর একটী পারিজাতেরও ত্রিদিব-লাবণ্য ধ্বংস করিয়াছে। ভারতে ভারতীপুত্র শ্রীশ্রীচৈতন্যও বৈরাগ্যের ঐ দারুণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। যখন তিনি নিমাইপণ্ডিত নামে প্রখ্যাত, তখন তিনি কিশোরবয়স্ক। তখনই তাঁহার যশোভাতিতে সরস্বতীর লীলাক্ষেত্র শ্রীনবদ্বীপধাম উদ্ভাসিত। কুক্ষণে ভারত-গৌরব রবি বৈরাগ্য-রাহুগ্রস্ত হইয়া পড়িল। হাস্যময়ী, জীবনসঙ্গিনী, যুবতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে

নয়নাসারে প্লাবিত করিয়া, নিমাই সন্ন্যাসী হইলেন। ক্রন্দনের উচ্চরোল উঠিল। মহা-পণ্ডিত, মহীপ্রাজ্ঞ নিমাই আজ দণ্ডকমণ্ডলুধারী, পথের ভিখারী! তিনি গাহিলেন :—

"তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ো সদা হরিঃ।—চৈতন্ত-চরিতামৃত।

প্রথম পংক্তির তাৎপর্য্য—তৃণাপেক্ষাও নীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইবে। বেশ শিক্ষা! এবম্প্রকার শিক্ষায় গৃহী চালিত হইলে, সংসারধর্ম্ম আর করিতে হয় না। ঐ শিক্ষা উদাসীনের পক্ষে খাটিতে পারে, কিন্তু গৃহীর পক্ষে নহে। একদল হিন্দু-গৃহস্থ ঐ শিক্ষা প্রভাবে উদ্যমশূন্য, ঘোর অলস হইয়া পড়িয়াছে। উহারাই বৈরাগী নামে অভিহিত। উহারাই ভিক্ষার ঘটী হস্তে লইয়া ভারতের ভিক্ষুকদলের পুষ্টিসাধন করতঃ ভারতকে দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর করিতেছে।

এমন বিজ্ঞানদৃপ্ত দিনেও সেদিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস 'কামিনীকাঞ্চন'-ত্যাগের ভেরী নিনাদ করিয়া ভারতবাসীকে স্তব্ধ করিয়াছিলেন। তিনিও সংসারত্যাগী, বৈরাগ্যের পক্ষপাতী।

তবেই দৃষ্ট হইতেছে যে, প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে ভারতভূমিতে বৈরাগ্য-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। ঐ স্রোতে দেশের ধনাকাঙ্খা, প্রতিভা-মাহাত্ম্য, সাম্রাজ্য-গৌরব, স্বাধীনতা-সুখ সব ভাসিয়া গিয়াছে এবং এখনও যাইতেছে। আজ যে ভারতের ভিক্ষুক সংখ্যা আমাদিগকে আশ্চর্য্য করিয়া তুলিতেছে, ইহারও কতকটা কারণ ঐ বৈরাগ্য মন্ত্র! অধুনা যেরূপ প্রচণ্ড জীবন-সংগ্রাম চলিতেছে, তাহাতে বৈরাগ্য-ভাব অবলম্বন করিয়া থাকিলে আমাদিগকে নিশ্চয়ই অন্যান্য উদীয়মান, উৎসাহী জাতি কর্ত্তৃক পদদলিত হইয়া ভূপৃষ্ঠ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। এ পৃথিবীতে অলসের, দীর্ঘসূত্রের স্থান নাই। উদ্যমহীনকে নিশ্চয়ই কোণ-ঠেসা হইতে হইবে। এ পৃথিবী সংগ্রামস্থল—এখানে বীর-ধর্ম্মেরই মাহাত্ম্য উদ্‌ঘোষিত। ক্লীবত্ব রন্ধন-শালায় শোভা পায়, সমরক্ষেত্রে নহে। বৈরাগ্য সুখ-শান্তির প্রস্রবণ—জীবনের কুসুমিত লক্ষ্য হইতে পারে কি না, সেটুকু পর্য্যন্ত আলোচনা করিবার আমাদের আর অবসর নাই, আবশ্যকও নাই। ঐ শুন চারি দিকে বিজ্ঞানের গম্ভীর নির্ঘোষ, ঐ শুন সার্ব্বভৌম জাগরণের মহান্ কোলাহল, ঐ দেখ পাশ্চাত্য জগতের তাণ্ডব নৃত্য, ঐ দেখ সেখানে উৎসাহ বহ্নির সর্ব্বগ্রাসিনী জিহ্বা লক্‌লক্ করিয়া দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত হইতেছে। আমাদিগকেও এক্ষণে জাগিতে হইবে। বিরাটক্ষেত্রে আর মোহাবিষ্ট হইয়া পতিত থাকিলে চলিবে না। আমাদিগকে জাগরিত করিবার জন্য ঐ শুন পাঞ্চজন্যের সুগম্ভীর নির্ঘোষ :—

"মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয় নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে। ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥ গীতা ২য়, ৩।

অর্থ—হে পার্থ! নির্ব্বীর্য্য বা কাতর-ভাবাপন্ন হইও না। হে পরন্তপ! ক্ষুদ্রাশয়োচিত হৃদয়ের দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ কর।

ঐ শুন অপৌরুষেয় গাম্ভীর্য্যের সুভীষণ টংকার :—

"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।"—ঈশোপনিষৎ।

অর্থ—মনুষ্য কর্ম্ম করিয়াই ইহলোকে শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে।

সংসার কর্ম্মক্ষেত্র, বৈরাগ্য-ক্ষেত্র নহে। কর্ম্ম করিতে করিতে শেষে যদি বৈরাগ্য আসে, আসুক। তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু কর্ম্মপথে আরূঢ় না হইয়াই বৈরাগ্য গ্রহণ করিলে, মহা অনর্থ। এবম্বিধ কাঁচা বৈরাগ্য সমূহ-অনিষ্টের মূলীভূত কারণ। কর্ম্মজনিত বৈরাগ্য পাকা বৈরাগ্য। ইহা জ্ঞান-মার্গের বস্তু। কর্ম্মমার্গের নহে। কর্ম্মমার্গ পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানমার্গের অনুসরণ হইতে পারে না। যাহারা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানানুসরণ করে, তাহারা গুরুতর ভ্রমে পতিত হয় এতদ্বিষয়ে শ্রুতি কি বলিতেছেন, শুন :—

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥"

অর্থ—যাহারা অবিদ্যার অর্থাৎ কেবল কর্ম্মের অনুসরণ করে, তাহারা অজ্ঞানরূপ গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে। আর যাহারা কেবল জ্ঞানে রত তাহারা তদপেক্ষাও গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে।

বর্ণাশ্রম-প্রতিপাদিত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিতে করিতে যদি বৈরাগ্যোন্মেষ হয়, তবে তাহাই সুখের আকর হইতে পারে। নতুবা, মহাজনদিগের দৃষ্টান্তানুসরণ করিতে যাইয়া অকালপক্ব বৈরাগ্যাবলম্বনে দেশের ও জাতির সর্ব্বনাশ ও সংহার অবশ্যম্ভাবী। যথোপযুক্ত আধারে ও যথোপযুক্ত সময়ে বৈরাগ্যবীজ উপ্ত হইলে সুফল ফলিতে পারিত; কিন্তু, রাজ-রাজেশ্বরী ভারত-মাতার দুরদৃষ্ট বশতঃই আজ কল্যাণকারিণী, পতিতপাবনী ভগবদ্বাণী শিব গড়াইতে বানর গড়াইয়া বসিলেন! তাই বলিতেছি, এখন আর বৈরাগ্যের চিন্তায় কাজ নাই। এক্ষণে কর্ম্মই আমাদের অবলম্বনীয়। অধুনা বৈরাগ্যের "ব" পর্য্যন্ত ব্রোমাইড্ অব্ পটাসের মত অবসাদক। ঐ "ব" তে বসিয়া থাকা সূচনা করে। ঐ "ব"ই আলস্যের—সর্ব্বনাশের প্রসূতি। বাধা, বিঘ্ন, বিনাশ সকল কথাতেই ঐ তুষার-শীতল বৈরাগ্যের বিকারব্যঞ্জক "ব"।

বৈরাগ্য-ব্রোমাইডের অযথা প্রয়োগে আমাদিগের নাড়ী বসিয়া গিয়াছে; এক্ষণে আমাদিগের সান্নিপাতিক অবস্থা। এতদবস্থায় উত্তেজক ঔষধের প্রয়োজন। তাই আমাদিগকে মৃগনাভি ও কর্পূর একত্র মিশ্রিত করতঃ সেবন করিতে হইবে, অর্থাৎ উপনিষদের ও গীতার প্রণোদক কর্ম্মবাদের মূলমন্ত্রগুলি স্মরণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই ধাত আবার উঠিবে, জড়তা কাটিয়া যাইবে, দেহে ও মনে নবীন বল ও নবীন উৎসাহ সঞ্চারিত হইবে। আমরা ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু। জ্ঞানকৃত পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত কখনই হইব না। কর্ম্ম করিতে করিতে জগদীশ্বর সমীপে মাত্র এইটুকু প্রার্থনা করিলেই আমাদিগের এখনকার মত যথেষ্ট হইবে যে,—

"যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম।"——উপনিষৎ।

অর্থাৎ, আমাদিগের মন হইতে কুটিল পাপ দূর কর। তোমাকে বার বার নমস্কার করি। ইতি

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ।

সাঙ্খ্য ও বেদান্ত।

৪র্থ প্রস্তাব।

শিষ্য। গুরুদেব! আপুনি বলিয়াছিলেন, সাঙ্খ্যদর্শনের মতের বিরুদ্ধে আরও যুক্তি আছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই সকল যুক্তিগুলি আজ আমার নিকট বলুন। আপনার কথিত যুক্তি শুনিতে আমার বড়ই কৌতূহল বাড়িতেছে।

গুরু। বৎস! তোমার অভিলাষ অনুসারে বলিতেছি, যুক্তিগুলি মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর। বিষয়গুলি ত সহজ নহে, সকল বিষয়ই অলৌকিক, কোন বিষয়ই প্রত্যক্ষ হয় না, কেবল মনন দ্বারাই ইহা বুঝিতে হয়, তাই মনের একাগ্রতা বিশেষ আবশ্যক করে। পূর্ব্ব প্রস্তাবে তোমাকে বলিয়াছি, 'পুরুষ বা আত্মার প্রয়োজন জন্য প্রকৃতির প্রবৃত্তি হইতে পারে না; অথবা পুরুষের দৃক্‌শক্তি এবং প্রকৃতির সৃষ্টিশক্তি এই উভয়বিধ শক্তি নিরর্থক না হইয়া যায়, এ নিমিত্তও প্রকৃতির প্রবৃত্তি বা পরিণাম হইতে পারে না।' এখন সাঙ্খ্যদর্শনকার প্রকৃতির পরিণাম বিষয়ে অপর দুইটী উদাহরণ দেখাইয়া আর একটী যুক্তি বলিয়াছেন, সেই যুক্তিটী এখন তোমার নিকট বলিতেছি, এবং তাঁহার সেই কথাও যে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না, এবিষয়ও তোমাকে বুঝাইতেছি। তিনি বলেন,—যে নিজে চলিতে পারে না, কিন্তু বেশ দেখিতে পারে, এবং অপর কোন ব্যক্তিকে কোন্ পথে কি ভাবে যাইতে হইবে, তাহা বলিয়া উত্তমরূপে বুঝাইয়া চালাইতে পারে, এইরূপ একজন পঙ্গু বা চলৎশক্তি-বিহীন মনুষ্য যদি বলিয়া বুঝাইয়া চালাইলে বেশ চলিতে পারে, চলিবার সামর্থ্যও যথেষ্ট আছে, কিন্তু স্বয়ং কিছুই দেখিতে পায় না, এইরূপ প্রকৃতির অন্ধের সহিত মিলিত হয়, তবে যেরূপ গতিশক্তি-বিহীন পঙ্গু গতিশক্তিযুক্ত অন্ধ ব্যক্তিকে চালাইতে পারে, এবং দুই জনে মিলিয়া মিশিয়া গমনাগমন ও দর্শনাদি বিবিধ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে; আর চুম্বক প্রস্তর স্বয়ং অচল অটল রহিয়াও যেমন অচেতন লৌহকে আকর্ষণ করিয়া চালাইয়া থাকে, সেইরূপ প্রবৃত্তিশক্তি-বিহীন কিন্তু জ্ঞানশক্তি-সম্পন্ন যে পুরুষ, তিনি, জ্ঞানশক্তি বিহীন প্রবৃত্তিশক্তি-সম্পন্ন প্রকৃতি বা প্রধানকে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন। সুতরাং পুরুষ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া অচেতন প্রকৃতিরও পরিণাম হইতে পারে; এবং তাদৃশ প্রকৃতির পরিণাম হইয়াই এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হইয়াছে; অতএব প্রকৃতিই জগতের আদিকারণ, আর কেহ এই জগতের আদি কারণ নহে। তাহাদের এই যে অভিনব মতবাদ রহিয়াছে, যাহা আপাতত দৃষ্টিতে যুক্তি-মূলক বলিয়া বোধ হয়, সে বিষয়ে আমরা বলি যে, সাঙ্খ্য-দর্শনকার এইরূপ স্বীকার করিলেও অর্থাৎ পঙ্গু ও অন্ধের সংযোগের মত পুরুষের পরিচালনা দ্বারা প্রকৃতির পরিণাম হয়, একথা মানিলেও সাঙ্খ্যদর্শনের মতবাদ দোষ-বিহীন হইতে

পারে না; কেননা, প্রথমতঃ সাংখ্যকার যদি এইরূপ কথা স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাহার মতবাদ যেরূপ রহিয়াছে, তাহার বিপরীত কথা হইয়া পড়ে। তাহাদের মতবাদ এই যে, "প্রকৃতির স্বাধীনভাবেই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, আর কেহ প্রকৃতির পরিচালক নাই, পুরুষ বা আত্মা নামে যিনি চেতন পদার্থ আছেন তিনি উদাসীন অবস্থায় সর্ব্বদাই বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তিনি নিগুণ ও নিষ্ক্রিয়, তাই কোন কার্য্যে আসক্ত হন না"। সম্প্রতি নিজের মত রক্ষা করিতে যাইয়া এবংবিধ মতবাদের বিরুদ্ধ কথা স্বীকার করিতেছেন; মতবাদের বিপরীত কথা স্বীকার করিতে যাওয়া দোষ নয় কি? দ্বিতীয়তঃ, যে পুরুষ উদাসীন ও কূটস্থ, সকল সময়ে যিনি একভাবে বর্ত্তমান থাকেন, যাহার কোন সময়ে কোন ভাবেই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না, যিনি কোনকালে কোন কার্য্যেই আসক্ত হন না, তিনি প্রকৃতির পরিণাম বিষয়ে কিরূপে পরিচালক হইতে পারেন? পঙ্গু বা খোঁড়া মনুষ্য কথা বলিয়া বুঝাইয়া অন্ধ ব্যক্তিকে পরিচালনা করিতে পারে, কিন্তু যাহার পারিচালনা বিষয়ে সেরূপ কোন ব্যাপার বা ক্রিয়া না থাকে, যে পুরুষ বা আত্মার কোন গুণ বা ধর্ম্ম নাই, যিনি সর্ব্বদাই ক্রিয়া-রহিত, এবংবিধ পুরুষের যে পরিচালকতা, তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারা যায় কি? তাই বলি, নিগুণ, নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন যে পুরুষ, তিনি প্রকৃতির পরিচালক, একথা সম্পূর্ণই অসম্ভব।

শিষ্য। মহাশয়! প্রসঙ্গক্রমে পুরুষ বা আত্মাকে কূটস্থ বলিয়াছেন; কূটস্থ বলিলে কিরূপ যে পুরুষের অবস্থা হয় তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। স্বর্ণকারের অলঙ্কার দেখিয়াছ ত? যে লৌহময় যন্ত্রের উপর স্বর্ণ রাখিয়া হাতুড়ী পিটিয়া পিটিয়া স্বর্ণকার স্বর্ণদ্বারা বিবিধ অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, সেই লৌহময় যন্ত্রের নাম 'কূট'; যাহার উপর থাকিয়া স্বর্ণের নানাবিধ পরিবর্ত্তন সর্ব্বদাই হইয়া থাকে, কিন্তু যে যন্ত্রের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না, তাহারই নাম 'কূট'; কূটের মত যিনি বর্ত্তমান থাকেন, তাহাকে কূটস্থ বলা যায়। এখন কূটস্থ শব্দের অর্থ বুঝিলে ত?

শিষ্য। হাঁ বুঝিলাম, এ উপমাটি বেশ। কূটের উপর থাকিয়া নানাবিধ আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া স্বর্ণ যেরূপ বিবিধভূষণের আকারে পরিণত হয়, সেইরূপ চিন্ময় পরব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া মায়াও নানাবিধভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া ভৌতিক জগতের আকার প্রাপ্ত হন, এই অংশেই বোধ হয় বেদান্তবিদ্ পণ্ডিতগণ কূটের সহিত পরব্রহ্মের সাদৃশ্য দেখিয়াছেন, এবং তাই ব্রহ্মকেও কূটস্থ বলিয়া থাকেন।

গুরু। হাঁ ঠিক বলিয়াছ, এখন প্রস্তাবিত বিষয়টী বুঝিয়া লও।

শিষ্য। আপনি বলিতেছেন, "উদাসীন পুরুষ প্রকৃতির পরিচালক হইতে পারেন না, যদি তিনি প্রকৃতির পরিচালক হন, তাহা হইলে আর তিনি উদাসীন থাকিলেন কই? পুরুষের পরিচালকতা স্বীকার করিলে সাংখ্যের যে মতবাদ প্রসিদ্ধ আছে, তাহার বিপরীত কথা স্বীকার করা হয়। তাই জিজ্ঞাসা করি, যদি সাংখ্যকার বলেন যে, যেমন চুম্বক

প্রস্তর স্বয়ং কোনরূপ কার্য্য করে না, তবুও যখন লৌহের নিকটে থাকে, তখন লৌহকে আকর্ষণ করে, চুম্বকের নিকটে অবস্থানবশতঃ অচেতন লৌহের যেরূপ পরিচালনা জন্মিয়া থাকে, সেইরূপ নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, উদাসীন যে পুরুষ তিনি স্বয়ং কোন কার্য্য করেন না, তবু প্রকৃতির সন্নিধানে আছেন, তাই প্রকৃতির পরিচালনা হইয়া যায়; এই জন্যই পুরুষকে প্রকৃতির পরিচালক বলা হইয়া থাকে। বাস্তবিকপক্ষে পুরুষ বা আত্মা কোনরূপ কার্য্য করেন না; তিনি উদাসীন। এইরূপে সাঙ্খ্যদর্শনের মতের সমর্থন করিলে তাঁহাদের প্রসিদ্ধ মতবাদের কোনরূপ বিরুদ্ধ কথা ত বলা হয় না।

গুরু। তোমার কথিত যুক্তি দ্বারাও সাঙ্খ্যদর্শনের মতবাদ নির্দ্দোষ হইল না; কেননা, প্রকৃতির সহিত পুরুষের সন্নিধান ত সর্ব্বদাই রহিয়াছে; সন্নিধানই যদি পরিচালনের কারণ হয়, আর কিছুই যদি প্রকৃতির পরিণামের প্রতি কারণ না হয়, তাহা হইলে পুরুষের সন্নিধান প্রকৃতির সহিত যেরূপ সর্ব্বদা রহিয়াছে, প্রকৃতির প্রবৃত্তিও সেইরূপ সর্ব্বদা হয় না কেন? চুম্বক প্রস্তর কখনও নিকটে থাকে, কোন সময় বা দূরেও থাকে,তাই চুম্বকের দ্বারা লৌহের পরিচালনা সর্ব্বদা হইতে পারে না; যখন চুম্বক লৌহের নিকটে থাকে, তখনই লৌহকে আকর্ষণ করিতে পারে, অন্য সময়ে পারে না। কিন্তু প্রকৃতি পুরুষ ত সেরূপ নহে; পুরুষ ব্যাপক বা সর্ব্বব্যাপী, প্রকৃতি বা প্রধানও সর্ব্বব্যাপী; সুতরাং পুরুষের সহিত প্রকৃতির সর্ব্বদাই সন্নিধান রহিয়াছে, তাহা হইলে সকল সময়ে সৃষ্টি হয় না কেন? সন্নিধানরূপ যে কারণ, তাহা ত সর্ব্বদাই বর্ত্তমান রহিয়াছে। আরও দেখ, চুম্বক প্রস্তরকে লৌহের নিকটে আনয়ন করা হয়, আবার চুম্বক প্রস্তরে যে সকল মলা থাকে তাহাও পরিষ্কার করা হয়, এইরূপ আরও অনেক কার্য্য চুম্বকের রহিয়াছে. সেই সকল কার্য্য না করিলে চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করিতে পারে না। পুরুষ বা আত্মাতে কিন্তু সেরূপ কোন কার্য্যই নাই, তিনি সর্ব্বদাই নির্গুণ ও ক্রিয়ারহিত অবস্থায় আছেন; সুতরাং চুম্বকের সহিত পুরুষের কি প্রকারে উপমা হইতে পারে?

শিষ্য। যদি বলি, প্রকৃতি ও পুরুষ যে ব্যাপক বা সর্ব্বব্যাপী হন—একথা ঠিক, কিন্তু তাহাদের এরূপ একটী সম্বন্ধ হয় যে, যাহা সকল সময়ে বর্ত্তমান থাকে না, সেই সম্বন্ধ যখন হয়, তখনই সৃষ্টি হইয়া থাকে, আবার যখন সেই সম্বন্ধের বিলোপ হয় তখন সৃষ্টিরও বিলোপ হইয়া যায়; এইরূপ কল্পনা করিলে কোন দোষ আছে কি?

গুরু। তোমার কথার অনুরূপ করিলেও সাঙ্খ্যমত দোষবিহীন হয় না; কেননা, সাঙ্খ্য-দর্শনকারের মতে প্রকৃতির চৈতন্য নাই. তিনি অচেতন; সুতরাং ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া কোনরূপ কার্য্য করিতে পারেন না; পুরুষের চৈতন্য আছে বটে, কিন্তু তিনি উদাসীন, সর্ব্বদাই একভাবে বর্ত্তমান থাকেন; সুতরাং পুরুষ বা আত্মাও সাঙ্খ্যমতে কোনরূপ কার্য্য করেন না। আর সাঙ্খ্যদর্শনের মতে প্রকৃতি ও পুরুষের যে সম্বন্ধ তুমি সাময়িকভাবে কল্পনা করিতেছ, তাহা যে ঘটাইয়া দিতে পারে, প্রকৃতি পুরুষ ব্যতীত এরূপ কোন

তৃতীয় ব্যক্তিও নাই, তাহা হইলে তাদৃশ সাময়িক সম্বন্ধ ঘটিবার কোনরূপ উপায় বলিতে পার কি? যদি বল প্রকৃতি ও পুরুষের যে সম্বন্ধ হয় তাহার কারণ হইয়া থাকে প্রকৃতির সৃষ্টিযোগ্যতা; সুতরাং যে সময়ে প্রকৃতি সৃষ্টি করার উপযুক্ত হন, তখনই তাহাদের উক্ত সম্বন্ধ হইয়া থাকে, আর যে সময়ে প্রকৃতি সৃষ্টি করার অনুপযুক্ত থাকেন, তখন প্রকৃতি ও পুরুষের সেই যে বিশেষ সম্বন্ধ তাহা থাকে না; সুতরাং প্রকৃতি ও পুরুষের তাদৃশ সম্বন্ধ ঘটাইবার জন্য অপর কোন ব্যক্তির বা কারণের প্রয়োজন হয় না, এই রূপও যদি স্বীকার কর, তাহাহইলেও সাঙ্খ্যমতে দোষ রহিয়া যায়। মনে কর, প্রকৃতির এই সৃষ্টিযোগ্যতা সকলসময়েই আছে, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; কেননা, প্রকৃতির কল্পিত সৃষ্টিযোগ্যতা যদি আগন্তুক বা জন্য হয়, তাহা হইলে সৃষ্টিযোগ্যতার অপর আর একটি কারণ আছে, একথা মানিতে হয়। যদি প্রকৃতির সৃষ্টিযোগ্যতার অপর কোন-রূপ কারণ না মান, তাহা হইলে, কোন সময়ে প্রকৃতির সৃষ্টিযোগ্যতা থাকে আবার কোন সময়ে প্রকৃতির সৃষ্টিযোগ্যতা থাকে না, ইহার কারণ কি বলিবে? আর যদি সৃষ্টি-যোগ্যতার কারণ আছে, একথা স্বীকার কর, তাহা হইলে, সৃষ্টিযোগ্যতার কারণেরও কারণ আছে—একথাও মানিতে হয়; তাহাহইলে প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে অতিরিক্ত নানাবিধ পদার্থ স্বীকার করিতে হইবে। তাহা তোমাদের মতবাদের বিরুদ্ধ কথা। প্রকৃতপক্ষে সাঙ্খ্য-দর্শনের মতে প্রকৃতির সৃষ্টিযোগ্যতার অপর কোন কারণ স্বীকৃত হয় নাই। সুতরাং প্রকৃতির সৃষ্টিযোগ্যতা সততই রহিয়াছে বলিতে হইবে, প্রকৃতির এই সৃষ্টিযোগ্যতা নিত্য বা চিরস্থায়ী যদি মানা হইল, তাহা হইলে সকল সময়ে সৃষ্টি হইবে না কেন? আর যদি সকল সময়েই সৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে ত পুরুষের সংসার-বন্ধনের বিনাশ হইতে পারিল না; তাহা হইলে পুরুষের মুক্তি হওয়া ত অসম্ভব হইয়া পড়ে। আর এক কথা বলি, তর্কস্থলে যদি তোমার কথা স্বীকারও করি, প্রকৃতির সাময়িক সৃষ্টিযোগ্যতা আছে, এবং প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধবিশেষে এই জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে, একথা যদি মানিয়াও লই, তাহা হইলেও বলিতে হইবে যে, প্রকৃতির এই জগৎ-সৃষ্টির প্রয়োজন কি? এই জগতের সৃষ্টি করিবার জন্য প্রকৃতির কোন উদ্দেশ্য আছে কি না? সেই উদ্দেশ্য যদি পুরুষের ভোগ বলিতে চাও, তাহা হইলে বলি, ভোগ্য বস্তু ত অসীম ও অনন্ত রহিয়াছে, ইহার ভোগও ত অসীম ও অনন্ত হইতে পারে; পুরুষের এই ভোগ যদি অসীম ও অনন্ত হয়, তাহা হইলে পুরুষের আর মুক্তি হইতে পারিল কই? আর যদি বলিতে চাও যে, পুরু-ষের মুক্তি হওয়াই সৃষ্টির উদ্দেশ্য রহিয়াছে, তাহাও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না; কেননা সৃষ্টি করার পূর্ব্বেও ত পুরুষের মুক্তাবস্থা রহিয়াছে, তাহার জন্য আবার সৃষ্টির প্রয়োজন কি? সুতরাং মুক্তিও সৃষ্টির প্রয়োজন হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, পুরুষের ভোগ ও মুক্তি এই দুইটীকেও সৃষ্টির প্রয়োজন বলিতে পার না, কেননা, ভোগ্য বস্তু অসীম ও অনন্ত বলিয়া ভোগের অন্ত বা অবসান হইতে পারে না; সুতরাং পুরুষ বা আত্মার মুক্তি অসম্ভব হইয়া

পড়ে। এই বিষয়ে পূর্ব্বেও তোমাকে বিস্তার করিয়া বলিয়াছি। অতএব, যিনি অচেতন জড়পদার্থ, সেই প্রকৃতি এই জগতের আদি কারণ হইতে পারে না; পরমেশ্বরই এই জগতের আদি কারণ হইয়া থাকেন।

শিষ্য গুরুদেব! সাঙ্খ্য-দর্শনকারের মতে পুরুষ বা আত্মা যাহাকে বলা হয়, বেদান্ত-দর্শনের মতের আত্মাও ত প্রায় তাদৃশই হইয়া থাকেন; সাঙ্খ্যদর্শনকার পুরুষকে নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন বলিয়াছেন, বেদান্ত-দর্শন-প্রণেতার মতেও ত যিনি পরমাত্মা বা পরমেশ্বর হইয়া থাকেন, তিনিও নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় হন, বেদান্তবিদগণ তাঁহাকে উদাসীনও ত বলিয়াছেন; ইহাই যদি স্থির হইল, তবে বেদান্তদর্শনের মতে পরমাত্মা বা পরমেশ্বর হইতে কি প্রকারে সাময়িক সৃষ্টি হওয়া সম্ভব হইতে পারে? আর তাঁহার মতে আত্মার মুক্তিই বা কি প্রকারে সম্ভব হয়? যে সমস্ত দোষ সাঙ্খ্যদর্শনকারের মতবাদে আপনি আরোপ করিতেছেন, বেদান্তমতেও যদি আত্মা নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন হইলেন, তবে সেই সকল দোষ তাঁহার মতে হইবে না কেন? অনুগ্রহপূর্ব্বক এই বিষয়টী আমাকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া বলুন।

গুরু। বৎস! তোমার প্রশ্নের আমি সম্যক উত্তর দিতেছি, তুমি মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর, এবং বিচার করিয়া দেখ যে, আমার কথা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে কি না? আমি সাঙ্খ্যদর্শনকারের মতবাদে যতগুলি দোষ দেখাইয়াছি, বেদান্তদর্শনকারের মতে সেই সকল দোষ বা আপত্তি হইতে পারে না; কেননা, বেদান্তমতে যিনি পরমাত্মা বা পরমেশ্বর হন, তিনি যে সময়ে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আশ্রয় করিয়া থাকেন, সেই সময়ে তিনি নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন অবস্থায় বর্ত্তমান থাকেন; পরমাত্মা যখন এই স্বরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন, জীবের যখন আত্মাবিষয়ে এই স্বরূপ জ্ঞান উপস্থিত হয়, তখন তাহাকে মুক্ত বলা হইয়া থাকে; বেদান্তমতে মুক্তি কোনরূপ স্বতন্ত্র জিনিষ নহে; আত্মার স্বরূপ জ্ঞান হইলেই মুক্তি হইয়া থাকে। আর যে সময়ে পরমাত্মা বা পরমেশ্বর অনির্ব্বচনীয় শক্তিশালী মায়াকে আশ্রয় করেন, সেই সময়ে তাঁহার এই জগতের সৃষ্টি বিষয়ে অভিলাষ উপস্থিত হয়, তখন আর তিনি নির্গুণ বা নিষ্ক্রিয় নহেন, সেইকালে পরমেশ্বর মায়ার পরিচালক হইয়া থাকেন; সুতরাং তখন মায়াবিশিষ্ট পরমেশ্বর হইতে এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি প্রভৃতি যাবদীয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। অতএব বেদান্ত-দর্শনকারের মতে সৃষ্টিও হইতে পারে এবং মুক্তিও সম্ভব হয়, ইহার কোন একটীও যুক্তিবিহীন নহে। এ বিষয়ে সময়ান্তরে তোমাকে আরও বিস্তার করিয়া বুঝাইব। এখন সাঙ্খ্য-দর্শনের মত খণ্ডন বিষয়ে আর একটী যুক্তি শ্রবণ কর।

সাঙ্খ্যকার স্বীকার করেন যে, প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, এই প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামে তিনটী গুণ আছে, ইহারা যে সময়ে অঙ্গাঙ্গিভাব বা গুরুলঘুভাব ত্যাগ করিয়া থাকে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণই যখন সমান অবস্থা প্রাপ্ত হয়, কেহ ছোট কেহ বা বড় এই ভাব যখন থাকে না, তখনই তাহাকে প্রকৃতি বা প্রধান বলা হয়। এই সময়ে সত্ত্বগুণও যেরূপ

অণুভাব প্রাপ্ত হয়, রজোগুণও সেইরূপ অণু হইয়া যায়, আর তখন তমোগুণও একই রকম অণুভাব প্রাপ্ত হয়, এই তিনটীর মধ্যে কাহারও কোনরূপ বৈলক্ষণ্য থাকে না? গুণত্রয়ের এই সাম্যাবস্থার নামই প্রকৃতি। প্রকৃতির এই যে তিনটী গুণ আছে, ইহাদের এবংবিধ সাম্যাবস্থার পরে আবার বৈষম্য উপস্থিত হয়, তখন আবার সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে,—প্রকৃতির এই সাম্যাবস্থার পরে পুনর্ব্বার সৃষ্টি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? গুণত্রয়ের অঙ্গাঙ্গিভাব বা গুরুলঘুভাব কোন্ কারণ হইতে হইয়া থাকে? সাঙ্খ্যকার গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলেন এবং এই প্রকৃতিকে নিত্যও বলিয়া থাকেন। যদি এই সাম্যাবস্থার বিনাশ হয় তবে প্রকৃতিরও ত বিনাশ হইল; সুতরাং বৈষম্য হইয়া সৃষ্টি হইলে প্রকৃতির নিত্যতা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? যদি বল, সাঙ্খ্যদর্শনকার দ্বিবিধ নিত্য স্বীকার করেন,সুতরাং গুণের বৈষম্য হইলেও প্রকৃতির নিত্যতা থাকিয়া যায়; কেননা, তাঁহাদের মতে একপ্রকার হয় কূটস্থ নিত্য, দ্বিতীয় প্রকারের নাম পরিণামি নিত্য; যাহার কোন সময়ে কোনরূপ অবস্থান্তর হয় না, যিনি সর্ব্বদা একরূপ অবস্থায় বর্ত্তমান থাকেন, তাহাকে কূটস্থ নিত্য বলা হয়। সাঙ্খ্য-দর্শনকারের মতে কূটস্থ নিত্যের উদাহরণ পুরুষ বা আত্মা। তাঁহাদের মতে প্রকৃতি তাদৃশ কূটস্থ নিত্য নহেন, তিনি পরিণাম নিত্য। যাহার বিকার বা অবস্থান্তর হইলেও যথার্থরূপে বিনাশ হয় না, অন্যবিধ রূপে যে বস্তু থাকিয়া যায়, তাহাকে পরিণামি নিত্য বলা হয়; রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াও ত্রিগুণ যখন থাকিয়া যায়, তখনই বলিব যে, সৃষ্টি হইলেও প্রকৃতির নিত্যতা যায় না, তাই তিনি পরিণামি নিত্য। এইরূপ কথা স্বীকার করিলেও সাঙ্খ্য-দর্শনের মত নির্দ্দোষ হইল না; কেননা, গুণগণের সাম্যাবস্থা দূর করিয়া তাহাদের বৈষম্য অবস্থা আনয়ন করে কে? যে ব্যক্তি গুণের বৈষম্য করিতে পারে, প্রকৃতিব্যতীত তাদৃশ অপর কোন সৃষ্টির কারণ তিনি ত স্বীকার করেন না, তবে বৈষম্য কেন? বিনাকারণে বৈষম্য হইলে তাহা সর্ব্বদা থাকে না কেন? আর কারণব্যতীত বৈষম্য হইলে বিনা কারণে সাম্যাবস্থা ঘটে না কেন? তাহা হইলে যে অকস্মাৎ প্রলয়ও হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে অকস্মাৎ প্রলয়ের কথা ত তাঁহারা স্বীকার করেন না। অতএব, বিনাকারণে যখন বৈষম্য অসম্ভব, অথবা বিনাকারণে বৈষম্য স্বীকার করিলে সাম্যও যখন কারণ ব্যতীত হইতে পারে, তখন বৈষম্যের কারণ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সাঙ্খ্য-দর্শনকারের মতে চেতন পরমেশ্বরের পরিচালনা যখন নাই, এবং বৈষম্যের কারণ রূপেও তাহা যখন স্বীকৃত হয় না, তখন তাঁহাদের মতে ত্রিগুণের বৈষম্যও ত ঘটিতে পারে না। আর বৈষম্যনিবন্ধন যে গুণত্রয়ের পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাব বা গুরুলঘুভাব তাহাও ত হইতে পারে না; অঙ্গাঙ্গিভাব-যাহাতে কেহ অবয়ব, কেহ বা অবয়বী এইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে, তাহা না হইলে সৃষ্টিও ত হইতে পারিল না? তাহা হইলে প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ব, মহত্তত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ব, অহঙ্কারতত্ব হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় ইত্যাদি ক্রমে সাঙ্খ্যদর্শনকারের মতে যে,

সৃষ্টি হওয়ার কথা আছে, তাহাও সম্ভব হইল না। অতএব, চেতন যে পরমেশ্বর তিনিই এই জগতের আদি কারণ হইয়া থাকেন, অচেতন যে প্রকৃতি তিনি চেতন কর্তৃক পরিচালিত না হইলে জগতের কারণ হওয়া সম্ভব হয় না। এ বিষয়ে বারান্তরে তোমাকে আরও অনেক কথা বলিব।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রসন্নকুমার বেদান্ততীর্থ।

ঘুচাইবে কে আঁধার !

কেঁদে কেঁদে উঠে প্রাণ কি জানি কি যাতনায়,
বুঝিবারে নাহি পারি কেন কাঁদি, কে কাঁদায়।
কারণে ও অকারণে হাসিতাম হাসি কত,
কি জানি নয়নে আজ কেন বহে ধারা শত।
ভাল আর নাহি লাগে সেই হাসি, সেই গান,
নীরবতা চাহে শুধু আমার ব্যাকুল প্রাণ।
হয়েছি এমন আমি কাহারে ভাবিয়া হায়,
ভাবিয়া ভাবিয়া তবু বুঝিতে না পারা যায়।
ভাল শুধু নাহি লাগে বাসিতাম ভাল যাহা,
শিহরিয়া উঠি এবে স্মরণে আসিলে তাহা।
চিন্তা-স্রোতে ভেসে ভেসে হইয়াছি লক্ষ্যহীন,
কি করিতে পারি আর, আমি যে দীনের দীন।
হৃদয়-মন্দির মম হইয়াছে অন্ধকার,
জ্যোতির্ম্ময় বিনা বল ঘুচাইবে কে আঁধার !

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

সরল যোগ-সাধন।

নিয়মের পঞ্চম সাধন ঈশ্বর পূজন।

যঃ প্রসন্ন স্বভাবেন বিষ্ণুং বা রুদ্রমেব চ। যথা শক্ত্যার্চ্চয়েদ্ ভক্ত্যা এতদীশ্বরপূজনং ॥ —যোগী যাজ্ঞবল্ক্য

প্রসন্নচিত্ত হইয়া শক্ত্যনুসারে ভক্তিসহ শিব কিম্বা বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিলে তাহাকে ঈশ্বর-পূজন কহে।

বস্তুতঃ ঈশ্বর-পূজন বলিলে সাকার দেবতার পূজা জানিতে হইবে। অদৃশ্য নিরাকার ব্রহ্মের কখনও পূজা করা যাইতে পারে না।

শাস্ত্রে উল্লেখ আছে,—

অমূর্ত্তশ্চেৎ স্থিরো ন স্যাত্ততো মূর্ত্তিং বিচিন্তয়েৎ।

অর্থাৎ অমূর্ত্তির চিন্তায় মন স্থির হয় না, তজ্জন্য মূর্ত্তি ভাবনা করিবে।

সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।

অর্থাৎ সাধকদিগের হিতের জন্য নিরাকার ব্রহ্মের রূপ কল্পনা হইয়াছে। কুমারী বালিকা যেরূপ পুত্তলিকা লইয়া নানারূপ ক্রীড়া করিয়া প্রকৃত গৃহস্থ-জীবনের সুখ কল্পনা করিয়া থাকে, তদ্রূপ প্রকৃত ব্রহ্মানন্দ পাইবার জন্য ঈশ্বরের নানারূপ কল্পনা করিয়া ভক্তগণ ঈশ্বরের পূজা করিয়া থাকেন।

শাস্ত্রে উল্লেখ আছে,—

রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং। স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া॥
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা। ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতা দোষত্রয়ম্ মৎকৃতম্॥
ব্যাস সংহিতা।

অর্থাৎ হে ভগবান্, তুমি রূপ-বিবর্জ্জিত, কিন্তু আমি ধ্যানে যে তোমার রূপ কল্পনা করিয়াছি; তুমি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের গুরু ও বাক্যের অতীত হইলেও, স্তবস্তুতিদ্বারা আমি তোমার যে অনির্ব্বচনীয় ভাব নষ্ট করিয়াছি; এবং তুমি সর্ব্বব্যাপী অথচ আমি যে তীর্থ যাত্রাদি দ্বারা তোমার সেই সর্ব্বব্যাপকতা নষ্ট করিয়াছি; হে জগদীশ! আমার কৃত এই তিনটি দোষ আপনি ক্ষমা করুন। লোকহিতের জন্য স্বয়ং বেদব্যাস এইরূপ ভাবে নিজের দোষ পরিহারার্থ জগদীশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ব্রহ্মের সাকার মূর্ত্তি এবং তাঁহার পূজাস্তব ও তীর্থ যাত্রাদির বর্ণন করিয়া গিয়াছেন।

উত্তমো ব্রহ্ম সদ্ভাবো ধ্যান ভাবস্তু মধ্যমঃ। স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বাহ্যপূজাধমাধমঃ॥—আত্মজ্ঞান।

পরব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ ভাবে যে চিত্ত লয় হয়, তাহাই উত্তম; ব্রহ্মের সাকার মূর্ত্তিতে যে চিত্ত ধ্যানাবস্থায় নিমগ্ন থাকে, তাহাই মধ্যম; সেই সাকার মূর্ত্তির স্তুতি মন্ত্রাদি জপ করা,

অধম ;—আর দুর্ব্বাক্ষতপুষ্প চন্দনাদি দ্বারা সগুণ মূর্ত্তির যে বাহ্যপূজা, তাহা অধম অপেক্ষাও অধম। কিন্তু বাহ্যপূজা অধমাপেক্ষাও অধম বলিয়া সাকার দেবদেবীর পূজা করা বৃথা, এরূপ কাহারও মনে করা উচিত নহে। কারণ কি, এই বাহ্যপূজাই ব্রহ্মের সদ্ভাব প্রাপ্ত হইবার প্রথম সোপান। স্থূল ও স্বল্পবুদ্ধি-বিশিষ্ট মানব প্রথমেই ব্রহ্মের সূক্ষ্মভাব ধারণা করিতে সক্ষম হইবে না ভাবিয়াই, বেদব্যাস সাকার মূর্ত্তির উপাসনা প্রণালী প্রণয়ন করিয়াছেন। উক্ত সাকার মূর্ত্তির পঞ্চদেবতা ভেদে উপাসনা পঞ্চভাগে বিভক্ত। ব্রহ্মের সাকার মূর্ত্তি পঞ্চভাগে বিভক্ত হইবার কারণ এই যে, ব্রহ্মাণ্ড ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চতত্ত্বে গঠিত। এই পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে প্রথম ভূত—আকাশ হইতে পরব্রহ্ম শিবরূপ ধারণ করিয়াছেন। বায়ু হইতে শক্তি (দেবীরূপ), তেজ হইতে সূর্য্যরূপ, জল হইতে নারায়ণরূপ ও পৃথিবী হইতে গণেশরূপ ধারণ করিয়াছেন। এবং মনুষ্যগণও এই-সকল রূপের পূজা আরাধনা করিয়া অবশেষে পরমব্রহ্মের সদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বময়ঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ। সর্ব্বেষামুপকারায় সাকারোঽভূন্নিরাকৃতিঃ॥ অগস্ত্য সংহিতা

সর্ব্বভূতের হিতকারী সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা সকল জীবের উপকারার্থ সাকাররূপ ধারণ করিয়াছেন।

সৌরাশ্চ শৈবা গাণেশা বৈষ্ণবা শক্তিপূজকাঃ। মামেব তে প্রপদ্যন্তে বর্ষাম্ভঃ সাগরং যথা।
একোঽহং পঞ্চধা যাতঃ ক্রীড়ার্থং নামভিঃ কিলে॥—পদ্মপুরাণ।

অর্থাৎ সূর্য্যের উপাসকদিগকে সৌর কহে, শিবোপাসকগণকে শৈব, গণেশ উপাসক-দিগকে গাণেশ, বিষ্ণু উপাসকদিগকে বৈষ্ণব এবং শক্তি (দেবী) উপাসকদিগকে শাক্ত কহে। যিনি যে ভাবে যে দেবতাকেই পূজা করুন না কেন, সকলেই পঞ্চতত্ত্বের অধিপতি এক পরব্রহ্মকেই উপাসনা করিতেছেন। চতুর্দ্দিকের বর্ষার জল যেরূপ এক সাগর গর্ভেই প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ সকল উপাসকগণই পরিশেষে পরম ব্রহ্মরূপ সাগরগর্ভে লীন হইয়া থাকেন। কারণ অহং প্রতিপাদ্য এক ব্রহ্মই ক্রীড়ার্থ পঞ্চনাম ধারণ করিয়াছেন।

দৈত্যরাজ পুষ্পদন্ত বলিয়া গিয়াছেন,—

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানা পথজুষাং নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥

অর্থাৎ মনুষ্যের রুচিভেদে পরমাত্মা প্রাপ্তি বিষয়ে সরল ও জটিল নানা পথ আছে, নদনদী যেরূপ সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ যিনি যে পথ অবলম্বন করিয়া গমন করুন, তিনি অবশেষে পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইবেন। উক্ত দেবপূজা পদ্ধতি পঞ্চ, দশ ও ষোড়শ উপচারে বিভক্ত।

গন্ধপুষ্পধূপদীপনৈবেদ্যমিতি পঞ্চকম্। নিবেদয়েৎ সদার্চ্চায়াং পূজা পঞ্চোপচারিকা॥ তন্ত্রসার।

গন্ধ (চন্দন), পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য—দেবতার পূজাকালে এই পঞ্চ দ্রব্য দেবতাকে অর্পণ করিতে হয়, ইহার নামই পঞ্চোপচার।

অর্ঘং পাদ্যং নিবেদ্যঞ্চ তথৈবাচমনীয়কম্। মধুপর্কাচমঞ্চৈব গন্ধ পুষ্পে ততঃ পরম্।
ধূপদীপৌ চ নৈবেদ্যং দশোপচারকা স্মৃতা॥ তন্ত্রসার।

অর্ঘ, পাদ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, এই সকল দ্রব্যই দশোপচার।

আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কম্। মধুপর্কাচম স্নান বসনাভরণানিচ।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপৌ নৈবেদ্যং বন্দনাং তথা। প্রযোজয়েদর্চ্চনায়ামুপচারান্ তু ষোড়শ॥

অর্থাৎ আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমন, স্নান, বসন, অলঙ্কার, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, বন্দন * এই সকল ষোড়শ উপচার। ইহা ব্যতীত অষ্টাদশো-পচারেও দেবতার পূজার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে অধিকন্তু যজ্ঞোপবীত ও নমস্কার ব্যবস্থা শাস্ত্রে উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়।

নমোহন্ত মাসনং দদ্যাৎ স্বাগতং দর্শনং ভবেৎ। নমোহন্তং পাদয়োঃ পাদ্যমর্ঘ্যং শিরোহস্ত মেবচ॥
মুখেত্যাচমনং প্রোক্তং মধুপর্কং তথৈবচ। তেনৈব মনুনাচামং নমোহন্তং স্নানমেবচ॥
নমোহন্তে বাসসী প্রোক্তে তথা ভরণানি চ। নমোহন্ত মর্পয়েদ্গন্ধং পুষ্পঞ্চ যৌবদ্ভকম্॥
পুষ্পং সমর্পয়েদ্দেব্যৈ মুদ্রয়া জ্ঞানসংজ্ঞয়া। অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনী যোগাৎ জ্ঞান মুদ্রেয়মীরিতা॥
নমোন্তঞ্চ তথা ধূপং দীপমালাং তথৈবচ। নৈবেদ্যঞ্চ ততো দদ্যাৎ যথোক্তং বৈ চতুর্ব্বিধং॥
পানার্থং মধুরং বারি দদ্যাদাচমনং পুনঃ॥ কর্পূরং সহিতং দেব্যৈ তাম্বূলঞ্চ নিবেদয়েৎ।
প্রণবাদি নমোহন্তেন মন্ত্রেণনেন সংযত। পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াণি দদ্যাদেতানি দেশিকঃ॥—তন্ত্রসার।
"উৎসৃজ্য মূলমন্ত্রেণ প্রতিমাখ্যা নিবেদয়েৎ॥"—যোগিনী-তন্ত্র।

দেবতার পূজা করিতে হইলে প্রথমে দেবতার উপবেশনের জন্য আসন দিতে হয়। পরে তাঁহার স্বাগত জিজ্ঞাসা করতঃ পদধৌতের জন্য জল এবং দেবতার মস্তকে অর্ঘ্য প্রদান করিতে হয়। পরে আচমন করিবার জন্য জল, তৎপরে ক্রমানুসারে মধুপর্ক, পুনরাচমন, স্নানবস্ত্র, অঙ্গাভরণ, অলঙ্কার, গন্ধদ্রব্য (চন্দনাদি), পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, (চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় এই চারিবিধ আহারীয় দ্রব্য, পানার্থ জল ও কর্পূরাদি সুগন্ধযুক্ত তাম্বূল সমর্পণ করিবে। ঐ সকল দ্রব্য সমর্পণ কালে ওঁকার সহ দেবতার মূলমন্ত্র উচ্চারণকরতঃ ও পূজোপকরণ দ্রব্যের নাম উল্লেখ করিয়া অন্তে "নমঃ" এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া পূজার উপকরণ দ্রব্য সকল দেবোদ্দেশে সমর্পণ করিতে হয়। এই সকল উপচার সমর্পণ কালে জ্ঞানমুদ্রা অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী সংযোগ করিয়া সমর্পণ করিতে হয়। দেবতার বাহ্যপূজা করিবার মূল উদ্দেশ্য এই যে, চিত্ত শুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ঈশ্বরাসক্ত ভাবে অন্তর্মুখী গতি বিশিষ্ট হইয়া থাকে। বাহ্য পূজার বিশেষ বিবরণ এইস্থানে উল্লেখ করিতে হইলে অতি বিস্তার হইয়া যাইবে, এই আশঙ্কায় অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইল। এরূপ বাহ্য পূজা ব্যতীত দেবতার অন্তর পূজা অর্থাৎ মানসিক পূজা করিবার ব্যবস্থা আছে। যথা:—

* কোন স্থানে বন্দনের স্থানে তাম্বুল দিবার ব্যবস্থা আছে।

হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ। পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যাৎ মনস্ত্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ॥
তেনামৃতে নাচমনীয়ং স্নানীয়ং তেন চ স্মৃতম্। আকাশতত্ত্বং বস্ত্রং স্যাৎ গন্ধঃ স্যাৎ গন্ধতত্ত্বকং॥
চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ। তেজস্তত্ত্বং চ দীপার্থং নৈবেদ্যং স্যাৎ সুধাম্বুধিঃ॥
অনাহতধ্বনিঘণ্টা বায়ুতত্ত্বং চ চামরং। সহস্রারং ভবেৎ ছত্রং শব্দতত্ত্বং চ গীতকম্॥
নৃত্যমিন্দ্রিয়কর্ম্মাণি চাঞ্চল্যঞ্চ মনস্তথা। সুমেখলাং পদ্মমালাং পুষ্পং নানাবিধং তথা॥ অময়াদ্যৈর্ভাব-পুষ্পৈরর্চ্চয়েদ্ভাব গোচরং। অমায়মনহঙ্কার মরাগ মমদং তথা॥ অমোহক মদম্ভঞ্চ অদ্বেষা ক্ষোভকং তথা॥ অমাৎসর্য্যমলোভং চ দশ পুষ্পং বিদুর্বুধাঃ। অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ। দয়া পুষ্পং ক্ষমা পুষ্পং জ্ঞান পুষ্পঞ্চ পঞ্চকং॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সাধকপুরুষ ইষ্টদেবতার ধ্যান করিয়া উপবেশনার্থ আসনস্বরূপ হৃদয়-কমল প্রদান করিবে, ইষ্টদেবকে হৃদয়-কমলে উপবেশন করাইয়া শিরস্থিত সহস্র-দল কমল হইতে বিনিঃসৃত চন্দ্রের অমৃত দ্বারা দেবতার পাদযুগলে পাদ্য সমর্পণ করিবে। পরে মনকে অর্ঘ্যস্বরূপ নিবেদন করিতে হয়। অনন্তর উক্ত সহস্রদল-কমলস্থিত চন্দ্র হইতে ক্ষরিত অমৃত আচমনীয় ও স্নানীয় প্রদান করিয়া, বস্ত্রস্বরূপ আকাশতত্ত্ব, গন্ধস্বরূপ পৃথিবীতত্ত্ব, পুষ্পস্বরূপ চিত্ত, ধূপস্বরূপ প্রাণ, দীপস্বরূপ তেজতত্ত্ব, নৈবেদ্যস্বরূপ সুধাসাগর, ঘণ্টাধ্বনিস্বরূপ অনাহত ধ্বনি, চামরস্বরূপ বায়ুতত্ত্ব, ছত্রস্বরূপ শিরস্থ সহস্রদল কমল, গীত-স্বরূপ শব্দ তত্ত্ব, নৃত্যস্বরূপ ইন্দ্রিয় সমুদয়ের কার্য্য ও মনের চাঞ্চল্য, এই সমস্ত মানসিক ভাব সমর্পণ করিবে। সুমেখলা অর্থাৎ সুষুম্না নাড়ী স্বরূপ পদ্মমালা প্রদান করিয়া অময় অর্থাৎ বঞ্চকতা-রহিত ভাবময় পুষ্পদ্বারা ইষ্টদেবেকে অর্চ্চনা করিবে। অময়া অর্থাৎ (কুটিলতা-শূন্যতা, অনহঙ্কার (অহঙ্কার-শূন্যতা), অরাগ (অনুরাগ রাহিত্য), অমদ (গর্ব্বশূন্যতা), অমোহ (মোহরাহিত্য), অদম্ভ (দম্ভশূন্যতা), অদ্বেষ (দ্বেষ-রাহিত্য), অক্ষোভ (ক্ষোভরাহিত্য), অমাৎসর্য্য (পরশ্রীকাতরতা ত্যাগ), অলোভ (লোভশূন্যতা), ইহাই দশবিধ ভাবময় পুষ্প। ইহা ব্যতীত আরও পঞ্চপ্রকার পুষ্প পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন; যথা,—অহিংসা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, দয়া, ক্ষমা ও জ্ঞান এই পঞ্চ ভাব-পুষ্প দ্বারা ইষ্টদেবতাকে পূজা করিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, উপরোক্ত পঞ্চদশ প্রকার ভাব-পুষ্পের কথা যাহা বলা হইল, সেই ভাবগুলিকে হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণা করিতে পারিলেই ইষ্টদেবের পূজা করা হইয়া থাকে। এইরূপ মানসিক পূজা রাজযোগের একটী উচ্চতম অঙ্গ।

ঈশ্বরারাধনা সকাম ও নিষ্কাম ভেদে দুই প্রকার; সকামী অর্থাৎ যাঁহারা স্বর্গাদি ও ইহসংসারের সুখ ভোগ-কামনায় ঈশ্বরারাধনা করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন;—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন। আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানীচ ভরতর্ষভ॥

অর্থাৎ হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! আর্ত্ত (রোগাদ্যভিভূত), জিজ্ঞাসু (আত্মজ্ঞানেচ্ছু), অর্থার্থী (ইহ ও পরলোকে সুখ-ভোগ-কামী) এবং আত্মজ্ঞানী, এই চারিপ্রকার ব্যক্তি আমায় ভজনা করিয়া থাকেন।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে। প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থ মহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥

তাহাদের মধ্যে সর্ব্বদা আমাতে নিষ্ঠাবান্ ও একমাত্র আমাতে ভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। আমি জ্ঞানীর অতিশয় প্রিয়, তজ্জন্য জ্ঞানীও আমার প্রিয় হইয়া থাকেন।

উপরোক্ত চারিপ্রকার উপাসকের মধ্যে আর্ত্ত ও অর্থার্থী ইহারাই সকামী এবং জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী নিষ্কামী। অনেকে এরূপ মনে করিয়া থাকেন যে, কামনা-শূন্য হইয়া ঈশ্বরের আরাধনা কিরূপে হইতে পারে?

"প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে।"

অর্থাৎ কোনরূপ প্রয়োজন বিনা মন্দ ব্যক্তিগণও কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। এরূপ স্থলে নিষ্কামভাবে কিরূপে ঈশ্বরারাধনা সম্ভবপর হইতে পারে?

কোন সময় দুই ব্যক্তি এক রাজার নিকট গমন করিয়া কোনরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করিল। রাজা তাহাদের উভয়ের বেতন নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে প্রথম ব্যক্তি বলিল, "বিশ কিম্বা পঁচিশ মুদ্রায় আমার ভরণ পোষণ হইতে পারে।" দ্বিতীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "রাজন্! আমি আপনার নিকট কোনরূপ বেতন নির্দ্দিষ্ট করিয়া কার্য্য করিতে আসি নাই, আপনার প্রসন্নতাই আমার কার্য্যের পুরস্কার বা বেতন হইবে।" রাজা দুই ব্যক্তির অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া উভয়কে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। প্রথম ব্যক্তি নিয়মিত কার্য্য করিয়া নিয়মিত রূপে বেতন প্রাপ্ত হইতে লাগিল, এবং সময় সময় আলস্যবশতঃ কার্য্যে অবহেলা হওয়ার জন্য অর্থদণ্ড, বাক্যদণ্ড এবং পরিশেষে কারাদণ্ডও সহ্য করিতে লাগিল। উভয় ব্যক্তিই রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে রাজা বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাহারা কার্য্যে একবার নিযুক্ত হইলে আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারিবে না। উভয়েই রাজার বাক্যে সম্মত হওয়াতে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি স্বেচ্ছামত রাজার সেবা করিতে লাগিল, সে ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট কোনরূপ বেতন-প্রার্থী নহে বলিয়া রাজাও তাহাকে নির্দ্দিষ্ট ভাবে কোন কার্য্যে নিয়োগ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। সে স্বেচ্ছায় যতদূর পারে, কার্য্য করিতে লাগিল। তাহার দ্বারা কোন গর্হিত কার্য্য হইলেও তাহার নিষ্কাম ভাব দেখিয়া রাজা শীঘ্র তাহার কোনরূপ দণ্ডবিধান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন, এবং কোন সময় তাহার দ্বারা রাজার অভিপ্রায়-মত কার্য্য সমাধা হইলে রাজা যৎপরোনাস্তি প্রসন্ন হইতেন। আর ইহাও মনে মনে ভাবিতেন যে, এ ব্যক্তি আমার নিকট কিছুই প্রার্থী নহে, ইহাকে কিছু দ্রব্য প্রদান করিলেও কিছু গ্রহণ করিবে না। রাজার মনে এইরূপ ভাবনা হওয়াতে দিন দিন রাজা তাহার প্রতি প্রসন্ন হইতে লাগিলেন। এমন কি অবশেষে রাজার নিজ ভক্ষ্য দ্রব্য হইতে আহারীয় বস্তু এবং নিজ গাত্র হইতে অলঙ্কার-বস্ত্রাদি অর্পণ করিতে লাগিলেন। সে সমস্ত বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র স্পৃহা ছিল না, সে জন্য সে গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হইত; কিন্তু গ্রহণ না করিলে পাছে রাজা দুঃখিত হন, এই

ভাবিয়া রাজার প্রসন্নতাহেতু সে ব্যক্তি রাজার আহারীয় বস্ত্র, অলঙ্কার, বস্ত্রাদি গ্রহণ করিত। অবশেষে সে ব্যক্তি রাজার এরূপ প্রিয় হইল যে, বহু সময়ে রাজা তাহার অভিমত লইয়া কার্য্য করিতেন, এবং ক্রমশঃ সেই ব্যক্তির অভিমত রাজাজ্ঞা সদৃশ রাজ্যে সর্ব্বমান্য হইতে লাগিল। প্রথম ব্যক্তি তাহার বন্ধুর এরূপ প্রতিপত্তি দেখিয়া, তাহার প্রতি হিংসা করিতে লাগিল। হিংসার জন্য সময় সময় তাহাকে রাজার ভৎর্সনাও সহ্য করিতে হইত। অবশেষে সেই বেতনভুক্ত ব্যক্তির পক্ষে রাজার ভৎর্সনা অসহ্য হইয়া উঠিল। পরে সেই ব্যক্তি রাজকার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্তির জন্য রাজ-সমীপে প্রার্থনা করিল। কিন্তু পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞাবশতঃ তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল। পরে তাহার দ্বারা কার্য্য শৃঙ্খলামত সমাহিত না হওয়ায় তাহাকে বহুবিধ কষ্ট ভোগ করিতে হইল। এইরূপ জগতের রাজা-বিশেষ ঈশ্বরের নিকট যিনি বেতন-সদৃশ পুত্র, ধনৈশ্বর্য্য, সুখভোগ ও শরীরের আরোগ্যের জন্য কামনা করিয়া উপাসনা করেন, তাহাকে শাস্ত্রবিধি অনুসারে সুশৃঙ্খলরূপে ঈশ্বরের সেবা করিতে হয়। তাহা হইলে সে ব্যক্তি বেতন সদৃশ যাহা কামনা করিয়া থাকে, তাহা প্রাপ্ত হয়। আর যদি বিধিপূর্ব্বক নিয়মিতভাবে ঈশ্বরের সেবা করিতে না পারে, তাহা হইলে সময় সময় তাহাকে রাজদণ্ড সহ্য করিতে হয়। আর কামনাও পূর্ণভাবে সিদ্ধ হয় না, ক্রমশঃ তাহার পতন হইয়া থাকে। *

কিন্তু নিষ্কামী ব্যক্তিগণ কেবল ভগবানের প্রসন্নতা লাভের জন্যই ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকেন। ঈশ্বর ভিন্ন যাঁহাদের আর কোনও কামনা নাই, ঈশ্বরই যাঁহাদের একমাত্র আশ্রয়, ঈশ্বরই যাঁহাদের সর্ব্বকর্ম্মের নিয়ন্তা, ভগবানের গুণানুবাদ ভিন্ন যাঁহাদের আর অন্য কথায় তৃপ্তিলাভ হয় না, তাঁহারাই প্রকৃত নিষ্কামী। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন,—

> যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ। অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
> তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥

'যিনি অনন্যযোগে, অর্থাৎ, যাঁহার আমাভিন্ন অন্য চিন্তা নাই, সকল কর্ম্ম যিনি আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি সকল প্রকার কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে আমাকে স্মরণ করিয়া সেই সকল কর্ম্মের ফল আমাকেই অর্পণ করেন, আমিই যাঁহার একমাত্র ধ্যেয় ও উপাস্য, এই মৃত্যু-সঙ্কুল সংসার-সাগর হইতে আমি তাঁহাকে শীঘ্রই উদ্ধার করিয়া থাকি'। দ্বিতীয় ব্যক্তি যেরূপ নিষ্কামভাবে সেবা করাতে রাজার প্রসন্নতা লাভ করিয়া রাজোপযোগী আহারীয়, বস্ত্র অলঙ্কারাদি ভোগ-বিলাস প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং পরিশেষে রাজার ন্যায় তাহার অভিমত রাজ্যে সর্ব্বমান্য হইয়াছিল; তদ্রূপ নিষ্কামী পুরুষ ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণে ক্রমিক সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ অভিমান-শূন্য হইলেই প্রকৃত নিষ্কাম ভাবের উদয় হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

* সকামী সাধকগণ তন্ত্রমতেও সময় সময় অনিয়মিত অবিধিপূর্ব্বক সাধনাবশতঃ উন্মাদাদি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকেন, ইহাই রাজাস্বরূপ ঈশ্বরের দণ্ড জানিতে হইবে, কিম্বা নিরপেক্ষ ঈশ্বরের দণ্ড না ভাবিয়া সকামীর প্রাক্তন ফল বলিয়া জানিতে হইবে।

সত্য ও জ্ঞান।

বিশ্বের মূল অন্বেষণ মানব-প্রকৃতির একটা অঙ্গ। মানবের আদিম অবস্থা হইতে এই প্রকৃতি চলিয়া আসিতেছে এবং তাহা মিথ (myth) বা প্রাচীন আখ্যায়িকাতে নিবদ্ধ রহিয়াছে। আমাদের দেশে পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্বে এখনও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল পৌরাণিক আখ্যায়িকা, শ্রুতি হইতেও প্রাচীন এবং উহার অসার ভাগ, হিন্দু-চিন্তা-বলে বর্জ্জিত হইয়া বেদান্ত-দর্শনে অভিনব কলেবরে সত্যরূপে পরিণত হইয়াছে। বৈদান্তিক বলেন, এই নিরন্ত পরিণামশীল প্রপঞ্চের অন্তস্তলে এমন এক বস্তু কল্পিত হইতে পারে, যাহা আছে, ছিল ও থাকিবে, যাহার ক্ষয় নাই, ব্যয় নাই এবং যাহা সার্ব্বভৌম ও সর্ব্বকাল-স্থায়ী। এই বস্তুই সৎ বা সত্য এবং অপর সমস্তই অসৎ বা ক্ষণিক ও মিথ্যা। এ স্থলে বৈজ্ঞানিক বলিতে পারেন যে, এরূপ বস্তু দার্শনিক উন্মত্ততা প্রসূত; বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত গুলি কি সার্ব্বভৌম নহে, উহারা কি নিত্য হইতে পারে না? উত্তপ্ত পদার্থ ওজনে বাড়ে, চৌম্বক-শক্তি তড়িৎ-শক্তির রূপান্তর, যাবতীয় মৌলিক পদার্থ পরস্পরের সহিত মিশে না, স্থান ও জল বায়ু অনুসারে জীবের গঠনের পরিবর্ত্তন হয়, প্রত্যেক দেশে আমদানী ও রপ্তানীর মূল্য প্রায় সমান, মনুষ্যের মধ্যে স্বার্থ ও পরার্থপরতা উভয়ই আছে, এই সিদ্ধান্ত গুলি কি অসত্য? যদি এই গুলিকে অসত্য বলা যায়, তাহা হইলে উহা আত্ম-প্রবঞ্চনা ভিন্ন কিছুই নহে। বৈদান্তিক ইহার উত্তরে বলেন যে, এই সিদ্ধান্তগুলি যে নিত্য ও সার্ব্বভৌম, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। এই সিদ্ধান্তগুলি বহুকালের ভূয়োদর্শন-প্রতিষ্ঠিত, তাহা স্বীকার করিতে পারা যায়; কিন্তু তাই বলিয়া উহাদের নিত্যতা স্বীকার করা যায় না। ভূয়োদর্শনে গম্য গমক, ব্যাপ্য ব্যাপক, স্থির হইতে পারে, বস্তুর আপাত-সম্বন্ধ নির্ণীত হইতে পারে; কিন্তু উহাদের নিত্যতা প্রতিপন্ন হয় না। আজ দেখিলাম, কাল দেখিলাম বলিয়া, ভবিষ্যতে দেখিব এইরূপ একটা প্রত্যাশা হয়, কিন্তু তাহা যে সর্ব্বকালস্থায়ী হইবে, তাহা বলা যায় না। ভূয়োদর্শন-নিয়মও ভূয়োদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং বৈজ্ঞানিক সত্য বা প্রমা চিরন্তন না হইতে পারে। এমন কোনও জগৎ থাকিতে পারে, যেখানে উত্তপ্ত পদার্থ ওজনে বাড়ে না, রাসায়নিক ক্রিয়ায় তারতম্য হয় এবং মানুষ স্বার্থপর নহে। সূর্য্য প্রত্যহ আলোক প্রদান করে বলিয়া, উহা যে চিরকালই করিবে, এইরূপ কোনও নিয়ম নাই। এমন এক সময় আসিতে পারে, যখন সূর্য্য জ্যোতিঃশূন্য হইয়া বিশাল পিণ্ডে পরিণত হইবে। বৈজ্ঞানিক সত্য গুলি কার্য্যোপযোগী; ব্যাবহারিক জগতে এই সত্য ভিন্ন চলে না; কাজেই ইহারা ব্যাবহারিক সত্য। ব্যাবহারিক জগতের কার্য্য-কারণে ইহাদের অভ্যুদয় ও বিনাশ, ইহারা চিরন্তন নহে। কিন্তু ইহাদের পশ্চাতে এমন একটি সত্য আছে, যাহা চিরন্তন, যাহা তাবৎ জগতের মূল এবং যাহা বৈদান্তিকের চক্ষুতে পারমার্থিক সত্য।

প্রকৃতির ক্রিয়া-বৈচিত্র্য বা নানাত্ব দার্শনিকেরা অতি প্রাচীন কাল হইতে অনুভব করিয়াছেন। শ্বেত পীত, কোমল কঠিন, মিষ্ট লবণ, মৃদু তীব্র প্রভৃতি গুণগুলির ভাব ও অভাব বস্তু মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গুণগুলি বস্তুনিষ্ঠ অথবা বস্তু হইতে স্বতন্ত্র, এই প্রশ্ন লইয়া দার্শনিক জগতে মতভেদ আছে। কেহ বলেন বস্তুই প্রধান, গুণগুলি আগন্তুক। বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী বলেন, বস্তু ও গুণ উভয়ই স্থির ও স্বতন্ত্র। ইহার ফলে দুই শ্রেণীর মত উৎপন্ন হইয়াছে; যাঁহারা গুণের প্রাধান্য স্বীকার করেন না, বস্তু মাত্র স্বীকার করেন, তাঁহারা একসত্তাবাদী বা মনিস্ট। কপিলের পরিণামবাদ, বৌদ্ধের শূন্য বাদ, পারমিনাইদিসের সত্তাবাদ, হিরাক্লিতসের নানাত্ববাদ, শঙ্করের সত্তাবাদ, স্পেন্সারের মূর্ত্তান্তরিত সত্তাবাদ, এইগুলি এক-সত্তাবাদের পরিচয়। পুনরায় যাঁহারা প্রকৃতির মূলে বহু বস্তু স্বীকার করেন,যেমন বৈশেষিকের ষট্ পদার্থ, নব্য ন্যায়ের সপ্ত পদার্থ এবং জেমস্ প্রভৃতি নব্য পণ্ডিতের পরমাণু, দেশ, কাল, জড়, শক্তি প্রভৃতি নানা সত্তা—বহুসত্তাবাদের দৃষ্টান্ত।

পণ্ডিতের কলহ লইয়া আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। নানাত্ব অস্বীকার করিবার আমাদের উপায় নাই। একই দ্রব্যের কত বিভিন্ন মূর্ত্তি। রাসায়নিক, জড়ের মূলে পরমাণু বা তন্মাত্র স্বীকার করেন; কিন্তু এদিকে একাশীটি মৌলিক পদার্থের উল্লেখ রহিয়াছে। প্রাকৃত বিজ্ঞানের পর্য্যালোচনা অনুসারে একমাত্র ঈথরের স্পন্দনে আলোক, বর্ণ, উত্তাপ, এমন কি তাড়িত ও চৌম্বক ক্রিয়া উদ্ভূত হইতেছে। পুনরায় জীব-তত্ত্বের উপদেশ অনুসারে একমাত্র জীবকোষ হইতে অসংখ্য জীব ও উদ্ভিদের আবির্ভাব হইয়াছে। পুনরায় ভূবিদ্যা অধ্যয়নে জানা যায় যে, পৃথিবী কোন সময় বালুকা বা প্রস্তরময় ছিল, তৎপরে শ্বেত মৃত্তিকা (চক্) এবং তাহার পরে মৃদঙ্গার ও অন্যান্য খনিজ পদার্থের স্তর দ্বারা সমাচ্ছন্ন ছিল এবং এখনও বিভিন্নস্থলে বিভিন্ন স্তর গঠিত হইতেছে। এইরূপ পরিবর্ত্তন নিয়তই ঘটিতেছে; কাজেই নানাত্ব স্বীকার না করিলে চলে না। প্রতি মুহূর্ত্তেই নূতন সৃষ্টি নূতন অবয়ব, এক মুহূর্ত্তের ক্রিয়া অপর মুহূর্ত্তের সঙ্গে মিলে না।

প্রতীচ্য জ্যোতিষের মতে জ্যোতিষ্ক সমূহ প্রথম অবস্থায় বাষ্পময়, তৎপরে ক্রমশঃ দৃঢ়ীভূত হইয়া স্তর ধারণ করে এবং এইরূপে উহা উদ্ভিদের আবাসভূমি ও জীবের বাস যোগ্য হইয়া থাকে। জীবের মধ্যে কত জীব আসিতেছে কত জীব যাইতেছে, প্রত্যেক নূতন মুহূর্ত্ত পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তের সৃষ্টি ধ্বংশ করিতেছে এবং এই ধারাবাহিকত্বের একটা শেষ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এখন আমরা দেখিতেছি, অভিব্যক্তি-দ্বারে মনুষ্যই শেষ জীব। কিন্তু কে বলিবে, মনুষ্য অপেক্ষা উন্নত জীব জগতে আসিবে না বা অপর জগতে নাই? যদি কোনও অধিকতর উন্নত জীবের আগমন সত্যই হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান মানব-বংশ তাহার পথ উন্মুক্ত করিতেছে এবং মনুষ্যেরও প্রতি মুহূর্ত্তে আকার গঠন ও আভ্যন্তরীণ সামগ্রীর পরিবর্ত্তন হইতেছে। বৌদ্ধেরা বোধ হয় জগৎকে এই চক্ষুতে দেখিয়াছিলেন, তাই তাঁহাদের ক্ষণ-ভঙ্গ-বাদ।

এখন জিজ্ঞাস্য, এই পরিবর্ত্তন স্বপ্ন বা ছায়ার ন্যায় অলীক অথবা ইহার মূলে কোনও সত্তা আছে, ইহা ভাব অথবা অভাব মূলক ? বৌদ্ধ মতে জগৎ অভাব, অসৎ বা শূন্য ; কিন্তু শূন্য যদি কিছুই না হয়, তাহা হইলে ইহা হইতে কিছু কি করিয়া আসে ? অধুনা কেহ কেহ বলেন, বীজগণিতে শূন্যকে শূন্য দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল এক হয় অর্থাৎ এস্থলে অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়। সেইরূপ অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি কেন না হইবে ? বলা বাহুল্য, এ উদাহরণ সমীচীন নহে এবং বৌদ্ধের শূন্য-কল্পনা অভাবমূলক বলিয়া বোধ হয় না। যাহাতে কোনও গুণার্পণ করা যায় না, যাহার কোনও নাম নির্দ্দেশ করা যায় না, জগতের কোন বস্তুর সহিত যাহার তুলনা হয় না, তাহাই বৌদ্ধের শূন্য। বৈদান্তিকেরাও জগতের মূলে এইরূপ এক নির্গুণ পদার্থ স্বীকার করেন, তবে তাঁহারা উহাকে শূন্য না বলিয়া অতি বৃহৎ বা ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন এবং ব্রহ্ম বস্তু সৎ,—অসৎ নহে। এই বস্তুর ভূত, ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমানে কোনও ক্ষয় ব্যয় নাই এবং বিবর্ত্ত পরিণামের মধ্যে মালার সূতার ন্যায় উহা সর্ব্বত্র অনুস্যূত রহিয়াছে।

বৈদান্তিক বলেন, এই পরিবর্ত্তন বা বিবর্ত্ত, এই প্রপঞ্চের পঞ্চীকরণ বা বিভিন্ন পরমাণু সমূহের প্রচয়, এই প্রতি মুহূর্ত্তে সৃষ্টি, ইহা অসত্য, ইহা মায়িক ; সত্য কেবলমাত্র সেই অদ্বিতীয় বস্তু। বহু-সত্তাবাদী বলিয়া থাকেন, এক বস্তু স্বীকার করিলে কেমন করিয়া চলিবে ? যদি গুণ লইয়া এক বস্তু স্বীকার করিতে হয়, যথা, নিত্য, অনাদি ও অনন্ত, তাহাও সঙ্গত নহে। জগতে আর কিছুই কি উক্ত গুণ-বিশিষ্ট নাই ? এই দেশ, কাল, পরমাণু, জড়শক্তি, ইহারা কি ? ইহারাও কি অনাদি নহে ? ইহারা কি প্রত্যেকে সত্য নহে ? ইহাদের আদি কোথায় ? ইহার উত্তরে এক-সত্তাবাদী বৈদান্তিক বলিয়া থাকেন, এরূপ বহু অনাদি পৃথক্ সত্তা কল্পনা করিবার আবশ্যকতা কি ? একমাত্র সত্তা বা সত্য স্বীকার করিয়া দেশ, কাল, পরমাণু প্রভৃতি তাহারই অবয়ব বলিয়া ধরিয়া লইলে সঙ্গতি রক্ষা হয় না কি ? এতগুলি বিভিন্ন অনাদি সত্তা মূলে ধরিলে সৃষ্টি ক্রিয়া ও জগৎ-শৃঙ্খলা ব্যাখ্যা করা দুরূহ হইয়া পড়ে। যদি বলা যায়, সৃষ্টির মূলে পরমাণুই সর্ব্বেসর্ব্বা, তাহা হইলে দেশ ও কাল কি পরমাণুর কার্য্যের সুবিধার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে এবং পরমাণু সমূহ নিজ কার্য্যের জন্য কি জড়শক্তি সংগ্রহ করিতে পারে ? আবার প্রাণন ও মনন ক্রিয়া পরমাণুর কোন্ গুণ দ্বারা সাধিত হয় ? বহু সত্তাবাদী বলিতে পারেন যে, প্রত্যেককেই অনাদি স্বতন্ত্র স্বনিষ্ঠ ধরিতে পারা যায় ; কিন্তু ইহাতে আপত্তি এই যে, তাহা হইলে জগতে শৃঙ্খলা থাকিতে পারে না। এই সকল সত্তা প্রত্যেকে অপরের কার্য্যের জন্য যেন নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে। অতএব বহু-সত্তাবাদে জগৎ-সমস্যার কোনও মীমাংসা হয় না।

অপরদিকে ঘোর জড়বাদীরা বলিতে পারেন যে, বহুসত্তাবাদীর মত খণ্ডন হইতে পারে। কিন্তু আমরাও এক-সত্তাবাদী ; জড় আমাদের সত্য পদার্থ—অতএব তোমাদের

মতে ও আমাদের মতে প্রভেদ নাই। তোমরা পরিবর্ত্তন পরিণামকে অনিত্য বল, আমরাও তাহাই বলি; দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থে যে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, বিশ্লেষ-ক্রিয়া দ্বারা আবার সেই মূল অণুতে উপনীত হইতে পারা যায়; কিন্তু অণুর পশ্চাতে আর যাওয়া যায় না। অতএব তোমরা ও আমরা একমতাবলম্বী। ইহার উত্তরে এক-সত্তাবাদী বৈদান্তিক বলিতে পারেন যে, তোমাদের মতে ও আমাদের মতে একটী বিশেষ পার্থক্য আছে। তোমরা তোমাদের সত্য পদার্থকে অচেতন-শক্তি-প্রেরিত ক্রিয়া-সমর্থ, প্রবৃত্তি-চেষ্টা-বিহীন সত্তা-বিশেষ বলিয়া থাক; কিন্তু ভাবিয়া দেখ, জীবের জীবত্ব এরূপ সত্তাদ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। আমাদের সত্য—জ্ঞানময় চিদ্রূপী, তোমাদের সত্য—অচেতন, অজ্ঞান; এই অজ্ঞান হইতে তোমরা জ্ঞানবান্ জীবের উৎপত্তি দেখাইতে চেষ্টা কর, কিন্তু তাহাতে বিচার দোষ আসিয়া পড়ে। তোমাদের সত্য স্থানাবরোধক মাত্র; ইহার গুরুত্ব, দ্রবত্ব প্রভৃতি গুণ দ্বারা জীবের প্রাণ, মন প্রভৃতি বুঝাইতে পারা যায় না। যদি বল জ্ঞান হইতে অজ্ঞান জড় কি করিয়া আসে; তাহার উত্তরে বলা যায় যে, জ্ঞানময় পদার্থ হইতে অজ্ঞান-আভাসবিশিষ্ট জড় আসা সম্ভব, কিন্তু অজ্ঞান জড় হইতে জ্ঞানের আবির্ভাব কিছুতেই দেখাইতে পারা যায় না।

বস্তুতঃ বৈদান্তিক কল্পিত সত্য যদি জ্ঞানময় হয় এবং ঐ জ্ঞান যদি তাবৎ বস্তুতে নিহিত থাকে, তাহা হইলে জড়ে কি করিয়া অজ্ঞান আসে? ইহার উত্তরে বৈদান্তিক বলিয়া থাকেন যে, জগতে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞান কিছুই নাই, জড়েও জ্ঞান-আভাস আছে। ইহাতে বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই; যেহেতু জ্ঞান কোথায় শেষ হইয়াছে এবং অজ্ঞানের কোথায় আরম্ভ, ইহা নিশ্চয় করা বড়ই কঠিন। প্রথমতঃ জ্ঞান ও অজ্ঞানে প্রভেদ কি, তাহা আমরা এখনও বুঝি নাই। দুইটি বিরোধী বস্তুর আরম্ভ ও শেষ অধিকাংশস্থলে স্থির করা যায় না। জীবশ্রেণী শেষ হইয়া কোথায় উদ্ভিদ জীবনের আরম্ভ হইয়াছে, তাহা ঠিক করিয়া বলা দুঃসাধ্য; এরূপ প্রাণী আছে, যাহার মধ্যে উদ্ভিদ ও জীবের লক্ষণ বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং কাহারও মতে উহারা জীব, কাহারও মতে উদ্ভিদ। পুনরায় বস্তুসমূহ যদি কঠিন ও কোমল গুণানুসারে বিভাগ করা যায়, তাহা হইলে গুড় কঠিন কি কোমল, এই প্রশ্ন উপস্থিত হইলে উভয়-সঙ্কটে পড়িতে হয়। রাসায়নিক বিভাগে অনেক স্থলে এই রূপ সমস্যা আসিয়া পড়ে। এ সকল স্থলে ইন্দ্রিয়সমূহ আমাদিগকে প্রতারণা করে। অতএব জ্ঞান ও অজ্ঞানের পার্থক্য নির্দ্দেশ করা সুগম হইবে, এরূপ আশা বিড়ম্বনা মাত্র। আমিবা নামক জীবাণু চৈতন্যবিশিষ্ট কি না, এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হয় যে, উহা চেতন; উহার জ্ঞান আছে। আমিবাকে চেতন আমরা এইজন্য বলি যে, নিশ্চেষ্ট আমিবার আহার্য্য সম্মুখীন হইলে উহা গতিশীল হয় ও শরীরের অংশ প্রলম্বিত করিয়া আহার্য্য আত্মসাৎ করে। বিশেষ উদ্দেশ্যে কোন কার্য্য করা জ্ঞানের লক্ষণ, সেইজন্য বলিতে হয় আমিবার জ্ঞান আছে। যখন কোনও রাসায়নিক মৌলিক পদার্থ অপর মৌলিক

পদার্থকে উপেক্ষা করিয়া কোনও বিশেষ মৌলিকের সহিত মিশে, ইহাও জ্ঞানের পরিচয় কি না, তাহা উত্তরকালীন বৈজ্ঞানিকেরা মীমাংসা করিবেন। অধুনা অনেক প্রাণতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত কারবন্ কম্পাউণ্ড দ্বারা প্রাণী উৎপাদন করিতে চেষ্টা করিতেছেন; যদি তাঁহারা সফল হন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, জড়েও চৈতন্য আছে।

এখন আপত্তি হইতে পারে যে, এই বিশ্বব্যাপী অনন্ত সত্য যদি এক হয়, তাহা হইলে উহা হইতে নানাত্ব, বহুত্ব কি করিয়া আসে? বৈদান্তিক বলেন, ঐ সত্তায় এমন একটি শক্তি আছে, যাহার দ্বারা এই নানাত্ব বহুত্ব সৃষ্ট হইতেছে। সেই শক্তির নাম মায়া বা অবিদ্যা। বৈজ্ঞানিক বলিতে পারেন যে, উহা দার্শনিক কবিত্ব মাত্র, ইহার মূলে কিছুই নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখা উচিত যে, বিজ্ঞান-রাজ্যেও এরূপ কবিত্ব রহিয়াছে। একরসবাহী ইথর যদি তাবৎ জড়ের প্রসবকারী হয়, তাহা হইলে উহা হইতে একাশীটি বিভিন্ন ভূত কি করিয়া হয়? অথবা একমাত্র প্রোটোপ্লাসম্ বহুবিধ জীবের প্রাণসংস্থান কি করিয়া করে? এখানে এক হইতে বহু কি করিয়া হইল? যদি বলা যায়, উহার কারণ অজ্ঞেয়, তাহা হইলে প্রশ্নের কোনও সমাধান হয় না। ইথর, পরমাণু প্রভৃতিও অজ্ঞেয়; কিন্তু উহা ব্যতীত বিজ্ঞানে এক পদ অগ্রসর হওয়া যায় না বলিয়া, উহা স্বতঃসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। এক হইতে বহু কি করিয়া হয়, তাহা বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় নহে, উহা দর্শনের অধিকারভুক্ত। দার্শনিক এস্থলে নির্বাক, নিস্পন্দ থাকিতে পারেন না, তাঁহাকে উহার একটা সঙ্গত কারণ দেখাইতে হইবে। জ্ঞানান্বেষণে দার্শনিকের পশ্চাৎপদ হইবার উপায় নাই; পরীক্ষা পর্য্যবেক্ষণ জ্ঞানের শেষ সীমা নহে; সংখ্যা পরিমাণ দ্বারা তাবৎ বস্তুর রহস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কল্পনা সাহায্যে ও প্রজ্ঞাবলে যত উচ্চে উঠিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আর একটা কথা,—জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয় বলিয়া জ্ঞান-রাজ্যের কোনও সীমা নাই। কোম্‌তের ধারণা ছিল যে, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর ঘটক অবয়ব বা উপাদান আমাদের নিকট চিরকালই অজ্ঞেয় থাকিবে; কিন্তু স্পেক্‌ট্রস্‌কোপ আবিষ্কার দ্বারা আমরা দৃশ্যমান গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির ভৌতিক উপাদান জানিতে পারিয়াছি। অতএব, এক হইতে বহু কোনও বিশেষ শক্তি-প্রভাবেই হইয়া থাকে; উহাকে মায়া বল বা ঐশী শক্তি বল, এরূপ কোনও একটি কারণ নির্দ্দেশ ব্যতীত চলিবে না।

এখনও আরও কয়েকটি জিজ্ঞাসা থাকিয়া গেল, তাহার আলোচনা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে হইতে পারে না। তবে একটি প্রশ্নের উল্লেখ না করিলে চলিবে না। মানব যদি সেই বিশ্বব্যাপী চিন্ময়ের প্রতিরূপ হয়, তাহা হইলে তাহার পূর্ণজ্ঞান হয় না কেন? মানব যে গৃহ-প্রকোষ্ঠে বাস করে, তাহার বাহিরে কি হইতেছে, প্রত্যক্ষ না করিলে জানিতে পারে না; আকাশে কত নক্ষত্র আছে, তাহা গণনা ব্যতীত স্থির হইতে পারে না; উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর ভৌগোলিক অবস্থা কি প্রকার, তাহা আপনা হইতে প্রতিভাত হয় না। জ্ঞানের এ অবরোধ, এ বদ্ধভাব কোথা হইতে আসিল? বৈদান্তিক বলেন, ইহা ঐ

পূর্ব্বোক্ত মায়ারই কার্য্য। এই মায়াশক্তি জ্ঞানের উপর একটী আবরণ দিয়া রাখিয়াছে, তাহা অপসারিত না করিলে পূর্ণ জ্ঞান হয় না। যে যে পরিমাণে এই মায়াশক্তি ভেদ করিতে পারিয়াছে, সে জ্ঞানরাজ্যে সেই পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছে। ইহার উপায় মনন বা বিচার ও নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধ্যান বা চিন্তা। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম, যে বিষয়েই হউক না কেন, মনন নিদিধ্যাসন ভিন্ন জ্ঞান সংগ্রহ হইতে পারে না। কপিল হইতে নিউটন্ পর্য্যন্ত যত মনীষী বিশ্বরাজ্যের অন্তর হইতে জ্ঞানরশ্মি বিকীরণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বিচারশীল ধ্যানী। তবে বৈদান্তিকের চক্ষুতে জ্ঞানের আরও উচ্চতর স্তর আছে; সে অবস্থায় মানুষের জিজ্ঞাসার শেষ হয়, সংশয় বিচ্ছিন্ন হয়, আর তাহার কিছু জানিবার সাধ থাকে না; ইহা সত্যের জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান। এ উক্তিটি দার্শনিকের স্বপ্ন মনে করার কোনও কারণ নাই। মানবের জ্ঞানশক্তির পরিমাণ আমরা এখনও জানিতে পারি নাই। যোগদর্শনের প্রতিভাজ্ঞান ও বৈদান্তিকের ব্রহ্মজ্ঞান, আকাশ-কুসুম নহে, তাহা প্রতিপন্ন হইতে পারে। আদিম অসভ্য মানব ও নব্য সুসভ্য মানবের জ্ঞানের তারতম্য দেখিলে মনে হয় যে, জ্ঞানবিকাশের সম্ভবতঃ সীমা নাই।

শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

চিত্র প্রসঙ্গ।—গত পৌষ মাসের "ব্রহ্মবিদ্যায়" চীনদেশীয় মহাজ্ঞানী কন্‌ফিউসিয়াসের চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত স্থানাভাবে তাঁহার বিষয় কিছুই বলা হয় নাই। অত্র সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলিতেছি। কন্‌ফিউসিয়াস একজন চীনদেশীয় জ্ঞানী সাধু পুরুষ। খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৫৫০ বা ৫৫১ অব্দে কউঙ্ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। চীনদেশীয় ভাষায় তাঁহার নাম "কউঙ্ ফুৎজি" K'ung Futze; ইহার অর্থ দার্শনিক বা গুরু কউঙ। উহা হইতে লাটিন্ ভাষায় নাম কন্‌ফিউসিয়াস হইয়া গিয়াছে। ইনি বলবান ও সাহসী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনবর্ষ বয়ক্রমকালে ইনি পিতৃহীন হন; শৈশবে ইহাকে অতি কষ্টে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। পঞ্চদশ বৎসর বয়সে ইনি শিক্ষায় মনোযোগী হন এবং ঊনবিংশ বর্ষ বয়ক্রমকালে বিবাহিত হন। বিবাহের পর বৎসরেই তাঁহার একমাত্র পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাহার পর তাঁহার দুইটী কন্যাও হইয়াছিল। যাহা হউক, বিবাহের পর হইতেই দারিদ্র্যপ্রযুক্ত তাঁহাকে অগত্যা চাকুরী করিতে হইয়াছিল।

দ্বাবিংশবর্ষ বয়সে কন্‌ফিউসিয়াস শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি কেবলমাত্র বালকদিগের শিক্ষার ভার লইতেন তাহা নহে, যে সকল যুবক সচ্চরিত্রতা এবং

রাজ্য-সুশাসনের নিয়ম সকল শিক্ষা করিতে অভিলাষী হইতেন,তাঁহাদিগকেও যত্নের সহিত সেই সকল বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতেন। তাৎকালিক সমাজের ও রাজ্যের দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল বলিয়া তিনি তৎপতিকারার্থ উক্তরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের শাসনকর্ত্তাদিগের নিকট যাইয়া, তাঁহাদের অত্যাচার ও অবিচার প্রশমন করিবার অভিলাষে অনেক প্রকার আদেশ উপদেশ দিতেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, শাসন-কর্ত্তারা তাঁহার কথায় কেহই কর্ণপাত করিতেন না। তিনি মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার উদ্দেশ্যসাধনে অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া বহু রাজ্য ভ্রমণ করিয়াও, তথা-প্রচলিত সামাজিক বিশৃঙ্খলাবশতঃ সফল-মনোরথ হইতে পারেন নাই।

তাঁহার উপরিউক্ত প্রাণের উদ্দেশ্য সাধন নিমিত্ত তিনি তৎসময়ে রক্ষিত নানাস্থানের পুস্তকালয় হইতে নানাবিধ কাব্য, ইতিহাস গ্রন্থ সকল পাঠ করিতেন, এবং তাহা হইতে উদাহরণ আহরণ করিয়া শাসনকর্ত্তা প্রভৃতিকে বুঝাইতেন। এই সূত্রে তিনি অনেক পূর্ব্ব ইতিহাস ও বিস্তর পুরাতন কবিতা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ এখনও সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। কিন্তু তাঁহার নিজ মত যুক্তি-তর্কদ্বারা প্রমাণিত করিয়া যে সকল উপদেশ তিনি লোক সকলকে প্রদান করিতেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। তাঁহার সমস্ত জীবনের মধ্যে যে সকল ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা বিবৃত করিয়া "বসন্ত ও শরৎ" ("Spring and Autumn") নামে পুস্তক লিখিয়াছিলেন; কিন্তু সাধারণ লোকে সে সকল ঘটনার বিবৃতি সম্বন্ধে সন্দিহান আছেন। যাহা হউক, তিন সহস্র ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন প্রধান শিষ্য তাঁহার অভিমত, উপদেশ ও জীবনী সম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন; তাহা হইতেই, তাঁহার বিষয় এখন আমরা জানিতে সমর্থ হইতেছি। ৭০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

ভ্রম সংশোধন। —গত ফাল্গুন মাসের ভাষ্যের সূচীপত্রে ভ্রমক্রমে "বাৎস্যায়ন ভাষ্যের" উল্লেখ এবং "সিয়ান পাখী" ও "শিব ও শক্তি" নামক সঙ্গীত-দ্বয়ের রচয়িতার নাম-নির্দ্দেশ করা হয় নাই। পত্রিকার চতুর্থ ফর্ম্মায় ৫৮৫ হইতে ৫৯২ পর্য্যন্ত পৃষ্ঠায় "বাৎস্যায়ন ভাষ্য" ছাপা আছে এবং উক্ত সঙ্গীত-দ্বয়ের রচয়িতার নাম—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ। পাঠক মহাশয়গণ! অনুগ্রহপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লইবেন।

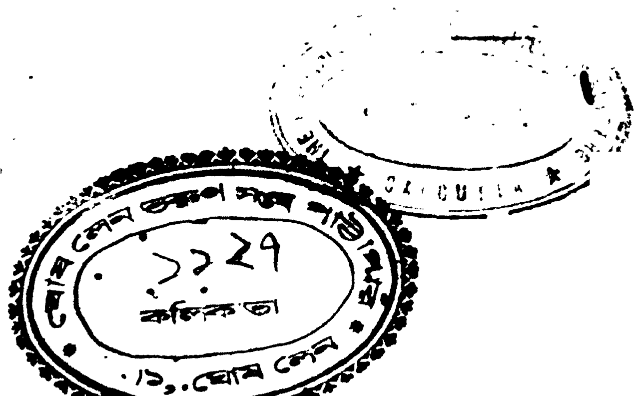
লাওট্‌জি (Lao-Tze)। অদ্য এই সঙ্গে আমরা চীন দেশীয় আর একজন জ্ঞানী দার্শনিকের উল্লেখ করিতেছি। ইহাঁর প্রতিমূর্ত্তি এই সংখ্যার প্রথমেই প্রদত্ত হইয়াছে। চীন ভাষানুসারে লাওট্‌জির অর্থ "বৃদ্ধ বালক" বা "বৃদ্ধ দার্শনিক"। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, ইহাঁর মাতা অলৌকিক উপায়ে গর্ভধারণ করিয়া ৬২ বা ৭২ বৎসর পরে ইহাঁকে প্রসব করেন। প্রসূত বালকের পক্ক কেশ দর্শন করিয়া লোকে "বৃদ্ধবালক" বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিত। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা ইহাঁর জন্মকাল নিশ্চিতরূপে নিরূপণ করিতে পারেন নাই। তবে আনুসঙ্গিক নানা কারণে তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, লাওট্‌জি, কনফিউসিয়াসের সম-সাময়িক ছিলেন, অর্থাৎ খৃষ্টীয় পূর্ব্ব ৬ষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

ইনি আত্ম-প্রচারে বড়ই কুণ্ঠিত হইতেন, এবং দেশের পূর্ব্ব ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ আগ্রহসহকারে পাঠ করিতেন। এক সময়ে কনফিউসিয়াসের সহিত তাঁহার বিস্তর কথোপকথন ও সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। কনফিউসিয়াস যেমন স্থূল সামাজিক, ধর্ম্মনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কার কার্য্যে নিবিষ্ট ছিলেন, লাওট্‌জী মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য, দার্শনিক ভাবে তত্ত্বসকল উদ্ঘাটিত করিয়া অপেক্ষাকৃত উন্নত ও তত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগকে উপদেশ প্রদান করিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন। তবে সে সময়ে দেশমধ্যে সূক্ষ্ম তত্ত্বের সাধারণ ভাবে আলোচনা না থাকাতে, তাঁহার মত বিশেষভাবে পরিমার্জ্জিত ও বিজ্ঞান সম্মতভাবে প্রচার করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহা হইলেও যে সনাতন সত্যের উপর, যে সাধারণ মূলতত্ত্বের উপর জগতের প্রধান প্রধান ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার উপদেশও সেই তত্ত্বগুলির উপর। ইনি টাও নামক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। টাও টে কিং Tao Teh King নামে ইনি এক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। যে ঋষি সঙ্ঘের প্রেরণায় কালে কালে নানা দেশে, নানা ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছে, তাঁহাদেরই ইচ্ছায় চীন দেশে "টাও" বা বেদান্তবাদ প্রচার হইয়াছিল। প্রচারক যিনি, তিনি সাধারণ মানব ছিলেন না; তিনিও এই সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত, ব্রহ্মবিদ্যার শিক্ষক ও প্রচারক। ইহাঁর বিস্তৃত জীবনী পাওয়া যায় না। কাহারও মতে তিনি ১৬০ বৎসর কাহারও মতে তিনি ২০০ বৎসর জীবিত ছিলেন।

পুস্তক প্রসঙ্গ।—কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত লেড বিটার (C. W. Leadbeater) সাহেব "To Those Who Mourn" নামক এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রিয়জনের মৃত্যুতে যাঁহারা মুহ্যমান্ হইয়া পড়েন, তাঁহাদিগের সান্ত্বনার জন্য এই পুস্তিকা খানি লিখিত হইয়াছে। মৃত্যু-রহস্য বা পরলোক-রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া, অতীন্দ্রিয় সত্য ঘটনা সাধারণের সম্মুখে ধরিয়া, লেখক শোকার্ত্তজনের হৃদয়ে আশা ও শান্তিবারি সেচন করিয়াছেন। উক্ত সত্য ঘটনাসকল অলীক সান্ত্বনা দানের জন্য উল্লিখিত হয় নাই, তাহা বালক-প্রবোধের উপায় স্বরূপ কল্পিত উপাখ্যান নহে, অথবা কিম্বদন্তী বা জনশ্রুতি-কথিত

আখ্যায়িকা নহে—সে সকল প্রত্যক্ষ সত্য। পরহিতের জন্ম দৃঢ়-সঙ্কল্প লেখক, দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর সাধনার পর, গুরু কৃপায় সূক্ষ্ম-দৃষ্টি লাভ করিয়া এবং তৎপথের পথিক অন্যান্য সূক্ষ্ম-দৃষ্টি-সম্পন্ন মহানুভবগণের সহিত এক যোগে পরলোক তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া যে সকল তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে নানা পুস্তকে—The Astral Plane, The Devachanic Plane, The Other side of death ইত্যাদি নানারূপ বিবৃত করিয়াছেন। সেই সকল তত্ত্বের দুই একটী কথা লেখক বক্ষ্যমাণ পুস্তকে সংক্ষিপ্ত ও সরলভাবে লিখিয়াছেন। ভুবর্লোকের অবশ্য-জ্ঞাতব্য মূল্যতথ্যগুলি বিশেষ ও বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে; স্বর্লোকের কথাও কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ আত্মীয়-জন শোকার্ত্ত ব্যক্তির পক্ষে এই পুস্তকখানি নিশ্চয়ই শান্তিপ্রদ হইয়াছে।

শোক কেন ভাই? – উপরি উক্ত ইংরাজী পুস্তক অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীযুক্ত মাখন লাল রায় চৌধুরী বি, এ, বি, টি মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় শীর্ষোল্লিখিত নাম দিয়া কথিত পুস্তিকাখানি প্রণয়ন করিয়াছেন এবং দি হোইট্ লোটাস্ পাবলিসিং কোম্পানির শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় Scottish Churches College এর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম, এ—মহাশয়ের সম্পাদকতায় সাধারণে প্রচার করিয়াছেন। পুস্তিকাখানির মূল্য ৶০ তিন আনা, দি হোয়াইট লোটাস্ পাবলিসিং কোম্পানির নিকট পাওয়া যায়। ইহার ভাষা বেশ প্রাঞ্জল ও মনোজ্ঞ হইয়াছে; সাধারণে ইহা পড়িয়া সহজেই পরলোকতত্ত্ব-রূপ কঠিন সমস্যার অনেকটা স্পষ্ট আভাস পাইতে পারিবেন। স্থানে স্থানে ইহাতে আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া লিখিত বিষয় প্রমাণিত করিয়াছেন। বিষয়টী অতীব কঠিন, এবং দুর্জ্ঞেয় হইলেও, লেখার গুণে, ইহাতে সাধারণ মানবের বোধের অধিগম্য হইতে বাধা হইবে না। এই কারণে আমরা সকলকেই এই পুস্তিকাখানি একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি।




CALCUTTA